১ম ভাগ।] বৈশাখ ১৩২২। [১ম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য ২।৵০ আনা।] [প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

আল্-এস্লাম।

১ম ভাগ।

১৩২২, বৈশাখ—চৈত্র।

——:০:——

সূচী পত্র।

—০:০:০—

(বর্ণানুক্রমে।)

আল্-এসলাম—

বায়তুল্লাহ ।

আল্-এস্লাম।

১ম ভাগ।	বৈশাখ, ১৩২২	১ম সংখ্যা

আভাষ।

যে বিশ্ব-বিপদ-হন্তা রহমানুররহিম, আপনার মঙ্গল-করাঙ্গুলিসঙ্কেতে, অধঃপতিত ও নানা পাপ তাপ-জর্জ্জরিত বঙ্গীয় মোসলেম সমাজকে মুক্তির পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন,—যাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ-সিক্ত হইয়া, এস্লামের কয়েকটি নগণ্য সেবক, সমাজকে সেই মুক্তির পথে চালিত করিবার জন্য, আঞ্জমানে ওলামার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন,—এবং, যাঁহার প্রদত্ত শক্তি ও প্রেরণা লাভ করতঃ, সেই জাতীয়-সৌধের কল্যাণভিত্তির উপর, আজ "আল্-এস্লাম"-রূপ আর একখানি ইষ্টক স্থাপিত হইল,—সেই কল্যাণময় সর্ব্বশক্তিমানকে আমরা কায়মনোবাক্যে ধন্যবাদ করিতেছি—তাঁহার উদ্দেশে সহস্র সজ্‌দ!

পাপতাপদগ্ধ বিশ্বচরাচরকে, স্বর্গীয় প্রেমের পুণ্য-পিযুশ-বাহিনী শান্তশীতল সাল্‌সাবিলস্রোতে আপ্লুত করতঃ অনন্ত জীবন দানের জন্য, যে মহিমান্বিত মহাপুরুষ আপনাকে আল্লার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—সুনীতি, প্রেম, শান্তি, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও সাম্যবাদ-শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি সাধনের জন্য, যে মহাপুরুষ আল্লাতায়ালার অসীম করুণার অনন্ত প্রস্রবন স্বরূপ—রাহ্‌মাতুল্‌লেল্ আলামীন স্বরূপ—কোফর-কলুষ-দগ্ধ ধরাতলে মোহাম্মাদরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন,—যাঁহার সেই মৃতসঞ্জীবনী অমৃতবাণীর ঝঙ্কারে, বঙ্গের নগর প্রান্তর মুখরিত করাই "আল্-এস্লাম" প্রচারের প্রধানতম লক্ষ্য,—আজ আমরা ভক্তিগদগদকণ্ঠে তাঁহার নামের জয়জয়কার করিতেছি—তাঁহার উদ্দেশে সহস্র দরূদ!!

আল্-এস্‌লাম।

স্বধর্ম্ম, স্বজাতি, স্বদেশ ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা করিবার নিমিত্তই "আল্-এস্‌লামের" প্রচার। পান্থ—অনভিজ্ঞ ও অশক্ত, পথ—অতিশয় বন্ধুর, সূচীভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এ অবস্থায়, "সিনা" গিরি শিখরের সেই বিদ্যুদ্বহ্নিরই একমাত্র ভরসা। সেই মহাবহ্নির একটী শিখা আবার চমকিয়া দমকিয়া উঠুক, আমরা আমাদের ভগ্ন প্রদীপটী জ্বালাইয়া লই।

مددے گر بچراغے نکند آتش طور
چارۂ تیرہ شب وادي ايمن چه کنم ؟

অভিনন্দন।

[১]

এস, নূতন বরষে নূতন হরষে
নব অরুণিমা মাখিয়া,
এস, নূতন আলোকে নবীন পুলকে
নূতন জীবন বহিয়া।

[২]

এস, নব বসন্তের নব আনন্দের
নবীন সুরভি মাখিয়া
এস, মৃত সঞ্জীবনী পুণ্য পূতবাণী
জীমূত মন্দ্রে ঘোষিয়া।

[৩]

এস, আঁধার ভেদিয়া, আকাশ রাঙিয়া
নবীন কিরণ বিতরি,
এস, মধুর কূজন করিয়া বহন
ছড়ায়ে অমৃত লহরী!

[৪]

এস, নবীন উল্লাস নবীন আশ্বাস
নবীন উৎসাহ লইয়া,
এস, শারদ চাঁদিনী, প্রেমের রাগিনী
হৃদয়ে মাখিয়া পূরিয়া।

[৫]

এস, "আল-এস্‌লাম"! সহস্র সালাম
বন্দি হে তোমায় আনন্দে,
এস, নূতন আশায় নূতন ভাষায়
বরিছে তোমায়, স্বচ্ছন্দে!

[৬]

এস, ল'য়ে নব গান, ল'য়ে নব তান
ল'য়ে নব স্বাস্থ্য শকতি,
এস, ল'য়ে নব গাথা, মরমের কথা
বহিয়া জাতীয় মুকতি!

[৭]

এস ল'য়ে সেই বাণী সুধামন্দাকিনী
লইয়া কর্ম্মের স্রোতনা,
দাও মরা গাঙ্গে বাণ ডাকি'রঙ্গে
বহুক নবীন চেতনা!

[৮]

নবীন উষায় নবীন ভূষায়
নবীন মূরতি ধরিয়া,
এস, আলস্য জড়তা হীনতা দীনতা
মোহ অবসাদ মথিয়া!

[৯]

এস, নব উদ্দীপনা, নূতন প্রেরণা
নূতন স্ফূরতি—সঙ্গে,
এস, কর্ম্মের ভেরী ধর্ম্মের তূরী
বাজায়ে অসাড় বঙ্গে!

সিরাজী।

কোরআন।

(নাম সম্বন্ধে আলোচনা)।

কোরআন মজিদের নাম সম্বন্ধে অনেক মোসলমানই চিন্তা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। একবার একজন আর্য্য সমাজী মহোদয়কে এ বিষয় 'গভীর গবেষণায়' প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছিলাম। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর আবিস্কার করিয়াছিলেন যে, কোরআন শব্দ কোর্ এবং আন্ শব্দদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন। কোর্ শব্দের অর্থ পাঠ কর, এবং আন্ শব্দের অর্থ এখন, সুতরাং কোরআন শব্দের অর্থ হইল 'তুমি এখন পাঠ কর'। কিমাশ্চার্য্যমত পরম্ ?† আরবী জুনিয়ার ক্লাসের ছাত্রগণ আর্য্য পণ্ডিত মহাশয়ের এই অমূল্য গবেষণার প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন।

নামের আবশ্যকতা।

জগতে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দ্দিষ্ট নাম আছে। কথোপকথনের সময় অন্যান্য বস্তু হইতে বস্তু বিশেষের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব রক্ষা করাই এই নামকরণের উদ্দেশ্য। মানব শব্দে মানব মাত্রই সমান এবং অভিন্ন, কিন্তু মুজিবের নাম মুজিবকে, মুনিরের নাম মুনিরকে অপরাপর মানব হইতে স্বতন্ত্র এবং পৃথক করিতেছে। এইরূপ পুস্তক-শব্দে পৃথিবীর সমুদয় পুস্তকই বুঝাইতেছে, কিন্তু 'তওরাৎ' শব্দ তওরাৎকে, 'জবুর' শব্দ জবুরকে এবং 'ইঞ্জিল' শব্দ ইঞ্জিলকে অন্যান্য সমুদয় পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র এবং পৃথক করিতেছে। নাম করণ দ্বারা বস্তুর বিশেষত্ব রক্ষিত না হইলে কথোপকথন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত—বক্তা যে কাহার বিষয় বলিতেছেন, শ্রোতা তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিত না। অতএব কোরআন মজিদের নাম করণেরও বিশেষ আবশ্যক ছিল।

নামকরণে উপযোগীতাবিচার।

নাম করণ সম্বন্ধে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বস্তু ও তাহার নামের মধ্যে যেন বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, অর্থাৎ নাম বস্তুর এবং বস্তু নামের উপযোগী হয়। এই উপযোগীতা বিচার যদিও সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না, তথাপি ইহা যে সুবিবেচনার পরিচায়ক, তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ ইহার দ্বারা, একদিকে যেরূপ, সম্বন্ধ এবং উপযোগীতা থাকা প্রযুক্ত, নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র শ্রোতা বস্তুকে বুঝিতে সমর্থ হন, পক্ষান্তরে ইহার দ্বিতীয় মহান উপকার

† "ইসলামচিত্র" নামক পুস্তকের গ্রন্থকার বলিতেছেন—আরবী ভাষার "কার্ণন" শব্দ হইতে কোরআণ সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে!! সম্পাদক।

এই যে, এই শ্রেণীর নামগুলি তাহাদের অধিকারী দিগের আকার, প্রকৃতি, গুণ, ভাব এবং উদ্দেশ্যের প্রতি সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত করিয়া থাকে। ঠিক যেন প্রবন্ধের শীর্ষ, যাহা পাঠ করিয়াই প্রবন্ধের ভাব এবং উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে আমরা বুঝিতে পারি। আরব্য ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্রের তিনটী গ্রন্থের নাম যথাক্রমে 'আস্‌রারুল বালাগাহ্' (অলঙ্কার তত্ব) 'মোতাউ-ওয়াল' (দীর্ঘ) 'আত্‌ওয়াল' (দীর্ঘতর)। ইহাদিগের মধ্যে কোনটী অলঙ্কার শাস্ত্র-গ্রন্থের নাম হওয়ার উপযুক্ত, এবং কেন উপযুক্ত, তাহা পাঠককে বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

কোরআন মজিদের নাম করণ।

কতিপয় মুসল্‌মান পণ্ডিতের (যাঁহাদিগের মধ্যে এমাম শায়াফেয়ী ও অন্যতম) মত এই যে, কোরআন মজিদের—কোরআন নাম করণের সময়, কোনরূপ সম্বন্ধ এবং উপযোগীতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই। তওরাৎ জবুর এবং ইঞ্জিলের নাম খোদাতায়ালা যেরূপ 'তওরাৎ' 'জবুর' এবং 'ইঞ্জিল' রাখিয়াছেন, সেইরূপ তিনি কোরআন মজিদের নাম 'কোরআন' রাখিয়াছেন। এই মতটি যে কতদুর অভ্রান্ত, পাঠক তাহা পরে জানিতে পারিবেন। সম্প্রতি আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে, তওরাৎ, জবুর এবং ইঞ্জিলের নাম করণে সম্বন্ধ এবং উপযোগীতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে কি না।

ইঞ্জিল।

ইঞ্জিল শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ **Evanglion** হইতে। **Evanglion** শব্দের অর্থ সুসংবাদ। খ্রীষ্টানদিগের নিকট ইঞ্জিলের সুসমাচার হওয়ার কারণ এই যে, উহাদ্বারা মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট জগৎবাসীকে "স্বর্গ রাজ্যের" আনন্দময় সংবাদ অবগত করাইয়াছিলেন। মুসলমানগণ ইঞ্জিলকে সুসংবাদ মনে করেন—এইজন্য যে, উহাতে হজরত ঈসা, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ মোহাম্মাদ মোস্তফার শুভাগমনের মঙ্গলময় বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পাঠ করুন :—

اذ قال عيسى ابن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التورة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد (الصف ركوع ١)

"যখন মরয়াম-পুত্র ঈসা বলিয়াছিলেন :—হে এস্‌রাইলের বংশধরগণ, আমি খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি, আমি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী তওরাতের সমর্থন করিতেছি এবং আমার পরবর্ত্তী তত্ত্ববাহক আহমদের আগমনের (আনন্দময়) সুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি। ২৮, ৯।

মুসলমানদিগের নিকট ইহা হইতে অধিক সুসংবাদ আর কি হইতে পারে?

তওরাৎ।

তওরাৎ, হিব্রু শব্দ তোরাঃ—অর্থ আদেশ, অনুজ্ঞা এবং ব্যবস্থা। যিনি তওরাৎ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, তওরাতের ন্যায় ব্যবস্থা পুস্তকের নাম 'তওরাৎ' রাখা কিরূপ সঙ্গত হইয়াছে।

জবুর।

জবুর হিব্রু অথবা হাবশীয় (আবিসিনিয়া দেশীয়) ভাষার শব্দ মজ্‌মুর বা জমুর হইতে গৃহীত, জমুর শব্দের অর্থ গান। জবুর পুস্তকও মহাত্মা দাউদের সুললিত স্তোত্রগুলির সমষ্টি মাত্র। জবুরের দ্বিতীয় নাম মাজামিরে দাউদ—দাউদের গীতাবলী। (১)

প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রাপ্ত পুস্তকের নাম করণও প্রত্যাদেশ দ্বারা হওয়া চাই।

ইঞ্জিল ও তওরাৎ প্রভৃতির ন্যায় কোরআন মজিদের নাম করণেরও অবশ্য যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু কোরআন মজিদের এবং অপরাপর তত্ত্ব বাহকদিগের গ্রন্থ সমূহের নামের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্যও আছে। অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে ইহা বলিবার উপায় নাই যে, গ্রন্থগুলির ন্যায় তাহাদের নামগুলিও প্রত্যাদেশ (الہام) দ্বারা প্রাপ্ত, এবং খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অথচ স্বর্গীয় পুস্তক মাত্রেরই অন্যান্য প্রত্যেক বিষয় যেরূপ খোদা তায়ালার নিকট হইতে প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, নাম করণও তদ্রূপ প্রত্যাদেশ দ্বারা হওয়া উচিত। আমরা বলিয়াছি, অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তকের নাম প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রদত্ত নহে, এরূপ বলিবার কারণ এই যে, ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে উহাদের নামের কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রাপ্ত হইলে, গ্রন্থের মধ্যে নামের উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। যেহেতু প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষ যতগুলি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমুদয়ই তাঁহার পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নচেৎ স্বীকার করিতে হইবে যে সেই পুস্তক অসম্পূর্ণ।

তওরাৎ এবং জবুর সম্বন্ধে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ উক্ত পুস্তকদ্বয়ের মধ্যে তাহাদের নাম সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই। ইঞ্জিলের মধ্যে অবশ্য দুই এক স্থানে তাহার নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে উল্লেখ কিরূপ? আরবী ইঞ্জিলের মধ্যে তাহার নাম তাব্‌শীর বোশরা এবং বেশারত (تبشير - بشري - بشارت) ইংরাজী ইঞ্জিলের মধ্যে গস্পেল (Gospel) গ্রীক ইঞ্জিলে ইভাঞ্জিলিয়ান (Evanglion) পার্শী ইঞ্জিলে মোজদা (مژده) উর্দ্দু ইঞ্জিলে খোশ-খাবারী (خوشخبری) বাঙ্গলা ইঞ্জিলে সুসমাচার এবং অন্যান্য ভাষায় অন্যান্য নাম।

মূল ইঞ্জিল চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বিভিন্ন ভাষায় ইঞ্জিল বলিয়া যাহা এখন পরিচিত, তৎসমুদয়ই মূল ইঞ্জিলের শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ অনুবাদ মাত্র। সুতরাং মূল ইঞ্জিলের প্রকৃত নাম যে কি, তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, বেদেও বেদের নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু কোরআন বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করিতেছে যে, আমার নাম কোরআন। একবার নহে, দুইবার নহে—৬০বার কোরআন বলিয়াছে যে, আমার নাম কোরআন। কোরআন মজিদ অন্যান্য নামেও অভিহিত

(১) مزامير داود كتاب من اسفار العهد القديم فيه انا شيد داود الملک *
فوايد اللغه ص ٣٦٠

হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাও কোরআনই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে। ইহা সামান্য বিষয় নহে। সুদূর ভবিষ্যতে যদি কোন সময় :খ্রীষ্টধর্ম্ম, য়্যাহুদীধর্ম্ম এবং আর্য্যধর্ম্ম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি বর্ত্তমান থাকে, তবে তদানীন্তন পৃথিবীবাসীদিগকে কে বলিয়া দিবে যে, ইহা মহাত্মা মুসার গ্রন্থ তওরাৎ, ইহা মহাত্মা যীশুর পুস্তক ইঞ্জিল, আর ইহা আর্য্য ঋষীদিগের গ্রন্থ বেদ। পক্ষান্তরে যদি মুসলমানজাতি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহাদিগের স্মৃতিগুলিও ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়, আর যদি কোরআন মজিদ বিদ্যমান থাকে, তবে তাহার প্রত্যেক অধ্যায় ও প্রত্যেক পৃষ্ঠা বলিয়া দিবে যে, আমি কোরআন! পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মুসলমানগণ বাস করিতেছে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় কথোপকথন করিতেছে, মুসলমানগণ, ততোধিক অমুসলমানগণ, কর্ত্তৃক পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় কোরআন মজিদের অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক ভাষায় কথিত হইতেছে যে, ইহার নাম কোরআন. প্রত্যেক অনুবাদের প্রত্যেক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে, ইহার নাম কোরআন। ইহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে :—

১। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কোরআন মজিদের নাম ও প্রত্যাশে (الہام) দ্বারা প্রাপ্ত।

২। কোরআন মজিদের ন্যায় তাহার নামও পরিবর্ত্তন এবং সংস্কারসাপেক্ষ নহে।

৩। কোরআন, কোরআনরূপে পরিচিত হইতে মুসলমানদিগের মুখাপেক্ষী নহে।

কোরআন মজিদের নামের সংখ্যাধিক্য।

কোরআন মজিদের নামের সংখ্যা অনেক। আল্লামা আবুল মায়ালীর অনুসন্ধান অনুসারে বিশেষ নাম ছাড়া সাধারণ নামের সংখ্যা ৫৫ পঞ্চান্ন। (১) সব গুলিরই কোরআন মজিদে উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন কোরআন শব্দও পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। নামের এই সংখ্যাধিক্য এবং পুনঃপুনঃ উল্লেখ দ্বারা আমরা কি বুঝিতে পারি? জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি যাহাকে ভালবাসে, শতবার শতপ্রকারে তাহাকে স্মরণ করে, সহস্রবার সহস্র প্রকারে তাহার নাম গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহা কেবল ব্যক্তি বিশেষের অবস্থা নহে। জাতি এবং দেশ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। যে জাতির যাহা প্রিয়তর এবং অত্যাবশ্যক, যে দেশের যাহা প্রীতিভাজন এবং দরকারী, সে জাতির এবং সে দেশের ভাষায়, জলবায়ুতে এবং মৃত্তিকায় নানারূপে নানাভাবে এবং পুনঃপুনঃ তাহারই উল্লেখ এবং আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। খোদাতায়ালা কোরআন মজিদের মধ্যে বিভিন্ন শব্দে এবং পুনঃপুনঃ কোরআনের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরং কোরআন মজিদ তাঁহার কিরূপ আদরের এবং প্রীতির সামগ্রী, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর বুদ্ধিমান জীব আছেন, যাঁহারা কোরআণ মজিদকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না—সুতরাং নিজে কখনও পাঠ করেন না, এবং যাঁহারা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে

(১) বিশেষ বিবরণের জন্য আল্‌ এৎকান اسماءالقران অধ্যায় দেখুন।

মোল্লা ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করিয়া, কোরআন বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

من در امید مرهم و این آهوان مست * ریزند بر جراحت ما مشک سوده را

কোরআন মজিদের বিভিন্ন নাম।

কোরআন মজিদের মধ্যে তাহার যে সকল সাধারণ নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত পক্ষে সে গুলি তাহার বিশেষণ। নিম্নলিখিত নামগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন :—

১।	কালামুল্লাহ (১)	খোদার বাণী।
২।	নুর, (২)	জ্যোতি।
৩।	শেফাউন, (৩)	আরোগ্য (সুধা)
৪।	হোদা,	জ্ঞান, পথ প্রদর্শক।
৫।	রাহমাত,	দয়া, করুণা।
৬।	মাওয়েজাতুন,	উপদেশ।
৭।	জেকরুণ,	স্মরণ, উপদেশ।
৮।	জেক্‌রুম্মোবারাকন,	পবিত্র স্মৃতি, পবিত্র উপদেশ।
৯।	আজ্‌ জেকরুল হাকিম,	জ্ঞানময় উপদেশ
১০।	হেকমাত,	জ্ঞান।
১১।	হেকমাতুম্বালেগাহ,	গভীর জ্ঞান, অন্তস্পর্শী জ্ঞান।
১২।	মোহায়মেন,	সাক্ষী।
১৩।	মোসাদ্দেক,	পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের সমর্থক অথবা তাহাদিগের সত্যতা সপ্রমাণ কারী।

(১) ১০ পারা ৭ রুকু।
(২) ৬পাঃ, ৪রুঃ, ৬পাঃ, ৭রুঃ, ৯পাঃ, ৯রুঃ, ২৫পাঃ, ৬রুঃ।
(৩) ১১পাঃ ১১রুঃ, ১৫পাঃ ৯রুঃ, ১৪পাঃ ১৯রুঃ।
(৪) ১পাঃ ১রুঃ, ১পাঃ ১২রুঃ, ৮পাঃ ৭রুঃ, ৯পাঃ ১৪রুঃ, ৪পাঃ ৫রুঃ, ১১পাঃ ১১রুঃ, ১৪পাঃ ২০রুঃ, ২৪পাঃ ১৯রুঃ, এবং অন্যান্য স্থানে।
(৫) ৮পাঃ ৭রুঃ, ৯পাঃ ১৪রুঃ, ১১পাঃ ১১রুঃ, ১৫পাঃ ৯রুঃ। এবং অন্যান্য স্থানে।
(৬) ৪পাঃ ৫রুঃ, ১১পাঃ ১১রুঃ, ১২পাঃ ১০রুঃ, ১৮পাঃ ১০রুঃ।
(৭) ৮পাঃ ১৫রুঃ, ২৪পাঃ ১৯রুঃ, ১৪পাঃ ১২রুঃ।
(৮) ১৭পাঃ ৪রুঃ। (৯) ৩পাঃ ১৪রুঃ।
(১০) ২পাঃ ২রুঃ, ২পাঃ ১৩রুঃ, ৪পাঃ ৮রুঃ, ৫পাঃ ১৪রুঃ, এবং অন্যান্য স্থানে।
(১১) ২৭পারা ৮রুকু। (১২) ৬ পারা ১১ রুকু।
(১৩) ১পাঃ ৪রুঃ, ১পাঃ ১১রুঃ, ১পাঃ ১২রুঃ, ৯পাঃ ১৭রুঃ, ২৬পাঃ ২রুঃ এবং অন্যান্য স্থানে।

১৪।	সেরাতুম্ মোস্তাকীম,	সরল পন্থা, ন্যায়পথ।
১৫।	কাইয়েম,	দায়ী, অভিবাহক।
১৬।	কওলুন ফাস্ল,	চরম মীমাংসা, অথবা ন্যায়ান্যায় মীমাংস কারী গ্রন্থ।
১৭।	আন্ নাবাউল আজীম,	মহা সংবাদ।
১৮।	আহ্সান উল হাদীস,	সর্ব্বোৎকৃষ্ট কথা।
১৯।	রূহুন (রূহ্)	প্রাণ, শক্তি।
২০।	আল্ওয়াহ্য়ী,	প্রত্যাদেশ।
২১।	বাসায়ের,	যুক্তি সকল, অথবা দৃষ্টিশক্তি সমস্ত।
২২।	বায়ান,	বিবরণ, ব্যাখ্যাতা।
২৩।	এল্ম্,	জ্ঞান, শিক্ষা।
২৪।	তাজ্কেরা,	উপদেশ।
২৫।	হাক্ক,	সত্য, ন্যায় অথবা সত্যবাদী।
২৬।	আল্ ওর ওয়াতুল ভোস্কা,	সুদৃঢ় উপলক্ষ।
২৭।	সেদ্ক্,	সত্য, প্রকৃত।

---

(১৪) ৮পাঃ ৬রুঃ, ২২পা ১৮রুঃ।

(১৫) ১০পাঃ ১১রুঃ, ১৬পাঃ ১৩রুঃ, ২১পাঃ ৮রুঃ।

(১৬) ৩০পাঃ ১১রুঃ।

انه ان القران لقول فصل فاصل بين الحق والباطل * تفسير بيضاوي ج ٢ ص ٣٢٣

(১৭) ৩০ পারা ১ রুকু।

النباء العظيم' هو ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم من
القران المشتمل على البعث وغيره — جلالين ج ٢ ص ٤٨٤ قال الامام البغوى :—
قال مجاهد قال الاكثرون هو القران * معالم التنزيل ج ٤ ص ٢٠٧

(১৮) ২৩পাঃ ১৭রুঃ।

[১৯] ১৪পাঃ ৭রুঃ, ২৫পাঃ ৬রুঃ। [২০] ১৭পাঃ ৪রুঃ, ২৭পাঃ ৫রুঃ।

[২১] ৯পাঃ ১৪রুঃ, ৯পাঃ ১৯রুঃ, ২৫পাঃ ২৮রুঃ। [২২] ৪পাঃ ৫রুঃ।

[২৩] ২পাঃ ১রুঃ, ৩পাঃ ১০রুঃ, ৩পাঃ ১৪রুঃ

[২৪] ১৬পাঃ ১০রুঃ, ২৯পাঃ ৬রুঃ, ২৯পাঃ ১৩রুঃ, ২৯পাঃ ২০রুকু।

[২৫] ১পাঃ ১১রুঃ, ১পাঃ ১৪রুঃ, ১৮পাঃ ৪রুঃ, ২৩পাঃ ৭রুকু।

[২৬] ২৩পাঃ ২রুঃ, ২১পাঃ ১২রুকু।

فقد استمسك بالعروة الوثقى' عن انس بن مالك - العروة الوثقى - القران *
تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٥٣

[২৭] ২৪ পারা ১ রুকু।

২৮। মোনাদী, আহ্বানকারী, ঘোষণাকারী।
২৯। হোকুম, অনুজ্ঞা, অনুশাসন।
৩০। মাসাল, উদাহরণ।
৩১। বোশ্রা, সুসংবাদ।
৩২। বাশীর সুসংবাদ দাতা।
৩৩। নাজীর, সতর্ককারী।
৩৪। সোহফ, পুঁথি।
৩৫। বালাগ, সন্দেশ।
৩৬। আহ্সানুল কাসাস, সুন্দরতর উপাখ্যান।
৩৭। কেতাব ও আল কেতাব গ্রন্থ।
৩৮। কেতাবুল্লাহ্ খোদার গ্রন্থ।
৩৯। কেতাবুম্মোবীন, প্রকাশকারী গ্রন্থ, বর্ণনাকারী পুস্তক।
৪০। কেতাবুম্মোবারাক, পবিত্র গ্রন্থ, কল্যাণদায়ক গ্রন্থ।
৪১। কেতাবুন আজীজ, মহাগ্রন্থ, অথবা প্রিয়তম গ্রন্থ।
৪২। আল কেতাবুল হাকীম, জ্ঞানময় গ্রন্থ।
৪৩। আয়াতুল্লাহ, খোদার নিদর্শন, অথবা খোদার উপদেশ।
৪৪। আয়াতুম্ মোবাইয়েনাৎ পরিষ্কার নিদর্শন, প্রকাশ্য উপদেশ, পরিষ্কারকারী নিদর্শন, সতর্ককারী উপদেশ।

---

[২৮] ২১ পারা ১২ রুকু।

انا سمعنا منادیا ینادی للایمان * قال القرطبی یعنی القران فلیس کل واحد یلقی النبی صلی الله علیه وسلم - تفسیر معالم التنزیل ج ۱ ص ۲۰۵

[২৯] ১৩ পারা ১১ রুকু। [৩০] ১৮ পারা ১০ রুকু।
[৩১] ১ পারা ১২ রুকু, ১৪পাঃ ২০রুঃ, ১৯পাঃ ১৬ রুঃ, ২৬পাঃ ২১রুঃ।
[৩২] ২৪ পারা ১৫ রুকু। [৩৩] ১৮পাঃ ১৬ রুঃ, ২৪পাঃ ১৫রুঃ।
[৩৪] ৩০পাঃ ৫রুঃ, ৩০পাঃ ২৩রুঃ। [৩৫] ১৩ পারা ১৯ রুকু।
[৩৬] ১২ পারা ১১ রুকু।
[৩৭] ১পাঃ ১রুঃ, ১পাঃ ১১রুঃ, ১৫পাঃ ১৩রুঃ, ২৫পাঃ ৬রুঃ, ৩পাঃ ৯রুঃ এবং অন্যান্য স্থানে।
[৩৮] ১পাঃ ১২রুঃ, ৩পাঃ ১১রুঃ, ২২পাঃ ১৬রুঃ, ১০ পারা ১১ রুকু।

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله - ای فیما اثبته الله تعالی فی کتابه - ای القران لان فیه آیات تدل علی الحساب و منازل القمر -
فتح البیان ج ۴ ص ۱۰۳

[৩৯] ১২পাঃ ১১রুঃ, ১৯পাঃ ৫রুঃ, ১৯পাঃ ১৬রুঃ, ২০পাঃ ৪রুঃ, ২৫পাঃ ৭রুঃ, ২৫পাঃ ১৪রুঃ
[৪০] ৭পাঃ ১৭রুঃ, ৮পাঃ ৭রুঃ। [৪১] ২৪পাঃ ১৯রুঃ,। [৪২] ১১পাঃ ৬রুঃ, ২১পাঃ ৬রুঃ
[৪৩] ৩পাঃ ১রুঃ, ৪পাঃ ১রুঃ, ৪পাঃ ২রুঃ, ২০পাঃ ১২রুঃ, ৩পাঃ ৪রুঃ এবং অন্যান্য স্থানে।
[৪৪] ১৮পাঃ ১০রুঃ, এবং ১২ রুকু।

৪৫। আল কাসাসুল হাক্ক, সত্য উপাখ্যান, প্রকৃত বর্ণনা।
৪৬। আল্ আয়াৎ, নিদর্শনসমূহ, প্রমাণ সকল, উপদেশসমূহ।
৪৭। বাইয়েনাহ, ও বাইয়েনাৎ— যুক্তি, প্রমাণ; অথবা জাজ্বল্যমান প্রমাণ।
৪৮। তানজীল, (بمعنى منزل) প্রেরিত, অবতীর্ণ।
৪৯। বোরহান, প্রমাণ।
৫০। শাহেদ, সাক্ষী।

এই বিশেষণগুলি কোরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে তাহার নামস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। সবগুলিই আরব্য অভিধানের শব্দ, অর্থের মধ্যে কোনই জটিলতা নাই। সুতরাং এই শব্দগুলি কোরআন মজিদের নাম হওয়ার কিরূপ উপযুক্ত, তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। যিনি শব্দগুলির অর্থের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকটী কিরূপ পরিষ্কার, এবং সুন্দর .অথচ সংক্ষিপ্তভাবে কোরআনের বিশেষত্ব, কোরআনের সৌন্দর্য্য, কোরআনের উদ্দেশ্য, কোরআনের শিক্ষা এবং কোরআনের লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।

কোরআনের বিশেষ নাম।

কোরআন মজিদের বিশেষ নাম তিনটী, ফোরকান, মোসহাফ এবং কোরআন। দ্বিতীয়টী প্রথমটী হইতে এবং তৃতীয়টী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ।

ফোরকান।

এই নামে কোরআন মজিদ নিজকে তিনবার অভিহিত করিয়াছে :—

(১) (توبه) تبارك الذى نذزل على عبده الفرقان—১ম:

[৪৫] ৩ পারা ১৪ রুকু।
[৪৬] ২ পারা ১১ রুকু, ১ পারা ১৩ রুকু, ২ পারা ১৫ রুকু।
[৪৭] ৮ পারা ৭ রুকু, ১২ পারা ২ রুকু, ৩০ পারা ১২ রুকু, এবং ১ পারা ১২ রুকু, ২ পারা ৭ রুকু, ২ পারা ৯ রুকু, ৩ পারা ১৭ রুকু।
[৪৮] ১৯পাঃ ১৪রুঃ. ২২পাঃ ১৮ রুঃ, ২৭পাঃ ১৬রুঃ, ২৯পাঃ ৫রুঃ ৩০পাঃ ২৩রুকু।
[৪৯] ৬ পারা ৪ রুকু। [৫০] ১২ পারা ২ রুকু।

افمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه * قال الحسين بن الفضل هوالقران و نظمه و اعجازه - معالم التنزيل ج٢ ص١٢٨ * قال ابن زيد :—رسول الله صلعم كان على بينة من ربه والقران يتلوه شاهد منه ايضا من الله بانه رسول الله صلعم - تفسير طبرى ج١٢ ص١١ * والمراد بال شاهد القران - تفسير غرايب القران نيسابورى ج١٢ ص١١٥

[১] (القران الكريم) পারা ১৮, রুকু ১৬।

(যিনি স্বীয় দাসের উপর ফোরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি মহিমান্বিত)

২য় ঃ—

(১) وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان * (آل عمران)

মানবকে সত্য পথ প্রদর্শন নিমিত্ত ইতঃপূর্ব্বে তিনি তওরাৎ এবং ইঞ্জিল অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, এবং (এখন) ফোরকান অবতীর্ণ করিলেন।

৩য় ঃ— شهر رمضان الذى انزل فيه القران

(২) هدى للناس و بينت من الهدى والفرقان (بقره)

মানবগণকে সত্য পন্থা প্রদর্শন নিমিত্ত আমি রমজান মাসে কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। ইহাতে পূর্ণ শিক্ষা এবং ব্যবস্থা আছে।

কোরআণ মজিদ তওরাৎকেও ফোরকান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে ঃ—

و لقد آتينا موسى و هارون الفرقان (انبياء) (৩)

(নিশ্চয় আমি মুসা এবং হারূনকে ফোরকান দিয়াছিলাম)

ফোরকান কোন ভাষার শব্দ, এবং উহার অর্থ কি? এখন তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। কোরআন মজিদের ইংরাজী অনুবাদক প্রসিদ্ধ নামা জর্জ্জ সেল (George Sale) মহোদয় হিব্রুভাষাবিদ্ একাধিক পণ্ডিতের সাক্ষ্যানুসারে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ফোরকান শব্দ হিব্রুভাষা হইতে গৃহীত। য়্যাহুদীগণ তাহাদের ধর্ম্ম পুস্তকের অধ্যায় এবং খণ্ডগুলিকে (Perek or Pirka) ফেরকা এবং ফরক বলিয়া অভিহিত করিত, ইহা হইতেই এসলাম তাহার ধর্ম্ম গ্রন্থের নাম ফোরকান রাখিয়াছে। (৪) সেল মহোদয়ের এই মত গ্রহণ করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি প্রথমে দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমাদিগকে বাধিত করুন ঃ—

১ম, য়্যাহুদীগণ তওরাতের খণ্ড এবং অধ্যায় গুলিকে ফেরকা অথবা ফের্‌ক বলিয়া থাকে। এই শব্দদ্বয় হইতে গৃহীত হইলে কোরআন মজিদের অধ্যায় এবং খণ্ড গুলিই ফোরকান নামে অভিহিত হইতে পারিত, কিন্তু সেরূপ না হইয়া এসলাম সম্পূর্ণ কোরআন মজিদকে ফোরকান নামে অভিহিত করিল কেন?

২য়, ফের্‌কা এবং ফেরক্ শব্দের প্রকৃত অর্থ—খণ্ড এবং অংশ। এই অর্থে ইহা হিব্রু ভাষায় যেরূপ ব্যবহৃত, সেইরূপ আরব্য ভাষাতেও প্রচলিত। কোরআন মজিদের মধ্যেও এই শব্দদ্বয়ের ব্যবহার হইয়াছে ঃ—

[১] (القران الحكيم) পারা ৩ রূকু ৯।
[২] (القران المجيد) পারা ২ রূকু ৭।

[৩] (القران الكريم) ১৭ পারা ৪ রূকু।
[৪] Al Forkan, from the verb *Furaka*, to devide or distinguish; not, as the Mohamedan doctors say, because those books are devided into

(১) فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين (توبة)

(অতএব ধর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য (সমাজের) প্রত্যেক অংশ হইতে এক সম্প্রদায় (যত্নবান হয় না কেন ?)

ফের্‌কা—অংশ (দল)

فكان كل فرق كالطود العظيم (شعراء) (২)

(প্রত্যেক খণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় (অবিচলিত) রহিল।)

ফের্‌ক্—খণ্ড।

বিখ্যাত অভিধান লেখক এব্‌নে মানজুর লিখিয়াছেন :—

والفرق القسم' والجمع افراق - والفرق والفرقة والفريق الطائفة من الشئ المتفرق (৩)

(ফের্‌কের অর্থ অংশ, আফরাক বহুবচন ; যে ফের্‌ক, ফের্‌কা এবং ফরিক শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন বস্তুর খণ্ড।) এই ফের্‌ক হইতে ফরিক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, ফরিক শব্দের অর্থও অংশ। বিখ্যাত আরব্য কবি জরীর বলিয়াছেন :—

اتجمع قولا' بالعراق فريقة * و منه باطلال الاراك فريق (৪)

ফার্‌ক—অংশ।

এই উক্তিসমূহের দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, আরব্য ভাষায় খণ্ড এবং অংশ অর্থে ফের্‌কা এবং ফের্‌ক শব্দের ব্যবহার আছে। এরূপ অবস্থায় এই ব্যবহৃত এবং প্রচলিত শব্দদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া অব্যবহৃত এবং অপ্রচলিত শব্দ ফোরকানের সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল ? সেল মহোদয় অথবা তাঁহার পক্ষপাতিগণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা বলিয়া দিতে পারেন কি ?

chapters or sections or distinguish between good and evil ; but in the same notion that the Jews use the word *Perek* or Pirka from the same root, to denote a section or portion of scripture. G. Sale ; Pril. disc. III.

ভাবার্থ :—ফোরকাণ শব্দ "ফারাকা" ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ, বিভাগ করা বা আলাহিদা ভাবে পরিচয় করিয়া দেওয়া। মুসলমান পণ্ডিতগণ বলেন, এই পুস্তকগুলি বহু পরিচ্ছেদে বিভক্ত অথবা উত্তম এবং অধমের মধ্যে পার্থক্য সম্পাদন করে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। কিন্তু একথা ঠিক নহে, ইহুদীগণ এই একই উদ্দেশ্যে "পেরেক" বা "পির্‌কা" শব্দ ব্যবহার করেন, ইহাও সেই একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহাদ্বারা তাঁহারা ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিভাগ বা পরিচ্ছেদ বুঝাইতে চেষ্টা করেন।

---

(১) কোরাণ মজিদ, ১১ পারা রুকু ৪।
(২) কোরআণ মজিদ পারা ১১ রুকু ৪।
(৩) (لسان العرب) ১২শ খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।
(৪) ঐ ঐ ঐ

মোসলমান পণ্ডিতদিগের মতে ফোরকান আরব্য ভাষারই শব্দ। পণ্ডিতগণ ইহার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কোরআনই কোরআনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। সুতরাং ফোরকান শব্দের অর্থ কোরআন মজিদের মধ্যেই আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য যে, ফোরকান শব্দ মাস্‌দার বা (Infinitive mood) প্রথমে ইহার বিভিন্ন মাশ্‌তাকের (Derived) প্রয়োগ দেখুন :—

والفارقات فرقا - (مرسلات) (১)

(ন্যায়ান্যায় মীমাংসাকারীদিগের শপথ)

ফারেকাত্ (ফারকা ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ ফারেকাতুন শব্দের বহুবচন, অর্থ) =মীমাংসাকারী অথবা পৃথককারিগণ।

فيها يفرق كل امر حكيم - دخان (২)

উহাতে (উক্ত রজনীতে) বিচক্ষণতার সহিত সমুদয় বিষয়ের চরম মীমাংসা হইয়া থাকে।

য়োফরাকো (ফারাকা ক্রিয়ার বর্ত্তিমান)=মীমাংসা করা হয়। (৩)

فافرق بيننا و بين القوم الفسقين - مايده (৪)

অতএব আমাদের এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগের মধ্যে মীমাংসা কর।

অফরোক (ফারাকার অনুজ্ঞা Imperative-mocd) =মীমাংসা কর।

এইবার ফোরকান শব্দের ব্যবহার দেখুন :—

ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان - (انفال)

যদি তোমরা খোদার প্রতি এবং যাহা আমি মীমাংসার দিবস—উভয় দলের সম্মূখীন হওয়ার দিবস, আমার দাসের উপর অবতীর্ণ করিয়াছি (তাহার প্রতি) বিশ্বাস করিয়া থাক।

এই শ্লোকে যুদ্ধের দিবসকে মীমাংসার দিবস বলা হইয়াছে।

[১] (القران الكريم) ২৯শ পারা।

[২] (القرن الكريم) ২৫শ পারা ১৪ রুকু।

[৩] الامر الحكيم' الحكم المبرم الذى لا يحصل فيه تغير ولا نقض وقيل معنى حكيم

مفعول على ما تقضيه الحكمة وهو من الاسناد المجازى' لان الحكيم صاحب الامر على الحقيقة - (تفسير فتح البيان ৮ম খণ্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা) فالمعنى فيما يفصل كل امر مبرم اوما تقتضيه الحكمة - فما فصل - فهو امر مبرم - ومقتضى الحكمة * وذلك لا يمكن الا ان يكون الفصل مبرما او محكما اقتضاء الحكمة وهو معنى قولنا —: বিচক্ষণতার সহিত চরম মীমাংসা

[৪] ১০ পারা ১ রুকু।

তাহার কারণ এই যে, এই যুদ্ধের দ্বারা সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে, এসলাম এবং ঈশ্বর-দ্রোহিতার মধ্যে, চরম মীমাংসা হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ফোরকান শব্দ মাস্‌দার (Infinitive mood) কিন্তু আরব্য ভাষায় মাস্‌দার অনেক সময় এস্‌মে ফায়েল (Subject) রূপে ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত আয়তে ফোরকান কর্ত্তৃপদরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে :—

(১) يا ايهالذين امنوا ان تتقوالله يجعل لكم فرقانا (انفال)

বিশ্বাসিগণ! যদি তোমাদের খোদা (তায়ালা)র সম্বন্ধে ভয় থাকে (তাহা হইলে) তিনি তোমাদিগকে ফোরকান প্রদান করিবেন।

এই পবিত্র শ্লোকে ফোরকান (ক্রিয়ামাত্র বোধক ধাতুরূপ) ফারেক (কর্ত্তৃপদ) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এখানে ফোরকান শব্দের অর্থ মীমাংসা কারী, অথবা ন্যায়ান্যায় মীমাংসাকারী শক্তি অর্থাৎ বিবেক। এখন দেখুন, আয়েতের অর্থ কত সরল ও সুন্দর হইয়াছে :—

মোসলমানগণ, যদি খোদা করিয়া তোমাদের ভয় থাকে, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে সত্যাসত্য মীমাংসাকারী শক্তি অর্থাৎ বিবেক প্রদান করিবেন।

—এই অর্থে ফোরকান শব্দের প্রয়োগ আরও হইয়াছে। পাঠ করুন :—

و اذ آتينا موسى الكتاب والفرقان (بقره) (২)

(আর যখন আমি মুসাকে গ্রন্থ (তওরাৎ) এবং ফোরকান দিয়াছিলাম) এই আয়েতের মধ্যে ফোরকান শব্দের অর্থ তওরাৎ যে নহে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ কেতাব শব্দ দ্বারা তওরাৎ প্রদানের বিষয় আয়েতের মধ্যে প্রথমই বলা হইয়াছে। সুতরাং এস্থানে ফোরকানের অন্য অর্থ গ্রহণ করা অনিবার্য্য। যেহেতু খোদাতায়ালা বলিতেছেন :—আমি মুসাকে দুইটী বস্তু প্রদান করিয়াছিলাম, একটী তওরাৎ, অপরটী ফোরকান। ফোরকান কি? সেই, যাহাকে আমরা ন্যায়ান্যায় বিবেচনাকারী ক্ষমতা, সত্যাসত্য মীমাংসাকারী শক্তি অথবা বিবেক বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

এখন অভিধানের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন :—বোস্তানী বলিয়াছেন :—

الفرقان - القران - وهو مصدر فى الاصل و كل ما فرق به بين الحق والباطل - والنصر والبرهان والصبح * (৩)

অর্থাৎ কোরআনকে ফোরকান বলা হয়। ইহা প্রকৃত পক্ষে মাসদার (Infinitive mood) যাহাদ্বারা ন্যায়ান্যায়ের মীমাংসা করা হয়, তাহাই ফোরকান। জয়, যুক্তি এবং উষা অর্থেও ফোরকান শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

(১) (القران الكريم) পারা ৯ রুকু ১৮।
(২) (القران الكريم) ২ পারা ৭ রুকু।
(৩) (قطر المحيط) ২য় খণ্ড, ১৫৮৯ পৃষ্ঠা।

কুল্লীয়াৎ নামক অভিধান গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

الفرق قد يكون بين الاجسام' و قد يكون فى المعانى * والفرقان ابلغ منه' لانه يستعمل فى الفرقان بين الحق والباطل (١)

অর্থাৎ ফারক্ পৃথক্ করণ, পদার্থের অথবা ভাবের। কিন্তু ফোরকান কেবল ন্যায়ান্যায়ের পৃথক করণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আল্লামা এব্নে মাঞ্জুর বলিয়াছেন :—

كل ما فرق به بين الحق والباطل فهو فرقان* والفرقان من اسماء القران' اى انه فارق بين الحق والباطل* والفاروق ما فرق بين شيئين * و رجل فاروق' يفرق بين الحق والباطل والفاروق عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لتفريقه بين الحق والباطل (٢)

অর্থাৎ—যাহার দ্বারা সত্যাসত্যের মধ্যে পার্থক্য সাধিত হয়, তাহাই ফোরকান। ফোরকান কোরআনের অন্যতম নাম। কারণ কোরআন ন্যায়ান্যায়ের মীমাংসা কারী। ফারুক—অর্থ পৃথককারী, কোন ব্যক্তিকে ফারুক বলিলে, তাহার অর্থ হইবে—সত্যকে অসত্য হইতে পৃথককারী ব্যক্তি। এই জন্য ন্যায়পরায়ণ হজরাৎ ওমারকে ফারুক বলা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা পাঠক নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, ফোরকান শব্দের অর্থ—সত্যাসত্য মীমাংসাকরা অথবা (কর্তৃপদরূপে ব্যবহৃত হইলে) সত্যাসত্য মীমাংসাকারী। সুতরাং কোন গ্রন্থকে ফোরকান বলিয়া অভিহিত করিলে তাহার অর্থ হইবে যে—**সত্যাসত্য মীমাংসাকারী গ্রন্থ।**

এখন প্রশ্ন এই যে, কোরআন এবং তওরাৎ ব্যতীত অপরাপর প্রেরিত পুরুষদিগের গ্রন্থকে ফোরকান বলা হইল না কেন? প্রকৃত কথা এই যে, কোরআন এবং তওরাৎ ব্যতীত অন্যান্য স্বর্গীয় (آسمانی) পুস্তকের মধ্যে সাধারণতঃ কেবল আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তওরাৎ এবং কোরআনের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা এবং আইনের শিক্ষাও পূর্ণমাত্রায় প্রদত্ত হইয়াছ। ন্যায়ান্যায় মীমাংসা করা আইন এবং ব্যবস্থা শাস্ত্রের কর্তব্য। এইজন্যই যে সকল গ্রন্থে আইন এবং বিধিরও শিক্ষা আছে, খোদাতায়ালা কেবল সেই গুলিকেই ফোরকান বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু কোরআন মজিদের মধ্যে ব্যবস্থা ও আইনের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষাও পূর্ণমাত্রায় প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তওরাতের মধ্যেও কিছু কিছু নৈতিক শিক্ষা আছে,—সেইজন্য খোদাতায়ালা কোরআন মজিদ এবং তওরাৎকে ফোরকানের সঙ্গে সঙ্গে হোদা (শিক্ষা এবং জ্ঞান) এবং জেয়া (জ্যোতি) বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। তওরাৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

---

[২] (فوايد اللغة) ২৫১ পৃষ্ঠা।
[৩] (لسان العرب) ১২শ খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা

و لقد اتينا موسی و هارون الفرقان و ضياء (انبياء) (১)

এবং অবশ্য আমি মুসা ও হারুণকে মীমাংসাকারী এবং জ্যোতি প্রদান করিয়াছিলাম।

মীমাংসাকারীর অর্থ আইন এবং জ্যোতির অর্থ আধ্যাত্মিক শিক্ষা। অর্থাৎ আমি মুসা ও হারুণকে আইন এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাপূর্ণ তওরাৎ দিয়াছিলাম।

কোরআন মজিদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

شهر رمضان الذی انزل فيه القران' هدی للناس و بينٰت من الهدی والفرقان * بقره (১)

(মানবজাতিকে সত্য পথ প্রদর্শন নিমিত্ত আমি রামাজান মাসে কোরাণ অবতীর্ণ করিয়াছি। ইহাতে পূর্ণ শিক্ষা এবং ব্যবস্থা আছে।) বাইয়েনাতেম মেনাল হোদা (পূর্ণ শিক্ষা) অর্থাৎ— আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জ্ঞান। ফোরকান (মীমাংসাকারী) অর্থাৎ আইন।

চিন্তাশীল পাঠক এই আয়াত দুইটীর মধ্যে আরও একটী সূক্ষ্ম বিষয় দেখিতে পাইবেন। তওরাৎ সম্বন্ধে প্রথমে ফোরকান এবং পরে জেয়া শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তওরাতের প্রথম এবং মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যবস্থা (Law) আর দ্বিতীয় এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য নৈতিক শিক্ষা। কিন্তু কোরআন মজিদ সম্বন্ধে প্রথমে দুইবার হোদা শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পর ফোরকান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং নৈতিক উন্নতিই কোরআনের মুখ্য এবং প্রথম লক্ষ্য, আর ব্যবস্থা এবং আইন তাহার পরোক্ষ এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

ذلک ربنا الحکيم العليم *

صورت گر و نقاش چين' رو صورت يارم به بين
يا صورتے کش اينچنين' يا ترک کن صورت گری

ক্রমশঃ

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল্ বাকী।

---

[১] (القران الحکيم) পারা ১৭, রুকু ৪।

[১] (القران الکريم) পারা ২ রুকু ৭।

আল-এসলাম

তাজমহাল মাসজেদ।

M. P. Works, 34, Mechuabazar Street
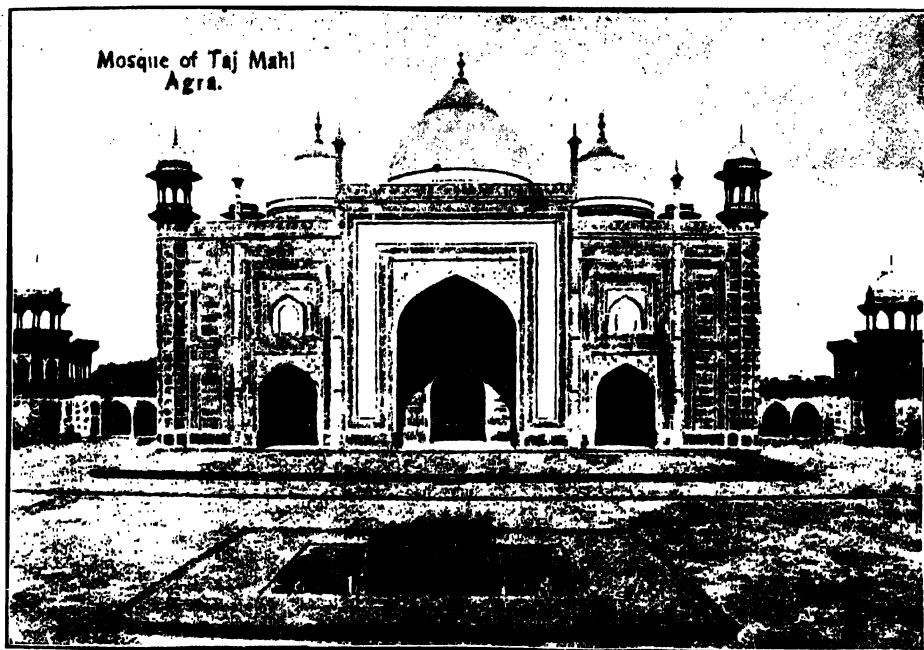
কোরআনের দুইটী আদর্শ

কোর-আন শরীফে, অনেক নবী রসুল ও সংস্কারক মহাপুরুষগণের নাম ও জীবন-কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কোর-আন ইতিহাস উপাখ্যান বা চরিত-পুস্তক নহে, ইহাতে বাই-বেলাদি নৈসর্গিক পুরাণ পুস্তক সমূহের ন্যায় কোন গল্প, কিম্বদন্তি বা উপকথার ধারাবাহিক বর্ণনা নাই। তবে মানবজাতির কল্যাণ সাধন এবং ধর্ম্মের গ্লানি মোচনের নিমিত্ত, যুগে যুগে যে সকল সংস্কারক, অর্থাৎ নবী বা রসুল, এই মরজগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধির নির্য্যাস মাত্র গল্পচ্ছলে কোরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। আবার শৃঙ্খলা ও পরম্পরার বাধ্যবাধকতার মধ্যেও তাহা সীমাবদ্ধ নহে। যেখানে যেরূপ আদেশ, যেখানে যেরূপ কর্ম্মের সাড়া, অর্থাৎ যেখানে যেরূপ ও যতটুকু আবশ্যক, সেইরূপ ও ততটুকু উপাখ্যান সেখানে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে অধিক আলোচনা করা সম্ভবপর হইবে না।

কোর-আনশরীফে সদাসৎ উভয় প্রকার উদাহরণ ও আদর্শেরই উল্লেখ আছে। কোর-আন অনর্থক ও তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার ভাবপ্রবণতার মধ্যে ফেলিয়া, মানবজাতিকে কর্ম্মবিমুখ করিতে চাহে না। কোরআন কর্ম্মের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের চরিতার্থতা আনিয়া দেয়, প্রাকৃ-তিক বিধানের বিপরীত, সন্ন্যাসের আবিলতার মধ্যে জড়াইয়া কোরআন মানবজাতিকে অনর্থক কর্ম্মবিমুখ করিবার বা সংসার হইতে প্রকৃতির বিধান—যাহা প্রকৃতপক্ষে আল্লার বিধান—উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করে না। বরং মানবের কল্যাণের জন্য আজীবন পরিশ্রম, যাবতীয় পাপ ও কুসংস্কারের অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া, জ্ঞান ও সত্যের শান্তমধুর হেমকিরণচ্ছটায় মানবের চিত্তকে উদ্ভাষিত করিবার জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন, অর্থাৎ স্বজাতীয় মানবের কল্যাণের নিমিত্ত বেষ্টির ব্যক্তিত্বকে সমষ্টির চরণতলে "কোরবান" করাই কোরআনে শ্রেষ্ঠতম সাধনা ও প্রধানতম এবাদাৎ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার পূর্ণতার নামই নবুয়ৎ বা রেসালাৎ। কোর-আন শরীফে এই প্রকার নবী ও রসুলগণের, তাঁহাদের সহায় ও সহচরগণের, অথবা তাঁহাদের সাধনমার্গের বৈরীদিগের যে সকল সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয়, আজকাল আমরা তাহার মূল ইঙ্গিত ও যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করি না, অথচ মধ্যে মধ্যে বলিয়া বসি যে, এই উপাখ্যানগুলি উন্নত যুগের মানবমণ্ডলীর জন্য কিছুমাত্রও ফলদায়ক নহে। কিন্তু, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে যতটুকু বুঝিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, আমরা বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে বলিতে পারি যে, আল্লাহতাআলার অভিপ্রেত কল্যাণ ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন করা, যদি কোন সাধকের উদ্দেশ্য হয়;—তাহা হইলে এই উপাখ্যানগুলিই তাহার প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। সাধা-রণতঃ উপদেশ ও আদর্শের মধ্যে যে পার্থক্য, কোরআন শরীফের সাধারণ আদেশ ও এই সকল

উপাখ্যানের মধ্যেও সেই পার্থক্য। আল্লাহ যদি সুযোগ দেন, এবং "আল্‌-এস্‌লাম" যদি তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভে দীর্ঘজীবী হইতে পারে, তাহা হইলে ধীরে ধীরে এই সকল ভাবের অভিব্যক্তি করার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোরআন শরীফে অনেক সাধুসজ্জন ও নবী রসুলের সাধন সংবাদ বিবৃত হইয়াছে। যখন আমরা কোরআনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ণিত, চরিত সন্দর্ভগুলিকে একসঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করার চেষ্টা করি, তখন সেই তালিকার শীর্ষস্থানে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত দুইটী নাম সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নয়ন যুগলকে স্নিগ্ধ করিয়া থকে, সে দুইটী নাম—মোহাম্মাদ ও এবরাহীম (তাঁহাদের প্রতি শান্তি ও আল্লার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক!)। চরিত্র, শিক্ষা, সাধনা এবং আত্ম বলিদান ও সিদ্ধির বিভিন্নদিক দিয়া সমালোচনা করিলে, কোরআনের বর্ণিত—বরং জগতের সম্মুখস্থ সমস্ত—তালিকার মধ্যে, এই আদর্শ যুগলই সর্ব্বপ্রথমে অনুসন্ধিৎসু সমালোচকের নয়ন মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। সেই সকল বিভিন্নদিকের ও বিভিন্ন রূপের বিশেষত্ব বর্ণনা করা বর্ত্তমান সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নহে। বর্ণিত সাধু সজ্জনগণের মধ্যে কোরআন শরীফ মাত্র এই দুইজনকে اسوة حسنة বা "মহান আদর্শ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এই বিশেষত্ব ও তাহার কারণ সম্বন্ধে আজ আমরা পরোক্ষভাবে দুই একটী কথার আলোচনা করিব।

* * * * * *

ইতিহাসের হিসাবে হজরৎ এবরাহীমই প্রথম, সুতরাং আসুন পাঠক, আমরাও প্রথমে তাঁহার সম্বন্ধেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

মানবের মস্তিষ্কের উপর স্থায়ী অধিকার স্থাপনের জন্য শয়তানের হস্তে যত প্রকার অস্ত্র শস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে কুসংস্কার ও জন্মগত অন্ধবিশ্বাসই সর্ব্বপ্রধান। মানব যে দেশে, যে যুগে ও যে সমাজে জন্মগ্রহণ করে,—সেই দেশ, সেই যুগ ও সেই সমাজের সমস্ত সংস্কার ও যাবতীয় বিশ্বাস বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বদ্ধমূল হইতে থাকে। জনসাধারণ বা অজ্ঞ সমাজের পক্ষে এই সংস্কার ও বিশ্বাসের বিপরীত কোন কথা বলা বা কার্য্যে লিপ্ত হওয়া'ত দূরে থাকুক, তাহার চিন্তা করিবার শক্তিও তাহাদের নাই। পক্ষান্তরে শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকদিগের পক্ষেও, এই সকল জন্মগত কুসংস্কারও পারিপার্শ্বিক অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করা দুঃসাধ্য। সত্যের সমর্থনের জন্য সহস্র প্রকার যুক্তি তর্ক প্রদর্শিত হউক, তথাপি মানব-হৃদয় প্রথমাবস্থায় কখনই সেই প্রত্যক্ষ সত্যের মঙ্গলাচরণ করিতে পারে না,—কোন দেশে ও কোন যুগে পারে নাই—বরং আপনার সমস্ত শক্তি লইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, এবং সত্যের জ্যোতি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য অনর্থক চেষ্টা পাইয়াছে।

এবরাহীম (আঃ) যে যুগে, যে সমাজে ও যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নানা প্রকার কুসংস্কার, নানাপ্রকার অন্ধবিশ্বাস ও অনাচারে পরিপূর্ণ ছিল। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক

শৌচসাধনের কোন চিন্তাই তাহাদের ছিল না। তাহারা সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল; এবং স্বহস্ত নির্ম্মিত পুতুল ও প্রতিমা সমূহে "ওলুহিয়তের" আরোপ করিয়া সেইগুলিকেই আপনাদের সমস্ত ইষ্টানিষ্টের বিধাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই সময় আজর * নামক ঘোর পৌত্তলিকের বংশে হজরৎ এবরাহীমের জন্ম হয়। এবরাহীমের হৃদয় কৈশোর হইতেই অনুশীলন ও স্বাধীন চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে জগতের সম্মুখে তিনি যে প্রথম আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, কোরআন শরীফে তাহার সংক্ষিপ্তসার বর্ণিত হইয়াছে।

জমাটবাঁধা বোৎপরস্তি বা পৌত্তলিকতার মধ্যেই এবরাহীম ভূমিষ্ঠ ও লালিত পালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতে তিনি আপনার আত্মীয়স্বজনগণের এই সকল আচরণে মনে একটা তীব্র ক্ষোভ অনুভব করিতে লাগিলেন। মানুষ স্বহস্তে পাথর কাটিয়া বা মাটি ছানিয়া, ঘাস খড় জড়াইয়া কতকগুলি পুতুল ও প্রতিমা গঠন করিতেছে, তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নানাপ্রকার রঙ্গ মাখাইতেছে, বস্ত্র ও অলঙ্কার পরাইয়া সেগুলিকে সুদর্শন করিয়া তুলিতেছে, সেই মানুষই আবার সেগুলির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছে, সর্ব্বশক্তিমান ও অনন্ত আল্লার আসনে বসাইয়া এই জড়পিণ্ডগুলির নিকট বরপ্রার্থনা করিতেছে, পৃথিবীর দুঃখ যাতনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আকুলপ্রাণে তাহাদের চরণতলে মাথা কুটিতেছে —এ বিসমদৃশ্য বাল্যকাল হইতেই এবরাহীমের মনে একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, রাজা প্রজা সকলেই ঘোর পৌত্তলিক, তাহাদের সেই ভক্তি গদগদ কণ্ঠের আবিলতাপূর্ণ আরতি-গীতি, তাহাদের শঙ্খ ঘণ্টার সেই গগন-স্পর্শী আরাব, তাহাদের যজ্ঞবেদীর সেই চন্দন-চর্চ্চিত মনোহর দৃশ্য, একসঙ্গে মিলিয়া তাঁহার জন্মগত অন্ধবিশ্বাসকে পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সামাজিক শাসন ও রাজকীয় ভীষণ দণ্ডের লোমহর্ষণ চিত্র, তাঁহার নয়ন প্রান্তে উদ্ভাষিত হইয়া, সর্ব্বদাই তাঁহার মনে এক বিষম বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছিল; এবং এইভাবে শয়তানের কঠোর হস্ত তাঁহার চিত্তের স্বাধীনতা ও শক্তি হরণ করিয়া, পারিপার্শ্বিক অন্ধবিশ্বাসের স্রোতে তাঁহার মানবীয় বিশেষত্বটুকুকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সেই সময় যুগপৎ ভাবে, এই আঘাতের প্রতিঘাতও তীব্রতর রূপে জাগিয়া উঠিতেছিল। এবরাহীম অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন—পিতামাতাই হউন, আর সমস্ত পৃথিবীর লোক একযোগ হইয়া বলুক, আমি কিন্তু এই অক্ষম, নির্জীব ও নগণ্য পাথরের পুতুলগুলিকে কখনই "আল্লাহ" বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিব না। শয়তানের প্রধান অস্ত্রের মারাত্মক আঘাত এইখানে সর্ব্বপ্রথমে বিফল হইয়া গেল। যাহা হউক, দেশসুদ্ধ লোক এইগুলিকে খোদা বলিতেছে, আমি ইহাদিগকে'ত পরিত্যাগ করিলাম, এখন আমি যেরূপ খোদা চাই, তাহার সন্ধান কোথায় পাইব। কেহ গুরু নাই, মুর্শিদ নাই, আলোচনার জন্য ধর্ম্মতত্ত্বের পুস্তকস্তূপ তাঁহার নিকটে সংগৃহীত ছিল না, এ অবস্থায় যে নবীন যুবক আপনার স্বজাতি ও

---

* হজরৎ এবরাহীমের পিতা বা পিতৃব্য। লেখক।

স্বদেশের পূজিত ঈশ্বরগুলির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে, তাহার আশ্রয় কি? আশ্রয়—অনুশীলন, স্বাধীন চিন্তা ও মানবজাতির সর্ব্বপ্রধান বরং একমাত্র শ্লাঘনীয় সম্বল—বিবেক। এবরাহীম বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এবং ملكوت السموت والارض বা স্বর্গ ও মর্ত্তের সমস্ত সাম্রাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া সেই মহিমান্বিত সম্রাটের সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রেমের প্রথম উন্মেষ, সুতরাং পিপাসার যন্ত্রণা অসহ্য। ভাবমগ্ন এবরাহীম একদা কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর গোধূলি লগ্নে তন্ময় তদ্গতভাবে আপনার অভিপ্সিত সেই শক্তিমান, প্রেমময় প্রেমাষ্পদের ধ্যানে তন্ময় তদ্গত। এমন সময় নীল গগনের প্রান্তদেশে একটা সোনার ফুল ফুটিয়া উঠিল, আহা, তারাটী কেমন সুন্দর, কেমন জ্যোতির্ম্ময়! এবরাহীম তখন বলিলেন, এই আমার রাব্ (প্রতিপালক পরমেশ্বর), ইহাই বুঝি আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের সেই ধ্রুব তারা। দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রটী গগন প্রান্তে অস্তমিত হইয়া গেল। তখন এবরাহীম বলিয়া উঠিলেন, আমি অস্তগামী পদার্থকে কখনই প্রেম করিব না। অল্পক্ষণ পরে, প্রতীচ্যের শুভ্র ভালে সোনার সিন্দুর মাখাইয়া, বিশ্বচরাচরকে শান্ত শীতল কিরণ মালা-বিচ্ছুরিত করিয়া, চন্দ্রের উদয় হইল। এবরাহীম তখন বলিলেন, এইবার, এই রূপময় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থই আমার পূজ্য, ইনিই আমার খোদা। এবরাহীম সান্তের মধ্যে অনন্তের অনুসন্ধান করিতেছেন, এবং অনিত্যের মধ্যে সেই নিত্য সত্য সদাপ্রভুকে অন্বেষণ করিতেছেন,—দেখিতে দেখিতে সেই নীল গগনের সোনার তরীখানিও হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে কোথায় উধাও হইয়া গেল, অধীর ব্যাকুল এবরাহীম, তখন আকুল প্রাণে বলিয়া উঠিলেন, "আমার প্রকৃত মালেক যে, সে যদি পথ দেখাইয়া আমাকে আপনার দিকে টানিয়া না লয়, তাহা হইলেই আমি ভ্রষ্ট সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।" এইভাবে রজনীর অবসান হইল, দশদিক মহা-তেজপুঞ্জে উদ্ভাষিত করিয়া, বিশ্বব্যাপী জাগরণ ও চৈতন্য সহকারে সূর্য্যের আবির্ভাব হইল। কি তেজ, কি জ্যোতি! আর যায় কোথায়? এবরাহীম বলিয়া উঠিলেন— هذا ربي هذا! اكبر এই আমার প্রভু—ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু এবরাহীমের এই "সূর্য্যদেবও" কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অস্তমিত হইয়া গেলেন। হঠাৎ এবরাহীমের হৃদয় হইতে অন্ধকারের যবনিকা উঠিয়া গেল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, وسع كرسيه السموت والارض সেই অভিপ্সিতের মহা-সিংহাসন স্বর্গ মর্ত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে। নবজীবনের সেই শুভ-উন্মেষ-মুহূর্ত্তে, এবরাহীম আপনার স্বজাতীয়দিগকে আহ্বান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন :—

يا قوم انى برى مما تشركون * انى وجهت وجهى للذى فطرالسموات والارض
حنيفا و ما انا من المشركين - الايه -

হে আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ! আমি তোমাদের পূজ্য যাবতীয় ঠাকুর দেবতার সহিত সম্বন্ধ-চ্ছেদন করিতেছি,—আমি একজনেরই হইয়াছি, অন্য হইতে নির্লিপ্ত হইয়া সেই একজনের দিকেই মুখ করিয়াছি (তাহার দিকেই আপনাকে পরিচালিত করিয়াছি)—যে স্বর্গ মর্ত্ত সকলেরই সৃষ্টি করিয়াছে; আমি মোশরেক দিগের দলভুক্ত নহি

(সুরা আনআম ৮ম রূকু)।

সাধারণতঃ দুইটী কারণে মানুষ মিথ্যার উপাসনা করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সে মনে করিয়া থাকে যে, যে দেশে ও যে সমাজে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দেশের প্রচলিত সমস্ত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এবং সেই সমাজের অনুষ্ঠিত সমস্ত পাপাচরণের অনুসরণ করিতে সে সর্ব্বতোভাবে বাধ্য, এবং সেই পাপ ও অসত্যের উপাসনা করাই তাহার পক্ষে ধর্ম্ম। সে যাহা করিতেছে—জ্ঞান বিবেক ও যুক্তির হিসাবেও তাহা ঠিক কিনা, তাহা সে চিন্তাও করিতে পারে না। পক্ষান্তরে খোদা তাআলার প্রদত্ত জ্ঞান বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি দ্বারা বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সে সদাই কুণ্ঠিত। পিতা-পিতৃমহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণের সময় হইতে যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, যে সকল অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে, সত্য হউক মিথ্যা হউক, আমাকেও সেই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিতে হইবে। সত্যের জন্য যে অনুসন্ধিৎসা বা تحقيق, তাহাদের ভাষায় তাহা পাপ, সমাজদ্রোহিতা এবং কালে ধর্ম্ম দ্রোহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এইজন্য আমরা ইতস্ততঃ সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, জ্ঞান শিক্ষা ও সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াও লোকে পুতুল ও প্রতিমার সম্মুখে মাথা কুটিতেছে, নানাপ্রকার বর ও অভয় প্রার্থনা করিতেছে। উৎকল দেশীয় ভিক্ষুকের ক্ষুদ্র পেটিকাস্থ "৺শীতলা দেবীর" উৎকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তাহার ক্রোধের ভয়ে কোটি কোটি নরনারী অস্থির হইয়া পড়িতেছে; রক্ষা পাইবার জন্য তাহার পূজা অর্চ্চনা করিতেছে। এই গড্ডলিকা প্রবাহে পড়িয়াই মানুষ—অবলা কুলবালাদিগকে জীবন্তাবস্থায় অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে এবং "দেবতার প্রসন্নতা" লাভের জন্য জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী জননীও আপনার ননীর পুতুলসম শিশু সন্তানটিকে প্রচণ্ড-তরঙ্গমালা-বিক্ষুব্ধ হাঙ্গরকুম্ভীরাদি-পরিপূর্ণ গঙ্গাসাগরে ফেলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না, বরং ইহাকে পরম ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই গড্ডলিকা প্রবাহের কল্যাণেই আজ জগতে ত্রিত্ববাদের নামে "কোফরের" [ঈশ্বরদ্রোহীতার] অকল্যাণকর বাণ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা বিনাতারে টেলিগ্রাফী আবিষ্কার করিতেছে, তাহাদের মধ্যে আজও অনেকে পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্রাত্মা ঈশ্বর' তিন স্বতন্ত্র ও পূর্ণ ঈশ্বর; অথচ তিনে মিলিয়া এক ঈশ্বর—এই অনর্থক ও অকল্যাণকর হিয়াঁলির মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ফলতঃ মানব-সমাজে ধর্ম্মের দিক দিয়া বলুন, আর পার্থিব হিসাবে বলুন, যত প্রকার কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, শেরেক কোফর ও বেদাতের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, ইহাই তাহার একমাত্র প্রস্রবণ। হজরৎ এবরাহীমের স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার ক্রমবিকাশ—তাহার পূর্ণপরিণতি, সত্যের অনুসন্ধানে তাঁহার আকুল-আকাঙ্ক্ষা, সত্যকে নির্ব্বাচন গ্রহণ ও প্রচার করিবার সৎসাহস—বস্তুতঃ তাঁহাকে মানব জাতির আদর্শ ও চির-বরণ্য সংস্কারকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এইখানে এবরাহীমের অসাধারণত্ব এবং ইহাই তাঁহার প্রদর্শিত প্রথম আদর্শ। কোরআন বলিতেছে :—

و لكم أسوة حسنة في ابراهيم ....

অর্থাৎ এবরাহীমের জীবন তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর আদর্শ। দুঃখের বিষয় আজি কালিকার মুসলমান সমাজও এই পবিত্র ও মহান্‌ আদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। আল্লাহ তাআলা মুসলমান সমাজকে এবরাহীমের [আঃ] আদর্শ ও সোন্নতের অনুকরণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন; যতদিন এই আদেশ প্রতিপালিত না হইবে, ততদিন এ জাতির কোন প্রকার স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

আমরা মনে করি—ক্ষৌরকর্ম্ম, স্নান, খৎনা ও এইরূপ কার্য্যসমূহে এবরাহীমের সোন্নতের পর্য্যাবসান। কিন্তু কোরআন শরীফ এবরাহীম-জীবনের যে সকল পরীক্ষা ও নিস্পেষণের সংবাদ দিতেছে, সেদিকে আমরা অল্পই লক্ষ্য করিয়া থাকি। পরীক্ষার ভীষণ নিস্পেষণে পড়িয়া অদম্য উৎসাহ ও কৃতকার্য্যতার সহিত তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া, এবরাহীম-জীবনের আর একটী বিশেষত্ব।

হজরৎ এবরাহীম বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিলেন—"স্বর্গ মর্ত্ত ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাতে আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি, তোমাদের এই ঠাকুর দেবতাগুলির সহিত আমার কোনও সম্বন্ধই নাই"। আর যায় কোথা, সমস্ত দেশবাসী তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল; ভিখারীর পর্ণকুটীর হইতে সম্রাটের প্রাসাদ পর্য্যন্ত এই ঘোষণায় কাঁপিয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজনের তিরস্কারে ও আচার্য্যদিগের "উপদেশে" বিব্রত হইয়া এবরাহীম বলিলেন,—আচ্ছা, এই মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্ম্মিত "ঈশ্বর" গুলির ক্ষমতা সম্বন্ধে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এবরাহীম তাঁহার পিতা ও স্বজাতীয়দিগকে বলিলেন, তোমরা এই যে মূর্ত্তি গুলির অর্চ্চনা করিতেছ, এগুলি কি? [ইহাদের ক্ষমতা ও মূল্য কি?] তাহারা বলিল, আমাদের পিতৃপুরুষগণ এই সকল ঠাকুর দেবতার পূজা করিতেন [অতএব আমরাও করিতেছি] এবরাহীম বলিলেন, তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সকলেই স্পষ্ট ভ্রমে পতিত হইয়াছ। তাহারা বলিল,—এবরাহীম, তুমি কি কোন নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছ, না তুমি আমাদিগের সহিত কৌতুক করিতেছ? এবরাহীম বলিলেন, [কৌতুক বা ঠাট্টা তামাসা নহে] স্বর্গ মর্ত্তের যে অধীশ্বর সেগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক ও প্রভু, আমিও এই মতাবলম্বী। আল্লার দিব্য, তোমরা চলিয়া যাওয়ার পর আমি তোমাদের এই ঠাকুর গুলি সম্বন্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিব। অতঃপর সমস্ত লোক চলিয়া গেলে, এবরাহীম ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া একে একে সবগুলিকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু বড় ঠাকুরটীকে রাখিয়া দিলেন। এবরাহীমের আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতীয়েরা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের পূজনীয় দেবদেবীদিগের এই দুরবস্থা দর্শনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "যে নরাধম আমাদের ঠাকুর দেবতার এমন দুর্গতি করিয়াছে, সে বড়ই অত্যাচারী" [অর্থাৎ তাহার সমুচিত দণ্ড হওয়া চাই।] যাহারা এবরাহীমের পূর্ব্বাবস্থা অবগত ছিল, তাহারা বলিল, এবরাহীম নামক একটী যুবক তাঁহাদের [ঠাকুর দেবতাদের] কথা আলোচনা করিত।

তখন সকলে যুক্তি করিয়া এবরাহীমকে ধরিয়া আনিল এবং বলিল, এবরাহীম! তুই কি আমাদের ঠাকুর দেবতাগুলির এইরূপ দুর্গতি করিয়াছিস ? এবরাহীম উত্তর করিলেন, হয়ত এই বড়ঠাকুরই এইরূপ করিয়া থাকিবেন। আচ্ছা, আপনারা ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন না, দেখুন তাঁহারা কি বলেন! তখন সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবরাহীম হাতে কলমে তাহাদের উপাস্য জড়পিণ্ডগুলির অক্ষমতা প্রতিপন্ন করিতেছেন। তাহারা দারুণ সংশয়ের মধ্যে উপস্থিত হইল,—পরাজিত হইল, এবং স্বাভাবিকরূপে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,— "তুই কি জানিস না যে ইহারা কথা বলিতে পারে না ?" তখন এবরাহীম সকলকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোমরা তাহা হইলে আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন সকল জড়পিণ্ডের পূজা করিতেছ, যাহারা তোমাদিগকে সামান্য পরিমাণেও উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে না, ধিক্ তোমাদিগকে আর ধিক্ তোমাদের উপাস্য ঠাকুর দেবতাদিগকে—যাহারা অত্যাচারীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে বা তাহার সন্ধান দিতেও পারে না! তোমাদের কি একটুও জ্ঞান নাই" ? প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকট পরাজিত জনসাধারণ তখন ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, ইহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া আপনাদের ঠাকুর দেবতার সাহায্য করিতে হইবে। [সুরা আম্বিয়া]

জীবন্তদগ্ধ করা ব্যতীত এমন "নরাধমের" শাস্তি আর কি হইতে পারে ? দেশসুদ্ধ লোক ক্ষেপিয়া উঠিল, ভীষণ অনলকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল, অগ্নির তেজে নিকটে যাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। আর বিলম্ব নাই, হস্তপদ-শৃঙ্খলিত এবরাহীম, অদূরে দণ্ডায়মান; সত্যের তেজও স্বর্গের প্রেরণায় দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় দূরে দণ্ডায়মান। সে মুখে ভীতির কোন লক্ষণ নাই, চাঞ্চল্যের কোন চিহ্ন নাই, "এলী এলী লামা সাবাকতানী" বলিয়া হা-হুতোহস্মি নাই। স্বর্গের দূতরূপী এক শক্তিশালী পুরুষ আসিয়া সেই আসন্নকালে তাঁহাকে বলিলেন, এবরাহীম! সময় নাই, শীঘ্র বল, এ সময় আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি কি না ? হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল এবরাহীম, অচঞ্চলচিত্তে ভক্তিগদগদকণ্ঠে উত্তর করিলেন :—

حسبی الله نعم الوکیل

আমার পক্ষে আমার আল্লাই যথেষ্ট, সে-ই আমার সর্ব্বোত্তম বন্ধু। তখন তিনি পুনরায় বলিলেন :—এবরাহীম! যদি তোমার আল্লার প্রতি তোমার এতটা বিশ্বাস বা নির্ভর থাকে, তবে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য তাঁহারই নিকট প্রার্থনা কর। আদর্শ সংস্কারক, আদর্শ ভক্ত ও আদর্শ নবী হজরৎ এবরাহীম তখন অকম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন :—প্রার্থনা করিতে যাইব কেন ? যাহার কাছে প্রার্থনা করিব, সে কি আমার অবস্থা দেখিতেছে না ? —তবে আবার প্রার্থনা করিতে যাইব কেন ? তাহার সন্তোষে আমার সন্তোষ, সেই মঙ্গলময়েরই মঙ্গল ইচ্ছার জয়জয় কার করিয়া আমি তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি। এই ভক্তির উৎসে বিশ্বচরাচর প্লাবিত হইয়া গেল, শয়তানের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল, এবং সেই মহাপ্লাবনের এক গণ্ডুষে নমরূদের ভীষণ অনলকুণ্ড নিবিয়া গেল।

কোরআন বলিতেছে, এবরাহীম তোমাদের পক্ষে এক অনুকরণীয় কল্যাণ-আদর্শ। সমাজ! তোমার মধ্যে এই আদর্শের অনুকরণ করিবার কি কেহ আছে?

কোন অনুর্ব্বর ও বন্ধুর দেশে সত্যের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতে হইলে, সেই দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য সর্ব্বপ্রথমে আত্মবলি দিতে হয়। ফারানের পর্ব্বতশৃঙ্গ, সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাষিত হইয়া উঠিবে, এবং জগতের কল্যাণের জন্য হেজাজের মরুভূমি হইতে চিরস্থায়ী পুণ্যপ্রস্রবণ প্রবাহিত হইবে,—বহুদিনের এই প্রতিশ্রুতি পালনের সূত্রপাৎ করা হইল—এবরাহীমের দ্বারা। তাইত পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনী হাজেরা ও বার্দ্ধক্যের বড় সাধের সন্তান এসমাইলকে বিসর্জ্জন দিতে হইল। একটি প্রাণের আত্ম-বিসর্জ্জনে একটি জাতির সৃষ্টি হইল। পূরাকালের মুসলমানেরা এই আদর্শের অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, মান সম্ভ্রম, স্বদেশ ও স্বজনের মায়া কাটাইয়া "প্রচারে" বাহির হইতেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় ফিঃ লইয়া ওয়াজ ও বক্তৃতা করিতেন না; বা একটা সভায় মহা আড়ম্বরে বক্তৃতা করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতেন না। তাঁহারা এক একটা কোফরস্থানের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইয়া, চিরজীবনের জন্য তথায় বসতি স্থাপন করিতেন। লোকের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের হাবভাব ও রুচি অবগত হইতেন, এবং ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিতেন। তাঁহাদের সমস্ত জীবনই এই সাধনায় অতিবাহিত হইয়া যাইত; এবং পরিণামে এক একটা দেশ এসলামের শান্তশীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইত। আজ আমাদের সম্মুখে, এই বঙ্গদেশের প্রত্যেক প্রান্তে এসলাম প্রচারের এমন সকল প্রশস্ত ক্ষেত্র বিরাজমান রহিয়াছে যে, তিন কোটি বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে যদি তিনজন লোকও এইরূপ —আত্মবিসর্জ্জন নহে—শুধু দেশত্যাগী হইতে প্রস্তুত হন; তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাই সহস্র সহস্র ভ্রান্ত-মানব মুক্তির পথ দেখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু হায়! এবরাহীমের আদর্শের অনুকরণ করিবার মত একটী প্রাণীও বুঝি আমাদের মধ্যে নাই!!

হজরৎ এবরাহীম [আঃ] মের জীবনের এইরূপ বহু ঘটনাই আমাদের অনুকরণীয়। প্রকৃত মুসলমান হইতে হইলে আমাদিগকে প্রকৃত মানুষ হইতে হইবে, এবং প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে ঐ সকল আদর্শের অনুকরণ করিতে হইবে।

হজরৎ এবরাহীমের এই আদর্শপূর্ণ পরিণত হইয়া, স্বর্গের আশীর্ব্বাদ বা রাহমাতুল-লেল্-আলামীন রূপে কি ভাবে জগতের সম্মুখে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল, এবং কোন গুণে তিনি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া কোরআনে কথিত হইয়াছেন, আগামীতে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মোহাম্মাদ আকরম খাঁ।

পুণ্য-কথা।

(হজরত মহম্মদের জীবনের ঘটনাবলী।)

১। মহাত্মা উস্‌মান বিন মত্‌উন হজরতের নিকট আসিয়া বলিলেন, "হে রসুলাল্লাহ, আমাকে মুষ্কচ্ছেদন করিবার (খাসী হইবার) অনুমতি দিন।" হজরত বলিলেন, "যে ব্যক্তি খাসী হয় কিংবা অন্যকে খাসী করে, সে আমাদের ধর্ম্মের নহে। রোজা রাখাই আমার অনুবর্ত্তীগণের খাসী হওয়া।" উস্‌মান বলিলেন, "তবে আমাকে পরিব্রাজক হইবার অনুমতি দিন।". হজরত বলিলেন, "ধর্ম্মযুদ্ধ করাই আমার অনুবর্ত্তীগণের পরিব্রাজক হওয়া।" উস্‌মান পুনরায় বলিলেন, "তবে আমাকে সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি দিন।" হজরত আজ্ঞা করিলেন, সমাজের প্রতীক্ষায় মসজিদে বসিয়া থাকাই আমার অনুবর্ত্তীগণের সন্ন্যাসী হওয়া।" (সরেহ সুন্নত)

২। একব্যক্তি হজরতের নিকট একটী রেশমী কাবা (দীর্ঘ জামা বিশেষ) উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিল। তিনি তাহা পরিধান করিয়া নামাজ পড়িলেন। নামাজ সমাপ্ত করিয়া যেমন কেহ কোন খারাপ জিনিষকে ফেলিয়া দেয়, এইরূপে (তিনি তাহা খুলিয়া ফেলিয়া) দিলেন; পরে বলিলেন, "ইহা ধার্ম্মিকের উপযুক্ত নহে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩। একদিন হজতর শিষ্যবৃন্দসহ নামাজ পড়িতেছিলেন। পশ্চাতের শ্রেণীতে একব্যক্তি উত্তমরূপে নামাজ পড়ে নাই। হজরত নমাজ সমাপ্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হে অমুক, তুমি কি মহান্ আল্লাকে ভয় কর না? তুমি কি জান না—তুমি কি প্রকারে নামাজ পড়িলে? তুমি বোধ হয় মনে করিয়াছ, তুমি যাহা কর আমি তাহা জানিতে পারি না। আল্লার শপথ, যেমন আমি সম্মুখের জিনিষ দেখি, তেমনি পশ্চাতের জিনিসও দেখি। (আহমদ)

৪। এক সময় হজরত নামাজান্তে প্রার্থনায় বলিতেছিলেন, "আল্লাহুম্মা আউজুবিকা

اللهم اعوذبك من المأثم ومن المغرم

মিনাল মা-ছিমি ও মিনাল্ মগরিমি। "হে আল্লাহ, পাপ হইতে এবং ঋণ হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি।" একব্যক্তি নিবেদন করিল, "একি আপনি যে ঋণ হইতে আশ্রয় গ্রহণ করেন"। হজরত বলিলেন,—লোকে যখন কর্জ্জ লয়, মিথ্যা বলে এবং যাহা অঙ্গীকার করে, পূর্ণ করে না। (উভয়) মুসলমানগণ কবে তাহাদের ধর্ম্মগুরুর এই অমূল্য উপদেশ মত চলিবে?

৫। একদিন হজরত রাত্রের নামাজে কোরআনের এই আয়েত পড়িতেছিলেন।

ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم

"যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দান কর, তবে তাহারা ত তোমারি দাস। আর যদি তাহাদিগকে মাফ কর, তবে নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞ।" শেষ বিচার দিন, বিচারপতি স্বয়ং প্রভু আল্লাহ তালা, তাঁহার সম্মুখে নিজ শিষ্যগণের জন্য হজরত ঈসার এই কাতর প্রার্থনা

হজরত সেই কঠিন দিনে নিজ শিষ্যগণের ভাবী অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া এতদূর বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, প্রভাত পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায় বারবার তাহাই পড়িতে লাগিলেন।

(নাসায়ী এবং এব্‌নে মাজা)

৬। হজরত কখন কখন রাত্রিতে এত দীর্ঘ সময় নমাজে দণ্ডায়মান থাকিতেন যে, তাঁহার চরণযুগল ফুলিয়া যাইত। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কেন এইপ্রকার সাধনা করেন? আল্লাহতালা আপনার ত আগের ও পিছন পাপ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন?" হজরত উত্তর করিলেন, "আমি কি আল্লার কৃতজ্ঞ দাস হইব না?" (উভয়)

৭। হজরত বলিলেন "নমাজ আমার চক্ষের পুতলি।" তাই যখন তাঁহার উপর দুঃখ বিপদ আসিয়া পড়িত, তিনি নমাজে মগ্ন হইতেন—আর জগতের সমস্ত শোক দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন। প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হয়, তখন শোক তাহার কোথায়? তাপ তাহার কোথায়? (আবু দাউদ)

৮। আনন্দ ময় ঈদ। হজরত আয়েসা সিদ্দিকার গৃহে দুইটী ক্ষুদ্র বালিকা দায়েরা বাজাইতেছিল এবং বোয়াসের যুদ্ধে আন্‌সারীগণ যে সকল বীরত্বসূচক কবিতা পড়িয়াছিলেন তাহা গাইতেছিল, সেই গৃহে হজরত কাপড় দ্বারা মুখ ঢাকিয়া শুইয়াছিলেন। অবোধ বালিকাদের আমোদ আহ্লাদে বাধা দেওয়া তিনি উচিত মনে করেন নাই। এমন সময় হজরত আবুবকর সেইস্থানে আসিয়া বালিকাদিগকে ধমকাইতে লাগিলেন। প্রেরিত মহাপুরুষ মুখ (হইতে কাপড় সরাইয়া) বলিলেন—"ইহাদিগকে কিছু বলিও না, আজ ঈদের দিন। (উভয়)

৯। হজরতের সময় একবার সূর্য্যগ্রহণ হয়। তিনি সত্বর মসজিদে গিয়া নামাজ পড়িতে লাগিলেন। গ্রহণ সমাপ্ত হইলে তিনিও নামাজ শেষ করিলেন। পরে বলিলেন, "অজ্ঞানতার সময় লোকে বলিত—"চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ পৃথিবীর কোন মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে হয়"। বাস্তবিক কাহারও জীবন মৃত্যুতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ হয় না। আল্লাহ আপন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যে ঘটনা ইচ্ছা করেন তাহাই ঘটিয়া থাকে। গ্রহণ হইলে তোমরা গ্রহণ-মুক্তি পর্য্যন্ত নামাজ পড়িবে। পরে আল্লাহ তালার যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটিবে। (নাসায়ী)

১০। একদিন হজরত এক বিকলাঙ্গ পুরুষকে দেখিয়া ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমতা স্মরণ করিয়া আল্লার উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিয়াছিলেন। (দার-কুতনি)

১১। এক সময় হজরত পথ দিয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, হজরত গাত্র হইতে কাপড় খুলিয়া দিলেন, বৃষ্টিতে তাঁহার শরীর ভিজিয়া গেল। তাঁহার সহচর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহারা প্রভুর নিকট হইতে সদ্য সদ্য পৃথক হইয়া আসিয়াছে।" বন্ধুর নিকট বন্ধুর পায়ের ধূলিকণাও পবিত্র। (মোসলেম)

১২। একবার বৃষ্টির অভাবে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। হজরত শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া ঈদগাহে উপস্থিত হইলেন এবং আল্লার নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা করিয়া উপাসনা করিতে

লাগিলেন। এদিকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল,বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল এবং পরে প্রচুর বৃষ্টি হইতে লাগিল। শিষ্যেরা আশ্রয় স্থানের জন্য তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া হজরত দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। (আবু দাউদ)

১৩। হজরত স্বীয় শিশু পুত্র ইব্রাহীমের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার ধাত্রীর গৃহে গমন করিলেন। তখন ইব্রাহীমের শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কোমল হৃদয় হজরতের নয়ন হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্য আবদুররহমান বিন্‌ওফ বলিলেন, "হে আল্লার প্রেরিত আপনি ও?" হজরত উত্তর দিলেন, "বৎস ওফ, ইহা দয়া।" পুনরায় বলিলেন, "চক্ষু রোদন করে এবং হৃদয় শোকার্ত্ত হয়। যাহা আমার প্রভুর অভিপ্রেত আমি তাহাই বলিতেছি—হে ইব্রাহিম, আমি তোমার বিচ্ছেদে বড় কাতর হইয়াছি।" মহাপুরুষগণ সময়ে বজ্র কঠোর এবং সময়ে কুসুম কোমল। (উভয়)

১৪। হজরতের কন্যা জয়নবের একটী পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। তিনি হজরতকে ডাকিবার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। হজরত সেই ব্যক্তির দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "তাহাকে আমার সালাম জানাইয়া বলিও—যাহা কিছু আল্লাহ্ বলেন এবং যাহা কিছু দেন সমস্ত তাঁহারই, তাঁহার নিকট প্রত্যেকের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার বিনিময় প্রার্থনা কর।" জয়নব পুনরায় তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন। হজরত কতিপয় শিষ্য সঙ্গে লইয়া তথায় আসিলেন। ছেলেটিকে হজরতের কোলে তুলিয়া দেওয়া হইল। তখন তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। হজরতের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার শিষ্য সাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রেরিত মহাপুরুষ! একি ব্যাপার?" হজরত বলিলেন, ইহা দয়া, যাহা আল্লাহ্ আপন সেবকদিগের অন্তরে রাখিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ আপন দয়ালুহৃদয় দাসদিগেরই উপর দয়া করেন।" মানুষের যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহা হজরতের চরিত্রে কেমন ফুটিয়াছিল? (উভয়)

১৫। হজরতের কন্যা জয়নবের মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকেরা রোদন করিতে লাগিল। হজরত উমর তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং ধমকাইতে লাগিলেন। হজরত হস্ত দ্বারা উমরকে পশ্চাতে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "হে উমর, উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও! উহাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, উহাদের হৃদয় দুঃখার্ত্ত, উহাদের শোক সদ্যঃ। পুনরায় স্ত্রীলোকদিগকে বলিলেন, "শয়তানের ন্যায় গোলমাল করিতে সতত বিরত থাকিবে।" যে পর্য্যন্ত রোদন চক্ষু হইতে এবং হৃদয় হইতে হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা মহান্ আল্লা হইতে এবং কোমল হৃদয়ের জন্য হয়; এবং যাহা কিছু হাত হইতে এবং জিহ্বা হইতে হয়, তাহা শয়তান হইতে হয়।" (এমাম আহমদ)

১৬। হজরত ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করিতেন এবং শ্রমকে পছন্দ করিতেন। এক সময়ে কোন ব্যক্তি প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঘরে কিছু আছে?" সে বলিল, "হাঁ—একটী মোটা কম্বল আছে, তাহার

কিছু গায় দেই আর কিছু বিছাই। আর একটী পেয়ালা আছে, তাহাতে সকলে জলপান করে। হজরত আজ্ঞা করিলেন, "সেই দুইটা আমার নিকট লইয়া আইস।" সে তাহাই করিল। হজরত সেই দুইটী জিনিষকে হাতে লইয়া বলিলেন, "কে এই দুইটীকে কিনিবে?" এক ব্যক্তি বলিল, "আমি এক দেরেম দাম দিতেছি।" তৎপরে হজরত দুই তিন বার বলিলেন, "কে এক দেরেম অপেক্ষা বেশী দিবে?" একব্যক্তি বলিল, "আমি দুই দেরেম দিব।" হজরত তাঁহাকে জিনিষ দুইটী দিয়া দিলেন এবং সেই ভিক্ষুককে দুই দেরেম দিয়া বলিলেন, ইহার একটী হইতে কিছু খাদ্য কিনিয়া ঘরের লোকদিগকে দাও, এবং আর একটী হইতে একখানি কুড়ালি কিনিয়া আমার নিকট লইয়া আইস। সে একখানি কুড়ালি কিনিয়া লইয়া আসিল। হজরত স্বহস্তে তাহাতে একটী মজবুত বাঁটী লাগাইয়া দিলেন। পরে বলিলেন, "যাও, কাঠ কাটিয়া বিক্রয় কর, যেন পণর দিন তোমাকে না দেখি।" সে চলিয়া গেল এবং কাঠ কাটিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। একদিন সে হজরতের নিকট আসিল। তখন তাহার নিকট দশ দেরেম সঞ্চিত ছিল। সে তাহা হইতে অল্পমূল্যের কিছু কাপড় খরিদ করিল এবং অবশিষ্ট দ্বারা খাদ্য দ্রব্য কিনিল। হজরত তাহাকে বলিলেন, "তোমার ভিক্ষার জন্য বিচার দিনে তোমার মুখে যে দাগ পড়িত তাহা হইতে ইহা উত্তম। স্মরণ রাখিও, ভিক্ষা করা তিন ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও সিদ্ধ নহে—এক সেই ব্যক্তি যে অনাহারে ভূমিতে পড়িয়া আছে, দ্বিতীয় যে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় যে ব্যক্তিকে হত্যার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

(আবু দাউদ এবং এব্‌নে মাযা)

১৭। হজরত ধর্ম্মোপদেষ্টা কিন্তু তিনি নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদে ঘৃণা করিতেন না। বিবী আয়েশা সিদ্দিকা একটী মদিনাবাসিনী বালিকা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার বিবাহ দিয়া দেন। হজরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কন্যার সহিত কোন গায়িকা গিয়াছে কি না। পরে বলিলেন, "মদিনাবাসিগণ গান পছন্দ করেন। যদি তুমি কন্যার সহিত কোন গায়িকা পাঠাইতে, সে গাহিত :—আতায়নাকুম্, আতায়নাকুম ফা আহহিয়ানা ওয়া আহহিয়াকুম্ —আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি, আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি, আল্লাহ আমাকে ও তোমাদিগকে জীবিত রাখুন—তবে কেমন হইত!" (এব্‌নে আব্বাস ও এব্‌নে মাজা)

১৮। হজরত শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন, "তোমরা কুষ্ঠ রোগী হইতে দূরে পলাইও —যেমন ব্যাঘ্র হইতে পলাইয়া থাক, অথচ একদা তিনি এক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরিয়া আপনার পাত্রে এক সঙ্গে ভোজন করাইলেন। হজরত বলিলেন, "খাও, আমি আল্লার উপর ভরসা এবং নির্ভর রাখি।" যাহারা আল্লার উপর নির্ভর রাখে, তাহাদিগকে কোন আপদ বিপদ অভিভূত করিতে পারে না। (এব্‌নে মাজা)

১৯। ওহদের যুদ্ধে হজরতের একটী অঙ্গুলি আহত হয়। তাহা হইতে রক্ত বাহির হইতেছিল। তখন কিন্তু হজরত ধীরভাবে এই কবিতাটী পড়িতেছিলেন, "হাল আন্‌তে ইল্লা

এছ বাউন দমিতি, অফি সবিলিল্লাহে মালাকিতি ?” * هل انت الا إصبع دميت و فى سبيل الله ما لقيت অর্থাৎ তুমি কি একটী আঙ্গুল মাত্র নও, যাহা খোদার পথে আহত হইয়াছে।” ধন্য তাঁহার সহিষ্ণুতা ! (উভয়)

মোহাম্মদ শাহীদুল্লাহ।
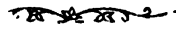
এসলাম প্রচার।

একদল লোকের ধারণা, এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রধানতঃ তরবারি সাহায্যেই প্রচারিত হইয়াছে। মুসলমানগণ এক হস্তে কোরআন ও অপর হস্তে কৃপাণ ধারণ করিয়াই ধর্ম্ম প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এস্‌লামের পরম হিতৈষী ও মুসলমানগণের চিরসুহৃদ খৃষ্টান পাদ্রী সাহেবান, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মিশন ফণ্ডের অনায়াসলব্ধ কাগজ কলমের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের তালে তাল দিয়া ও সেই সুরে সুর মিলাইয়া আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু লেখকগণও আপনাদের সুপক্ক লেখনী প্রসূত গদ্যের রচনাচাতুর্য্যের অন্তরালে, পদ্যের উদ্দীপনাময়ী ঝঙ্কারের আড়ালে, নভেল নাটকের ভাষার সৌন্দর্য্য ও রসাল ভাব মাধুর্য্যের অন্তর্ভাগে, ইতিহাসের ঘটণা প্রসঙ্গে ও বর্ণনা বিন্যাসে, এস্‌লাম প্রচারের এই অদ্ভুত কল্পনাকাহিনী অতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বিদ্বেষমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পিত কাহিনীর প্রচার-বাহুল্যের ফলে, খৃষ্টান মুসলমান ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অযথা হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে, সকলের একান্ত বাঞ্ছনীয় একতা ও সম্প্রীতি স্থাপনের পথে মহা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ অকল্যাণকর ক্রটীর জন্য যে খৃষ্টান পাদ্রী ও হিন্দু লেখকগণ সম্পূর্ণরূপে দায়ী, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত প্রস্তাবে উপরোক্ত ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ঐতিহাসিক প্রমাণশূন্য, তাহা অতি সহজেই প্রতীয়মান হইবে। ঐ ধারণার সত্যাসত্যের বিচার মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে এস্‌লাম ধর্ম্ম-বিধানের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক, এবং পরে এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারক হজরত মোহাম্মাদ (দঃ), তাঁহার প্রতিনিধি ও সহচর-বর্গের আচার ব্যবহার, প্রচারপদ্ধতি এবং এস্‌লাম প্রচারের পূর্ব্বতন ধারাবাহিক

প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। আমরা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ক্রমে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া জগৎবাসীর সম্মুখে এসলাম প্রচারের প্রকৃত কারণ ও ইতিহাস প্রকটন করিতে প্রয়াসী হইব।

ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে কোরআনের বিধান।

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن

১। (হে মোহাম্মদ!) "আহ্বান কর লোকদিগকে তোমার প্রভুর পথের দিকে—যুক্তি, তর্ক ও সদুপদেশ দ্বারা—এবং তাহাদের (বিধর্ম্মীদের) সহিত অত্যন্ত প্রীতিকর উপায়ে তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" অর্থাৎ যুক্তি তর্ক দ্বারা ও মিষ্ট সম্ভাষণে তাহাদিগকে এসলাম ধর্ম্মের প্রতি সাদরে আহ্বান করিবে এবং তাহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক করার সময় অত্যন্ত ভদ্রতা ও প্রীতিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করিবে, ইহাই এস্লাম প্রচারের অবলম্বনীয় পন্থা। (সুরা নহল, ১৬ রুকু)

و لا تجادلوا اهل الکتب الا بالتی هی احسن

২। গ্রন্থের অধিকারী (খৃষ্টান ও এহুদী প্রভৃতি) দিগের সহিত তোমরা অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ও ভদ্রোচিত উপায় অবলম্বন ব্যতীত কখনও তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না।" (সুরা আন্‌কবুত)

قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی

৩। বল (হে মোহাম্মাদ!) ইহাই আমার (ধর্ম্ম) পথ, আমি পূর্ণজ্ঞানে (লোকদিগকে) খোদাতাআলার (ধর্ম্মের) প্রতি আহ্বান করিতেছি। আমার মতানুবর্ত্তীগণ ও (তদ্রূপ লোকদিগকে ধর্ম্মপথের দিকে আহ্বান করিতেছে) (সুরা ইউসফ)

و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فیه وهدی و رحمة لقوم یؤمنون

৪। (হে মোহাম্মাদ!) আমি তোমার প্রতি এই জন্যই স্বর্গীয় গ্রন্থ কোর্‌আন শরিফ অবতারণ করিয়াছি, যাহাতে তুমি তাহাদিগকে তাহাদের মতভেদ ঘটিত বিষয় সমূহ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দাও, এবং কোরআন শরিফ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ও অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ। (সুরা নহল)

قل لعبادی یقولوا التی هی احسن

৫। (হে মোহাম্মাদ!) তুমি, আমার দাসদিগকে বল, তাহারা যেন অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ প্রণালীতে কথোপকথন করে। (সুরা বণি এস্রাইল)

لا تسبوا الذین یدعون من دون الله

৬। "ঐ সকল লোকদিগকে গালি দিও না, যাহারা—খোদাতাআলার পরিবর্ত্তে (প্রতিমাদি) অন্য বস্তুর পূজা করিয়া থাক।" অর্থাৎ বিধর্ম্মীদিগকেও গালাগালি দিওনা, বরং তাহাদিগকে

(পুর্ব্বোল্লেখিত আয়াতের মর্ম্মানুসারে) নিতান্ত শান্ত ও শিষ্টভাবে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণে এস্লামের সত্যতার বিষয় শুনাইতে চেষ্টা করিবে।

لا اكراه فى الدين - قد تبين الرشد من الغى

৭। এস্লাম ধর্ম্মে বলপ্রয়োগ বিধি নাই। আবশ্য ন্যায়-ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাচার এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য প্রকাশ পাইয়াছে।" অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রচার পথে বলপ্রয়োগ আদৌ অনুমোদিত নহে, বস্তুতঃ তাহার কোন প্রয়োজনও নাই, কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পার্থক্য অর্থাৎ এস্লামের মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই লোকে তৎপ্রতি আকর্ষিত হইবে, তজ্জন্য বলপ্রয়োগের আবশ্যকতাই বা কি আছে?

ان هذه تذكرة - فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا

৮। "অবশ্যই ইহা (কোর্‌আন শরিফ) উপদেশ (পুস্তক) মাত্র। অতএব যাহার ইচ্ছা হয়, সে তাহার প্রভুর পথাবলম্বন করিতে পারে।" অর্থাৎ পবিত্র কোরাণ শরিফ উপদেশগ্রন্থ মাত্র। এমতাবস্থায় যাহার ইচ্ছা হয়, সে খোদাতাআলার অনুমোদিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে পারে, যাহার ইচ্ছা সে অধর্ম্মের পথেও যাইতে পারে, তবে উভয়ের ফলাফলের জন্য মানুষ নিশ্চয় দায়ী হইবে। (সুরা 'মজম্মল' ১ম রুকু ও সুরা 'দহর' ২য় রুকু)

قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر

৯। বল, সত্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে (আনীত) অতএব যাহার ইচ্ছা হয় সে বিশ্বাস করুক, আর যাহার ইচ্ছা না হয় সে বিশ্বাস না করুক। (সুরা 'কাহাফ', রুকু ৪)

قل الله اعبد مخلصا له دينى فاعبدوا ما شئتم

১০। (হে মোহাম্মদ) (লোকদিগকে) বলিয়া দাও "আমি একাগ্রচিত্তে একমাত্র খোদা-তাআলার উপাসনা করিয়া থাকি। অতএব তোমরা যথেচ্ছা উপাসনা করিতে পার।" অর্থাৎ, আমি একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তা পরম করুণাময় খোদাতাআলারই উপাসনা করিয়া থাকি। অপরের পক্ষেও তাহাই করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা যদি কাহারও মনঃপুত না হয়, তাহা হইলে সে ভূত, প্রেত, মানব, দানব, যাহার ইচ্ছা তাহার উপাসনা করিতে পারে, তবে তজ্জন্য যে তাহাকে পরকালে দায়ী হইতে হইবে, ইহা নিশ্চিত।

ما انت عليهم بجبار - فذكر بالقران من يخاف وعيد ط

১১। "(হে মোহাম্মদ) তুমি বিধর্ম্মীদের প্রতি বলপ্রয়োগের অধিকারী নহ, অতএব তুমি কোর্‌আনের দ্বারা সেই সকল লোকদিগকে উপদেশ দাও, যাহারা পরকালের শাস্তির ভয় করে।" বস্তুতঃ কোর্‌আন শরিফে এরূপ বহু আয়ত বা পদ বিদ্যমান আছে, যাহা দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় যে, এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে লোকদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, যাহার ইচ্ছা হয় সে ইস্লাম গ্রহণ করিতে পারে, যাহার ইচ্ছা না হয়, সে এস্লাম গ্রহণে অসম্মত হইতে পারে, তাহাতে কোনরূপ জোর জবরদস্তি বা ভীতিপ্রদর্শনের ব্যবস্থা

নাই। অতএব যাঁহারা মনে করেন যে, এস্‌লাম ধর্ম্ম তরবারির সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল, অথবা এস্‌লাম ধর্ম্মগ্রন্থ বলপ্রয়োগ বিধির সমর্থন করে, তাঁহারা নিশ্চয় ভ্রান্ত। হয় তাঁহারা মুসলমান শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথবা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা অনভিজ্ঞ সাজিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আদর্শ।

৬১০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বীয় জীবনের চত্বারিংশৎবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর, একদা মক্কা নগরের'হিরা'নামক পর্ব্বত গুহায় ধ্যান-নিমগ্নাবস্থায় ভাববাদিত্বলাভ করেন এবং সেই অভিনব ও অনভ্যস্ত ব্যাপার দর্শনে নিজেও বিস্ময়াপন্ন ও ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়েন। গৃহে প্রত্যাগমনান্তে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবী খোদায়জা (র) তৎপ্রমুখাৎ পর্ব্বতগুহার সেই বিস্ময়কর ব্যাপারের কথা শুনিয়া, হজরতকে নানারূপ প্রবোধবাক্যে শান্তনা প্রদান করেন, এবং তাঁহারা নিজেদের কৌতূহল নিবারণকল্পে তৎকালীন নানাধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ—বিশেষতঃ খৃষ্টান ধর্ম্মতত্ত্বে পারদর্শী—অরকা বেন নওফল নামক একব্যক্তির নিকট উপস্থিত হন। তিনি সমস্ত ঘটনা আদ্যন্ত শ্রবণপূর্ব্বক হজরত মোহাম্মদকে প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া প্রকাশ করেন এবং তিনি যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে, স্বীয় স্বজন ও দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত ও জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইবেন, তদ্বিষয়ও ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপন করেন। ইহাতে বিবী খোদায়জা সর্ব্বাগ্রে হজরত মোহাম্মদকে আল্লার প্রেরিত রসুল (ভাববাদী) বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক এস্‌লাম ধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন করেন। অতঃপর হজরত আলী ও হজরত আবুবকর (রা) জয়েদ এব্‌নে হাবছা, বেলাল, ওমর এব্‌নে আম্বসা, খালেদ এব্‌নে সাদ প্রভৃতি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। হজরত আবুবকর মক্কা নগরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার সহিত সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের আলাপ পরিচয় ছিল। তাঁহার প্রচার-মাহাত্ম্যে হজরত ওস্‌মান, জোবের, আব্দুররহমান, তাল্‌হা, সাদ এব্‌নে আবি ওবায়বদা, আমের প্রভৃতি বহু লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হজরত মোহাম্মাদর মতানুবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। হজরত মোহাম্মদ ৪০ বৎসর কাল তাঁহাদের মধ্যে জীবনযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবচরিত্রের বিষয় সকলেই সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। তিনি যে জীবনে কখনও মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা অন্যরূপ নৈতিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দেন নাই, সে কথা সকলেই অবগত ছিলেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে বাল্যকাল হইতে "আমিন" ও "ছাদেক" অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী নামে অভিহিত ছিলেন, এজন্য তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকদিগের নিকট যে তত্ত্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সরল প্রকৃতির জ্ঞানী লোকেরা সহজেই সে কথায় বিশ্বাসস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার প্রচারিত মতে দীক্ষিত হ'ন। তাঁহারা নিজেদের পূর্ব্ব ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই, কারণ সেই হস্তনির্ম্মিত প্রতিমা পূজা করা যে জ্ঞান ও বিবেকবিরুদ্ধ মারাত্মক দোষ, ইহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কোরেশ বংশীয়দের মধ্যে যে সকল লোক পরশ্রীকাতর ছিল, হিংসা বিদ্বেষ ও অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি যাহাদের স্বভাবগত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা হজরত মোহাম্মদের কুসংস্কার বিনাশক একত্ববাদ ধর্ম্মের ঘোর শত্রু হইয়া উঠিল, এবং এই সংস্কার মূলক

ধর্ম্ম মত প্রচারে ঘোর বাধা উপস্থিত করিতে লাগিল। এই সময় হইতে তাহারা হজরত রসুলে করিমের প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে।

এস্‌লাম প্রচারে বাধা।

(১) ছহি বোখারী নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাদিছ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হজরত মোহাম্মদ একদা কাবা মন্দির প্রাঙ্গণে নমাজ পড়িতেছিলেন, ইতঃমধ্যে ওক্‌বা এব্‌নে মইত নামক একজন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি একখণ্ড বস্ত্রকে রজ্জুরূপে বিন্যস্ত করিয়া (রসুলে করিম সজ্‌দায় নিমগ্ন থাকা অবস্থায়) উক্ত বস্ত্রখণ্ডের অগ্রভাগ তাঁহার গলদেশে স্থাপন পূর্ব্বক সজোরে আকর্ষণ করিতে থাকে। এতদ্দ্বারা হজরতের নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, ইতঃমধ্যে ঘটনাক্রমে হজরত আবুবকর সেখানে উপস্থিত হইয়া ওক্‌বাকে ধাক্কা দিয়া দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক হজরতকে রক্ষা করেন, এবং কোরআন শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতটি উচ্চারণ করেন, যথা—

اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله و قد جاء كم بالبينات

অর্থ—তোমরা কি এরূপ এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতেছ, যিনি বলিতেছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই আমার প্রভু; এবং যিনি তোমাদের নিকট জ্বলন্ত প্রমাণ সমূহ উপস্থিত করিয়াছেন?" কাফেরগণ এতদ্দর্শনে হজরত আবুবকরকে আক্রমণ পূর্ব্বক গুরুতররূপে প্রহার করে। তিনি প্রহৃতাবস্থায় সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন।

(২) আর এক দিবস হজরত রসুলে করিম (আঃ) কাবা মন্দিরে নমাজ পড়িতেছিলেন, কোরেশ দলপতি আবুজাহ্‌লের আদেশমতে নিষ্ঠুর ওক্‌বা উষ্ট্রের নাড়ী ভুঁড়ি (উজড়ী) আনিয়া হজরতের স্কন্ধদেশে চাপাইয়া দেয়, ইহা দেখিয়া বিপক্ষদল উচ্চ হাস্যধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তোলে। ঘটনাক্রমে বিবী ফাতেমা (র) সেখানে উপস্থিত হইয়া বহু কষ্টে পিতাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। "ছহি বোখারী," "ছহি মোস্‌লেম"।

(৩) এইরূপ ঘটনা নিয়তই ঘটিতে থাকিত। হজরত মোহাম্মাদের ভাববাদিত্ব লাভের ষষ্ঠ বর্ষে, একদা তিনি ছফা পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া উপস্থিত লোকদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ছিলেন, ইতঃমধ্যে আবুজাহাল সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ হজরতকে লক্ষ্য করিয়া কুৎসিত ভাষায় গালি বর্ষণ করিল, হজরত নীরবে ধৈর্য্যের সহিত তাহা শ্রবণ করিলেন। অতঃপর আবু-জাহাল হজরতকে লক্ষ্য করিয়া একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। প্রস্তরাঘাতে হজরতের মস্তক হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইল, তিনি রক্তাক্ত কলেবরে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

(৪) কোরেশগণ নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়াও যখন হজরত রসুলে করিমকে তাঁহার একত্ববাদ সূচক ধর্ম্ম প্রচার ব্রত হইতে বিরত রাখিতে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বনি হাশেম অর্থাৎ হজরতের আত্মীয় স্বজন ও তাঁহার মতানুবর্ত্তীদিগকে বর্জ্জন করিল। তাঁহাদের সহিত ক্রয় বিক্রয়, বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সংস্রব পরি-

ত্যাগ করিল। বনি হাশেম একটী পর্ব্বত গুহায় ৩ বৎসর পর্য্যন্ত অবরুদ্ধাবস্থায় অনশনে বা অর্দ্ধাশনে অতি কষ্টে সময় অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলেন। † সময় সময় পর্ব্বতগুহায় অবরুদ্ধ বনি হাশেমের শিশু সন্তানগণের অনশন জনিত আর্ত্তনাদ শ্রবণে, পাষাণ-হৃদয় নরপিশাচগণের মনও বিগলিত হইত। বনি হাশেমের আত্মীয় স্বজনগণ বালক বালিকাদের হৃদয়বিদারক ক্রন্দন রোল শ্রবণে ব্যথিত হইয়া সেই পর্ব্বত গহ্বরে গোপনে খর্জ্জুরাদি খাদ্য দ্রব্য পৌঁছাইতে বিরত হইত না। অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে যৎসামান্য আহার করাইয়া অধিকাংশ সময় নিজেরা অনশনে অতিবাহিত করিতেন। এত যন্ত্রণা ও উৎপীড়নেও কোন মুসলমান—ধর্ম্মত্যাগ করা দুরের কথা, সমান্য পরিমাণেও বিচলিত হইতেন না। বরং উৎপীড়ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের পরিমাণ দ্বিগুণ ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত।

(৫) অত্যাচার জর্জ্জরিত হজরত মোহাম্মদ অবশেষে বাধ্য হইয়া মক্কা নগর হইতে পদব্রজে তায়েফ নামক স্থানে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে গমন করেন, সেখানে তিনি ঐ দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক নিতান্তই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হন। বিধর্ম্মী দলপতিগণের প্ররোচনায় গ্রাম্য বালকবৃন্দ তাঁহার প্রতি প্রস্তর বর্ষণ, লোষ্ট্র নিক্ষেপ, এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ ইত্যাদি নানারূপে তাঁহার অবমাননা ও নির্য্যাতন করে। এমনকি প্রস্তরাঘাতে হজরতের সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় এবং তাঁহার সেই কুসুম কোমল দেহ হইতে দর দর ধারায় রক্তস্রাব হইতে থাকে, এই সময় প্রহার যাতনায় অস্থির হইয়া হজরত একস্থানে বহুক্ষণ অচেতনাবস্থায় পড়িয়াছিলেন। চৈতন্যলাভান্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তিনি খোদাতায়ালার নিকট তাঁহার শত্রুদিগের জন্য ক্ষমা ও মঙ্গল কামনা করিয়া যে করুণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার মধুর ভাষা, গভীর ভাব, আত্মত্যাগ, উদার ও বিশ্বজনীন প্রেমপ্রবণতা দর্শনে পাষাণহৃদয় শত্রুর অন্তরেও ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি-শালী প্রেরিত মহাপুরুষগণ ব্যতীত অন্য লোকের পক্ষে তাদৃশ ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত বিপদের সম্মুখীন হওয়া ও শত্রুদলের প্রতি সদ্ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করা, কখনই সম্ভবপর নহে।

(৬) বিধর্ম্মিগণ হজরত মোহাম্মদকে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারব্রত হইতে বিরত রাখার জন্য নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন ও বিবিধরূপ ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন তাহারা মন্ত্রণাপূর্ব্বক একদা নিশাযোগে হজরৎকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার গৃহ বেষ্টন করিল, কিন্তু তিনি তাহাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বমুহূর্ত্তে জানিতে পারিয়া, অতি কৌশলে গৃহ ত্যাগ করিয়া হজরত আবুবকর-সমভিব্যাহারে মদিনা প্রস্থান উদ্দেশ্যে একটী পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরূপে যে তিনি বিধর্ম্মী নিচয় কর্ত্তৃক কত প্রকারে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া যিনি জগতে প্রেম ও একেশ্বরবাদ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম মত কি তরবারির সাহায্যে বা বলপ্রয়োগে প্রচারিত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে? কোন জ্ঞানী, কোন

---

† "জাদল্‌মাআদ"—১ম খণ্ড, ২৯৯ পৃঃ।

বিবেক সম্পন্ন লোক কি এরূপ ধৈর্য্যশীল উৎপীড়নসহিষ্ণু সহৃদয় বিশ্বহিতৈষী মহাপুরুষকে উৎপীড়ক বলিয়া আখ্যাত করিতে পারেন ?

হজরত রসুলে করিমের ক্ষমাশীলতা ও ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত।

(১) ওয়াহ্‌শী নামক একজন নিষ্ঠুর নরঘাতক, হজরত রসুলে করিমের পিতৃব্য মহাবীর আমির হামজাকে প্রতারণা পূর্ব্বক হত্যা করে। সে তাঁহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করে, তাঁহার বক্ষবিদারণ পূর্ব্বক হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া নানা প্রকারে অবমাননার পরিচয় প্রদান করে। পিতৃব্যের এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে হজরত যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তিনি অজীবন 'ক্ষোৎবা' প্রসঙ্গে এই মর্ম্মবেদনার আভাস দিয়াছেন। কিন্তু এই অপরাধীকে যখন দণ্ডের জন্য হজরতের দরবারে উপস্থিত করা হইল, সে বিনীত ভাবে হজরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। একদিকে এই নির্ম্মম পাষণ্ডকে উচিত দণ্ড দিবার জন্য মুসলমান মাত্রই ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছেন, অন্য দিকে অপরাধী কাতর দৃষ্টিতে বারবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেছে, রহমাতুল-লেন-আলমীনের দয়ায় সাগরে বাণ ডাকিল,—তৎক্ষণাৎ অপরাধী মুক্তি পাইল।

(২) হোবের নামক জনৈক বিধর্ম্মী, হজরত রসুলে করিমের কন্যা 'জয়নব' কে বর্শাঘাতে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করে। ইহাতে তাঁহার গর্ভনিপাত হয় এবং এই আঘাতের কিছুদিন পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। হোবের হজরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হইলে তিনি নিঃসঙ্কোচে তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান

মূল বাইবেল কোথায় ?

খেয়ালের তিন খানা ইটের উপর খ্রীষ্টান ধর্ম্মের দুনয়াজোড়া দেয়ালের ভিত গাঁথা হইয়াছে যথা ঃ—

(১) বাইবেল—বা মথি, মার্ক প্রভৃতির নামে পরিচিত চারিখানা Gospel (সুসমাচার) ।

(২) ত্রিত্ববাদ—অর্থাৎ এই বিশ্বাস যে খোদা তিন জন, (১) পিতা ঈশ্বর (২) পুত্র ঈশ্বর, আর (৩) পবিত্রাত্মা ঈশ্বর, ইহাঁদের প্রত্যেকই স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিন জনে মিলিয়া এক অভিন্ন ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর। অধিকন্তু পুত্র ঈশ্বর যীশু, একই সময়ে সম্পূর্ণ ঐসিক শক্তিসম্পন্ন পূর্ণ ঈশ্বর, ও সম্পূর্ণ মানবীয় গুসণম্পন্ন পূর্ণ মনুষ্য।

(৩) যীশুর প্রায়শ্চিত্ত্য বা atonement এর বিশ্বাস করা। অর্থাৎ, যীশু দুনয়ার সমস্ত পাপীর পাপের দণ্ডস্বরূপ ক্রসে নিহত হইয়াছেন। এই কথার উপর আস্থা স্থাপন করিলে আর কাঁহাকেও নিজ পাপের জন্য দায়ী হইতে হইবে না, এই কথাটা বিশ্বাস করা।

বাইবেলের† কথাটা প্রথমে আলোচনা করা যাউক। বাইবেল খুলিলেই প্রথমে যে পুস্তকখানি আমাদিগের নজরে পড়ে, তাহার নাম— "মথি লিখিত সুসমাচার।" বাংলা বাইবেল খুলিলে সহসা মনে হয় যে, মথি নামক কোন ব্যক্তি এই কেতাবখানা লিখিয়াছেন। এই ধারণাটা পাকা করিবার জন্য যখন আমরা অন্যান্য অনুবাদের সাহায্য লইতে চাই, তখনই চক্ষু স্থির! উর্দ্দুতে লেখা হইয়াছে (متی کی انجیل) অর্থাৎ মথির ইঞ্জিল, আর আরবীতে বলা হইতেছে—

انجيل يسوع المسيح المقدس كما كتب مار متى

অর্থাৎ " সাধু মথির লেখা অনুসারে যীশুখৃষ্টের ইঞ্জিল।" এইখানা মথির ইঞ্জিল কি যীশুর ইঞ্জিল, তাহার মীমাংসার ভার আরবী ও উর্দ্দু অনুবাদক মহাশয়দিগের উপরে ন্যস্ত করিয়া অগ্রসর হওয়া যাউক। ইংরাজী, আরবী প্রভৃতি অনুবাদ গুলি যদি নির্ভুল বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, মথি কখনই এই শিরোনামটা লেখেন নাই। কারণ, কোন ভদ্রলোকই নিজ হাতে নিজকে সাধু সজ্জন ও মহাপুরুষ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না। এই কেতাবখানার উপর কে কবে এই (মথিলিখিত) কথাগুলি বসাইয়া দিল, তাহার কোন খোজ খবরই পাওয়া যায় না। সুতরাং এই পুস্তকখানা যে বাস্তবিক মথি কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। যাহা হউক, আসুন পাঠক, আমরা মূল বাইবেলখানার আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহা হইলে হয়ত এই সমস্যার একটা সমাধান হইয়া যাইতে পারে।

† এই প্রবন্ধে কেবল খৃষ্টানী বাইবেল বা নূতন নিয়মের কথার আলোচনা হইবে

মথি, মার্ক প্রভৃতি লেখকগণ গ্রীক ভাষায় মূল বাইবেল রচনা করিয়াছিলেন, ইহা আধুনিক খৃষ্টানদিগের বিশ্বাস ও দাবী, * সুতরাং আসুন পাঠক! আমরা সেই তথাকথিত মূল গ্রীক ভাষার লিখিত বাইবেলের আশ্রয় গ্রহণ করি। গ্রীক বাইবেল খুলিলে আমরা দেখিতে পাইব, এই শিরোনামে লেখা আছে :—

"Kata Mattheon"

স্বয়ং গোঁড়া খৃষ্টানেরা গ্রীক বাইবেলের যে অভিধান লিখিয়াছেন, এবং লণ্ডনের 'রিলিজিয়স ট্রাক্ট বুক সুসাইটী' যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অভিধানে, ইহার অর্থ লেখা আছে, **According to**। এ সম্বন্ধে অভিধান আলোচনারই বা আবশ্যক কি? ইংরাজী অনুবাদের শিরোনামে এই শব্দটীর স্থলে লেখা হইয়াছে **Gospel according to St. Matthew.** সুতরাং ইহার ঠিক অর্থ হইল— মথি-অনুসারে লিখিত। "মথি লিখিত" এই অনুবাদ সম্পূর্ণ ভুল। তাহা হইলে গ্রীক বাইবেলের শিরোনাম হইতেও জানা যাইতেছে যে, এই পুস্তকখানি কখনই মথি কর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই। জোর জবরদস্তী এই শিরোনামটা বিশ্বস্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও, বড় জোর এইটুকু প্রমাণ হইবে যে, মথি একটা কিছু লিখিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই গ্রীক বাইবেলখানা রচিত হইয়াছে।

শিরোনামের হাঙ্গামা ছাড়িয়া দিয়া, আসুন পাঠক, আমরা মথির ইঞ্জিলখানি আগাগোড়া পড়িয়া ফেলি। একবার নয়, দুই বার নয়, দুইশত বার—দুই হাজার বার, যতবার ইচ্ছা পড়িয়া ফেলিলেও, এই পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তর কোথাও এমন একটী অক্ষর পাওয়া যাইবে না, যাহার দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে, উহা মথি কর্ত্তৃক লিখিত। বরং ইহার বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায়। যথা :— "আর সেস্থান হইতে যাইতে যাইতে যীশু কর গ্রহণ স্থানে উপবিষ্ট মথি নামে একব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; তাহতে সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল †।" এইপদ হইতে স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, এই পুস্তকখানি মথি কর্ত্তৃক কখনই লিখিত হয় নাই, নচেৎ তাহাতে "মথি নামে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া" ও "সে উঠিয়া তাহার পশ্চাদ্গমন করিল" এইরূপ কথা কখনই থাকিত না। তাহার পর তর্কস্থলে যদি মথিকে এই পুস্তকের লেখক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াও হয়, তাহা হইলেও সন্দেহের জের মিটিতেছে না। আজকাল খৃষ্টান জগতের হাতে, পুরাতন বাইবেলের যে সকল অনুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা দাবী করিয়া থাকেন, তাহার প্রাচীনতর অর্থাৎ "বাটিকান" অনুলিপি খানিও যীশুর স্বর্গারোহনের অন্ততঃ চারিশত বৎসর পরের লিখিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল অনুলিপির সাক্ষ্য পেশ করার সময়, আমাদের পাদ্রী ও মিশনরী লেখকেরা প্রায়ই "সম্ভবতঃ" ও "অনুমান হয়" ইত্যাদি রূপ অকাট্য যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, ঐ সকল

---

* ১ রেভারেণ্ড জে, এম, বি, ডনকান এম, এ; বি, ডি, কর্ত্তৃক "আমরা কিরূপে আমাদের বাইবেল পাইয়াছি" নামক পুস্তক ও অন্যান্য সকল পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে।

† মথি ৯ম অধ্যায় ৯ পদ।

অনুমানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেও, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, মথির লিখিত মূল বাইবেল, এবং চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত তাহার যত নকল লওয়া হইয়াছিল, তাহা সমস্তই জগতের পৃষ্ঠ হইতে চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টান জগৎ এখন যে পুস্তক-খানিকে মথির লিখিত বাইবেলের অনুলিপি বলিতেছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে অনুলিপি, না কোন জালিয়াতের দ্বারা প্রণীত একখানা নূতন কেতাব, তাহা নির্ণয় করিবার কোনই উপায় নাই। অথবা 'সাত নকলে' যে স্বাভাবিক ভাবে ইহার 'আসল খাস্তা' হয়নাই, তারই বা বিশ্বাস কি? এমন অনেক জালিয়াতী বাইবেল'ত সেকালে লেখা হইয়াছিল, আর নকলের গোলও'ত এই বিংশ শতাব্দীর উন্নতির দিনেও তাঁহারা মারিয়া উঠিতে পারেন নাই। অধিকন্তু উল্লিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলির সহিতও বর্ত্তমান বাইবেলের অনেক স্থানে মিল নাই। সুতরাং এই পুস্তক-খানিকে আমরা কোন মতেই মথির লিখিত বাইবেলের অনুলিপি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না।

খৃষ্টান ভ্রাতারা যীশুর পর ষোলশত বৎসর পর্য্যন্ত খুব মোটা গলায় দাবী করিয়া আসিতেছিলেন যে, মথির ইঞ্জিল হিব্রু ভাষায় লিখিত, আর বর্ত্তমান গ্রীক বাইবেলখানা তাহার অনুবাদ মাত্র। (দেখ—Enc. Britannica ১১শ সংস্করণ, ১৭ খণ্ড, ৮৯৬ পৃষ্ঠা।) তখন এই প্রকার বলার বিশেষ কারণ ছিল। মথি যে এই বাইবেলখানা লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের খৃষ্টান বন্ধুরা, প্যাপিয়স, ইরেনিয়াস, ওরিজেন, এপিক্যানিয়াস ও জেরোম প্রভৃতি প্রাচীন পাদ্রীদিগের সাক্ষ্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া থাকেন। এই সকল লেখকের উক্তিতে বাইবেলের কোন কোন কেতাবের নাম উল্লেখ অছে বলিয়া দাবী করা হয়, বলা বাহুল্য যে, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু এই সকল সাক্ষীরা. একবাক্যে বলিতেছেন যে, মথি হিব্রু ভাষাতেই তাঁহার বাইবেল লিখিয়াছিলেন। (দেখুন The Creed of Christendom)। উপরোক্ত এন্সাইক্লোপেডিয়া ও বাইবেল সংক্রান্ত অন্যান্য গবেষণামূলক পুস্তক দেখিলেই পাঠকগণ আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কাজেই তাঁহারা তখন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, মথির বাইবেল মূলে হিব্রু ভাষাতেই লেখা হইয়াছিল। অধ্যাপক Hug তাঁহার বাইবেল সমালোচনা পুস্তকে উল্লেখ করিতেছেন যে, পূর্ব্বে ইবোনীয় (Ebionites) ও নাসারা (Nazarens) নামে যে দুইটী খৃষ্টান সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের নিকট হিব্রুভাষায় লিখিত মথির বাইবেল রক্ষিত ছিল, তাহারা সেই বাইবেলকেই মূল ও আসল বাইবেল বলিয়া মনে করিত। * জেরোমের ন্যায় সাক্ষী বলিতে-ছেন যে, সেই সময় এই পুস্তকখানিকে অনেকেই মথির লিখিত মূল পুস্তক বলিয়া মনে করিতেন। † জেরোমের সাক্ষ্য হইতে আর একটা তথ্য পাওয়া যাইতেছে। জেরোম চার্চের একজন অতি মান্য গণ্য পাদ্রী, তিনি ৩৩১—৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৪২০ খৃঃ অব্দে

* Hug. Introd. Part II

† Thirlwall's Introd. to Schleiermacher, 48-50 and notes.

তাঁহার মৃত্যু হয়। এপিফেন Epiphane একজন প্রধান বিশপ ছিলেন। ৪০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। এই বিশপ এপিফেনই (Ebionites) ইবোনাইটস্ সম্প্রদায়কে এইনামে অভিহিত করেন। সেণ্ট জস্‌টিন দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। সাধু ওরিজেন আলেকজন্দ্রীয়ার প্রধান পণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজক বলিয়া কথিত, ১৮৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ২৫৩ খৃঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। ‡ এই সাধু জষ্টিন ও সাধু ওরিজেনের লেখাতে এই দুই সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা বেশ জানা যাইতেছে। সুতরাং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই এই দুইটী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব বলিতে হইবে যে, মথির লিখিত মূল বাইবেল যখন হিব্রু ভাষায় লিখিত বলিয়া সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে স্বীকৃত হইত, তখনও খৃষ্টানদের মধ্যে সেই হিব্রু ভাষাতেই ঐ বাইবেলের পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন কেতাব প্রচলিত ছিস, এবং সে সময়েও কোন্‌খানা মথির লিখিত "Genuine or original Gospel of Matthew" সে সম্বন্ধে ঘোরতর মতভেদ প্রচলিত ছিল।

সে যাহা হউক পাঠক, পূর্ব্ববর্ত্তী ও প্রাচীন ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের সাক্ষ্য হইতেই বাইবেল সম্বন্ধে এক আধটুকু আভাস পাইয়া, সেই গুলিকে পাদ্রী সাহেবেরা আপনাদের অবলম্বন স্বরূপ পেশ করিয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেন। ঐ সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যে যখন স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মথির লিখিত বাইবেল মূলে হিব্রু (এবরাণী) ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তখন কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে সেই কথা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কারণ ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষ সাধুগণের সাক্ষ্যের এক অংশ লইব, আর এক অংশ ছাড়িয়া দিব, একথা তাঁহারা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। বিশেষতঃ তখন তাহাতে ক্ষতিরও কোনও কারণ দেখা যায় নাই, কাজেই উহাই ঠিক মত বলিয়া দাবী ও ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞান-চর্চ্চা ও স্বাধীন গবেষণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ক্রমে ক্রমে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আরম্ভ করিলেন যে বর্ত্তমান গ্রীক বাইবেলখানি অপর কোন পুস্তকের অনুবাদ নহে, বরং ইহা একখানা মূল পুস্তক। অনেক বড় বড় পণ্ডিত এই মতের পোষণ করিতে লাগিলেন। (Hug, Erasmus, Webster, Paulus ও De Wette প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আলোচনা দ্রষ্টব্য।) কাজেই আবার সুর বদলাইতে হইল। তখন তাঁহারা ১৬ শত বৎসরের কথা পালটাইয়া দিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, "ও সব কথা কিছুই নয়, মথি গ্রীক ভাষায়ই কেতাব লিখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গ্রীক বাইবেল মথির লেখা মূল বাইবেলের অনুলিপি মাত্র। এই সুর পালটাইবার এই প্রকার ছোট বড় আরও দুই একটা কারণ থাকিতে পারে। সে যাহা হউক, খৃষ্টান ভ্রাতাদিগের মানিত সাক্ষী, তাঁহাদিগেরই প্রাচীন সাধু ও মহাপুরুষগণের সাক্ষ্য দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বর্ত্তমান গ্রীক বাইবেলখানি কখনই মথি কর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকার' খৃষ্টান লেখক, এই স্থানে সামলাইতে না পারিয়া নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে,

‡ Chambers' Encyclopaedia দেখুন।

The description, however; of what Matthew did suits better the making of a co'lec'ion of Christ's discourses and sayings than the composition of a work corresponding in form and character to our Gospel of Matthew."* ইহার ভাবার্থ এই যে, আমাদের এই বাইবেল বর্ত্তমান আকারে ও প্রকারে মথি কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, এই কথা বলা অপেক্ষা, মথি যীশুর কতকগুলি কথা ও তাঁহার কার্য্যের কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এই কথাটা অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। Or'gin of Christianity নামক পুস্তকের ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার মিঃ হেনেল অনেক আন্দোলন আলোচনার পর এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, Some one after Mathew wrote the Greek Gospel, which has come down to us, incorporating these Hebrew *Logia*, whence it was called the Gospel *according to* Matthew. অর্থাৎ মথির পরে কোন লোক এই গ্রীক বাইবেল লিখিয়াছেন। ইহাই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মথির সংগৃহীত I'a !ogia বা দৈববাণীর সহিত মিল রাখিয়া এই গ্রীক বাইবেল লেখা হইয়াছিল বলিয়াই তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে, মথি অনুসারে লিখিত সুসংবাদ। Mr. Schmiedel বলিতেছেন:— "For the authorship of the First Gospel the apostle Matthew must be given up" অর্থাৎ প্রথম সুসংবাদের গ্রন্থকার সম্বন্ধে মথিকে নিশ্চয়ই বাদ দিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে, বাইবেলের ঐতিহাসিক প্রমাণের সামন্য একটুকু আভাস দেওয়া হইল, গোটা বাইবেলখানির ঐতিহাসিক ভিত্তি এইরূপ কল্পনা ও অনুমানের উপর স্থাপিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। অন্যান্য দিক দিয়া সমালোচনা করিলেও, বাইবেলের অবিশ্বস্ততা ও তাহরিফ অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হয়। ক্রমে ক্রমে সে সকল কথা পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিবার চেষ্টা করিব।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

* Art.—Gospel of St Mathew দেখুন।

পারস্য সাহিত্য।

পারস্য-সাহিত্য এত বিস্তৃত ও এই ভাষার সাহিত্যসেবিগণের সংখ্যা এত অধিক যে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোন সাহিত্য এ পর্য্যন্ত তত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অন্য কোন ভাষার সাহিত্যসেবিগণের সংখ্যাও এত অধিক বলিয়া বোধ হয় না। পারস্য সাহিত্যের বহু গ্রন্থ নানা ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত ও সুধী সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। পারস্য সাহিত্যাকাশের পূর্ণ শশধর মহাত্মা সেখ সাদীর গোলেস্তাঁখানি বিভিন্ন সময়ে ল্যাটিন, ইংরাজী, জর্ম্মাণ, ফরাসী, ডচ প্রভৃতি নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। অন্যান্য কবিদের প্রণীত আরও অনেক গ্রন্থ নানা পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদিত, সমালোচিত ও পাশ্চত্য সাহিত্যসেবিগণের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রসংসিত হইয়াছে। ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত এম, গার্সন সাহেব ১৭৪৩ খৃঃ অব্দ এসিয়াটিক জার্ণেল পত্রে লিখিয়াছেন, যদিও অনুবাদ হইতে আসলের ভাব সম্যকরূপে পরিগৃহীত হওয়া সুকঠিন, তত্রাচ ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, পারস্য সাহিত্য অতি বিস্তৃত ; অন্যান্য সাহিত্য-সাগর মথিত করিয়া বহুকষ্টে যে রত্নলাভ করিতে পারা যায়, পারস্য সাহিত্য ভাণ্ডারের যত্র তত্র বহুল পরিমাণে তাহা হইতেও উজ্জ্বল রত্নাবলী বিরাজিত আছে। 'সার ওয়েস্‌লী সাহেব ও পারস্য সাহিত্য ও পারস্য কবিগণের সম্বন্ধে অনেক যশোগাথা গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পারস্য সাহিত্যের বিশেষত্ব এমন স্পষ্ট ও পারস্য কবিদের বর্ণানা চাতুর্য্য এমন সুন্দর যে, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে সামান্য ছাত্রের দল পর্য্যন্ত, সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহাদের রচিত কবিতাবলী হইতে সমভাবে রসগ্রহণ ও সমান আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ফ্রান্সের একজন বিদূষী রমণী "পারস্যোদ্যান" নামক একখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি তাহাতে পারস্য সাহিত্য ও পারস্য কবিগণের সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন, এবং বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতোদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে জগতের সকল সাহিত্য অপেক্ষা পারস্য সাহিত্যের আসন বহু উচ্চে।

বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতির যুগে এহেন পরাস্য-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে বহুরত্নাভরণ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গমাতার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করা যাইতে পারে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় মোসলেম সমাজ বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্যক চর্চ্চায় আজও উদাসীন, এখনও তাঁহাদের পূর্ব্ব-নিদ্রার ঘোর কাটে নাই, কখনও কাটিবে কি না তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপাতাই জানেন। সমুদ্রে শিশির বিন্দুর ন্যায় যদিও ২।১ জন মহাত্মা শনৈঃ শনৈঃ এ পথে অগ্রসর হইয়া আজিও সমাজ দেহের সঞ্জীবতার পরিচয় দিতেছেন ; কিন্তু পরাস্য সাহিত্যের প্রতি কাহাকেও মনোযোগী হইতে দেখা যায় না। কেবল গল্প, গুজব ও প্রণয়গীতি গাহিয়া কখনও কোন সাহিত্যর প্রকৃত উন্নতি হয় না, পারস্য-সাহিত্য সমুদ্র বিশেষ, ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এ রত্ন-সাগর মথিত হওয়া

অসম্ভব। আমরা আশা করি এখন হইতে মোসলেম সাহিত্যসেবিগণ অনর্থক ও বাজে প্রসঙ্গাদি পরিত্যাগ করিয়া পরাস্য সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে রত্নাভরণ সংগ্রহ করিতে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইবেন।

আজ আমরা "আল-এসলামের" প্রথম সংখ্যায় পারস্য সাহিত্যের প্রথমাবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব, এবং সর্ব্বপ্রথম পারস্য-কাব্য রচয়িতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা আবুল-হাশান 'রুদকীর' সংক্ষিপ্ত জীবনী উপহার লইয়া 'আল-এসলামের' পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত হইব। সর্ব্বশক্তিমান সহায় হইলে ভবিষ্যতে অন্যান্য কবি ও মহাপুরুষদের পবিত্র জীবনী প্রচার এবং কবিত্বশক্তি ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর সম্যক আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পারস্য সাহিত্যের প্রথমাবস্থা।

শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ-প্রচারিত ও বর্ত্তমান এসলাম ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিঃ জগতে বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে নিয়মিত পারস্য কবিতার অস্তিত্ব ও গ্রন্থাকারে তাহা লিপিবদ্ধ হইবার কথা ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ২।১ জন লেখক (প্রবাদ স্বরূপ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান এসলাম ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'বাহরাম্ গোর্' নামক একজন মহাশক্তি-শালী রাজা ছিলেন। তিনি মৃগয়া করিতে গিয়া একবার একটী প্রকাণ্ড দুর্জ্জয় ব্যাঘ্রকে বিনা অস্ত্রের সাহায্যে পরাজিত করিয়া তাহার উভয় কর্ণ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি নিজের বীরত্বাভিনয়ে নিজেই মুগ্ধ হইয়া ছিলেন এবং হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে এক চরণ পারস্য কবিতা বাহির হইয়া পড়ে। তদীয় সুন্দরী প্রণয়িণী ছায়ার ন্যায় তাহার সঙ্গে থাকিতেন, রাজার প্রত্যেক কথার যথাযোগ্য উত্তর দেওয়ারও তাঁহার অভ্যাস ছিল। রাজা উল্লিখিত রূপে এক চরণ বলিয়া চিরপ্রথানুযায়ী প্রণয়িণীর নিকট তাহার উত্তর চাহিলেন, তদীয় প্রণয়িণী তৎক্ষণাৎ কবিতাটীর দ্বিতীয় চরণ সংযোজন করিয়াছিলেন; সুতরাং দুই চরণ বিশিষ্ট একটী কবিতা সম্পূর্ণ হইল। * ইহাই পারস্য সাহিত্যের নিয়মিত প্রথম কবিতা। রাজার সহিত যে সকল সুধী মণ্ডলী ছিলেন, তাঁহারা ইহা শুনিয়া বিশেষ প্রশংসাবাদ করিলেন। সেই হইতে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া দুই চরণ বিশিষ্ট "ফর্দ্দ" (فرد) নামক একটী করিয়া কবিতা রচনার প্রথা প্রচলিত হইল। এই প্রথাই বহুদিন পর্য্যন্ত পারস্য সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান এসলাম ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই পারস্য সাহিত্যে কবিতার প্রচলন ছিল; তৎপর শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ কর্ত্তৃক এসলামের পবিত্র জ্যোতিঃ জগতে বিকীর্ণ হইবার পর, কিছুদিন পারস্য সাহিত্যের আলোচনা কমিয়া যায়, সে সময় আরব্য সাহিত্যই সুধী সমাজে একমাত্র

---

* কবিতাটী এই—

منم آن پیل دمان و منم آن شیر یله (বাহরাম)

نام بهرام ترا هم پدرت بو جبله (প্রণয়িণী)

গৌরবের জিনিস বলিয়া পরিগণিত হইত, এমন কি অন্য কোন সাহিত্যের আলোচনা করিতেও তৎসাময়িক সুধীমণ্ডলী ঘৃণা বোধ করিতেন। তৎকালে মোসলেম জগতের রাজসভা-সমূহে আরব্য-ভাষাতেই রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, আরব্য ভাষাই তখন রাজভাষা ও আদালতের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের সহচর চতুষ্টয়ের সময় হইতে 'উমাইয়া' ও আব্বাসিয়া বংশের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বহুদিন এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। সে সময় সভ্য-সমাজে পদ্য ও গদ্য গ্রন্থাবলী রচনা, এমন কি চিঠিপত্র লেখালেখি পর্য্যন্ত আরব্য ভাষাতেই প্রচলিত ছিল; কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নহে, আব্বাসীয়া বংশের রাজত্বের শেষভাগে আবার পারস্য-সাহিত্যের প্রতি সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, পারস্য-সাহিত্যে চারিচরণবিশিষ্ট "রোবায়ী" নামিত কবিতা রচনা ও কবিতা সম্বন্ধে কিছু নিয়মের বাধাবাধি এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত পারস্য-সাহিত্যে উল্লিখিত 'ফার্দ্দ' ও 'রোবায়ী' ভিন্ন অন্য কোন ছন্দের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার পর পারস্য-সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, বুধশ্রেষ্ঠ মহাত্মা আবুল হাসান 'রুদাকী'ই সর্ব্বপ্রথমে এই সাহিত্যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন ও সর্ব্ব-প্রথম পারস্য কবি নামে অভিহিত হয়েন। এজন্য আমরাও আজ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রচার করিতে উদ্যত হইলাম।

পারস্য-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম কবি

মহাত্মা আবুল হাসান 'রুদাকী'।

মহাত্মা আবুল হাসান 'রুদাকী' হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত 'রুদাক' নামক একটি পল্লীগ্রামে সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের ঠিক সন তারিখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কবির প্রকৃত নাম 'আবুল হাসান'; কিন্তু সাহিত্য-জগতে তাঁহার নাম 'রুদাকী' বলিয়াই বিখ্যাত। তাঁহার রচিত কবিতা সমূহের 'ভণিতা'তে এই 'রুদাকী' নামই দেখিতে পাওয়া যায়। কবির এই 'রুদাকী' নামকরণ সম্বন্ধে নানামুনির নানামত। কেহ বলেন 'রুদাক' নামক ক্ষুদ্র পল্লী কবির জন্মভূমি বলিয়া, তিনি আপন নামের সহিত জন্মভূমির নাম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে এই 'রুদাকী' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। অন্য এক সম্প্রদায় বলেন, কবি সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অধি-কন্তু তৎসাময়িক 'রুদ' নামক বাদ্য যন্ত্র বাদনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, ইহাই তাঁহার 'রুদাকী' নামে বিখ্যাত হইবার কারণ। *

কবি আজন্ম অন্ধ ছিলেন, মাতৃগর্ভ হইতেই বিধাতা তাঁহাকে চক্ষুরত্নে বঞ্চিত করিয়া-ছিলেন, তিনি সর্ব্বপ্রথমেই পবিত্র 'কোরআনসরিফ' কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করেন; সাত

* আমাদের মতে প্রথম সিদ্ধান্তটাই যুক্তিসঙ্গত।—সম্পাদক।

বৎসর বয়সেই ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত এই বিরাট্ ধর্ম্ম গ্রন্থ খানি তিনি সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাকে দর্শন শক্তির পরিবর্ত্তে অসাধারণ স্মরণশক্তি দান করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন, দর্শনশক্তির অভাবে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। সমস্ত পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণই একবাক্যে তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অধিকার ছিল, কিন্তু সাহিত্য চর্চ্চাতেই তিনি অধিক আনন্দ উপভোগ করিতেন, সাহিত্য চর্চ্চাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। পারস্য-সাহিত্যের "কালেলা দাম্‌না" নামক বিখ্যাত ও বিরাট্ হিতোপদেশ-মূলক গ্রন্থখানি তিনি কাব্যাকারে প্রণয়ন করেন, ইহাই পারস্য সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম কাব্য-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানিই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎসাময়িক খোরাসানাধিপতি 'নাস্‌রাব্‌নে আহমদ' তাঁহাকে আপন সভার প্রিয় সভাসদ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সময় সময় এই গুণগ্রাহী নরপতি তাঁহার রচিত কবিতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া পারিতোষিকস্বরূপ তাঁহাকে বহু অর্থ ও খেলাতাদি প্রদান করিতেন। গাজনীর অধিপতি বিখ্যাত সোলতান মাহমুদের প্রিয় পারিষদ অমরকবি 'ফেরদোসীর' সহকারী কবিবর মহাত্মা 'আনসারী' 'কাসায়েদে আনসারী' নামক স্বরচিত কাব্যগ্রন্থে খোরাসানাধি-পতি কর্ত্তৃক কবি 'রুদাকী'কে প্রদত্ত পারিতোষিকসমূহের একটী বিস্তৃত তালিকা প্রদান করিয়াছেন। যে সময় বোখারানগর খোরাসান রাজ্যের রাজধানী ছিল, 'নাস্‌রাব্‌নে আহমদ' রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর 'হিরাটের' জলবায়ু ও স্বভাবের শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কিছু দিন রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক হিরাটে অবস্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বোখারাভিমুখী হয়েন নাই, নানাপ্রকার বিলাস ব্যসনে মত্ত হইয়া দীর্ঘকাল রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক হিরাটেই অবস্থান করিতেছিলেন। রাজকার্য্যে রাজার উদাসীনতা বশতঃ রাজ্যের মধ্যে নানাস্থানে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। অমাত্যবর্গ ও রাজ্যের হিতৈষী প্রধান আমীরগণ নানারূপ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কবি 'রুদাকী'কে ধরিয়া বসিলেন। কবি তাঁহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া "রাজার বিরহে বোখারা নগরীর বিলাপ ও রাজার পদরজ অঙ্গে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইবার প্রার্থনা" প্রকাশক বোখরা নগরীর পক্ষ হইতে কতকগুলি কবিতা রচনা করিলেন এবং নর্ত্তকিগণকে তান-লয়সহযোগে রাজসদনে তাহা গান করিতে শিখাইয়া দিলেন। সেগুলি এমনি মর্ম্মস্পর্শী ও ভাবময়ী হইয়াছিল যে, নর্ত্তকিগণের মুখে রাজা তাহা শুনিবামাত্র এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজধানী বোখারার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এই অভাবনীয় ঘটনা উপলক্ষে কবির যশঃসৌরভে দিগ্‌দেশ পরিপূরিত হইল, রাজার নিকট ও রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট ইহার প্রতিদানে কবি বহু ধনরত্নাদি লাভ করিলেন। সুখের বিষয়, তাঁহাকে স্বীয় জীবনে যশঃ লাভে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। তাঁহার জীবনকালেই দেশদেশান্তরে তদীয় যশোবিভা বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; কবিভাগ্যে এরূপ যশ-

লাভ প্রায় ঘটিয়া উঠে না। তাঁহার পর পরাস্য-সাহিত্যাকাশে তাঁহাপেক্ষাও বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রথম কবি এবং অনেক বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলিয়া সাহিত্য-আসরে তাঁহার নামডাক খুব বেশী।

হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগে কবি পরলোক গমন করেন, তাঁহার মৃত্যুর ঠিক সন তারিখ জানিবার কোন উপায় নাই, তবে তিনি যে অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি মৃত্যুকালে বহু ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন।

অহো! মরজগতে যে যতই ধন, জন, যশঃ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হউক না কেন, এক দিন তাহাকে তমোময় ভূগর্ভে মৃত্তিকারাশিতে অথবা চিতাবক্ষে ভস্মাবশেষে পরিণত হইতেই হইবে। এইখানে আমাদের অন্ধ কবি হেমবাবুর অন্ধজীবনের কয়েকটী কবিতা মনে পড়িয়া যায়—

সুচির বসন্ত হাসে না ধরায়
না চির হেমন্ত ধরণী কাঁপায়
উত্তপ্ত নিদাঘ প্রাবৃটে জুড়ায়
অনিত্য সকলি বিধির ইচ্ছায়। *

* আবশ্যকীয় স্থানগুলিতে সঙ্গে সঙ্গে Reference ও থাকা আবশ্যক। এই বিষয়টীর প্রতি সাধারণভাবে লেখক মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কারণ, জনশ্রুতির লেখা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয় না।

(সম্পাদক)

বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান।

আমাদের এই সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বঙ্গজননীর উর্ব্বর ক্ষেত্র প্রসাদাৎ আধুনিক কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও সাহিত্যে রমণী জাতির যে সকল বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা আজ আমার উদ্দেশ্য নহে। যে সকল প্রতিভাশালী বঙ্গ-সাহিত্যিক বিশেষ কৃপাপুরঃসর তাঁহাদের স্বরচিত সাহিত্য ও উপন্যাসের আসরে মুসলমান কুল রমণিগণকে অবতারণ করাইয়াছেন, আজ আমি কেবল সেই সব রমণীরই চরিত্র সমালোচনা করিব, এবং এই সুযোগে পাঠকদিগকে এই মাত্র দেখাইতে প্রয়াস পাইব যে, মুসলমান-রমণীর এই প্রকার বিচিত্র চরিত্র প্রকটনে বঙ্গ-সাহিত্য কতদূর গৌরবশালী হইয়াছে।

নারী বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, ইহা যে তাঁহার এক মধুর, মনোরম ও অপূর্ব্বসৃষ্টি—তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। নারীই জগতের প্রাণস্বরূপিণী। এই কঠোর পৃথিবীতে যাহা কিছু কোমল, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্ত এক নারীতেই বর্ত্তমান। দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা-সংক্ষুব্ধ, পাপ-তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে একাধারে প্রেমের উৎস ও শান্তির প্রবাহ বহাইয়া এ মর জগতে নন্দন-কাননের সৃষ্টি করিতে একমাত্র সাধ্বী, পুণ্যবতী নারীই সমর্থা। তাই অমর কবি বিহারী-লাল চক্রবর্ত্তী নারীজাতিকে সম্বোধন করিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে গাহিয়াছেন,—

> "প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর, করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী
> হত মরুময়, সব চরাচর, না থাকিতে তুমি জগতে যদি।"

এমন যে নারী, তিনি হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে জগতের মান্যা ও বরেণ্যা।

কিন্তু নিতান্ত পরিতাপ ও ক্ষোভের বিষয়, কতিপয় বঙ্গ সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক মুসলমান-রমণীর চরিত্র চিত্রণে যেরূপ সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মান হইতে হয়। প্রথমে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম বাবুর কথাই ধরা যাক্। তিনি দয়া করিয়া তাঁহার উপন্যাসে যে সকল মুসলমান রমণীকে স্থান দান করিয়া তাহাদিগকে অমর করিয়াছেন, আমাদিগের দুরদৃষ্ট নিবন্ধন তাহার একটীকেও আমরা আমাদের কুল-রমণীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারি না। তাঁহার আয়েসা, তাঁহার দলনী বেগম, তাঁহার লুৎফুন্নিসা, তাঁহার রোশেনারা, জাহানারা, সর্ব্বোপরি তাঁহার জেবুন্নিসা; মোট কথা তাঁহার অমর লেখনী-প্রসূত বা উদ্ভট কল্পনা-বিজৃম্ভিত প্রত্যেক মুসলমান রমণীই বাঙ্গালার আব হাওয়ার গুণে এমনই কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা অতীব দুঃসাধ্য। বাঙ্গালীর লিপি কৌশলে বাস্তবে ও কল্পনায় যেরূপ

'অভেদাত্মা হরিহর' ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কোন হেতু নাই, কারণ ইতিহাস বরাবরই তাঁহাদের নিকট 'গলাধাক্কা' খাইয়া আসিতেছে।

ইতিহাসের জেবুন্নিসা আর বঙ্কিমবাবুর জেবুন্নিসা দুই স্বতন্ত্র রমণী—উভয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। ইতিহাসে আমরা মোগল-কুল-গৌরব, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আওরঙ্গজেব-দুহিতা জেবুন্নিসাকে বহু সদ্গুণ ভূষিতা, সাধ্বী, চিরকুমারী, বিদুষী মহিলামূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। অষ্টম বর্ষে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তীক্ষ্ণধী জেব মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিয়া পিতার নিকট হইতে ত্রিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ই পিতার সহিত ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুস্তকাগারে ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ ছিল। তিনি স্বয়ং অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সরলতা তাঁহার চরিত্রের একটী প্রধান গুণ ছিল। পোষাক পরিচ্ছেদের আড়ম্বর তাঁহার কোন দিনই ছিল না। তিনি মূল্যবান পোষাক বা অলঙ্কারের কখনই পক্ষপাতী ছিলেন না। কেহ কখনও তাঁহাকে ক্রোধ-পরবশ হইতে দেখে নাই। এরূপ কথিত আছে, একদিন একজন দাসী তাঁহার একখানি চীন দেশের মহামূল্য সুন্দর মুকুর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তজ্জন্য দাসীকে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়া জেব বলিয়াছিলেন,—"যাহাতে মুখ দেখিয়া হৃদয়ে গর্ব্বের উদয় হইতে পারে, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ভালই হইয়াছে।" প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া জেবুন্নিসা প্রার্থনা সমাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ কোরআন ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। তৎপরে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তিনি একজন স্বভাবকবি ছিলেন। অচলা ঈশ-প্রেম ও ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া তিনি যে ভগবদারাধনা করিতেন, তাহার ভাবটুকু আমরা পাঠকবর্গকে উপহার প্রদানের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি খোদার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—"হে দয়াময়! তুমি বিশাল জগতের শ্রেষ্ঠশিল্পী। শিল্পীরা যেমন মৃত্তিকাকে বারিসিক্ত করিয়া মূর্ত্তি গঠন করে তুমিও সেইরূপ তোমার অনুগ্রহ বারি দ্বারা আমাকে সৃজন করিয়াছ। হে প্রভো! যতদিন না আমার জীবনান্ত হয়, ততদিন তোমার সেই অনুগ্রহ রসে যেন তোমারই সৃষ্ট এই দেহ অভিষিক্ত থাকে। আমি যেন তোমারই কথা ভাবিতে ভাবিতে মরিতে পারি।* পাঠক, আপনারা জেবুন্নিসার প্রকৃত স্বরূপ দেখিলেন ত? এখন একবার এই পূতপুণ্যশ্লোকা গুণবতী জেবুন্নিসা বাঙ্গালী-উপন্যাস লেখকের হস্তে পড়িয়া কিরূপ মসীলিপ্তা ও কলঙ্কিতা হইয়াছেন তাহাও প্রত্যক্ষ করুন।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস—"রাজসিংহের" একস্থানে লিখিয়াছেন,—"জ্যেষ্ঠা জেবুন্নিসা বিবাহ করিলেন না। পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।" তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তার পরেই তিনি লিখিয়াছেন,—"পিসী ভাইঝী উভয়ে অনেক স্থলেই মদনমন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন।"

* প্রথম সংখ্যা—সম্পাদক।

কি ঘৃণার কথা! কি লজ্জার কথা!! এক মাত্র বাঙ্গালীর কল্প-লেখনীতেই এই প্রকার বীভৎস পশুভাব নিচয়ের পরিস্ফুটন সম্ভবপর। অন্য একস্থলে রায়বাহাদুর মহাশয় জেবুন্নিসার মুখ দিয়া পাপ পুণ্যের যে বিধিবিধান বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান ধর্ম্মে ও পরোক্ষভাবে খোদ বিধাতার উপরে যে কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। মবারক বলিল,—"পাপপুণ্য আল্লার হুকুম।" তাহাতে বঙ্কিমবাবুর বাদশাহজাদী অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন,—"আল্লা এ সকল হুকুম ছোটলোকদের জন্য করিয়াছেন—কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে না রাজপুতের মেয়ে যে একটী স্বামী করিয়া চিরকাল দাসীত্ব করিয়া শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য এ বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।" পাঠক ক্ষমা করিবেন, এরূপ চটুল রাসলীলার অভিনয় অনেকের তৃপ্তিকর হইলেও শুচিতার খাতিরে আমাকে চাপিয়া যাইতে হইল। যে পিতৃবৎসলা সাধ্বী জেবুন্নিসা ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন, বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব মেধা ও প্রতিভায় সর্ব্বোপরি তাহার বিশ্ববিজয়ী কল্পনায় তিনিই— "নন্দনে নরকের" সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাপেক্ষা পরিতাপ ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ভারত-সম্রাট সাহাজাহানদুহিতা পিতৃবৎসলা জাহাঁনারা ও ভ্রাতৃবৎসলা রোশেনারাকেও বঙ্কিম বাবু এইরূপ কলুষ-কালিমা-লিপ্ত করিতে অনুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইউরোপীয় পর্য্যটকপুঙ্গব বার্নিয়ার জাহাঁনারার পবিত্র চরিত্রে যে মানবীয় ধর্ম্মবিগর্হিত কুৎসিৎ অপবাদের আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই স্বসমাজের কুচ্ছ কাহিনী বা 'লণ্ডন রহস্যের' লীলা-খেলা সমধিক প্রকটিত হইয়াছে। "Cupid's work overtime" যাহারা পড়িয়াছেন অথবা নিদানপক্ষে যাহারা 'এলফিষ্টন বায়স্কোপে' উহা দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাহা হউক, আমাদের বঙ্কিমবাবু তাহাতেও রং ফলাইয়া বলিতেছেন,—"জাহাঁনারা যে পরিমাণে গুণবিশিষ্টা ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল।" যে পিতৃবৎসলা চিরকুমারী পুণ্যবতী জাহাঁনারা শুধু পিতার সেবার জন্য দীর্ঘ সাত বৎসরের বন্দীত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন —যাঁহার অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষা ও অকৃত্রিম ভালবাসা ভক্তিতে সাজাহান দীর্ঘকাল কারাদুর্গে থাকিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছিলেন—পিতৃসেবাই যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, সেই সাধ্বীরমণী বাঙ্গালী পাঠক সমাজে কিরূপ বীভৎস চিত্রে চিত্রিত, তাহা অননুমেয়। রোশেনারা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাহাঁনারার ন্যায় বিচারশূন্য, বাধাশূন্য এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন।" আর কত উদাহরণ দিব। এ যে পলাণ্ডুর খোসা ছাড়ান! পৃথিবীর আর কোথাও বিজেতার রমণী বিজিতের লেখনীতে এরূপ বীভৎস নারকীয় চিত্রে চিত্রিত হইয়াছেন কিনা, সন্দেহের বিষয়।

তারপর লুৎফুন্নিসা, সেও কবির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। লুৎফ-উন্নিসা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক।

কল্পনাতেই ইহার উদ্ভব, তাহাতেই ইহার বিকাশ এবং অবশেষে তাহাতেই ইহার পরিণতি। কিন্তু হিন্দু কপালকুণ্ডলার এই মুসলমান সতীন লুৎফউন্নিসার বিলাস-লালসা কলুষিত-চরিত্র দর্শনে পাঠকের রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। স্বতই মনে হয়, মুসলমান রমণীমাত্রই এরূপ বিলাসী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অসংযত চরিত্র বিশিষ্টা। ধন্য বঙ্কিমবাবু! তাঁহার লেখনীধারণ বিফল হয় নাই। বঙ্কিম বাবুর জেবুন্নিসার ন্যায় লুৎফ-উন্নিসা ও "মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব?" তারপর বল্গা বিমুক্ত দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তির অবাধপরিচালনে "প্রথমে কানাকানি, শেষে কালিমাময় কলঙ্ক রটিল। তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।" তারপর "আগ্রা ও দিল্লীর বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া "ভ্রমরীর ন্যায় কুসুমে কুসুমে বিহার করিতে লাগিলেন।" দেখিলেন পাঠক, বঙ্কিম বাবুর অনন্যসুলভ লিপিচাতুর্য্যে বাস্তব ও কল্পনার কি মধুর ও অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে! ইতিহাসের জেবুন্নিসা আর উপন্যাসের লুৎফ উন্নিসায় কোন পার্থক্য আছে কি? আহা কি সুন্দর! যেন এক বৃন্তের দুইটী প্রস্ফুটিত বাস্‌রার গোলাব ফুল।

তারপর দলনী বেগম। বাঙ্গালার শেষ মুসলমানগৌরব মীর কাসেম বনিতা দলনী বেগমের স্বামিভক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বিষপানে আত্মহত্যা অনৈতিহাসিক, অধর্ম্মীয়। মুসলমানশাস্ত্রে আত্মহত্যা মহাপাপ। ধর্ম্মের বিচারে দলনী বেগমের এ আত্মহত্যা অমার্জ্জনীয়, গুরুতর অপরাধ। নায়ক নায়িকার বিষপানে বা ছুরিকাঘাতে বা পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা সাধন, পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুকরণ-প্রিয়তার নিদর্শন। ইহকাল সর্ব্বস্ব পাশ্চত্য জাতিতে যাহা সম্ভব, পরকালবিশ্বাসী মুসলমান সমাজ কখনই তাহার অনুকরণ বা অনুসরণ করিবে না।

তারপর বঙ্কিমবাবুর "রমণীরত্ন" আয়েসা, উপন্যাসপ্রিয় প্রায় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আয়েসা বঙ্কিমবাবুর সফল আদর্শ রমণী। গ্রন্থকার স্বয়ং একস্থানে বলিয়াছেন,—"আয়েসা বনমধ্যে পদ্মফুল।" বাস্তবিক একটী সাহিত্যিক আদর্শ নারী চরিত্র গঠন করিতে যতগুলি উপকরণের আবশ্যক, উপন্যাস পাঠকের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে, বঙ্কিমবাবু তদীয় প্রতিভা ও অনন্যসুলভ শিল্পনৈপুন্য প্রদর্শনে কণামাত্র কার্পণ্য করেন নাই। বঙ্কিমবাবু আয়েসার চরিত্র চিত্রণে যতটুকু সতর্কতা, যতটুক কলা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে স্বপ্রকাশ। গ্রন্থকার সত্যই বলিয়াছেন,—"আয়েসা পূর্ব্বাহ্লিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে তাহাই হাসিতে থাকে।" সুতরাং এমন আদর্শ আয়েসা চরিত্রে ও আমার মত বেসমজদার ও বেরসিকের দোষোল্লেখ করা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

'পলাসী যুদ্ধের' কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার স্বরচিত জীবনীর, কোন এক স্থলে বলিয়াছেন,—"বঙ্কিম বাবু আদর্শকুল-রমণী চরিত্র গড়িতে পারেন নাই, তাঁহার প্রত্যেকটী রমণীচিত্র পাশ্চাত্যভাবব্যঞ্জক। ইহাদের কোনটীকেই আমরা আমাদের আদর্শ কুলবধূরূপে

বরণ করিয়া লইতে পারি না।” আমিও নবীনবাবুর স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিতে বাধ্য যে, আয়েসা আদর্শ মুসলমান রমণী নহে। জগৎসিংহের প্রতি আয়েসার ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রেম অবৈধ অস্বাভাবিক ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। নিশীথে নির্জ্জন-কারাগারে ভিন্নধর্ম্মী পরপুরুষের করপল্লব ধারণ করিয়া নীরবে দর দর ধারায় অশ্রুপাত করাকে, কোন মুসলমানই—এমন কি কোন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুই—সহানুভূতি বা প্রশংসা চক্ষে দেখিতে পারিবেন না। “Love knows no bounds and love obeys no laws.” এই শ্রুতিসুখকর অথচ বিপ্লববাদী মতবাদ প্রচারের আমরা পক্ষপাতী নহি। ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে যাঁহাদিগকে বাস করিতে হইবে; ধর্ম্মই যাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্ব, তাঁহারা যদি আপাতমধুর জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়া বিধি নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া তাহার সীমা অতিক্রান্ত করেন; তবে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে,তাহা অপ্রতিরোধনীয়। আজ যদি কোন বাক্‌দত্তা পূর্ণবয়স্কা হিন্দুকুলবধূ কোন মুসলমান যুবকের করপল্লব ধারণ করিয়া তাহার পিতা বা ভ্রাতার মুখের উপরে গর্ব্বস্ফীত বক্ষে নিতান্ত লজ্জাহীনা প্রগল্‌ভা নারীর ন্যায় বলে যে “এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবেন না।” ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহা হইলে প্রাগুক্ত পিতা বা ভ্রাতার মনে কি যে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইবে, তাহা সকলে সহজে বুঝিতে পারিবেন। আজ বঙ্গীয় মুসলমানগণ জেবুন্নিসা, রোসেনারা, জাহাঁনারা ও আয়েসার এরূপ অদ্ভুত কল্পিত চরিত্র চিত্র-দর্শনে তাহাদের অন্তরের পরতে পরতে সেইরূপ জ্বালা অনুভব করিতেছেন। আমার হৃদয়জাত এ আকুল অভিব্যক্তি তাহারই ক্ষীণ আভাষ মাত্র।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—“উপন্যাস—উপন্যাস, ইতিহাস নহে।” কিন্তু আমরা তাঁহাদের এ অপূর্ব্ব মতের পোষকতা করিতে পারি না। ইতিহাসের অনুশাসন না মানিয়া —ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া ঐতিহাসিক কাব্য, উপন্যাস বা চুটকি গল্প রচনা করিলে নূতন সৃষ্টিনৈপুণ্য বা সহজে প্রতিভা প্রকাশের অবকাশ ঘটিতে পারে—নায়ক নায়িকার চরিত্রের সৌন্দর্য্যও সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে,—কবির বা ঔপন্যাসিকের অদ্ভুত কল্পনাশক্তির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের মর্য্যাদা বা সম্মান তাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে কৈ? ইতিহাসে যে ঘটনার আভাষ থাকে, কাব্যে বা উপন্যাসে প্রতিভার কিরণে তাহা ফুটাইয়া তোলাই কবি বা ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য।

ইতোমধ্যে আধুনিক হিন্দুসমাজে বঙ্কিমবাবুর নভেলি পাশ্চাত্য—অনুকরণে যে বিপ্লব বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একটু আভাষ অবশ্য আপনাদের অনেকেই নবীন বাবুর “আমার জীবনে” দেখিতে পাইয়াছেন। অধুনা-উদ্ভাবিত উপায়ে কেরাসিন তৈল সাহায্যে শরীরে অগ্নি ধরাইয়া স্নেহলতার সহমরণে নহে—অগ্রমরণে, আমরা আদৌ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না। ক্ষণিক উত্তেজনা বশতঃ তিনি বাঙ্গালীর লুপ্ত নারীসম্মানজ্ঞান জাগাইবার ব্যর্থ প্রয়াসে যে পথাবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গীয় হিন্দুনারী-সমাজে যে বিপ্লব-বহ্নির সৃষ্টি

হইয়াছে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে meterialised পাশ্চাত্য ভাবপ্রবণতার অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তার যতটুকু নিদর্শন পাওয়া যায়, তত আর কিছুই নহে। ইহাতে সমাজ সংস্কার হওয়া দূরে থাকুক, সমাজে অসন্তোষ, অশান্তি ও বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার বিষাক্ত পাদপ সমধিক বদ্ধমূল হইতে থাকিবে। নারীজাতিকে উচিত সম্মান প্রদর্শনে যতদিন আমরা পরাঙ্মুখ থাকিব, তাহাদিগের পতিত অবস্থার উন্নতিসাধনে যতদিন আমরা অবহেলা প্রদর্শন করিব, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতিলাভ পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনবৎ অসম্ভব।

মুসলমান ধর্ম্মে স্ত্রীজাতির স্থান কত উচ্চে—মুসলমানগণ আদিকাল হইতে স্ত্রীজাতিকে কি নজরে দেখিয়া আসিতেছে—মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতির Legal status কিরূপ নিরাপদ, তাহা প্রত্যেক আইনজ্ঞ ব্যক্তিই অবগত আছেন।

ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, মুসলমান ধর্ম্মে স্ত্রীজাতির প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে, অন্য কোন ধর্ম্মে তাহা খুবই দুর্ল্লভ। তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আজও মুসলমান সমাজে 'সাফ্রিগেটের' উৎপত্তি হয় নাই—স্নেহলতা ও তাহার পদাঙ্ক-অনুসরণকারিণীদের জন্মগ্রহণ হয় নাই। গঙ্গাসাগরে কন্যা বিসর্জ্জনের বিবরণ কেবল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। "স্ত্রীর পত্র" হিন্দুগণের অন্তঃপুর হইতেই বাহির হইতেছে। হিন্দুসমাজে স্বামীবিয়োগ-বিধুরা বিধবা নারীর স্থান নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকগণ যদি মুসলমান-কুলবালার অযথা দোষান্বেষণে ব্রতী না হইয়া, আপনাদিগের সমাজের সংস্কার সাধনে সচেষ্ট হইতেন—মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পন্থানুসরণ করিতেন—তবে আজ 'স্নেহলতা' সমাজে এমন বিপ্লব সৃষ্টি করিবার সুযোগ পাইতেন না।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া উপসংহারে যে কৈফিয়ত দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রকৃত মনোভাব ধরা পড়িয়াছে। পূর্ব্বাহ্লেই অযাচিতভাবে কৈফিয়ত দিলে শ্রোতার মনে স্বতই বক্তার সরলতা ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়াপাত হয়, ইহা স্বাভাবিক।

আমরা বলিব, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তারতম্য নির্দ্দেশ করাই তাঁহার এরূপ একদেশ-দর্শিতামূলক উপন্যাস প্রকাশের উদ্দেশ্য। তাঁহার উপন্যাসের স্থলে স্থলে মুসলমান-বিদ্বেষ বীজ যে গুপ্ত ভাবে উপ্ত হইয়াছে, তাহা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। বঙ্কিমবাবু "চন্দ্রশেখরের" একস্থলে লিখিয়াছেন,—"পৃথিবীতে যতপ্রকার মনুষ্য আছে, ইংরেজদের মুসলমান খানসামা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।" তারপর আলমগীর বাদশাহের চিত্রদলনাভিনয়। রাজপুত্রী বলিলেন—"আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটী বাঁ পায়ের নাথি মার। কার নাথিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি?" অবশেষে কেহ অগ্রসর হইল না দেখিয়া "চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বামচরণ খানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—

চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।” কি সুন্দর, উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল! নির্ম্মলকুমারী ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকুতোভয়ে বলিতেছেন—“আমি এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।” এক স্থানে আছে,—“জেবুন্নিসা আতর মাখা রুমালখানা চক্ষুতে দিয়াছিল। এখন পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।” বঙ্কিম বাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন,—“ঔরঙ্গজেব বেত্রাহত কুকুরের ন্যায় বদনে লাঙ্গুল নিহিত করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।” এই গুটি কয়েক উদাহরণ হইতেই উপলব্ধি হইবে যে, বঙ্কিম বাবুর মুসলমানবিদ্বেষ কিরূপ ছিল। বঙ্কিমবাবুর মুসলমানচিত্র একটীতেও বস্তুতন্ত্রতা বা বাস্তবতা নাই। তিনি যে সমাজে ঘুরিয়াছেন, তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি তাহার প্রতিবেশ প্রভাবের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তিনি মুসলমান সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কথনই মেলা মেশা করেন নাই। মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতির আদর কতটুকু—তাঁহাদের সম্মান কতটুকু—মুসলমান সমাজে তাহাদের স্থান কত উচ্চে—মুসলমান নারীচরিত্র মাধুরী কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহা হিন্দু বঙ্কিমবাবু বুঝিবেন কিরূপে? তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিজের সীমাবদ্ধ ভূয়োদর্শনকে খেয়ালের রঙ্গে রঙ্গাইয়া “যবন”-বিদ্বেষ-বিষে অভিষিক্ত করিয়াই লিখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে মুসলমানসমাজের আদর্শ চরিত্র অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আব্দুল মালেক চৌধুরী।

আল্-এসলাম

গ্রাণাডাস্থিত আলহামরার সিংহ-প্রসাদ

সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন।

পৃথিবীর যাবতীয় উন্নতিশীল প্রাচীন এবং আধুনিক সভ্যজাতির ইতিহাস খুলিয়া দেখ, তাহাদিগকে জাগ্রত, জীবন্ত এবং মহিমা-মণ্ডিত করিবার মূলে সাহিত্যশক্তিরই অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান। জগতের সমুদয় রাজকোষের ধন রত্ন অপেক্ষাও সাহিত্যের মূল্য অধিক। সাহিত্য-শক্তির তুলনায় বীরমণ্ডলীর একত্রীভূত বলও অকিঞ্চিৎকর। পক্ষান্তরে কদর্য্য সাহিত্যের কুৎসিতভাব, কু-কল্পনা এবং কু-চিন্তার কলুষরাশি, জগতের সমুদয় পাপ প্রলোভন অপেক্ষাও ভয়াবহ। ইতিহাসজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্য তরণীর কর্ণধারগণ, ভাব-তরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া, সাহিত্য সমুদ্রে যখন যে চিন্তা এবং যে ভাবের স্রোতঃ বহাইয়া দিয়াছেন, তখনই সমস্ত জাতি সেই ভাবে বিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই প্রত্যেক জাতির অভ্যুদয়কালের সহিত অধঃপতনকালের সাহিত্যের গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জগতের যাবতীয় উন্নত জাতির অভ্যুত্থানকালের সাহিত্যের মূলে সর্ব্বদাই বীর, করুণ এবং শান্তরস-প্রধান মহাকাব্য (Epic) সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উন্নতির মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত রসপ্রবাহ পূর্ণ সাহিত্যের পুষ্টিই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পতনের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, কুৎসিত কদর্য্য ভাবপূর্ণ উপন্যাস, কাব্য ও আখ্যায়িকার ভাবে তাহাদের ভাষা প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয়জীবন সংগঠন, উদ্দীপন, পরিচালন এবং তাহার অধঃপতন, সাহিত্যের উপরেই যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যের দিকে দৃক্পাত করিলে সমাজহিতৈষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত ও মর্ম্মাহত হইতে হইবে। আমরা যেরূপ অধঃপতিত, অনন্ত দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতি—আমাদের হৃদয়ের বল ও মনের তেজঃ যেরূপ ক্ষীণ, চরিত্র যেরূপ অবনত, আদর্শ যেরূপ সামান্য—তাহাতে আমাদের সাহিত্য কিরূপ জ্যোতির্ম্ময়, শক্তিশালী ও উচ্চলক্ষ্যযুক্ত এবং উদ্দীপনাময় হওয়া আবশ্যক. তাহা জ্ঞানবৃদ্ধ সমাজ-সেবকগণের একান্ত চিন্তার বিষয়। সত্য বটে, বঙ্গের মুদ্রাযন্ত্রগুলি হইতে প্রত্যহ শত শত পত্র পত্রিকা এবং পুস্তক পুস্তিকা বাহির হইতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহার মধ্যে কয়খানিতে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনী খুঁজিয়া পাওয়া যায়? গবেষণা ও স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত প্রবন্ধ কয়টী দেখিতে পাওয়া যায়? দৈনিক হইতে আরম্ভ করিয়া সাময়িক পত্রিকা পর্য্যন্ত, প্রায় সমস্তই গাঁজাখুরী গল্প এবং নূতন নায়কনায়িকার উচ্ছৃঙ্খল প্রণয় প্রসঙ্গের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ! নূতন লেখক যাঁহারা দেখা দিতেছেন, তাঁহারাও উপন্যাস বিন্যাসে এবং গল্প ফাঁদিতেই ব্যতিব্যস্ত! দেশের সমস্ত পাঠকই যেন উপন্যাস এবং প্রণয়কাহিনী পড়িবার জন্য নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন! জাল

জুয়াচুরি, ডাকাতি অপহরণ ও বহিষ্করণের গল্পে মাসিকপত্রিকাগুলি ভারাক্রান্ত! তেমন জাঁকজমকশালী নামডাকের মাসিকপত্রিকাগুলিতেও পড়িবার উপযোগী সমাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, রাজনীতি বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ নিতান্ত অল্প পরিমাণেই পরিদৃষ্ট হয়! আর কাব্য বা কবিতার কথা কি লিখিব। চাঁদের হাসি, ফুলের রাশি, বিরহ-অনল, মিলনের জল, "পুকুর পাড়ের অভিসার," ফুলবাগানের প্রেমের হার, প্রথম চুম্বন, প্রথম আলিঙ্গন, আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস, প্রিয় লাভ বিফলতার হাহুতাশ, ইহা ছাড়া কবিতার বিষয় আর কিছুই নাই! আদি রস ব্যতীত আজ কাল পাঠকদিগেরও যেন অন্য রস ভাল বোধ হয় না। উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই, অর্থ নাই, কেবল রসাল জাঁকাল শব্দের ঘটা! এই শ্রেণীর কবিতার স্রোতে বঙ্গসাহিত্য এক্ষণে বিপ্লাবিত!

বিজ্ঞ পাঠকপাঠিকা! আপনাদিগকে জিজ্ঞসা করি, কোন অধঃপতিত জাতি, কোন কালে নাটক নভেল পড়িয়া; বেশ্যা-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত গাহিয়া, যাত্রা থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, আমোদ প্রমোদ ও বিলাস-সাগরে ডুবিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে, ইতিহাস হইতে তাহার নিদর্শন দেখাইয়া দিতে পারেন কি? পরন্তু উপরোক্ত কারণ পরম্পরায়, জগতের যাবতীয় সমুন্নত প্রাচীন জাতি যে, অধঃপতিত, এমন কি অনেকে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ইতিহাস কি অনলদক্ষরে তাহাই প্রকাশ করিতেছে না? যখন ব্যাস বাল্মীকির, বীর করুণ ও শান্তরস প্রধান কবিত্ব প্রবাহের পর—ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ, কালিদাস, ভারবী প্রভৃতি কবিগণের আদি রসের ভাবতরঙ্গে জাতীয় জীবন তরী লক্ষ্যহারা—দিশাহারা হইয়া অকূলে ভাসিয়া গিয়াছিল, তখনই কি আর্য্যজাতির প্রকৃত অধঃপতনের সূত্রপাত হয় নাই? মুসলমান জগতে ফেরদৌসী, নেজামী, আন্‌য়ারী, সাদী, হাফেজ, রুমী প্রভৃতি কবিগণের আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ এবং বীরত্বগাথা ও নীতিপূর্ণ সাহিত্যপ্রকাশের পরে; জামী, খসরু, ফৈজী বাহরাম প্রভৃতি কবিগণ আবির্ভূত হইয়া যখন অশ্লীল প্রেমের প্রমত্ত অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন হইতেই কি মুসলমান জাতির অধঃপতনের সূত্রপাত হয় নাই?

প্রিয় পাঠকপাঠিকা! আপনারা একবার বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডার খুঁজিয়া দেখুন যে, উহা প্রায় ভস্মস্তূপে পরিপূর্ণ কি না? যে দুই একখানি রত্ন, ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায়ও জ্যোতি বিস্তার করিতেছে, তাহাও ভস্ম স্তূপের নীচে পড়িয়া অদৃশ্য প্রায় হইয়া গিয়াছে! বঙ্গসাহিত্যে ন্যায়, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস ও জীবনী নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না! শিল্প, কৃষি, রসায়ন ও বাণিজ্য বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করা বিড়ম্বনা মাত্র! শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লবাবু এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়, রাসায়নিক এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ইউরোপ ও আমেরিকা কর্ত্তৃক উচ্চ কণ্ঠে পরিকীর্ত্তিত হইলেন, কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার কণা মাত্রও প্রকাশিত হইল না; হায়! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? বিদেশীয় মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত দূরে থাকুক, স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগেরই বা কয়কানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে? ফলতঃ বঙ্গভাষায় আগাগোড়া কেবল কামিনী কোমল উপন্যাস পুষ্টিলাভ

করিতেছে। ইতিহাসের কথা আর কি বলিব? উপকরণ সংগৃহীত থাকা সত্ত্বেও এপর্য্যন্ত বাঙ্গালার একখানি সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইল না! হতভাগ্য দেশের এমনই দুর্দ্দশা যে, মাতৃভূমির যে দুই একটী সুসন্তান ইতিহাস, জীবনী ও গবেষণামূলক অন্যান্য গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমিকে শক্তিশালিনী ও গৌরবভাগিনী করিতে সদা তৎপর, সহানুভূতির অভাবে তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের গ্রন্থ বৎসরে শত খণ্ডও বিক্রীত হয় কি না সন্দেহ! উপহার দিলেও সহসা কেহ তাহা পাঠ করিতে চাহে না! আর পাঠ করিতে চাহিবেই বা কেন? উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কেবল নায়িকার মূর্ত্তি দর্শন করা ও মোহজাত বিষাক্ত প্রেমের রসে ভাসমান হওয়াই যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের বিজ্ঞান, ন্যায়, নীতি, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ তত্ত্বের আলোচনা করিবার শক্তি আছে কি? বঙ্গদেশের অধিকাংশ লেখকই ভুঁইফোড় প্রকৃতির। বিদ্যাবুদ্ধি, স্বাভাবিক চিন্তা-শীলতা কিছু থাক্ বা নাই থাক্, কলম ধরিতে পারিলেই তিনি লেখক—পুস্তক ছাপিতে পারিলেই গ্রন্থকার! আমাদের দেশের লোক সকল বিষয়েই অলস—বাবু। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কে অত পরিশ্রম করিয়া মস্তিষ্ক আলোড়নপূর্ব্বক দর্শনবিজ্ঞানের গ্রন্থ লেখে! কে অত গবেষণা করিয়া সহস্র সহস্র ঘটনার আদ্যোপান্ত আলোচনা এবং বিচার করিয়া ইতিহাস ও জীবনী লেখে? কে এমন গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার বারিধারা, হেমন্তের শিশির ও শীতের কঠোরতা সহ্য করিয়া পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, নদী নালা, কৃষি ক্ষেত্র, ও গহ্বরাদি পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক অক্লান্ত অশ্রান্তভাবে প্রচুর আলোচনা দ্বারা প্রাণি-তত্ত্ব ও উদ্ভিদ-তত্ত্ব প্রকটন করে? সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপন্যাস লেখা। গাঁজায় দম দিয়া একটী গল্পের স্রোত বহাইয়া দাও। নায়ক-নায়িকার রসালাপ অভিসার ও পলায়ন লইয়া খুব জমকাল বর্ণনা কর, এবং সুকুমার সাহিত্যের ভিতর দিয়া স্বদেশীয় ভিন্নজাতির প্রতি প্রচুর পরিমাণে গালী বর্ষণ কর,—বিষের স্রোত প্রবাহিত কর, দেশোদ্ধার হইবে। হিন্দু-নায়কের জন্য, অসূর্য্যম্পশ্যা মুসলমান বাদশাহজাদীগণকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া বাহির কর, হতভাগা মুসলমানদিগকে তীব্র বিদ্রূপ-বাণে জর্জ্জরিত কর, তৎপর নায়ক বা নায়িকাকে সাগর বক্ষে ডুবাইয়া দাও, অথবা উদাসী বা উদাসিনীর বেশে সাজাইয়া দাও, খুব মজাদার একখানা উপন্যাস হইয়া গেল। ছাপাইয়া দাও যথেষ্ট টাকা হইবে, এবং সমালোচনার দুন্দুভিনাদে চারিদিক্ বিকম্পিত হইয়া উঠিবে। কেহ বলিবে দ্বিতীয় বঙ্কিম, কেহ বলিবে দ্বিতীয় স্কটের অভ্যুদয় হইয়াছে। আর চাই কি, তোমার জন্ম ও জীবন সফল হইয়া গেল! দেশ অধঃপাতে যাক—হিন্দু-মুসলমান হিংসানলে প্রজ্বলিত হউক, তাহাতে তোমার কি? তুমি ত রায় বাহাদুর বঙ্কিম। তোমার আর চিন্তা কি? ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জন্ম ও জীবন।

অনেকে বলিতে পারেন, উপন্যাস পাঠে উপকার আছে। আমি বলি, দুই চারি জনের জন্য সে উপকার—সর্ব্বসাধারণের জন্য কদাপি নহে। আরও বিবেচনার বিষয়, উপন্যাস পাঠে যে উপকার,—ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, জীবনী,

প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনায় কি তদপেক্ষা বহুল উপকারের আশা নাই? যদি থাকে, তবে শুধু উপন্যাসই লিখিতে এবং পড়িতে হইবে, তাহার কারণ কি? পক্ষান্তরে কেহ কি বলিতে পারেন, ইতিহাস, জীবনী, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠে কাহারও উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হইয়াছে?

ইহা চির সত্য যে, লক্ষ্যহীন গল্প গুজবের দ্বারা জাতীয় জীবনের সংগঠন এবং পরিচালনা হইতে পারে না। বৈদিক যুগের পরে—যখন অসংখ্য গল্পগুজব-পূর্ণ পুরাণসমূহ রচিত হইয়াছিল—উপনিষদ্, আয়ুর্ব্বেদ ও দর্শনালোচনা পরিত্যাগ করিয়া, যখন আর্য্যকবিগণ পুরাণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন হইতেই কি ভারতীয় আর্য্যগণ আর্য্যত্ব ভ্রষ্ট হইয়া, "হিন্দুত্ব" প্রাপ্ত হন নাই? তাই বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ছড়াছড়ি, কুৎসিত কবিতার বহুল প্রচার এবং গল্পগুজবের বাড়াবাড়ি দেখিয়া মনে বড়ই আশঙ্কা হয়। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, হিন্দু লেখকদিগের দেখাদেখি, নব-অভ্যুত্থিত মুসলমান লেখকদিগের মধ্যেও অনেকেই উপন্যাস বিন্যাসে, লক্ষ্যহীন ভাষা কবিতা ও শিক্ষাহীন প্রেমের অভিনয়ে একান্তই মাতিয়া উঠিয়াছেন! হায়! ইহা বঙ্গীয় মুসলমানের পক্ষে নিতান্ত দুঃখ এবং অনুতাপের কারণ। অধঃপতিত সমাজ ইহাতে আরও অধঃপাতে যাইবে। তাহাদের সাহিত্যক্ষেত্র এখনও কিছুমাত্র সংগঠিত হয় নাই - কেবল সূচনা মাত্র হইতেছে। এই অঙ্কুর অবস্থাতেই যদি সেই সাহিত্যক্ষেত্রে বিষাক্ত 'আগাছা'সমূহ রোপিত হয়; তাহা হইলে উহাতে আর উৎকৃষ্ট ফলফুলের বৃক্ষবল্লী জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায়? তাই বলিতেছি, ভ্রাতঃ! যদি প্রতিভা না থাকে - স্বভাবিক চিন্তাশীলতা না থাকে—যদি স্বর্গ হইতে কোনও শক্তি না লইয়া আসিয়া থাক—যদি ইতিহাস ও জীবনী প্রণয়নের ক্ষমতা না থাকে—যদি কাব্য ও প্রবন্ধ লিখিবার মস্তিষ্ক না থাকে—যদি দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলনের ধৈর্য্য ও শক্তি না থাকে—তবে অনর্থক এ পরিশ্রম ও বিড়ম্বনা কেন? যদি দেশের ও দশের উপকারের জন্য তাহাদের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য, লেখনী পরিচালনা করিতে পার, তবে সে লেখনী ধন্য! নতুবা সেই লেখনীকে ইন্ধনে পরিণত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাই বলি, ভ্রাতঃ! নিজে মজিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। দেশকে দশকে মজাইয়া মহাপাপের বোঝা মাথায় লইবার আবশ্যকতা কি? ইতিহাস খুলিয়া দেখ, মুসলমানদিগের উন্নতির যুগে তপস্তেজঃপূর্ণ ধর্ম্মপ্রাণ, উন্নতহৃদয় প্রতিভাশালী মহাজনগণ ব্যতীত, আর কেহ লেখনী ধারণ করেন নাই। সাহিত্যক্ষেত্র যাহার তাহার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। ভ্রাতৃবর্গ! সাবধান হও,—বঙ্গীয় মুসলমানগণ পাপে পাপে মরিয়া গিয়াছে, এখন আর সেই মৃতদেহকে বিষাক্ত প্রেমরস-সিঞ্চনে পচাইও না। মনে রাখিও—তোমরা সম্পূর্ণ একটী ভিন্নজাতি এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। পরন্তু তোমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ভিন্নরূপ। মনে রাখিও,—ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া তোমরা মনের বল ও আত্মার তেজ হারাইয়াছ, জাতীয় আচার ব্যবহার ও সভ্যতা-শূন্য হইয়া মুসলমান জগতের বাহিরে পড়িয়াছ। তোমাদের সেই তেজঃপূর্ণ বীরমূর্ত্তি ভীরুতার ছায়ায় কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। স্মরণ

রাখিও—তোমরা মুসলমান, বিশ্ববিজয়ী অনল-প্রতাপ-সম্পন্ন একেশ্বরবাদী মহাজাতির অংশ। তোমাদিগকে সমগ্র জগতের মুসলমানদিগের সহিত এক সূত্রে, একই ভাবে ইস্‌লামের মূল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। মনে রাখিও, তুমি পবিত্র ও জ্বলন্ত ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং তোমার সাহিত্য-শক্তি যাহাতে পবিত্র ও জ্বলন্ত ভাব লাভ করিয়া তোমার জাতীয় জীবনকেও তদনুরূপ পবিত্র ও জ্বলন্ত করিয়া তুলিতে পারে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা তোমার কর্ত্তব্য।

কবি, বক্তা এবং লেখকগণই এক্ষণে আমাদিগের জাতীয় জীবন সংগঠনের একমাত্র উপায়। সুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে, উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত রসনা ও লেখনী পরিচালনা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের উপরই বিরাট্ বঙ্গীয় মুসলমান জাতির পুনরভ্যুত্থান এবং সুখ সৌভাগ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং যাহা তাহা লিখিয়া—নিজের সখ মিটাইতে গেলে চলিবে না। প্রতিবেশীদিগের সাহিত্যের অনুকরণে আমাদের জাতীয় সাহিত্য পুষ্ট করিলে প্রকৃত মঙ্গলের আশা খুব বিরল। পবিত্র জাতীয় ভাষা আরবী এবং পারসী ও উর্দ্দু হইতে জাতীয় ভাব রুচি ও তেজোরাশি আহরণ করিয়া বঙ্গভাষাকে নূতন ভাবে গঠন করত আমাদিগের জন্য জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইবে। বর্ত্তমান বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য আমাদিগের জড়তাপূর্ণ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে। জাতীয় ভাষা আরবী, এবং তৎসহ পারসী ও উর্দ্দু হইতে এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্রাদির অনুবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইতিহাস মুসলমান জাতির প্রাণস্বরূপ। জাতীয় ইতিহাস ও মহাপুরুষ-দিগের জীবনী ব্যতীত মুসলমানদিগের মৃতদেহে শক্তি সঞ্চারের অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু হায়! আমাদিগের লেখকগণের মধ্যে জাতীয় ইতিহাস ও জীবন-চরিত সঙ্কলনের অনুরাগ প্রায়ই দৃষ্ট হইতেছে না। তৎপর যাহার তাহার পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে—জাতীয় সাহিত্যের এই ভিত্তি সংগঠনের সময়ে—লেখনী ও রসনা পরিচালনা করা কখনও মঙ্গলজনক নহে। তপস্তেজঃপূর্ণ পবিত্র হৃদয় জাতীয় হিতচিন্তামগ্ন ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাজনগণই লেখনী ও রসনা পরিচালনার উপযুক্ত। যাঁহারা সত্য সনাতন পবিত্রতম ইস্‌লাম ধর্ম্মের গভীর উদ্দেশ্যে সদা অনুপ্রাণিত, এবং জাতীয় অধঃপতনে যাঁহাদের হৃদয় নিয়ত মুর্ম্মুর দাহনে দগ্ধ হইতেছে, যাঁহাদের মনোবল স্বর্গীয় তেজে সদা উদ্দীপ্ত, তাঁহারাই এক্ষণে লেখনী পরিচালনা ও সাহিত্য সংগঠনের জন্য অগ্রগণ্য হইবার উপযুক্ত। কোনকালেই ব্রহ্মতেজঃসন্দীপ্ত মহাপুরুষগণ ব্যতীত অপর কেহ জাতি সংগঠনে সক্ষম হন নাই—তাহা হওয়াও অসম্ভব। তাই বলিতেছি, ভাই বঙ্গীয় মুসলমান লেখক ও কবিগণ! কেবল নিজের সখ মিটাইবার জন্য বা ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসা ও অনুরাগভাজন হইবার জন্য, কদাপি লেখনী পরিচালনা করিও না। তোমাদের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তোমরা অবতীর্ণ

হও ;—বিমল উদার হৃদয়ে, জাতীয় জড়জীবনে ধর্ম্মবত্তা এবং বৈদ্যুতিক তেজঃ সঞ্চারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লেখনী সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হও। মাননীয় পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন বজ্র-বহ্নি-বিদ্যুৎ ঝঙ্কার প্রতাপ লইয়া জলজ্জিহ্ব কৃপাণ সঞ্চালনে বাধাবিঘ্ন এবং পাপ-তাপরাশি নাশ করিয়া আপনাদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমাদের লেখনী ও রসনা সত্য ও পবিত্রতায় দীপ্ত তেজোরাশি লইয়া, সেইরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হউক! তোমাদের লেখনী হইতে ইস্লামের প্রদীপ্ত প্রভাপুঞ্জ, মেঘবিচ্ছিন্ন মধ্যাহ্ন মিহিরের প্রোজ্জ্বল ময়ূখমালার ন্যায়, অযুত প্রবাহে বিস্ফুরিত হইয়া জাতীয় জীবনকে আলোকিত পুলকিত ও সুশোভিত করিয়া তুলুক !! জাতীয় জীবনের আলস্য-ঔদাস্য, জড়তা-মূর্খতা ও দীনতা মলিনতা রূপ ধ্বান্ত তিমিরপটল একবারে বিলুপ্ত হউক !!!

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, সাহিত্য শক্তি "জাতীয়-জীবন" সংগঠনের প্রধানতম এবং প্রবলতম উপায়। দেশে দিন দিন সাহিত্যের আলোচনা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দেশের লোক তদনুরূপ ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্ এবং চিন্তাশীল ও সন্নীতিপরায়ণ হইতেছে কি? চরিত্র ও নীতিবল ব্যতীত কোন্ জাতি ও কোন্ দেশ কবে অবনতি-গহ্বর হইতে উদ্ধৃত ও উন্নত হইয়াছে ?

ধর্ম্ম ও নীতি দূরে থাক্—আমাদের দেশের লোক কি দিন দিন চরিত্র ও সততা হইতেও ভ্রষ্ট হইতেছে না ? আমাদের শিক্ষিতদের—বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের—মধ্যেই বা কয়জন চরিত্রবান্ আদর্শ মহাত্মা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ? এই যে, দেশের কি হিন্দু কি মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি লোমকূপ হইতে কুপ্রবৃত্তির সুতীব্র পূতিগন্ধ নির্গত হইতেছে, এই যে দিন দিন পল্লীতে পল্লীতে থিয়েটার ও বারাঙ্গনালয় স্থাপিত হইতেছে—দেশ হইতে সংযম ও সাধুতা, পবিত্রতা ও সরলতা একেবারে উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে ; সাহিত্যের কুৎসিত উত্তেজনা ও অশ্লীল দৃশ্য কি ইহার একটী প্রধান শক্তিশালী কারণ নহে ? যে বারাঙ্গনা স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট পাপের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি এবং নরকের ঘৃণিত কীট বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, যে দেশের সাহিত্যে এহেন ঘৃণিত নরক-ইন্ধন কুলটা, কবির কল্পনা লেখনী-সংযোগে "যৌবনে যোগিনী" রূপে বর্ণিত এবং পবিত্রতায় পুষ্পের সহিত উপমিত ; সে দেশের আর নৈতিক জীবন ও ধর্ম্মবলের আশা কোথায় ? যে দেশে ব্রহ্মসঙ্গীত পার্শ্বেই পিশাচিনীর উলঙ্গ প্রেমসঙ্গীত স্থান পায়, সে দেশে যে হাকি উলিনিয়াম বা পম্পেয়াই নগরের ন্যায় বিধাতার অভিসম্পাৎরূপ কালানলে এখনও ভস্মীভূত হয় নাই, ইহাই তাঁহার অপরিসীম করুণা ! এই যে, দেশের স্কুলের কোমলমতি ছাত্র হইতে কলেজের তরুণ বয়স্ক যুবক এবং আফিসের পরিণত বয়স্ক কেরাণী পর্য্যন্ত, প্রায় সকলেই নানাবিধ কুৎসিত কদর্য্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বঙ্গের ভাবী বংশধরগণকে চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য এবং শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে ; এই যে, অনবরত দেশের সর্ব্বত্র মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার জন্য অসংখ্য প্রকারের তৈল, এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য সংখ্যাহীন পেটেন্ট ঔষধ বাহির হইতেছে - এই

যে, দেশের শত শত সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র প্রত্যহ পাপজনিত কদর্য্য পীড়াসমূহের ঔষধ ও চিকিৎসার অশ্লীল বিজ্ঞাপনমালা অঙ্গে ধারণ করিয়া লজ্জা ও নীতির মাথা খাইয়া পাপের দিকে—ব্যভিচার ও কদাচারের দিকে—জনসাধারণকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিতেছে; ইহা দ্বারা দেশের ধর্ম্মভাব, চরিত্র বল এবং পবিত্রতার পরিমাণ করা যায়। এ সমস্তের মূলে কি দেশের যাত্রা, থিয়েটার, নাটক, নভেল, উপন্যাস, নবন্যাস, প্রহসন, গীতি-কবিতা, প্রেম-কবিতা, প্রেমকাহিনী এবং কদর্য্য সঙ্গীতের আদৌ প্ররোচনা ও প্রবর্ত্তনা নাই?

যিনি যাহাই বলুন না কেন, কুৎসিত সাহিত্যের অশ্লীল ভাবে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। হায়! এমন কি কেহ নাই—যিন এই পৈশাচিক কদর্য্য সাহিত্যের মূলে সমালোচনার বিষ-দিগ্ধ তীব্র কুঠার প্রহার করেন? কে আছ বঙ্গের সুসন্তান! এস, পবিত্রতম মাতৃ-প্রতিম বঙ্গভাষাকে চরিত্রহীন কুৎসিতস্বভাব ঔপন্যাসিক এবং ভণ্ড কবি-কুলের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও!

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসেবকগণ! সাবধান এবং সতর্ক হও। অনুকরণ করিতে যাইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িও না। ইস্‌লামের পবিত্রতা ও নীতির প্রাচীরের বাহিরে যাইয়া ভ্রমেও সাহিত্য সেবা করিও না। যদি বঙ্গসাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিতে চাও, যদি সাহিত্যশক্তি প্রভাবে জাতীয় জীবন-তরীকে গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করিতে চাও—যদি বঙ্গসাহিত্যের দ্বারা জাতীয় কল্যাণ ও কুশল কামনাকর; তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার কুচিন্তা কুকল্পনা ভীরুতা ও দীনতার হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও;—বদ্ধপরিকর হও। সুচিন্তার উদ্যানে উচ্চ কল্পনার স্বাস্থ্যকর উন্মুক্ত বায়ুতে ইহাকে বিচরণ করিতে দাও। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মবীরদিগের পবিত্র জীবনীর সৌন্দর্য্যরাশি সাহিত্যে প্রতিফলিত কর। পুরাবৃত্তের দৃশ্য প্রকটন করিয়া মানব-জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি কোন্ কোন্ গুণে উন্নত এবং কোন্ কোন্ দোষে অধঃপতিত বা ধ্বংসের আবর্ত্তে পতিত হইয়াছে, তৎসমুদয় দেখাইয়া দাও। জাতীয় ইতিহাস হইতে মহর্ষিগণ ও বীরেন্দ্রবর্গের প্রোজ্জ্বল জীবনচরিতাবলী সঙ্কলন কর। যে সমস্ত দোষে আমরা প্রকৃত মুসলমানের প্রভাব ও জীবন হইতে সহস্র যোজন দূরে পড়িয়া গিয়াছি; তৎসমুদয়ের মূলোৎপাটনে লেখনী ও রসনা পরিচালনা কর। উচ্চ চিন্তায় উচ্চ কল্পনায় সমাজকে মাতাইয়া তোল। প্রাণের উচ্ছ্বাসে—হৃদয়ের তেজে—সত্যের প্রচারে—সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ কর। দেখিবে, সাহিত্য-শক্তির ঝটিকা প্রভাবে অচিরেই জাতীয়জীবন মেঘোন্মুক্ত হইয়া সৌভাগ্য-শশীর অমল ধবল-কৌমুদী-ছটায় আলোকিত এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়াছে!

—সিরাজী।

আল্-এস্‌লাম।

বহুদিন বিশ্ব-মঞ্চে ধর্ম্ম, রাজনীতি,
জ্ঞান শিল্প, বাণিজ্যের করি' অভিনয়
ঝলসিয়া বিশ্ব-নেত্র অপূর্ব্ব ছটায়
মোস্‌লেম হইল মগ্ন বিঘোর নিদ্রায়!
জগতের নানাজাতি নবীন পুলকে
ছুটে এসে ত্যক্ত মঞ্চ করি' অধিকার
সেই হ'তে আজো শিল্প বাণিজ্য বিভবে
সাজাইছে শূন্যদেহ অপূর্ব্ব গৌরবে!
কত যুগ চলে গেল চিহ্নমাত্র রাখি'
তবু এরা মেলিল না নিদ্রালস আঁখি!
তাহাদের মোহ-নিদ্রা করিবারে দূর
হে—"এস্‌লাম," শুভক্ষণে তুলিলে কি সুর?
মোদের আকাঙ্ক্ষা, তব দীপকের তান
শুনে এরা পায় যেন আজি নবপ্রাণ!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্।

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব।

(DOCTRINE OF ATONEMENT.)

খৃষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ বলেন যে, আদমের বংশধর মাত্রই জন্মগত ভাবে পাপী। এই পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়, যিশুখ্রীষ্টের আত্মদানে বিশ্বাস করা। তাঁহাদের এই কথার মূলে একটা যুক্তি আছে। তাঁহারা বলেন, যিশু সাধারণ মানুষের মত, একজন মানুষের সন্তান নহেন। তিনি কুমারী মারিয়ার (মরিয়ম) গর্ভে স্বয়ং অবতরণ করেন। স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর (?) বলিয়া, তাঁহার জন্য একজন বাপের আর আবশ্যক হয় নাই।

আদম পাপ করিয়াছিলেন বলিয়া, সদাপ্রভু তাঁহাকে শাপ দেন, তাই তাঁহার এবং তাঁহার সমস্ত বংশধরের জন্য মুক্তির পথ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মানব জাতির আর উদ্ধার হইবে না, একথা স্মরণ করিয়া এক সময় পরম পিতা ঈশ্বরের খুব দুঃখ হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া ইহাদের উদ্ধার করেন। আদম তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করায়, তিনি রাগ করিয়া শাপ দিয়াছেন। ইহা কিছু অন্যায় হয় নাই, কেননা দোষ ত আদমেরই। তিনি যে শাপ দিয়াছেন, তাহা ন্যায়মতই হইয়াছে। এ অবস্থায় সোজাসোজি ক্ষমা করিয়া ফেলিলে ন্যায়ের মর্য্যাদা থাকে না। আবার যদি ক্ষমা না করা হয়, তাহা হইলেও তাঁহার দয়াগুণ প্রকাশ পায় না। ব্যাপারটা শেষে খুব জটিল হইয়া দাঁড়াইল। অর্থাৎ স্বয়ং "সদা প্রভু" কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

এই সময় "পরমেশ্বরের একজাত পুত্র" মহাত্মা যিশুখ্রীষ্ট এই মুস্কিল আসান করিবার জন্য নিজে অগ্রসর হইলেন।* বাইবেলে আছে, পাপ করিলে মরিতে হয়; তিনি নিজে মরিয়া সকলকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার প্রস্তাব করিলেন, সদাপ্রভুও তাহাতে সম্মত হইলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার সহজ উপায় ঠিক করা হইল,—মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করা। পরমেশ্বরের পিতা নাই, এই কথার সভ্যতা রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজেই কুমারী মারিয়ার গর্ভে স্থানগ্রহণ করিলেন। যেহেতু তিনি একাধারে ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ই, এইজন্য উপযুক্ত কাল মায়ের পেটে থাকিয়া শেষে সাধারণ মানুষের মত কচি শিশুটী হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। সুখে দুঃখে বাল্যকাল কাটাইয়া যৌবনের সুরু হইলে, কিছুদিন লোক-দিগকে উপদেশ দিলেন—কয়েকজন শিষ্যও করিয়া লইলেন। শেষে যখন ঠিক সময় আসিল, তখন তিনি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শিষ্যগণকে শেষ উপদেশ দিয়া অত্যাচারী ইহুদীদের হাতে ধরা দিলেন। তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া অপমান করিল—পরে যেন তেন

---

* কথায় বলে বাপ যাহা না পারে বেটা তাহা সমাধা করে।—লেখক।

প্রকারের একটা বিচার করিয়া ক্রুশকাঠে চড়াইয়া হত্যাও করিল। খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস মতে যিশুর এই আত্মহত্যা বা মৃত্যুই জগৎ-বাসীর উদ্ধারের একমাত্র কারণ। তাঁহারা বলেন, যিশু জগতের সমস্ত পাপ নিজের মাথায় লইয়া মরিলেন, কিছুকালের জন্য সমস্ত মানবমণ্ডলীর পরিবর্তে নিজে নরকভোগ করিলেন, এবং শেষে আবার জীবিত হইয়া জগতে আর একবার দেখা দিয়া গেলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার এই মৃত্যু এবং জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহার পরিত্রাণ অনিবার্য্য। আর যে অবিশ্বাসী তাহার জন্য সেই মৃত্যু।

খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণের এই দাবীর মধ্যে কোন প্রকার কুটিলতা আছে বলিয়া কেহ বুঝিতে পারে না। বস্তুতঃ এমন কথাও কেহ কিংবা করিয়া বলিতে পারে? যাহা হউক, অনেকে যখন এমন সোজা কথাটী মানিতে চায় না, একটু মাত্র বিশ্বাসরূপ "কলা গাছের ভেলা" দিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে রাজী হয় না, তখন এই জন্য তাহারা দোষী না নির্দ্দোষ, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

কোন জ্যোতিষীর মুখে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা শুনিলে তখনই তাহা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। অনেকে বিশ্বাস করে দৃঢ় ভাবে; কেহ কেহ মনে করে, এরূপ হইতেও পারে, আবার অনেকে হাসিয়াই কথাটা উড়াইয়া দেয়। কিন্তু যখন সেই ঘটনার ঠিক সময় আসে, এবং উহা অবিকল সেইরূপই ঘটে, তখন সেই সত্যকথা 'চারনাচার' সকলকেই মানিয়া লইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্যোতিষীরও খুব মান বাড়িয়া যায়। তখন আর কেহ তাহাকে 'ভাক্ত' বা মিথ্যাবাদী বলিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে দুই একটী ছোট খাট মিথ্যা ধরা পড়িলেও কেহ সেদিকে বড় লক্ষ্য করে না।

এক জন চিকিৎসক সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। কোন একজন অচেনা লোক আসিয়া যদি বলে যে, সে একজন খুব ভাল চিকিৎসক, তখনই কি সকলে তাহাকে মানিয়া লয়? না, যে পর্য্যন্ত তাহাদ্বারা দুই চারিটী কঠিন রোগ আরাম না হয়, সে পর্য্যন্ত নেহায়েৎ সোজা মানুষ ছাড়া আর কেহই তাহাকে ভাল চিকিৎসক বলিয়া স্বীকার করে না। আবার এমনও এক দল মানুষ আছে, যাহারা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তাহাকে চিকিৎসা বিদ্যা জানে বলিয়াই স্বীকার করে না। মোটের উপর প্রত্যেক বিষয় লইয়াই এই রকম গোল দেখা যায়।

যাঁহারা 'ক' অক্ষর শুনিয়া কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল হইয়া যান, এক সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহারা বড়ই সাধু এবং মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। আবার আর এক দল বলে, "ওরা সব ভং—উহাদের ভিতরে সার নাই।" এখন আমরা কোন্ পথে যাই? যীশু আসিয়াছিলেন—জগতের হিতের জন্য। কর্ত্তব্য পালন ব্যপদেশে তাঁহার প্রাণ গেল। গোঁয়ার গোবিন্দ ইহুদীগণ তাঁহাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিল। সকল কাজই যে ভালর জন্যই হয়,

নাস্তিক ছাড়া সকলেই একথা স্বীকার করিবে, কেননা পরমেশ্বর পরমমঙ্গলময়, তিনি কখনও কোন অমঙ্গলজনক কার্য্য করেন না। কিন্তু যিশুর মরণের ফলস্বরূপ যে মঙ্গল, তাহা কি জগতের শুধু যিশুভক্তের উদ্ধার এবং বাকী সকলের জন্য "যন্ত্রব তন্ত্রব" গতি? আমাদের কাছে যেন তাহা বোধ হয় না। নিম্নে এক এক করিয়া কারণ দেখান যাইতেছে।

(ক)

পাদ্রীসাহেবেরা বলেন, আদম এবং ইভের (হাওয়া) দ্বারা জগতে পাপ আনীত হইয়াছিল। এই পাপ মোচন করিবার কোনই উপায় নাই। তবে যাহারা মুক্তি পাইতে চায়, তাহারা যদি যিশুর আত্মদানরূপ প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে, তবেই ইহা দূর হইবে। আচ্ছা দেখা যাউক, তাঁহাদের কথিত এই পাপের জন্য কিরূপ শাস্তির বিধান হইয়াছিল, এবং যিশুর প্রায়শ্চিত্তে যাহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা উহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন কি না? বাইবেল শাস্ত্রে উক্ত আছে, আদমের পাপের জন্য "সদাপ্রভু" তাহাকে শাপ দিলেন,—"তুমি ঘর্ম্মাক্তমুখে আহার করিয়া শেষে মৃত্তিকায় প্রতিগমন করিবে" (১) ইত্যাদি। হাবাকে বলিলেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে" (২) ইত্যাদি। আদমের ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি কঠিন পরিশ্রম করিয়া জীবনধারণের উপায়স্বরূপ আহার সংগ্রহ করিবেন। যাহারা যিশুর রক্তে বিশ্বাসী আছেন বা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন কাহারও সন্ধান পাওয়া যায় কি, যিনি বিনা পরিশ্রমে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারেন বা পারিয়াছেন? কোন খৃষ্টীয়ান নারী কি বলিতে পারেন যে, তিনি যিশুর রক্তে বিশ্বাসী হইয়া প্রসব বেদনা হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং নিতান্ত সুখের সহিত সন্তান প্রসব করিতে পারিয়াছেন? তাহার পর কথা হইল; আদমের "ধূলিতে প্রতিগমন" অর্থাৎ মৃত্যু এবং হাবার অর্থাৎ তাঁহার এবং তাঁহার বংশধর সকল স্ত্রীলোকের "স্বামীর প্রতি বাসনা।" আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোন খৃষ্টীয়ান যেকোন দেশ হইতে এমন একটীমাত্র দৃষ্টান্তও কি দেখাইতে পারেন যে, যিশুর রক্তে বিশ্বাস করিয়া কেহ মরে নাই অথবা কোন খৃষ্টান নারীর পুরুষের প্রতি আদৌ আসক্তি নাই? আমাদের দৈনিক অভিজ্ঞতা আমাদের উপরোক্ত প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। পাদ্রীসাহেবগণের নিকট হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ততঃ দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দেখিতে না পাইব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই প্রায়শ্চিত্তবাদের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। আমরাই বা কেন, জগতের কোন স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিই পারিবেন না।

(খ)

কোন ব্যক্তির, 'বাপ্তিস্ম' নিয়া যীশুর রক্তের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পূর্ব্বে, তাঁহার তথাকথিত জন্মগত পাপ ছাড়া স্বকৃত পাপও কিছু না কিছু অবশ্যই থাকিবে। সেই হিসাবে সে

১। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় ১৯ পদ। ২। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় ১৬ পদ।

উভল অপরাধী। মুক্তি পাইতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যাবতীয় অপরাধের দায় হইতে উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক। সুতরাং সেই নূতন যীশু-ভক্তের নিজকৃত পাপের ভারও যীশুর উপরই চাপাইতে হইবে। কিন্তু যীশু'ত প্রাণ দিলেন তাহার পূর্ব্বে—অপর বোঝা হাল্কা করিবার জন্য। যুক্তি অনুসারে, ভবিষ্যতে কখন কাহার কি রোগ হইবে, তাহার জন্য ডাক্তারকে খানিকটা কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলেই কি সব গোল মিটিয়া যাইবে? মনে করুন, মিষ্টার 'ক' পঞ্চাশ বৎসর বয়সে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি অবৈধ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাইয়া প্রমেহ বা উপদংশের বিষ শরীরে ধারণ করিয়া ফেলিয়াছেন। যদি তাঁহার বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত এই বিষের ক্রিয়া প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তবে পরে তাহা প্রকাশ পাইবে কি না? যদি প্রকাশ পায়, তবে তাহাকে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে, অধিকন্তু (খৃষ্টানদিগের শাস্ত্রানুসারে) সেই পাপের ফলে তাহার মৃত্যুও নিশ্চিত। বলি, এই অবস্থায় যিশুর রক্তে তাঁহার কি ফল হইল? তাঁহার কৃত পাপের জন্যত' তিনি শাস্তি পাইলেনই। যদি বলা হয় যে, এইরূপ বিশ্বাস করিলে মানুষ ভবিষ্যতে পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিবে, তাহা হইলে সে দিকেও একটু দৃষ্টি করা হউক। যাঁহারা খৃষ্টীয়ান,—ভক্তের পাপ মোচনের জন্য যিশু নিজে সমস্ত পাপের ভার লইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কি পাপজনক কোন কার্য্যই করেন না? মিথ্যাবাদীর মৃত্যু অবধারিত বলিয়া বাইবেলে লেখা আছে। চুরী, ব্যভিচার, ঝগড়া বিবাদ এবং অন্যায় করিয়া কাহারও প্রতি দোষারোপ করা প্রভৃতি আরও কত নিত্য নৈমিত্তিক পাপ আছে। খৃষ্টীয়ানগণ এই সমস্ত পাপ কি করেন না? এই সমস্ত পাপের জন্য পার্থিব বিচারপতিগণ কি কোন খৃষ্টীয়ানকে শাস্তি দিতে নিরস্ত থাকেন? আমরা কিন্তু এ সমস্ত কাজই হইতে দেখি। অতএব এই স্থলেও প্রায়শ্চিত্ত বাদের কোনই স্বার্থকতা দেখা যাইতেছে না।

(গ)

রেভারেণ্ড যোজেফ যদি মিষ্টার যোহনকে তাঁহার কার্য্যের সহায়তার জন্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সেই রেভারেণ্ড সাহেব এক হিসাবে যোহনের প্রভু হইলেন। যদি যোহন রেভারেণ্ড সাহেবের তহবিল ভাঙ্গিয়া খায়, তাহা হইলে কি রেভারেণ্ড সাহেব সেই যিশু ভক্ত শিষ্যকে ছাড়িয়া দেন? আমরা কিন্তু দৈনিক অভিজ্ঞতা হইতে সেই হতভাগ্য যোহনের ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীঘর দর্শন পর্য্যন্ত মহালীলার একটা অর্ত্তাঙ্কও বাদ পড়িতে দেখি না। পাদ্‌রীসাহেব যে বুক ফুলাইয়া প্রভু যীশুর প্রেমময় আত্মোৎসর্গ কাহিনী জগৎময় ছড়াইয়া থাকেন—যীশুর প্রতি বিশ্বাসী হইলে প্রত্যেকের যাবতীয় পাপ দূর হয় বলিয়া বাখান করিয়া ফিরেন, এই সরল কথাটা কি তাঁহার মনের দুয়ারে একবারও আঘাত করিল না যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কল্যাণে বেচারার এই পাপ বহু দিন পূর্ব্বেই মোচিত হইয়া

গিয়াছে! আর যদি যীশুর কল্যাণে অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে তাহার এই পাপ-মোচন না হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, সে যীশুর প্রকৃত শিষ্য হইতে পারে নাই। এ অবস্থায় তাহার নামটী গির্জ্জা স্থিত শিষ্যমণ্ডলীর নাম রেজেষ্টারীর খাতা হইতে কাটিয়া দেওয়া হয় না কেন? পক্ষান্তরে এই দুই ব্যবস্থার যে কোনটী পূর্ণ ভাবে পালন না করিলে পাদ্রীসাহেবের ইমানের উপরেও যে একটা অবিশ্বাসের আস্তরণ আসিয়া পড়ে—এ কথা কে অস্বীকার করিবে? আমাদের চক্ষের সামনে এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত ঘটিতেছে, সত্য করিয়া বলিতে হইলে আমরা জোর করিয়া বলিব যে, এই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা বই আর কছুই বুঝিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোহাম্মদ মুজাফফর উদ্দীন।

প্রার্থনা।

তোমার পথের পথিক আমি
সোজা পথটি বলিয়ে দাও
অন্ধকারে যায় না দেখা
দীপটি তোমার জ্বালিয়ে দাও।
কান্না যে মোর সাথে থাকে
সাড়া ত'রে দেয় না ডাকে—
তুমি ক্ষণেক দাও গো দেখা
বিপদ্ আমার টলিয়ে দাও,
তোমার নামে হৃদয় আমার
গলিয়ে দাও গো গলিয়ে দাও।
চালাও আমায় দু'হাত ধ'রে
আপন বলে বলী ক'রে
যত বাধা সামনে পড়ে
ঐ চরণে দলিয়ে দাও।
প্রাণের আমার সব জড়তা
সকল কলুষ আবিলতা
আপনি তুমি অতল তলে
তলিয়ে দাও গো তলিয়ে দাও
তোমার পথের পথিক আমি
সোজা পথটী বলিয়ে দাও।

সেখ হবিবররহমান

—o—
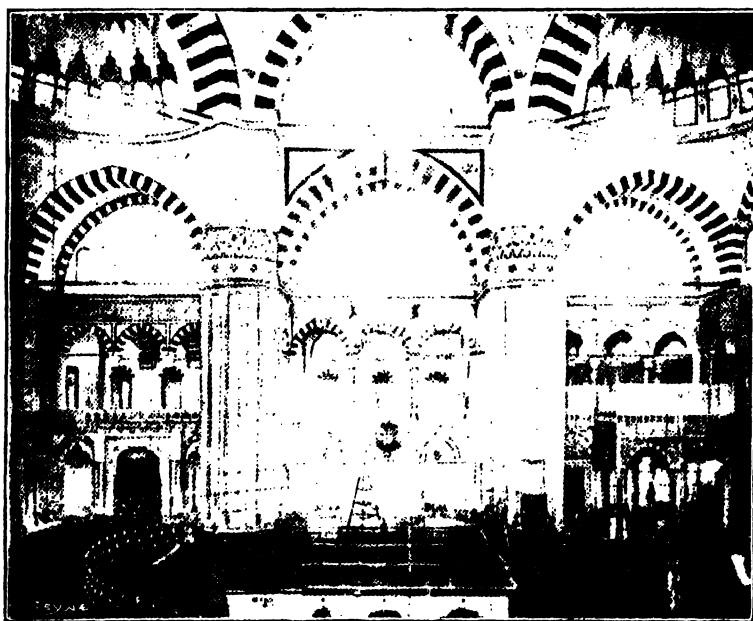
আল্-এস্লাম।

আদ্রিয়ানোপল-মসজেদ।

আল-এসলাম

১ম ভাগ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ ২য় সংখ্যা

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব।

(DOCTRINE OF ATONEMENT)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(ঘ)

মহাত্মা পৌল রোমীয়দের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে একস্থানে* লিখিত আছে, "আমাদের মীমাংসা এই যে, ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া ব্যতিরেকে বিশ্বাস দ্বারাই মনুষ্য ধার্ম্মিকীকৃত হয়।" আর এক স্থলে আছে, "যিশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত, এবং আমাদের ধার্ম্মিকতার নিমিত্ত উত্থাপিত হইলেন।"† শেষোক্ত পদটীর সমর্থন করিতে যাইয়া পৌল ইব্রীয়দের নিকট লিখিত পত্রের নবম অধ্যায়ের শেষভাগে ‡ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মানব জীবনে অনবরত পাপকার্য্য সম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। প্রত্যেক পাপ কার্য্যের জন্য মানুষের মৃত্যু এবং তাহার পর শাস্তি ভোগও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাঁহারা যিশুকে বিশ্বাস এবং তাঁহাতে নির্ভর করেন, তাঁহাদের সমস্ত পাপ যিশু নিজের উপর চাপাইয়া তাঁহাদের বদলে নিজে মরিয়াছেন। এই উপায়ে তাঁহারা যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত এবং ভবিষ্যতের জন্য বেপরোয়া হইতে পারিয়াছেন।

মুখে মুখে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু আদতে তাহার মধ্যে সত্যতা কতটুকু আছে, সে দিকে দৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। খৃষ্টীয়ানদের জন্য যিশু নিজের রক্তদান করিয়াছেন বলিয়া

---

* ৩য় অধ্যায় ২৮ পদ।

† রোমীয় ৪র্থ অধ্যায় ২৮ পদ। ‡ ইব্রীয় ৪র্থ অধ্যায় ২৩ হইতে ২৮ পদ।

আমাদের হিংসা হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু যদি এই 'রক্তদান' ব্যাপারে সংসার হইতে ব্যভিচার প্রভৃতির অস্তিত্ব দূরীকৃত না হয়, তবে এমন অনর্থক রক্তদানের সার্থকতা কোথায়? যিশুর আত্মোৎসর্গ খৃষ্টীয় জগতের নৈতিক চরিত্রের কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে কি? যদি না পারিয়া থাকে, তবে মানুষ চুরি করিবে, শাস্তি পাইবে না; ব্যভিচার করিবে, অপরাধী হইবেনা; এমন বিধান কোন মূর্খ মানিয়া লইবে! যে কাজ সংসারে দোষজনক এবং শাস্তিসাপেক্ষ, পরমেশ্বরের নিকট তাহা গ্রাহ্যই নহে,—এমন কথা যে বলিবে, তাহার বুদ্ধি যে কতটা সূক্ষ্ম, তাহা সাধারণের বিচার্য্য।

এমন কতকগুলি পাপ আছে, যাহা সচরাচর মানুষের নিকট ধরা পড়ে না, কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী খোদাতায়ালা তাহা দেখিতেছেন। যখন বেশী বাড়াবাড়ি দেখেন, তখন তিনি তাহা দমন করিবার জন্য, এক একটা আশ্চর্য্য রকমের হেকমত অবলম্বন করেন। কেহ ব্যভিচারের বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করিলে, কখনও তিনি নানা প্রকার কুৎসিত অথচ মারাত্মক রোগ দিয়া তাহাকে দমন করেন। স্থল বিশেষে পার্থিব বিচারপতির হাতে ফেলিয়াও কোন কোন পাপের শাস্তি প্রদান করেন। যাঁহারা মনে করেন যে, যিশু পৌলের কথা মত, তাঁহার বিশ্বাসীবৃন্দের সমস্ত পাপ নিজে বহন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সমস্ত জঞ্জাল না ঘটাই উচিত ছিল। কিন্তু আমরাত এরূপ কোন দৃষ্টান্তই পাই না! যাহা ইহকালে অশান্তির কারণ, এবং যাহার ফলে ইহকালে (অবশ্য ধরা পড়িলে) শাস্তি ভোগ অনিবার্য্য, সেই কার্য্য পরকালে যে গ্রাহ্যই হইবেনা, এমনটী হইতেই পারেনা। এই অবস্থায়, যে প্রায়শ্চিত্তবাদ ইহকালের জন্য ফলদায়ক হইল না, তাহা পরকালে কোন্ কাজে আসিবে, এবং তাহার মূল্যই বা কত?

(২)

খৃষ্টীয়ানগণের বিশ্বাসানুযায়ী যীশুখৃষ্টের আত্ম-বলিদান পরমেশ্বরের দয়াগুণ প্রকাশের একমাত্র উপায়।* বাস্তবিক পক্ষে এক জনের প্রাণের বদলে যদি সমস্ত জগৎকে রক্ষা করা যায়, তবে তাহা যে সর্ব্বশক্তিমানের দয়াগুণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য হওয়ার যোগ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা কথা—যিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময়, তাঁহার অসংখ্য গুণের মধ্যে বিশেষ একটী গুণ প্রকাশ করিবার জন্য, আর একজনের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইল, এ কেমন কথা! তাহার পর—দয়া যাহাকে বলা যায়, তাহা সঙ্কীর্ণ পদার্থ নহে। একজনের জন্য যাহা শাস্তি, তাহা দশজনের মঙ্গলের কারণ হইলেও দয়া নাম বাচ্য হইতে পারেনা। একটী সাপ উপস্থিত দশজন মানুষের জন্য যে প্রাণনাশক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এই ভয়ানক বিষধরের হাত হইতে সকলকে রক্ষা করা যে সুবিবেচক এবং করুণহৃদয় মহাত্মার কার্য্য, তাহাও ঠিক; কিন্তু তাই বলিয়া সেই সাপটীকে নিরপরাধ থাকা সত্ত্বেও বধ করা বড়ই কঠোরতামূলক ব্যবস্থা। দৃষ্টান্তটী ঠিক খাপ খাওয়ার মত হইল না।

---

* যোহন ১৭ অধ্যায় ১—৫ পদ।

যিশু কিছু পাপ ছিলেন না, জগতে যে তিনি খল রূপে আসিয়াছিলেন, তাহাও নহে; এমতাবস্থায় তাঁহাকে বধ করা যে পরমেশ্বরের কতটা ন্যায়পরায়ণতা এবং দয়াগুণের পরিচায়ক, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না!

খৃষ্টীয়ানগণ বলিতে পারেন, যিশু নিজেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন—স্বর্গস্থ পিতা সদাপ্রভু তাঁহাকে মারেন নাই। কথাটা যে তাহা অমূলক, তাহার প্রমাণ স্বয়ং যিশুর জীবনী হইতে পাওয়া যায়। মথি লিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যিশু যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত, তখন তিনি জৈতুন পর্ব্বতে উঠিয়া নিতান্ত চঞ্চলতা সহকারে করুণস্বরে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। একবার মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া তিনি সদাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক।" "এই পানপাত্র" অর্থ মৃত্যু। লুক লিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের ৪২ হইতে ৪৪ পদে এবং যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৮ অধ্যায়ের ১১ পদে এসম্বন্ধে খোলাসাভাবে লিখিত আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, স্বেচ্ছায় মৃত্যু ভোগ করা যিশুর অভিপ্রেত ছিলনা—ঈশ্বরই তাঁহাকে এই যন্ত্রণার অধীন করেন; তাই তিনি নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।" নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় এইরূপ উক্তি ছাড়া আর কিছুই মুখে আসিতে পারে না।

যাহা হউক, এসম্বন্ধে আমরা আর বেশী কিছু বলিতে চাই না! আমাদের বক্তব্য এই যে, সর্ব্বশক্তিমান সদাপ্রভু যদি এতটা দয়া করিতে পারিলেন, তবে, নিরপরাধ যিশুকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বধ করিলেন কেন? একটা মস্ত সমাজের পাপের জন্য একজন নিরীহ ফকীরকে মারা কোন দেশ-শাসকের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আহা! নিরপরাধ যিশু সেই কঠিন সময় প্রাণান্তক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে আবেগময়ী ভাষায় কতইনা চিৎকার করিয়া করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এলি, এলি, লামা সবক্তানি'?+ (হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু কেন তুমি আমাকে ভুলিয়াছ?) খৃষ্টীয়ান ভ্রাতাদিগের সদাপ্রভু কি এমনই কঠোর ভাবে ন্যায় এবং দয়া গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন!

আরও একটী কথা আছে। যিশু মানব-সুলভ বুদ্ধির অপূর্ণতা হেতু জগতের হিত করিবেন বলিয়া নিজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণটী লইয়া আসরে নামিলেন, ভবিষ্যতে এই কার্য্যের ফল কি দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার শক্তি তাঁহার ছিলনা, অথবা পরোক্ষ-ভাবে থাকিলেও উহাদ্বারা কাজ লইতে পারিলেন না। যাহা হউক, পুত্র হইয়া তিনি বিনিময় ব্যতীত এমন একটা অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারিলেন, আর স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান স্বর্গস্থ পিতার এমন কি বাধা ছিল যে, তিনি বিনা বিনিময়ে তাঁহার সামান্য "ক্ষমা"টুকু দান করিতে পারিলেন না! মানব শরীরে প্রাণ যেরূপ অপরিহার্য্য এবং প্রিয়তর পদার্থ, পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারের এক কণা দয়া কি তাহা অপেক্ষা বেশী আদরের!

+ মথি ২৭ অধ্যায়, ৪৬ পদ।

বলিতে কি, পূর্ব্বাপর সমস্ত কথার আলোচনা করিলে, নিতান্ত গণ্ড মূর্খও বলিবে, পরমেশ্বর দয়া দেখাইতে যাইয়া ন্যায়ের মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় না তিনি দয়ালু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলেন, আর না তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠারই মর্য্যাদা রক্ষিত হইল। এই কি ধর্ম্ম!

(৩)

প্রায়শ্চিত্তবাদ দ্বারা যে শুধু সদাপ্রভুর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রেই অদূরদর্শিতা এবং স্বেচ্ছাচার রূপ কলঙ্ক কালিমার দাগ পড়িয়াছে, তাহা নহে—যিশুও ন্যায়নিষ্ঠার গণ্ডি হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। মানুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, এবং তদুপরি বিবেক রূপ অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী থাকা সত্ত্বেও, সদাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিল না—প্রবৃত্তির প্রলোভনে —শুধু শয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া। শেষে এই পাপ গুরু ভার হইয়া পড়িল, কেহই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিল না—তখন যিশু আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া দিলেন। মানুষ পাপ করিল খোদার বিরুদ্ধে, খোদার পুত্র আসিয়া সেই পাপের শাস্তি নিজে ভোগ করিলেন, আর এদিকে এই রিপুর দাস জন-সম্প্রদায় বেকসুর খালাস! কিন্তু পাপ যে দুই প্রকার! এক পাপ ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া—যেমন আদমের নিষিদ্ধ গাছের ফলভক্ষণ। ইহাতে কাহারও কিছু যায় আসে না। পৃথিবীর সুশৃঙ্খলার উপর এই পাপের কোন প্রকার ক্রিয়াই প্রকাশ পায় না। এই প্রকার পাপ মোচনই যদি প্রায়শ্চিত্তবাদের বিষয়ীভূত হইত, তবে তাহাতে যিশু চরিত্র বাস্তবিকই এক অতুলনীয় শোভা ধারণ করিত। কিন্তু হায়! এ যে আরও আগে বাড়িয়া গিয়াছে! যিশুর রক্তে যাহার বিশ্বাস আছে, কোনও পাপের জন্যই নাকি তাহাকে শাস্তির অধীন হইতে হইবে না! বলি, দ্বিতীয় প্রকার পাপ যে দশ আজ্ঞা* লঙ্ঘন করা, ইহার জন্যও যদি অবাধ মুক্তির লাইসেন্স পাওয়া যায়, তবে আর চাই কি! যে হতভাগ্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি কর, সে মাথা কুটিয়া মরুক, বদলা পাইবেনা!!

একটী দৃষ্টান্ত দিব। 'ক' চুরি, নরহত্যা এবং আরও পাঁচ রকম পাপ করিল। ধরা পড়িবার ভয় হইলে সে জর্দ্দনের জল ছুইয়া পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইল এবং যিশুর রক্তে নির্ভর করিল। এই অবস্থায় কোন বিচারপতি যদি 'ক'কে ধরিয়া জেলে দেন, তবে তিনি অপরাধী হইবেন কিনা? যদি বল কেন? উত্তর এই,—যিশুতে আত্মনির্ভর করার সঙ্গে সঙ্গেই যিশুর রক্তের প্রভাবে তাহার যাবতীয় পাপ মোচন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে এখন শুচি বা সহজ কথায় নিরপরাধ। নিরপধাধের প্রতি শাস্তির বিধান করা গুরুতর অপরাধ। বিচারক সংসারের সুশৃঙ্খলা সাধন করিতে গিয়া—পাপানুষ্ঠানের মূলে আঘাত করিতে যাইয়া, স্বয়ং অপরাধ প্রযুক্ত পাপী হইলেন! এখন জিজ্ঞাসা করি, বিচারপতির এই অজ্ঞানকৃত সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পাপের জন্য যিশু দায়ী কিনা? ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি এখানে যিশুর আত্মদান সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিবেন? আসল কথা এই, যিশু জগতের পাপ দূর করিতে আসিয়া শেষে তাহার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন। জানিনা তাঁহার উদ্দেশ্য "দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন" ছিল কি না?

* দ্বিতীয় বিবরণ ১৭ হইতে ২১ পদ।

বাইবেল এ সম্বন্ধে কিছু বলে না। সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া আমরা যতই বুঝিতে যাই, ততই দেখি কাজটা বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাঁহার অভয় দানের প্রভাবে দুষ্ট অধিকতর দুষ্ট এবং শিষ্টের নিগৃহীত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। ঈশ্বরপুত্র যিশুর পক্ষে ইহা কতটা শ্লাঘার বিষয়, পাদ্রি সাহেবগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

(৪)

সদাপ্রভু নাকি ন্যায়ের খাতিরে পাপীদিগকে সরাসরি ভাবে ক্ষমা করিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায় বলেন, অমনি মাফ করা হইলে পাপকার্য্যে লোকের সাহস বাড়িয়া যাইত। সদাপ্রভু বিজ্ঞানময়, তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া—নানাদিক দেখিয়া তবে, নিজের একজাত পুত্রের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইলেন। ইহাতে লোকে বুঝিতে পারিল যে, পাপের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। অতএব তাহারা ভয়ে ভয়ে আর অপকর্ম্মের কাছেও যাইবেনা।

এইত গেল খৃষ্টীয়ান পক্ষের 'অতি ভক্তির' কথা। কিন্তু ইহাতে আমরা কি উপদেশ পাই? না, যিশু পাপীর জন্য আত্মজীবন দান করিলেন। ইহার ফলে প্রত্যেক যিশুভক্তই যাবতীয় গুরু এবং লঘু পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বসিল। তাহারা বুঝিল, তাহারা যতই অন্যায় কার্য্য করুক, যিশুর রক্তের প্রভাবে সমস্তই "পদ্মপত্রে জলের" মত গা ছুইয়াও ছুইতে পারিবেনা। বস্, আর কথা কি? "হিসাব নাই কিতাব নাই" যাহা মনে ধরে করিয়া লও!! হাসি ঠাট্টার কথা নয় مال مفت دل بے رحم—যাহার জন্য বেগ পাইতে হয়না, তাহার আদর ও কম হয়। খৃষ্টীয়ানগণের যখন দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু "যিশু-প্রেমই" তাঁহাদিগকে যাবতীয় জ্বালা যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবে, তখন তাঁহারা পাপ পুণ্যের দিকে লক্ষ্য করিবেন কেন? আসল কথা এই, "যিশুর রক্ত" মানুষকে সৎপথে নেওয়া দূরে থাকুক, অসৎ পথের দিকে আরও দুই দশ 'কদম' বাড়াইয়া দিতেছে। পরমেশ্বর যে ভয়ে বিনা প্রায়শ্চিত্তে মানবের অপরাধ ক্ষমা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, ইহার প্রভাবে সেই দুঃসাহসিকতা পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে বা বড়িবার জন্য আশাতীত সুযোগ ঘটিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মোহাম্মদ মুজাফ্ফর উদ্দীন।

অমর কবি হাফেজ।

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما !

"যাহার হৃদয় প্রেমে জাগ্রত হইয়াছে, সে কখনও মরে না।
জগতপৃষ্ঠায় আমাদের অমরত্ব স্থির নিশ্চিত।" —হাফেজ।

কবিতা— এবং প্রকৃত কবিতা—মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম প্রবৃত্তিনিচয়কে জাগরিত এবং সম্মোহিত করে। সাহিত্য, প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক জাতির কিছু না কিছু আছে। কিন্তু মনে হয়, প্রকৃতি যেন পারশ্য দেশের প্রতিই এ বিষয়ে অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। পারশ্যের নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতি, নানা জাতীয় পুষ্প সৌরভে আমোদিত স্নিগ্ধ মধুর বসন্ত, গুল্মলতা সমাচ্ছন্ন সবুজ গিরিশ্রেণী, মৃদুমলয় পরশে ঈষদান্দোলিত শস্য শ্যামল প্রান্তর সমূহ, পল্লব-পুষ্পমালা-পরিশোভিত তরুরাজি, নির্ম্মল—খরস্রোত উৎস সমূহ, বিভিন্নবর্ণ পুষ্পে সজ্জিত সুরম্য উদ্যানরাজি, এবং প্রেমের জীবন্তমূর্ত্তি বুলবুলের মোহন তান—সৌন্দর্য্যোপাসনা-প্রবৃত্তি এবং কাব্য রচনা শক্তির উন্মেষের পক্ষে, ইহা অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত স্থান আর কি হইতে পারে? সম্ভবতঃ এই জন্যই পারশ্য কাব্যের এত সৌন্দর্য্য এবং এত উৎকর্ষ যে, জগতের কোন জাতির কবিতারই তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে না।

পারশ্য কাব্য-সাহিত্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কসিদা, মাসনভী এবং গজল ইত্যাদি। কসিদাতে সাধারণতঃ ব্যক্তি বিশেষের গুণকীর্ত্তন অথবা দোষবর্ণন হইয়া থাকে, মাস্‌নভীতে ঐতিহাসিক বিবরণ, পৌরাণিক উপাখ্যান এবং প্রেমিকদিগের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণিত হয় এবং গজলে কবি স্বীয় হৃদয়ের আশা, নৈরাশ্য ও সুখ দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই গজলই পারশ্য কাব্যের প্রাণ, এবং ইহাতেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব।

পারশ্য কবিদিগের মধ্যে গজল লেখকের সংখ্যা অনেক হইলেও সাদী, খেস্‌রো (খুসরু?) হাফেজ, ফোগাণী, জামী এবং সায়েব প্রভৃতির ন্যায় গজল লেখক—যাঁহারা নূতন নূতন ভাব ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া পারশ্য সাহিত্যকে সম্পদশালী করিয়া গিয়াছেন—খুব কম। ইঁহাদিগের মধ্যে আবার হাফেজই, অধিকাংশের মতে, সর্ব্বোচ্চস্থানের অধিকারী। ইউরোপীয় সাহিত্যিকগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, খাজা হাফেজের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী এবং প্রত্যুৎপন্নমতি কবি পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পারশ্য কাব্যের অন্যতম স্তম্ভ—মৌলানা জামী, খাজা হাফেজকে لسان الغیب (স্বর্গের বীণা) এবং ترجمان الاسرار (রহস্যোদ্ঘাটক) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ হাফেজ স্বর্গীয় প্রেমের সূক্ষ্মতম ভাবগুলি এবং আধ্যাত্মিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ, এরূপ সুন্দর এবং প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেন

যে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন স্বর্গীয় দূত আসিয়া কবির কাণে কাণে, এই কথাগুলি কহিয়া যাইতেছে ;—

کس چو حافظ نکشود از سر اندیشه نقاب
تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند !

"কবিতা সুন্দরীর প্রসাধনের পর, তাহার বিশ্ববিমোহন মুখ-চন্দ্রমা হইতে, হাফেজের ন্যায় বিচক্ষণতার সহিত অন্য কেহই অবগুণ্ঠন-উন্মোচন করিতে সমর্থ হন নাই।"

কবির নাম মোহাম্মদ, উপাধি সামসুদ্দীন এবং তাখাল্লোস (تخلص) হাফেজ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ নেহাবেন্দ নগরের নিকটবর্ত্তী সারকান নামক পল্লীতে বাস করিতেন। হাফেজের পিতামহ পল্লিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীরাজ নগরে আগমন করিয়া ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন, এবং স্বীয় অধ্যবসায় ও সততা গুণে অনতিকালের মধ্যে ঐশ্বর্য্য লাভ এবং জ্ঞানানুশীলনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন।

অনুমান ৭১৫ হিজরী সনে শীরাজ নগরে হাফেজের জন্ম হয়। তদানীন্তন প্রথানুযায়ী সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে কোরআন মজিদ কণ্ঠস্থ করিতে হইয়াছিল, তিনি অষ্টম বর্ষে কোরআন মজিদ সমাপ্ত করিয়া অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন, কিন্তু ফেকাঃ এবং তাফ্‌সীর শাস্ত্রের প্রতিই তাঁহার সমধিক অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। অধ্যাপক সমসুদ্দীন মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, তিনি হাফেজের পাঠানুরাগ এবং প্রতিভায় এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্বীয় উপাধিটী (সামসুদ্দীন) তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে হাফেজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শীরাজের শাসনকর্ত্তা শাহ আবুএস্‌হাকের রাজস্বসচিব, বিদ্যোৎসাহী কেওয়ামুদ্দাওলা তাগ্‌চী, হাফেজের জ্ঞান গরিমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া একটী উচ্চদরের মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া হাফেজকে উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে বরণ করিলেন। অনেকদিন যাবত হাফেজ এই বিদ্যালয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ফেকাঃ এবং তাফ্‌সীর শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে শীরাজনগরে খাজু নামে একজন ঋষিকল্প কবি বাস করিতেন। হাফেজ তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন, এবং প্রধানতঃ তাঁহারই উপদেশ এবং উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। উত্তরকালে হাফেজ কাব্য শাস্ত্রের সর্ব্ব-সম্মত গুরুরূপে সম্মানিত হইয়াও সর্ব্বদা সাধু খাজুকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।+

+ খাজুর প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ, ও গজলকাব্যে সাদীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিতেছেন ঃ—

استاد غزل سعدی ست پیش همه کس
دارد سخن حافظ طرز سخن خاجو

অর্থাৎ সাদীই গজল কাব্যের সর্ব্ববাদী সম্মত ওস্তাদ, কিন্তু হাফেজের কাব্যে খাজুর রচনার ভঙ্গিমা দেখিতে পাওয়া যায়। —সম্পাদক।

মহাত্মা সাদীর সময় পর্য্যন্ত পারস্য কবিতা সকল, কেবল প্রেমিকের আনন্দোচ্ছ্বাসে অথবা নিরাশ প্রণয়ীর তপ্তশ্বাসে পর্য্যবসিত ছিল। শায়েখ সাদী সর্ব্ব প্রথম পার্থিব ও স্বর্গীয় প্রেমের সমন্বয় এবং অধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহের বিশ্লেষণ পূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া দেশবাসীর হৃদয় তন্ত্রীগুলিকে নূতন সুরে বাজাইয়া তোলেন। খাজা হাফেজ যখন কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহার অল্পদিন পূর্ব্বে মহাকবি সাদীর মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সমগ্র দেশ সাদীর যশোগানে মুখরিত ছিল। সাদীর পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া তাঁহার কবিতার ন্যায় কবিতা লিখিতে সকলই চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাকবি অবলম্বিত প্রণালী যেরূপ মনোরম এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তাঁহার অনুসরণ এবং অনুকরণও সেইরূপ আয়াসসাধ্য ছিল। মহাকবি স্বয়ং তাঁহার নিম্নলিখিত কবিতায় এ বিষয় আভায দিয়া গিয়াছেন ঃ—

در کفے جام شریعت - در کفے سندان عشق
ہر ہوسناکے نداند جام و سندان باختن

এই জাম ও সেন্দানের খেলায় অথবা উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক কবিতা রচনায় যদি কেহ সাদীর সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তিনি খাজা হাফেজ। সাদীর অনুকরণে তিনি আধ্যাত্মিক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বলে অল্পদিনের মধ্যেই আধ্যাত্মিক কবিতার এই নব রোপিত চারা গাছটী, ফল-কুসুমিত প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইল, এবং সাদীর প্রতিষ্ঠিত সেই ক্ষুদ্র উদ্যানটী তখন নব পুষ্প পল্লবে মণ্ডিত হইয়া নন্দন কাননের শ্রী ধারণ করিল।

হাফেজের কবিতার রসাস্বাদনে সমগ্র দেশ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। পারস্যের বাহিরে অন্যান্য দেশেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিভিন্ন দেশবাসিগণ তাঁহাকে লাভ করার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, রাজন্যবর্গ তাঁহাকে রাজ কবি রূপে প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া উঠিলেন, এবং প্রধান প্রধান রাজ দরবারের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট অনুরোধপূর্ণ নিমন্ত্রণ আসিতে আরম্ভ হইল। কিন্তু এই কাব্যজগতের রাজা স্বদেশ ও স্বাধীনতা ছাড়িয়া কোন রাজ দরবারে যাইতে সম্মত হইলেন না।

বাগদাদের শাসনকর্ত্তা সোলতান আহমদ, হাফেজের কবিতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই গুণগ্রাহী সোলতান একবার তাঁহাকে বাগদাদ আগমন করার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি এই বলিয়া অব্যাহতি লাভ করেন যে—

گرچه دوریم بیاد تو قدح می نوشیم
بعد منزل نبود در سفر روحانی

"যদিও দূরে আছি, তথাপি তোমারই স্বাস্থ্য পান করিতেছি। আত্মার মিলনে শারীরিক দূরত্ব বাধা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।"

এসফেহানবাসিগণও বারম্বার তাঁহাকে আহ্বান করেন, কিন্তু কবি আপত্তি করিলেন যে—

نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر
نسیم گشت مصلی و آب رکنا باد

"মোসাল্লা উপবনের মৃদুমলয় এবং রোকনাবাদ উৎসের নির্ম্মল সলিল আমাকে অন্য স্থানে যাইতে অনুমতি দেয় না।"

দক্ষিণ ভারত হইতে সোলতান মাহমুদ বাঁহমণী হাফেজের নিকট নজর স্বরূপ কিছু স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে পদার্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন, সোলতান মাহমুদের বিদ্যানুরাগী মন্ত্রী মীর ফজলুল্লাহ হাফেজের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। বন্ধুর অনুরোধে এবং সোলতানের আগ্রহাতিশয্যে কবি দাক্ষিণাত্যে আগমন করিতে সম্মত হইলেন। মহাকবিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সোলতান একখানি সুসজ্জিত জাহাজ প্রেরণ করেন। হোরমোজ বন্দরে হাফেজ এই জাহাজে আরোহণ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজ উপকূল ছাড়িয়া অধিক দূরে অগ্রসর না হইতেই ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হইল। জাহাজ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াও দৈবক্রমে রক্ষা পাইল। হাফেজ তীরে অবতরণ করিলেন, এবং ভারত আগমনেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ফজলুল্লাহর নিকট একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহার একটী শ্লোক এইরূপ:—

بس آسان می نمود اول غم دریا ببوی سود
غلط گفتم که هر موجش بصد گوهر نمی ارزد

"লাভের আশায় সমুদ্রের কষ্ট প্রথমে খুব সহজ মনে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা আমার ভ্রম, সমুদ্রের একটী তরঙ্গ শত মুক্তার বিনিময়েও মহার্ঘ।

বঙ্গাধিপতি সোল্‌তান গেয়াসউদ্দিনও কবিকে আনয়ন করিবার জন্য বিশ্বাসী ভৃত্য ইয়াকুতকে শীরাজ নগরে পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু খাজা সাহেব আগমন করেন নাই। কেবল একটী উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহার একটী বয়েৎ এখানে উদ্ধৃত হইল:—

شکر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله میرود

"এই পারস্য মিষ্টান্নের (যাহা বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়াছে) রসাস্বাদন করিয়া ভারতীয় তোতাকুলের (কোকিল কুলের ?) কণ্ঠ মধুর হইবে।

খাজা হাফেজ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একজন কৈশোরের প্রারম্ভেই পিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যান। দ্বিতীয় পুত্রের নাম শাহ্‌ নো'মান ছিল। ইনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বোরহানপুর নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। বোরহানপুর দুর্গে এখনও ইহার সমাধি মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিজরী ৭৯১ সনে, ৭৬ বৎসর বয়সে অমর কবি হাফেজ এই মরলোক পরিত্যাগ করিয়া অমর লোকে প্রস্থান করেন। মোসল্লার উপবন এবং রোকনাবাদের প্রস্রবণ তাঁহার অতিশয় প্রিয় স্থান ছিল। তিনি বলিয়াছেন :—

بده ساقي مے باقي که در جنت نخواهي يافت
کنار آب رکنا باد و گلگشت مصلى را

হে সাকী! অবশিষ্ট মদিরাটুকুও দান কর; মোসাল্লার কুঞ্জবন এবং রোকনাবাদের প্রস্রবণ (এর ন্যায় মদিরা পান করিবার উপযুক্ত স্থান) স্বর্গেও তুমি পাইবে না।

মৃত্যুর পর ভক্তগণ তাঁহাকে এই উপবনেই সমাহিত করেন—

ع قبر بلبل کي بنے گلزار ميں

মোসাল্লা উদ্যানের যে অংশে তাঁহার মজার রহিয়াছে, অদ্যাবধি তাহা হাফিজিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, তাঁহার প্রিয়তম "খাকে মোসাল্লা" (خاک مصلى = ৭৯১) হইতেই তাঁহার মৃত্যুর তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একজন সমসাময়িক কবি এ বিষয়ে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিয়াছেন :—

چراغ اهل معني خواجه حافظ * که شمع بود از نور تجلى
چو در خاک مصلى ساخت منزل * بجو تاريخش از خاک مصلى (৭৯১)

হিজরী ৮৫৫ সনে সম্রাট বাবর শাহের মন্ত্রী মৌলানা মোযাম্মায়ী কবির সমাধি মন্দিরের উপর একটী সুন্দর গুম্বজ নিম্মাণ করাইয়া দেন। করিম খাঁ জেন্দ তাঁহার শাসন কালে মোসাল্লা তপোবনের সংস্কার করেন এবং তথায় দরবেশ (ব্রহ্মচারী) দিগের অবস্থান করিবার সুবিধার জন্য একটী আশ্রমও প্রস্তুত করিয়া দেন। তিনি একখণ্ড সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরের উপর একটী কবিতা উৎকীর্ণ করাইয়া সমাধি মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা কবিতার মাত্‌লা (প্রথম শ্লোক) টী পাঠক বর্গকে উপহার দিলাম।

مژده وصل تو کو کز سر جان برخيزم
طاير قدسم و ز جان جهان برخيزم

মহা কবি রচিত কবিতাবলির সমালোচনা করার উপযুক্ত যোগ্যতার একান্ত অভাব হেতু আমি সেরূপ ধৃষ্টতা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম। যোগ্যতম ব্যক্তি এবিষয়ে লেখনী ধারণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। *

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল বাকী।

* মাওলানা আস্‌লাম জয়রাজপুরী প্রণীত হয়াতে হাফেজ নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

ধর্ম্ম ও নীতি।

পাশ্চাত্য দেশে জড়বাদমূলক সভ্যতার প্রচলনে জনসাধারণের, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। কেহ কেহ একেবারে নাস্তিক হইয়াছেন, আবার কেহ কেহ যদিও ঈশ্বরবাদী বা আস্তিক আছেন, তাঁহাদেরও কিন্তু ধর্ম্ম বিশেষের উপর কোন আস্থা নাই। অধুনা প্রাচ্যদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হওয়ায়, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মরীতি বা ধর্ম্মবিধিব্যবস্থা পালন করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যে, নৈতিক জীবন যাপন করিলেই যথেষ্ট হইল, ধর্ম্মবিশেষের অনুসরণের কোন আবশ্যকতা নাই। যাঁহাদের এই প্রকার ধারণা, তাঁহারা যে নিশ্চয়ই মন্দ লোক, এরূপ কথা বলা যায় না; বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ সৎলোক, এবং চরিত্রের দিক্ দিয়া দেখিলে, যাঁহারা ধর্ম্মবিশেষের নিষ্ঠাবান অনুগামী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নৈতিক ভাবে সৎ হন, এবং যদি তিনি মানবজাতি এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট অন্যান্য জীবের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন, তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মবিশেষের অনুকরণ করুন আর না'ই করুন, তাহাতে বিশেষ দায় আসে না। দয়াই ধর্ম্ম এবং ইহাপেক্ষা মহত্তর আর কোন কর্ত্তব্য নাই। এই যুক্তি যে একেবারে দুর্ব্বল নহে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তত্রাচ তাঁহাদের এই মত সমর্থন করিতে অক্ষম। ধর্ম্মবিচ্যুত নীতির উপর, জাতীয় জীবন গঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে। অবশ্য এরূপ অনেক নীতিবান ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা প্রত্যেক সৎকর্ম্ম সমাধা করিতে প্রস্তুত, কারণ তাঁহাদের নীতিজ্ঞানই তাঁহাদিগকে সেই দিকে পরিচালিত করিতেছে; আবার কার্য্য বিশেষের সংশ্রবে যাইতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ, কারণ তাঁহারা জানেন যে, নীতির হিসাবে উহা অন্যায়। কিন্তু তাঁহারা ভাবেন না যে, যাঁহারা সৎশিক্ষা দ্বারা এবং আত্মসংযম ও আত্মদমন অনুশীলন করিয়া সাধারণ লোক হইতে এক স্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই অনেক স্থলে * এইরূপ ন্যায় এবং অন্যায়ের সারভাগ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম, সাধারণের পক্ষে উহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং পৃথিবীর অধিকাংশ

* সদাসৎ ও ন্যায়ান্যায়ের বিচারভার মানুষের বিবেকের উপর ন্যস্ত করা কখনই নিরাপদ হইতে পারেনা। বাহ্যিক ইন্দ্রিয় গুলিই আমাদের জ্ঞানাহরণের একমাত্র উপকরণ। এই উপকরণগুলি নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ, এবং শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার জড়তা ও আবিলতার অধীন; অধিকন্তু প্রতিবেশ জলবায়ু, পারিপার্শ্বিক রুচি এবং জন্ম ও বংশগত সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য একজন পণ্ডিত যে কার্য্যকে আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে আদর্শনীতি বলিয়া মনে করিতেছেন, অন্য একজন পণ্ডিত আবার তাহাকে নীতি-হীনতার চরম আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। এক দেশের দুর্নীতি, অপর দেশে সুনীতিসম্মত পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই নিমিত্ত এমন একটী মানযন্ত্রের আবশ্যক, যদ্দ্বারা আমরা এই সকল বৈষম্যের

লোকের উপর ধর্ম্মের যে প্রতিপত্তি হইতে পারে ও আছে, নীতি তাহার এক কণা মাত্রও অধিকার পাইতে পারে না। ধর্ম্মকে যথন নীতি হইতে পৃথক করা যায়, তথন ধর্ম্মানুসারে আমাদের করণীয় কি হয়? বিধাতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের অভিপ্রায়, তাঁহার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের যে সমস্ত কর্ত্তব্য, সেই সমস্ত পালনই তথন আমাদের একমাত্র করণীয় হইয়া দাঁড়ায়, এবং ধর্ম্ম আমাদের দ্বারা তাহা করাইয়া লয় বলিয়া, ধর্ম্মই মানবের কার্য্য ও চিন্তাকে একটা নির্দ্দিষ্ট আকার প্রদান করে। ঈশ্বরের আদেশ যেমন মানবের অন্তঃকরণ স্পর্শ করে, এমন আর কিছুতেই করে না। নীতিশাস্ত্র, কাহারও নিকট সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইলেও, কথনই সর্ব্বসাধারণের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিবিশেষের নিকট বা স্থলবিশেষে যাহা নীতিসঙ্গত, তাহাই আবার অন্যত্র নীতিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইতে দেখা যায়। ন্যায় ও অন্যায়ের অন্তর্জ্ঞাত বা স্বাভাবিক জ্ঞানকে নীতিজ্ঞান (moral sense) বলে, কিন্তু একদল দার্শনিক এরূপ জ্ঞানের অস্তিত্বেই সন্দেহ করিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া কেবল নীতিশাস্ত্র দ্বারাই পৃথিবী চালিত হইতে পারে, ইহা তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিয়া লইলেও, যাহার দ্বারা মানবজাতি চালিত হইতে পারে, সেইরূপ সমভাববিশিষ্ট নীতিশাস্ত্র আমরা কোথায় পাইব? ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পূর্ণতায়, মানবের নিকট দৈববাণী দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশে, তাঁহার আদেশ পালনে মানবের বাধ্যতায়, পুরস্কার ও শাস্তির অবস্থায় এবং ঈশ্বরের নিকট মানবের দায়িত্বে বিশ্বাস এবং অন্যান্য নৈতিক কর্ত্তব্যের অনুশীলন সহ ধর্ম্ম-পরায়ণতা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ব্যাপকভাবে (in a comprehensive sense) ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, এইরূপ বিশ্বাসই সমূহ মানবজাতিকে পাপ হইতে দূরে রাখিতে পারে। কিন্তু একজন নিয়ন্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া এবং তাঁহার ইচ্ছা বা আদেশের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া, কেবল নৈতিক কর্ত্তব্যের অনুশীলন কয়জন লোকের পক্ষে সম্ভবপর? যে কয়জন,

---

মধ্য হইতে প্রকৃত নীতির উদ্ধার সাধন করিতে পারি। ঐ যন্ত্রের কলকব্জাগুলি আবার উল্লিখিত দোষ-ত্রুটী বিবর্জ্জিত হওয়া চাই। এই মানযন্ত্রের নামই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম নির্দ্দোষ এবং বর্ণিত জড়তা ও আবিলতা পরিবর্জ্জিত; কারণ, পূর্ণজ্ঞান বিধাতাই তাহার নিয়ন্তা।

পক্ষান্তরে একইজন মানুষ নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক বিকারের বশীভূত হইয়া, বিভিন্ন সময় পরস্পর বিরোধী কার্য্যগুলিকে তাহার পক্ষে নীতি-সম্মত ও করণীয় কর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইহাদ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রকৃত নীতি-সম্মত কর্ম্মের নির্দ্ধারণ ও নির্ব্বাচনের জন্য, মানবীয় জ্ঞান ও বিবেকের উপর কথনই আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে না। ইহার জন্য আবিলতা ও বিকার শূন্য একটী পূর্ণ জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক, নচেৎ মানুষ "সৎশিক্ষা দ্বারা" যতই "আত্মসংযম ও আত্মদমন অনুশীলন" করুক না কেন, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তাহার পদস্খলন হইবার আশঙ্কা। সেই সর্ব্বদর্শী পূর্ণজ্ঞান বিধাতার নির্দ্দেশের নামই ধর্ম্ম। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কোন মানুষই কোন অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে নীতিপরায়ণ হইতে পারেনা।

—সম্পাদক।

মানুষের সাধারণ গণ্ডি ছাড়াইয়া বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই পক্ষে, এবং তাহাও স্থলবিশেষে, সর্ব্বত্র নহে। অতএব ধর্ম্মের আবশ্যকতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। ধর্ম্মই জগৎকে রক্ষা করে—ইহা না থাকিলে বিশ্বমণ্ডল বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত। সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া "ধর্ম্ম" এই পদ সাধিত হইয়াছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ বা প্রতিপালন করা। ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ—"যে, সকল মনুষ্যকে প্রতিপালন করে।" অতএব ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ধর্ম্ম না হইলে পৃথিবী চলিতে পারে না। আরবী "দীন" دین শব্দের বুৎপত্ত্যর্থ—বাধ্য করা, শাসনকরা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদি। ধর্ম্মের অনুশাসনে মানুষ পৃথিবীর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া থাকে বলিয়া, তাহার নাম "দীন"।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, মানবজাতির প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মের আবশ্যক ছিল, কিন্তু যখন হইতে মানুষ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তখন হইতে ধর্ম্মের আর কোন আবশ্যক নাই। তর্কের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জগতের সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত কোন দেশবাসী লোক, নীতির এরূপ উচ্চ সোপানে উপনীত হন নাই যে, তাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের বা পরকালের শাস্তির ভয়ে অথবা অন্য কোন পার্থিব আশা বা আশঙ্কায় নহে। যখন এত দীর্ঘকালের মধ্যে একটী মাত্র দেশও সেরূপ অবস্থায় পৌঁছিতে পারে নাই, তখন সেরূপ অবস্থা যে কখনও আসিতে পারে, তাহা কি প্রকারে আশা করা যায়? আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যে সমস্ত লোক শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা নৈতিক হিসাবে আদর্শ মানুষ হইয়াছেন, ধর্ম্মের গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করা তাঁহাদের নিমিত্ত অনাবশ্যক, এবং ধর্ম্মের বিধি ও অনুষ্ঠান তাঁহারা উপেক্ষা করিলে কোন ক্ষতি নাই। এরূপ পথ অনুসরণের কেহ বাস্তবিক পক্ষপাতী হইতে পারেন কিনা, জানি না। যাঁহাদের দেখিবার মত চক্ষু আছে, এবং বুঝিবার মত মেধা আছে, উহাতে যে কত ক্ষতি, তাহা তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। শিক্ষিত শ্রেণীর মতামত ও মনোভাব ক্রমে ক্রমে সাধারণ লোক দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে, এবং শিক্ষিত শ্রেণীর উদাহরণই তাহাদিগের দ্বারা অনুসৃত হইয়া থাকে। শিক্ষিত শ্রেণীর আদর্শ চরিত্রের লোক, যদি তাঁহাদের কার্য্য ও আচরণ দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, ধর্ম্মবিশেষের অনুসরণ অনাবশ্যক, তাহা হইলে তাহার পরিণাম যে কি হইতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য।† যাহারা স্বাধীনতা

† এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মানুসরণের মূল উদ্দেশ্যগুলি উত্তমরূপে বুঝিয়া দেখিতে হইবে। নীতিপরায়ণ হওয়া ধার্ম্মিকের লক্ষ্য নহে—উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য হইলেও উহা তাহার উদ্দেশ্য নহে। সে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই উপলক্ষ্য গুলির আশ্রয় গ্রহণ বা ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সেটা মানবের আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং খোদাওন্দের رضوان রেজওয়ান। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, মানবের করণীয় কর্ম্মগুলিকেই, বিধিবদ্ধ ভাবে একটী সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন করিবার জন্য ধর্ম্মের পক্ষ হইতে কতকগুলি ক্রিয়া কলাপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা সময়ে ও যথা নিয়মে এই পদ্ধতিগুলির অনুসরণ না করিলে ঐ উদ্দেশ্য সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ এই ক্রিয়া কলাপগুলির দ্বারাই আধ্যাত্মিক ভাব সমূহের

ও স্বেচ্ছাচারিতার পার্থক্য বুঝিতে অক্ষম, তাহাদের নিকট ইহার ফল কি হইতে পারে? যাঁহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে তিনি কখনও এরূপ পথানুসরণের সমর্থন করিবেন না, এবং আমাদের বোধ হয়, দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মকে নীতির বেদীতে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইবেন না। উপরে দেখান হইয়াছে যে, নীতি ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ধর্ম্ম নীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। যখন ধর্ম্মের পরাক্রম সাধারণ লোকের উপর অনেক অধিক, এবং যখন নৈতিক কর্ত্তব্যানুশীলনের মূল্য কেবল একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা অনুমিত হইতে পারে, তখন ধর্ম্মের স্থলে নীতিকে রাখিবার চেষ্টা, কিম্বা নীতির অনুসরণ করিলে ধর্ম্মকে উপেক্ষা করা যায়, এরূপ বিশ্বাস যাহাতে সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইতে পারে—এরূপ আচরণ করা, একান্ত অবাঞ্ছনীয় ও যুক্তিবিরুদ্ধ। ধর্ম্ম ও নীতিকে যথাক্রমে দেশ বিশেষের সাধারণ আইন ও আন্তর্জাতিক (International) আইনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। দেশের আইন ভঙ্গ করিলে যেমন তাহার ফলে শাস্তি ভোগ করিতে হয়, তেমনই ধর্ম্মের বিধান পালন না করিলে পরকালে দায়ী হইবার ভয় আছে। নীতি ও আন্তর্জাতিক আইন একই শ্রেণিভুক্ত। ভঙ্গ বা পালন না করিলে বিবেকের নিকট অবশ্যই দায়ী হইতে হয়, কিন্তু সেই দায়িত্বের ভয়ে অন্যায় হইতে বিরত হইতে কয়জনকে দেখা যায়? যদি সে ভয় সাধারণতঃ কার্য্যকরী হইত, তবে আজ ইউরোপে আন্তর্জাতিক আইনের অবমাননা এবং এই মহাবিপ্লব দেখিতে হইত না। আন্তর্জাতিক আইনের পশ্চাতে যদি আন্তর্জাতিক সেনা (International army) থাকিত, তাহা হইলে উহার এরূপ অবমাননা হইত না। ধর্ম্মের এক অংশে বিধান, অপর অংশে উহার ভঙ্গে শাস্তি। জনসমাজে ধর্ম্ম একপ্রকারে আন্তর্জাতিক সৈন্যের কার্য্য করে; নীতি তাহা পারেনা। নীতি কেবল আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায়, বিধান দিয়াই ক্ষান্ত, উহার পালন না করিলে কোন প্রাকৃতিক শাস্তি নাই। সুতরাং সাধারণের উপর উহার বন্ধন শিথিল। যাঁহারা তত্রাচ বলিবেন যে, মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মানবজাতিকে চালিত করিবার জন্য ধর্ম্মের বিধি অনাবশ্যক এবং কেবল নীতিই যথেষ্ট, তাঁহাদিগের জন্য মিষ্টার এচ্, ডান্‌লপ নামক জনৈক ইংরাজ লেখকের "Appeal to the Anglo-Saxon World" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিতে চাই :—

বিকাশ ও ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। পরন্তু নিয়ম ও সময়ের গণ্ডির বাহিরে গিয়া কোন লোককেই যথাযথ ভাবে এবাদৎ ও উপাসনা সম্পন্ন করিতে দেখা যায় না, কারণ তাহা অসম্ভব। যাঁহারা মুখে এরূপ দাবী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া থাকেন? আলস্য ও অবহেলা মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। এইজন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার আবশ্যক। বিভিন্ন স্তরের লোকের বিষম অবস্থাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সকলের পক্ষে সমভাবে ব্যবহার্য্য হইতে পারে, এইরূপ কতকগুলি ক্রিয়া ও ক্রিয়া পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, সাধারণ সমাজের দুর্গতির চিন্তা নিরপেক্ষ হইলেও, ঐ তথা কথিত উন্নত মানবগণকে সর্ব্বদা ও সকল অবস্থায় এবাদৎ সংক্রান্ত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে।

—সম্পাদক।

"Human nature has not changed, but its most brutal instincts have been driven together, behind a fence, and that fence is of the Law, and it is held by the power of the Law, which is the police."

(অর্থাৎ, মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু উহার পাশবিক বৃত্তিগুলিকে একটা বেড়া বা প্রাচীরের পশ্চাতে বিতাড়িত করা হইয়াছে,—আইন সেই বেড়া, আইনের ক্ষমতার দ্বারা উহা সংরক্ষিত হয়, এবং সেই ক্ষমতাটী কি ?—পুলিস।) নৈতিক জগতে ঠিক্ এইরূপ ধর্ম্মের বেড়া আবশ্যক এবং সেই বেড়া সংরক্ষণের জন্য পরকালের ভয় বা পুলিস আবশ্যক। দেশ শাসন যেমন আইন অভাবে চলিতে পারেনা এবং আইন না থাকিলে দেশ যেমন অরাজক হয়, ধর্ম্ম ব্যতিরেকে জগতও ঠিক সেইরূপই হইবে।

সুখানুসারিতা মতেই (from utilitarian point of view) ধর্ম্মের আবশ্যকতা বিশেষ-ভাবে প্রতিপন্ন করা হইল; অন্যান্য দিক হইতে দেখিলেও ধর্ম্মের অনুসরণ যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা দেখাইবার, বোধ হয়, আর আবশ্যকতা নাই। কারণ এই জড়বাদমূলক মতের প্রাদুর্ভাবের দিনে বস্তুবিশেষের উপকারিতা অনুসারে মূল্য নিরূপণ করা হয়। ধর্ম্ম নীতি অপেক্ষা অধিকতর উপকারজনক, ইহা যদি আমরা দেখাইতে সক্ষম হইয়া থাকি, তাহা হইলে বোধ হয় ধর্ম্মের প্রকৃত গুণ সম্বন্ধে লিখিয়া এ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করার আর কোন প্রয়োজন নাই। এসলামে "শরিয়াৎ" বলিলে যাহা বুঝা বুঝায়, এই প্রবন্ধে ধর্ম্ম সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি ওয়াশিংটন ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইল। তিনি বলিয়াছেন ;—

"Let us with caution indulge the supposition
that morality can be maintained without religion."

অর্থাৎ, ধর্ম্ম ব্যতীত নীতি যে রক্ষা করা যাইতে পারে, আমরা যেন সতর্কতার সহিত এরূপ কল্পনার প্রশ্রয় দান করি।

মুজাবর রহমান।

বাঙ্গালায় মুসলমান জাতির জনবহুলতা।

কিঞ্চিদধিক সাড়ে পাঁচশত বৎসর কাল মুসলমান শাসনাধীনে থাকিবার ফলে সুবিশাল ভারতবর্ষে মুসলমান জাতির বসবাস সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে অন্যান্য জাতির অনুপাতে বাঙ্গালা দেশে যত অধিক পরিমাণে মুসলমানদিগের বসতি স্থাপিত হইয়াছে, পাঞ্জাব ব্যতীত এই রাজ্যের অন্য কোন প্রদেশেই তত অধিক দৃষ্ট হয় না। এমন কি, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান এবং তুর্কীস্থান প্রভৃতি মুসলমান প্রধান রাজ্যগুলির নিতান্ত সন্নিহিত পাঞ্জাব প্রদেশও এবিষয়ে সুদূরবর্ত্তী বঙ্গভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। * নানাবিধ শস্য-সম্পদের উপযোগী সমতল ক্ষেত্রের প্রচুরতা, অল্পায়াসে শস্যোৎপাদন এবং সর্ব্বোপরি শীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যবস্থার তীব্রতার অভাব, অর্থাৎ আব হাওয়ার নাতিশীতোষ্ণতা জনিত জীবন যাত্রার সুগমতাই, বোধহয়, বাঙ্গালাদেশে এত অধিক পরিমাণে মুসলমান জাতির বসতি বিস্তারের কারণ। †

সে যাহা হউক, সমগ্র ভারতের মুসলমান সংখ্যা একুনে যত হইবে, তাহার কিঞ্চিদধিক তৃতীয়াংশ এই বাঙ্গালা দেশেই অবস্থান করিতেছে। হিন্দু প্রভৃতি জাতিই সর্ব্বাধিক প্রাচীন কাল হইতে এতদ্দেশের প্রধান অধিবাসীরূপে বসবাস করিতে থাকিলেও, এই কয়েক শত বৎসরের মধ্যে মুসলমান জাতির জনসংখ্যা আশাতিরিক্ত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ইতিমধ্যেই বিপুল হিন্দু-জন-সংখ্যাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। স্থানান্তরে এই বাঙ্গালা দেশের

---

* বিগত 'আদম-শুমারীর' তালিকা অনুযায়ী খাস বাঙ্গালার মুসলমান সংখ্যা দুইকোটী বিয়াল্লিশ লক্ষের উপর; কিন্তু পাঞ্জাবের মুসলমান সংখ্যা ন্যূনাধিক সওয়া কোটী মাত্র। ভারতীয় প্রদেশ সমূহের মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে এই বাঙ্গালা দেশই প্রথম এবং পাঞ্জাব প্রদেশ দ্বিতীয় স্থানীয় বলিয়া গণনীয়।

† ভারতবর্ষের সুদূর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত এই বাঙ্গালা দেশে এত অধিক পরিমাণে মুসলমান জাতির বসতি বিস্তার বাস্তবিকই কৌতূহল জনক। এসম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। বাবু রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কোন কোন ইতিহাস লেখক বলেন যে, বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের নীচ জাতীয় হিন্দুদিগের উপর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণার্থে অতিমাত্রায় বল প্রয়োগই এতদঞ্চলে এত অধিক পরিমাণে এস্লাম ধর্ম্মের বিস্তৃতি লাভের কারণ। আমরা কিন্তু তাঁহাদের এরূপ যুক্তির সারবত্তা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যেহেতু, তাঁহারা এ বিষয় এযাবত কোনই উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থাপিত করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, এতদ্দেশে মুসলমান সমাজের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি প্রসঙ্গে যে সমস্ত যুক্তি সঙ্গত কথার অবতারণা করা হইয়াছে, প্রিয় পাঠকবর্গ অন্য প্রবন্ধে তাহার সবিশেষ আলোচনা দেখিতে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে জোনাব দেওয়ান ফজলে রব্বি সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত "The Origin of the Mussalmans of Bengal" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

'আদম-শুমারীর' যে ধারাবাহিক তালিকা সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে প্রিয় পাঠকবর্গ বুঝিতে সক্ষম হইবেন যে, এতদ্দেশে মুসলমান-জন-সংখ্যা কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজপুরুষগণ কর্তৃক সর্ব্বপ্রথমে এদেশের লোক সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা হয়। অতঃপর প্রত্যেক দশবৎসর পরে পরে এতদ্দেশবাসী হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতির লোকদিগের সংখ্যা গণিত হইয়া আসিতেছে। রাজপুরুষেরা গণনা ও তুলনা এই দুইটী বিষয়ের সুবিধার নিমিত্ত এই বাঙ্গালা দেশকে নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথাঃ— পশ্চিম বঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ। এই বিভাগ চতুষ্টয়ের মধ্যে বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি ও হাওড়া জিলা লইয়া পশ্চিম বঙ্গ। চব্বিশ পরগণা (কলিকাতা সমেত), নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও খুলনা জেলা লইয়া মধ্যবঙ্গ। রাজসাহী, বগুড়া, মালদহ, পাবনা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলা লইয়া উত্তরবঙ্গ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল নোয়াখালি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা (কুমিল্লা) প্রভৃতি জেলা লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ গঠিত।

বাঙ্গালার আদম-শুমারীর রিপোর্ট অনুসারে উপরোক্ত বিভাগ চতুষ্টয়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের (বর্দ্ধমান বিভাগের) সমগ্র অধিবাসীর ষষ্ঠাংশ মাত্র মুসলমান; অর্থাৎ ঐ বিভাগে প্রতি পাঁচজন হিন্দু অধিবাসীর অনুপাতে একজন মাত্র মুসলমান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অপরাপর বিভাগত্রয়ের মধ্যে যথাক্রমে মধ্যবঙ্গের (প্রেসিডেন্সী বিভাগের) হিন্দু-জন-সংখ্যা প্রায় সমানাংশ; উত্তর বঙ্গের (রাজসাহী বিভাগের) হিন্দুর সংখ্যার দেড়গুণ, এবং পূর্ব্ববঙ্গের (ঢাকা চট্টগ্রাম বিভাগের) হিন্দু সংখ্যার কিঞ্চিৎ অধিক দ্বিগুণ মুসলমান অবস্থিতি করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এতদ্দেশের লোক সংখ্যার যে তালিকা (Census Reports) প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে বাঙ্গালাদেশবাসী মুসলমানদিগের যেরূপ বংশবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে, তাহা নিতান্তই অসাধারণ। এতৎসম্বন্ধে আমরা ১৮৯১ সনের আদম-শুমারীর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিতেছি।

"It is statistically proved that since 1872 out of every 10,000 persons, Islam has gained 100 persons in Northern Bengal, 262 in Eastern Bengal, and 110 in Western Bengal, on an average 157 in the whole of Bengal proper. The Mussalman increase is real and large. If it were to continue, the faith of Mohammed would be universal in Bengal proper in six and half centuries, whilst Eastern Bengal would reach the same condition in about four hundred years * * * Nineteen

years ago, in Bengal proper, Hindoos numbered nearly half a million more than Mussalmans did, and in the space of less than two decades, the Mussalmans have not only overtaken the Hindoos but have surpassed them by a million and a half."

Census Reports of India, 1891.

উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ :— "১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালার লোকসংখ্যা গণনা ও তুলনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক দশ সহস্র লোকের মধ্যে ১০০ জন করিয়া উত্তর বঙ্গে, ২৬২ জন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে, এবং ১১০ জন করিয়া পশ্চিম বঙ্গে অথবা সমগ্র বঙ্গে গড়পড়তা ১৫৭ জন করিয়া মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বৃদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। মুসলমান-দিগের বর্দ্ধনশীলতা প্রকৃতই অত্যধিক। যদি এইরূপেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম খাস বাঙ্গালার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে পরিব্যাপ্ত হইতে সাড়ে ছয়শত বৎসর লাগিবে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের তাদৃশ অবস্থা হইতে আরও কম সময়ের দরকার; মাত্র চারিশত বৎসরের মধ্যে উহা সংঘটিত হইবার সম্ভবনা। * * * উনিশ বৎসর পূর্ব্বে খাস বাঙ্গালায় হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যা হইতে প্রায় পাঁচ লক্ষ অধিক ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কুড়ি বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ, হিন্দুদিগের সহিত তুলনায়, তাহাদের ন্যূনসংখ্যা পূর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং পনের লক্ষ অধিক হইয়া পড়িয়াছে।"

যাহা হউক, ইহা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম-শুমারীর অবস্থা। বিগত ১৯১১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ক অবস্থা অবগত হইতে বোধ হয় অনেকেরই আগ্রহ হইতে পারে; তাই নিম্নে আমরা বিগত আদম-শুমারীর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়া প্রিয় পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কালের মধ্যে, বঙ্গের হিন্দু-সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, মুসলমান বৃদ্ধির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বেশী। সমগ্র বঙ্গে হিন্দুরা বাড়িয়াছে—শতকরা ৩·৯ অর্থাৎ প্রায় চারিজন; আর মুসলমান বাড়িয়াছে, শতকরা ১০·৪ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে দশজন, এতদ্দ্বারা মুসলমানদিগের বৃদ্ধির পরিমাণ বোধগম্য হইতেছে। বাঙ্গালা দেশের মুসলমান অধিবাসীদিগের এতাদৃশ দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে কয়েক শত বৎসরের মধ্যে যে এদেশ একটা মুসলমান প্রধান দেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে, ১৮৯১ সনের আদম-শুমারীর মন্তব্য লেখক তাহা বিশদরূপেই দেখাইয়াছেন। এতদৃষ্টে প্রতিবেশী হিন্দু জাতির মনোমধ্যে যে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের মধ্যে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এসম্বন্ধে সংবাদপত্র সমূহে প্রবন্ধ লিখিয়া, কেহ বা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া, বঙ্গীয় হিন্দু জাতির পরিণাম আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।* কিন্তু

* কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রণীত "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য

তাই বলিয়া বাঙ্গালার হিন্দুগণ যে ধ্বংস পথে অগ্রসর হইতেছেন, একথা বলাও সমীচীন নহে। তাঁহাদের সংখ্যাও যে বৃদ্ধি পাইতেছে, পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত বঙ্গের আদম-শুমারীর ধারাবাহিক তালিকা দৃষ্টেই তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে।

যাহা হউক, বাংলাভাষাভাষী লোকেরা প্রধানতঃ যে প্রদেশে বসবাস করিতেছে, তাহা সাধারণতঃ খাস বাঙ্গালা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। নব প্রতিষ্ঠিত গভর্ণর্ বাহাদুরের শাসনাধীনে বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি এই ভাবেই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এই জেলাত্রয় সম্বন্ধে উপরোক্ত ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যেহেতু উপরোক্ত জেলাত্রয়ের অধিবাসিগণ বাঙ্গালাদেশপ্রচলিত বাঙ্গালা ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে আসামবাসীদিগের সামিল করা হইয়াছে। অথচ তাঁহারা সামাজিকতার হিসাবেও বাঙ্গালা দেশবাসী হিন্দু মুসলমানদিগের সহিতই অধিকতর সম্পর্কিত রহিয়াছেন।

অতঃপর নিম্নে আমরা লোক সংখ্যা গণনা বিভাগের অধ্যক্ষ মিষ্টার গেট কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বিগত 'আদম-শুমারী' গুলির ধারাবাহিক তালিকা সংযোজিত করিয়া দিতেছি, ইহাতে পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বাঙ্গালা দেশের বিভাগগুলির জন সংখ্যা পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রত্যেক বিভাগের মুসলমানদিগের ক্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি উপলব্ধি হইতে পারিবে। এই সংখ্যার সহিত নবগঠিত বাঙ্গালাপ্রেসিডেন্সির বহির্ভাগে উপরোক্ত জেলা গুলির মুসলমান সংখ্যা সংযোজিত হইলে, বাঙ্গালাভাষা-ভাষী মুসলমান সমাজের জন-সংখ্যা যে আরও বর্দ্ধিত দৃষ্ট হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু আসাম প্রদেশভুক্ত উপরিলিখিত জেলা সমূহে বাঙ্গালা ভাষাভাষী মুসলমানগণের সংখ্যা বিশ লক্ষেরও অধিক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

মিষ্টার গেট কর্ত্তৃক প্রকাশিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিভাগ চতুষ্টয়ের আদম শুমারীর ধারাবাহিক তালিকা।

খৃষ্টাব্দ	১৮৭২		১৮৮১		১৮৯১		১৯০১		১৯১১	
প্রদেশের নাম	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
পশ্চিম বঙ্গ	৬২১৬০৬০	৯২৯৩৯১	৬২০৭৪০৯	৯৫৮৪২৯	৬৪০০৩৪০	৯৯৯১৯১	৬৮৫৫১৬৪	১০৮৪৮২০	৬৯৭১১৬০	১১৩৮০৫২
মধ্য বঙ্গ	৩৩৩৪৭২৬	৩১৫৭০২৬	৩৫৬৪৫৮৪	৩৫১২৮৯৩	৩৬৭৮৭৯২	৩৬১০১৬৬	৩৮৮৩৩৬৭	৩৭৭৩৩২১	৪০৮৪৬১৭	৩৮৮৪৯৫৭
উত্তর বঙ্গ	৩৬৭৯৯১১	৫৫৭২১৮৮	৩৬২৩৬৪৪	৫৩৮৩৩৮৯	৩৭১৯৮৭২	৫৫৭৯৪৪৫	৩৯৩৮৫২৬	৫৮৭৬৪০৮	৪০১১৬৩৩	৬৩৬০০৩৭
পূর্ব্ব বঙ্গ	৪৮৬৯৭৩৪	৭৯৫০৫৩০	৪৬৭৩৭১৫	৮৫৪১৪০৬	৫১৫৬৯৮৪	৯৯৮৫৭৮১	৫৫১৪০২৫	১১২২০৪২৭	৫৪৭৭৯৬৯	১২৮৫৪১৮০
একুন	১৮১০০৪০১	১৭৬০৯১৩৫	১৮০৬৯৩৫২	১৮৩৯৬১১৭	১৮৯৭৫৯৭৮	২০১৭৪৫৯৩	২০১৯১০৮২	২১৯৫৪৯৭৭	২০৯৪৫৩৭৯	২৪২৩৭২২৮

উল্লিখিত তালিকাদৃষ্টে বুঝা যাইতেছে যে, পশ্চিম বঙ্গের (বৰ্দ্ধমান বিভাগের) মুসলমান সংখ্যা শতকর ১৩ জন। মধ্য বঙ্গে (প্রেসিডেন্সী বিভাগে) তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৪৮ জন। উত্তর বঙ্গে (রাজশাহী বিভাগে) তাহারা শতকরা ৫৯ জন। কিন্তু এই বিভাগস্থিত বগুড়া জেলার মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৮২ জন।) অতঃপর পূর্ব্ব বঙ্গের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগদ্বয়ে) মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৭০ জন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

আবুল কাছেম আমিনুল্লাহ।

শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান

অনেকের বিশ্বাস, মুসলমানগণ, তাঁহাদের উন্নতির যুগে, কাগজে কলমে বা পুস্তকগত জ্ঞান বিজ্ঞানে ও শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যায় তাঁহারা চিরকালই পশ্চাৎপদ ছিলেন। মোস্‌লেম জগতের বর্ত্তমান শিল্প-বিমুখাবস্থা দর্শনে, জনসাধারণের অন্তরে উপরোক্ত ধারণাটী অধিকতর বদ্ধমূল হইয়াগিয়াছে। কিন্তু এরূপ ধারণার মূলে যে কোনরূপ সত্যের সংশ্রব নাই, ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী।

মোস্‌লেম সভ্যতার উন্নতিযুগে, এস্‌লাম জগতের সর্ব্বত্রই যে, শিল্প, বাণিজ্য ও আবিষ্কার উদ্ভাবনের পূর্ণপ্রভাব বিদ্যমান ছিল, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্যের কারখানা

পশ্চিম তুর্কিস্থানের প্রধান নগর 'সমরকন্দ' সহরে কাগজ প্রস্তুত করার বহুসংখ্যক কারখানা স্থাপিত ছিল। 'এস্পাহানে' অত্যুৎকৃষ্ট তরবারি এবং নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত হইত। 'হলব' নগরের ভুবনবিখ্যাত আয়নার কারখানার কথা সর্ব্বজনবিদিত। আজও বাজারে উৎকৃষ্ট আয়নাসমূহ হলবী আয়না নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পারস্যের তাব্রিজ নগর কার্পেট বা গালিচা শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। আজও সেখান হইতে সেই প্রাচীন শিল্প-স্মৃতি সমূলে বিলুপ্ত হয় নাই। 'সুসন' নগরের 'সুসী' নামক বস্ত্র-শিল্প অতিশয় খ্যাত ছিল। মিসরে উৎকৃষ্ট মিছরি ও নানবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। 'মরক্কো' নগরে চর্ম্ম শিল্পের যে অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার সেই খ্যাতি প্রতিপত্তি আজও বিলীন হয়নাই। এখনও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চর্ম্ম শিল্প বিশেষতঃ বহি পুস্তক বাঁধাইবার শ্রেষ্ঠতম রঞ্জিত চর্ম্ম "মরক্কো লেদার" **Morocco Leather** নামে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। এয়মন প্রদেশের রেশম-শিল্প পৃথিবীময় খ্যাত ছিল। টিউনিসের বন্দর "তরসানা" ترسانہ অর্থাৎ রণতরী ও বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানার জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। ৭১১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে স্পেন বিজয়কাল পর্য্যন্ত, পশ্চিম আফ্রিকার তৎকালীন গবর্ণর বীরবর মুসা, টিউনিসের এই কারখানায় নির্ম্মিত রণতরী বহরের সাহায্যেই দিগ্বিজয়ে সাহসী হইয়াছিলেন। বাগদাদে বারুদ প্রস্তুত হইত। কাগজ ও বস্ত্রশিল্পের বহুসংখ্যক বৃহৎ কারখানাও সেখানে ছিল।

ফলতঃ যখন সমগ্র পৃথিবী, শিল্পচর্চ্চা ও ব্যবহারিক শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধে ঘোর অন্ধকারে অবস্থিত ছিল, তখন মুসলমানগণই জগতে বিবিধ নূতন শিল্পদ্রব্যের আবিষ্কার ও প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশে, শিল্পবিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইউরোপবাসীর শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির মূলসূত্রগুলি যে মুসলমানদিগের নিকট হইতেই গৃহীত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমগ্র ইউরোপ যখন জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতা ও শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন মুসলমানগণই

তাহার এক প্রান্তে স্পেনের রাজধানী কর্দোভা ও গ্রাণাডা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সভ্যতার প্রখর জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া, পাশ্চাত্য দেশ সমূহের জ্ঞানহীনতা ও মূর্খতার অন্ধকার বিদূরিত করিতে প্রবৃত্ত হন।

স্পেনের পশ্চিম প্রান্তে শান্তরিণ شنترين নামক একটী নগর সূক্ষ্মতম মসৃণ বস্ত্রশিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। স্বনামখ্যাত ভৌগোলিক পণ্ডিত এব্নে হাওকল বাগদাদী (ابن حوقل بغدادي) তৎপ্রণীত "কেতাবুল মমালেক্ ওয়াল্ মসালেক" كتاب الممالك والمسالك নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, উক্ত নগরে এরূপ একপ্রকার "জর্‌বাফ্‌ত" বা স্বর্ণতার মিশাইয়া সূক্ষ্মতম বস্ত্র প্রস্তুত হইত, যাহার সমকক্ষ হইতে পারে, এরূপ বস্ত্র তখন পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইত না। জনসাধারণ, উক্ত বস্ত্রের অসাধারণ শিল্পকৌশল দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া তাহাকে একটী অলৌকিক বস্ত্র বলিয়া ধারণা করিত, এবং এই উপলক্ষে তাহাদের মধ্যে নানারূপ কল্পনা জল্পনার বিনিময় হইত। এব্নে হাওকল উক্ত বস্ত্র সম্বন্ধে স্বয়ং যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একাংশ উর্দ্ধৃত করা হইতেছে:—

و يتلون ذالك الثوب الوانا و تحجر عليه ملوك بنى اميه بالاندلس - فلا ينقل و لا يشترى فيزيد الثوب على الف دينار لعزته و حسنه ط

অর্থাৎ এই বস্ত্র নানাবর্ণে রঞ্জিত ছিল, স্পেনের উমাইয়া বংশীয় বাদশাহগণ, তাহা এক-চেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেজন্য তাহা স্থানান্তরিত হইতে পারিত না, এবং তাহার অন্যত্র ক্রয় বিক্রয় হইবার উপায় ছিল না, সুতরাং উহার সৌন্দর্য্য ও সন্মান হেতু মূল্য একসহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইতেও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক "এব্নে খল্‌কান" (ابن خلكان) এর নিকট এক ব্যক্তি এই অপূর্ব্ব বস্ত্র শিল্পের প্রশংসা করিতে যাইয়া, অধিক কোন কথা না বলিয়া কেবল এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন যে, বস্ত্রখানি যেন মাকড়সার জাল হইতেও সূক্ষ্মতম, মসৃণ ও মোলায়েম। এ সম্বন্ধে এব্নে খল্‌কান নিজে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন:—

فتعالى الله ما اجل قدرته والطف حكمته و احسن صنعته و كيف خص كل صقع بنوع من الغرائب سبحانه و تعالى ط

"খোদা তায়ালা মহৎ, তাঁহার ক্ষমতা উচ্চতর, তাঁহার জ্ঞান পবিত্রতম এবং তাঁহার শিল্প উৎকৃষ্টতর, তিনি দেশ বিশেষকে অভিনব শিল্পবিশেষের সহিত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি পবিত্র ও সুমহান। (১)

শিল্পাবিষ্কার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ কেবল অনুকরণপ্রিয় ছিলেন না, এবং অন্যের আবিষ্কৃত শিল্পসূত্রাদির চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না; বরং তাঁহারা যে শিল্পাবিষ্কারক্ষেত্রে

(১) এব্নে খলকান ابن خلكان ২য় খণ্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা।

যথেষ্ট স্বাধীন গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

আরবগণ, তাঁহাদের অসভ্যতা ও মূর্খতার যুগেও শিল্পের প্রতি কম অনুরাগী ছিলেন না। অবুহেলাল আস্‌করী (ابو هلال عسكري) "আওয়ায়েল" (اوائل) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মিঞ্জিনিক যন্ত্র (منجنيق - Crane) অর্থাৎ যে যন্ত্র সাহায্যে অধিক গুরুভার বস্তু স্থানান্তরে নিক্ষেপ করিতে পারা যায় অথবা উদ্ধে বা অধঃদেশে সহজে স্থাপন করা যায় তাহা, আরবজাতিরই আবিষ্কার। তাঁহার মতে উক্ত বিশেষ কার্য্যকরী যন্ত্রটী আরব দেশের হিরা জেলার শাসনকর্ত্তা জোজায়মা আব্‌রশ (جذيمه ابرش) এরই আবিষ্কার। ঐতিহাসিক এব্‌নে খল্‌কানও একথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১) ঐতিহাসিক এবনে কোতায়াবার (ابن قتيبه) মতে পাদুকা এবং মোমবাতিও উল্লিখিত শাসনকর্ত্তা জোজায়মার আবিষ্কৃত কীর্ত্তি। এই উক্তির সহিত অতিরঞ্জনের সংশ্রব থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, আরব দেশে এস্‌লাম রবি সমুদিত হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সেখানে নানা প্রাচীন শিল্পের প্রচলন ছিল এবং শিল্পানুরাগ ও বাণিজ্য-প্রীতি আরবজাতির স্বাভাবিক অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহাদের সেই প্রকৃতিগত শিল্পানুরাগ ও আবিষ্কার-স্পৃহা এস্‌লামের প্রভাব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।
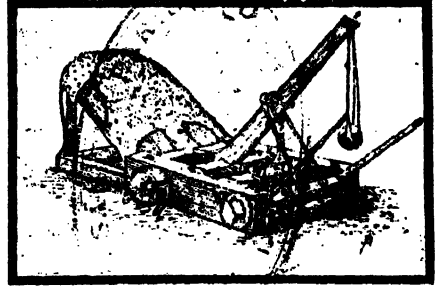
মুসলমানগণ যেমন ব্যবহারিক শিল্পের অসাধারণ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে শিল্প সংক্রান্ত পুস্তকাদি রচনাক্ষেত্রেও তাঁহারা তদ্রূপ উৎসাহ উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এয়াকুব কুন্দী (يعقوب كندي) নামক মুসলমান শিল্পী, পণ্ডিত ও গ্রন্থকারগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রাচ্য জগতের তত্ত্ববিদ পণ্ডিত মহাত্মা মেসিও সেডিউট (Sediwat) তৎপ্রণীত Historie Generate dus Arabes নামক গ্রন্থে (২৪৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, আবিষ্কার উদ্ভাবন, আরবজাতির স্বাভাবিক গুণ। তাঁহারা শিল্পাবিষ্কারে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন"। উল্লিখিত এয়াকুব কুন্দী যে সকল যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বক্ষ্যমান প্রবন্ধের শেষ ভাগে তাহা বর্ণিত হইবে।

স্বর্ণ রৌপ্যের মৌলিকতা।

"ফেহ্‌রস্তে এব্‌নে নদীম" (فهرست ابن نديم) নামক গ্রন্থ-তত্ত্ব বিষয়ক প্রসিদ্ধ পুস্তকে (২৬পৃঃ) পণ্ডিতপ্রবর এয়াকুব কুন্দীর শিল্প জ্ঞান ও আবিষ্কার শক্তি সম্বন্ধে অতি উচ্চ সমালোচনা লিখিত হইয়াছে।

(১) এব্‌নে খলকান ২য় খণ্ড ৩৪১ পৃষ্ঠা।

এয়াকুব কুন্দী রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বস্তু বিশ্লেষণ বিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি কিমিয়াগর নামধারী ভণ্ড সন্ন্যাসী ও ছদ্মবেশী ফকিরদিগকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন। কৃত্রিম উপায়ে যে সোণা চাঁদী প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে, তাহা তিনি রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও রসায়ণ বিদ্যা যেমন স্বর্ণরৌপ্যকে মৌলিক বস্তু বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে, পণ্ডিত প্রবর এয়াকুব কুন্দী ইহার বহুকাল পূর্ব্বেই সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি জনসাধারণকে ধোকাবাজ সন্ন্যাসী ও ফকিরগণের ফাঁদ হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দুইখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন যথা :—

(১) আত্তাম্বিহ আলা খদ্‌য়েল কিমাবিয়িন”

التنبيه على خدع الكيماؤ يين

অর্থাৎ কিমিয়াগরদিগের ধোকা ভঞ্জন।

(২) بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب والفضه و خدعهم

অর্থাৎ স্বর্ণরৌপ্যপ্রস্তুতশিল্পের দাবিকারীদের ভণ্ডামী প্রকাশ করণ পুস্তক।

পুষ্পসার বা আতর প্রস্তুত প্রণালী (আতরের রাসায়ণিক তত্ত্ব) সম্বন্ধে তিনি আর একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম كيمياء العطر “কিমিয়াউল এৎর্”। এই পুস্তকখানি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। লাটিন ভাষায় উহার অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা তাহার মূল আরবী গ্রন্থখানিরও কোন খোজ খবর রাখি না।

উল্লিখিত পণ্ডিত প্রবর “কোমকমে-নব্বাখ” قمقم نباخ নামক কাচ নির্ম্মিত এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং তাহার নির্ম্মাণকৌশল সংক্রান্ত বহু বিবরণ সম্বলিত একখানি পুস্তকও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। উক্ত যন্ত্রের একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাহা হইতে স্বয়ম্ভু শব্দ নিনাদিত হইত। কাচ ফলকে কলাই করণ এবং মূল্যবান খনিজ পদার্থের রাসায়ণিক গুরুত্ব নিরূপণ ইত্যাদি বিষয়ে তৎপ্রণীত অনেক পুস্তকের তত্ত্ব পাওয়া যায়।

স্বয়ম্ভু-শব্দ-যন্ত্র

এয়াকুব মিজিনিকী নামক আর একজন মুসলমান শিল্পী পণ্ডিতের নাম ইতিহাস পৃষ্ঠায় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সমর বিদ্যা সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের নাম “ওম্‌দাতস্ সালেক ফি সেয়াসতল্ মমালেক”।

সমর-বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

عمدة السالك فى سياسة الممالك -

অর্থাৎ “দেশের শাসন সংরক্ষণের উৎকৃষ্টতর উপায়”। এই পুস্তক সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এব্‌নে খল্‌কানের মন্তব্য দেখুন,—

هو مايم فى معناه - - يتضمن احوال الحروب و تعبيئها و فتح الثغور و بناء المعاقل
و احوال الفروسية والمصابرة على الحصار والقلاع والرياضة الميدانيه والحيل الحربية
و فنون العلاج بالسلاح و عمل اداة الحرب والكفاح و صفوف الخيل و صفتها۔

অর্থাৎ—ইহা এই শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অতি সুন্দর ও উপাদেয় পুস্তক, ইহাতে সমর কৌশল, সৈন্যবিন্যাস, সীমাপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন, দুর্গরচনা, চাতুর্য্যক্রীড়া, স্থাপত্যবিদ্যা, দুর্গাবরোধ, দুর্গরক্ষা, খোলা মাঠের কুচকাওয়াজ, সামরিক কৌশল, অস্ত্রচিকিৎসাপ্রণালী, অশ্ব শ্রেণীর পরিচয় ও দোষগুণ পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে। (১)

বস্ত্র, চিনি ও কাগজের কারখানা।

মুসলমানসভ্যতার উন্নতি-যুগে, শিল্পাবিষ্কারের যে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার ধ্বংশাবশেষ ও নানাস্থানে প্রাপ্ত শিল্পজাত দ্রব্য দর্শন করিয়া, ইউরোপের বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতসমাজ বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

মুসলমানেরাই যে পৃথিবীতে সর্ব্বাগ্রে চিনি প্রস্তুতের কলকারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজেরও সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় (২)। ফজ্‌ল এব্‌নে এহিয়া (فضل بن يحيى) কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (৩) স্পেনের প্রসিদ্ধ বাদশাহ খলিফা আব্দুর রহমান রাজ-প্রাসাদের সীমার মধ্যেই কাগজ প্রস্তুতের একটী বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। (৪) কেবল দেশের বাদশাহ ও বাণিজ্য ব্যবসায়িগণই যে শিল্পানুরাগী ছিলেন, তাহা নহে, বরং দেশের আমির ওমরা এবং ধনী ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও অনেকে শিল্পোন্নতিসাধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এক একজন বড়লোক বহু শিল্পসংক্রান্ত কলকারখানার পরিচালক ও পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন। দৃষ্টান্তস্থলে আমীর এব্‌নে আহমদ রাসেবীর (ابن احمد راسبى) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি ৮০টী রেশমবস্ত্রের কারখানার মালিক ছিলেন। এই সকল কারখানা আরবী সাহিত্যে 'তরাজ' (طراز) নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আলী এব্‌নে আহমদ ৩০১ হিজরীর লোক। *

মিসরের আরবীয় শিল্পজাত প্রাচীন দ্রব্যের প্রদর্শনী গৃহে, একখণ্ড বস্ত্র সংরক্ষিত আছে।

একটী বস্ত্রশিল্পের নমুনা।

ইহা বাগদাদের প্রসিদ্ধ খলিফা হারুনররশিদের পুত্র খলিফা আমীনের আমলের শিল্পের আদর্শ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাতে বস্ত্রশিল্পের বানা ও তানার সাহায্যে নিম্নলিখিত আরবী এবারৎ লিখিত আছে যথা—

(১) এব্‌নে খলকান ২য় খণ্ড ৩৩৭ পৃষ্ঠা।

(২) এনসাইক্লোপেডিয়া বৃট্যানিকা (Encyclopaedia Britannica) "সুগার" (Sugar) শব্দ দ্রষ্টব্য।

(৩) এব্‌নে খল্লদুন ১ম খণ্ড ৩৫২ পৃঃ।

(৪) ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৪৭ পৃঃ।

* "তবরী" (طبري) ১২শ খণ্ড ২৪ পৃষ্ঠা, মিসরের সংস্করণ।

بسم الله بركة من الله بعد الله الامين محمد اميرالمؤمنين اطال الله بقائه مما امر
بصنعة فى طراز العامة بمصر الفضل بن الربيع مولى اميرالمؤمنين -

অর্থ—আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষে তদীয় দাস খলিফা আমিনের প্রতি মঙ্গল হউক, এবং তিনি দীর্ঘজীবী হউন। ইহা রাজভৃত্য ফজল এব্‌নে রবীর আদেশক্রমে মিসরের সাধারণ বস্ত্রশিল্পাগারে প্রস্তুত হইয়াছে। *

পানির কল।

সাবেক মুসলমান আমলদারীতে রাজ্যের নানাস্থানে পানির কল স্থাপিত ছিল। লেডী মোরিয়া ক্যালিবোট স্পেনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, খলিফা দ্বিতীয় আব্দুর রহমান পইপের সাহায্যে সহরের সর্ব্বত্র জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (১)

আবু আব্দুল্লা মস্তন্‌সারের উদ্যানস্থিত অত্যাশ্চর্য্য প্রমোদ-সরোবরে যে উপায়ে জল সরবরাহ করা হইত, তাহাকে আধুনিক জলের কলের পূর্ব্ব সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। (২)

বর্ত্তমানে, নগরের জল সরবরাহের গুরুভার একমাত্র গবর্ণমেণ্টের ঘাড়েই বিন্যস্ত, কিন্তু মুসলমান আমলদারীতে নগরবাসীরা আমাদের ন্যায় কেবল রাজানুগ্রহের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন না, তাঁহারা সেরূপ মুখাপেক্ষাকে জাতীয় গৌরব ও আপনাদের কর্ত্তব্য পালনের প্রতিকূল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাই অনেক স্থলে তাঁহারা নগরে বন্দরে কূপের জল সরবরাহের গুরুভার দায়িত্ব নিজেরাই বহন করিতেন। ধনী মুসলমানগণ এরূপ জনহিতকর কার্য্যে প্রাণ খুলিয়া অর্থব্যয় করিতেন। অনেকেই এতদর্থে প্রচুর ভূসম্পত্তি ওয়াকৃফ করিয়া যাইতেন। দীন দরিদ্র বা নগরবাসী লোকদিগকে পানীয় জলের জন্য বর্ত্তমানের ন্যায় কোনরূপ "জলকর" বা ট্যাক্স বহন করিতে হইত না। আমীর ওমরাদের প্রদত্ত সম্পত্তির আয় দ্বারা চিরকাল জল সরবরাহের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

বসরা নগরে মোহাম্মদ সোলেমান হাশেমী জল সরবরাহের একটী বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। ৪৮৩ হিজরী অব্দে—বসরার অধঃপতনকালে—অগ্নিকাণ্ডে এই কলকারখানা ভস্মীভূত হইয়া যায়। (৩)

সম্রাট আওরঙ্গজেব, আওরঙ্গাবাদে জল সরবরাহের যে কল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ ও পাইপের চিহ্নাদি এখনও পর্য্যটকগণের নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে।

* "ছনাঅতল্ আরব" صناعة العرب ৮ পৃষ্ঠা।
(১) তারিখে স্পেন "৩৩৬ পৃষ্ঠা। সৈয়দ মোহাম্মদ আহমদ খাঁ কর্ত্তৃক উর্দ্দু ভাষায় অনূদিত
(২) "এব্‌নে খল্লাছুন" ابن خلدون ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৮২ পৃঃ।
(৩) "তারিখুল্ কামেল" تاريخ الكامل ১০ম খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা।

ফতেপুর শিক্‌রিতে উত্তরে দক্ষিণে, জল সরবরাহ করার দুইটী বৃহৎ কল স্থাপিত হইয়াছিল। শীতকালে জনসাধারণের ব্যবহারার্থে পাইপের সাহায্যে সর্ব্বত্র তপ্তজল সরবরাহ করা হইত। এই কারখানার ভগ্নচিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

আগ্রা নগরীতে, বিশেষতঃ ভুবনপ্রসিদ্ধ তাজমহল প্রাঙ্গণে ও তাহার বিস্তৃত সীমার মধ্যে মিনাবাজার, উদ্যান ও তৎপ্রান্তদেশবর্ত্তী অট্টালিকাদিতে যমুনা হইতে জল সরবরাহ করার যে কল ছিল, তাহার পাইপ প্রভৃতির ভগ্নচিহ্ন তাজের সিংহদ্বারের একটী প্রকোষ্ঠে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাজমহলের পশ্চিম পার্শ্বের মস্‌জেদ সংলগ্ন দক্ষিণাংশে গোলক ধাঁধাঁর ন্যায় যে হাম্মাম বা স্নানাগার আছে, তাহা যমুনার জলধারা হইতে অনেক উচ্চে নির্ম্মিত, কিন্তু যেরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে সেখানে অদৃশ্য পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহ করা হইত, তাহা বিশেষ বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে কলকারখানার কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু তথাপি আমরা আগ্রা ভ্রমণকালে উক্ত স্নানাগারে যমুনার জল দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলাম। মস্‌জেদের খাদেম বলিয়াছিলেন, হাম্মামের জল কোনরূপ কৃত্রিম উপায়ে আনীত হয় নাই, বরং হাম্মামের তলদেশ দিয়া এমন কোন অপূর্ব্ব এবং সাধারণ জ্ঞানের অগোচর উপায়ে যমুনার সহিত পাইপের সংযোগ আছে যাহার সাহায্যে এখনও যমুনার জল, উর্দ্ধদেশে হাম্মামের জলাধারে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

দিল্লীর লাল কেল্লাতে দরবারেখাসের বামে দক্ষিণে মর্ম্মর মণ্ডিত ভূমিদেশে অবলম্বনে যে 'নহর' খনিত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। আমরা দিল্লী ভ্রমণকালে শাহী আমলের নির্ম্মিত সেই অপূর্ব্ব নহরের জল-প্রবাহ দর্শনে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিনাই।

মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ জোবেদা খাতুনের নহর নির্ম্মাণে, মুসলমান শিল্পিগণ যেরূপ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা অতি বিস্তৃতভাবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে পত্রান্তরে প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিয়া এখানে তাহার পুনরালোচনা করিতে বিরত রহিলাম।

স্পেনের খলিফা আব্দুলমোমেন এবনে আলী, নানাবিধ যন্ত্র ও অস্ত্রাবিষ্কারে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। লেডী মোরিয়া ক্যালীবোট স্বপ্রণীত ইতিহাসে লিখিয়াছেন, খলিফা আব্দুলমোমেন নানাবিধ শিল্প আবিষ্কারে ও উন্নতি বিধানে বিশেষ যত্নের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সময় বিলাসব্যসন ও সমৃদ্ধিজনক এবং যুদ্ধবিদ্যায় ব্যবহারযোগ্য নানাবিধ যন্ত্র, যান, ও বহুল অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, শিল্পাগার সমূহের তত্ত্বাবধান কার্য্য তিনি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন, এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রস্তুত করাইতেন। উক্ত ইতিহাস রচয়িত্রী, আব্দুলমোমেনের আবিষ্কৃত মস্‌জেদের মেম্বর বা বেদী এবং উপাসনাকারীদের জন্য অপূর্ব্ব নির্ম্মিত জায় নমাজ সম্বন্ধে অতি মূল্যবান মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বেদীটী একপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধযুক্ত কাষ্ঠফলক দ্বারা নির্ম্মিত। তাহার সর্ব্বাঙ্গ

অপূর্ব্ব বেদী ও জায়-নমাজ।

(১) আছারে আকবরী ১৪৪—১৩৪ পৃষ্ঠা।

নানাবিবিধ ফল ফুলের বিচিত্র শিল্প চাতুর্য্যে বিভূষিত এবং বেদীর আংটা ও ঠাপ সমূহ স্বর্ণ মণ্ডিত কারুকার্য্যবিখচিত অপূর্ব্ব শোভাসৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত ছিল। বেদীটী যথেচ্ছা স্থানান্তরিত হইতে পারিত। তাহা স্থানান্তর করিতে কোনরূপ অপ্রীতিকর ও অশান্তিকর খর খর শব্দ হইত না। নমাজীদের 'জায়-নমাজ' সমূহ অতিসূক্ষ্ম ও সুশোভন কারুকার্য্য এবং শিল্পচাতুর্য্যে বিখচিত ছিল। সে সকল আবশ্যক মতে অতি সহজেই স্থানান্তর করিতে পারা যাইত। বেদীটীর আর একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, খতিব বা বক্তা মেম্বরের একটী সোপানে পাদ বিক্ষেপ করা মাত্র প্রকোষ্ঠরূপ বেদীর দ্বার সমূহ নিজ হইতে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত, আবার বক্তার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার দ্বার সমূহ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িত। এই বেদীর শিল্পী, আরও বহু প্রকার নূতন প্রণালীর যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত শিল্পজাত দ্রব্য, স্পেনের প্রসিদ্ধ সৌধমালার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি ও সাজ সজ্জায় প্রধান উপকরণরূপে সাদরে সংগৃহীত হইত।

শেখ শেহাবুদ্দীন আহমদ লিখিয়াছেন, সিরিয়া প্রদেশের হেমছ (حمص) নগরের জামে মস্‌জেদের তোরণদেশের গুম্বদে, লৌহ নির্ম্মিত স্তম্ভে একটী মানুষের প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটীর দুই হস্তই মুষ্টিবদ্ধ, কেবল উভয় হস্তের তর্জ্জনী মুক্ত এবং সরলভাবে উর্দ্ধদিকে সংস্থাপিত ছিল। বায়ুর গতি নির্ণয় করার জন্য এই যন্ত্রটী বিশেষ কার্য্যকরী ছিল। বায়ুর গতি যখন যেদিকে ফিরিত, অঙ্গুলিদ্বয় সেই দিকেই ঝুকিয়া পড়িত। এই মানব মূর্ত্তিটী যেন সাক্ষাৎভাবে লোকদিগকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে বায়ুর গতি নির্ণয় করিয়া দিত। এই যন্ত্রের নাম "আবুরিয়াহ" (ابو رياح) অর্থাৎ বায়ুর পিতা। (১)

বায়ুর গতি নির্ণায়ক যন্ত্র

মুসলমানগণের উন্নতি-যুগে, বিভিন্ন প্রকারের ঘড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মস্তনসারিয়া মাদ্রাসায় (مدرسه مستنصریه) একটী আশ্চর্য্য ধরণের ঘড়ি স্থাপিত হইয়াছিল। আকাশ-মার্গের ন্যায় একটী গোলকাধারে, একটী ঘূর্ণায়মন গতিশীল সূর্য্য স্থাপন করা হইয়াছিল; তদ্দ্বারা স্পষ্টতর সময়নির্ণয় কার্য্য সম্পন্ন করা হইত। (২)

ঘড়ি।

দমাস্ক নগরের ভুবন বিখ্যাত জামে মসজেদে যে ঘড়ি স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা আরও বিস্ময়কর ব্যাপার। মসজেদের মিণারের গাত্রে একটী গবাক্ষদ্বারে ছোট ছোট দ্বাদশটী পিত্তল নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী বিরাজমান ছিল, আবার প্রত্যেক সোপানে দ্বাদশটি ক্ষুদ্র বাতায়ন ছিল। প্রথম ও শেষ সোপানে, পিত্তলের পাত্রোপরি দুইটি সুদৃশ্য বাজপক্ষীর অবয়ব নির্ম্মিত ছিল। এক ঘণ্টা সময় উত্তীর্ণ হইলে, উভয় বাজপক্ষী, ঈষদ্ভাবে গ্রীবা লম্বা করিয়া স্ব স্ব চঞ্চুর সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত এক একটি পিত্তলের গুলি সজোরে তাহাদের সম্মুখস্থ পিত্তলপাত্রে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে যে শব্দ হইত তদ্দ্বারা সময় নিরূপণ কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হইত। বর্ত্তমান সময় গির্জ্জা ও মনুমেণ্টগাত্রে যেরূপ

(১) "আলমোস্তৎরফ" (المستطرف) ১ম খণ্ড ৭৮; ১৩০৮ হিজরীতে মিসরে মুদ্রিত
(২) "আছারল বেলাদ" (اثار البلاد للقزويني) ২১১পৃষ্ঠা, জর্ম্মণীতে ছাপা।

ঘড়ি স্থাপন করা হয়, এবং লোকে ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে সময় নিরূপণ করে, মুসলমান আমলে সচরাচর মস্জেদের মিনারে সেইরূপ বৃহৎ ঘড়ি স্থাপন করা হইত এবং নগরবাসী ঘড়ির শব্দ শ্রবণে সময় নিরূপণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইত। (১)

এস্লামাবাদী।

মোহাম্মদ।

আরবের মরুভূমে　　বহায়ে অমৃত নদী,
বহায়ে অমৃত নদী প্রতি বালু-কণিকায়—
কোন্ এক শুভ প্রাতে　　এসেছিলে নেমে তুমি
ইস্লামের বৈজয়ন্তী উড়াইতে এ ধরায়!

পাপ-অন্ধকারে মগ্ন　　হায় মূর্খ মক্কাবাসী
প্রথমে তোমারে নাহি চিনিতে পারিল—তাই
তুলিল তোমার' পরে　　ঘাতকের গুপ্ত অসি,
পলাইলে মদিনায়-মিলিল তোমার ঠাঁই!

কি সৌভাগ্য মদিনার—　　লইল তোমার দীক্ষা
সকলে পড়িল লুটি' তোমার চরণ তলে—
জীবনের সফলতা　　যেখানে লভিলে তুমি
ছুটে এল নরনারী ভাসিয়া নয়ন জলে!

তারপর একদিন　　খুলে গেল অন্ধ আঁখি,—
নহে শুধু মক্কাবাসী—অর্দ্ধ পৃথিবীর লোক
ঈশ্বর প্রেরিত বলে'　　প্রত্যক্ষ চিনিল তোমা'
তোমারে গ্রহণ করি, ভুলে গেল রোগ শোক!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,

(১) রেহ্লায় এব্নে জোবায়ের (رحلة ابن جبير) ২৭১—২৭২ পৃষ্ঠা; ইউরোপে মুদ্রিত

মোস্তফা চরিতালোচনা।

(১)

ঈশ্বর তত্ত্ব।

একেশ্বরবাদিত্ব।—যাঁহারা কেবল একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন, তাঁহারা একেশ্বরবাদী এবং তাঁহাদের ধর্ম্মই 'একেশ্বরবাদধর্ম্ম' নামে অভিহিত। পৃথিবীর আদিকালে এই ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং যাবতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পয়গাম্বরই উহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া গিয়াছেন। আদি পুরুষ হজরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত শিছ, ইদ্‌রীস, নূহ, এবরাহিম, মুসা, দাউদ, সোলায়মান, ঈসা, প্রভৃতি খ্যাতনামা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ ঐ ধর্ম্মের উপাসক, শিক্ষক, উপদেশক ও সংস্কারক ছিলেন।—পরে দার্শনিক পণ্ডিতগণের গভীরচিন্তা ও গবেষণা-ফলে (?) ঐ ধর্ম্মের শাখাপ্রশাখা বাহির হইয়া জগতে অনেকেশ্বরবাদ ধর্ম্মের প্রচলন হইয়াছে।

ত্রীশ্বর বাদের সুচনা।—খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীসদেশে প্লাটো নামে এক দার্শনিক পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন; তিনি দর্শনশাস্ত্রে গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই গভীর চিন্তাফলে সর্ব্বপ্রথমে একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের নামান্তর আরম্ভ হয়। ঈশ্বর আপনি হইয়াছেন, কি, কেহ তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছে, এই তর্ক তাঁহার মনে উদিত হওয়ায়, তিনি উহার মীমাংসায় নিবিষ্টমনা ও গভীরচিন্তা-ভিভূত হন। সেই চিন্তার ফলে ঈশ্বরের স্বয়ম্ভুতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। কিন্তু, "যিনি একমাত্র ঈশ্বর, তিনি একই সময়ে বিশ্ব-জগতের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য (সৃজন, পালন, রক্ষণ ইত্যাদি) কিরূপে সম্পন্ন করেন? যাঁহার শরীর নাই, আদর্শ নাই, তিনি অতি বিচিত্র অথচ সুন্দর আদর্শ সকলের নির্ম্মাণ করেন কিরূপে?" ইত্যাদি রূপ রহস্য ভেদ করা তাঁহার মানবসুলভ জ্ঞান, গবেষণা ও চিন্তাশক্তির অতীত থাকায়, তিনি মূলে একমাত্র ঈশ্বরকে বজায় রাখিয়া, তাঁহার তিন ভাগ ও তিন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লন, এবং ঐ এককে তিন ও তিনকে একই আখ্যায় আখ্যাত করিয়া ঐ ত্রিভাব বা ত্রিমূর্ত্তির তিনটি পৃথক্ পৃথক্ গুণ কল্পনা করিয়া লন।

কিন্তু, প্লাটোর ঐ দার্শনিক মত, সেকালে গ্রীসের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই; উহা কেবল দার্শনিক পণ্ডিতগণেরই আন্দোলন ও আলোচনার এক জটিল গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ মত জগতে ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতে থাকিলেও, তৃতীয় খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে নাই। চতুর্থ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট কনষ্ট্যন্টাইনের সময়ে, সভা সমিতির দ্বারা প্লেটোর ঐ মতের প্রাধান্য সমির্থিত হয় এবং উহা খৃষ্টান ধর্ম্মের ভিতরে প্রবেশাধিকার লাভ করে।—প্লেটোর উদ্ভাবিত একেশ্বরের তিনমূর্ত্তি, কাথ-লিক খৃষ্টানদিগের তিন ঈশ্বরে পরিণত হয় এবং "God the Father, God the Holy

Ghost and God the son" (পিতা ঈশ্বর, পবিত্র-আত্মা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর) এই তিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। এখানে পিতা হইতেছেন, স্বয়ং ঈশ্বর; পবিত্র আত্মা হইতেছেন, কপোতরূপী ঈশ্বর; * এবং পুত্র হইতেছেন, যীশু (হজরত ঈসা)। কিন্তু, মহাত্মা যীশু নিজে একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনার জন্য স্পষ্টভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাহার প্রমাণ দিতেছি।

যীশু বলিতেছেন, "যাহারা আমাকে প্রভো, প্রভো, বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে।"† যীশু আবার বলিতেছেন, "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া, তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে, এইটি মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা।"‡ বর্ত্তমান চারিটি সুসমাচারের মধ্যে যীশু কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অংশ অথবা পুত্র বলিয়া দাবী করেন নাই বা নিজের উপাসনা করিবার জন্যও উপদেশ দেন নাই; বরং নিষেধই করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "সেইদিন (শেষ বিচারের দিন) অনেকে আমাকে বলিবে, 'প্রভো, প্রভো, আপনার নামে কি আমরা ভাবোক্তি প্রচার করি নাই? আপনার নামে কি ভূতদিগকে ছাড়াই নাই? এবং আপনার নামে কি অনেক পরাক্রম-কার্য্য করি নাই?' তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি তোমাদিগকে কখনই জানি নাই; হে অধর্ম্মাচারিগণ; আমার নিকট হইতে দূর হও।" * অবশ্য যীশু, সুসমাচার অনুসারে, খোদাকে পিতা বলিয়াছেন, কিন্তু খোদাতালা সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা ও সকলেরই পিতা; কেবল যীশুরই পিতা নহেন। যীশু অন্যত্র বলিয়াও গিয়াছেন, "সাবধান—লোককে দেখাইবার নিমিত্ত তাহাদের সাক্ষাতে ধর্ম্মকর্ম্ম করিওনা, করিলে তোমাদের 'স্বর্গস্থ পিতার' নিকট তোমাদের পুরস্কার নাই।" † স্বর্গস্থ পিতা মানে কি এখানে ঈশ্বরকে বুঝাইতেছে না? যীশু নানাস্থানে ঈশ্বরকে সকলের পিতা বলিয়াছেন; লুকের একটা পদ তুলিয়া দেখাই, "তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।" ‡

উপরি উদ্ধৃত পদাবলী দ্বারা যীশুর নিজের উক্তি দেখান হইল। এতদ্ব্যতীত সমস্ত গস্‌পেল তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখিলেও, এবং যীশুর উপদেশগুলির বারংবার সমালোচনা করিলেও

* গস্‌পেলের (ইঞ্জিলের) মতে যীশু জর্দ্দন নদীতে স্নান করিয়া উঠিলে, পবিত্র আত্মা কপোতের রূপ ধরিয়া তাঁহার দিকে নামিয়া আসিয়াছিলেন। মথি, মার্ক, লুক ও জন লিখিত চারিটী গস্‌পেল বা ইঞ্জিল এখন প্রচলিত।

† মাথির ইঞ্জিল ৭ অঃ ২১।
‡ " " ২২ অঃ ৩৭—৩৮।
* মথির ইঞ্জিল ৭ অঃ ২২—২৩।
† " " ৬ অঃ ১২।
‡ লুকের ইঞ্জিল ৬ অঃ ৩৬।

প্লেটোর মতের বা ত্রীশ্বর বাদের ছায়ামাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব, যীশুর উপদিষ্ট ধর্ম্ম ও কাথলিকদিগের মত যে এক, তাহা সমর্থনও করা যায় না।

পৌত্তলিকধর্ম্মের পতন ও পুনরুত্থান—রোমকজাতি বহুকাল ধরিয়া সাকার দেবদেবীর উপাসক ছিল। কনষ্ট্যণ্টাইনের সময়ে রোমরাজ্য হইতে ঐ ধর্ম্মের একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে পৌত্তলিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল।* তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জুলিয়ান ৩৬১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং রোমকদিগের পৈতৃক ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।—ফলে খৃষ্টান গুরু, যাজক ও আচার্য্যগণের মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। পৌত্তলিক ধর্ম্ম অল্পকাল মধ্যেই আবার সমগ্র সাম্রাজ্যে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

খৃষ্টধর্ম্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশ।—রোম-সম্রাট থিওডোসিয়সের সময়ে (৩৯০ খৃঃ অঃ) পৌত্তলিকধর্ম্মের আবার তিরোধান ও খৃষ্টধর্ম্ম সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রতিভাসালী হইলেও, অন্য এক ভাবে খৃষ্টধর্ম্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিল। যে সকল সাধুতপস্বী খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর হাতে মারা পড়িয়া ছিলেন, তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি প্রবল হইয়া উঠিল। কতকগুলি খৃষ্টান সন্ন্যাসীর (যাহাদিগকে ঐতিহাসিক মিঃ গিবন আক্ষেপ বশতঃ জানোয়ার বিশেষ বলিয়াছেন,) কল্যাণে ঐ সেণ্ট বা সাধু পূজার নিয়ম নিবদ্ধ হইয়া গেল।† যাহারা রাজদ্বারে ন্যায় বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও "ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত" (Martyr বা শহিদ) বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইয়া উঠিল। ঐরূপ ভাবে নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ অস্থি বা ভস্মরাশি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে তৎসমুদয়ের সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল। 'সমাধিস্থ মহাত্মাগণ ঈশ্বরের অংশ বিশেষ ও সর্ব্বশক্তিমান' এই ধারণাও সাধারণ খৃষ্টানদিগের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল, এবং ঐ সমাধি ও সমাধিভবনগুলির পূজাপদ্ধতি জাঁক জমকের সহিত প্রচলিত হইয়া পড়িল। ফলকথা, যীশুর উপদিষ্ট একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম ও কনষ্ট্যণ্টাইনের প্রবর্ত্তিত ত্রীশ্বরবাদ ধর্ম্ম, প্রকারান্তরে পৌত্তলিকতার লীলানিকেতন হইয়া গেল।

সাকার দেবদেবীর উপাসনা।—হিন্দুদিগের আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ। বেদে ঈশ্বর, একমাত্র—অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ম)। কিন্তু, পুরাণে ঐ ঈশ্বরের তিনমূর্ত্তি ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ঐ তিনমূর্ত্তির তিনটি নাম দিয়া তিনটির উপর তিনটি পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। এক মূর্ত্তি, ব্রহ্মা—তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নামে আখ্যাত হইয়াছেন;

* ৩৪০ খৃষ্টাব্দে কনষ্ট্যণ্টাইনের মৃত্যু হয়।
† গিবনের রোমান এম্পায়ার, তৃতীয় খণ্ড ২০৮

অপর এক মূর্ত্তি বিষ্ণু—তিনি পালন কর্ত্তা নামে অভিহিত হইয়াছেন ; আর এক মূর্ত্তি মহেশ্বর —তিনি সংহার কর্ত্তার স্থান অধিকার করিয়াছেন। আবার উপনিষদের বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা—ঈশ্বরতত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। উপনিষদের ঈশ্বর—"পরম ব্রহ্ম" নামে প্রসিদ্ধ—তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর—"একমেবাদ্বিতীয়ম"। উপনিষদ, সংহিতার ন্যায় তিন ঈশ্বরের সমর্থন করে না। বেদে সাকার দেবদেবীর উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

বেদে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার—ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়েরই উহা পড়িবার উপায় নাই, এবং বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম ও উপাসনাদি করিবারও ব্যবস্থা নাই। সাকার দেবদেবীর উপাসনা পুরাণের মতে হইয়া থাকে ; এজন্য ঐরূপ উপাসনা পৌরানিক ধর্ম্ম নামে কথিত হয়। যে সকল জাতির বেদে ও বৈদিকধর্ম্মে অধিকার নাই, তাঁহারা পৌরানিক ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া বহু-ঈশ্বরবাদ ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র কতিপয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই বেদোক্ত একেশ্বরবাদী। পৌরানিকধর্ম্ম যে বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, তাহা বলিবার আমাদের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যে বেদ হিন্দুধর্ম্মের মূল শাস্ত্র, তাহাতে পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটী দেবতার বা তাঁহাদের মূর্ত্তিপূজার নাম গন্ধও নাই। অথচ বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা মূর্ত্তি পূজার বহুল প্রচলনে নানা যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করিয়া, উহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। ফলে এই হইয়াছে যে, প্রকৃত একেশ্বরবাদধর্ম্ম বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া গিয়াছে ও অপর সাধারণ হিন্দুর অসংখ্য উপাস্য হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম।—বুদ্ধদেব, দেবদেবী মানিতেন না ; তাহাদের পূজার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না—তিনি সর্ব্বজীবে সম-দয়াবান ছিলেন। জীবহিংসা তাঁহার মতে মহাপাপ। বুদ্ধ ও তাঁহার মতাবলম্বী বৌদ্ধেরা, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে জীব-বলিদানের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। ভিক্ষাই তাঁহাদের জীবিকার একমাত্র সম্বল এবং শাক সব্জী প্রভৃতি উদ্ভিদই তাঁহাদের খাদ্য ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে যোগ, সাধনা, ধ্যান, তপস্যা প্রভৃতি সকলই আছে—নাই কিন্তু ঈশ্বরবাদিত্ব। বুদ্ধ যে ঈশ্বরবাদী ছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই ; এজন্য তিনি নিরীশ্বরবাদী বলিয়া আখ্যাত। বুদ্ধের পরে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের যে সকল নীতিগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের কোন স্থানে, "ঈশ্বর, বুদ্ধদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ;" কোথাও "তিনি সর্ব্বস্রষ্টা" প্রভৃতি ঈশ্বরবাদমূলক শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে উল্লেখ—উল্লেখ মাত্র। বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে কোথাও তাহাকে ঈশ্বরবাদী বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। ঈশ্বরের উপাসনা করিবার নিমিত্ত তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ দেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে যতই সদ্‌গুণরাজির সমাবেশ থাকুক না কেন, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইস্‌লাম।—কোরাণশরীফ ইস্‌লাম ধর্ম্মের আদিম ধর্ম্মপুস্তক। ঐ পুস্তকেই ইস্‌লাম-ধর্ম্মের আরাধনার রীতিপদ্ধতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, লৌকিক ব্যবহার, বিবাহ,

উত্তরাধিকার প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বিষয়ের বর্ণনা আছে। সংসারধর্ম্ম পালনে যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের আবশ্যক, তৎসমুদয়ই উহাতে বিবৃত হইয়াছে। ঐ কোরাণশরীফ ঈশ্বরের একত্ববিষয়ে বারংবার সাক্ষ্য দিতেছে এবং কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য বহুভাবে উপদেশ দিতেছে। কেবল উপদেশ কেন, প্রত্যেক ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীকে প্রত্যহ পাঁচবার ঐ ঈশ্বরেরই উদ্দেশে উপাসনা (নামাজ) করিবার জন্য বাধ্য করিয়া দিয়াছে।—বৎসরের মধ্যে একমাস উপবাস (রোজা), তাঁহারই উদ্দেশে করিবার বিধান উহাতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একেশ্বরের উপাসনাই কোরাণের মূল ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম কেবল জনসাধারণই পালন করিতে বাধ্য, অপরে নহে, এমন নয়। কি পয়গম্বর, কি তাপস, কি সাধু, কি সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনবান, কি দরিদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই প্রতি ঐ একই আদেশ—"একমাত্র ঈশ্বরই উপাস্য, আর কেহ উপাস্য নহে।"

মুসলমান ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ, (স) কেবল কোরাণের আদেশ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি নিজে কোরাণোক্ত আদেশ অনুসারে উপাসনা ও উপবাস করিয়া- এবং অন্যান্য আদেশ, উপদেশ ও শিক্ষানুসারে কার্য্য করিয়া মুসলমান মাত্রকেই কোরাণের অনুযায়ী চলিবার ব্যবস্থা দৃঢ় করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

মূল ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণশরীফ বা পরবর্ত্তী অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থ,* ঈশ্বরকে দুইভাবে বা তিনভাবে ভাবিবার অথবা তাঁহার তিনমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, প্রত্যেক মূর্ত্তিকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যভার দিবার সমর্থন করে না; বরং দৃঢ়ভাবে নিষেধই করিয়াছে। "তোমরা ঈশ্বরের অংশী স্থাপন করিওনা," কোরাণে এই নিষেধাজ্ঞার বারংবার উল্লেখ আছে। ঈশ্বর যখন সর্ব্ব-শক্তিমান, তখন একই সময়ে নানাবিধ কার্য্য করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিবার তাঁহার দরকার কি? "যিনি এক, তিনিই তিন; যাঁহারা তিন, তাঁহারাই এক" এই বলিয়া মুসলমান সুধিগণ, কল্পনা প্রভাবে ঈশ্বরের একত্বকে ঐরূপ ভাবে ভগ্ন করিয়া বহু ঈশ্বরবাদিত্বের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী নহেন।

অবতারবাদ।—যাঁহারা ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানব সমাজে সময়োপযোগী শিক্ষা বিতরণ করিয়াছিলেন। মুসলমান শাস্ত্রকারেরা, ঐ অবতারবাদের সমর্থন করেন না।

খৃষ্টানদের বিশ্বাস যে, বিবি মরিয়মের (মেরীর) স্বামীসন্দর্শনের পূর্ব্বে, ঈশ্বর তাঁহার উদরে আপনা হইতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে মরিয়মের গর্ভসঞ্চার হইয়া, মহাত্মা যীশুর জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা যীশুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া মানিতে বাধ্য, এবং মানিয়াও থাকেন। যদি যীশুর অবতার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ঈশ্বরের দৈবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

---

* হাদীস, ফেকা, ইত্যাদি।

কিন্তু, যীশু যে নিজে কখনও ঈশ্বরত্বের দাবী করেন নাই, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কৃষ্ণ যে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তাহারও প্রমাণাভাব। গীতায়, কৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, গীতা কৃষ্ণের রচনা নহে। কুরুক্ষেত্র নামক রণক্ষেত্রে কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ দেন, ও কৃষ্ণার্জ্জুনে যে সকল কথোপকথন হয়, সেগুলি সঞ্জয় প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণন করেন। পরে পণ্ডিত বেদব্যাস ঐ বর্ণনাগুলি সংগ্রহ ও সুলিলত ভাষায় ছন্দোবন্দ করিয়া, গীতা নাম দিয়া প্রকাশ করেন। অতএব গীতার উক্তিকে কৃষ্ণার্জ্জুনের উক্তি বলিব, কি সঞ্জয়ের উক্তি বলিব—কিম্বা বেদব্যাসের রচনা বলিব, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

অবশ্য ঈশ্বর সর্ব্বশক্তির আধার, সুতরাং তাঁহার পক্ষে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার কোন বাধা থাকা সম্ভব নহে ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম ধরিয়া তাঁহাকে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইলে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান হন কিরূপে? যদি মনে করা যায়, মনুষ্যজাতীর আদর্শ গঠনের পূর্ব্বে তাঁহাকে মনুষ্যরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল, তাহা হইলে তিনি মনুষ্যরূপ ধারণ না করিলে, মনুষ্যের আদর্শ গড়িতে পারেন না, ইহাই সাব্যস্ত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শক্তিকেও খর্ব্ব করা হয়। যদি তিনি নিজে অশরীরী হইয়াও মনুষ্যশরীর ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে মনুষ্যের আদর্শ গড়িবার জন্য কি রূপধারণ না করিয়া পারেন না? সে দরকার হয়, রাম চাঁদ মিস্ত্রীকে ; কেননা তাহাকে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের একখানি ছবি আঁকিতে বলিলে, সে একটি আদর্শ না দেখিয়া তাহা আঁকিতে পারিবে না। যদি মনে করা যায়, মানুষকে কাজ শিখাইবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মায়ের পেটে জন্ম লইয়া—মানুষের রূপ ধরিয়া, মানুষের সহিত কাজ করিয়া কোন্‌টি ভাল কাজ ও কোন্‌টি মন্দ কাজ, এবং কোন্‌টি ধর্ম্ম ও কোন্‌টি অধর্ম্ম, তাহা দেখাইতে হইয়াছিল, তাহা হইলে ত তিনি শক্তিখর্ব্বতার অপবাদ এড়াইতে পারেন না! মানুষের অলক্ষে থাকিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়াই সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক ; তাহা যাঁহার দ্বারা হইতে পারে না, তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইবেন, কিরূপে?

আর এক কথা—ঈশ্বরবাদী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বর অনাদি অনন্ত।—কালে কালে বর্ত্তমান আছেন এবং থাকিবেন। কিন্তু, যীশু মরিয়ামের গর্ভে জন্ম লইবার পূর্ব্বে, কখনও ছিলেন না ; তবে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিলে, তাঁহার অনাদিত্ব বজায় থাকে কোথায়? আবার যখন তিনি এ মরধাম পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন, তখনই তাঁহার অনন্তত্ব লোপ পাইল। কৃষ্ণও দৈবকীর গর্ভে জন্ম লইবার পূর্ব্বে ছিলেন না এবং প্রভাসতীর্থ তীরে বৃক্ষোপরে তাঁহার আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর, তাঁহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

অবশ্য কোরাণশরীফে আছে, যীশু সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন ; * কোরাণশরীফে ইহাও

* এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।　　—সম্পাদক

আছে যে, যীশু নিজ ক্ষমতা বলে সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই ; ঈশ্বর তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। যদি কোরাণশরীফের মতই লইতে হয়, তাহা হইলে উহার সমস্ত প্রবচন গুলি একত্র করিয়া বিচার করিতে হইবে। সে বিচারে যীশু কখনই ঈশ্বরাবতার সাব্যস্ত হইতে পারিবেন না। ঐরূপ অবতার নামে অভিহিত কোন মহাত্মারই অনাদিত্ব বা অনন্তত্ব স্থির থাকে না এবং থাকিতে পারে না।

ইস্‌লামে ঈশ্বরের একত্ব।—ইস্‌লামধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ (স) কখনও আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার কিম্বা রূপান্তর অথবা নামান্তর বলিয়া দাবী করেন নাই। বরং সাধারণকে বলিয়াছেন, "আমি তোমাদেরই মত মানুষ ; আমাতে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়"। যীশু ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার স্বর্গীয় পিতার এই ইচ্ছা ; তাহাতেই যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিবার পক্ষে খৃষ্টানদিগের সুযোগ হইয়া যায়। এ নিমিত্ত হজরত মোহাম্মদ, কখনও তেমন ভাবের কথা মুখেও আনেন নাই। "ঈশ্বর এক, ঈশ্বর অসীম ক্ষমতাপন্ন ; তিনি জনকও নহেন, জাতও না"—ইত্যাদি কোরাণোক্ত পবিত্র প্রবচন, শরীরনিবদ্ধ মানব মানবীর রক্ত মাংসে জড়িত হওয়ার ও মানব স্বভাবের অনুকরণ করার অপবাদ হইতে ঈশ্বরকে সর্ব্বতোভাবে বিমুক্ত করিয়া দিয়াছে। "ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, আকাঙ্খাহীন, আশক্তিহীন —তিনি জগৎস্রষ্টা, সৃষ্টির কারণ ; তিনিই পালনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা এবং তিনিই সংহার কর্ত্তা।" পবিত্র কোরাণশরীফ, ঐ সকল বিষয় আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে ; এবং সেই সর্ব্বগুনসম্পন্ন একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনার জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিতেছে।

খৃষ্টধর্ম্ম মূলে একেশ্বরবাদিতার উপর স্থাপিত হইয়া, পরে তাহাতে স্থির থাকিতে পারে নাই। হিন্দুধর্ম্মের মূলে একেশ্বরবাদিত্ব থাকিলেও, পরে, নানা মুণির নানা মতে, উহা বহু-ঈশ্বরবাদমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে নাস্তিকতার কলঙ্কস্পর্শ ঘটিয়াছে। * কিন্তু কোরাণ ও কোরাণোক্ত ধর্ম্ম—সকল ধর্ম্মের মূল একেশ্বরবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, অধিকন্তু উহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া দিয়াছে। যে পবিত্র ও সনাতন একেশ্বরবাদধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মূল হইয়া, পরে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইস্‌লামধর্ম্মগুরু প্রাজ্ঞপ্রবর হজরত মোহাম্মদ সেই ধর্ম্মের উদ্ধার, রক্ষা, পুনঃ প্রচার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া "ইস্‌লাম" বলিয়া উহার আখ্যা দিয়া গিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ অবতার ছিলেন না ; তিনি পয়গম্বর বা ঈশ্বরের তত্ত্ববাহক দাস (عبده و رسوله) ছিলেন। যীশু এবং অপরাপর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরাও ঐরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকই ছিলেন। ঐশ্বরিক গুণ বা ক্ষমতা কাহারই ছিল না।

আব্দুল লতীফ।

---

* ইহুদি ধর্ম্মের ইহুদীগণ তেমনি আদিতে একেশ্বরবাদ ছিল। কালক্রমে উহার মধ্যে অনেকেশ্বরবাদ প্রবেশ করে। খৃষ্টানেরা যেমন যীশুকে খোদার পুত্র বলেন, তাঁহাদের পয়গম্বর হজরত ওজের (Ezra) কে খোদার পুত্র বলিয়া মানিতেন। লেখক খ্রীষ্টীয়ানগণ এসম্বন্ধে নানাকথা বলেন। —সম্পাদক।

পুণ্যকথা।

(২)

হজরত সৎকবিতা ভাল বাসিতেন, অশ্লীল কবিতা ঘৃণা করিতেন। তিনি বলিতেন, সত্য শ্লোকাংশ যাহা কোন কবি কহিয়াছে, তাহা নবীদের এই কবিতার্দ্ধ الا كل شي ما خلا الله باطل স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত পদার্থ নশ্বর।

হজরত কখনও শারীরিক পরিশ্রমকে ঘৃণা করিতেন না। পরিখার (খন্দকের) যুদ্ধের দিন হজরত স্বয়ং শিষ্যগণ সহ মৃত্তিকা খনন করিতেছিলেন। তাঁহার উদরদেশ মৃত্তিকায় লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মাটি বহিতে বহিতে তিনি এই কবিতাটি পড়িতেছিলেন :—

والله لولا الله ما اهتدينا
و لا تصدقنا و لا صلينا *
فانزلن سكينة علينا
و ثبت الاقدام ان لاقينا
ان الاولى قد بغوا علينا
اذا ارادوا فتنة ابينا

আল্লার শপথ যদি আল্লার দয়া না হইত, না আমরা পথ প্রাপ্ত হইতাম, না দান করিতাম, না নামাজ পড়িতাম। যদি আমরা যুদ্ধ করি, আমাদের উপর নিশ্চয় শান্তি অবতীর্ণ করিও এবং আমাদের পদকে স্থির রাখিও। নিশ্চয় তাহারা প্রথমে আমাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। যখন তাহারা উৎপীড়ন করিতে সংকল্প করিল, আমরা তাহা দূর করিলাম। চীৎকার করিয়া—"আবায়না আবায়না" (দূর করিলাম, দূর করিলাম) কথা দুইটী বলিতেছিলেন।

(উভয়)

(২২) একদা হজরত কোন স্থানে যাইতেছিলেন। পথে বংশীধ্বনি শুনিয়া তিনি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন। যে পর্য্যন্ত শব্দ শুনা গিয়াছিল, তিনি সেই প্রকারে ছিলেন।

(এমাম আহমদ এবং আবুদাউদ)

(২৩) একদা এক কুখ্যাত দুষ্ট ব্যক্তি হজরতের নিকট আসিতে অনুমতি প্রার্থনা করিল। হজরত তাহাকে আসিতে দিলেন। সে উপবিষ্ট হইলে, হজরত প্রফুল্ল মুখে তাহার সহিত মিষ্ট আলাপ করিতে লাগিলেন। লোকটী চলিয়া গেলে, হজরত আয়শা সিদ্দিকা বলিলেন, "হে আল্লার রসুল, আপনিত ইহার সম্বন্ধে নানা প্রকার বলিয়াছিলেন; পুনরায়

তাহার সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিলেন ?" হজরত উত্তর করিলেন "তুমি আমাকে কবে অসৎ এবং রূঢ় বাক্য বলিতে শুনিয়াছ ?"

(উভয়)

(২৪) একদা প্রেরিত মহাপুরুষ কোন মসজিদে নমাজ পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া, আপনার উটের পা বাঁধিয়া, সেই মসজিদে প্রবেশ করিল, এবং হজরতের সহিত নমাজে যোগ দিল। নমাজ সমাপ্ত করিয়া, সে নিজের উটের নিকটে আসিয়া, তাহার পা খুলিয়া দিয়া, তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে আল্লাহ্ আমার উপর এবং মোহম্মদের উপর দয়া কর। আমাদের প্রাপ্য দয়ায় তুমি আর কাহাকেও অংশী করিও না।" হজরত ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমরা কি বল ? এ ব্যক্তি না ইহার উট বেশী মূর্খ ?

(আবু দাউদ)

(২৫) পয়গম্বর হইবার পূর্ব্বে হজরত মোহম্মদ বাণিজ্য করিতেন। সেই সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কিছু দ্রব্য ধারে ক্রয় করিয়াছিল। ক্রেতা সেই স্থানে দাম দিবার অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া যায়। তৎপরে সে এই বিষয় ভুলিয়া যায়। তিন দিন পরে স্মরণ হইলে, সে মূল্য লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল, হজরত সেই স্থানে বসিয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া হজরত বলিলেন, "তুমি আমাকে বড় মুস্কিলে ফেলিয়া দিয়াছিলে। আমি এই স্থানে তিন দিন পর্য্যন্ত তোমার অপেক্ষা করিতেছি।"

(আবু দাউদ)

(২৬) একদা প্রেরিত মহাপুরুষ এক গৃহে উপস্থিত ছিলেন। গৃহস্বামিণী নিজ পুত্রকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, "এস, আমি তোমাকে কিছু দিব।" হজরত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাহাকে কি জিনিস দিতে ইচ্ছা করিয়াছ !" গৃহস্বামিণী বলিল, "খেজুর।" হজরত বলিলেন, "সাবধান ! যদি তুমি তাহাকে কিছু না দিতে, তাহা হইলে তোমার পক্ষে মিথ্যা কথা বলার পাপ লেখা হইত।" (আবু দাউদ ও বয়হকী)

(২৭) কখন কখন প্রেরিত মহাপুরুষ সরল অথচ নির্দ্দোষ রহস্যালাপ করিতে ভাল বাসিতেন। একদা এক ব্যক্তি হজরতের নিকট আসিয়া আরোহণের জন্য একটী বাহন চাহিল। হজরত বলিলেন, "তোমার বাহনের জন্য উটের বাচ্চা দিব।" সে বলিল, "বাচ্চা লইয়া কি করিব ?" হজরত বলিলেন, "উট ত উটের বাচ্চাই।"

(তিরমিজী এবং আবু দাউদ)

(২৮) একদা এক বৃদ্ধা, প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হে আল্লার প্রেরিত, আমি কি বেহেস্তে (স্বর্গে) যাইতে পারিব না ?' "হজরত হাসিয়া বলিলেন "বেহেস্তে কোন বৃদ্ধা যাইবে না।" সে দুঃখিত হইয়া বলিল, "কেন ! তাহার কি অপরাধ ?" হজরত

উত্তর করিলেন, "তুমি কি কোরাণশরিফ পড় নাই ?" انا انشأنهن انشاء فجعلنهن ابكارا (নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে নূতন এক সৃষ্টিতে সৃষ্টি করিয়াছি। পরে তাহাদিগকে কুমারী করিয়াছি) বৃদ্ধা ইহা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। (রজীন)

(২৯) প্রেরিত মহাপুরুষের জাহের-বিন-হারাম নামে এক পল্লীগ্রামবাসী শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় ক্ষেত্রজাত ফল, মূল, শাক, সবজী হজরতকে উপহার দিতেন। হজরত ও তাঁহাকে সহরের জিনিষ প্রদান করিতেন। হজরত কোন দিন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "জাহের আমার গ্রামের গোমস্তা, আমি তাহার সহরের গোমস্তা।" হজরত তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এক দিন হজরত বাজারে গিয়াছিলেন, সেই খানে জাহের জিনিস পত্র বেচিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া হজরত তাঁহার পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহার দুই চক্ষুর উপর হাত চাপিয়া ধরিলেন। জাহের তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। এই জন্য সে বলিলেন, "এ কে ? আমাকে ছাড়িয়া দাও," পরে হজরতকে জানিতে পারিয়া, আপনার পৃষ্ঠদেশ হজরতের বক্ষে উত্তমরূপে রগড়াইতে লাগিলেন। হজরত সেইরূপে জাহেরকে ধরিয়া রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কে এই গোলামকে কিনিবে ?" জাহের কুৎসিত ছিলেন, তাই বলিলেন, "হে আল্লার রসুল, আপনি আমার জন্য খুব অল্প মূল্যই পাইবেন। "হজরত বলিলেন, কিন্তু আল্লার নিকট তোমার মূল্য কম নয়।" (শরহে সুন্নত)

(৩০) হোনয়নের যুদ্ধে হজরত একটী অশ্বতরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এক শিষ্য তাঁহার বাহনের বল্গা ধরিয়াছিলেন। যখন কাফেরগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল, তিনি অশ্বতর হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন انا النبي لا كذب - انا ابن عبد المطلب (আমি সেই নবী যে কখনও মিথ্যা বলে নাই। আমি আব্দুল মত্তালেবের সন্তান।) সেই দিন তাঁহার ন্যায় সাহসী ও বীরপুরুষ আর কেহ দেখে নাই।

(উভয়)

(৩১) হজরত শিষ্যগণকে বলিতেন, "তোমরা আমার প্রশংসায় এরূপ বাহুল্য করিও না, যেরূপ খৃষ্টানগণ মরিয়ম পুত্রকে বাড়াইয়া দিয়াছে। নিশ্চয় আমি আল্লার দাস; অতএব তোমরা আমাকে আল্লার দাস ও তাঁহার পয়গম্বর বলিও।" কেমন তাঁহার বিনয় ছিল!

(উভয়)

(৩২) বনি আমেরের দূতরূপে কয়েক ব্যক্তি, প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট আসিয়াছিল। তাহারা নিবেদন করিল, "আপনি আমাদিগের প্রভু।" হজরত বাধা দিয়া বলিলেন, "প্রভু ত আল্লাহতালা।" তখন তাহারা বলিল "আপনি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।" হজরত বলিলেন, "এই প্রকার বল কিংবা ইহা হইতে কম। শয়তান যেন তোমাদিগকে নিজের মুখ-পাত্র না করে।" (আবু দাউদ)

(৩৩) মহাত্মা জাহেমা প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট আসিয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মাতা জীবিত আছেন ?" তিনি

বলিলেন, "হাঁ।" হজরত আদেশ করিলেন, "তবে তুমি তাঁহার নিকট থাক। জানিও বেহেশ্‌ত্‌ তাঁহার পদতলে।" (ইমাম আহ্‌মদ, নেসায়ী এবং বয়হকী)

(৩৪) একদিন প্রেরিত মহাপুরুষ শিষ্যগণসহ বেড়াইতে ছিলেন। তখন তিনি একটী উচ্চ গুম্বদ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি ?" শিষ্যগণ বলিলেন, "ইহা অমুক আন্‌সারীর গৃহ।" হজরত শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ইহার পর একদিন হজরত বসিয়াছিলেন এমন সময় সেই আনসরী আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিল। হজরত তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এইরূপে কয়েক বার মুখ ফিরাইয়া লইলে, সেই ব্যক্তি তাঁহার অসন্তোষ জানিতে পারিল। সে আপন বন্ধুদিগের নিকট দুঃখ করিয়া কহিল, "আল্লার শপথ, রসুল আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।" তাঁহারা হজরতের গুম্বদ দেখার কথা বলিলেন। সেই ব্যক্তি যাইয়া গুম্বদ ভূমিসাৎ করিয়া দিল। আর একদিন প্রেরিত মহাপুরুষ সেই দিকে গিয়াছিলেন। গুম্বদ দেখিতে না পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুম্বদ কি হইল ?" শিষ্যেরা সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। হজরত বলিলেন, "যাহারা বিশেষ আবশ্যক ব্যতিরেকে অট্টালিকা প্রস্তুত করে, তাহাদের জন্য অমঙ্গল আছে।"

(আবু দাউদ)

(৩৫) প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "আমার প্রভু আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমার জন্য মক্কার কঙ্কর সুবর্ণ হইয়া যায়। আমি নিবেদন করিলাম, 'হে প্রভু এরূপ নয়, কিন্তু আমি প্রার্থনা করি, যেন একদিন আমি পেট ভরিয়া খাইতে পাই এবং একদিন যেন আমি ক্ষুধার্ত্ত থাকি। তাহা হইলে, যখন আমি ক্ষুধার্ত্ত থাকিব, তখন তোমার নিকট অনুনয় বিনয় করিব এবং যখন আমি তৃপ্ত থাকিব, তখন তোমার প্রশংসাবাদ করিব এবং তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।'

(এমাম আহ্‌মদ ও তিরমিজি)

(৩৬) হজরত আয়শা বলেন, "আমার কামরায় একটী পর্দ্দা ছিল, তাহাতে একটী পক্ষীর চিত্র অঙ্কিত ছিল। একদিন প্রেরিত মহাপুরুষ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "অয়ি আয়শা! উহা বদলাইয়া ফেল। কেননা যখনই আমি উহা দেখি, সংসারের কথা মনে হয়।"

(এমাম আহ্‌মদ)

(৩৭) প্রেরিত মহাপুরুষ মহাত্মা মা'জ-বিন্‌-যবলকে য়্যামানের শাসনকর্ত্তা করিয়া রওনা করিয়া দিলেন। মা'জ বাহনোপরি ছিলেন। মা'জ বার বার বলিতে ছিলেন, "হে আল্লার রসুল, হয় আপনিও বাহনের উপর আসুন, না হয় আমাকে নীচে নামিতে দিন।" হজরত বলিলেন "না মা'জ, তুমি বাহনের উপর থাক, আমাকে পদব্রজে চলিতে দাও। আমি এইজন্য হাঁটিয়া যাইতেছি যে, আল্লার জন্য যদি আমার পায় ধুলি লাগিয়া যায়, আমি এই সময় তাহা বহু মূল্য মনে করিতেছি।" হজরত উপদেশ শেষ করিয়া, মা'জকে বলিলেন, "তুমি এই বৎসর অন্তে পুনরায় আমার সহিত আর মিলিবে না। হয়ত তুমি আমার এই মসজিদে কিংবা আমার

কবরের নিকট আসিবে।” ইহা শুনিয়া মা'জ হজরতের ভাবী বিচ্ছেদের শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। হজরত মদিনার দিকে আপনার মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, ধার্ম্মিকগণ আমার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, সে যে বংশেরই হউক এবং যে স্থানেই হউক।”

(ইমাম আহ্‌মদ)

(৩৮) এক ধনী ব্যক্তি রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, হজরত স্বীয় পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই লোকটীর সম্বন্ধে তোমার কি মত ?” সে বলিল “ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আল্লার শপথ, যদি ইনি কোন স্থানে বিবাহ প্রস্তাব করেন, লোকে সাগ্রহে বিবাহ দিবে। এবং যদি কাহার জন্য সুপারিস করেন, তাঁহার সুপারিস লোকে মানিয়া লইবে।” রসুললাল্লাহ ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পুনরায় এক ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইল। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, ”এই ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমার কি মত ?” সে উত্তর করিল “এ একজন গরীব মুসলমান। যদি এই ব্যক্তি কোথায় বিবাহ-সম্বন্ধ করে, কেহই তাহাকে বিবাহ দিবে না। যদি সে কাহারও জন্য সুপারিস করে, তবে তাহার সুপারিস গ্রাহ্য হয় না। এবং যদি কোন কথা বলে কেহই তাহা শুনে না।” হজরত বলিলেন, “এই ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির ন্যায় পৃথিবীর সমস্ত লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” (উভয়)

(৩৯) হজরত আয়শা সিদ্দীকা বর্ণন করেন। প্রেরিত মহাপুরুষের পরিজনবর্গ উপর্য্যুপরি দুইদিন যবের রুটীও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই। এমন সময় তাঁহার লোকান্তর গমন হয়।

(উভয়)

হজরত মৃত্যু পর্য্যন্ত যবের রুটী উপর্য্যুপরি দুই দিন পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই। যদি একদিন খাইতেন, দ্বিতীয় দিন উপবাস যাইত ; যদি একদিন রুটী পাইতেন দ্বিতীয় দিন খর্জ্জুর খাইয়া দিন কাটাইতে হইত। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত হজরতের পরিজনবর্গের এই অবস্থা ছিল।

(৪০) প্রেরিত মহাপুরুষ প্রার্থনা করিতেন,—“হে আল্লাহতালা তুমি আমাকে দরিদ্র অবস্থায় জীবিত রাখিও, দরিদ্রাবস্থায় মৃত্যুগ্রস্থ করিও এবং দরিদ্রদিগেরই সহিত বিচার দিনে সমবেত করিও।” হজরত আয়শা জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে আল্লার রসুল, ইহা কি জন্য ?” “হজরত উত্তর করিলেন, “নিশ্চয় ইহারা ধনী হইতে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বেহেস্তে যাইবে। অয়ি আয়শা, কোন দরিদ্রকে রিক্তহস্তে ফিরাইওনা। যদি খেজুরের টুকরাও হয়, তাহাও দিবে। অয়ি আয়শা, দরিদ্রকে নিজের নিকটবর্ত্তী জানিও। তবে, নিশ্চয় বিচারদিনে আল্লাহ্‌তালা তোমাকে আপনার নিকটবর্ত্তী করিবেন।

(তিরমিজি, বয়হকী এবং এবনে মাযা)

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌।

নূর-ইসলাম।

মিসেস এনি বেশান্তের "ইসলাম" শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিলে বাস্তবিক মোহিত হইতে হয়। "ইসলাম" শব্দের সমভিব্যাহারে মিসেস বেশান্তের নাম শুনিয়া আপনারা কেহ ভীত হইবেন না। প্রথমে আমারও আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তিনি হয়ত তাঁহার 'থিয়োসফী' ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া আমাদের একমাত্র সম্বল ইসলামের উপর, খানিকটা হাত সাফ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমার সে ভ্রান্তি দূর হইল। হাত সাফ করা ত অতি দূরে—ইহার প্রতি পত্র—প্রতি ছত্র সুপক্ক আঙ্গুরের ন্যায় অতি মিষ্ট ভক্তিরসে পরিপূর্ণ! তিনি নূর-ইসলাম (বা ইসলাম-জ্যোতির) এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না।—এমন কি প্রিয় বঙ্গভাষায় ইহার মর্ম্মোদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

তবে কথা এই যে, অনুবাদ করিবার মত ক্ষমতা ও বিদ্যাবুদ্ধি সকলের থাকে না—বিশেষতঃ আমার ন্যায় লোকের তাদৃশ চেষ্টা! তাহাতে আবার আমি বহু চেষ্টা করিয়াও মিসেস এনি বেশান্তের মূল ইংরাজী বক্তৃতা-পুস্তিকা খানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমাকে উহার উর্দ্দু অনুবাদের উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। অনুবাদক মহোদয় অতি উচ্চ (সুফিধর্ম্ম ভাবপূর্ণ) ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন! সুতরাং আমি যদি ঐ অনুবাদের অনুবাদ করিতে গিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, নিজের ভাব ব্যক্ত এবং বিকৃত ভাষা ব্যবহার করিয়া ফেলি, সে ত্রুটি মার্জ্জনীয় বলিয়া ভরসা করি।

আর একটি কথা,—মিসেস এনি বেশান্ত যেমন হজরতের নাম উল্লেখ করিতে অত্যধিক সম্মানের ভাষা ব্যবহার না করিয়া, ভক্তের সরল ভাবপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, অনুবাদক মৌঃ হাসেনউদ্দিন সাহেবও তদ্রূপ করিয়াছেন; যথা "আব ওহ মহম্মদ সিরফ্ মহম্মদ হি না রহা বাল্কে ওহ পয়গম্বরে-আরব হুয়া"* ইত্যাদি। ভাব ও ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে আমিও অনুবাদক মহাশয়ের প্রথা অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আর দিবাকরের সমুজ্জ্বল কান্তি দেখাইবার জন্য, অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না; পুষ্পের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের নিমিত্ত অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক, আশা করি, আমি আড়ম্বরপূর্ণ সম্মানসূচক শব্দের বহুল প্রয়োগ বর্জ্জন করায় দোষী হই নাই।

এখন আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন, মিসেস বেশান্ত কি বলিতেছেন:—

ভদ্র মহোদয়গণ!

প্রত্যেক দেশের জাতীয় উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতির যাবতীয় কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান কারণ হইতেছে—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি কিম্বা সভ্যতা লাভ করিতে পারে না। যে দেশের সমুদয় অধিবাসী একই ধর্ম্মাবলম্বী,

---

* اب وہ محمد صرف محمد هي نہ رہا بلکہ پیغمبر عرب ہوا

যে দেশে সকলে একই ভাবে একই ঈশ্বরের পূজা করে—তাঁহাকে সকলে একই নামে ডাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মনোভাব একই সূত্রে গ্রথিত থাকে, সে দেশ অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মতে যে দেশে এক ঈশ্বরকে লোকে বিভিন্ন নামে ডাকে; একই ঈশ্বরের উপাসনা বিবিধ প্রণালীতে হয়; একই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট লোকে বিভিন্ন ভাষায় প্রার্থনা করে, তথাপি সকলে ইহাই মনে করে যে, আমরা সকলে একই গন্তব্যস্থানে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়াছি, এবং এইরূপ পার্থক্যের মধ্যে একতা থাকে; যদি কোন দেশের ঐ অবস্থা হইত, (কিন্তু অদ্যাপি এমন কোন ভাগ্যবতী দেশের বিষয় জানা যায় নাই।)—আমার মতে সে দেশ নিশ্চয়ই ধর্ম্মে প্রধান হইত।

অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন ধর্ম্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এই আদর্শের অদ্বিতীয় দেশ—ইহার তুলনা এ ভারত নিজেই। এ দেশে এত স্বতন্ত্র ধর্ম্ম এবং এত পৃথক বিশ্বাসের লোক বাস করে যে, মনে হয় যেন ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম-মত-সমূহের প্রদর্শনী-ক্ষেত্র। এবং এই দেশই সেইস্থান, যেখানে পরস্পরের একতা, মিত্রতা এবং সহানুভূতির মধ্যে ধর্ম্মের সেই আদর্শ—যাহাকে আমি ইতঃপূর্ব্বে বাঞ্ছনীয় বলিয়াছি—পাওয়া যাইতে পারে।

আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি আপনাদিগকে চারিটি প্রধান ধর্ম্মের, অর্থাৎ বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়, হিন্দু এবং অনল-পূজার বিষয় বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের, অর্থাৎ ইসলাম, জৈনমত এবং শিখধর্ম্মের আলোচনা রহিয়া গিয়াছিল। এই তিন ধর্ম্ম—যাহা ভারতবর্ষের প্রধান সাতটি ধর্ম্মের অন্তর্গত—ইহাদের পরস্পরে এত অনৈক্য দেখা যায় যে, ইহারা একে অপরের রক্ত-পিপাসু হইয়া উঠে এবং দুইজনের মনের মিলনের পক্ষে এই ধর্ম্ম-পার্থক্য এক বিষম অন্তরায় হইয়া আছে।

আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, ভারতবর্ষ হেন দেশে যদি সকলে চক্ষু হইতে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করতঃ চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, "আমরা প্রকৃতপক্ষে একই প্রভুর উপাসনা বিভিন্ন প্রণালীতে করিতেছি—একই প্রভুকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিতেছি।"

["পুরাও পুরাও মনস্কাম,—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা?"—
ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"সকলে তাঁরেই ডাকে,
আমি যাঁরে ডাকি,—
রাঙ্গা রবি নিয়া বুকে ঊষা ডাকে সোণামুখে
গোধূলি বালিকা ডাকে
শ্যাম ছটা মাখি।"—
মানকুমারী দেবী।]

আর, একই স্থান হইতে আমরা আসিয়াছি এবং সেইখানে পুনরায় যাইতেছি। ইহার ফল এই হইবে যে, একে অপরের সহিত নিতান্ত আন্তরিক ও প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে মিশিতে পারিবে। একের দুঃখে অপরে দুঃখিত হইবে—সমুদয় ভারতবাসী একই জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু জগতের বড় বড় শক্তিপুঞ্জ ভারতসন্তানকে একজাতি বলিয়া স্বীকার করিবে। যখন হিন্দু-মুসলমানে, পারসী-খ্রীষ্টানে, জৈন-য়ীহুদীতে এবং বৌদ্ধ-শিখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আলিঙ্গন হইবে, তখন আমি মনে করিব যে, ধর্ম্মের জয় এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পবিত্র নাম শান্তিপ্রদ হইয়াছে।

অদ্য আমি ইসলাম-সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব এবং আগামী কল্য ও পরশ্ব অবশিষ্ট দুই ধর্ম্ম সম্বন্ধে, এবং অনন্তর সমুদয় ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম—সারতত্ত্ব অর্থাৎ সেই থিয়োসফী (ব্রহ্মজ্ঞান-বা "এলমে-এলাহী") সম্বন্ধে আলোচনা করিব, যাহাতে প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসের সারভাগ আছে এবং যাহা সকলের উপর একই প্রকার অধিকার রাখে—যাহাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি তাহার নিজস্ব বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বলিতে পারে না; বরং তদ্বিপরীত যে কোন ধর্ম্মবিশ্বাসের অধিকারী বলিতে পারে যে, ইহাই আমারও ধর্ম্ম। অদ্য সমিতির সম্বাৎসরিক অধিবেশন দিনে আমার এই প্রার্থনা যে, বিশ্ব-সংসারের সমুদয় ধর্ম্মগুরুদের পবিত্র-আত্মা আমাদের ও আমাদের কার্য্যকলাপের প্রতি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুন—যেন তাঁহাদের শিষ্য-মণ্ডলী একজন অপরকে ভাল বাসিতে পারেন। আমীন!

ইসলাম।

কোন ধর্ম্ম পরীক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে চারিটি বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম সেই ধর্ম্মের উৎপত্তির ইতিহাস, যাহার প্রভাব তাহাতে (সেই ধর্ম্মে) লুক্কায়িত থাকে। দ্বিতীয়, তাহার প্রকাশ্য বা বাহ্যিক মত অথবা শাখা পল্লব, যাহার সহিত সাধারণে সম্পর্ক রাখে। তৃতীয়, ধর্ম্মের দর্শন, যাহা বিদ্বান এবং সুশিক্ষিত লোকদের জন্য। চতুর্থ, ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য, যাহাতে সাধারণতঃ মানবের আপন অহং বা অস্তিত্বজ্ঞানের ভাণ্ডারের সহিত মিশিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমি এই কষ্টিপাথরে ইসলামকে পরীক্ষা করিয়া আপনা-দিগকে দেখাইতে চাই যে, সর্ব্বপ্রথমে আরব ও শামদেশের অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দেখুন, সে দেশের কি দশা ছিল।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন সমস্ত আরব, শাম ও আজমদেশে অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে কুসংস্কারের প্রবল ঝঞ্চানিল বহিতেছিল; যুদ্ধকলহ ও পরস্পরের রক্তারক্তি এক দলকে অন্য দল হইতে পৃথক করিতেছিল; হিংসা দ্বেষ এমন প্রবল ছিল যে, একই বিষয়ের ঝগড়া কয় পুরুষ পর্য্যন্ত চলিত; * যথা এক ব্যক্তি কোন বিষয় লইয়া অন্য একজনের সহিত বিবাদ

* আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সভ্যযুগেও বঙ্গীয় মুসলমানদের ঘরে ঐরূপ বংশানুক্রমে চিরস্থায়ী বিবাদ দেখা যায়। এইজন্য আমরা কলিকাতা হাইকোর্টে "Hereditary enemy" শব্দ শুনিতে পাই। আহা! কবে আমাদের প্রতি খোদাতালার রহমৎ হইবে!

করিল, অনন্তর শত বৎসর পরে একের পৌত্র অপরের পৌত্রকে শুধু এই অজুহাতে হত্যা করিত যে, "ইহার পিতামহ আমার পিতামহের শত্রু ছিল"! ইহা সেই আরব দেশ—যেখানে কেবল এই কথায় যুদ্ধ আরম্ভ হইত যে "তোমার উষ্ট্র আমার উষ্ট্রকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল কেন?" বাস্, এই সামান্য কারণে রক্তনদী প্রবাহিত হইত—শবরাশি স্তূপীকৃত হইত! এ সেই আরব দেশ—যেখানে নিষ্ঠুর পিতা, মাতার ক্রোড় হইতে শিশু কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া আসিত। আর হতভাগিনী নিরুপায় মাতা আপন স্বাভাবিক মাতৃস্নেহপূর্ণহৃদয়ের অসহ্য বেদনা লইয়া মরমে মরিয়া থাকিত। স্ত্রীলোক হওয়ার দরুণ পাষণ্ডস্বামীর ঐ নির্ম্মম অত্যাচারে আপত্তি করিতে পারে, এতটুকু ক্ষমতাও তাহার ছিল না। কাহাকেও জামাতা বলিতে না হয়, এইজন্য কন্যাহত্যা করা হইত। ইহা সেই দেশ, যেখানে ঘৃণিত পৌত্তলিকতা বিরাজমান ছিল—ঘরে ঘরে নূতন দেবতা; এক ঠাকুর আবার অন্য ঠাকুরের প্রাণের শত্রু! প্রতিমার সম্মুখে নরবলিদান'ত নিত্য ক্রীড়া ছিল; যেখানে মানবজাতির প্রতি স্নেহ মমতার পরিবর্ত্তে বিলাসিতা ও আত্মপরায়ণতা পূর্ণ মাত্রায় রাজত্ব করিত। যে কোন প্রবল ব্যক্তি আপন দুর্ব্বল প্রতিবেশীকে বিনা কারণে কিম্বা অতি সামান্য কারণে হত্যা করিয়া ফেলিত; তাহার ঐ দুষ্ক্রিয়ায় বাধা দিবার লোক'ত দূরে থাকুক, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবারও কেহ ছিল না।

তদানীন্তন আরবে বিলাসিতা ও অন্যান্য "মকারাদি" কুক্রিয়ার অন্ত ছিল না; এক স্বামী ভেড়া ছাগল প্রভৃতি পশুর ন্যায় অসংখ্য ভার্য্যা গ্রহণ করিত; আর এই বিষয়ে গৌরব করা হইত যে অমুক ধনী ব্যক্তি এত অসংখ্য স্ত্রীর স্বামী। ঈশ্বরের সৃষ্টি—স্ত্রীজাতি এমন জঘন্য দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধা ছিল যে, তাহারা নিতান্ত অসহায় গৃহপালিত পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিত। মোটের উপর এমন কোন নিকৃষ্ট পাপ ও জঘন্য দোষ নাই, যাহা তৎকালীন আরবে না ছিল।

সেই স্বার্থ, অত্যাচার ও আত্মপরতার পূতিগন্ধময় জলবায়ু পরিবেষ্টিত-এক কোরেশগৃহে একটি শিশু (সে পবিত্র শিশুরত্নের উদ্দেশে সহস্র দরুদ!) জন্মগ্রহণ করিলেন, যাঁহার পিতা তাঁহার জন্মের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর তিনিও সেইরূপ পিতা ছিলেন, যিনি তদীয় পিতৃকর্ত্তৃক কোন প্রতিমার সম্মুখে নরবলিরূপে আনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দেবালয়ের সেবিকার কৃপায়—সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।* এই

---

* হজরতের পিতামহ আবদুল মত্তালিব যে স্বীয় পুত্র হজরত আবদুল্লাকে প্রস্তর-মূর্ত্তির নিকট বলিদান করিতে গিয়াছিলেন, এ কথার সত্যতায় আমার একটু দ্বিধা বোধ হয়। আলেম ফাজেলগণ দয়া করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিলে বিশেষ বাধিত হইব। বাঙ্গালা "আমির হামজা" পুঁথিতে দেখিয়াছি,—

"কাফেরে খাজানা দিবে মোছলমান হৈয়া।
আমি এয়ছা বেটা তবে কিসের লাগিয়া॥"

শিশু এমন একটি হতভাগিনী দুঃখিনী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ইঁনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই বিধবা হইয়াছিলেন,—আর দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কয়েক মাস পরেই এ অবোধ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া স্বামীর অনুগমন করেন। ইহার ফলে এই পিতৃমাতৃহীন শিশু কিছু দিন স্বীয় পিতামহ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পিতামহও কয়েক বৎসর পরে দেহত্যাগ করিলেন। তখন সেই অসহায় বালক বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত, স্বীয় পিতৃব্য আবু তালেবের আশ্রয়ে রহিলেন। ইহা ত অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এইরূপ বিপদগ্রস্ত পিতৃমাতৃহীন সহায়সম্পদশূন্য একটি অজ্ঞান বালক যে শিক্ষাদীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। বাস্তবিক কার্য্যতঃও তাহাই হইয়াছিল। শিক্ষা বা অধ্যয়ন বলিতে একটি অক্ষরের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হয় নাই, নীতি বা আচার নিয়মের অনুশাসনের বাতাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তথাপি তাঁহার শৈশবকাল, অতি পবিত্র জীবনের উচ্চ আদর্শ ছিল। তাঁহার নির্ম্মল জীবনে মানবের বাঞ্ছনীয় যাবতীয় সদ্‌গুণরাজি—যথা, দয়া, সৌজন্য, প্রেম, ধৈর্য্য, নম্রতা, বিনয়, শান্তিপ্রিয়তা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি স্বভাবতঃ বিরাজমান ছিল। তিনি নানা গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বাল্যজীবন অতিক্রম করিয়া তিনি কৈশোরে উপনীত হইলেন। এখন জীবিকা-অর্জ্জনের নিমিত্ত তিনি আপন কোন বিধবা আত্মীয়ার গৃহে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। উক্ত বিধবা খদিজা বিবি তাঁহাকে পণ্যদ্রব্যসহ বাণিজ্য উপলক্ষে শামদেশে প্রেরণ করিতেন। এই বিষয়কর্ম্মে খদিজাবিবি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার এই নূতন কর্ম্মচারী অতিশয় ধর্ম্মভীরু, ন্যায়পরায়ণ, মিতব্যয়ী এবং অতি বিশ্বাসী। অতঃপর তিনি ইঁহার সহিত পরিণীতা হন।

ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই নবীন যুবক যাঁহার নাম মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম) ছিল, সে সময়ে পয়গম্বর হন নাই। আর তাঁহার পত্নী হজরত খদিজাও তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুবর্ত্তিনী ছিলেন না; তিনি স্বয়ং অল্পবয়স্ক তরুণ এবং তাঁহার জায়া তদপেক্ষা দ্বিগুণ বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর তাঁহারা এমন সুখের দাম্পত্য জীবন ভোগ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে তেমন মধুর দাম্পত্যজীবনের উচ্চ আদর্শ আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ—আর তেমনই ভাবে তাঁহাদের বিবাহ জীবনের পূর্ণ ২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার পর হজরত খদিজার মৃত্যু হইল। অতঃপর পয়গম্বর সাহেবের স্বভাব চরিত্র ও কার্য্যকলাপ সর্ব্বদাই অতি প্রশংসনীয় ছিল। যখন তিনি মক্কার সঙ্কীর্ণ গলিকুচাতে যাতায়াত করিতেন, সে সময় তত্রত্য ক্রীড়ারত অবোধ শিশুগণ তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিত, আর তিনি সততই তাহাদের সহিত স্নেহসিক্ত মিষ্টভাষায় কথা বলিতেন, তাহাদের মস্তকে হস্তামর্শন করিতেন। কেহ কখনও শুনে নাই যে, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা বিপদগ্রস্তের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন; বিধবা ও পিতৃহীন শিশুদের সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। প্রতিবেশিবর্গ তাঁহাকে “আমীন” (বিশ্বস্ত)

বলিয়া ডাকিত। "আমীন" শব্দের অর্থ বিশ্বাসভাজন—এমন উচ্চ ভাবপূর্ণ উপাধি কেবল শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিই বিশ্ব জগতের নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন। এখন আপনারা একটু চিন্তা করিয়া দেখুন'ত, যে ব্যক্তির বাহ্যিক জীবন জগতের পক্ষে এমন উপকারী এবং সুখ শান্তিপ্রদ ছিল, তাঁহার আভ্যন্তরীণ জীবন কেমন হইতে পারে। অহো! (সত্য তত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত) তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার বন্যাস্রোতের তাড়না তাঁহাকে বনে বনে ও জনপ্রাণিশূন্য মরুভূমে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি কতবার দিবানিশি অনশনে অনিদ্রায় বিপৎসঙ্কুল পর্ব্বতকন্দরে বাস করিতেন। তিনি যে ভাবে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ঈশ্বর-অনুসন্ধান করিতেন, তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা দুর্লভ; অথবা ইহার মর্ম্ম কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, যাঁহারা একাগ্রচিত্তে খোদার পথে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রমে হজরত মহম্মদের (দঃ) এই প্রকার ধ্যান-আরাধনা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে—অতি দূরে—ঘোর অরণ্যে চলিয়া যাইতেন; দুর্গম ও ভয়ঙ্কর গিরিগুহায় মাসাধিককাল পর্য্যন্ত বাস করিতেন—সেখানে শুধু সিজদায় (নতশিরে) পড়িয়া অনবরত রোদন ও বিলাপ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কাজ ছিল না। এমন কি তিনি অন্যূন পঞ্চদশ বর্ষ এই ভাবে যাপন করিলেন—অবশেষে সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসিল, যখন দৈববাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "উঠ! খোদায় পাকের (পবিত্র ঈশ্বরের) নাম উচ্চারণ কর!" কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না, সে শব্দ কাহার; অথবা ঐ আকাশবাণী বাস্তবিকই বিশ্বাসযোগ্য দৈববাণী কি না? কারণ তিনি বেশ জানিতেন যে, তিনি নিরক্ষর লোক ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইত যে, ইহা হয়ত তাঁহার ভ্রম বা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র—কিম্বা তাঁহার অহংজ্ঞান তাঁহাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত ঐরূপ শব্দ করিতেছে। এবং সম্ভবতঃ ইহা সেই দৈববাণী নহে, যাহা স্বয়ং খোদাতালার নিকট হইতে পয়গম্বরগণ শুনিতে পাইতেন, যাহাকে "এল্‌হাম" কিম্বা "অহি" বলে।

অবশেষে আর একবার যখন তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় অত্যন্ত আকুল ছিলেন, সহসা তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব এক অলৌকিক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, আর সেই আলোক রাশির মধ্যে একটী জ্যোতিষ্মান মূর্ত্তি দেখা দিয়া বলিলেন, "যাও, সত্য নাম উচ্চারণ কর।" একবার সাহসে ভর করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কাহাকে ডাকিব?" ইহার উত্তরে স্বর্গদূত তাঁহাকে ঈশ্বরের একত্ব, ফেরেশ্‌তাদের রহস্য, পৃথিবীর সৃষ্টি এবং মানবজাতির অস্তিত্ব বিষয়ে শিক্ষাদান করিলেন এবং তাঁহাকে সেই দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কর্ম্মভারের (পয়গম্বরী) কথাও বলিলেন, যে জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছে। অর্থাৎ দেবদূত বলিয়া দিলেন যে, তাঁহাকে বিশ্ব জগতের ধর্ম্মপথ প্রদর্শক এবং উপদেষ্টার কার্য্যভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

এদিকে দেবদূত অদৃশ্য হইলেন, ওদিকে হজরত মহম্মদ, (দঃ) যিনি এখন হইতে আরব দেশের পয়গম্বর নামে অভিহিত হইবেন, অত্যন্ত অস্থির ও ভীতি বিহ্বল চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা সতী হজরত

খদিজা উপযুক্ত শুশ্রূষা সহকারে তাঁহার তাদৃশ বিহ্বলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে পয়গম্বর সাহেব আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় ইহা আমার মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ।" ইহাতে পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণী অতিশয় শান্তনাপূর্ণ মধুর বচনে তাঁহার নিস্তেজ হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া বলিলেন, "না, না, তুমি সত্যবাদী—বিশ্বাসী—"আমীন ;" প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান ; পিতৃহীনের প্রতি স্নেহ বর্ষণ কর ; দরিদ্র, আতুর ও বিধবার প্রতি দয়া করিয়া থাক—এমন লোককে বিশ্বপাতা কখনই অকালে নষ্ট করিবেন না। প্রভু খোদাতালা কখনও বিশ্বাসী ভক্তদিগকে প্রবঞ্চনা করেন না। উঠ, এখন সেই দৈববাণী—প্রকৃত সত্য দৈববাণীর প্রত্যাদেশ অনুসারে কার্য্য কর।"

সেই পুণ্যবতী মহিলা, যিনি সর্ব্ব প্রথমে পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন,—এমনই সঞ্জীবনীসুধা পূর্ণ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে, তিনি—যিনি নিজের দুর্ব্বলতায় জড়ীভূত ও নিরুদ্দম হইয়া সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া বসিয়া ছিলেন, * এখন পূর্ণ সাহসে ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে, একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! আর সে মোহাম্মদ কেবল মোহাম্মদ মাত্রই রহিলেন না—বরং প্রতাপ প্রবলশালী পয়গম্বর হইয়া গেলেন! তিনি একটা অসভ্য, অরাজক দেশকে শান্তিপূর্ণ এবং একটা জন প্রাণিবিরল নগণ্য উপদ্বীপকে এক মহা সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ইউরোপে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোক লইয়া গেলেন, এই দুইটী বস্তু সেখানে প্রায় ছিলই না। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ পৃথিবীতে বড় বড় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহার সমবিশ্বাসীগণ এমন নিষ্ঠার সহিত এলাহীর ধ্যান ও স্মরণে নিমগ্ন হইলেন যে, তাহার আদর্শ অন্য কোন ধর্ম্মে পাওয়া সম্ভবপর কি না সন্দেহ। কারণ আপনারা একটু চিন্তা করিলে এবং ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্য কোন ধর্ম্ম এমন নাই, যাহাতে এমন অকপট হৃদয় সত্যবিশ্বাসী লোক পাওয়া যায়। এই জ্ঞান বিশ্বাস তাহারা (মুসলমানেরা) আরবের পয়গম্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

যদি বেন সাহেবের কথামত ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় যে, সাধারণ আচার ব্যবহার হইতে ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনারা ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং ভাবিয়া দেখুন, তাঁহার (হজরতের) বাক্য সমূহ তাঁহার শিষ্যবর্গের হৃদয়ে কেমন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। মুসলমানেরা আরবের পয়গম্বর হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস এমন সুদৃঢ় যে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ স্থান পায় না।

একজন মুসলমান—যদ্যপি এমন কোন স্থানে, এমন কতকগুলি লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, যাহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছুরিকায় খণ্ড খণ্ড করে এবং তাহার পয়গম্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে—নমাজে মস্তক অবনত করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না। *

---

* ইহা মিসেস বেশান্তের অতিশয়োক্তি। (সম্পাদক)

* মিসেস এনি বেশান্তের বর্ণিত মুসলমান কি আমরাই ? ছি! ছি! ধিক্ আমাদের! আমরা মুসলমান নামের কলঙ্ক। বঙ্গদেশে দড়ি ও কলসী একেবারে নাই কি ?

আপনারা আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন, পয়গম্বরের সুপারিশের (শাফা'আতের) প্রতি তাহাদের বিশ্বাস কেমন অটল যে, তাহারা মৃত্যুভয় একেবারে জয় করিয়া ফেলিয়াছে। আফ্রিকার দরবেশবৃন্দের সৎসাহসের তুলনা কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন কি ?—যাঁহারা ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু তোপ-কামানের সম্মুখে স্থিরভাবে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবার জন্য এমনই আনন্দের সহিত অগ্রসর হইতেন, যেন বরযাত্রিরূপে কোন বিবাহ সভায় যাইতেছেন! এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের দলের কয়েক ব্যক্তি শত্রুসেনা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পারিতেন, সে পর্য্যন্ত দলে দলে কামানে ধ্বংস হইতেন। সে কোন্ উদ্দীপনা ছিল, যাহা তাঁহাদিগকে এমন ভীষণ মৃত্যুমুখে লইয়া যাইত? তাহা কেবল পয়গম্বরের—কোরআনের মহিমা, এবং ইসলামপ্রেম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, (তাঁহাদের) এই ভক্তি পৃথিবীতে ভবিষ্যতেও অটল রহিবে, বরং বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিবে। (আমীন!)

ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রমাণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাহা এই যে ঃ—পয়গম্বরের "নবুয়তে" সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাঁহার সহধর্ম্মিনী—যিনি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সমুদয় রহস্য অবগত ছিলেন, আর তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার আশৈশব জীবনের স্বভাব-চরিত্র সমুদয় উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এই বিষয় যদি আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে, পয়গম্বরের সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে অতি জ্বলন্ত প্রমাণ পাইবেন। আপনারা নিজেরাই বেশ জানেন যে, কোন বিজ্ঞ বক্তৃতানিপুণ ব্যক্তি কোন সভা সমিতিতে গিয়া বেশ ঝাড়া দুই ঘণ্টা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রভাবে শ্রোতৃবর্গকে মোহিত ও চমৎকৃত করিয়া স্বমতে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারে—যেহেতু সে সময় লোকে তাহাকে কেবল বক্তৃতা-মঞ্চেই দেখে; তাহার আভ্যন্তরীণ জীবনের অবস্থা কিছু জানে না। কিন্তু ইহা বড় কঠিন, এমন কি অসম্ভব যে নিজের স্ত্রী, কন্যা, জামাতা প্রভৃতি অতি নিকটবর্ত্তী আত্মীয়গণ তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে—যদি সে ব্যক্তি বাস্তবিক তদ্রূপ নির্ম্মল ও সত্যপর না হয়। আমাদের মতে ইহারই নাম "পয়গম্বরী" এবং সত্য বলিতে কি, এমন বিশ্বব্যাপী জয়লাভ হজরত মসিহের (যীশুর) ভাগ্যেও ঘটে নাই। *

(ক্রমশঃ)

মিসেস আর, এস, হোসেন।

---

* অল্পদিন হইল—মুসলমান গ্রন্থকারগণ ইংরাজী ভাষায় এসলাম-সম্বন্ধে পুস্তক পুস্তিকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে ইউরোপে এসলাম সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্যই খ্রীষ্টান মিশনের এজেন্সী হইতে সংগ্রহ করা হইত—কাজেই অজ্ঞ ইউরোপ এসলামের নামে একেবারে শিহরিয়া উঠিত। এই অল্পদিনের চেষ্টায় কিরূপ ফল হইয়াছে, এই বক্তৃতা হইতেই তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। লর্ড হেড্‌লি, খাজা কামালুদ্দিন, মিঃ, এহয়া-উন-নাস্‌র পার্কিনসন প্রভৃতি মুসলমান লেখকগণের চেষ্টায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কিরূপ মত পরিবর্ত্তন হইতেছে, "Islamic Review" পত্র পাঠ করিলে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে। —সম্পাদক।

হাদিসের বিশ্বস্ততা

হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (স) যাহা করিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন এবং অপরকে যাহা করিতে দেখিয়া মৌনাবলম্বনে সম্মতি দিয়াছেন,—তাঁহার সাহাবী বা সহচরবর্গ সেই সকল উক্তি বা ঘটনার কথা পরবর্ত্তী লোকদিগের নিকট বর্ণনা করেন। সাহাবীদিগের মুখে শুনিয়া তাবেয়ী (বা পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ) অপর লোকদিগের নিকট সেই কথা বর্ণনা করেন। এই ভাবে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) সমস্ত কার্য্যকলাপ বা আদেশ উপদেশ ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয়। গ্রন্থকার কাহার মুখে শুনিয়াছেন; যাঁহার মুখে তিনি শুনিয়াছেন, তিনি আবার কাহার মুখে শুনিয়াছেন—হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত সেই সকল সাক্ষী বা রাবীর নাম প্রত্যেক হাদিসের সঙ্গে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পরম্পরাগত সাক্ষীদিগকে রাবী ও তাঁহাদের বর্ণিত সাক্ষ্যগুলিকে হাদিস নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কোর'আনের পরই হাদিসের স্থান। বলা বাহুল্য যে, এসলামের বহুতর শিক্ষা এই সকল হাদিসের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। হাদিস শাস্ত্রের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা সম্বন্ধে, মুসলমান পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক যে সকল অমূল্য পুস্তকাদি রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে রাবীদিগের চরিত্র সমালোচনা বা جرح و تعديل অন্যতম। এই পণ্ডিতেরা প্রত্যেক যুগের হাদিসবর্ণনাকারী বা রাবীদিগের বিস্তৃত-জীবনবৃতান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সকল চরিত-পুস্তকে, প্রত্যেক রাবীর জন্ম, মৃত্যু, বয়স, নৈতিক অবস্থা, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, স্মরণশক্তি ইত্যাদি প্রত্যেক আবশ্যকীয় প্রসঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করা হইয়াছে। রাবীদিগের চরিত্রের অতি সামান্য একটু দোষও তাঁহাদের চোখ এড়াইতে পারে নাই। রাবী-গণের দোষত্রুটী সম্বন্ধে তাঁহাদের সমসাময়িক ধর্ম্মাত্মা পণ্ডিতগণ কে কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও তাঁহারা সঙ্কলন করিয়াছেন। ফলতঃ হাদিসগুলি যাহাতে কোন প্রকারে বিকৃত হইতে না পারে; যাহাতে কোন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি, স্বকপোল কল্পিত কোন কথা হাদিস বলিয়া চালাইয়া দিতে না পারে, রাবীদিগের ভ্রম-প্রমাদ যাহাতে কস্মিন কালেও হাদিসের অঙ্গীভূত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য 'এই চরিত-শাস্ত্র' বা ফান্নে রেজ্জালের (فن رجال) গ্রন্থকারগণ, মানব শক্তির আয়ত্তাধীন কোন প্রকার যত্ন-চেষ্টা বা সাবধানতা অবলম্বনে ত্রুটী করেন নাই। বস্তুতঃ—কোরআনের কথা দূরে থাকুক—এই হাদিসগুলির বিশ্বস্ততা রক্ষাকল্পে, মুসলমান পণ্ডিতগণ যে প্রকার অভাবনীয় কষ্ট স্বীকার ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, জগতের কোন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহার শতাংশের একাংশও যত্ন লওয়া বা সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। সার উইলিয়ম মুর প্রভৃতি খ্রীষ্টান লেখকগণ, এহেন যত্নের সহিত সঙ্কলিত ও সংরক্ষিত হাদিস সমূহের অবিশ্বস্ততা প্রমাণ করিবার জন্য, চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। এই শ্রেণীর লেখকদিগের অন্যায় যুক্তি-জাল ছিন্ন করিবার বা মৌলিকভাবে হাদিস শাস্ত্রের বিশ্বস্ততা প্রতিপাদনের জন্য,

এই সন্দর্ভের অবতারণা করা হয় নাই। আজ আমরা হাদিস শাস্ত্রের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ উপস্থিত করিব।

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষভাগে—হোদায়বিয়ার যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করার পর—হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের নিকট, এসলামধর্ম্ম গ্রহণের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করেন। বোখারী, মোসলেম প্রভৃতি হাদিসের কেতাবে এই প্রকার অনেক পত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালীন মিসর-রাজ মাকাউকিসের (Maqauqis) নিকটও এইরূপ একখানা পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, 'মওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' প্রভৃতি বহু হাদিস গ্রন্থে এই সমস্ত বিবরণ জানিতে পারা যায়। রাবী বলিতেছেন ঃ—

كتب صلى الله عليه و سلم الى المقوقس ملك مصر والاسكندرية و اسمه جريج ابن مينا—بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد عبدالله و رسوله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى - اما بعد - فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم - يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم القبط - يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولو فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

الله
رسول
محمد

অনুবাদ ঃ—তিনি (হজরত মোহাম্মদ)—তাঁহার উপর আল্লার আশীর্ব্বাদ হউক—মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার অধিপতি মাকাউকিসকে—যাহার নাম 'জারিহ এবনে মীনা' ছিল—লিখিলেন—

"দাতা ও দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি।

আল্লাহর দাস ও প্রেরিত মোহাম্মদের পক্ষ হইতে, কব্তি দিগের অধিনায়ক মাকাউকিসের প্রতি। সৎপথের অনুসরণকারীদিগের প্রতি সালাম (শান্তি হউক)। অতঃপর, আমি তোমাকে এসলামের দিকে আহ্বান করিতেছি। এসলাম গ্রহণ কর—শান্তি প্রাপ্ত হইবে, আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুণ্য প্রদান করিবেন। আর যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহা হইলে সমস্ত কব্তি জাতির (Copts) পাপের জন্য তুমি দায়ী হইবে।*—হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা সেই সত্যের দিকে অগ্রসর হও—যাহা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত, যথা ঃ—আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও পূজা করিব না, এবং তাহার পূজায় আর কাহাকেও শরিক (অংশী) করিব না এবং আমাদের কোন মানব, আল্লাহকে ছাড়িয়া অপর মানবকে খোদা বলিয়া গ্রহণ করিবে না;

* নিম্নরেখ অংশটুকু 'কোর'আন' হইতে উদ্ধৃত।

পরন্তু যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে, তবে বলিয়া দাও—তোমরা সাক্ষী থাকিও যে আমরা মুসলমান।

(হজরতের মোহরের অনুবাদ।)

আল্লার
প্রেরিত
মোহাম্মাদ

হাদিসে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'হাতেব-এব্‌নে-বাল্‌তায়া' নামক জনৈক সাহাবী এই পত্র লইয়া মাকাউকিসের নিকটে উপস্থিত হইলে, হাতেবের সহিত তাঁহার অনেক বাদ প্রতিবাদ হয়, এবং শেষে—

واخذ كتاب النبى صلعم فجعله فى حق من عاج و رفعه لجارية له

মাকাউকিস হজরতের পত্র লইয়া অতিশয় মূল্যবান হস্তী-দন্ত-নির্ম্মিত কৌটাতে বন্ধ করিয়া তুলিয়া রাখিলেন। সুতরাং পত্রখানা যে রাজকোষে সুরক্ষিত হইয়াছিল, এই হাদিসেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন ফরাসী পর্য্যটক মিসরের একটি খ্রীষ্টীয় মঠ (convent) হইতে ঐ মূল পত্রের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। এখন উহা রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপল নগরের সরকারী পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইয়াছে। ডাঃ পি, বেজার (Dr. P. Badger) নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ উহার যে 'পাঠোদ্ধার' (decipher) করিয়াছেন, তাহাতে হাদিসের বর্ণিত পত্রের সহিত এই নবাবিষ্কৃত পত্র, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইতেছে। কেবল ডাঃ বেজার একস্থানে 'আয়েন' বর্ণের পরবর্ত্তী একটা আকার এ-বর্ণের পূর্ব্বে যোগ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা বেজারেরই ভুল। পত্রের চতুর্থ ছত্রে আকার বা আলেফ যে আয়েন বর্ণের পরে লিখিত হইয়াছে, প্রত্যেক অভিজ্ঞ পাঠকই তাহা স্বীকার করিবেন। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ কল্পে, এ পত্রের একখানা অবিকল ছায়াচিত্র স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই পত্রখানার আবিষ্কার স্থান—খৃষ্টীয় মঠ, আবিষ্কারক ফরাসী দেশীয় খৃষ্টান পর্য্যটকবর্গ, এবং উহার পাঠোদ্ধারও করিয়াছেন একজন অভিজ্ঞ খৃষ্টান পণ্ডিত। সুতরাং এই পত্রের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই হইতে পারে না।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হাদিস সঙ্কলন সম্বন্ধে কিরূপ সততা ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিরূপ অভাবনীয় দূরদর্শিতা ও ধী-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং হাদিসের বিশ্বস্ততা ও প্রামাণ্যতা যে কিরূপ অখণ্ডনীয় দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, উল্লিখিত নবাবিষ্কৃত পত্র তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। জ্ঞান বিজ্ঞানের যতই উন্নতি সাধিত হইবে, এসলামের সত্যতাও ততই দৃঢ়ীকৃত হইতে থাকিবে।
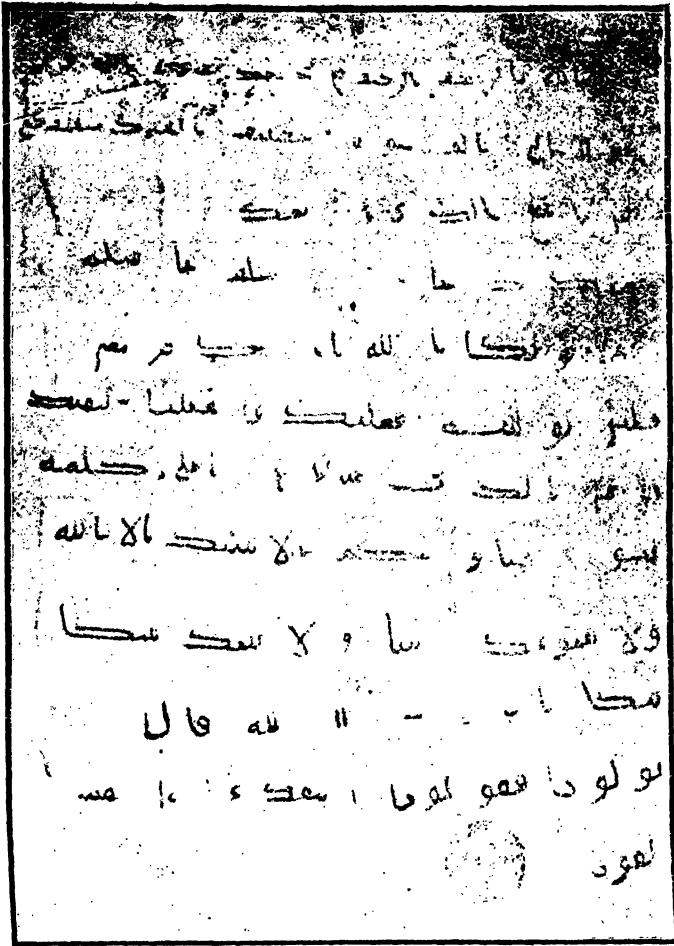
মিসর-পতি মাকউকিসের নিকট প্রেরিত হজরতের মোহরযুক্ত পত্রের ছায়াচিত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে, দ্বিতীয় সংখ্যা "আল্-এস্‌লাম" প্রকাশিত হইল। প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, যে সকল হিতৈষী ও বন্ধুবান্ধব আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহা-দিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। "আল্-এস্‌লামের" দোষ ত্রুটী সম্বন্ধে যে সকল অভিজ্ঞ সাহিত্যিক মূল্যবান উপদেশাদি দ্বারা আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকতর ধন্যবাদের পাত্র। প্রথম সংখ্যায় যে কয়টী দোষ ত্রুটী ঘটিয়াছে, আমাদের অভিজ্ঞতা, ও সময়ের অভাবই তাহার কারণ। ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ সতর্ক হইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

সাহিত্যের দিক দিয়া যাঁহারা "আল্-এস্‌লামের" সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের খেদ্‌মতে আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে,—কেবল "সাহিত্য" আলোচনার জন্যই 'আল্-এস্‌লাম' প্রচারিত হয় নাই। মতামত প্রকাশের সময় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "অল্-এস্‌লাম" আঞ্জুমানে ওলামার মুখ পত্র এবং এসলাম মিশনের প্রধানতম অবলম্বন। সুতরাং "কোহিনূর" "নবনূর" বা "বাসনার" অভাব তাহাদ্বারা পূরণ হওয়া অসম্ভব। ধর্ম্ম-তত্ত্বের আলোচনা, এস্‌লামের মাহাত্ম্য প্রচার, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা উপস্থাপিত সংশয়াদির খণ্ডন, সমাজ-সংস্কার, অন্ধবিশ্বাসাদির মূলোৎপাটন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুশীলন ও গবেষণা-প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তিসাধন প্রভৃতিই 'আল্-এস্‌লামের' প্রধানতম লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য। অবশ্য, ইতিহাস ও "সাহিত্য" সম্বন্ধেও 'আল্-এস্‌লাম' যথাসাধ্য সমাজের অভাব দূর করিতে ক্রুটী করিবে না। বলা বাহুল্য যে, এ সমস্তই সাহিত্য-আলোচনার গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত, বরং কোন জাতির অস্থি মজ্জার উপর সাহিত্যের স্থায়ী প্রভাব বিস্তৃত করার ইহাই প্রধান অবলম্বন।

'সাহিত্য' শব্দটির একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ গড়িয়া লওয়া কখনই সঙ্গত হইবে না। আমাদের মতে, বাংলা সাহিত্য কেবল বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়, অথবা মাত্র কাব্য ও উপন্যাসে সীমাবদ্ধ নহে; বোধ হয়, ইহা স্থায়ী ও কল্যাণকর সাহিত্যের প্রধান আশ্রয়স্থলও নহে। আর, মুসলমান সমাজের বিশেষ অভাবগুলির দিক দিয়া দেখিলে—উহা বিশেষ উপকারীও নহে। কেবল-উহাদ্বারা আমাদের অভাব মিটিবে না, জাতীয় মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা সাধিত হইবে না। তবে উহাও যে সাহিত্যের একটা আবশ্যকীয় শাখা, তাহাও আমরা অস্বীকার করিতেছি না।

"আল্-এস্‌লামের" ভাষা খুব কঠিন হইয়াছে বলিয়াও কোন কোন অভিজ্ঞ বন্ধু অনুযোগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—উহার ভাষা খুব সরল এবং খুব প্রাঞ্জল হওয়া উচিত। আদর্শ স্বরূপ তাঁহারা হিন্দু সম্পাদিত কয়েকখানা মাসিকের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। এই পরামর্শ যে খুবই সঙ্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, 'আল্-এস্‌লামের' প্রথম সংখ্যার অধিকাংশ প্রবন্ধ সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সব দেশ ও সব জাতিই পরিণামে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে—কিন্তু প্রথম অবস্থায় নহে। হিন্দু সমাজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়া বাংলা সাহিত্যের গতি ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাহা হইতে এখনও বহুদূরে অবস্থিত। "অভিধান খুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া কঠিন শব্দ ব্যবহার করা" যে খুব অন্যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাষাটাকে একেবারে নির্জ্জীব ফিরফিরে বাবু করিয়া তোলাও অনুচিত। এই প্রকার বাবু-ভাষা কোন পতিত জাতিকে হাত ধরিয়া তুলিতে পারে না। তবে সর্ব্বত্রই গুরুগম্ভীর বজ্রনিনাদেরও আমরা পক্ষপাতী নহি। সব জিনিষেরই এক একটা স্থানাস্থান আছে, সেদিকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা উচিত।

"উর্দ্দু-ফার্সীর কদর্য্য-অপভ্রংশ।"

বৈশাখ মাসের "প্রবাসী"তে কয়েকখানা মুসলমানরচিত বাংলা পুস্তকের সমালোচনা বাহির হইয়াছে। মৌলবী একরামুদ্দিন সাহেবের রচিত 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' নামক পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে, বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন :—"কোন মুসলমানের বাংলা রচনা পড়িতে বসিলেই আশঙ্কা হয়, না জানি উর্দ্দু-ফার্সীর কদর্য্য-অপভ্রংশ-মিশ্রিত হইয়া, বাংলা ভাষা তাহাতে কি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছে।.........ইহার ভাষায় একটুকুও জটিলতা কিম্বা উর্দ্দু-ফার্সী মুদ্রাদোষ নাই।" মৌলবী নজীবর রহমান প্রণীত "আনোয়ারা" উপন্যাসের সমালোচনায়, আরও লিখিত হইয়াছে—"গ্রন্থকারের ভাষায় এমন কয়েকটি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে—যাহা বাংলা ভাষায় অচল। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, তিনি জল না লিখিয়া লিখিয়াছেন 'পানি'। বাংলায় জল লিখিতে হইবে, পানি বাংলা নয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবারকার সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণে বলিয়াছেন—'যাহা চলতি, যাহা সকলে বুঝে, তাহাই চালাও ; যাহা চলতি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চলতি, তাহা ইংরেজীই হউক, পার্সীই হউক, সংস্কৃতই হউক,—চলুক।' আমাদের মতও তাই। কিন্তু তাই বলিয়া যেকোনো ইংরেজী, সংস্কৃত বা পার্সী শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিলেই বাংলা হইবে না। সে শব্দগুলি চলতি হওয়া চাই।"

উর্দ্দু-ফার্সী শব্দ বা তাহার 'অপভ্রংশের কদর্য্যতা,' সমালোচক মহাশয়ের পক্ষে এতদুর আশঙ্কাজনক কেন হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মুসলমানেরা 'পুথি' বা 'দোভাষী' বাংলায় যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে উর্দ্দু-ফার্সী শব্দের ব্যবহার বাহুল্য দেখা যায় বটে, কিন্তু উচ্চদরের হিন্দুলেখকদিগের লেখাতেই উর্দ্দু ফার্সীর "অপভ্রংশের" মাত্রা অধিক—মুসলমান লেখকেরা প্রায়ই শুদ্ধভাবেই ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করিয়া থাকেন। উক্ত পুথিগুলি দ্বারা বাংলা ভাষার যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক, কারণ, সমালোচক সম্ভবতঃ, ঐ পুথিগুলিকে উপলক্ষ করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করেন নই। আধুনিক মুসলমান লেখকগণের বাংলা বহি-পুস্তকই তাঁহার লক্ষ্যীভূত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ সকল পুস্তকে বর্ণিতরূপ 'আশঙ্কাজনক কদর্য্যতা' আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। স্থানে স্থানে উর্দ্দু ফার্সী ও আরবী শব্দ হিন্দু লেখকেরাও'ত ব্যবহার করিয়া থাকেন, উর্দ্দু ফার্সী শব্দের ব্যবহারই যদি দোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সে দোষে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লেখকগণকে-দোষী করা উচিত।

তাহার পর চলতি ও অচল শব্দের কথা। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইলে তদ্দারা বাংলা ভাষার ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, তাহা হইলে, ভাষার শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধির পথ, একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। আজকাল ইংরাজী, ফার্সী, আরবী, ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার যে সকল শব্দ, বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে চলিত হইয়া গিয়াছে, তাহাও একদিন অচল ছিল। অভাবে পড়িয়াই হউক, ভাষা-সৌষ্ঠব ও শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি

করিবার জন্যই হউক, আর ঐ সকল ভাষার প্রবল-প্রভাবে অভিভূত হইয়াই হউক—যাহা একদিন চলতি ছিল না, আজ তাহা বহু পরিমাণে চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে বাংলা ভাষার উপকারই হইয়াছে। সমালোচক মহাশয় নিজের উক্তির সমর্থন-কল্পে শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়াই, আমরা ঐ মন্তব্যটির উপরোক্ত অর্থগ্রহণ করিলাম। নচেৎ তাঁহার মন্তব্যের সঙ্গে আমাদের কোনই মতান্তর নাই। কারণ, শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন "যাহা চলতি, যাহা সকলে বুঝে, তাহা চালাও।" এই চলতি আর অচল ঠিক করিতে হইবে—সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে প্রচলিত ভাষার অনুশীলন করিয়া। এই প্রকার অনুসন্ধান করিলেই কোন শব্দ চলতি, আর কোন শব্দের অর্থ সকলে বুঝে, আমরা তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব। সুতরাং, হিন্দু লেখকগণ কোন শব্দ ব্যবহার করেন না বলিয়াই, সেই শব্দটী 'অচল' বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

এখন 'আনোয়ারা' লেখকের ত্রুটী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। লেখক, তাঁহার পুস্তকে জলের পরিবর্ত্তে 'পানি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আর মুসলমান পাত্র পাত্রীদিগের দ্বারা 'পিসীমা মাসীমা' স্থলে 'খালা-আম্মা ফুফু-আম্মা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করাইয়াছেন। এই স্বাভাবিকতা রক্ষা করায় লেখকের কোন দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'পানি' লেখাতে দোষ কি? পানি শব্দ কি অচল, সকল বাঙ্গালীই কি উহার অর্থ বুঝে না? পানি বাংলা শব্দ না হইতে পারে,—কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বাংলা শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা কি? 'পানি' বংলা নহে বটে, কিন্তু জল কি খাঁটি বাংলা? আজকালকার হিসাবে বাংলাদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটি ৫১ লক্ষ। ইহার মধ্যে ২ কোটি ৪২ লক্ষ্য বাঙ্গালী 'পানি' শব্দ ব্যবহার করে, সকল বাঙ্গালীই উহার অর্থ বুঝে। হিন্দু-বাঙ্গালীরাও যে পানি একেবারে ব্যবহার করেন না, এমন নহে। আজকাল "বরফ" দেওয়া "সোডা পানির" ব্যবহার খুবই দেখা যাইতেছে, ষ্টেশনে ষ্টেশনে "পানি-পাঁড়ের" প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। 'পানিফল' এবং 'পানিকাকেরও' যথেষ্ট প্রচলন আছে। রামায়ণাদি হিন্দু পুরাণ পুস্তকেও পানির যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়, এমন কি, প্রবাসীর প্রচারিত নূতন রামায়ণেও—স্থানে স্থানে পানি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং আনোয়ারা লেখকের যে কি অপরাধ, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তিন কোটি মুসলমান-বাঙ্গালী যেশব্দ সাধারণভাবে ব্যবহার করিতেছে, তাহা কখনই অচল হইতে পারে না।

উর্দ্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যাহার প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এমনও অনেক শব্দ আছে, ধর্ম্মের হিসাবে যাহার ব্যবহার মুসলমানের পক্ষে অন্যায়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে স্থানে স্থানে উর্দ্দু ফার্সী শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য। বাংলা ভাষার উপর হিন্দু-বাঙ্গালীর যতটা দাবী, মুসলমান বাঙ্গালীর দাবী তদপেক্ষা অধিক। "সচল্‌-অচল" নির্ব্বাচনের সময়, আমাদের হিন্দু সমালোচক মহাশয়গণ এই কথাটা বিস্মৃত না হইলে ভাল হয়।

এস্‌লাম প্রচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হজরত মোহাম্মদ (স) একদা এক বৃক্ষতলে নিদ্রাভিভূত ছিলেন, এমন সময় তাঁহার এক জন শত্রু, উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেখানে উপস্থিত হইয়া অতি কর্কশস্বরে বলিল, "মোহাম্মদ! বল তোমাকে এখন কে রক্ষা করিবে?" হজরত অতি ধীর অথচ নির্ভয় ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "আল্লাহ, —তিনিই একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা।" তাঁহার এই গুরু গম্ভীর ভাষা শ্রবণ করিয়া এবং এই অমানুষিক ধৈর্য্য দেখিয়া সেই পাষাণ্ডের হৃদয় দমিয়া গেল—ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ থরহরি কাঁপিতে লাগিল এবং তরবারি খানা হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। হজরত অসিখানি তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমাকে রক্ষা করে কে?" কাফের এইবার কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। —নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। হজরত তাহাকে ক্ষমা করিলেন, বলিলেন, শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করা আমার রীতি নহে, প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আমি ধরাধামে প্রেরিত হই নাই; বরং শত্রুকে কিকরিয়া ক্ষমা করিতে হয়, আমি তাহারই পরিচয় দিবার জন্য ইহধামে আসিয়াছি। এই বলিয়া তিনি তরবারিখানি তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

যে মহাপুরুষ শত্রুর প্রতি—এরূপ অসাধারণ দয়া প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যে তরবারির সাহায্যে প্রচারিত হইয়ছিল, এরূপ অপবাদ অপেক্ষা হাস্যোদ্দীপক বিষয় আর কিছু জগতে আছে কিনা, তাহা আমরা জানি না।

বিধর্ম্মীগণের স্বেচ্ছায় এসলাম গ্রহণের দৃষ্টান্ত।

(১)

হজরত হামজার এস্‌লাম গ্রহণ।

হজরত মোহাম্মদের পিতৃব্য মহাত্মা আমীর হামজা একদা শুনিতে পাইলেন, কোরেশদলপতি নিষ্ঠুর আবুজেহেল তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রকে প্রহার করিয়াছে। হামজা তখনও এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই, বরং তিনি হজরতের এই নূতন ধর্ম্মমত প্রচারের বিরোধীই ছিলেন। সময় সময় তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেন—ভীতি প্রদর্শনেও ক্ষান্ত ছিলেন না। কিন্তু রক্তের টান এমনই অদ্ভুত বস্তু যে, ইহার প্রভাবে মানুষের ব্যক্তিগত শত্রুতা বা অনৈক্য আদৌ থাকিতে পারে না। আবু জেহেলের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে আজ তাঁহার প্রাণের ভিতর দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তীর এবং ধনুক লইয়া বাহির হইলেন। আবু জেহেলকে পাইয়া একটী বাণাঘাতে তাহার মস্তকদেশ আহত করিয়া দিলেন। এইরূপে ভ্রাতস্পুত্রের অবমাননার প্রতিশোধ লইয়া হজরতের, নিকট এই সংবাদ লইয়া গেলেন। হজরত

এই সংবাদে তুষ্ট হইলেন না। এক গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তাতঃ! এই সংবাদ আমার চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ের কোন প্রকার শান্তি বিধান করিতে পারে না। প্রতিশোধ লইবার জন্য আমি জগতে প্রেরিত হই নাই। যাহারা ভ্রম বশতঃ আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করে, অত্যাচার উৎপীড়ন করে, তাহাদের জন্য মঙ্গল কামনা করা, তাহাদের ভবিষ্য-জীবন নৈতিকভাবে উন্নত করার চেষ্টা করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। অপকারীর উপকার প্রয়াসী হওয়াই প্রকৃত মানবধর্ম্ম, আমি সেই টুকুই করিতে আসিয়াছি এবং করিব"।

মহাত্মা আমীর ভ্রাতুষ্পুত্রের এবম্বিধ উদার অথচ বিশ্বপ্রেম প্রাণাদিত উক্তি শ্রবনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞসা করিলেন, "স্নেহ ভাজন, যাহাতে তোমার তুষ্টি লাভ করিতে পারা যায়, এরূপ কি কার্য্য আছে?" হজরত বলিলেন, "চাচা, আজ যদি আপনি আমার প্রচারিত সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে আমি আবুজেহেলের যাবতীয় অত্যাচার উৎপীড়ন সমূলে ভুলিয়া যাইতে পারি। তারপর—ইহাতে আমি যে অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইব, তাহা বর্ণনাতীত।" হজরতের এ হেন উদার উক্তি শ্রবণে হজরত আমীর হামজা একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার মুখ হইতে যেন আপনা আপনিই কলেমায়ে তৈয়্যেবা (لا اله الا الله محمد الرسول الله—আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই—মোহাম্মদ আল্লার প্রেরিত।) উচ্চারিত হইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমীর একজন পাকা মুসলমান বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

(২)

হজরত ওমরের এস্‌লাম গ্রহণ।

হজরতের সমসাময়িক আরবদের মধ্যে, হজরত ওমর বীর্য্যেশৌর্য্যে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহাকে ভয় নাকরিত, মক্কায় এমন কেহই ছিল না। তিনি কোরেশদিগের পক্ষে বৈদেশিক দূতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। একবার আবুজেহেল প্রভৃতি হজরতের মস্তকের বিনিময়ে প্রচুর পুরস্কার দিবে বলিয়া ঘোষণা করিলে, হজরত ওমর এই দুরূহ কার্য্যসাধনের জন্য উলঙ্গ তরবারি হস্তে হজরতের সন্ধানে বাহির হইলেন। পথে যাইয়া শুনিতে পাইলেন, তাঁহার ভগিনী এবং ভগ্নিপতি এসলামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হইল।—তাঁহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহাদের আবাসাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সেখানে উপস্থিত হইয়াই তিনি এই নিরীহ মোস্‌লেমদ্বয়ের উপর এমন ভয়ানক নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন যে, হতভাগ্যদ্বয়ের প্রাণ যায় যায় হইয়া পড়িল। নিরুপায় ওমর-সহোদরা ভ্রাতার নিকট শেষ নিবেদন ছলে কোরাণের সূরা তাহার (سورة طه) প্রথম রুকুটী একবার শুনাইবার প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "শুধু এই অংশটুকু শ্রবণ করিয়াই আমরা এসলাম গ্রহণ করিয়াছি।" হজরত ওমর ভগিনীর এই কাতরোক্তি এড়াইতে পারিলেন না। অনুমতি প্রদত্ত হইলে, তাহার ভগিনী এমনি করুণস্বরে ইহা পাঠ করিতে লাগিলেন যে, প্রত্যেক শব্দ, এমনকি প্রত্যেকটী বর্ণ ওমরের প্রাণের ভিতরে যাইয়া আঘাত করিতে লাগিল। যখন পাঠ

সমাপ্ত হইল, তখন দেখা গেল, ওমর—সেই নিষ্ঠুর ওমর যেন একটী মোমের পুতুলের মত বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডলস্থিত সেই ক্রোধ ব্যঞ্জক ভীতিপ্রদ চিহ্ন যেন কোন অজ্ঞাত কারণে স্বর্গীয়করুণাধারায় বিধৌত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তিনি একটী সাক্ষাৎ প্রেমের মূর্ত্তিরূপে শোভা পাইতেছেন। বস্তুতঃ পবিত্রতম গ্রন্থ কোর্‌আনের ভাব এবং ভাষার ঝঙ্কারে তিনি যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কোর্‌আনের এহেন সুমধুর রচনাবলী কবি কল্পিত পদার্থ নহে, ইহার রচয়িতা স্বয়ং অনন্ত শক্তিধর বিশ্বপতি। ইহার প্রকাশক বিশ্ব জগতের গর্ব্বের ধন—ঐশীতত্ত্ববাহক হজরত মোহাম্মদ (সঃ) স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কোন প্রকার বিপ্লবের সূচনা করিতে প্রয়াসী হন নাই। এ হেন মহাজনের সহিত শত্রুতাসাধন বড়ই অপকর্ম্ম। এই অপকর্ম্মের ফলাফল কি হইবে, তাহা চিন্তা না করিয়া তিনি যে অবিমৃষ্যকারিতা সহকারে শুধু সামান্য পুরস্কারের লোভে ইহা সাধন করিতে চলিয়াছেন এজন্য লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইলেন। এই অনুতাপানল প্রভাবে তাঁহার অহঙ্কার পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তপ্ত অশ্রুধারা সেই সব ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলে, দেখা গেল তিনি আর একজন নূতন মানুষ—মানুষের মত মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভগিনী বা ভগ্নিপতিকে আর কিছু না বলিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে তিনি হজরতের সন্ধানে চলিলেন। এ দিকে হজরতের সহচরগণ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, ওমর পুরস্কার লোভে দীন দুনয়্যার কাণ্ডারী হজরতের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত করনোদ্দেশ্যে উলঙ্গ তরবারি হস্তে আসিতেছেন। যাঁহার বীর্য্য শৌর্য্য সমগ্র দেশময় বিখ্যাত, তাঁহাকে ভয় না করে এমন কয় জন লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সকলে যুক্তি করিয়া হজরতকে লইয়া জনৈক সহচরের* ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ওমর দরজায় আসিয়া খট্‌খটি দিলেন। সাড়া শব্দ পাইলেন না। আবার সজোরে আঘাত করিলেন। তখন ছাহাবাবৃন্দ বুঝিতে পারিলেন যে, এইবার দরজা না খুলিয়া উপায় নাই। কয়েকজন সহচর সাহসে নির্ভর করিয়া অস্ত্র ধারণ করিতে যাইতেছেন, হজরত বলিলেন, "দরজা খুলিয়া দাও, চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না।" হজরতের আদেশ অমান্য করা কাহারই সাধ্য ছিল না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একজন ছাহাবা দরজা খুলিয়া দিলেন। ওমর ধীর পাদ বিক্ষেপে হজরতের নিকট আসিয়া তাঁহার কর যুগল ধারণ করিয়া এস্‌লাম গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া হজরত ব্যতীত আর সকলেই যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ওমরের দীক্ষা গ্রহণে কোরাইশগণ যেমন হতবল হইয়া পড়িল তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নবশক্তির সংযোগ সাধিত হইল।

(৩)

তোফায়ল এব্‌নে ওমর দৌসী।

ইনি এয়মন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা এবং আউসবংশীয়গণের নেতা ছিলেন। সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। একবার তিনি মক্কায় আসিলে নগরবাসীবৃন্দ

* ছাহাবা—صحابه

অতি সমারোহ সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করে। কথা প্রসঙ্গে তাহারা তাঁহাকে মোহাম্মদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করে। সকলে একবাক্যে বলিল—মোহাম্মদ একজন পাকা যাদুকর, তিনি কুহক প্রভাবে ধর্ম্ম জগতে এক মহা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে এমন কি আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ সংঘটিত করিয়া দিতেছেন—লোকটী বড় সহজ নয়, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকাই নিরাপদ।

তোফায়েল বলিয়াছেন, তিনি কাবামন্দিরে গমনের সময় তদীয় কর্ণবিবর তুলাদিয়া বন্ধ করিয়া যাইতেন। তিনি মনে করিতেন যে, যদি কোন প্রকারে মোহাম্মদের বিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি সেই সম্ভাবিত মহা বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেননা। তিনি আরও বলিয়াছেন, "একদিন আমি প্রভাত কালে কাবা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—মোহাম্মদ তন্ময় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার উচ্চারিত কোর্‌আনের কয়েকটী কথা শুনিয়া আমি প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম—উহা ভাষা এবং ভাব সম্পদে এক অভিনব পদার্থ, তখন আমার নিজকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মনে হইল, আমি একজন গণ্যমান্য কবি এবং সাহিত্যিক, ভাষার এবং ভাবের মারপেঁচ আমার বুদ্ধির অগোচর ছিলনা। এই অবস্থায় একটীকথা শুনিয়াই বিচলিত হইতেছি কেন? মোহাম্মদের কথা যদি ভাল হয়, তবে উহা গ্রহণ করিব না কেন? আর যদি উহা মন্দ হয় তবে উহা শ্রবণে আমার ঘৃণার উদ্রেক হইবেই। নানা প্রকার ভাবাগোণা করিয়া আমি হজরতের নিকট উপস্থিত হইলাম, নানা প্রকার আলাপ করিতে করিতে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে কোর্‌আন পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম।"

হজরত, অনুরোধ ক্রমে এক অংশ কোরান পাঠ করিলে তোফায়েল উহার রচনা চাতুর্য্য এবং অন্যান্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, নিতান্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত হজরতের হাত ধরিয়া এসলাম গ্রহণ করিলেন।

(৪)

আবুজর গেফ্‌ফারী।

এই ব্যক্তি মদিনার একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন,—মদিনাবাসী কর্ত্তৃক দূতরূপে হজরত মোহম্মদের চরিত্র পরীক্ষা ও তাঁহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ জন্য প্রেরিত হইয়া ছিলেন। তিনি হজরতের প্রত্যেক কার্য্যই প্রতিকূল দৃষ্টিতে দেখিতে ছিলেন, কিন্তু পরিণামে সত্যের আকর্ষণী শক্তিতে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

(৫)

ওয়ায়ের এব্‌নে ওহাব।

মক্কার কোরেশ বংশের অন্যতম নেতা ছফ্‌ওয়ান এব্‌নে উম্মিয়ার পিতা কোরেশদিগের পক্ষে বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের হস্তে নিহত হইয়াছিল। পিতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ

গ্রহণার্থ ছফ্‌ওয়ান নিতান্তই অধীর ও উদগ্রীব ছিল। ওমায়ের-এব্‌নে-ওহাব নামে একব্যক্তি তখন কোরেশ বংশের মধ্যে বীর পুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাহার পুত্র মদিনা নগরে মুসলমান-গণের হস্তে বন্দী দশায় বাস করিতে ছিল। এইজন্য তাহার অন্তরেও সর্ব্বদা মুসলমান বিদ্বেষের বহ্নিশিখা জ্বলিতে ছিল। এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে একদা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য কথোপকথোন আরম্ভ হইলে ওমায়ের বলিলেন, আমার মস্তকে ঋণভার এবং আমার পরিবারের ভরণ পোষণের চিন্তা না থাকিলে আমি নিশ্চয় মদিনায় গমণ পূর্ব্বক মোহম্মদের (সঃ) হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করিতাম। ছফ্‌ওয়ান এতৎশ্রবণে বলিল, "ওমায়ের! আমি তোমার ঋণের দায়িত্ব এবং তোমার পরিবারের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতেছি, তুমি তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন জন্য অবিলম্বে ধাবিত হও।" ওমায়ের সাগ্রহে বলিলেন, "তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই মদিনাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সাবধান আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় যেন কোন তৃতীয় ব্যক্তি জানিতে না পারে।" ওমায়ের তাঁহার তরবারি খানি ভালরূপে শাণিত করিলেন—উহাতে বিষমিশ্রিত করিলেন এবং তৎপর মদিনাগমন পূর্ব্বক হজরত রসুলে করিমের মস্‌জেদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উষ্ট্র-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। উষ্ট্রের শব্দ শুনিয়া হজরত ওমর গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি ওমায়েরের কুঅভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দ্রুতপদে হজরতের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অসদভি-প্রায়ের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, এবং এক হস্তে তাঁহার তরবারির মুঠা এবং অপর হস্তে তাঁহার গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। হজরত রসুলে করিম ওমরকে বলিলেন, আমার নিকট তাহাকে উপস্থিত কর। ওমায়ের হজরতকে সালাম করিয়া বলিলেন, "আমার পুত্রের সংবাদ জানিবার জন্য আমি মদিনায় আসিয়াছি।" হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তরবারি কেন আনিয়াছ, তোমার উদ্দেশ্য কি?" ওমায়ের উত্তর করিলেন, "আমাদের তরবারি পূর্ব্বেই বা আপনার কি ক্ষতি করিতে পারিয়াছে যে, এখন আবার নূতন ক্ষতি সাধন করিবে?" হজরত বলিলেন, "তুমি ও ছফওয়ান মক্কার বাহিরে পাহাড়ের উপর নির্জ্জন স্থানে আমাকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ ও ষড়-যন্ত্র করিয়াছ, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে, তুমি সেই চুক্তি পূর্ণ করিবার জন্য মদিনায় আসিয়াছ—এসকল কথা কি সত্য নহে?" ওমায়ের বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রণার কথা তৃতীয়ব্যক্তি জানিতে পারিবার কোনই কারণ ছিল না। হজরত মোহাম্মদ যদি দৈব-শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ না হইবেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে এই গুপ্ত তত্ত্ব জানিতে পারিলেন! এই ঘটনা দ্বারা এবং হজরতের বিস্ময় জনক ভদ্র ব্যবহার ও উদার ভাব দর্শনে, ওমায়েরের পাষাণ হৃদয় ক্রমে বিগলিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি হজরতের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক, ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ইস্‌লাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। মক্কাবাসী হিতে বিপরীত কাণ্ড দেখিয়া সকলেই অবাক!

*

(৬)

খালেদ এব্‌নে ওলিদ।

খালেদ এব্‌নে ওলিদের নাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বীরমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় বীরগণের মধ্যে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ব্যতীত বোধ হয় আর কাহাকেও খালেদের সহিত তুলনা করিবার জন্য উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না। 'ওহদের যুদ্ধের সময় খালেদ এব্‌নে ওলিদ কোরেশগণের পক্ষে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার হস্তে বহু মুসলমানের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। (এই ওহদের যুদ্ধেই হজরত রসুলে করিমের দন্দান (দাঁত) শহিদ হইয়াছিল।) খালেদের প্রবল প্রতাপে মুসলমানগণ থরথরি কম্পিত ছিলেন। ৮ম হিজরীতে "হোদায়বিয়া" সন্ধির শর্ত্তানুসারে হজরত রসুলেকরিম সদলবলে পরবৎসর মক্কা নগরে হজ্জক্রিয়া সম্পাদন জন্য উপস্থিত হইলে, মুসলমানগণের পবিত্র স্বভাবচরিত্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, একতা, ভ্রাতৃভাব ও ধর্ম্মভক্তি ইত্যাদি মহৎগুণ দর্শনে খালেদ ও অন্যান্য বহু প্রধান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সাগ্রহে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কালে এই খালেদ আরব ও সিরিয়া বিজয় কার্য্যে জগতের অন্যতম প্রধান বীর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

(৭)

ওমর-এব্‌নে-আছ।

মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানগণ যখন বিধর্ম্মী কোরেশগণের নিদারুণ নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া আফ্রিকা মহাদেশে হাবশ বা আবিসিনিয়া রাজ্যের খৃষ্টান রাজার আশ্রায়ে পলায়ন করেন, তখন ওমর-এব্‌নে-আছ কোরেশগণের পক্ষে দলপতিরূপে পলায়নকারী মুসলমানদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি আবিসিনিয়ার অধিপতি খৃষ্টান রাজ-দরবারে উপনীত হইয়া তাহার স্বদেশবাসী সমাজদ্রোহী পলাতকদিগেকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি মুসলমানগণের সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। তিনি ভয়ানক মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু হোদায়বিয়া সন্ধির পর বৎসর ৮ম হিজরী সনে স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। তিনি ইতিহাসে মিসর-বিজয়ী প্রসিদ্ধ মুসলমানসেনাপতিরূপে পরিচিত।

(৮)

আবু জন্দল।

হোদায়বিয়ার সন্ধির শেষ শর্ত্তে লিখিতছিল :—অতঃপর কোরেশগণের মধ্যে, কেহ ইস্‌লাম গ্রহণ পূর্ব্বক মুসলমানগণের নিকট আশ্রয় লইলে, তাহাকে কোঁরেশগণের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, কিন্তু কেহ ইস্‌লামত্যাগ করিয়া কোরেশগণের নিকট উপনীত হইলে তাহাকে মুসলমানগণের হস্তে প্রত্যার্পণ করা হইবে না। এই শর্ত্ত অনুসারে হজরত রসুলেকরিম তাঁহার সহচরগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবু জন্দল নামক এক যুবককে কোরেশগণের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। কোরেশগণ তাঁহাকে হস্তপদ বন্ধন করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ

করে, এবং নানা প্রকার যন্ত্রনা দান করিতে থাকে। কিন্তু আবুজন্দল কারাগারে অবস্থান কালে অপর বন্দিদিগের মধ্যে ইস্লাম প্রচার কার্য্যে নিরত ছিলেন। তাঁহার একবৎসর কাল কারাগারে অবস্থানের কল্যাণে ৩০০ শত বন্দি ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কোরেশগণ হিতে বিপরীত ফল দেখিয়া লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইল, এবং আবুজন্দলকে অবিলম্বে কারামুক্ত করিয়া হজরত রসুলেকরিমকে অনুরোধ করিল, যেন তিনি তাহার ভক্তকে মক্কা হইতে মদিনায় ডাকিয়া পাঠান।

(৯)

আব্দল ওজ্জা।

আব্দুল ওজ্জা নামক এক ব্যক্তি বাল্যকালে অনাথ হইয়া স্বীয় পিতৃব্যের নিকট লালিত পালিত হন। তাঁহার পিতৃব্য আব্দুলওজ্জাকে উষ্ট্র, ছাগ ও দাসদাসীদ্বারা সাহায্য করিয়া তাঁহার অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। আব্দুলওজ্জা আন্তরিক ভাবে ইস্-লামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিলনে। কিন্তু পিতৃব্যের ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী ছিলেন না। কিছু দিবস পর তিনি আর তাঁহার মনোভাব চাপা দিয়া রাখিতে না পারিয়া চাচার নিকট ইসলাম গ্রহণার্থ অনুমতি ভিক্ষা করেন। তাঁহার চাচা ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট রূপে লাঞ্ছিত করে, এবং তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব কড়িয়া লয়—এমন কি তাহার পরিধানের বস্ত্রখণ্ড পর্য্যন্ত হরণ করিয়া তাহাকে সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দেয়। আব্দুল ওজ্জা তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া একখণ্ড কম্বল প্রার্থী হন। তাঁহার মাতা যে কম্বল দান করিলেন, তাহা তিনি দুইখণ্ড করিয়া একখণ্ড পরিধান করিলেন এবং আর একখণ্ড গায়ে দিয়া মদিনা যাত্রা করিলেন। হজরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। হজরত তাঁহার নাম করিলেন আব্দুল্লা এবং তাঁহাকে "জুল বেজাদায়েন" বা দুই কম্বল ধারী উপাধি প্রদান করিলেন।

(১০)

হজরত মোহাম্মদ পারস্য-রাজ খস্রুর নিকট আব্দুল্লা এব্নে হোজায়মা নামক একজন সহচর দ্বারা পত্র প্রেরণ পূর্ব্বক খসরুকে ইস্লাম গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন। খসরু তাহাতে ক্রোধপরবশ হইয়া তাহার এয়মন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বাজানের নিকট হজরত মোহাম্মদকে গ্রেফ্তার করিয়া রাজ দরবারে প্রেরণ জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। বাজান মদিনায় একদল সশস্ত্র সৈন্য প্রেরণ করেন। সেনাপতি 'খরে খসরু' ও 'বানুয়া, মদিনায় উপস্থিত হইলে, হজরত তাহাদিগকে বলিলেন, গত রাত্রিতে তোমাদের রাজা যুবরাজ শিরোয়া কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, তোমরা তোমাদের গবর্ণরের নিকট অনুসন্ধান করিয়া দেখ। তাহারা অনুসন্ধানে ঘটনা সত্য জানিতে পারিয়া এবং হজরতের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বাজান সহ সকলেই সনাতন ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম বিশ্বাসে দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত।

যাহারা বলিয়া থাকেন, ইস্‌লাম ধর্ম্ম তবারির সাহায্য বা বলপ্রয়োগে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাদের পক্ষে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মবিশ্বাসের পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যাহাদিগকে বলপ্রয়োগে তাহাদের পৈত্রিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল, তাহারা ইস্‌লাম ত্যাগ করার সামান্য সুযোগ পাওয়া মাত্রই যে তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হইবে, ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের কিরূপ ভক্তি এবং অনুরাগ দৃঢ়তর হইত, তৎসংক্রান্ত কয়েকটী দৃষ্টান্ত অতঃপর উদ্ধৃত করা হইবে। (ক্রমশঃ)

ইস্‌লামাবাদী।

বাসনা।

প্রাণ খুলিয়ে ঐ নীলিমার—
পানে আমি চাইতে চাই—
যে গান কানে যায়না শোনা
সে গান আমি গাইতে চাই।

ঐ ভুবনের অনেক দূরে
যেথায় সেই এক সোণার পুরে—
কে আছে যে, কেমন সেজে
তথায় আমি যাইতে চাই
তারি প্রাণের মধুর সুবাস
পাইতে চাইগো পাইতে চাই।

যথায় প্রেমের তুফান বহে
সুধার সরে দুলে দুলে—
কে গাহে যে অমর গীতি
সে সাগরের কূলে কূলে,

সেই সাগরে পরাণ ভ'রে
সব ভুলিয়ে নাইতে চাই
সেই রহস্যের দেশে ওগো,
উধাও হ'য়ে ধাইতে চাই।

ঐ যে গগন শোভায় ভরা
ঐ যে চারু চন্দ্র তারা—
ও সকল ও পিছে রেখে
কোথায় আমি যাইতে চাই
প্রাণ খুলিয়ে সেই নীলিমার
পানে আমি চাইতে চাই।

শেখ হবিবর রহমান।

১ম ভাগ আষাঢ়, ১৩২২ ৩য় সংখ্যা

উত্থান-সঙ্গীত।

হাসিল কনক উষা
অরুণ মেলিল আঁখি!
আহ্বানি মোস্লেম বৃন্দে
কাননে গাইল পাখী!
ত্রিদিবের হুর পরী
গাইল করুণ রবে!
"সবাই জাগিল বিশ্বে
মোস্লেম জাগিবে কবে?"

২

যে জাতি একদা ছিল
উত্থানের শীর্ষ দেশে!
সে জাতির এ দুর্দ্দশা
হায় রে হইল কিসে?
কোন্ পাপে তাহাদের
এ ঘোর পতন হ'ল!
সে গৌরব, সে প্রতিভা
কি দোষে ঘুচিয়া গেল!

কোন পাপে অভিশপ্ত
হ'ল আজি এই জাতি!
নিবে গেল কেন তার
ধর্ম্মের বিমল ভাতি!
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছেড়ে তারা
অধর্ম্মেরে বুকে ল'য়ে
চলেছে পাপের পথে
ইস্লামের মাথা খেয়ে!

৪

একতা, স্বজাতি-প্রেম
ভুলে গেছে বহু দিন!
কেহ নহে কারো বাধ্য,
তারা আজি ভিন্ ভিন্!
ধর্ম্মের পবিত্র ভাব
নাহি জাগে কারো প্রাণে!
মাতেনা কাহারো হৃদি
কোরাণের পুণ্য-গানে!

আপন স্বার্থের লাগি
পরার্থে ঢালিয়া ছালি,*
ইস্লামের পূত বক্ষে
দিয়াছে কলঙ্ক-কালি!
তাই তারা দিন দিন
যাইতেছে রসাতলে!
লুপ্ত হবে এই জাতি
আপনার কর্ম্ম-ফলে!

৬

দান, ধ্যান, উপাসনা
করিতে চাহেনা তারা!
বিষয়-বৈভবে মজে
দিবা নিশি আত্মহারা!
ছদ্‌কা, জাকাত, রোজা
পরিহরি চিরতরে,
সুরা ও স্বৈরিণী ল'য়ে
পাপ-পথে সদাচরে!

৭

পতনের নিম্ন তরে†
চলিয়াছে দিন দিন!
ইস্লামের পূর্ণ জ্যোতিঃ
ক্রমেই হ'তেছে ক্ষীণ!
আর কিছু দিন পরে
একেবারে নিবে যাবে!
ধরাতে মোস্লেম আর
খুজিয়া নাহিক পাবে!

৮

হাসিল কনক-উষা
অরুণ মেলিল আঁখি
আহ্বানি মোস্লেম বৃন্দে
কাননে গাইল পাখী!
জাগরে মোস্লেম জাগ
আর কত ঘুমে রবে!
সবাই জাগিল বিশ্বে
তোমরা জাগিবে কবে?

৯

স্বার্থের কুহকে পড়ে
হ'য়ে ঘোর আত্মহারা!
ভুলি নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম
একেবারে হ'লে সারা!
এখনো নয়ন মে'লে
চে'য়ে দেখ নিজ পানে,
কত উচ্চে ছিলে তুমি
পড়ে' গেছ কোন্ স্থানে!

১০

দর্শন-বিজ্ঞান-স্মৃতি
জগতে যা'কিছু আছে,
ধরার সকল জাতি
শিখেছে তোমার কাছে!
খগোল, ভূগোল, ন্যায়,
সাহিত্য, গণিত, বীজ,
এ জগতে যত শাস্ত্র
সকলি তোমারি নিজ!

১১

তোমারি সর্ব্বস্ব নিয়ে
সব জাতি গর্ব্ব করে!
তুমি আজি মূর্খ হ'য়ে
পশ্চাতে রয়েছ পড়ে!
তব ধনে ধনী সব,
পথের ভিখারী তুমি!
'ম্লেচ্ছ,' 'যবন' হ'য়ে
চষিতেছ আজি ভূমি!

* পূর্ব্ববঙ্গে ছাইকে ছালি বলে। †অর্থাৎ স্তরে।

১২

ছিলে তুমি এক দিন
　　কেমন গর্ব্বিত বেশে!
জগতের সব জাতি
　　"কুর্ণিশ" করিত এ'সে!
ঐশ্বর্য্যের মোহে পড়ে
　　ভুলিয়া কর্ত্তব্য কাজ,
বিলাস-বাসনা-স্রোতে
　　সকলি হারালে আজ!

১৩

দুই মুষ্টি অন্ন তরে
　　আজি তুমি ম্লেচ্ছ মুটে!
কুলি সেজে পাছে পাছে
　　বাক্স নিয়ে যাও ছুটে!
গুতা, লাথি, জুতা, কিল
　　আজি তব অঙ্গ-ভূষা!
অশ্রু নীরে বক্ষ ভাসে'
　　দিবস রজনী উষা!

১৪

মাটি কাটা, ভিক্ষা করা
　　ব্যবসা ধরেছ আজি!
কোথা সে উপাধি তব
　　মৌলভী, মৌলানা, কাজী!
হুজুর ও জাহাঁপানা
　　আর ত বলেনা কেহ!
প্রাসাদের পরিবর্ত্তে
　　আজি ভাঙ্গা পর্ণ গেহ!

১৫

মোস্লেম বলিয়া যদি
　　দিতে চাও পরিচয়!
এস ছুটে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে
　　কেন মিছে কর ভয়?
ভুলে যাও দলাদলি,
　　মিলে মিশে থাক সবে;
সাধ জগতের হিত,
　　স্বর্গ-সুখ পাবে ভবে!

১৬

জগতে সকলি ভাই,
　　পর তুমি কারে ক'বে!
মারামারি, কাটাকাটি,
　　কেন মিছে কর তবে?
পুণ্য কাজে মতি রে'খ,
　　ধ'রনা পাপের পথ;
স্বার্থ এনে বলি দিও,
　　পূর্ণ হবে মনোরথ!

১৭

এক ভিন্ন অন্য নাই
　　উপাস্য এ ধরাতলে,
গে'ও সবে উচ্চ কণ্ঠে
　　মাতায়ে মানব দলে।
কোরাণের পুণ্য শ্লোকে
　　ভ'রে দিও চারি ধার,
সমীর বহিবে সদা
　　সে সুধা-সৌরভ-ভার!

১৮

তা হ'লে এ শোক দুঃখ
　　দুদিনে ঘুচিয়া যাবে!
বিধাতার আশীর্ব্বাদ
　　অচিরে আবার পাবে!
আবার উদিবে তব
　　সৌভাগ্যের দীপ্ত রবি!
তোমার যশের গীত
　　আবার গাইবে কবি!

১৯

উঠিবে তখন তুমি
উত্থানের শীর্ষ দেশে !
জগতের সব জাতি
কুর্ণিশ করিবে এ'সে !
মুটে গিরি, ভিক্ষা বৃত্তি
করিতে হ'বেনা আর !
তোমার গৌরব-গীতে
পূর্ণ হ'বে চারি ধার !

২০

"আল্লা হো আকবর" রবে
সবারি ভাঙ্গিবে ঘুম,
"জয় জয়" রবে তব
আবার পড়িবে ধুম !
কেন মিছে পাপ-মোহে
যাইতেছ রসাতলে !
অই যে ডাকিছে সবে
"জাগরে মোস্লেম" ব'লে !

২১

হাসিল কনক-উষা
অরুণ মেলিল আঁখি !
আহ্বানি মোস্লেম বৃন্দে
কাননে গাইল পাখী !
ত্রিদিবের হুর পরী
গাইল করুণ রবে !
"সবাই জাগিল বিশ্বে
মোস্লেম জাগিবে কবে ?"

কায়কোবাদ

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম।

যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য আল্লাহতলা মানবমণ্ডলীকে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহা কথনই স্বভাবের অনুশাসনের বিপরীত হইতে পারে না। অর্থাৎ ঐশিক (ধর্ম্ম) বিধান ও প্রকৃতির অনুজ্ঞার মধ্যে অসামঞ্জস্য সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, প্রকৃতি ও ধর্ম্ম একই আল্লার আদেশ—একই বিধাতার বিধান। সুতরাং যদি কোন ধর্ম্মশাস্ত্র মানুষকে প্রকৃতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আদেশ প্রদান করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমাদিগের মনে পর পর তিনটী ধারণার উদয় হইতে পারে। যথা :—

(১) ঐ 'ধর্ম্মশাস্ত্র' কখনই খোদার প্রেরিত নহে ; অথবা—

(২) যিনি ঐ ধর্ম্মব্যবস্থার বিধাতা, প্রকৃতির নিয়ন্তা তিনি নহেন। কিম্বা—

(৩) সেই বিধাতা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও ঘোর অত্যাচারী।

বলা বাহুল্য যে, এই তিনটী ধারণাই ভ্রান্ত, বরং নাস্তিকতামূলক। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আল্লাহতালার নিয়ন্ত্রিত ধর্ম্ম ও তাঁহারই সৃষ্ট প্রকৃতির মধ্যে, কোনরূপ অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য সংঘটিত হইতে পারে না।

আপনাদের সামর্থ্যের অভাবে, আজকাল আমরা—মৌলবী সমাজ—সাধারণতঃ এই কথাগুলি চাপা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের ব্যভিচারগুলি দূরীভূত করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ছিল। সে কর্ত্তব্যের প্রতি আমরা যথেষ্ট অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছি। "নায়চারী," "নাছারা," "কাফের" ও "মোলহেদ" বলিয়া অভিসম্পাত করিবার জন্য যে আমাদিগকে ورثة الانبياء, বা 'নায়েবেনবী' উপাধি দেওয়া হয় নাই, ইহা আমাদের আদৌ স্মরণ হয় না। আমরা কেবলই বলিয়া থাকি, 'ও সব কথা মুখে আনিলে কাফের হইতে হইবে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা বিশ্বাস করাই তোমার কর্ত্তব্য, নচেৎ হাবীয়া দোজখে পুড়িয়া মরিতে হইবে।' কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, কোন তাড়না ও অনুশাসনের ভয়ে বা প্রলোভনের খাতিরে যে "বিশ্বাস," তাহা আদৌ বিশ্বাস (ইমান) পদ-বাচ্য হইতে পারে না। বিশ্বাস হয়—করা যায় না। সাধারণ ও অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে যাহা বলিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ সহজ সাধ্য, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকদিগের মধ্যে তাহাদ্বারা বিশেষ ফল লাভ করা সম্ভব নহে। জ্ঞানানুশীলনের বিভিন্ন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, এবং আধুনিক ও উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় লিপ্ত হইয়া, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির যে পরিমাণ বিকাশ সাধিত হইয়াছে ;—ইউরোপীয় ধর্ম্মহীনতা, স্বাধীন চিন্তা—বরং স্বেচ্ছাচারের উত্তাল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে পড়িয়া, তাঁহাদের চিন্তার স্রোত যে ভাবে ও যে দিকে ধাবিত হইতেছে ;—সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগী যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগকে এসলামের মাহাত্ম্য ও তাঁহাদের দ্বিধা ও সংশয়াদির দুর্ব্বলতা, উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ "নায়চারী হোগিয়া" বলিয়া রাগ করিয়া বসিয়া থাকিলে, অথবা ওয়াজের সভায় তাঁহাদিগকে দুই চারিটা গালাগালি দিলে আলেমদিগের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। বরং ইহাতে সাধারণতঃ লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে থাকিবে যে, আমাদের ধর্ম্ম যুক্তির নিকট টিকিতে পারে না। খোদার দেওয়া জ্ঞানবুদ্ধির উপর পাথর চাপা দিয়া আস্ত একটা হস্তীমূর্খ সাজিতে না পারিলে, ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। ইহার পরিণাম যে কতদূর শোচনীয় হইবে, চিন্তাশীল পাঠকবর্গকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সমাজের নির্ব্বাচিত ও বিশিষ্ট মেধাগুলি এখন স্কুল-কলেজে ; সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মহীনতা দূর করিবার চেষ্টা করা আলেম সমাজের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। অন্যথায় স্বাভাবিকরূপে ঐ সকল "নাস্তিকতা বা ধর্ম্মহীনতা" সমাজের প্রত্যেক স্তরে সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। কারণ, তখন অজ্ঞ লোকেরাও আপনাদিগকে শিক্ষিত ও বিশিষ্ট দলের অনুকরণে—অন্ততঃ বাহ্যিক ভাবে—গঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে, এমন কি লালায়িত হইয়া পড়িবে। তখনঃধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা ও দুইটা নাস্তিকতা-মূলক 'বোলচাল' দেওয়াও ভব্যতার নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইবে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই অনভিপ্সিত দৃশ্যের অভিনয় এখনই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, কোন ধর্ম্ম কস্মিনকালেও জয়যুক্ত হইতে পারে নাই,—পারিবেও না। জ্ঞানের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে,—গোঁড়ামী এবং জন্মগত ও প্রতিবেশ-সংস্কারের অন্ধকার আপনা আপনিই অপসারিত হইয়া যাইবে। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ইউরোপ যে প্রকারে আপনার জীবন ও ধনভাণ্ডারগুলিকে লুটাইয়া দিয়াছে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা খুবই অল্প। কিন্তু তবু সে সব বিফল হইয়াছে, জ্ঞান-চর্চ্চার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের ধর্ম্মহীনতা ও নাস্তিকতার মাত্রাও ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা জ্ঞান ও ধর্ম্ম—যুগপৎভাবে এই উভয়ের সেবা করিতে পারে না। কারণ আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইউরোপীয় ধর্ম্মবিশ্বাস সমূহের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ। আমরাও যদি এসলামের স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলিকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবর্জ্জনায় ঢাকিয়া ফেলি ; যে সকল প্রাকৃতিক সত্যের উপর এসলামিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, জন সমাজে তাহা প্রকাশ করিতে না পারি ; জ্ঞানের অনুশাসন লঙ্ঘন করা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক প্রত্যক্ষ সত্যগুলির বিরুদ্ধাচরণ করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকি,—তাহা হইলে আমাদিগের পরিণামও অত্যন্ত শোচনীয় হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ, যে ধর্ম্ম, শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকদিগের মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে অক্ষম—তাহা ধর্ম্মই নহে। সত্যস্বরূপ—জ্ঞানস্বরূপ খোদাওন্দের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। মূর্খদিগের মস্তিষ্ক মাত্র, কোন সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় স্থল হইতে পারে না।

এসলাম সেরূপ ধর্ম্ম নহে। জ্ঞান ও প্রকৃতির যথাযথ বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের নামই এসলাম। নিজেদের দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা কল্পে, আজ আমরাই নিজ হস্তে সেই এসলামের মূল কাটিবার চেষ্টা করিতেছি। এমন অনেক আজগবী কথা আছে—যাহা কোরআনে নাই, হাদিসে নাই—অথচ সেগুলিকে এসলামের অঙ্গীভূত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে। "নায়েবে নবী"স্বরূপে সমাজের কুসংস্কার দূরীভূত করা যাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল, তাঁহাদের অধিকাংশ, হয় নিজেরাই কুসংস্কারগ্রস্ত, অথবা অন্ধবিশ্বাসী সমাজের প্রভাবে ভীত, ত্রস্ত ও অভিভূত।

আপাততঃ এইখানেই এ প্রসঙ্গের ইতি করিয়া, আসুন পাঠক, আমরা মূল বক্তব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আলোচ্য বিষয়ের একটা দিকের আভাষ দেওয়া হইয়াছে,—সেটা ক্রিয়াকলাপ বা আমল (عمل)। ইহার আর একটী দিক হইতেছে—আকীদা বা ধর্ম্মবিশ্বাস। আমল বা ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান যেমন ধর্ম্মের অন্তর্গত, সেইরূপ ভূত ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কতকগুলি অদৃষ্ট বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও তাহার অঙ্গীভূত বরং অধিকতর আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে এই সকল আকীদা বা ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাজ বড়ই গণ্ডগোলে পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, অমুক আকীদাটা প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মের বিপরীত—সুতরাং অগ্রাহ্য। অমুক আকীদাটা বস্তুবিজ্ঞানের সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্যের বিপরীত, সুতরাং তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে

না। ফলতঃ ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তের সহিত কোন আকীদার বৈপরীত্য সূচিত হইবার আশঙ্কা হইলেই, তাঁহারা প্রমাদ গণিতে থাকেন। এই বিষয়টী লইয়া বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া, আমাদের মত অনভিজ্ঞ লেখকের পক্ষে অসমসাহসিকতা ও সঙ্গে সঙ্গে ধৃষ্টতার কাজ হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করিব, যোগ্যতম ব্যক্তিগণ নীরব-নিস্পন্দ। আমাদের এই ধৃষ্টতায় উত্ত্যক্ত হইয়া, তাঁহারা এ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিলে, শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

(২)

আমাদের দেশে তিনটী শব্দ পরস্পরের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, যথা :—দিন, ধর্ম্ম ও Religion। ইংরাজী Religion শব্দটীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। বাইবেলে ইহার কোন ব্যাখ্যাই দেওয়া হয় নাই। অভিধানে এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করা হইয়াছে—to bind বা বন্ধন করা। ফলতঃ "ধর্ম্ম" শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার সহিত "প্রকৃতির" যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধভাবে সূচিত হইয়া থাকে, ইংরাজী Religion বলিতে তাহা হয় বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কৃত "ধর্ম্ম" শব্দটীও বহু অর্থ-বাচক, উহার মধ্যে "প্রকৃতিও" একটী। ধর্ম্মের ধাতুগত অর্থে বলা হইয়াছে,—"ধৃ = পোষণ করা + ম — ক, যে সকলকে পোষণ করে।" এইজন্যই বোধ হয়, ঈশ্বরকেও ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। ফলতঃ অভিধান-অনুসারে যম ও জগদীশ্বর, সোমপায়ী ব্রাহ্মণ ও শিবের ষাঁড়, এবং ধনুক ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকলেই ধর্ম্মপদ বাচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহার বহু অর্থের মধ্যে প্রকৃতিও একটী। কিন্তু ইংরাজী Religion এর সহিত Nature শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। Religion আর Nature এই শব্দ দুইটীকে একসঙ্গে হামানদিস্তায় ফেলিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণগুলিকে একটা হাঁড়িতে করিয়া জ্বাল দিয়া তাহার নির্য্যাস বাহির করিয়া লইলে, তদ্দ্বারা হয়ত ধর্ম্ম শব্দের একটা প্রতিশব্দ গড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে।

এসলামিক পরিভাষায়, দিন, খাল্‌কুল্লাহ, সোন্নাতুল্লাহ, এসলাম ও فطرت (ফেৎরাৎ = প্রকৃতি বা Nature) সম-অর্থবাচক। কোরআন মজীদে ও হাদিস শরীফে দিন ও এসলাম অর্থেই "ফেৎরাৎ" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। নিম্নে অতি সংক্ষেপে দুই একটা প্রমাণ উল্লিখিত হইতেছে। কোরআন মজীদ, সুরা রূম, ৪র্থ রূকুতে বলা হইয়াছে,—

فاقم وجهک للدین حنیفا ط فطرت الله التی فطر الناس علیها ط لا تبدیل لخلق الله ط
ذالک الدین القیم - و لکن اکثر الناس لا یعلمون - روم ۴

অর্থ :—তুমি একনিষ্ঠ হইয়া দিনের জন্য আত্মনিয়োগ কর, আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে নিজের যে ফেৎরাতের (= Nature বা প্রকৃতির) উপর সৃষ্টি করিয়াছেন (তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর) আল্লার সৃষ্টিতে রদ বদল নাই, ইহাই সরল দিন, কিন্তু অনেক লোকই (এই তত্ত্ব) অবগত নহে।

উপরের আয়াতে "দিন" ও "ফেৎরাৎ" একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, বরং ফেৎ-রাতই যে দিন (অর্থাৎ প্রকৃতিই যে ধর্ম্ম), এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং অনেক লোকই যে এই তত্ত্ব অবগত নহে, তাহাও ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কোরআন মজীদের ন্যায় হাদিস শরীফেও ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বোখারী ও মোসলেমে হজরৎ আবুহোরেরার রেওয়ায়েৎ :—

قال رسول الله صلعم ما من مولود الا يولد على الفطرة—الحديث

অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তানই "ফেৎরাতের উপর" ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে—ইত্যাদি। এস্থানেও এসলামের প্রতিশব্দরূপে ফেৎরাৎ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। আরও একটা হাদিস দেখুন :—

عن شقيق قال ان حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت' قال واحسبه' قال ولومت مت على غير الفطرة التى فطرالله محمدا صلى الله عليه وسلم—رواه البخارى

অর্থ :—একজন লোক নমাজে রুকু ও সেজদা ধীরভাবে না করায়, হজরৎ হোজায়ফা তাঁহাকে বলিলেন, তোমার নামাজ হয় নাই; সে ব্যক্তি বলিল, আমিত মনে করি—হইয়াছে। হোজায়ফা বলিলেন, (এই অবস্থায় নামাজ পড়িতে পড়িতে) যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে —আল্লাহ হজরৎ মোহাম্মাদকে (স) যে ফেৎরৎ (ধর্ম্ম) মতে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তোমার মৃত্যু হইবে না।—বোখারী।

'ফেতরৎ' শব্দের অর্থ যে এসলাম, তাহা এখানে পরিষ্কার ভাবে জানা যাইতেছে।

উল্লিখিত আয়াতের টীকায় এ'রাবুল কোরআন (اعراب القرآن) গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,

فطرت الله اى الزموا واتبعوا دين الله ج٢ ص٩٧

অর্থ :—আল্লার ফেৎরৎ অর্থাৎ আল্লার দিন।

(١) تفسير كبير

فطرة الله وهى التوحيد ص٧١٥ ج٢

(٢) كشاف

(فطرت الله) اى الزموا فطرة الله.........والفطرة الخلقة الاترى الى قوله لا تبديل لخلق الله - والمعنى انه خلقهم قابلين للتوحيد و دين الاسلام غير نائين عنه ولا منكرين له لكونه مجاوبا للعقل مساوقا للنظر الصحيح - ص٤٠٧ ج٢

(٣) نيشا پورى :—

فطرة الله هى التوحيد الذى تشهد به العقول السليمة والنظر الصحيح .

(٤) مدارك—فطرة الله—والفطرة الخلقة

(৫) خازن فطرةالله اى دين‌الله......قال ابن عباس والمراد بالفطرةالدين وهوالاسلام

(৬) طبری

(১) قال ابن زيد - فى قوله فطرةالله التى فطرالناس عليها قال الاسلام -

(২) قال مجاهد—فطرة الله قال الاسلام -

(৩) مجاهد - لا تبديل لخلق‌الله اى لدينه -

(৪) عكرمه - خلق‌الله انما هوالدين -

(৫) عكرمه - فطرة الله... ..الاسلام

(৬) قتاده - لا تبديل لخلق‌الله اى لدين‌الله

(৭) سعيد بن جبير - خلق‌الله دين‌الله

(৮) ضحاک - خلق‌الله دين‌الله

(৯) ابن عباس كره خصاء البهايم و قال لا تبديل لخلق‌الله

উপরে কবীর, জারীর, খাজেন, মাদারেক, কাশ্বাফ প্রভৃতি তফসীর হইতে, তফসীর শাস্ত্রের এমামগণের (Authority) যে সকল সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, উল্লিখিত আয়তের ফেৎরাৎ শব্দের অর্থ দিন ও এসলাম। বাহুল্য ভয়ে প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্র অনুবাদ দেওয়া হইল না।

"কামুস" নামক আরবীর বিখ্যাত অভিধানে লিখিত হইয়াছে :—

والفطرة صدقةالفطر والخلقةالتى خلق عليها المولود فى رحم امه والدين—قاموس ج ۲ ص ۱۱۴

অর্থাৎ রোজার সাদকাকে 'ফেৎরাঃ' বলা হয়, এবং ফেৎরাৎ শব্দের অর্থ—আল্লাহতালা মাতৃগর্ভেই সন্তানকে যে প্রকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এবং দিন (=ধর্ম্ম)। লেছানুল্ আরব (لسان‌العرب) প্রভৃতি বিখ্যাত অভিধান মাত্রেই এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।

মেশ্‌কাতের টীকা মেরকাতে (مرقاة) লিখিত হইয়াছে :—

الفطرة اى الطريقة والسنة والملة

অর্থাৎ ফেৎরাৎ শব্দের অর্থ তরীকা (পথ), সুন্নাৎ (পদ্ধতি) ও মিল্লাৎ (ধর্ম্ম)। মেশকাতের টীকায় ইহাও লিখিত হইয়াছে :—

لفظ الفطرة فى كلامه بمعنى دين‌الاسلام

অর্থাৎ হাদিসে যে ফেৎরাৎ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে—তাহার অর্থ এসলাম ধর্ম্ম।

হাদিসের বিখ্যাত অভিধান—নেহায়া, মাজ্‌মা-উল-বেহার প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত আছেঃ—

على الفطرة اى على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين......و فطرة محمد دين الاسلام......و عشر من الفطرة اى من السنة

ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রাকৃতিক ধর্ম্মের নামই এসলাম। আল্লামা রাগেব এস্পোহানীও (راغب اسفہانی) গারায়েবুল কোরআন (غرائب القرآن) পুস্তকে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

(৩)

মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে আরও কয়েকটা কথা পরিষ্কার করিয়া লইতে হইতেছে। এই কথাগুলিকে আমরা "সিদ্ধান্ত" বলিয়া উল্লেখ করিব।

প্রথম সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র এখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই, কখনও যে পারিবে, দৃঢ়তার সহিত এরূপ কথা বলাও অসম্ভব। মানব-বুদ্ধির ক্রম বিকাশ স্বভাবের দৈনন্দিন অভিব্যক্তির সঙ্গে মিশিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও অনুশীলনের পথ ক্রমেই সুগম করিয়া দিতেছে। অনন্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহতালার অনন্ত ভাণ্ডারে, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বস্তুবিজ্ঞানের অনন্ত রহস্য, এখনও অজ্ঞাত অবস্থায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত কার্য্যকরীভাবে মানুষ যতই সেই সকল রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছে, নিত্য নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া, ততই তাহার মন অধিকতর নূতন তথ্য জানিবার জন্য কুতুহলী ও ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। এক একটী করিয়া নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, আর পূর্ব্বকালের সর্ব্ববাদীসম্মত "সত্য"গুলি সঙ্গে সঙ্গে পাগলের প্রলাপ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে। এখানে গ্রীক পণ্ডিতগণের দর্শন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে উদাহরণ স্থলে পেশ করা যাইতে পারে। ফলতঃ যুগে যুগেই এই প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। কাল যাহা "সত্য" ছিল, আজ তাহা মিথ্যা বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। সুতরাং এই চিরাচরিত ও অপরিহার্য্য নিয়মানুসারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে,—আজ যাহা "সত্য" বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কাল আবার তাহাই মিথ্যা বলিয়া পরিবর্জ্জিত হইতে পারে—পক্ষান্তরে, আজ যাহা অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, কাল আবার তাহাই অখণ্ডনীয় সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অতএব বর্ত্তমান যুগের দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রত্যেক সিদ্ধান্তই যে অকাট্য, অপরিবর্ত্তনীয় এবং অভ্রান্ত—এরূপ দাবী করা ন্যায় সঙ্গত হইবে না। সুতরাং বিজ্ঞান ও দর্শনের কোন সূত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন উক্তির অসমতা দেখিতে পাইলে, একেবারে অধীর হইয়া ধর্ম্মের মুণ্ডপাত করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। সে সময় মনে করা উচিত যে, গত তেরশত বৎসর হইতে দর্শন ও বিজ্ঞানের বহু "সিদ্ধান্ত" প্রত্যেক যুগেই এসলামের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া আসিতেছে, কিন্তু দুই দিন পরে আবার তাহাই মিথ্যা বলিয়া ঘোষিত হইতেছে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

যতটুকু সম্ভব, প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহের বিবৃতি ও বিশ্লেষণ করাই বিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু সেগুলির প্রকৃত হেতুনির্ণয় করা তাহার সাধ্যাতীত। জল আইসে কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞান বলিবে,—অমুক বাষ্পের সহিত অমুক বাষ্পের সংমিশ্রণে জলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক হাতে কলমে ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিতে সমর্থ। কিন্তু এই সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি না হইয়া আগুণের সৃষ্টি হয় না কেন, পাথর হয় না কেন, আর জলই বা হয় কেন? বিজ্ঞান তাহার কোনও উত্তর দিতে পারে না। জল উত্তপ্ত হইলে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, বিজ্ঞান ইহা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে বটে, কিন্তু "কেন হয়" তাহা বলিয়া দিতে পারে না। বস্তুবিজ্ঞান ও খগোলশাস্ত্রের প্রত্যেক সিদ্ধান্তই এইরূপ। অর্থাৎ বিজ্ঞান সৃষ্টির মূল রহস্যোদ্ঘাটন করিতে অক্ষম। জ্ঞানের অতীত, বিজ্ঞানের অতীত, এবং সীমাবদ্ধ মানব-বুদ্ধি-প্রসূত ন্যায়-দর্শনাদির অতীত কোন এক মহাশক্তি, একটা অভেদ্য রহস্যজালদ্বারা সেগুলিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা অনুশীলন ও তজ্জনিত অনুমান মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া, এক একটী অভিমত স্থির করিয়া লইয়া থাকি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অনুশীলনের প্রত্যেক উপকরণ ও উপলক্ষই যে সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদহীন, এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি না। আমাদের এইরূপ বহু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এখন অসিদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বহুস্থলে আমাদের উপকরণ ও উপলক্ষগুলি প্রমাদ শূন্য হওয়া সত্ত্বেও, তদ্দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময়, নানা কারণে, আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। দৃষ্টিবিভ্রমের ন্যায় বুদ্ধিবিভ্রমও আমাদের প্রত্যেক চিন্তাতেই সম্ভব্য।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

চিরাচরিত প্রাকৃতিক ঘটনা পরম্পরার অনুশীলন করিয়া, সাধারণ ভাবে যে পদ্ধতিটী আমাদের গোচরীভুত হইয়া থাকে, আমরা তাহাকেই "প্রাকৃতিক নিয়ম" নামে অভিহিত করিয়া থাকি। পানির দ্বারা পিপাসা-নিবৃত্তি হয়, আগুণের দাহিকা শক্তি আছে, বাতাস না পাইলে কোন জীবই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, সূর্য্যের কিরণে পৃথিবী আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, স্ত্রী-পুরুষের শুক্র ও শোণিতের সংমিশ্রণে জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে,—এইগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া থাকি। আবহমান কাল হইতে এইরূপ হইয়া আসিতেছে বলিয়াই এরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে, নচেৎ কোন্‌টী 'প্রাকৃতিক নিয়ম' আর কোন্‌টীই বা তাহার বিপরীত, তাহা জানিবার অন্য কোন উপায়ই নাই। এ সম্বন্ধে কোন আইন গ্রন্থও নাই অথবা "প্রকৃতি" এতৎসংক্রান্ত আপনার **Rules and Regulations** (নিয়মাবলী) ছাপিয়া বিতরণও করে নাই। এই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন বর্জ্জিত বিধি (**Exeption**) আছে কিনা, ইহা লইয়াই যত মারামারি। একদল চরমপন্থী পণ্ডিতের মত—উহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইতেই পারে না। আর একদল ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহারা সম্ভবপরতার গণ্ডী সম্প্রসারিত করিয়া, প্রত্যেক অস্বাভাবিক কার্য্যকেই বাস্তবের

আসনে বসাইবার জন্য লালায়িত। দ্বিতীয় দলের সহিত যুক্তিতর্কের কোন সম্বন্ধই নাই, সুতরাং আমরা প্রথম দলের মন্তব্য সম্বন্ধে অগ্রে দুই একটা কথা বলিব।

অমুক দেশের অমুক ব্যক্তি বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা বলিলে এই শ্রেণির পণ্ডিতেরা বলিয়া উঠিবেন,—'সম্পূর্ণ মিথ্যা, একেবারে অসম্ভব। কারণ, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত। অর্থাৎ আমরা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছি—স্ত্রীপুরুষের সম্মিলন ব্যতীত কোন জীব জন্মগ্রহণ করে না।' কিন্তু তাহাদিগের নিকট যখন ইহার বিপরীত উদাহরণ উপস্থিত করা হয়; আমের মধ্যের কীট, নারিকেলের মধ্যের মাছ প্রভৃতি কত অসংখ্য জীব যে অহরহ বিনা পিতামাতায় জন্মিতেছে, কত অগণিত প্রাণী যে পুরুষের বিনা সংস্রবে অণ্ড প্রসব করিতেছে এবং তাহা হইতে অবাধে সেই প্রসূতির সমজাতীয় সন্তান উৎপন্ন হইতেছে—তাহা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা বলিবেন—'উহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে হয় নাই—বরং ঐগুলির স্বভাবই এইরূপে জন্মগ্রহণ করা। রাসায়নিক অনু-সংমিশ্রণই এই প্রকার জীব-উৎপত্তির কারণ।' তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, 'যে বিষয়গুলিকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত বলিয়া মনে করা হইতেছে, তাহাও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ পরম্পরার অধীন।' Cause (سبب বা কারণ) ব্যতীত যে, ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, আমরাও ইহা অস্বীকার করি না। অধিকন্তু আমরা তাঁহাদের ন্যায় ইহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে,—বিশেষ কারণেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, এবং এরূপ কারণে এরূপ ব্যতিক্রম হওয়াই প্রকৃতির বিধান। কিন্তু আমরা কথিত ব্যতিক্রমের কারণগুলি সকল সময়ে সম্যকরূপে অবগত হইতে নাও পারি। আমরা কারণ নির্ণয় করিতে পারি না বলিয়া, একটা সত্য (Fact) অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

আমাদের যে দল অন্য চরমে গিয়াছেন—তাঁহাদের সমস্ত যুক্তির সার এই যে, খোদা সর্ব্ব-শক্তিমান, তিনি পানির মধ্যে দাহিকা শক্তি দিয়া তাহাদ্বারা গোটা দুন'য়াটা পোড়াইয়া ছারখার করিতে পারেন, সুতরাং অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলিয়া কোন শব্দ তাঁহাদের অভিধানে স্থানলাভ করিতে পারে না। ইঁহারা কার্য্যকারণ পরম্পরার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। ইঁহাদিগের মতামত সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই যে, যাহা ঘটিতে পারে, তাহা যে নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? যে ঘটনা যত সাধারণ, তাহা ততই সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যে ঘটনা যত অসাধারণ, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমাদিগকে ততই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। মনে করুন, ঢাকার একজন লোক কলিকাতায় আসিয়া বলিল—"ঢাকায় বৃষ্টি হইয়াছে।" সকলে ইহা বিশ্বাস করিবে। আর একজন বলিল—"ঢাকায় শিলাবৃষ্টি হইয়াছে।" মানুষ অপেক্ষাকৃত একটু চমকিত হইবে—কিন্তু এই সংবাদটাও সহজেই বিশ্বাস করিয়া লইবে। আর একজন যদি বলে, "চট্টগ্রামে ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। দশ সের ওজনের এক একটা পাথর পড়িয়াছে, পাথরের আঘাতে কর্ণফুলির বড় বড় সওদাগরী জাহাজগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।"—শ্রোতা অমনই বলিবে, 'সত্য নাকি? কই,

কোন সংবাদপত্রে'ত এই সংবাদটী প্রকাশিত হয় নাই!' অতঃপর সে অন্য উপায়ে এই সংবাদটীর সত্যাসত্যের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইবে। ঘটনাটী যে পরিমাণ অসাধারণ হইবে, সংবাদ দাতাদিগের বিশ্বস্ততা, বুদ্ধিমত্তা এবং সর্ব্বশেষে তাঁহাদের অভ্রান্ত হওয়া সম্বন্ধে আমাদিগকে ততই পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে হয়। *

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

আরবী ভাষায় লিখিত প্রত্যেক পুস্তকই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। ঐ সকল পুস্তকের কোন মন্তব্য ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তদ্দ্বারা এসলামের উপর কোনরূপ দোষারোপ করা যাইতে পারে না। বাৎলিমুস, ফিসাগোরাস, আরাস্তাতালিস, আফ্লাতুঁ, সোকরাৎ প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, খগোলতত্ব, এবং ন্যায় ও দর্শনাদি সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, বা যে সকল পুস্তকে তাঁহাদের অভিমত ও সিদ্ধান্তগুলি লিপিবদ্ধ ছিল, তাহাই আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই প্রকার অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে একটা ঘোর বিপ্লবেরও সৃষ্টি হয়, এবং তাহা দমন করিবার জন্য আমাদের পণ্ডিতকুল "কালাম" শাস্ত্রের সূত্রপাৎ করেন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে-যুগের সকল পণ্ডিতই এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী সময়ের অনেকে, গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিকে একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; সেইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য প্রদর্শন কালে তাহাদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। অনেক স্থলে, এক একজন গ্রন্থকারের কল্পনাও ধর্ম্মবিশ্বাস (আকীদা) বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। বাৎলিমুস বলিয়াছেন, আস্মান নয়টী! আমাদের পণ্ডিতেরা ধর্ম্মশাস্ত্রে সাতটার অধিক খুঁজিয়া পান না। ধর্ম্মশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না, অথচ 'বাৎলিমুস হাকিমের' কথাও অস্বীকার করিবার যো নাই। তখন তাঁহাদের কয়েক জন বহু চিন্তার পর "আরস" ও "কুর্সী"কে আর দুইটী আসমান বানাইয়া দিয়া, এই সমস্যার সমাধান করিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ এমাম ও মোহাদ্দেছগণ এই প্রকার অন্ধ অনুকরণের যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই গড্ডলিকা প্রবাহে তাঁহারা বিশেষ কোন বাধা দিতে পারেন নাই, এবং কালে গ্রীকদিগের দর্শনবিজ্ঞান অনেকের নিকট অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কোরআনও নহে, হাদিসও নহে,—সুতরাং ঐ সকল সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে, বা সেই অনুসারে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে আমরা আদৌ বাধ্য নহি। এসলামের সহিত ঐ সকল বিশ্বাসের কোন সম্বন্ধই নাই। সুতরাং, অমুক পুস্তকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে বলিয়া এসলামের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত করা ন্যায় সঙ্গত হইবে না।

* সাধারণতঃ যে কার্য্যগুলিকে আমরা অস্বভাবিক বলিয়া মনে করি, পৃথিবীতে সেইরূপ বা তাহার অনুরূপ ঘটনা বিরল নহে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু পণ্ডিত তদন্ত সমিতি গঠন পূর্ব্বক, নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে বহু ঘটনার অনুসন্ধান করিয়া শেষে—ইঁহাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বে এই মতের কঠোর শত্রু হওয়া সত্তেও—তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আবশ্যক হইলে এ সম্বন্ধে আগামীতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত।

খৃষ্টান, য়্যাহুদী, পারসিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কোটি কোটি লোক ক্রমে ক্রমে এসলামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সমস্ত জাতির মধ্যে যে সকল কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভিত্তিহীন কিম্বদন্তি প্রচলিত ছিল, তাহার কিয়দংশ তাঁহাদের মধ্যে অবশ্যই ছিল। কালে তাহাই আবার, সাধারণতঃ মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসে পরিণত হইয়া যায়। মোজাহেদ, মোকাতেল, জোহাক, কাল্‌বী প্রভৃতি প্রাচীন তফসীরকারগণই এই সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী তফসীর (টীকা)কারদিগের অনেকেই বিনা তদন্তে তাঁহাদের কথায় সায় দিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য "রেজাল" শাস্ত্রের † গণ্যমান্য এমামগণ, ইঁহাদিগকে একবাক্যে জয়ীফ, (ضعيف-অগ্রাহ্য) এবং ইহাদের বর্ণিত গল্পগুজবগুলিকে সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। নমূনাস্বরূপ প্রাচীনতম মোফাচ্ছের মোজাহেদের অবস্থা শ্রবণ করুন; ইঁহার তফসীর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, اخذها من اهل الكتاب অর্থাৎ খৃষ্টান ও য়্যাহুদীদিগের নিকট হইতে এই তফসীর সংগৃহীত হইয়াছে। ‡ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا (খোদা শীঘ্রই তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রেরণ করিবেন) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিতেছেন যে,—খোদাতায়ালা যে হজরত মোহাম্মাদকে (দঃ) আপনার সঙ্গে, নিজ সিংহাসনে বসাইবেন—এই আয়াতে তাহাই বলা হইয়াছে।

মোজাহেদের পরই মোকাতেল। স্বয়ং এমাম আবু হানিফা (রা) সাক্ষ্য দিতেছেন যে, এই ব্যক্তি "জাহ্‌মী" দিগের অপেক্ষাও ঘৃণিত আকীদার লোক, ইনি বলিতেন—ان الله تعالى ليس بشئ অর্থাৎ খোদা কোন পদার্থই নহে! বিখ্যাত এমাম নাসাই (রা) ইহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মোকাতেল বরাবরই দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেন যে, "১৫০ হিজরীতে 'দজ্জাল' বাহির হইবে। যদি না হয়, তবে তোমরা আমার সমস্ত কথাই মিথ্যা বলিয়া জানিও"। সে যাহা হউক, এই শ্রেণীর গ্রন্থকারগণ বিধর্ম্মীগণের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য কিম্বদন্তি এবং রাশি রাশি কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস কোরআনের তফ্‌সীরের (ব্যাখ্যার) সামিল করিয়া দিয়াছেন। Sir William Muir প্রভৃতি এসলামের চিরবৈরী খৃষ্টান লেখকগণ, তফসীরের এই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এসলামের মুণ্ডপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই শ্রেণির লেখকদিগের উক্তি, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং তাঁহাদের অন্ধবিশ্বাসের নাম 'এসলাম' নহে। কোরআন বা নির্দ্দোষ (সহী) হাদিসের স্পষ্ট আদেশ ব্যতীত, অন্য কাহারও কথা দ্বারা একটা "আকীদা" গড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে না। ইহারই নাম—বেদ্‌আতে জালালা।

† যে শাস্ত্রে হাদিসের বর্ণনাকারিদিগের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাকে রেজাল শাস্ত্র (علم رجال) বলা হইয়া থাকে। হাদিসের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণ এই শাস্ত্রের উপরই নির্ভর করে।

‡ ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٣٣٢

মহাশিক্ষা-কাব্য।

বন্দনা।

জয় জয় বিশ্বনাথ, বিশ্বের কারণ,
অনাদি-অনন্ত বিভু, দয়া-পারাবার।
দীন-বন্ধু, দীন-নাথ, মঙ্গল নিলয়,
অনন্ত মহিমা-সিন্ধু, ব্রহ্ম সনাতন।
পবিত্র অপাপ-বিদ্ধ, অক্ষয়, অব্যয়,
নিত্য, সত্য, জ্ঞানময়, সর্ব্ব-শুভকর,
সর্ব্ব-শক্তি-মূলাধার, বিশ্বের বিধাতা।
পতিত পাবন তুমি, প্রভু পরমেশ,
অনন্ত বিভব তব, অনন্ত মহিমা ;
কি সাধ্য আমার, বিভো! আমি ক্ষুদ্র কীট,
সে সব বর্ণনা করি? নবী, ঋষিগণ
যুগ যুগান্তর ব্যাপি' ভক্তি-প্লুত-কণ্ঠে
অবিরাম গাহিয়া, যে মহিমার গাথা,
বিন্দু পরিমাণ নাহি পারিল শেষিতে!

২

হে খোদা, করুণা সিন্ধু! জীবনে মরণে
তুমি এক মাত্র গতি, তুমিই উপাস্য ;
তুমিই আশ্রয় শুধু এ বিশ্বের মাঝে।
এ বিশ্ব তোমারই সৃষ্টি, তব লীলাস্থলী ;
প্রতি অনু পরমানু, ভাবের ভাষায়,
নিয়ত কীর্ত্তন করে তোমার মহিমা।
রবিতে তোমারি তেজ ; তোমারি সৌন্দর্য্য,
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রে, অনন্ত গগনে—
তোমারি মহিমা রাজি—জ্বলন্ত, বিকীর্ণ
অনন্ত তারকাক্ষরে স্তবকে স্তবকে!
তোমারি কৃপায় বিভো! তোমারি কৃপায়—
তোমারি করুণা-কণা লভিয়া জীবনে,
প্রেরিত কুলের কেতু, সাধক-তপন,
মহাপ্রাজ্ঞ মোহাম্মদ * জনমি' ধরায়,
পাপ-দগ্ধ-নরকুলে করিলা উদ্ধার—
স্থাপিলা স্বরগ রাজ্য, মর অবনীতে।
(ধন্য তাঁর স্বার্থত্যাগ! ধন্যরে সাধনা!
ধন্যরে আত্মার বল, বিশ্বাসের তেজ!
ধন্য তাঁর বিশ্ব-প্রেম! শত ধন্য আর,
হে খোদা, তোমার লীলা) একাকী ধরায়
দেখাইলা যেই দৃশ্য—অপূর্ব্ব ঘটন!
টলিল সমগ্র ধরা, পাপ মূর্ত্তি-পূজা
হইলেক দূরীভূত ; উপধর্ম্মাবলী
সভয়ে বিলুপ্ত হ'ল ধরণী ছাড়িয়া।
জাতিভেদ, মদ্যপান, অবলা-পীড়ন
ভস্মীভূত ; ভস্মীভূত পাপের রাজত্ব!
শতধা বিচ্ছিন্ন হায়! মানব সমাজ
একই সত্যের মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
লভিল নূতন প্রাণ—নূতন হৃদয়!
এক আল্লা, এক নবী, একই কোরাণ,
এক আশা, এক লক্ষ্য, এক উপাসনা,
এক ক্ষুধা, এক তৃষ্ণা, এক অনুভূতি,
একই আদম বংশ, এক জন্ম-মৃত্যু,
এক মর্ম্ম, এক ধর্ম্ম—কি একত্ব ভাব!
এক অদ্বিতীয় আল্লা উপাস্য সবার।
আহা কি যথার্থ-তত্ত্ব! কি নির্ম্মল-সুধা!
মরি কি মহতী শিক্ষা-সরল উদার!

৩

হে খোদা, লীলার সিন্ধু, ইচ্ছায় তোমার,
শিক্ষা দিতে নরকুলে অপূর্ব্ব শিক্ষায়—

* দরূদ

বীরেন্দ্র-কুল-কেশরী রাজর্ষি হোসেন,—
(মহানবী মোস্তফার নন্দিনী-নন্দন,
বীরেশ কুলের ত্রাস—আলীর অঙ্গজ ।)
অনন্ত কল্যাণ-প্রসূ প্রজাতন্ত্র-প্রথা,
ধর্ম্মের মর্য্যাদা আর স্বাধীনতা হেতু ;
দেখাইলা যেই দৃশ্য, যেই আত্মত্যাগ,
যে ভীষণ বীরধর্ম্ম—কঠোর প্রতিজ্ঞা,
সত্যে অবিচল নিষ্ঠা, ন্যায়ের গৌরব,
বিশ্বাসের দীপ্ত তেজ, অতুল সাধনা,
অক্লান্ত অসীম ধৈর্য্য, তীব্র উন্মাদনা,
অতুল অক্ষয় তাহা—কবীন্দ্র কুলের
চির অভিরাম ধন ! চিরকাল তাহা
গাইবে ত্রিদিবে সুর, নরলোকে নর
ভক্তি-রসাপ্লুত-কণ্ঠে ভাসি নেত্র-নীরে ।
শত শত বর্ষ হ'তে যে পবিত্র গীতি
করিয়াছে উন্মাদিত মোস্‌লেম-জগতে,
হায় ! যে করুণ দৃশ্য, দৃপ্ত-বীর-মূর্ত্তি
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জাগে মোস্‌লেম-অন্তরে !
হে বিভো ! সে গাথা আজি গাইতে বাসনা
গম্ভীর জীমূত মন্দ্রে ; সে বীর মূরতি
আঁকিতে বাসনা চারু কল্পনার তুলে ।
কিন্তু প্রভো ! দীন আমি অক্ষম, অধম,
মানস কবিত্বহীন,—তাহে বঙ্গ ভাষা
অতি দীনা কাঙ্গালিনী, তেজোবীর্য্য হীনা,
ক্ষীণপ্রাণা, শক্তিশূন্যা : বড় ভয়ে তাই
কাতরে নিবেদি প্রভো ! কৃতাঞ্জলি পুটে,
সর্ব্বশক্তি মূলাধার তুমি বিশ্বপতে !
কর তুমি শক্তি দান, দাও ভাষা ভাব
দাও সে কল্পনা ধনে (চিত্তবিমোহিনী),
সানন্দে রচিব কাব্য—মহাশিক্ষা নাম
দিতে নরে মহাশিক্ষা !—কোথায় তাহার
উত্তাল তরঙ্গময় বারিধি সদৃশ,
কোথাবা শারদাকাশ (নক্ষত্র খচিত)
কোথা ফুটি' ফুলকুল সুগন্ধ-সৌন্দর্য্যে—
মোহিবে জগত জনে ; মধুচক্র সম
কোন স্থল মধুময় ; কোথা' দাবানল
জ্বলিবে ভীষণ অতি ; কোথা' নির্ঝরিণী—
বহিবে সুধীরে মৃদু কুলু কুলু তানে
জুড়ায়ে শ্রবণ-যুগ গাহি পুণ্য গাথা ;
কল্পনার চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত কোথা' ;
(কমলদল-শোভিত সরসী কমল ১
চারু উদ্ভাসিত যথা চন্দ্রিকা পটনে ২
মধুর-মাধবী মাসে ৩ পূর্ণিমা তিথিতে)
মঞ্জুল নিকুঞ্জ সম হবে কোন স্থান,
তাহে শারী, শুক, পিক, পাপিয়া, বুলবুল
কূজনিবে ; গুঞ্জরিবে প্রসূনে প্রসূনে
মধুপ রোলম্ব ৪ পুঞ্জ—মুখরি গহনে ।
কোন স্থানে বিরাজিবে তুঙ্গ শৃঙ্গধারী
তুষার মণ্ডিত শীর্ষ—তোয়দমেখলা ৫
সুবিশাল অদ্রিব্রজ, ৬ শত শতহ্রদা ৭
রূপের সাগরে করি তরঙ্গ বিস্তার
উজলিয়া দিগ্বলয় পলকে পলকে
সদা কেলি-লীলারত অঙ্গে অঙ্গে তার ।
কবিত্বের মহাসিন্ধু, তুমি বিশ্বপাতা !
বিন্দু কৃপা-বারিদানে, সেই সিন্ধু হতে
গণ্ডূষ কবিত্বসুধা, কর নাথ ! দান,
দাতা তুমি, তব দ্বারে এই ভিক্ষা মাগি—
ফিরা'ওনা রিক্তহস্তে দীন অকিঞ্চনে ।

১ সরস কমল—সরোবরের জল ।
২ চন্দ্রিকা পটন—চন্দ্ররশ্মি সকল ।
৩ মাধবী মাসে—বসন্তকালে ।
৪ রোলম্ব—মৌমাছি ।
৫ তোয়দমেখলা—মেঘ হইয়াছে চন্দ্রহার স্বরূপ যাহার ।
৬ অদ্রিব্রজ—পাহাড় সকল ।
৭ শতহ্রদা—বিদ্যুৎ ।

তদীয় আশীষ বলে—তোমারি কৃপায়,
হে কৃপালু শক্তিধর, হে কবিত্ব সিন্ধু!
হোমার, বাল্মিকী, দান্তে, কয়েস১, ভার্জ্জিল২,
হাফেজ, খাকানী, সাদী, নিজামী, উরফী,
জামী, রুমী, ফেরদৌসী, রোজী, আলাওল,
কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, ভারবী
কৃত্তিবাস, কাসীদাস, মধু, মাঘ, হেম,
বেদব্যাস, জয়দেব, ভারত, তুলসী,
আসাদী, ওমর৩, গেটে, বায়রণ, ফৈজী,
মোতানাব্বী, সেক্ষপীর, মিল্টন, মুকুন্দ,
টেনিসন, কাউপার, খেসরু, হোসেন;
আর যত কবিজন বিশ্বের গৌরব,
লভিয়া কবিত্ব-শক্তি, রচি কাব্যোদ্যান,
রাখিলা অক্ষয় কীর্ত্তি কালের পটেতে।
তোমারি প্রসাদে প্রভো! ইঁহারা সকলে
গাহিয়াছে যেই গীত কভু মেঘমন্দ্রে,
মধুপ ঝঙ্কারে কভু, কভু কল তানে—
মধুর ত্রিতন্ত্রীস্বনে, আনন্দে কভুবা;
মুখরিত ধরা আজি তাহারি ধ্বনিতে।
আঁকিয়াছে যেই চিত্র ইহারা সকলে
ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের, বীর ও ভীরুর,
স্বর্গ আর নরকের, সারল্য সত্যের;—
পবিত্রতা, দয়া, ক্ষমা, প্রেম, ভকতির;

১ কয়েস—সুপ্রসিদ্ধ আরব্য কবি এমরা-উল-কয়েস।
২ ভার্জ্জিল—সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক কবি।
৩ ওমর—প্রসিদ্ধ কবি ওমর খইয়াম।

ঔদার্য্য, বিশ্বাস, ধৈর্য্য আর সৌন্দর্য্যের!
আজিও জগতবাসী বিমোহিত চিত্তে
নিরখিছে অনুক্ষণ লুব্ধ দৃষ্টিপাতে।
আজিও মানবজাতি তাঁ'দেরি শিক্ষায়
শিক্ষিত—চালিত সদা; ধন্য সে কল্পনা
প্রমত্ত মানবজাতি যার সুধা রসে।
হে এলাহি! দয়া-বারি করি বরিষণ,
মানস-উদ্যান জাত কবিত্ব-তরুরে
করহ সুরসে এবে শ্যামল শোভন,
পত্রপুষ্পে সমাবৃত। বড় সাধ মনে,
সে কবিত্ব তরু হ'তে চারু ফুল দল
অবচয়ি, গাঁথিবারে কাব্যের মালিকা
কল্পনার সূক্ষ্ম সূত্রে—মনের মতন।
হে কবিত্ব-সুধা-সিন্ধু, প্রভু পরমেশ!
অসাধ্য সুসাধ্য ভবে তোমার কৃপায়।
তোমার প্রসাদে, পঙ্গু গিরিশৃঙ্গ লঙ্ঘে,
ভীরু হয় বীর-শ্রেষ্ঠ; পথের কাঙ্গাল
হয় রাজ রাজেশ্বর—ধরণীর পতি;
মূর্খ দস্যুপতি হয় কবিকুল মণি;
দুশ্চরিত্র সাধু হয়; অর্ব্বাচীন জ্ঞানী।
নমি তাই তব পদে, তব আশীর্ব্বাদে,
তোমারে নির্ভর করি', তব কৃপা আশে
সিরাজী আনন্দে আজি, হে কবিত্বার্ণব!
পশিলেক কাব্যোদ্যানে। কটাক্ষ সন্ধানে
কবিত্বের সুধাংশুর সুধা অংশু-জালে
উদ্ভাসিত কর তার হৃদয় আকাশ—
দেখাইতে বিশ্বজনে অপার্থিব শোভা।

সিরাজী

জাহান-আরা বেগম।

(১)

পরিচয় ও জন্মবৃত্তান্ত।

জাহান-আরা বেগম সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠা সন্তান। ইনি ১০২৩ হিজরী অব্দে স্বনাম-খ্যাত বেগম মমতাজমহল ওরফে তাজ বিবির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

মোমতাজমহল বেগম ইতিহাস বিখ্যাত আসেফ খানের কন্যা। আসেফ খানের পিতা মীর্জ্জা গায়াস বেগ, তুরাণের অধিবাসী। খোরসান রাজ্যের পতনের পর, ইনি সপরিবারে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। যে সময় মীর্জ্জা গায়াস বেগ ভারতবর্ষে পৌছিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা অতীব হীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও শৌর্য্য-বীর্য্য, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, তাঁহাকে সম্রাট আকবর শাহের দরবারে প্রবেশের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল।

মীর্জ্জা গায়াস বেগ, আগরার আলেম মণ্ডলীর প্রধান নেতা, মোল্লা গয়াসউদ্দিন মহোদয়ের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্র আসেফখানের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই কন্যা ইতিহাসে "দিওয়ানজী বেগম" নামে পরিচিতা। কিন্তু ইঁহার আসল নাম শামস্-উজ-জোহরা খানম। মোল্লা গায়াসউদ্দিন, প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের (রাঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্র, হজরত আব্দুর রহমানের (রাঃ) বংশধর।

মীর্জ্জা গায়াস বেগ, ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। আগরা: নগরে তাঁহার কবর-গৃহ আজও বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সুযোগ্য বংশধর মীর্জ্জা আবুল হাসান আমিন-উদ্-দৌলা মোহাম্মদ আসেফ খান, ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লাহোর নগরে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

মীর্জ্জা মোহাম্মদ আসেফের ঔরসে এবং দিওয়ানজী বেগমের গর্ভে এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যা-রত্নই ইতিহাস বিখ্যাত মমতাজমহল ওরফে তাজবিবি। কোন কোন ঐতিহাসিক ইঁহাকে বানুবেগম নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইঁহার রূপ ও গুণের প্রশংসা শুনিয়া ও কতক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় প্রিয়তম পুত্র শাহজাহানের * সহিত ইঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

জাহান-আরার জন্মকালে সম্রাট শাহজাহান মেবারের যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ কন্যা সন্তান, গওহার আরা বেগমের জন্মকালে (হিঃ ১০৪০ সালের ১৭ই জেলকদ তারিখে,

* মোমতাজমহলের সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে শাহ জাহানের আরও এক বিবাহ হইয়াছিল। জাহাঙ্গির নামা দ্রষ্টব্য।

৩৯ বৎসর ৪ মাস বয়ক্রম কালে) মোমতাজ মহলের মৃত্যু হয়, এবং মৃত্যুর ছয় মাস পরে, হিঃ ১০৪১ সালে তাঁহার দফন করা (কবর দেওয়া) হইয়াছিল।

তাজবিবি সাতটী সন্তানপ্রসব করিয়াছিলেন। (১) জাহানআরা বেগম, জন্ম ১০২৩ হিজরী। (২) দারা শেকোহ, জন্ম ১০২৪ হিজরী। (৩) মোহাম্মদ শুজা, জন্ম ১০২৫ হিজরী। (৪) রওশন-আরা বেগম, জন্ম ১০২৬ হিজরী। (৫) গাজী আবুল-মুজাফফর মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আওরংজেব আলমগীর, জন্ম ১০২৭ হিজরী। (৬) মোরাদবখ্‌শ্‌, জন্ম ১০৩৩ হিজরী। (৭) গওহারআরা বেগম, জন্ম ১০৪০ হিজরী। *

সম্রাট শাহজাহান অপরাপর সন্তান অপেক্ষা জাহান-আরা বেগমকে অধিক স্নেহ করিতেন। মোমতাজ মহলের মৃত্যুর পর, সম্রাট শাহজাহান তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত ধন-দৌলত ও গহনাদির (যাহার মুল্য এক কোটী টাকারও অধিক ছিল) অর্দ্ধাংশ এবং বাসগৃহ ও গৃহ-সরঞ্জামাদি জাহান-আরা বেগমকে এবং অপরার্দ্ধ অন্যান্য সন্তানদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। মীর্জ্জা ইসহাক বেগ নামক এক ব্যক্তি বেগম মোমতাজ মহলের "মীর-সামানের" পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, তিনি জাহান-আরা বেগমের দেওয়ানের পদে বাহাল হইয়াছিলেন।

জাহান-আরার শিক্ষা।

যে শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান, বিবেক ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, এবং যে শিক্ষার বলে, ইতর জীব-বৃন্দের সহিত মানুষের পার্থক্য সাধিত হয়, তাহা কেবল পুস্তক পাঠের উপরই নির্ভর করে না। অধুনা ইউরোপের পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন ও আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তথায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দল বলিতেছেন, পুস্তক পাঠ ব্যতীত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিবার অপর কোন উত্তম পন্থা নাই। অপর এক দল, প্রথম দলের যুক্তি খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, জ্ঞান, বিবেক, এবং দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানব সুলভ সদ্‌গুণাবলী, পুস্তক পাঠ ব্যতীত অপর উপায়েও সঞ্চয় করা যাইতে পারে। কিছু দিন হইল ইউরোপের বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার মিঃ নিউম্যান এ সম্বন্ধে সৎযুক্তিপূর্ণ একখানি পুস্তকও লিখিয়াছেন। ইউরোপের অপর দলের কোন পণ্ডিতই তাহার কোন সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হন নাই। মনুষ্যত্ব অর্জ্জন ও জ্ঞান লাভের জন্য আজ পর্য্যন্ত যে সকল পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দেশ ভ্রমণ, এবং সৎসঙ্গ লাভই, জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব লাভের জন্য অতি উত্তম উপায়। একবার মাত্র দেশ ভ্রমণ অথবা একবার মাত্র সাধুসঙ্গ লাভ, শত সহস্র পুস্তক পাঠের ফল প্রদান করিয়া থাকে।

---

* সম্রাট শাহজাহানের পূর্ব্ব স্ত্রীর গর্ভেও দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কনিষ্ঠ সন্তানের জন্মের সময় তিনি অসহ্য প্রসব বেদনা সহকারে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। শাহজাহাননামা দ্রষ্টব্য।

আমরা যে সময়ের আলোচনা করিতেছি, সেই সময়, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে বড় বড় কলেজ ছিল না এবং বিশেষ বন্দোবস্তযুক্ত কোন ইউনিভারসিটীও ছিল না। জন সাধারণ, আপন আপন গৃহে ওস্তাদ (শিক্ষক) রাখিয়া সন্তানদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। শিক্ষক মহোদয়েরা কেবল যে পুস্তক পাঠ করাইয়াই শিক্ষা-দান কার্য্য শেষ করিতেন, তাহা নহে; বরং তাঁহারা অনেক সময় ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের সহিত বিবিধ নীতিপূর্ণ ও চিত্তবিনোদন গল্প করিয়া ছাত্রদের শিক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিতেন।

রাজকন্যা জাহান-আরাও এই নিয়মাধীনে থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৎসঙ্গ লাভই যে তাঁহার জীবন গঠনের অধিক পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল, একথা বোধ হয় পাঠকবর্গকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কারণ, রাজ্ঞী মোমতাজমহল যাঁহার গর্ভধারিণী, দেওয়ানজী বেগম যাঁহার মাতামহী, রাজ্ঞী নূরজাহান বেগম যাঁহার পিতামহী এবং সর্ব্বোপরি ভারত-সম্রাট শাহজাহান যাঁহার পিতা, শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহার কি কোন অভাব থাকিতে পারে? তৎকালে যে সমস্ত মহিলা জ্ঞানে ও চরিত্রে নারীজাতির আদর্শ স্থানীয় ছিলেন, জাহান-আরা বেগম যে তাঁহারদেরই ক্রোড়ে লালিত-পালিত এবং পারিবর্দ্ধিত হইয়া শিক্ষা ও জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে বিদুষী সমাজ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। * সুতরাং সম্রাটকন্যা জাহান-আরা যে, স্বীয় সংসার ও ধর্ম্ম-জীবনকে আদর্শরূপে গঠন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

জাহান-আরার শিক্ষয়িত্রী।

সম্রাট দুহিতা জাহান-আরার বয়ক্রম যখন মাত্র পাঁচ বৎসর, সেই সময় সদ্‌র-উন্নেসা নাম্নী এক আদর্শ চরিত্র বিদুষী মহিলার উপর, তাঁহার শিক্ষা-ভার অর্পিত হয়। (১) সদ্‌র-উন্নেসা কেবল যে লেখাপড়াই জানিতেন, তাহা নহে; তিনি বিবিধ শিল্প কার্য্যেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই স্থানে সদ্‌র-উন্নেসার একটু পরিচয় প্রদান করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যাঁহারা পারস্য সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, হাকিম রোক্‌না-কাশী, ইরাণপতি শাহ আব্বাসের দরবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও আলেম ছিলেন। এই রোক্‌না-কাশীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আগরার বিখ্যাত কবি দেওয়ান নসির। সদ্‌র-উন্নেসা খানম এই দেওয়ান নসিরেরই সহধর্ম্মিনী ছিলেন। কবি রোক্‌না-কাশী, ইরাণ-রাজের সহিত কিছু মনোমালিন্য হওয়ায়, সপরিবারে ভারতবর্ষে চলিয়া আইসেন, এবং ভারত-সম্রাট আক্‌বরের সভাপণ্ডিত ও রাজকবি রূপে সাদরে গৃহীত হয়েন। (২) সদ্‌র-উন্নেসা খানম, রাজ্ঞী নূরজাহান বেগমের প্রিয়তমা সহচরী ছিলেন। (৩) মোমতাজ মহলের শিক্ষা দীক্ষার ভারত এক সময়

* আশাকরি, লেখক আগামীতে এ বিষয়টী আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। —সম্পাদক

(১) শাহজাহাননামা দ্রষ্টব্য। (২) আকবরনামা দ্রষ্টব্য। (৩) জাহাঙ্গিরনামা দ্রষ্টব্য।

ইঁহারই হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। অতি বৃদ্ধ বয়সে আবার তিনি সম্রাট-দুহিতা জাহান-আরারও শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। (১) তিনি কোরাণ-শরীফের হাফেজ এবং একজন উচ্চাঙ্গের কবি ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও রাজ্ঞী নূরজাহান ইহাঁকে অতীব সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন, এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ হিজরীর ১০২৮ অব্দে, সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক ইনি "শায়ের-উল্-মোল্ক" নামক মহাসম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত স্ত্রী কবি "তালেব আমলি" ইঁহার ভগিনী। এই তালেব আমলির মধুর কাব্য-ঝঙ্কারে এক দিন সমগ্র আজম দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি নিজের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ একখানি দেওয়ান লিখিয়া গিয়াছেন। উহাতে চৌদ্দ হাজার কবিতা আছে। (২)

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান।

(২)

পূর্ব্বযুগের মুসলমানগণের মধ্যে শিল্পাবিষ্কারের কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার জন্য আর একটী বিষয় অনুধাবনীয় বটে। মুসলমান ভৃত্য বা ক্রীতদাসগণ পরাধীনতা নিবন্ধন অনুশীলন, স্বাধীন-চিন্তাশীলতা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও গবেষণার সুযোগ পাইত না; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে অনেকেই শিল্পাবিষ্কার ও স্থাপত্য বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে। ইতিহাসে বহু ক্রীতদাস শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতী ও আবিষ্কারকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আল্লামা এব্নে নদীম (علامه ابن ندیم) তৎপ্রণীত 'কেতাবুল ফেহরেস্ত' (کتاب الفہرست) গ্রন্থে, এই শ্রেণীর বহু শিল্পীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম যথা :—এব্নে সালাম, সুজা, খফিফ, আলী এব্নে আহমদ, জাবের এব্নে সেনানল্-হর্রাণী, এব্নে কোর্রা, সনান এব্নে জাবের, ফেরাস এব্নে হাসন, হামেদ এব্নে আলী, এব্নে বাখিয়া প্রভৃতি। ইহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বংশানুক্রমিক ক্রীতদাস শ্রেণীর শিল্পী। সেকালে জ্ঞানার্জ্জন, শিক্ষা-চর্চ্চা ও শিল্পাবিষ্কারাদি সর্ব্ব সাধারণের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। মুসলমানগণ আপন আপন সন্তান সন্ততি বর্গের শিক্ষাসৌকার্য্যের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেন, বাড়ীর ভৃত্য ও দাসদাসীগণের প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ ও উদার দৃষ্টি রাখিতেন।

বর্ত্তমান সময় সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কল্পে কতই না আন্দোলন আলোচনা, এবং কন্ফারেন্স বা সভাসমিতি হইতেছে!—স্ত্রীলোকের সূচি কার্য্যাদির প্রদর্শনী খুলিয়া নারী সমাজে শিল্পানুরাগ

(১) শাহজাহাননামা দ্রষ্টব্য। (২) তারিখ-উদ্‌দেওয়ান দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধির কতই না চেষ্টা করা হইতেছে! কিন্তু মুসলমান আমলে স্ত্রী শিক্ষা ও তাহাদিগের মধ্যে শিল্প-চর্চ্চা জাগরূক রাখা সমাজের সাধারণ ও স্বাভাবিক কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। আল্লামা এবনে নদীম যন্ত্রাবিষ্কারের বর্ণনা প্রসঙ্গে সৈয়দা আজলিয়া (سيدة عجليه) নাম্নী একটী মহিলার নাম বিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ শিল্পাবিষ্কর্তৃগণের অগ্রণীয়া ছিলেন।

হর্‌রাণ (حران) সিরিয়া দেশের একটী প্রসিদ্ধ সহর। আল্লামা এব্‌নে তৈমিয়া (علامه ابن تيميه) এই নগরেরই অধিবাসী ছিলেন। এখানে নানাপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্র প্রস্তুত হইত। আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের আমলে এস্থানে যন্ত্র-বিজ্ঞানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তদানীন্তন এক ব্যক্তি মানমন্দিরের ব্যবহার্য্য "জাতল হলক" (ذات الحلق) নামক একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এব্‌নে নদীমের সময় পর্য্যন্ত এই যন্ত্র বিদ্যমান ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের মধ্যে সম্রাট মামুনের সময় শিল্প-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মামুন, মানমন্দির নির্ম্মাণের জন্য উদ্যত হইলে, এব্‌নে খলফ মর-ওরুজী (ابن خلف مرو روزي) নামক প্রসিদ্ধ শিল্পীর সাহায্য প্রার্থী হন। তিনি "ওস্তর-লাব" (اسطرلاب) বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রও আবিষ্কার করিয়াছিলেন।(১) ৩৭৭ হিজরীতে এব্‌নে নদীম স্বীয় "কেতাবুল ফেহরেস্ত" লিখিয়াছিলেন, সুতরাং এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মুসলমানগণের মধ্যে যে শিল্প-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে আবু-এস্‌হাক এব্রাহিম-এব্‌নে হাবিব ফজ্জারী মুসলমানগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (২)

দূরবীক্ষণ বহু প্রাচীন আবিষ্কার। অনেকেই বতালিমুসকে (بطليموس = Plotemy) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আদি আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মুসলমানগণ যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে অনেক নূতনত্ব সংযোজনা করিয়া উহাকে অপেক্ষাকৃত উন্নত করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক সমাজও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব ইউরোপের আবিষ্কার বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করেন, কিন্তু মুসলমানগণ যে, এই বিষয় গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং মধ্যাকর্ষণের তত্ত্বোদ্ঘাটনের সুবিধা কল্পে তাহারা যে এক প্রকার বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।*

ঘড়ির আবিষ্কারকও মুসলমানগণ। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে। ঘড়ি-শিল্পীগণ "সাআতী" (ساعاتي) নামে অভিহিত হইতেন। ঘড়িতে দোলক বা **Pendulum** ব্যবহার প্রণালীও মুসলমানগণের আবিষ্কার।

(১) এব্‌নে নদীম ২৮৪ পৃষ্ঠা।
(২) ঐ ২৭৩ পৃষ্ঠা।
* (صناجة الطرب في تقدمات العرب) গণিত ও পরিমিতির অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ফরাসী পাদ্রী জার্‌বার্ট (Gerbert) সাহেব ইউরোপে দোলক যুক্ত ঘড়ির ব্যবহার প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু তিনি যে তাহা মুসলমানগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারও বিশেষ প্রমাণ আছে। তিনি যে সময় স্পেনের একটী মুসলমান বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করিতেছিলেন, তখনই এই দোলক-ব্যবহার-প্রণালী মুসলমান শিল্পীদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। (১)

খলিফা হারুনর্‌-রশিদ ফ্রান্সের রাজা শার্লামেনকে যে একটী ঘড়ি উপহার পাঠাইয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। তদানীন্তন ফ্রান্সের রাজদরবারের বৈজ্ঞানিক সমাজ উক্ত ঘড়ির প্রস্তুত কৌশল বুঝিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মরক্কোর সোলতান আবদুল মোমেন এব্‌নে আলীর দরবারে যে অত্যাশ্চর্য্য কলের সিন্দুক নির্ম্মিত হইয়াছিল, আল্লামা মবারী নফখৎতিব (نفح الطيب) (১) নামক গ্রন্থে তাহার চিত্তাকর্ষক বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই সিন্দুকের মূল শিল্পীর নাম তাহাতে উল্লিখিত হয় নাই।

ইসলাম-জগতের প্রসিদ্ধ শিল্পীগণের নাম।

১। আবু নছর ফারাবী।

ابو نصر فارابي

ইনি 'কানুন' যন্ত্রের (آله قانون) আবিষ্কারক বলিয়া খ্যাত। ঐতিহাসিক 'এব্‌নে খালকান লিখিয়াছেন, 'কানুন' যন্ত্র সর্ব্বাগ্রে আবু নছর ফারাবী আধুনিক প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া একদা আমির সয়ফদ্দৌলার দরবারে তাহার ক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শন করেন। তিনি উক্ত যন্ত্রটী সাজাইয়া তাহা বাজাইতে আরম্ভ করিলে, সভাস্থ সমুদয় লোক হাসিয়া অস্থির হইতে লাগিল। পুনরায় তাহা খুলিয়া অন্যরূপে কলকব্জা পরিবর্ত্তন করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলে, উপস্থিত লোকজন সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। অতঃপর আর একটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য প্রকারে বাজাইতে আরম্ভ করিলে, সভাস্থ লোকজন—এমন কি সভাগৃহের দ্বারবান পর্য্যন্ত নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। (১)

২। শের মাদা দেলেমী।

شير مادہ دیلمي

ইনি 'তরলে কুলঞ্জ' (طبل قولنج) নামক যন্ত্রের আবিষ্কারক। কেহ কেহ মুসা নছ-রানীকেও এই যন্ত্রের আবিষ্কারক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মিসর-অধিপতির কুলঞ্জ

(১) খ্রীষ্টান গ্রন্থকার জর্জ্জী জয়দানের تاريخ التمدن الاسلامي ৩য় খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠা।

(১) নফখৎতিব (نفح الطيب) ৪০৫ পৃঃ ইউরোপে মুদ্রিত।

(১) এব্‌নে খালকান (ابن خلكان) ২য় খণ্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা।

(Colic = শুল)পীড়ার প্রাবল্যের সময় শেরমাদাদেলেমী ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সোলতান সালাহুদ্দীন যখন মিসর অধিকার করেন, তখন এই যন্ত্রটী মিসরের রাজকীয় তোষাখানাতে বিদ্যমান ছিল। সোলতানের লোকজন তাহা বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। এই যন্ত্রের উপর আঘাত করিলে উদর হইতে বায়ু নির্গত হইত; এজন্য কুলঞ্জ পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী ছিল। এবনে খাল্কান এই যন্ত্র-প্রসঙ্গে যে একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, মিসরের রাজকীয় তোষাখানা বা দ্রব্য ভাণ্ডারের দ্রব্যাদির হিসাব নিকাশ লইবার সময় এই অভিনব যন্ত্রটী অজ্ঞ সিপাহীদের হস্তগত হইলে, তাহারা তদ্দর্শনে কিঞ্চিত বিস্মিত হইয়া ইহা বাজাইতে আরম্ভ করিল। যে ব্যক্তি তাহা বাজাইত তাহার উদর হইতেই বদ্ধ বায়ু নির্গত হইত। ফলতঃ ইহা তখন একটী হাস্যোদ্দীপক খেলার বস্তুতে পরিগণিত হইল। অশিক্ষিত সৈন্যগণ কৌতুকভরে তাহা বাজাইতে বাজাইতে অবশেষে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু পরে যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, এই যন্ত্রটী একটী দুশ্চিকিৎস্য রোগের উপশমকারী অপূর্ব্ব যন্ত্র বিশেষ, তখন তাহারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল।

৩। হাকিম মকন্না।

حکیم مقنع

পার্সী সাহিত্যে 'মাহেনখ্শব' ماه نخشب বা 'নখ্শব চন্দ্রিকা' নামে একটী কৃত্রিম চন্দ্ররূপ যন্ত্রের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত যন্ত্রটী উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার। কিন্তু এবনে খল্কান উক্ত আশ্চর্য্য যন্ত্রের আবিষ্কারকের নাম 'আতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "রওজতস-সফা" (روضة الصفا) নামক গ্রন্থ প্রণেতা এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "বর্ণিত পণ্ডিত প্রবর ম্যাজিক ও কৌতুক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান প্রভাবে 'নখ্শবের' কূপ হইতে গোলাকার অথচ অত্যুজ্জ্বল এক প্রকার প্রদীপ-বৎ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত আলোকের প্রভা চতুর্দ্দিকে ৬ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত, এবং ঘোর অন্ধকার রাত্রিও শুক্লপক্ষের রজনীর ন্যায় উজ্জ্বল হইত।" গোঁড়া মুসলমানগণের মধ্যে কেহ কেহ এই পণ্ডিতকে নাস্তিক বা কাফের বলিয়া থাকেন। তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি জন্মান্তর বাদ বিশ্বাস করিতেন। ঐতিহাসিক 'তবরী' طبري এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "হাকিম মকন্না সম্বন্ধে ইহা কথিত আছে যে, তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন এবং নিজকে অবতার বলিয়া ব্যক্ত করিতেন।" প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহার গুরুতর দোষের মধ্যে রাজ বিদ্রোহাচরণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪। এয়াকুব কুন্দী।

یعقوب کندي

এই শিল্পী পণ্ডিত প্রবরের "কোমকামে নববাখ" قمقم نباخ নামক অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কারের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং সূর্য্য ঘড়ি নির্ম্মাণেও

সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ সকল শিল্পজাত দ্রব্যের নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে তিনি পুস্তকাদি রচনা করিয়াছিলেন। সূর্য্য ঘড়ি সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এব্‌নে নদীম তাহার নাম লিখিয়াছেন :—

عمل الساعات على صفيحة تنصب على السطح الموازي للافق

(১) যে সকল বস্তু দৃষ্টিশক্তির সীমাভুক্ত, তাহার দূরত্ব নিরূপণ সংক্রান্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত দূরবর্ত্তী দ্রব্যের পরিমাণ ও দূরত্ব নিরূপণ বিষয়ে অত্যন্ত উপাদেয় পুস্তক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। এবনে নদীম পণ্ডিত প্রবর এয়াকুব কুন্দীর প্রণীত পুস্তকাবলীর সূচীপত্র ছয় পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (২)

৫। নোহাস দেমশকী।

نحاس دمشقي

ক্রুসেড যুদ্ধের সময় খৃষ্টান আক্রমণকারী সৈন্যদল 'আক্কা' নগর আক্রমণকালে তিনটী প্রকাণ্ড সামরিক বুরুজ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার উপরিভাগে এমন এক প্রকার রাসায়নিক বস্তু লেপিয়া দিয়াছিল যে তাহাতে কোনরূপ অগ্নি সংযোগ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। খৃষ্টান সৈন্যগণ এ সকল বুরুজের অভ্যন্তরে অবস্থানপূর্ব্বক এরূপ সুকৌশলে "গ্রীকফায়ার" অর্থাৎ অনলবর্ষী পিচকারীর সাহায্যে নগরবাসীদের প্রতি অনলবর্ষণ করিতেছিল যে, তাহাতে মুসলমান পক্ষের অত্যন্ত ক্ষতি সাধিত হইতেছিল। মুসলমানগণ শত্রুপক্ষের এবম্বিধ অদ্ভুত কৌশল দর্শনে ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। এরূপ দুঃসময়ে উল্লিখিত শিল্পী নোহহাস দেমেশ্‌কী রাসায়নিক সংযোগে এক প্রকার তরল বস্তু প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বুরুজসমূহে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া অভ্যন্তরস্থ সৈন্যগণ সহ সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। (১)

৬। বদী ওস্তর্লাবী।

بديع اسطرلابي

ঐতিহাসিক এবনে খল্‌কান লিখিয়াছেন, বদী ওস্তর্লাবী খগোল শাস্ত্র সংক্রান্ত যন্ত্রাদি আবিষ্কারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই শিল্পাবিষ্কারের কল্যাণে তিনি খলিফা মোস্তার্শেদ-বিল্লার রাজত্ব-কালে প্রচুর অর্থসাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এরূপ কেহ ছিলেন না, যিনি খগোলিক যন্ত্রাবিষ্কার বিষয় তাঁহার সুযশ রক্ষা করিতে পারেন। ৫৩২ হিজরী অব্দে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন। (১)

---

(১) এবনে নদীম (ابن نديم) ২৫৮ পৃঃ।

(২) ঐ ২৬০ পৃষ্ঠা।

(১) সিরতে সোলতান ছলাহদ্দীন (سيرت سلطان صلاح الدين) ১০৩ পৃষ্ঠা।

(১) ফওয়াতল ওফয়াত (فوات الوفيات) ২য় খণ্ড ৩৯০ পৃঃ।

৭। নজমুদ্দিন এব্নে ছাবের।

نجم الدين ابن صابر

ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি। অথচ শিল্পাবিষ্কারেও তিনি সাময়িক পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রণী বলিয়া গণ্য হইতেন। কবিকুল, সচরাচর কেবল খেয়ালেয় বশীভূত—কর্ম্মবিমুখ হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের একটা কলঙ্ক আছে; কিন্তু এই মহাত্মা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবনে খল্‌কান লিখিয়াছেন, "তিনি, 'মেনজেনিক' যন্ত্র আবিষ্কার সম্বন্ধে শিল্পী সমাজের আদর্শ ছিলেন।" (১)

৮। এবনে বাজা সলম।

ابن باظة سلمي

এই মহাত্মা অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেণীর জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্র নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি তদীয় পিতা পণ্ডিত প্রবর হাসনের নিকট এই যন্ত্র-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। (২)

৯। মোহাজ্জবদ্দীন এবনে আবদুর রহিম এবনে আলী।

مهذب الدين ابن عبدالرحيم ابن علي

যন্ত্র বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার নিকট এত অধিক পরিমাণ উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি ছিল যে, অন্যত্র তাহার তুলনা খুজিয়া পাওয়া দায় ছিল। (৩)

১০। নওয়াব জয়নল আবেদীন।

نواب زين العابدين

ইনি দিল্লীর রাজমন্ত্রী দবিরউদ্দৌলা খাজা ফরিদউদ্দিনের (১২৪৪ হিঃ) পুত্র। মাধ্যাকর্ষণ ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংক্রান্ত নানা প্রকার যন্ত্র তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈঠকখানায় নানা প্রকার বহুমূল্য যন্ত্র সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিত। তাঁহার ' সাক্ষাৎ-প্রকোষ্ঠটী (Visiting Room) দেখিলে রসদখানা বা মানমন্দির বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার পিতা আল্লামা তফজ্জল হোসেন খাঁ লক্ষ্ণৌএর রাজমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্র বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১২১৫ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। (৪)

১১। শেখ শরফুদ্দীন তূসী।

شيخ شرف الدين طوسي

ইনি একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সংস্কারক এবং দূরবীক্ষণ রূপ যষ্টিযন্ত্রের আবিষ্কারক। ঐতিহাসিক এবনে খলকান 'ওস্তুর্লাব' যন্ত্রের আলোচনার পর যষ্টি যন্ত্রের আবি

(১) এবনে খলকান ২য় খঃ ৩৩৭ পৃঃ। ابن خلكان

(২) আল-এহাতা বে আখবারে গরনাতা ৮৫ পৃঃ। الاحاطة باخبار غرناطة

(৩) অয়ুনল আম্বা ২য় খঃ ২৪৪। عيون الانباء

(৪) সিরতে কবিদিয়া ৭।৯।৪২ পৃষ্ঠা। سيرت فريديه

ষ্কার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শেখ শরফুদ্দীন দূরবীক্ষণ যষ্টি যন্ত্রের অগ্রগণ্য আবিষ্কারক।(১) তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিত সমাজ তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না।" (صناجة الطرب) "ছন্নাজতৎ-তরব" নামক পুস্তকের খৃষ্টান গ্রন্থকার ডাক্তার নৌফল আফেন্দী লিখিয়াছেন, " যে সময় আরবগণ জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও খগোল শাস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তখন হইতে গোলক ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারের প্রথা তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত ছিল।" শেখ শরফুদ্দীন তূসীর সময়ে তিনি সৌর মণ্ডলের সমুদায় গোলক ও দূরবীক্ষণের আবশ্যকতার বিষয় আছা (عصا) নামক একখানি পত্রে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছিলেন। তৎপর তৎসম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।

ইসলামাবাদী।

আরব ও ভূগোল শাস্ত্র।

আমেরিকার একখানি সংবাদ-পত্রে (১) প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যখন আরবগণ স্পেন জয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা আমেরিকাতেও গিয়াছিলেন। তথাকার গ্রীষ্মাধিক্য দেখিয়া তাঁহারা সেই স্থানকে "কাল্‌ফোর্‌ণ (کالفورن)" নামে অভিহিত করেন। 'ফোর্‌ণ' অর্থ রুটি ভাজিবার তাওয়া, এবং 'কা'র অর্থ মত। অর্থাৎ এই স্থানটী তাওয়ার ন্যায় অত্যধিক উষ্ণ। জন সাধারণ এই নামের পরিবর্ত্তন করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার পশ্চিম ভাগকে 'কালিফর্ণিয়া' নামে অভিহিত করিতেছে।

এই সংবাদটী পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া বরং দুঃখিত হইতে হয়। যেহেতু আরবদের মত বিজয়ী জাতি, যাঁহারা প্রত্যেক স্থানে, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, আমেরিকা এবং মধ্য এশিয়ায় আপনাদের অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহারা মূর্খ, দরিদ্র এবং মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য পর মুখাপেক্ষী।

আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের একজন পাদ্রী (২) লিখিয়াছেন যে, "খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকদিগের নিকটে আমেরিকার কথা অজ্ঞাত ছিল। কারণ সেই সময়ের ঐতিহাসিকগণ, "পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে," ইহা ছাড়া আর কিছুই লিখিয়া যান নাই। কিন্তু গ্রীসের আরাস্তুতালিস (Aristotle) ও কতিপয় পণ্ডিতের,—যাঁহারা খৃষ্টের ২০০

(১) এবনে খলকান ১৮৫ পৃষ্ঠা। ابن خلکان ۔

(১) সংবাদ পত্রের নাম দেওয়া উচিত ছিল।

(২) রেফারেন্স না দিলে প্রবন্ধের কোন গুরুত্বই থাকে না। পাদ্রী সাহেবের নাম থাকা আবশ্যক ছিল। —সম্পাদক।

বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কথায় জানা যায় যে, প্রাচীনকালের লোকগণ একটী মহাদেশের কথা আলোচনা করিতেন বটে, কিন্তু সে মহাদেশটী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বাগ্দাদের সপ্তম খলিফা মামুনররশিদ অন্যান্য বিদ্যা চর্চ্চার সঙ্গে ভূগোলের দিকেও মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাগ্দাদে, আরবের অনেক খ্যাতনামা 'আলেম' একত্রিত হইয়া ভূগোল আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। যে সময়ে ইউরোপে ভূগোল বিদ্যার চিহ্ন মাত্রও ছিল না, এমন কি তাহার নামও কেহ জানিত না, সেই সময়ে এই বাগ্দাদ হইতেই অন্যান্য দেশে ইহার বিস্তৃতি ঘটে।

"তখন আরব 'আলেমগণ' শুধু, গ্রীক ও রোমক পণ্ডিত দিগের যে যে রচনা অসংগৃহীত ছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বরং সে সময়ে যে যে দেশ অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলি পরিচিত করিবার, এবং তাহাদের সীমা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই ৯০০ খৃষ্টাব্দে, একদল এশিয়ার পূর্ব্বাংশের শেষ আবিষ্কারের জন্য, এবং অন্যদল ইউরোপের দিকে ধাবিত হন। শেষোক্ত দল পর্ত্তুগাল হইতে অর্ণবযান-যোগে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া, ২৪ দিন পরে কোনও দ্বীপে উপস্থিত হন। যদি তথাকার শাসনকর্ত্তা, তাঁহাদের এই উদ্যমে কোন প্রকার বাধা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাই যে প্রথমে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেন, সে বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই।"

"ইহার পরে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূগোল বিদ্যা ইউরোপের অধিবাসিগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। কোন কোন যুদ্ধে এরূপ হয় যে, তদ্দ্বারা দেশের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং জন সাধারণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে যখন সোলতান সালাহউদ্দিন, ইউরোপের খৃষ্টানদিগকে শিরিয়া হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, এবং যখন তাহারা সাতবার আক্রমণ করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়া ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন শিরিয়ায় বাস করিয়া তাহারা আরবদিগের নিকট যে সকল বিদ্যা শিখিয়াছিল, এবং পুস্তকাদি পাইয়াছিল, তাহাও সঙ্গে লইয়া গমন করে এবং সমস্ত ইউরোপে তাহার প্রচলন করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এই গুলির মধ্যে ভূগোলশাস্ত্রও একটী। বস্তুতঃ তখন হইতেই ইরোপীয়গণ ভৌগলিক গবেষণায় মনোনিবেশ করে, এবং অনাবিষ্কৃত স্থানগুলি আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে "কলম্বস" কর্ত্তৃক আমেরিকা পুনরাবিষ্কৃত হয়।"

"যদি আমি বলি যে, আরবগণই ইউরোপের উন্নতি ও আমেরিকা আবিষ্কারের মূল, তবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। কেননা যদি আরবগণ মামুনর-রশিদের চেষ্টায় ভূগোল শাস্ত্রের উন্নতি সাধন না করিত, তবে সম্ভবতঃ আরও বহুদিন অমেরিকা আবিষ্কৃত হইত না, এবং ইউরোপেও উন্নতির প্রভা উদ্ভাসিত হইত না।

"ইউরোপীয়গণ এ পর্য্যন্তও আফ্রিকা, তাতার, এবং এশিয়ার অধিকাংশ স্থানের ভৌগলিক বিবরণে, খৃষ্টিয় নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত 'আলেমগণের

পদানুসরণ করিয়া থাকেন। আজ কালও জমখ্‌শরী, ইদ্রিছি, এবনে-বতুতা, আবুল ফেদা এবং ইয়াকুত হামবী প্রভৃতি আলেমগণই ইউরোপীয়গণের ভরসা-স্থল।”

“জমখ্‌শরী—১০৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অভিধান ও ব্যাকরণে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। ভূগোলশাস্ত্রে তাঁহার ‘আল-জেবালো ওয়াল-আমাকেনা ওয়াল-মিয়াহ’ (الجبال و الاماكن والمياه) নামক পুস্তক প্রসিদ্ধ।

“শরিফ মহাম্মদ ইদ্রিছি—ইনি ১১০০খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ‘আল মাকালা’ (المقالة) নামক ভূগোল লিখিয়াছেন। ইহাতে হপ্ত ‘আকলীম’ (বা ৭ মহাদেশের) ও ৭০টী নগরের বিবরণ আছে। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ করা হয় এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মূল পুস্তক ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ তাহার প্যারিসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

“এবনে বতুতা—মরোক্কোস্থ তাঞ্জা নগরে ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি পারস্য, আফ্রিকা, সিরিয়া, আরব, ভারতবর্ষ, চিন, তাতার, স্পেন ও অন্যান্য স্থান পর্য্যটন করিয়া ‘তোহফাতোন-নোজ্জার ফি গারায়েবেল-আমছার ওয়া আজায়েবেল-আছফার’ (تحفة النظار في غرائب الامصار و عجائب الاسفار) নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক লিখিয়াছেন। প্যারিসে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে, এবং ফরাসী ভাষায় চারি খণ্ডে তাহার অনুবাদও করা হইয়াছে।

“আবুল ফেদা—ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে দ্বিতীয় মামুনররশিদ নামে অভিহিত করেন। তাঁহার ‘তক্‌বিমোল-বোলদান’ (تقويم البلدان) নামক পুস্তক প্যারিসে মুদ্রিত হইয়াছে।

“ইয়াকুত হামবী—ইনি ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২২৯ খৃষ্টাব্দে হলবে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই খানি ভূগোল প্রসিদ্ধ। ‘মুকিদোল বোলদান’ ও ‘আল মোশতারেকো ওাজআণ ওয়াল মোখতালেফোছাফআণ’ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, প্রথম খানি ছয় খণ্ডে জর্ম্মণীর লিপজবর্গে ও দ্বিতীয় খানি গুটাঞ্জন নগরে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে।”

এই পর্য্যন্ত একজন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল। এখন এই বিষয়ের পুস্তকাদি অনুসন্ধান করিয়া যত দূর জানিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

সর্ব্ব প্রথমে ফিনিশিয়াবাসিগণ বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করেন। সেই জন্য, ভারতবর্ষ, স্পেন, পারস্য এবং ইউরোপে তাঁহাদের যাতায়াত ছিল। এইরূপ যাতায়াতের ফলে তাঁহাদের নিকট ভূগোলের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হয়। কিন্তু ভূগোল সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন পুস্তক না থাকায়, তাঁহারা সেই সব তত্ত্বকে পুস্তকাকারে পরিণত করেন নাই বলিয়াই বিবেচনা হয়।

গ্রীক স্বভাবতই বুদ্ধিমান জাতি। তাঁহারা প্রায় সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানই পুস্তকাকারে পরিণত করেন, এবং প্রায় সমস্ত জাতিই জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তাঁহাদের নিকট ঋণী। ইহা সত্ত্বেও, প্রথমে

তাঁহারা ভূগোলের দিকে দৃকপাত করেন নাই। আলেকজেণ্ডার যখন দিগ্বিজয় করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তৎকালীন পণ্ডিতদিগের দ্বারা তাঁহার পৃথিবী বিজয়ের ইতিহাস লিখিত হয়। সেই সমস্ত বিবরণ দেখিয়া তৎপরবর্ত্তী পণ্ডিতদিগের মনে ভূগোল লিখিতে প্রবৃত্তি জন্মে। খৃষ্টের ১৯২ বৎসর পূর্ব্বে 'হিরাতাসতিন্স' ও অন্য একজন পণ্ডিত কর্ত্তৃক ভূগোল লিখিত ও ভূচিত্র অঙ্কিত হয়। এবং "বালীমুস" এবং "বৎলীমুস" ও কয়েকখানি পুস্তক লেখেন।

মিসর বাসিগণ যদিও বহু পূর্ব্ব হইতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং শিল্পবাণিজ্যে জগতকে পরাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু তবুও তাহাদের মধ্যে ভূগোলের প্রচলন হয় নাই। আলেক জেণ্ডারের মৃত্যুর পর, 'বাতালাসা' বংশের রাজত্বকালে, তাঁহারা তথায় বিদ্যালয় ও পুস্তকাগার স্থাপন করেন। এই সময়ে মিসরে সকল বিদ্যারই উন্নতি হয়, এবং তৎকালীন রাজার পুত্র 'বাতলিমুছ ফিলাদফ্' একখানি ভূগোল পুস্তক লেখেন।

রোমকগণ—রোমক রাজাগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় কনষ্টান্টিনের সময়ে সে দেশে বহু বিদ্যার আলোচনা হয়, ভূগোলও তাহার মধ্যে অন্যতম। তাঁহারা বাতলীমুসের পুস্তকের সংস্কার করেন, এবং ভূচিত্রও অঙ্কন করেন। কিন্তু ভূগোল সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের কোন পুস্তক নাই।

আরবদিগের উন্নতির পূর্ব্বে ভূগোলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কেবল গ্রীকগণ ভিন্ন অপর কোন জাতিই ভূগোলের আলোচনা করিত না। ফিনিশিয়, মিসরবাসী ও রোমকদিগের নিজের এ বিষয়ে কোন পুস্তকই ছিল না।

এতদ্ব্যতীত পারস্য, ভারতবর্ষ ও চিনে যদিও অতি প্রাচীনকালেই সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল; এবং তাঁহাদের নিকট হইতে আরবগণ বহু বিষয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে ভূগোল চর্চ্চার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্রীক পুস্তকের মধ্যে আরবগণ বাতলিমুসের "আলজগরাফিয়া" ভিন্ন অন্য কোনও পুস্তক প্রাপ্ত হন নাই। হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীতে আরবীতে উহার অনুবাদ হয়। এবনে নদীম লিখিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রথমে আরব পণ্ডিত কুন্দীর (كندي=Condi) জন্য, (মৃত্যু ২৪৭ হিজরি) বাতলিমুসের 'আলজোগরাফিয়া' নামক পুস্তক ছাবেত কর্ত্তৃক (যিনি ২২১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ২২৮ হিজরিতে লোকান্তরিত হইয়াছেন) আরবীতে অনুবাদিত হয়।

এই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে, ২২১ হিজরীর পূর্ব্বে, আরবগণ গ্রীকদিগের ভূগোলের বিষয় কিছুই জানিতেন না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, এই সময়ের পূর্ব্বের আরব পণ্ডিতগণ দ্বারা লিখিত ভূগোলের যে সমস্ত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা বহুকাল হইতেই ভূগোলের আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। যথা আবু-ছাইদ আছমায়ী (যাহার ২১৩ হিজরিতে মৃত্যু হইয়াছে) 'জজিরাতোল আরব' (جزيرة العرب)

ও হেশাম কাল্‌বী (মৃত্যু ২০৬ হিজরী) 'আল বোলদানোল কবীর ওয়াল বোলদানোস্‌ছাগীর' (البلدان الكبير و البلدان الصغير) ইত্যাদি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

এই সমস্ত দেখিয়া, অনুমান করিতে পারা যায় যে, আরবীয় ভূগোলশাস্ত্র অপর কোনও জাতির নিকট হইতে গৃহীত নহে। তাঁহারাই ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে ২২১ হিজরীর পরে গ্রীক পুস্তক অনুবাদিত হওয়ায় তাহার যথেষ্ট অঙ্গপুষ্টি হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে আরবেরা অন্যান্য দেশের বিষয়ে ভালরূপে অবগত না থাকায়, প্রথমে তাঁহারা আরবের ভৌগলিক বৃত্তান্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকে আরবের পর্ব্বত, পর্ব্বত-গুহা, কূপ, এবং নহর (প্রবাহ) ইত্যাদির কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই-জাতীয় লেখকদিগের মধ্যে এব্‌নে ফকিহে হামদানী বিখ্যাত। তিনি তাঁহার 'জজিরাতোল আরব' (جزيرة العرب) নামক পুস্তকে, আরবের নগর, পর্ব্বত, খনি, প্রাচীন সমৃদ্ধ নগর সমূহের ধ্বংশাবশেষ ও পূর্ব্ব সম্প্রদায়দিগের ইতিহাস বিশদ ভাবে লিখিয়াছেন। এবং প্রস্তরখণ্ড সমূহে পূর্ব্বকালের বিচিত্র অক্ষরে যে সমস্ত কথা লেখা ছিল, তৎসমুদয়েরও মর্ম্ম-উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইউরোপের পুরাতন ধ্বংশাবশেষ অনুসন্ধানকারিদিগের নিকটে হামদানী যথেষ্ট সম্মানের পাত্র।

জজিরাতোল আরব, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লিডনে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং হস্তলিখিত পুস্তকও লণ্ডন, প্যারিস এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে আছে!

যে সমস্ত আরবীয় পণ্ডিত সমগ্র পৃথিবীর ভূগোল লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বিবরণ অপর এক প্রবন্ধে লিখিতে বাসনা রহিল।

আবু-এহিয়া মোহাম্মদ আবদুল জব্বার রোকণী।

সাধনা ও সিদ্ধি।

পুণ্য-হেরা-গিরি নিভৃত কন্দরে
বসিয়া ধূলির পর,
নিখিল নাথের গভীর ধেয়ানে
মগ্ন যোগীবর !
মুদিত নয়ন স্খলিত বসন,
বাহ্য জ্ঞেয়ান হারা,
অপাঙ্গে ঝরিছে ঝর ঝর ঝর,
তপ্ত অশ্রু ধারা !
বহে কি না বহে শ্বাস নাসিকায়,
বদ্ধ দুটী কর !
নিখিল-নাথের গভীর ধেয়ানে,
মগ্ন যোগীবর !

আহা কি মধুর মোহন মূরতি,
পুণ্য-জ্যোতিতে গড়া !
স্থির-অবিচল ক্ষণেকেরো তরে
নহেক নড়াচড়া !
নীরব ভাষায় মনের মন্দিরে,
অহো, কাঁদাকাটি কত !
কতই সাধনা, কত গাথা বাজে
হিয়া-যন্ত্রে অবিরত !
দূরিতে দেশের দারুণ দুর্গতি
লভিতে গো শুভ বর,
নিখিল-নাথের গভীর ধেয়ানে
মগ্ন যোগীবর।

হেরা-গিরি-গহ্বর

নিতি নিতি হেন কঠোর সাধনা,
প্রাণপাত আরাধন !
ভকতের ডাকে কাঁপিয়া উঠিল,
ধাতার সিংহাসন।
এক দিন আহা, শুভ দিন সেই,
দেব-দূত শুভক্ষণে,
বিরাট আকারে দিলা দরশন,
সাধকের যোগাঙ্গনে !

ঘোষিলেন দূত, বিভুর আদেশ,
বসুধার শুভকর ;
ধ্বনিলা আকাশে, সাধনায় সিদ্ধি
লভিলেন যোগীবর।

মোজাম্মেল হক্,
শান্তিপুর।

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব।

(DOCTRINE OF ATONEMET).

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(৫)

প্রায়শ্চিত্তবাদ যাঁহারা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় অপরাধের পরিবর্ত্তে শাস্তি দানে যে কি রহস্য আছে, তাহা জানিতেন না। বিচারক অপরাধীকে দণ্ড দেন—তাহার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য। অপরাধীর বিচারের ফল আশানুরূপ হইলে, তাহাদ্বারা শুধু সেই দোষীরই চরিত্র সংশোধন হওয়ার সুবিধা হয় না, বরং একটী সৎ-দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও দশ জন বিপথগামী সৎ-পথে আসে। এই উপায়ে সংসার মানুষের জন্য শান্তির আগারে পরিণত হয়। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানি প্রায়শ্চিত্ত বাদে যে ইহার বিপরীত ফল দাঁড়ায়, এ কথা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এইক্ষণে আমাদের কথা এই যে, যিনি বিচারকর্ত্তা, কেবল শাস্তি দান করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য নহে; বরং যে ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী, তাহার সন্ধান করা এবং নিরপরাধ ব্যক্তি যাহাতে কোন প্রকার যন্ত্রণা না পায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা তাঁহার প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য। ইহা না হইলে দেশময় একটা অরাজকতার সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্টীয়ানগণ যে মুক্তির "সুসংবাদ" আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন, তাহাতে আমরা একাধারে মহারাজাধিরাজ বিশ্ববিচারপতি খোদাতালার "বোকামি" (نعوذ بالله) এবং অন্যায় বিচারের আদর্শ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাই। দোষ করিলাম আমরা—মানবজাতি, আর তাহার পরিবর্ত্তে শাস্তি ভোগ করিলেন—বেচারা যীশু। দৃষ্টান্তটী হবচন্দ্র রাজা ও তাঁহার গবচন্দ্র মন্ত্রীর বিচারের মত দাঁড়ায়। প্রবাদ আছে, হবচন্দ্র নামে এক রাজা ছিল। তাঁহার রাজ্যে "বেঁটে বামন" নামে এক দুষ্টব্যক্তি মানুষকে জ্বালাতন করিয়া অস্থির করিয়া তুলে। শেষে রাজপুরুষেরা বামনকে ধরিয়া রাজার কাছে আনিলে, রাজা তাহার ফাঁসির হুকুম দিলেন। মশানে লইয়া গেলে দেখা গেল, বামনের গলা ফাঁসির দড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে না। সকলে আসিয়া রাজাকে জানাইল, "বামনের গলা দড়ির অনেক নিচে থাকে, এখন উপায়!" রাজা বলিল, "তা ভয় কি? একজন খুব লম্বা লোক বাছিয়া লও না।" শেষে লম্বা বাছিতে বাছিতে গবচন্দ্র মন্ত্রীর সেরা আর কাহাকেও পাওয়া গেল না, সুতরাং তাহারই ফাঁসি হইল। বামন খালাস পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অত্যাচার ইত্যাদি করিতে লাগিল। খৃষ্টীয় "যিশুর রক্তদানের" ভাবটাও ঠিক এইরূপই নয় কি?

তার পর আর এক কথা। খৃষ্টীয়ানগণ স্বীকার করেন যে, যিশু তাঁহার প্রত্যেক ভক্তকে নিজ রক্ত দ্বারা উদ্ধার করিবেন। যে যতই পাপ করুক, সমস্তই তাঁহার রক্তের প্রভাবে মাফ হইয়া যাইবে—তাহা ছাড়া "জন্মগত পাপও" (উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আদমের (আঃ) পাপ)

ক্ষমা হইবে। কথাটা সরাসরি শুনিলে বেশ একটু আনন্দ হয়, মনে হয় আমাদের প্রতি প্রেম-ময় সদাপ্রভুর কতইনা অনুগ্রহ! কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে, ইহার মধ্য হইতে একটা মস্ত হট্টগোলেরও আবির্ভাব হয়। মনে হয়, আচ্ছা, মানুষ'ত পাপ করে—শয়তানের ধোকায় পড়িয়া, তাহাতে পরমেশ্বরের কিছু ক্ষতি হয় কি? যদি কেহ একজন মানুষের কোন ক্ষতি করে, তবে সেই ক্ষতিগ্রস্ত যে কোন উপায়ে তাহার ক্ষতিপূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপরাধীকে ছাড়িয়া দেয় না। অপর কেহ যদি দয়া করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন, তবে সেই ক্ষতি পূরণকর্ত্তার সহিত অপরাধীর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা বিচার না করিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত অপরাধীকে অবাধে মুক্ত করিয়া দেয়। মানুষের বুদ্ধি কিনা, তাই সে مردہ بہشت میں جاے یا دوزخ میں ملا جی کو حلوے مانڈے سے کام ভাবিয়া তাহাকে মুক্তি দিতে দ্বিধা বোধ করে না। আচ্ছা, পরমেশ্বরেরও কি এইরূপ স্বভাব? যদি তাহাই হয়, তবে দেখিতে হইবে, মানুষের পাপে তাঁহার কি ক্ষতি হইল? আদম নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায় পরমেশ্বরের অনন্ত ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায় নাই। মানুষ সাংসারিক নিয়মের দুই একটা ব্যতিক্রম করিয়া পাপ করে বলিয়া, পরমেশ্বরের রাজ্য টলয়মানও হয় না। তবে তাঁহার ক্ষতি কি? না, কিছুই না। যদি ক্ষতিই না হইল, তবে পূরণ করিতে হইবে কি? না, কিছুই না! এই অবস্থায় যিশুর মৃত্যু কেন হইল? না, সদাপ্রভু হবচন্দ্র আর যিশু তাহার মন্ত্রী গবচন্দ্র।

ঠাট্টা মস্করা যাউক। মানুষের চরিত্র সংশোধন করার উদ্দেশ্যে সদাপ্রভু পাপ জনক কার্য্যের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহার পাপ সে যদি শাস্তি না পায়, তবে এই মহৎ উদ্দেশ্য রক্ষিত হয় না। খৃষ্টীয় প্রায়শ্চিত্ত বিধান এই নিয়মের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক শিক্ষা দেয়। তাঁহাদের মতে গায়ের জামা ময়লা হইলে মাথার টুপি ধোপার বাড়ী দিলেই সব পাক সাফ হইয়া যায়! যাহার ইচ্ছা হয় এমন বিধান মানুক; কিন্তু আমরা দৃঢ় রূপে বলিতে পারি, বিবেচনা-শীল ব্যক্তি এমন অযৌক্তিক বিধান কিছুতেই মানিবে না।

(৫)

খৃষ্টীয়ানদের শাস্ত্র অনুসারে মানুষের পাপের জন্য শাস্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, জীবন ভরা দুঃখ; পরিশ্রম সহকারে খাদ্য সংগ্রহ করা; মানবের বাসস্থান পৃথিবীতে তাহাদের বিঘ্নস্বরূপ শেয়াল কাঁটা, ও যাবজ্জীবন ক্লেশ ভোগ; সাপের সহিত মানুষের শক্রতা এবং সর্ব্বশেষে তাহাদের মৃত্যু।* আচ্ছা, যিশুত সকল জাতীয় পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, ইহার ফলে এই সমস্ত নির্দ্ধারিত শাস্তির লাঘব হয় না কেন? খৃষ্টীয়ানেরা পৃথিবীতে না মরিয়া চিরজীবী হইতেছেন কি? যিশুর রক্তের প্রভাবে দুই একজন বিশপও চিরসুখী এবং 'ক্ষেত্রের ওষধি' না খাইয়া থাকার যোগ্য হইয়াছেন কি? আর একটা কথা, যিশু মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, কিন্তু সাপ বেচারার উপায়? উহার এবং পৃথিবীর প্রায়শ্চিত্তটাও হইয়া গেলে, আর শেয়ালকাঁটা পায়ে ফুটিয়া আমাদিগকে ডাক্তারের বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করিতে হইত না এবং সাপের কামড়ে

* আদি পুস্তক, ৩ অধ্যায়।

মানুষের অপমৃত্যু হইত না। এই সমস্ত আপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিলে, আর একটী বড় লাভ হইত এই যে, বিনা প্রচারে দলে দলে মানুষ খৃষ্টীয়ান হইয়া যাইত। নির্দ্দিষ্ট শাস্তির কোন একটীও যখন লাঘব হইল না, তখন প্রায়শ্চিত্ত বাদ যে অমূলক, তাহা আর বলিয়া দিবার আবশ্যক হইবে না।

দ্বিতীয় স্তবক।

(১)

ধর্ম্মজগতে আড়াআড়ি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোন সম্প্রদায়ই নিজের ধর্ম্মকে ছোট বলে না—মনেও করে না। যদি প্রত্যেক ধর্ম্মের এক এক জন প্রতিনিধি ডাকাইয়া, সকলকে একত্র করিয়া, প্রত্যেকের ধর্ম্মের উৎকর্ষ কোন হিসাবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে প্রত্যেকেই এক একটা বিষয়ের উপর জোর দিবে। খৃষ্টীয়ানগণ বলিবেন,—(বলিয়াও থাকেন) তাঁহাদের ধর্ম্মই যে একমাত্র আচরণীয় এবং সার্ব্বজনীন, তাহার প্রমাণ অনেক, সেই অনেকের মধ্যে, 'যিশুর ঈশ্বরত্ব, তাঁহার নিষ্পাপ থাকা এবং ভক্তের উদ্ধারের জন্য নিজের প্রাণদান, এই তিনটীই প্রধান; জগতের আর কোন ধর্ম্মে এমন সার্ব্বজনীন বিধান নাই।' কথাগুলি লইয়া আলোচনা করিলে, একটা মজার রহস্য বাহির হইয়া পড়ে। যিশু সর্ব্বশক্তিমান সদাপ্রভুর একমাত্র 'সর্ব্বশক্তিমান' এবং নিষ্পাপ (?) পুত্র বলিয়া জগতের পাপ নিজের উপর চাপাইয়া দিয়া—সমগ্র বিশ্বের জন্য নিজেই মরিলেন। ত্রিত্ববাদমূলক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রদর্শনের প্রধান এবং একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ প্রায়শ্চিত্তবাদ প্রমাণের এই যে একটীমাত্র যুক্তি, ইহার মধ্যেও তিনটী খুঁৎ বাহির হইয়া পড়ে। নিম্নে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

(ক)

মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের পুত্র।* পুত্রের দুঃখ দূর করিতে পিতারই আগ্রহ বেশী হয়। যিশু সাধারণ মানুষের ভাইরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।† পুত্রের জন্য পিতার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই, ভাই কেন আসে ভাইয়ের জন্য প্রাণ দিতে? তার পর, ভাইয়ের দুঃখের লাঘব করিতে, ভাই নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতেছেন, পিতার মত পিতা যিনি, তাঁহার পক্ষে এই সময় উদাসীন থাকা কলঙ্ক জনক নহে কি?

(খ)

জীব মাত্রই পরম পিতা পরমেশ্বরের সৃষ্ট এবং পালিত—সুতরাং সন্তান। আমাদের মতে, মানুষ এই হিসাবেই ঈশ্বরের পুত্র পদ-বাচ্য। এই সমস্ত সাধারণ সন্তানের প্রতি পরমেশ্বরের আন্তরিক টান এবং ভালবাসা "ঔরস জাত" পুত্র যিশু অপেক্ষা কম হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্যই সদাপ্রভু মানবের অপরাধ ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত—বরং অক্ষম হইলেন। কিন্তু যখন তাঁহার প্রিয়তম পুত্র বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া তাঁহার অবজ্ঞাত ভ্রাতৃকুলের উদ্ধারের জন্য প্রাণ-পণ

* লুক—৬ অধ্যায় ৩৬ পদ। এবং মথি ৬ অধ্যায় ৬—৯ পদ।
† পরমেশ্বর যিশুরও পিতা এবং সাধারণ মানুষেরও পিতা, সুতরাং সকলে পরস্পর ভাই।

করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—কর্ত্তব্য নিষ্ঠার তাড়নে বিপদে পড়িয়া হা হতোস্মি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই 'প্রিয়তম পুত্রের' প্রতিও কি ঈশ্বর বিরূপ হইলেন? তাহা না হইলে, যিশুর "এলি এলি লামা সবাক্তাণীর" করুণ নিনাদ শুনিয়া তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে একটা উপায়ের উদ্ভব করিলেন না কেন? প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে, অনেক পিতাকে পুত্রের সদাসৎ কর্ম্মের প্রতি উদাসীন থাকিতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু যখন পুত্র বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়ে, তখন কোন পিতারই গাম্ভীর্য্য থাকে না। যিশুর মানব-প্রীতি যে মন্দ এবং তাহার ফল এতটা দুঃখ দায়ক হইবে, ইহা যদি পরমেশ্বরের জানা থাকিত, তবে ইহা হইতে তাঁহাকে বিরত রাখা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। খ্রীষ্টীয়ানগণ বলিবেন, ইহা কোন মতেই মন্দ নহে, সদাপ্রভুর অভিপ্রায় এবং ইঙ্গিত ক্রমেই ইহা সাধিত হইয়াছে। আমরা বলি, তাহা হইলে যিশু দুঃখ ভোগ করুন, আমাদের তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এই ক্ষণিক দুঃখ যিশুর চাঞ্চল্য উৎপন্ন করিল কেন? সদাপ্রভু তাঁহাকে আরও একটু গম্ভীর—আরও একটু সহনশীল করিয়া লইলেইত তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। ইহুদীগণ যিশুর অধীরতা দেখিয়া হাসিয়া ছিল—ঠাট্টাও করিয়াছিল, ইহাতে তাহাদের পাপ যে হয় নাই, তাহা নহে। যিশু জগতের, অথবা সংকীর্ণ ভাবে বলিতে গেলে ইস্রাইলীয় দিগের * জন্য যে উপকার করিতে আসিয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে পড়িয়া তথা কথিত দুই একজন ব্যতীত আর সকলেই তাহা হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইল। এই অবস্থায় কাজটার সার্ব্ব-জনীনতা রক্ষা পাইল কোথায়? যিশুর শস্তিদাতাগণ যে মুক্তি পাইবে, এমন প্রমাণ আমরা পাই নাই। পাদ্রি সাহেবগণ কি বলেন।

(গ)

যিশু জগতের পাপের জন্য দুঃখিত হইয়া এতটা স্বার্থত্যাগ করিতে পারিলেন—নিজে শাপ গ্রস্ত হইয়া মারা পড়িলেন, এবং শেষে নরকও ভোগ করিলেন, শুধু দয়ার তাড়নায়। কিন্তু দয়ার উৎস যিনি, সেই সদাপ্রভুর দয়ার সাগর কি এস্থলে মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল? যিশু পুত্র হইয়া ভাইয়ের জন্য মরিতে পারিলেন, আর পিতা একটু অভিমানও ত্যাগ করিতে পারিলেন না! নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট মাহাত্মটা কাহার বেশী দাঁড়াইবে? প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে, পুত্রের প্রাণ দানের পূর্ব্বে, পিতার পক্ষে তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডার হইতে একটু দয়া দান করিয়া নিজের মান রক্ষা করা উচিৎ ছিল।

(ক্রমশঃ)

মোহাম্মদ মুজাফফর উদ্দীন।

এস্‌লাম-প্রচার।

৩

এসলাম ধর্ম্মে নব-দীক্ষিত ব্যক্তি বর্গের ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত।

(১)

হজরত বেলাল।

হজরত মোহাম্মদ (স) মক্কানগরে, এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলে, বেলাল নামক জনৈক হাবসী ক্রীতদাস, এস্‌লামের মাহাত্ম্য ও সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া, গোপনে এস্‌লামের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি সুযোগ পাইলেই এস্‌লাম গ্রহণ, উহার ধর্ম্মনীতি পালন এবং হজরত মোহাম্মদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এই সংবাদ প্রচার হওয়ার পর, তাঁহার প্রভু উমাইয়া এব্‌নে খল্‌ফ এ বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে নানা প্রকারে এই "নূতন ধর্ম্মপথ" হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনরূপে কৃত কার্য্য হইতে না পারিয়া, তাঁহার প্রতি নিম্ন লিখিত রূপ শাস্তি-বিধানে প্রবৃত্ত হয়;—

(ক) তাঁহার গলায় দড়ি দিয়া মক্কার কঙ্করময় পথে বালক দল তাঁহাকে রথ টানার ন্যায় টানিয়া লইয়া বেড়াইত; প্রস্তরাঘাতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত হইয়া পড়িত এবং গলায় দড়ির দাগ পড়িয়া যাইত।

(খ) মক্কার ভীষণ রৌদ্রতাপে তপ্ত, বালুকাময় ভূমিতে তাঁহাকে সূর্য্যমুখীন অবস্থায় শায়িত করিয়া বক্ষদেশে গুরুভার পাথর চাপা দিয়া রাখা হইত। (গ) তাঁহার উভয় বাহু রজ্জু-বদ্ধ করিয়া কাষ্ঠ ফলক দ্বারা তাঁহাকে পেষণ করা হইত। (ঘ) অনশন ও পিপাসাতুর অবস্থায় রাখিয়া যন্ত্রণা দেওয়া হইত।

হজরত বেলাল এ সকল উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও 'আহাদ' 'আহাদ' অর্থাৎ খোদাতাআলা এক—অদ্বিতীয়, এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক এস্‌লামের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে নিরত থাকিতেন। একদা হজরত আবুবকর (র) বেলালকে তাঁহার প্রভুর গৃহে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিয়া মনে বড় আঘাত পাইলেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। যাঁহারা বলিয়া থাকেন, এস্‌লামধর্ম্ম বল প্রয়োগে প্রচারিত, তাঁহারা এই ক্ষেত্রে কি বলিতে চাহেন?

আম্মার, এয়াসর ও সুমাইয়্যা।

উপরোক্ত নব দীক্ষিত মুসলমানগণের প্রতি দুর্দ্দান্ত কোরেশগণ বহু প্রকারে অত্যাচার উৎপীড়নের ব্যবস্থা করিয়াও তাঁহাদের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া, একদা নরাধম আবুজেহেল আম্মারের মাতা এয়াসরের উরুদেশে এরূপ ভীষণ ভাবে বর্শার আঘাত করিয়াছিল

যে, সেই গুরুতর আঘাতেই তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। এরূপ কঠিন উৎপীড়নেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ এস্লামের সীমা রেখা হইতে কেশার্দ্ধ পরিমাণও সরিয়া যান নাই (১)। বল প্রয়োগে এস্লাম প্রচারের ইহাই কি লক্ষণ ?

(৩)

(ক) আবু ফাকিহ্ নামক জনৈক নব দীক্ষিত মুসলমানের পদযুগল রজ্জু বিজড়িত করিয়া তাঁহাকে মক্কার প্রান্তরময় বিক্ষিপ্ত তপ্তবালুকার উপর দিয়া ইতস্ততঃ টানিয়া কষ্ট দেওয়া হইত, কিন্তু তাহাতেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না (২)।

(খ) খোব্বাব এব্নে এরছ নামক জনৈক মুসলমানকে, মক্কার কাফেরগণ, তাঁহার মস্তকের কেশ ধারণ পূর্ব্বক বিষম যন্ত্রণা প্রদান করিত। তাহারা তাঁহার ঘাড় নোয়াইয়া দিত এবং তপ্ত প্রস্তরখণ্ড দ্বারা শরীরের নানাস্থানে দাগ বা সেক দিত।

(গ) বোআইনা (لبينة) জোনেরা (زنيرة) নাহদিয়া (نهدية) ওম্মে ওবায়স (ام عبيس) নামক কয়েক জন নবদীক্ষিত ক্রীতদাসীর প্রতি তাহাদের কাফের প্রভুগণ শতবিধ অত্যাচার উৎ-পীড়ন করিয়াও তাঁহাদিগকে এক পদও এস্লামের গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই(৩)। পাঠকগণ এ সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা কি বুঝিলেন ? তরবারীর বলে যাহাদের মধ্যে এস্লাম বিস্তার করা হইয়াছে, যাহারা অনিচ্ছায় এস্লাম গ্রহণ করিয়াছিল; এস্লাম ত্যাগ করিবার জন্য তাহাদিগের উপর ঈদৃশ অত্যাচার উৎপীড়ন করা হইতেছে, তথাচ তাহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম্মত্যাগে সম্মত হইতেছে না, ইহার তাৎপর্য্য কি ?

(ঘ) হজরত ওস্মানের এস্লাম গ্রহণের সংবাদ প্রচারিত হইলে, তাঁহার পিতৃব্য, হজরত ওস্মানকে খর্জ্জুর পত্রের স্তূপে নিক্ষেপ করিয়া তাহার নিম্নদেশে আগুণ দিয়া, তাঁহার নাকে চোখে ধূম বিকীর্ণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি কিছু মাত্র বিচলিত হন নাই। কাফেরগণের ঈদৃশ অত্যাচার উৎপীড়নের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় নব দীক্ষিত মুসলমানগণ সকলেই সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বেচ্ছায়—সাগ্রহে এস্লাম গ্রহণ না করিয়া থাকিলে, এরূপ কঠোর নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও এস্লাম ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না, ইহার কারণ কি ?

(৪)

নির্ব্বাসন দণ্ড।

নব দীক্ষিত মুসলমানগণের প্রতি যখন কোরেশগণের অত্যাচার উৎপীড়ন চরম সীমায় উপস্থিত হইল, কাফেরদিগের নিত্য নির্য্যাতন সহ্য করিয়া মক্কায় অবস্থান করা যখন মুসলমান-

(১) মদারেজন্ নবুওৎ (مدارج النبوة) ২য় খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা।
(২) এ'জাজৎ তন্জিল (اعجاز التنزيل) ৫৩ পৃষ্ঠা।
(৩) এ'জাজৎ তন্জিল ৫৩ পৃষ্ঠা।

দিগের-পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল ; মুসলমানগণ তখন নিরূপায় হইয়া, জন্মভূমির মায়া মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া, অতি সংগোপনে আফ্রিকা মহাদেশের অবিসিনিয়া বা হাবশ রাজ্যে পলাইয়া গেলেন। তাঁহারা স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। প্রথম বার হজরত ওস্‌মানের নেতৃত্বে দ্বাদশ জন পুরুষ ও চারিজন স্ত্রী দেশত্যাগী হন। অতঃপর আর একদল মুসলমান আবিসিনিয়া যাত্রা করেন। এই দলে ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা ছিলেন। হজরত আলীর (র) সহোদর জাফর তৈআর এই শেষোক্ত মুনলমানগণের দলপতি ছিলেন। মক্কার কাফেরগণ ইহাতে শান্তি পাইল না। তাহারা নির্ব্বাসিত মুসলমানগণের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক আবিসিনিয়া-রাজ-দরবারে তাঁহাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করিল। কিন্তু তথায় ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক যুদ্ধে কাফেরগণ পরাজিত হওয়ায়, আবিসিনিয়া-রাজ মুসলমানগণের পক্ষ সমর্থনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। শেষে কাফেরগণ নিরুৎসাহ ও লজ্জিত হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই যে মুসলমানগণ শুধু এস্‌লাম গ্রহণের অপরাধে নিজদের জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন, ইহাতে আমরা কি বুঝিতে পারিলাম ? এস্‌লাম ধর্ম্ম, বল প্রয়োগে প্রচারিত হইয়া থাকিলে, নব দীক্ষিত মুসলমানগণ শত অত্যাচার উৎপীড়নেও এস্‌লাম ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, তাহার কারণ কি ? জগদ্বাসী কি এখনও ঘোর অন্ধকারে এবং অন্ধ বিশ্বাসের কোলে ঘুমাইয়া থাকিবে ?

(৫)

সাআদ এব্‌নে ওবাদা। (سعد ابن عبادہ)

এই মহাত্মা মদিনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি একবার মক্কায় আগমন করিলে, হজরত মোহাম্মদের নিকটে এস্‌লাম ধর্ম্মে-তত্ত্ব অবগত হইয়া, তাহাতে দীক্ষিত হন। মদিনাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে হজরত রসুলে করিম যে দ্বাদশ জন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিকে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই 'ছাহাবী' তাহাদের অন্যতম। তিনি মক্কা হইতে মদিনা প্রত্যাবর্ত্তন কালে, মক্কার কাফেরগণের হস্তে বন্দী হন। কাফেরগণ তাঁহার উষ্ট্রের গদির রসি খুলিয়া তাঁহার হস্তপদ কসিয়া বন্ধন করে, এবং তাঁহার দীর্ঘ কেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করে। তিনি বহুক্ষণ প্রহৃত ও নির্য্যাতিত হওয়ার পর, একজন শ্বেতবস্ত্র ধারী ভদ্রলোককে তাহার নিকট আসিতে দেখিলেন। ইহাতে তাহার প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল ; কিন্তু কার্য্যতঃ হিতে বিপরীত ঘটিল। সেই ভদ্র-বেশধারী ব্যক্তি আসিয়া মহাত্মা সাআদের গণ্ডদেশে এরূপ জোরে এক পদাঘাত করিল যে, সেই আঘাতে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে জোবায়র ও হারেছ নামক তাহার পূর্ব্ব পরিচিত দুইজন ভদ্র লোকর সাহায্যে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। বল প্রয়োগে যে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিগণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এরূপ কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তাহার কারণ কি ? তাহাদের পক্ষে ত সামান্য সুযোগ ঘটিলেই এস্‌লাম ত্যাগ করা স্বাভাবিক ছিল।

(৬)

সোহায়ব রুমীর নির্ব্বাসন।

(صهيب رومي)

মক্কার বিধর্ম্মিগণের নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া যখন মুসলমানগণ মদিনা অভিমুখে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কোরেশগণের অত্যাচারের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সোহায়ব রুমী নামক এক ব্যক্তি মক্কা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, কাফেরগণ তাঁহার সমুদয় ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইল, এক খানি তৃণ পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইতে দিল না। কিন্তু ধর্ম্ম বলে বলীয়ান সোহায়ব ধর্ম্ম রক্ষা কল্পে সমুদয় স্বার্থ বলিদান পূর্ব্বক মদিনায় প্রস্থান করেন (১)।

(৭)

বিবী উম্মে সলমার বর্ণনা এইরূপ :—"আমার স্বামী মক্কার কাফেরগণের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মদিনায় প্রস্থানের জন্য উদ্যত হইলে, বনি-মগিরা বংশের লোক জন আসিয়া তাঁহাকে অবরোধ করিল! আমি নিজে শিশু কন্যা সলমা সহ উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলাম। তাহারা তাঁহাকে বলিল,'তুমি ইচ্ছা করিলে দেশ ত্যাগী হইতে পার বটে,কিন্তু আমাদের বংশের কন্যা অর্থাৎ তোমার স্ত্রীকে আমরা কিছুতেই সঙ্গে লইয়া যাইতে দিব না'। ইত্যবসরে বনু-আসাদ বংশীয় লোকজনও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের বংশের শিশু কন্যা সালমাকে কিছুতেই দিব না'। ফলকথা, তাহার উষ্ট্রটীকে বল পূর্ব্বক বসাইয়া বানু-আসাদ তাঁহার স্নেহাধার কন্যাটীকে, এবং বনু-মগিরা তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী, আমাকে বল পূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া গেল। সোহায়ল নিরুপায় হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা কল্পে স্বীয় স্ত্রী ও কন্যার মায়া মমতায় জালাঞ্জলি দিয়া একাকী মদিনায় প্রস্থান করিলেন (২)।"

(৮)

হজরত খোবায়বের শূল-কাষ্ঠে প্রাণদান।

হিজরী চতুর্থ বর্ষে মক্কার কোরেশগণ ষড়যন্ত্র কারিয়া আজল (عضل) ও ফারা (قارة) নামক দুই গোত্রের সাত জন লোককে প্রতিনিধি স্বরূপ হজরত মোহাম্মদের নিকট মদিনা নগরে প্রেরণ করে। সেখানে তাহারা প্রবঞ্চণা পূর্ব্বক প্রকাশ করে যে, এস্‌লাম ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন উপযুক্ত শিক্ষকের আবশ্যক হইয়াছে, অতএব হজরত তাঁহার কয়েক জন বিজ্ঞ সাহাবীকে তাহাদের সঙ্গে প্রেরণ করুণ। হজরত সরলভাবে তাহাদের প্রার্থনা মতে দশজন উপযুক্ত ছাহাবীকে তাহাদের সমভিব্যাহারে প্রেরণ করেন। তাঁহারা মক্কার নিকটবর্ত্তী হইলে, দুইশত সশস্ত্র কাফের তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। ছাহাবীগণ নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করেন। সেই যুদ্ধে দশ জনের মধ্যে আট জন শহীদ হইলেন। হজরত খোবায়ব ও

(১) সিরতে এব্‌নে হেশাম سيرت ابن هشام ১৬৮ পৃষ্ঠা।
(২) সিরতে এব্‌নে হেশাম سيرت ابن هشام ১৬৫ পৃষ্ঠা।

জায়েদ নামক অবশিষ্ট দুইজন ছাহাবী শক্র-হস্তে বন্দী হইলেন। কাফেরগণ বন্দী ছাহাবী দ্বয়ের উপর, এস্‌লাম ত্যাগ করার জন্য, নানা প্রকারে অত্যাচার উৎপীড়ন করে। কিন্তু কিছুতেই, কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে তাহাদিগকে শূলে চড়াইয়া বধ করিবে বলিয়া ঘোষণা করে। যথা সময়ে তাঁহাদিগকে বধ্য ভূমিতে উপস্থিত করিয়া, তাহারা আর একবার শেষ চেষ্টা করিল। এসলাম ত্যাগ করিলে তাহাদের প্রাণ দান করা হইবে, একথা তাঁহাদিগকে বিশেষ-রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ছাহাবীদ্বয়ের সেই একই উত্তর! ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থ তুচ্ছ জীবন তাঁহারা উৎসর্গ করিতে একটু ইতস্ততও করিলেন না! কাফেরগণ তাঁহাদিগকে শূলে তুলিবার পূর্ব্বে দেশের চির চলিত প্রথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কোন মনোবঞ্ছা থাকিলে তাহা প্রকাশ করিতে পার।" খোবায়ব বলিলেন, "কিছু সময় পাইবার প্রার্থী।" তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইলে, তিনি নমাজে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ মনে করিয়া ছিলেন, জীবনের শেষ উপসনা টুকু প্রাণ ভরিয়া সমাপন করিবেন; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইল, কিছু অধিক সময় ব্যপিয়া উপসনায় লিপ্ত থাকিলে, হয়ত কাফেরগণ মনে করিবে, এখনই বোধ হয় তাহার হৃদয়ে প্রাণের মমতা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই উপসনার ভান করিয়া কিছু সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি যথা সম্ভব শীঘ্রই উপাসনা-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া লইলেন। নিষ্ঠুর কাফেরগণ তাঁহাকে শূলে বিদ্ধ করিয়া নিতান্ত নৃশংসতার সহিত তাঁহার শরীরের নানাস্থানে বর্শাদ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। হজরত খোবায়ব ও তাঁহার সঙ্গী নিতান্ত ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, এস্‌লামের প্রতি তাঁহাদের অসীম ভক্তি ও আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় দিতে লাগিলেন। জনৈক নরাধম—পাষাণ হৃদয় কাফের, মহাত্মা খোবায়বের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করিয়া বর্শাঘাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল;—"খোবায়ব! এখন বোধ হয় তোমার হৃদয়ে প্রণের মমতা জাগিয়া উঠিয়াছে, এখন বোধ হয় তুমি মোহাম্মদকে (সঃ) বিপন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিলে, তজ্জন্য আগ্রহ ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবে?" খোবায়ব বজ্রকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমার জীবন রক্ষার জন্য যদি হজরতের অঙ্গে একটী সামান্য কণ্টকও স্পৃষ্ট হয়, আমি তাহাও সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।" এই বলিয়া তিনি নিতান্ত, বীরত্ব ব্যঞ্জক অথচ করুণভাবোদ্দীপক একটী আরবী কবিতা পাঠ করিতে করিতে শূল কাষ্ঠে প্রাণ ত্যাগ করিলেন (১)।

(৯)

আব্দুল্লা এব্‌নে হোজায়ফা।

এই মহাত্মা খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া রোম সম্রাট কয়সরের নিকট নীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এস্‌লাম ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ করা হয়। এই আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে কঠোরতাও অবলম্বন করা হয়। কিন্তু কয়সারের আদেশ অমান্য করায়, কয়সার ক্রোধান্ধ হইয়া, হজরত আব্দুল্লাকে ফাঁশি কাষ্ঠের সহিত বন্দন করিয়া রাখিতে আদেশ করে। তিন দিবা রাত্রি তাঁহাকে ঐ ভাবে রাখার পর পুনরায় তাঁহার প্রতি এস্‌লাম ত্যাগ করার

(১) বোখারী, তবরী, এব্‌নে হেশাম ২য় খঃ ১২৩ পৃঃ। জাদোল মাআদ ৩৫৯ পৃঃ ১ম খঃ।

আদেশ দেওয়া হয়। এইবার মহাত্মা আব্দুল্লা অত্যন্ত ঘৃণার সহিত কয়সারের আদেশ অগ্রাহ্য করেন। কয়সার ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে তপ্ত জলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করে। তাহাতে তাঁহার শরীরের নানা অংশের চর্ম্ম ও মাংস স্খলিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তিনি এই ভীষণ অগ্নি পরীক্ষাতেও কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না—সেই একই ভাবে এস্লামের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাস প্রদর্শন অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেলেন। কয়সার তাঁহার অটল বিশ্বাস, অসাধারণ ধৈর্য্য ও ধর্ম্মভীরুতা দর্শনে বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে মুক্তিদানের আদেশ করিল।

বিজ্ঞ পাঠকগণ ৮।৯ নং ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিবেন, যাঁহারা বলিয়া থাকেন, এস্লাম তরবারির সাহায্যে বা অন্যবিধ বল প্রয়োগে প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের উক্তি কতদূর সত্য? যে নবদীক্ষিত মুসলমানগণ এরূপ ভীষণ উৎপীড়ন ও নিষ্পেষণেও এস্লাম ত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই, যাঁহারা এস্লামের সম্মান বাজায় রাখার জন্য জীবন দান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহারা কি বল প্রয়োগে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন?

(১০)

হাবীব এব্নে জয়েদ মাজনী।

এই মহাত্মা প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-দ্রোহী মোসায়লেমাতল কাজ্জাবের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। মোসায়লেমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি হজরত মোহাম্মদকে ঈশ্বর-প্রেরিত সত্যবাদী পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করি, আর তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানি।" মোসায়লেমা এই উত্তর শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া হজরত হাবিবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক এক করিয়া কাটিয়া দিবার জন্য আদেশ প্রদান করিল। প্রত্যেক অঙ্গ কর্ত্তন কালে তাঁহাকে মত পরিবর্ত্তনের জন্য আদেশ করা হইত, কিন্তু তিনি অনবরতই তাহা অস্বীকার করিতেছিলেন। ফলে ভয়ানক নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত করা হইল; অথচ তাঁহার এস্লাম সম্বন্ধে—তিনি যে অটল বিশ্বাস পোষণ করিতেছিলেন, তাহাতে কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। বল প্রয়োগে এস্লাম প্রচারের ইহাই কি প্রমাণ?

—এসলামাবাদী।

নূর-ইসলাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আরবীয় পয়গম্বরের সমুদয় আত্মীয়বান্ধবদের মধ্যে কেবল তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেবই (?) এমন ছিলেন, যিনি কেবল নিজের এক গুঁয়ে গোঁড়ামীর জন্য তাঁহার ধর্ম্মমতে (প্রকাশ্যে) বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশের দলপতি ছিলেন বলিয়া আপন পুরাতন পৈতৃক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়া নিজের পক্ষে মানহানিকর বোধ করিতেন; নতুবা তাঁহার কার্য্য-কলাপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত যে, তিনি পয়গম্বরের ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ তিনি রসুলোল্লাহকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন, "হে পিতৃব্য-প্রাণ! তুমি অসঙ্কোচে আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে থাক; আমার জীবদ্দশায় কাহার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কটাক্ষ-পাত করে?" একদিন আবুতালেব স্বীয় পুত্র হজরত আলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ধর্ম্ম বিশ্বাস কি? আর তুই মহম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে কি মনে করিস?" হজরত আলী অত্যন্ত সম্মান অথচ উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন, "পিতৃদেব! আমি একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কেই পূজনীয় মনে করি, এবং মোহাম্মদকে আল্লাহ্‌তালার প্রকৃত প্রেরিত বলিয়া মানি। আর এই জন্য পয়গম্বরের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইব না।"

ঈদৃশ উত্তর শ্রবণে পিতার অসন্তুষ্টি হইবারই সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তাহা ত হইল না! বরং তিনি বলিলেন, "পিতৃ-প্রাণ-পুত্তলি! আমি তোমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অনুমতি দিতেছি। যেহেতু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তোমাকে সুপথ ছাড়া কুপথে পরিচালিত করিবেন না।"

নবুয়তের (পয়গম্বরী প্রাপ্তির) তিন বৎসর পর্য্যন্ত পয়গম্বর সাহেব নীরবে, বিনা আড়ম্বরে আপন মিশনের কার্য্য করিতেছিলেন। সে সময় তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা মাত্র ৩০জন ছিল। অতঃপর তিনি প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে আল্লাহ্‌তালার একত্বের বিষয় অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং নরবলিদান, বিলাসিতা ও সুরাপান যে অতি কদর্য্য, তাহাও বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ বক্তৃতার গুণে অনেকের হৃদয়ে বিশ্বাসের জ্যোতি প্রদীপ্ত হইল এবং তাঁহার শিষ্য সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবন্ধকতা-বহ্নিও পয়গম্বর সাহেবের বিরুদ্ধে দেশময় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বিরোধী দলের হস্তে পয়গম্বর সাহেব যত প্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও নিগ্রহ ভোগ করেন, সাধারণ মানব তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না।

বিধর্ম্মী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেবের ভক্ত, বিশ্বাসী লোককে যখন যেখানে দেখিতে পাইত, তম্মুহূর্ত্তেই হত্যা করিত। কাহারও প্রতি অমানুষিক নির্য্যাতন করিত। কাহাকে বা হস্ত পদ

শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া মরুভূমিতে উত্তপ্ত বালুকার উপর শয়ান করাইয়া তাঁহার বক্ষের উপর প্রস্তর চাপা দিয়া বলিত, "তুই:মোহাম্মদ ও তাহার আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর!" কিন্তু এত যন্ত্রণা সত্বেও তাঁহারা মোহাম্মদের কলেমা পড়িতে পড়িতে অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতেন!

একদা কোন দুরাত্মা জনৈক মুসলমানকে ধরিয়া তাঁহার দেহ হইতে খণ্ড খণ্ড মাংস কাটিয়া ফেলিতেছিল আর বলিতেছিল, "এ সময় তুই যদি নিজের পুত্র পরিবারের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ঘরে থাকিতিস, আর তোর স্থলে তোর মোহাম্মদ এইরূপ ছিন্নদেহে ভূমে লুটাইয়া ছট্‌ফট্ করিত তবেই বেশ ভাল হইত!" কিন্তু সেই সত্যধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান মৃত্যু পর্য্যন্ত এই একই উত্তর দিতেছিলেন, "আমাব গৃহ, পুত্র কলত্র—সুখ স্বাচ্ছন্দ, সমুদয় হজরৎ রসুলের পদতলে উৎসর্গ হউক। আমার সম্মুখে যেন তাঁহার চরণ কমলে একটি কণ্টকও বিদ্ধ না হয়।" *

অবশেষে বিরোধী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেব ও তদীয় শিষ্যবর্গকে এত অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল যে, তাঁহারা শেষে রসুলের ইঙ্গিতে দেশান্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। পয়গম্বর সাহেবের একদল অনুবর্ত্তী যখন শত্রু-তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া হাবশ (আবিসিনীয়া) দেশে গেলেন, তখন শত্রুগণও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সে দেশে উপস্থিত হইল, এবং তত্রত্য খ্রীষ্টান রাজাকে অনুরোধ করিল যে, মুসলমানদিগকে উহাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক। রাজা তখন হতভাগ্য প্রবাসীদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "রাজন্! আমরা অজ্ঞতা ও মূর্খতার সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলাম; আমরা ঘৃণিত পৌত্তলিক ছিলাম; আমাদের জীবন দুর্দ্দান্ত পশুপ্রকৃতি নরপিশাচের ন্যায় নীচ ও জঘন্য ছিল; নরহত্যা আমাদের দৈনন্দিন ক্রীড়া ছিল; আমরা জ্ঞানান্ধ, ঈশ্বরদ্রোহী ও ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত ছিলাম; পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতি বা মনুষ্যত্বের নামগন্ধ আমাদের মধ্যে ছিল না; অতিথি সেবা কিম্বা প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম; আমরা 'জোর যার মুলুক তার' ব্যতীত অন্য বিধিনিয়ম জানিতাম না। আমাদের এই ঘোর দুরবস্থার সময় আল্লাহ্‌-তালা আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ সৃষ্টি করিলেন—যাঁহার সত্যতা, (صداقت) সাধুতা এবং সরলতার উজ্জ্বল চিত্র আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই ব্যক্তি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, 'আল্লাহ্ এক, সর্ব্ব কলঙ্ক হইতে পবিত্র, কেবল তাঁহারই উপাসনা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; আমাদিগকে সত্য অবলম্বন এবং মিথ্যা বর্জ্জন করিতে হইবে; প্রতিজ্ঞা পালনে, বিশ্বজগতের প্রাণিবৃন্দের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শনে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে যেন বিমুখ না হই; যেন স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার করি, পিতৃহীনের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করি; নিয়ম মত দৈনিক উপাসনা ও উপবাস (রোজা) ব্রত পালনে অবহেলা না করি।' রাজন্! আমরা এই ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখি এবং, এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি।"

---

* মিসেস বেশান্ত এখানে দুইটী ঘটনা ভ্রমক্রমে এক বর্ণনার ভিতর ফেলিয়াছেন। অমুসলমানের পক্ষে এইরূপ ভ্রম মার্জ্জনীয়। সত্য বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধের হজরত খোবায়ব এবং হাবিব এব্‌নে জায়েদের বিবরণে দেখুন। —সম্পাদক।

ভদ্র মহোদয়গণ! পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের বিশ্বাস এবং ধর্ম্মমত এমনই উচ্চ ছিল যে, তাঁহারা প্রাণ হেন প্রিয় বস্তু করতলে লইয়া বেড়াইতেন! আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যতা ও অকপট হৃদয়ের প্রমাণ স্বরূপ আর একটি বিষয় আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি।

একদা পয়গম্বর সাহেব আরবের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় একজন অন্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "হে খোদার রসুল! আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, আমি সত্য পথ লাভ করিবার আশায় আসিয়াছি।" পয়গম্বর সাহেব বাক্যালাপে অন্য মনস্ক থাকা বশতঃ তাহার উক্তি শ্রবণ করেন নাই। সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, "হে রসুলোল্লাহ্! আমার কথা শুন, ধর্ম্মপথ দেখাও!" তদুত্তরে তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত তাহাকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে সে অন্ধ ক্ষুণ্ণচিত্তে চলিয়া গেল। পর দিবস পয়গম্বরের প্রতি যে "অহি" (দৈবাদেশ) আসিয়াছিল, যাহা অদ্যাপি কোর্‌আনে লিপি-বদ্ধ আছে এবং চিরকাল থাকিবে, তাহার মর্ম্ম এই :—

"রসুলের নিকট এক অন্ধ আসিল, কিন্তু সে (রসুল) অবজ্ঞা করিল ও তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না। তুমি কি করিয়া জান যে, সে পাপমুক্ত হইবে না, উপদেশ গ্রহণ করিবে না এবং সেই উপদেশে সে উপকৃত হইবে না? যে ব্যক্তি ধনী, তাহার সহিতই তুমি সসম্ভ্রম সম্ভাষণ করিতেছ, যদ্যপি সে বিশ্বাসী (ইমানদার) না হইত, তজ্জন্য তুমি অপরাধী হইতে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং সরল হৃদয়ে সত্য ও মুক্তির অন্বেষণে আসিল, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে না। (ভবিষ্যতে যেন আর কখনও এরূপ না হয়)।"

ঐ দৈবাদেশ পয়গম্বর সাহেবের মনে অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়াছিল। তদবধি যখনই তিনি উক্ত অন্ধকে দেখিতেন, তখনই বলিতেন, ইহার আগমন শুভ। যেহেতু ইহারই উপলক্ষে আল্লাহ্ আমাকে শাসন করিয়াছেন। পয়গম্বর সাহেব উক্ত অন্ধকে অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন এবং দুইবার তাহাকে মদিনায় কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফল কথা এই যে, পয়গম্বর সাহেব কেবল অপরকেই উপদেশ দিতেন না, বরং নিজের আত্মাকে উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত রাখিতেন।

সচরাচর যেরূপ প্রত্যেক পয়গম্বরের সহিত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ আরবীয় পয়গম্বরের বিরুদ্ধেও সাধারণের বৈরিতারূপ ঝঞ্ঝানিল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধর্ম্ম সংক্রান্ত শত্রুতা সাধনের নিমিত্ত পয়গম্বর সাহেব ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর বিরুদ্ধে নূতন বিপদের সূত্রপাত হইতে লাগিল! অবশেষে অবস্থা এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল যে, পয়গম্বর সাহেব সমুদয় মুসলমানকে আপন আপন প্রাণ লইয়া যত্র তত্র পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন হজরতের নিকট মাত্র একজন ব্যতীত আর কেহই রহিল না। কিন্তু পয়গম্বর সাহেব স্বীয় কর্ত্তব্য তেমনই নির্ভীক চিত্তে পালন করিতে থাকিলেন। এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার অরিকুল তাঁহার প্রাণ বিনাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেব আর সহ্য করিতে

না পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন, "হে পিতৃব্য-প্রাণ! কথা শুন, অমূল্য প্রাণ এমন অবহেলায় হারাইস না। আরবের রক্ত পিপাসু খঞ্জর সমূহ তোরই জন্য শাণিত হইতেছে! তুই নিবৃত্ত হ', তোর বক্তৃতা বন্ধ কর।"

তাঁহার কথায় পয়গম্বর সাহেব অতি সাহসের সহিত যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিবার উপযুক্ত বটে। তিনি বলিলেনঃ—

"পিতৃব্যদেব! আমি নিরুপায়। আমি ত কিছুই করি না, কে যেন আমার দ্বারা করাইতেছে। যদি বিধর্ম্মীগণ আমাকে এক হস্তে সূর্য্য অপর হস্তে চন্দ্র দান করিয়া বলে, 'তুমি আপন কার্য্য পরিত্যাগ কর,' তবু নিশ্চয় জানিবেন, আমি এ কার্য্য হইতে বিরত হইব না—যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সেরূপ ইচ্ছা না হয়। অথবা আমি আমার এই সাধনার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিব। তবে যদি আপনি নিজের জন্য ভয় করেণ ত' বলুন, আমি এই মুহূর্ত্তে আপনাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাই—আমার আল্লাহ্ আমার সঙ্গে থাকিবেন।" এই বলিয়া পয়গম্বর সাহেব সাশ্রু নয়নে গমনোদ্যত হইলেন।

কিন্তু পিতৃব্যের স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিল, তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "প্রাণাধিক! আমি তোকে কিছুতেই ছাড়িব না। তোর অরিকুল হইতে তোকে রক্ষা করিব। তুই নির্ভয়ে আপন কাজ কর।"

কিন্তু ভদ্র মহোদয়গণ! আরবীয় পওয়গম্বরের এই স্নেহময় পিতৃব্য আর অধিক দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারেন নাই। সেই ঘোর দুর্দ্দিনে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। আর এই বৎসরই তাঁহার পতিপ্রাণা বণিতা খদিজা বিবিও প্রেম-পাশ ছিন্ন করিয়া অনন্ত ধামে প্রাস্থান করিলেন। এই সময় বাস্তবিক পয়গম্বর সাহেবের পক্ষে অতি কঠোর শোক ও বিপদাকীর্ণ পরীক্ষার সময় ছিল! রসুলের শত্রুপক্ষ এই সময় প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। (আহা! বিপদ কখনও একা আইসে না)।

ক্রমে অবস্থা এমন ভয়ানক হইল যে, পয়গম্বর সাহেব মক্কা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন হজরত আলী এবং আবুবকর সিদ্দীক—মাত্র এই দুইজন ব্যতীত, তাঁহার নিকট আর কেহই ছিল না। তমোময়ী নিশীথে পয়গম্বর সাহেব ত আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এদিকে হজরত আলী তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন, যাহাতে শত্রুগণ নিশ্চিন্ত থাকে। মোহাম্মদ সাহেবের অরাতিকুল যথাকালে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তথায় উপস্থিত হইল; বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিল, একি! এ'ত মোহাম্মদ (দঃ) নহেন! এ যে আলী শয়ান রহিয়াছেন! উহারা তাঁহাকে কিছু না বলিয়া পয়গম্বর সাহেবের মস্তক আনয়নের নিমিত্ত বহুমূল্য পুরস্কার ঘেষণা করিল।

পয়গম্বর সাহেব যৎকালে একমাত্র সঙ্গী আবুবকর সিদ্দীক সহ গমন করিতেছিলেন, তখন আবুবকর অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে কহিলেন, "হে হজরত! আমরা ত মাত্র দুইজন!" তিনি উত্তর

করিলেন, "না, না! আমরা তিন জন—ইঁহাদের একজন অতিশয় প্রতাপশালী—সমুদয় বিশ্বজগৎ এক দিকে, আর তিনি একা এক দিকে।" আবুবকর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "হজরত! সে তৃতীয় জন দ্বারা আপনি কাহাকে বুঝাইতে চাহেন?" উত্তর হইল "সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সঙ্গে আছেন।" এ কথায় আবুবকর নিশ্চিন্ত হইলেন।

পয়গম্বর সাহেব মদিনা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি আশাতীত যত্ন ও সমাদরে গৃহীত হইলেন। শত শত সমাজ-নেতা অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইতে আসিলেন, এবং তাঁহার চরণ দর্শন মাত্রই অনুতপ্তচিত্তে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। হজরতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনুচরবর্গও ক্রমে ক্রমে মদিনায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পয়গম্বরের বিপক্ষগণ সেখানেও তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে তিষ্ঠিতে দিল না। তাহারা এবার সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া পয়গম্বর সাহেবকে আক্রমণ করিল। তখন পয়গম্বর সাহেবও কেবল আত্মরক্ষা কল্পে স্বীয় ক্ষুদ্র যোদ্ধৃদল লইয়া বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলেন :—

"জগৎ পাতা! তুমি সমস্তই দেখিতেছ, এবং সবিশেষ অবগত আছ। অদ্য যদি আমার ক্ষুদ্র সেনাদল বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তোমার সত্য নাম প্রচার করিবার লোক আর কেহ থাকিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি সত্যের সহায় হইবে।"

অবশেষে এই প্রথম রক্ত প্রবাহিনী যুদ্ধ—যাহা বদরের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত—হইয়া গেল। ওদিকেত সহস্র সহস্র যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল, এদিকে একশত বীরও ক্ষয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কার্য্যতঃ ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, মুসলমানদের পক্ষে কোন অদৃশ্য শক্তি যুদ্ধ করিতেছিল, তাই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মোসলেমগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। পয়গম্বর সাহেবের জীবনে এই প্রথম রক্তপাত—যাহা তিনি অনন্যোপায় হইয়া করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নতুবা তিনি এমন দয়ার্দ্র হৃদয় ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন যে, দুর্দ্ধর্ষ লোকেরা তাঁহাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিত। এইরূপে কয়েকবার আরবের মোসলেম-বিদ্বেষিগণ মহা সমারোহে যুদ্ধায়োজন লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে, এবং পয়গম্বর সাহেব শুধু আত্মরক্ষা—শিষ্যমণ্ডলীর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে করিতে বাধ্য হন। পরন্তু সর্ব্বদা সত্য ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার সঙ্গে থাকায় বিজয়ের উপর বিজয় লাভ করিতে থাকিলেন। এবং অযাচিত প্রভুত্ব লাভ করিলেন। এমন কি তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় সমগ্র আরব উপদ্বীপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এই সময় পয়গম্বরের অতীত ও বর্ত্তমান জীবনে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টি গোচর হইল। পূর্ব্বে লোকে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলে তিনি তাহার প্রতিশোধ না লইয়া তাহাদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করিতেন। এখন তিনি সৈন্য সেনানী ও যথাবিধি সমরায়োজন রাখিতে বাধ্য হইলেন—যাহা একজন সম্রাটকে করিতে হয়। এবং অপরাধীকে শাস্তিদান করিতেও হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি অতি উচ্চ আদর্শের দয়া ও ন্যায় বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

পয়গম্বর সাহেবের জন্মের পূর্ব্বের অর্থাৎ যে সময়কে আরবীয় মুসলমানদের মূর্খতার যুগ বলা হয়, যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণের প্রতি এমন নৃশংস নির্যাতন করা হইত যে, তাহার তুলনা নিতান্ত

অসভ্য বর্ব্বর জাতির মধ্যেও পাওয়া কঠিন। কিন্তু পয়গম্বর সাহেবের সময়ে যুদ্ধে ধৃত বন্দী-দিগের প্রতি যেরূপ সদয়, সুভদ্র ব্যবহার করা হইত, তাহার আদর্শ অদ্যাপি কোন অতি সভ্য দেশ ও সমাজে পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। একদা রণযাত্রা কালে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে এক দল বন্দী ছিল। খাদ্য সামগ্রীতে (রসদে) আটা অল্প ছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল; তচ্ছ্রবণে রসুলোল্লাহ আদেশ দিলেন যে, বন্দীদিগকে রুটী দান করা হউক, আর স্বাধীনেরা খর্জ্জুর ভক্ষণ করুক। (কি মহত্ত্ব!)

আর এক বারের ঘটনা এই যে, যুদ্ধ জয়ের পর, লুণ্ঠিত দ্রব্য যখন বণ্টন করা হইল, তখন পয়গম্বর সাহেব স্বীয় নিকটবর্ত্তী প্রিয় সহচরবৃন্দকে ভাগ লইতে দিলেন না। ইহাতে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। পয়গম্বর সাহেব তাহা অবগত হইয়া, সহচরদের ডাকিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! তোমরা জান, পূর্ব্বে তোমরা কিরূপ বিপন্ন ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদের বিপন্মুক্ত করিয়াছেন; তোমরা একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিলে, প্রভু তোমাদিগকে এখন ভ্রাতৃপ্রেম দান করিয়াছেন; তোমরা কোফরের (অধর্ম্মের) অন্ধকার কারা-রুদ্ধ ছিলে, তিনি বিশ্বাসের নির্ম্মল জ্যোতিতে তোমাদের মন আলোকিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল অনুগ্রহপুরস্কার কি তোমরা প্রাপ্ত হও নাই?" তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, আমাদের অবস্থা বাস্তবিক এইরূপই ছিল, এবং এখন যে সুখ সম্পদ ভোগ করিতেছি, ইহা আল্লাহ্‌তাআলারই অনুগ্রহে এবং আপনার দয়ায় আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।" তিনি উঁহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না, বল যে কেবল খোদার অনুকম্পা ছিল। আর যদি তোমরা এইরূপ বলিতে ত' আমিও সাক্ষ্য দিতাম। আমার সম্বন্ধে তোমরা ইহা বলিতে পার যে, তুমি এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ, আমরা তোমায় আশ্রয় দিয়াছি; তুমি দুঃখচিন্তা ভারাক্রান্ত ছিলে, আমরা তোমার সান্তনা দিয়াছি" (এ কথায় তাঁহারা কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া) পুনরায় পয়গম্বর সাহেব বলিলেন, "হে প্রিয় সহচর বৃন্দ! লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিনিময়ে কি তোমরা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর না? খোদার কসম! খোদার সমস্ত রাজ্য বিপেক্ষ দাঁড়াইলেও মহম্মদ আপন সহচরদের পক্ষে থাকিবে, যে হেতু তাঁহারা বিনা স্বার্থে—শুধু ঈশ্বরোদ্দেশে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন।"

পয়গম্বর সাহেবের এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সুফল এমন হইল যে, উক্ত সহচরগণ—যাঁহারা মরিতে মারিতে নির্ভীক, শৌর্য্য বীর্য্যে সিংহ-তুল্য জাতি ছিলেন, এক্ষণে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "হে রসুলোল্লা! আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

আমার হিন্দু ভ্রাতৃগণ! আপনারা বাস্তবিক আরবীয় পয়গম্বরের অবস্থা কিছুমাত্র অবগত নহেন। আপনারা এ অলৌকিক ঐশিক শক্তি দেখিতে সক্ষম নহেন, যাহা তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যকে কষ্ট স্বীকার ত তুচ্ছ—মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে; যাহা কোটী কোটী লোকের অন্তরে

ঈশ্বর-প্রেম অঙ্কিত করিয়াছে। আপনারা আরবীয় পয়গম্বরের নিরহঙ্কার ভাব ও আত্মত্যাগের বিষয় একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন ত! তিনি অনুবর্ত্তিগণকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, তাঁহাকে যেন কেহ দেবতা কিম্বা অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান না করে। তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, "আমি তোমাদেরই মত মানুষ, এইমাত্র প্রভেদ যে, আমি তাঁহার (খোদার) দূত, তাঁহার সংবাদ তোমাদিগকে পৌছাই।" পয়গম্বর সাহেবের নিরভিমানও সরলতার প্রমাণ এতদপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে। যে সময় তিনি রাজাধিরাজ সম্রাট ছিলেন, তখন স্বহস্তে আপন জীর্ণবস্ত্রে চীর সংলগ্ন করিতেন—ছিন্ন পাদুকা স্বহস্তে সেলাই করিতেন! তাঁহার শান্ত স্বভাব সম্বন্ধে তদীয় ভৃত্য আনাস বলিয়াছেন, "আমি দশ বৎসর তাঁহার নিকট ছিলাম, তিনি কদাচ অপ্রিয় বচন কহিবেন দূরে থাকুক, আমাকে 'তুই' পর্য্যন্ত বলেন নাই।" (হাদীস শরীফে তুই শব্দের উল্লেখ নাই), ভ্রাতৃগণ! এমনই আড়ম্বর শূন্য জীবন ছিল সেই সম্রাটের, যিনি ইচ্ছা করিলে পরিচর্য্যার জন্য সহস্রাধিক দাস দাসী রাখিতে পারিতেন!

আরবীয় পয়গম্বর যে 'মিশনের' জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমাধা করিলে পর সেই (দারুণ) সময় আসিল, যখন একদিন (মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে) রোগক্লিষ্ট অবস্থায় তিনি বহু কষ্টে নমাজের নিমিত্ত মসজিদে আনীত হইলেন। (নমাজ শেষ হইলে) তিনি আপন পীড়িত ক্ষীণ কণ্ঠ যথাশক্তি উচ্চ করিয়া বলিলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা সাধারণে ঘোষণা করিয়া দাও, যদি আমি এ জীবনে কাহারও প্রতি অত্যাচার অবিচার করিয়া থাকি, তবে সে অদ্য আমা হইতে প্রতিশোধ লউক, পরলোকের জন্য যেন স্থগিত না রাখে। যদি কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে, সে ঋণ শোধের নিমিত্ত আমার ঘরদ্বার তাহাকে সমর্পণ করিতেছি। অদ্য আমি সকল প্রকার জবাবদিহির জন্য উপস্থিত আছি।"

একজন বলিল, হজরতের নিকট তাহার ত্রিশ 'দেরেম' পাওনা আছে, তাহা রসুলোল্লাহ তন্মুহূর্ত্তে শোধ করিলেন * এই তাঁহার মসজিদে শেষ আগমন। অতঃপর ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুন

---

* মিসেস এনি বেশান্ত এস্থলে "আক্কাসের তাজিয়ানার" বিষয় উল্লেখ করেন নাই; আমার মনে হয় এজন্য "প্রতিশোধ" বিষয়টি অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। সে তাজিয়ানার কথা এই:—

কোন এক দিন হজরত কোন কারণে আক্কাস নামে এক ব্যক্তিকে এক ঘা কোড়া মরিয়াছিলেন! অদ্য সেই আক্কাস মসজিদে আসিয়া সেই কোড়ার প্রতিশোধ পাইবার দাবী করিল, তখন রসুল, তাহার হস্তে কশাঘাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন! ইহা দেখিয়া উপস্থিত সহচর বৃন্দ ও আত্মীয়বান্ধবগণ অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও উদ্বিগ্ন হইলেন; যেহেতু হজরত এমন পীড়িত অবস্থায় কোড়ার আঘাত কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহারা অনুনয় বিনয় করিয়া আক্কাসকে নিবৃত্ত হইতে, অথবা রসুলের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের গাত্রে একাধিক কোড়া মারিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আক্কাস তাঁহাদের কোন কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন তাঁহারা অতিশয় অধীর হইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন,—নিষ্ঠুর আক্কাস করে কি! হায় হায়, রসুল হত্যা করিবে! হজরত কিন্তু অবিচলিত চিত্তে আক্কাসকে তাঁহার আকাঙ্খিত প্রতিশেধ লইতে ইঙ্গিত করিলেন। সে বলিল, "হজরত! আমি নগ্ন পৃষ্ঠে আপনার

আরবীয় পয়গম্বর নশ্বর মৃন্ময় দেহ ত্যাগ করিলেন, যাহাতে অতি উচ্চ অনন্তধামে গিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন। এই জীবন অতি উচ্চ, পবিত্র, বিস্ময়কর এবং বাস্তবিক খোদার পয়গম্বরেরই যোগ্য ছিল। (অবশ্য, সাধারণ মানবের জীবন এরূপ হওয়া অসম্ভব)।

ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আমি আপনাদিগকে আরবীয় পয়গম্বয়ের প্রতি যে সব অন্যায় দোষারোপ করা হয়, তাহার বিষয় বলিতেছি। অনভিজ্ঞতা ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞানাভাবে, অথবা শুধু কুসংস্কার বশতঃ রসুলের প্রতি ঐসব দোষারোপ করা হইয়া থাকে। তাঁহার একতম দোষ এই বলা হয় যে, তিনি জীবনের শেষভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৯জন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আপনারা কি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, সেই ব্যক্তি, যিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কোন প্রকার "মকারাদি" কু অবগত ছিলেন না, পরে নিজের অপেক্ষা অনেক অধিক বয়স্কা একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই সহিত অতি সুখে জীবনের ২৬টি বৎসর যাপন করিলেন; তিনি শেষ বয়সে, যখন মানুষের জীবনীশক্তি নির্ব্বাপিত প্রায় হয়, শুধু আত্মসুখের জন্যই যে কতক গুলি বিবাহ করিবেন, তাহা কি সম্ভব? যদি ন্যায় বিচারের সহিত বিবেচনা করেন, তবে আপনারা বেশ জানিতে পারিবেন—সে বিবাহের উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রথমে দেখিতে হইবে, তাঁহারা (হজরতের পত্নিগণ) কোন শ্রেণীর কুলবালা ছিলেন, আর কেনই বা তাঁহাদের রসুলের প্রয়োজন ছিল।—কতিপয় নারী এরূপ ছিলেন যে, তাঁহাদের বিবাহের ফলে রসুলের পক্ষে 'নূর-ইসলাম' প্রচারের সুবিধা হইল। আর কয়েকজন এরূপ ছিলেন যে, বিবাহ ব্যতীত তাঁহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অন্য কোন উপায় ছিল না। (ক্রমশঃ)

মিসেস আর, এস, হোসেন।

কোড়ার আঘাত পাইয়াছিলাম।" এতচ্ছ্রবণে রসূলে করিম তৎক্ষণাৎ গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া নগ্নদেহে কশাঘাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন!!!

বলি, আজ পর্য্যন্ত জগতে কেহ ঐরূপ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছে কি? আমার বিশ্বাস রসূলকে গাত্র বস্ত্র মোচন করিতে দেখিয়া স্বর্গদূত (ফেরেশ্‌তা) পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিলেন! এরূপ মাহাত্ম্য আরও কোন মহাপুরুষ দেখাইতে পারিয়াছেন কি?

আক্কাস অবশ্য রসূলকে কোড়া মারিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল না, তাহার উদ্দেশ্য ছিল হজরতের পবিত্র পৃষ্ঠ চুম্বন করা। সে উদ্দেশ্য সফল হইল—ক্রন্দনের রোলের মধ্যে ভক্তির জয় জয় কার ঘোষিত হইল। —লেখিকা।

কোরআন।

নাম সম্বন্ধে আলোচনা।

(পুর্ব্বানুবৃত্তি।)

মোসহাফ।

কোরআন মজিদের দ্বিতীয় নাম 'মোসহাফ'। কিন্তু এই নাম কোরআন মজিদে ব্যবহৃত হয় নাই, সুতরাং ইহা উহার এলহামী (আপ্ত) নাম নহে। তবে মোসহাফ কোন ভাষার শব্দ?

স্বনামখ্যাত খ্রীষ্টান ঐতিহাসিক জর্জ্জী জিদান (George Zaidan) বলিতেছেন :—

"মোসহাফ হাবশী (আবিসিনিয়া দেশীয়) শব্দ। হাবশী ভাষায় উহার উচ্চারণ 'মাসহাফ'—অর্থ গ্রন্থ।" (১)

আমরা ঐতিহাসিক জিদানের এই উক্তির প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু 'মোসহাফ' আরব্য ভাষার শব্দ নহে, ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত, আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতেও বাধ্য নহি। হাবশ (আবিসিনিয়া) দেশে 'মোসহাফ' প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু আরব্য ভাষার বিভিন্ন প্রাচীন অভিধান গ্রন্থে আমরা মোসহাফ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাই। স্বনামধন্য অভিধানকার ফিরোজআবাদী লিখিয়াছেন :—'মোসহাফ' 'এসহাফ' শব্দের বা মসদারের (Infinitive mood এর) এস্‌মে মাফউল, (Passive Participle) এবং সহিফা শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'সহিফা' শব্দের অর্থ পত্রিকা (পাতা); 'এসহাফ' শব্দের অর্থ—পত্র সকলকে সুব্যবস্থা করিয়া অথবা গাঁথিয়া রাখা—file করা। 'মোসহাফ' শব্দের অর্থ "ব্যবস্থা কৃত পত্র সমূহ"। (২)

আরব্য ভাষার প্রধানতম অভিধান লেখক আল্লামা এব্‌নে মাঞ্জুর বলিতেছেন :—

والمُصحف والمِصحف' الجامع للصحف المكتوبة' بين الدفتين (৩)

অর্থাৎ মোসহাফ এবং মেসহাফ = দুই পিজ বোর্ডের (Pest Board) এর মধ্যে একত্রিকৃত লিখিত পত্রিকা সকল।

ভাষা তত্ত্ববিদ আজহারী বলেন :—

(১) تاريخ اللغة العربية لجرجى زيدان—৭ পৃষ্ঠা। ডাঃ আরনল্ড ও তাঁহার سواء السبيل فى معرفة المعرب الدخيل নামক অভিধান গ্রন্থে ঐরূপ লিখিয়াছেন।

(২) القاموس المحيط—৫৫৪ পৃষ্ঠা।

(৩) لسان العرب—১১শ খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা।

و انما سُمِی مُصحفًا، لانه اُصحِف ای جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين

অর্থাৎ মোসহাফকে মোসহাফ বলিবার কারণ এই যে, উহাতে লিখিত পত্রিকা সকল একত্র করা হইয়াছে, অর্থাৎ লিখিত পত্রিকাগুলি দুই পিজবোর্ডের মধ্যে ব্যবস্থা পূর্ব্বক রক্ষা করা হইয়াছে। (১)

রসুলে করিমের সময় সম্পূর্ণ কোরআনমজিদ লিখিত হইলেও, (২) লিখিত অংশগুলি একত্র করা হয় নাই। হজরত আবু বাক্র উক্ত অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে পরিণত করেন। তখন উপস্থিত অবস্থানুযায়ী উহার নাম মোসহাফ রাখা হয়। কোরআন মজিদে কোরআনকে মোসহাফ বলিয়া উল্লেখ না করিবার ইহাই কারণ। রসুলে করিমের জীবিতাবস্থায় কোরআন মজিদের লিখিত অংশ গুলিকে একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে পরিণত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল, যেহেতু তখনও ওয়াহ্য়ী (প্রত্যাদেশ) আসা বন্ধ হয় নাই। (৩) সেই জন্য রসুলোল্লাহ্র স্বর্গারোহণের পর, হজরত আবু বাক্রের আদেশ অনুসারে হজরত জায়েদ এব্নে সাবেৎ কোরআন মজিদের লিখিত পত্রিকাগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে সম্পাদিত করিলেন। (৪) এবং হজরত এব্নে মাস্উদ (ابن مسعود) অথবা হজরত সালেমের প্রস্তাবানুযায়ী এই গ্রন্থকে ‘ মোস্হাফ ’ নামে অভিহিত করা হইল।

(১) لسان العرب—১১শ খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা।

(২) و قد كان القران كله كتب فى عهد النبى صلعم ولا مرتب السور - فتح البارى ج۹ ص۱۰

অর্থাৎ সম্পূর্ণ কোরআন মজিদ, রসুলে করিমের সময়েই লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু একত্রিত এবং সুসম্পাদিত হয় নাই। ফৎহুলবারী, ৯ম খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা।

(৩) و انما ترك النبى صلعم، جمعه فى مصحف واحد، لان النسخ كان يرد على بعضه، فلوجمعه، ثم رفعت تلاوة بعضه، لادى الى الاختلاف والاختلاط فحفظه الله تعالى فى القلوب الى زمن انقضاء النسخ (اى من حيث المجموع، والا فالاجزاء كانت مكتوبة، كما سنقف عليه انشاء الله تعالى) فكان التاليف الزمن النبوى، والجمع فى المصحف فى زمن الصديق، والنسخ فى المصاحف فى زمن عثمان - ارشاد السارى

(৪) صحيح البخارى ৩য় খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা। এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে কিরূপ সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন :—

قام عمر، فقال من كان تلقى من رسول الله صلعم شيئاً من القران، فلياتِ به وكانو يكتبون ذلك فى الصحف والالواح والعسب - قال :—(اى الراوى) وكان لايقبل من احد

আমরা বলিয়াছি যে, রাসূলে করিমের সময়ে কোরআন মজিদ লিখিত হইলেও একত্রিত হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, কোরআন মজিদ লিখিত অবস্থায় একত্রিত হয় নাই। নচেৎ সম্পূর্ণ কোরআন মজিদই যেরূপ লিখিত ছিল, সেইরূপ একত্রিত এবং সুব্যবস্থিতও ছিল।

সুব্যবস্থিত থাকার প্রমাণ এই যে, আমরা বিভিন্ন সহী (প্রামাণিক) হাদিসে দেখিতে পাই যে, রসুলুল্লাহ অমুক নামজে অমুক সুরা পাঠ করিলেন, অমুক সুরা পাঠ করিতে উৎসাহিত করিলেন, অথবা অমুক সুরার মহিমা বর্ণনা করিলেন। (১) সুরার (অধ্যায়ের) আয়েৎগুলি সুব্যবস্থিত না হইলে ঐরূপ বলিবার কোনই উপায় হইত না।

একত্রিত থাকার প্রমাণ এই যে, তৎকালীন প্রায় প্রত্যেক মোসলমানই (সাহাবী) সম্পূর্ণ কোরআন মজিদের হাফেজ ছিলেন। (২) সুতরাং সম্পূর্ণ কোরআন মজিদই তাঁহাদের হৃদয়-পটে অঙ্কিত ছিল।

شيئا' حتى يشهد شاهدان وهذا يدل على ان زيدا كان لايكتفى بمجرد وجدانه مكتوبا' حتى يشهد به من تلقاه سماعا مع كون زيد' ان يحفظه و كان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط وعند ابن ابى داؤد :— ان ابابكر قال لعمر ولزيد' اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله' فاكتباه وكان المراد بالشاهدين' انهما يشهدان على ان ذلك المكتوب' كتب بين يدى رسول الله صلعم و كان غرضهم' ان لايكتبوا الا من عين ماكتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لامن مجرد الحفظ -
فتح البارى

অর্থাৎ হজরত ওমর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেনঃ—রসুলে করিমের নিকট হইতে কোরআন মজিদের যিনি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি লইয়া আসুন। সুতরাং সকলই লিখিত অংশগুলি যাহা পত্রিকা, বল্কল এবং কাষ্ঠ ফলক ইত্যাদিতে লিখিত ছিল) লইয়া আসিলেন। অতঃপর ওমর বলিলেনঃ—দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত কোন লিখিত অংশই কোরআন বলিয়া গৃহীত হইবে না। ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, কেবল লিখিত হইলেই জায়েদ এব্নে সাবেৎ তাহাকে কোরআনের অংশ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। রসুলে করিমের নিকট হইতে ঐ অংশ শ্রবণ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, এইরূপ অন্ততঃ দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু জায়েদ নিজেও সম্পূর্ণ কোরআন মজিদের হাফেজ ছিলেন। অতি মাত্রায় সতর্কতার সহিত কার্য্য করাই ঐরূপ করিবার একমাত্র কারণ ছিল। এব্নে আবি দাউদ বলেনঃ—হজরৎ আবুবকর, ওমর এবং জায়েদের প্রতি আদেশ করিলেন যে, আপনারা উভয়েই মসজেদের দ্বারদেশে উপবেশন করুন। এবং দুই সাক্ষী সহ কোরআন মজিদের কোন অংশ কেহ উপস্থিত করিলে, তাহা লিখিয়া লইবেন। সাক্ষীগণ বলিবেন যে, ইহা রসুলুল্লাহর (صلعم) সম্মুখে লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ কেবল স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করা হয় নাই। রসুলুল্লার সম্মুখে লিখিত হইয়াছে এইরূপ কোন অংশ প্রাপ্ত হইলে এবং নিসংশয়রূপে তাহার সত্যতা সপ্রমাণ হইলে তবে তাহা কোরআন মজিদে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" অতএব এসলামের হিতাকাঙ্খী পদ্‌রি মহোদয়গণ নিশ্চিন্ত থাকুন। ফাৎহুলবারী, ৯ম খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা।

(১) সহি বোখারী ও সহি মোসলেম প্রভৃতির كتاب الصلوة وكتاب فضائل القران দেখুন।

(২) قال الحافظ :— و هذا يدل ان كثيرا ممن قتل فى وقعة اليمامة كان قد حفظ القران
فتح البارى ৯ম খণ্ড, ৯ পৃঃ

লিখিত থাকার প্রমাণ।

১ম— كلا انها تذكرة - فمن شاء ذكره - في صحف مكرمة (১)

অর্থাৎ ইহা (কোরআন) উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহার ইচ্ছা, (সেই) স্মরণ রাখিতে পারে, ইহা মহিমান্বিত সোহফে—(পাত্রিকা সমূহে) রহিয়াছে।

২য়— رسول من الله يتلو صحفا مطهرة (২)

অর্থাৎ আল্লাহ (তায়ালার) পক্ষ হইতে প্রেরিত, যিনি পবিত্র সোহফ—(পত্রিকা সকল) পাঠ করিতেছেন।

সোহফ সহিফা শব্দের বহুবচন। 'সহিফার' অর্থ ما يكتب فيه شيء من الحكمة (৩) যাহাতে জ্ঞানের কথা লিখিত হয়। "পত্রিকায় উপদেশ রহিয়াছে" এবং "পত্রিকা পাঠ করিতেছেন" ইহার অর্থ পত্রিকায় লিখিত রহিয়াছে এবং "লিখিত পত্রিকা পাঠ করিতেছেন" বতীত আর কি হওয়া সম্ভব!

কোরআন।

কোরআন মজিদের তৃতীয় এবং মূল নাম কোরআন। কোরআন মজিদ স্বয়ং বলিতেছে যে আমি কোরআন।

১ و اوحي الي هذا القران

এবং প্রত্যাদেশ দ্বারা আমার নিকট এই কোরআন প্রেরিত হইয়াছে। পারা ৭ রুকু ৮।

২ ما كان هذا القران ان يفترى من دون الله

এই কোরআন কাহারও মিথ্যা রচনা নহে, আল্লাহ ইহা প্রেরণ করিয়াছেন। ১১ পারা ৯ রুকু।

৩ تلك آيات الكتاب و قران مبين

ইহা (খোদার তায়ালা) প্রেরিত জ্যোতির্ম্ময় কোরআনের শ্লোক।

৪ و لقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل

নিশ্চই আমি মানবকে (উপদেশ প্রদানের) নিমিত্ত এই কোরআনের মধ্যে উদাহরণ দিয়া বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি। ১৫ পারা ৭ রুকু।

৫ كذالك انزلناه قرانا عربيا

আমি উপরোক্তরূপে এই কোরআন আরব্য ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি। পারা ১৬ রুকু ১৫।

৬ ان هذا الا ذكر و قران مبين

ইহা উপদেশ এবং সত্য প্রকাশ কারী কোরআন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ২৩ পারা রুকু ৪।

(১) قران مجيد পারা ৩০, ৫ রুকু।
(২) قران مجيد পারা ৩০, ২৩ রুকু।
(৩) فرايد اللغة ৩৬৬ পৃষ্ঠা।

৭　　　　　　　　　　انه لقران كريم

নিশ্চই ইহা মহামান্বিত কোরআন।

৮　　　　　　　　　　بل هو قران مجيد

বরং ইহা কোরআন মজিদ। ৩০ পারা ১০ রুকু।

এইরূপ ৬৮ বার কোরআনকে কোরআন মজিদের মধ্যে কোরআন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (১)

এখন আলোচ্য এই যে, 'কোরআন' কোন ভাষার শব্দ? উহার উচ্চারণ কিরূপ, এবং অর্থই বা কি? জর্জ্জ সেল (George Sale) মহোদয় পুনরায় আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, কোরআন হিব্রু ভাষার শব্দ। প্রথমতঃ মুসলমানগণ কারাহ্ অথবা মাকরাহ্ হইতেই কোরআন শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। (১) আমাদের বক্তব্য এই যে হিব্রু ভাষায় কারাহ্ শব্দের অর্থ=পাঠ করা—এই অর্থে এবং সাদৃশ্যে আরব্য ভাষার কেরয়াত (قرأت) শব্দ রহিয়াছে। সুতরাং কোরআন মজিদের নাম য়্যাহুদীদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইলে, তাহা কোরআন না হইয়া 'কেরয়াৎ' হইত।

কেহ বলিতে পারেন, কোরআন শব্দের অর্থও পাঠ করা। কারণ, উহা 'কারায়া' ক্রিয়ার মাসদার (Infinitive mocd)—অতএব সেল মহোদয়ের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। আমরা বলিব :—

১। আমরা 'কারায়া' হইতে কোরআনের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করি না। কেন করি না, পাঠকগণ তাহা পরে জানিতে পারিবেন।

২। উহা স্বীকার করিলেও প্রমাণিত হইবে যে, কোরআন আরব্য শব্দ কারায়া হইতে উৎপন্ন, হিব্রু কারাহ্ অথবা মাকরাহ্ হইতে নহে।

বিভিন্ন ভাষার দুইটী শব্দের অর্থ কিম্বা উচ্চরণের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেই যে, প্রমথ দ্বিতীয় হইতে গৃহীত, তাহা বলিবার উপায় নাই। যেহেতু উহা ঠিক তাহার বিপরীতও হইতে পারে।

(১) লেখক টীকায় এই ৬৮টী স্থানের পারা ও রুকুর উল্লেখ করিয়াছিলেন, স্থানাভাব বশতঃ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।　　　　—সম্পাদক।

(২) G. Sale, Pril. Disc. III

সেল মহোদয় এবং অন্যান্য মোসলেম হিতৈষিগণ (যাঁহাদিগের মধ্যে আমাদের গিরিশচন্দ্র সেন ও একজন) আরব্য ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও, বিশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক কোরআন মজিদের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন, এই কষ্ট স্বীকারের মূল উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা ঠিক অবগত নহি। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, এই সকল অনুবাদের দ্বারা মোসলেম সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের মনে হয়, যেন তাঁহারা আমাদিগের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন না করিলেই আমরা অধিকতর উপকৃত এবং বাধিত হইতাম।

ز نادانی بر او کرد' همدم کار من ضایع
عجب تر اینکه' بر من منت بسیار هم دارد!

অথবা কেহ কাহারও নিকট হইতে গৃহীত না হইয়া, উভয়ই কোন তৃতীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত "গম্" আর ইংরাজী গো (Go) শব্দ দ্বয়ের অর্থ এবং উচ্চারণের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া যদি কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, সংস্কৃত "গম্" ইংরাজী Go শব্দ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা সে সিদ্ধান্ত (জর্জ্জ সেলের ন্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত হইলেও) গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এইরূপ আরব্য শব্দ কোরআন অর্থে এবং কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চারণে হিব্রু কারাহ্ বা মাক্‌রাহ্‌র অনুরূপ হইলেও আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি যে, আরব্য কোরআন হিব্রু কায়হ অথবা মাকরাহ হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিব্রু এবং আরব্য ভাষা দ্বয়ের মধ্যে কোনটী প্রাচীনতম, তৎসম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদগণ এখনও বিভিন্ন মত। অতএব সম্প্রতি আমরা কেবল ইহাই স্বীকার করিতে পারি যে, যেরূপ সংস্কৃত গম্ এবং ইংরারী Go একই ভাষা (মূল আর্য্য ভাষা) হইতে উৎপন্ন, তদনুরূপ আরব্য কোরআন এবং হিব্রু করাহ্ বা মাক্‌রাহ্‌ও একই ভাষা (মূল Semitic ভাষা) হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু তাহা হইলে সেল মহোদয়ের মূল উদ্দেশ্য—মুসলমানদিগের সর্ব্বস্ব, এমন কি কোরআনের নাম পর্য্যন্তও অপরের নিকট হইতে গৃহীত, একথা সপ্রমাণ করার দুরাকাঙ্খা সফল হইবে না।

মোসলমান পণ্ডিতদিগের মতে কোরআন আরব্য ভাষার শব্দ। তবে উহার ব্যুপত্তি এবং উচ্চারণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্যে নানারূপ মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথম মত-ভেদ উচ্চারণ লইয়া, অর্থাৎ কোরআন শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোরআন (قرءان) না কোরান (قران)। যাঁহারা শেষোক্ত উচ্চারণের পক্ষপাতী তাঁহারা আবার উহার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মত।

এমাম শাফেয়ী বলেন—যে, শুদ্ধ উচ্চারণ কোরান। এবং উহার কোন ব্যুৎপত্তি নাই। কোরআন মজিদের নামের জন্য খোদাতালা এই শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং উহার অন্য কোন অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি হইতেই পারে না। এমাম আশয়ারী (ابوالحسن الاشعری) এবং ফার্‌রার (ابوذکریا یحیی بن زیاد الفراء الکوفي) উচ্চারণ সম্বন্ধে এমাম শাফেয়ীর সহিত এক মত হইলেও ইঁহারা স্বীকার করেন না যে, কোরান শব্দের ব্যুৎপত্তি নাই, এবং নাম হওয়া ব্যতীত অভিধানে উহার অন্যার্থ হওয়াও অসম্ভব। এমাম আশয়ারী বলেন, কোরআন শব্দের উৎপত্তি কারনুন (قرن) হইতে। কারনুন শব্দের অর্থ সংযোগ এবং মিলন। কোরআন মজিদের শ্লোক (آیت) এবং অধ্যায় (سورة) গুলির ভাব এবং অর্থ পরস্পর সংযুক্ত এবং মিলন হওয়া প্রযুক্ত উহার নাম কোরআন হইয়াছে। ফার্‌রা বলেন কোরান কারায়েণ শব্দ হইতে উৎপন্ন। কারায়েন করিনা (قرينة) শব্দের বহুবচন। করিনার অর্থ যুক্তি এবং তুল্য ও সদৃশ্য। কোরআন মজিদের এক আয়েৎ অপর আয়েতের প্রমাণ (সমর্থক) এবং ব্যাখ্যাতা, অথবা মাধুর্য্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানে তুল্য এবং সদৃশ এই হেতু উহার নাম কোরান হইয়াছে।

এমাম শাফেয়ীর মত সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। কারণ তাহা ব্যকরণ এবং অভিধানের বিরুদ্ধ সুতরাং যুক্তি তর্কের বহির্ভূত। এমাম আশয়ারী এবং ফার্‌রার মত গ্রহণ করিতেও

আমরা অসমর্থ। কারণ তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, শুদ্ধ উচ্চারণ 'কোরান'। অথচ তাহা প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত পাঠের (قرأت) বিরুদ্ধ। অধিকন্তু বৈয়াকরণ জাজ্জাজের (الزجاج النحوى) মতানুসারে যে পাঠে 'কোরাণ' আছে, তাহাও প্রকৃত পক্ষে কোরআন। উচ্চারণে সংক্ষেপ এবং সরল করার উদ্দেশ্যে হাম্‌জা (আ) বিলুপ্ত করা হইয়াছে, এবং তাহার হার্‌কাৎ (আকার) পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরে ('র'কে) প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা কোরান নামকরণের যে হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ মূল্যবান নহে। গ্রন্থের শ্লোক এবং অধ্যায়গুলি ভাবে এবং অর্থে পরস্পর সংযুক্ত, অথবা মাধুর্য্যে এবং জ্ঞানে তুল্য হওয়া একটা গুণ বলিয়া ধরা হইলেও, তাহা কোন বিশেষ এবং অসাধারণ গুণ নহে।

উপরোক্ত মহোদয়গণ ব্যতীত অন্যান্য পণ্ডিতগণ এক মত হইয়া বলিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ কোরআন (على زنة الفعلان)। এবং খোস্‌রান, নোক্‌সান এবং গোফরান ইত্যাদির ন্যায় কোরআন শব্দও মাস্‌দার (Infinitive mood)। জাজ্জাজ এবং তাঁহার মতাবলম্বিগণের মতে কোরআন বিশেষণ। কিন্তু ইহা উল্লেখ যোগ্য মতভেদ নহে। যেহেতু যাঁহারা কোরআনকে বিশেষ্য বলেন, তাঁহারও বিশেষণী বিশেষ্য বলিয়াই স্বীকার করেন। (১)

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোরআন শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? হজরত এব্‌নে আব্বাস এবং অভিধানবিৎ লেহয়ানী প্রভৃতির মত এই যে, কোরআন শব্দের ব্যুৎপত্তি কেরয়াৎ (قرء - قرءة - قرانا) হইতে, অর্থ পাঠ করা। মাসদার (Infinitive mood) এস্থানে মাফউল (Passive Pariticiple) রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থ—পঠিত (بمعنى مقرو)। (২) ইঁহাদিগের মতে কোরআন মজিদকে কোরআন (পঠিত) বলিবার কারণ এই যে, উহা পুনঃপুনঃ পঠিত হইয়া থাকে, এবং লক্ষ লক্ষ মানব উহার আবৃত্তি করিয়া থাকেন। জগতের অপরাপর ধর্ম্ম পুস্তক সেরূপ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত।

হজরত এব্‌নে আব্বাস প্রভৃতি ছাড়া অপরাপর যাবতীয় অভিধান লেখক এবং টীকা কারের (مفسرين) মতে কোরআনের ব্যুৎপত্তি কারউন (قرء قرءا قرانا) হইতে, এবং অর্থ সংগ্রহ করা, সমন্বয় সাধন এবং পূর্ণ করণ।(৩)

প্রমাণ স্বরূপ আমরা কতিপয় বিখ্যাত পাণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

(১) ان قتادة وجه معنى القران الى الجمع

অর্থাৎ হজরত কাতাদা কোরআন অর্থ সমন্বয় করণ এবং পূর্ণতা সাধন বলিয়াছেন।

(১) এই সমস্ত বিষয়ের জন্য الاتقان ১৭শ অধ্যায়, لسان العرب ১ম খণ্ড ১২৪ পৃষ্ঠা এবং تفسير كبير ১ম খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

(২) تفسير ابن جرير ২৯শ খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা, এবং اتقا উপরোক্ত অধ্যায়।

(৩) فذهب الاكثرون الى انه (اى القران) مشتق من القرء — وهو الجمع

অর্থাৎ অধিকাংশের মত এই যে, কোরআন 'কারউন' হইতে উৎপন্ন। কারউন শব্দের অর্থ সমন্বয় এবং পূর্ণতা সাধন। فتح البيان ১ম খণ্ড ৩৩৭ পৃষ্ঠা।

(৪) تفسير ابن جرير ২৯শ খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা।

(২) قال ابو اسحاق الزجاج فى تقسيره معنى القران الجمع

অর্থাৎ জাজ্জাজ তাঁহার তফ্‌সীর গ্রন্থে বলিয়াছের :—কোরআন শব্দের অর্থ সমন্বয়। (১)

(৩) قال الزجاج و ابوعبيده :—انه ماخوذ من القرء' وهوالجمع

জাজ্জাজ এবং আবু ওবায়দা বলিয়াছেন :—কোরআন শব্দ 'কারউন' হইতে গৃহীত,—অর্থ সমন্বয় এবং পূর্ণ করন। (২)

(৪) قال ابن الاثير:— الاصل فى هذه اللفظة الجمع

এব্‌নে আসির বলিয়াছেন :—এই শব্দের (কোরআনের) প্রকৃত অর্থ সমন্বয়। (৩)

(৫) قال الراغب الاصفهانى :—انما سمى قرأنا لكونه جمع

রাগেব এসফেহানী বলিয়াছেন :—কোরআন সমুদয় বিষয়ের সমন্বয় করিয়াছে বলিয়া উহাকে কোরআন বলা হয়। (৪)

(৬) قال الامام البغوى—واصل القرء—الجمع

এমাম বাগাভী বলিয়াছেন :—কারউনের মূল অর্থ সমন্বয়। (৫)

কোরআন শব্দের অর্থ কি ? উপরোক্ত উক্তি সমূহের দ্বারা যদিও তাহা আমরা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি,—কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোরআন তাহার অর্থ ব্যাখ্যার জন্য অপর কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, কোরআনই কোরআনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। সুতরাং 'কোরআন' শব্দের অর্থও আমাদিগকে কোরআন মজিদেই দেখিতে হইবে।

পাঠ করুন :—

(৬) انا علينا جمعه و قرأنه

---

(১) تاج العروس ১ম খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা।
(২) تفسير كبير ১ম খণ্ড ১৮৩ পৃঃ।
(৩) نهايه لابن الاثير ৩য় খণ্ড ২৬৩ পৃঃ।
(৪) الاتقان ১১৯ পৃষ্ঠা।
(৫) معالم التنزيل ১ম খণ্ড ৭১ পৃষ্ঠা।
(৬) القران الكريم ২৯ পারা, ১৭ রুকু।

انما فسرنا الجمع والقران ب সমন্বয় সাধন و পূর্ণ করন—واما الاول فلا اشكال فيه واما الثانى فظاهره وان كان خلافاً لتعبيرات بعض المفسرين ولاكنه ليس مضاد السياق كلامه تعالى على ان بعضهم (ومنهم البيضاوى وغيره) قد فسره بالاثبات - وبعضهم (ومنهم ابن عباس رض وغيره) بالبيان وانت تعلم' مافى معنا هما من الرسوخ والتقرير والتكميل ولذا عبرنا عنه ب 'পূর্ণ করুন' اى تكميله من كل الوجوه واياك والاغترار بقول جميعهم فان منهم من يفسره با "النقش و تصوير الحروف" (راجع تبصير الرحمن الجزء الثانى وجه—٣٧٧) ولايذهب عليك مافيه من البعد والنكارة

واما الجمع' فهو ايضا وان لم يكن مرادفا ل পূর্ণতা সম্পাদন - لاكنه لازم غير مفارق لمفهومه فان الجامع مهما كان جامعاً حقيقيا لصفة اوصفات' فضرورى ان يكون كاملا فى تلك الصفة

অর্থাৎ "অবশ্য উহার (কোরআনের) **সমন্বয় সাধন** এবং **পূর্ণতা সম্পাদন** আমারই কর্ত্তব্য।"

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা পাঠক নিশ্চই কোরআন শব্দের দ্বারা সমন্বয় এবং পূর্ণকরণ বুঝিতে পারিয়াছেন। আর আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোরআন নাম স্বরূপ ব্যহৃত হওয়ার সময় বিশেষণ অথবা বিশেষণীয় বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব কোরআন নামের অর্থ হইতেছে **সমন্বিত এবং পূর্ণ গ্রন্থ।**

কোরআন মজিদের নাম **সমন্বিত** এবং **পূর্ণ** কেন হইল, তাহাই আমাদের আলোচনার শেষ বিষয়।

পণ্ডিত মণ্ডলি উপরোক্ত বিষয়ের তিনটী কারণ নির্দ্ধারণ কারিয়াছেন :—

(১) قال ابو اسحق النحوی' یسمی كلام الذی انزل علی نبیه كتابا وقرانا و فرقانا ومعنی القران الجمع' وسمی قرانا لانه یجمع السور فیضمها -

অর্থাৎ বৈয়াকরণ আবু এসাহক বলেন :—খোদা তায়ালার যে সমুদয় পবিত্র বাণী (প্রত্যাদেশ দ্বারা) রস্থলে করিমের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তৎসমষ্টির নামই কেতাব। কোরআন মজিদের এরূপ নাম হওয়ার কারণ এই :যে, উহাতে অধ্যায়গুলি সমন্বিত এবং সংযুক্ত হইয়াছে। (১)

(২) قال ابن الاثیر:—و یسمی القران لانه جمع القصص والامر والنهی—والوعد والوعید-

আল্লামা এব্‌নে আসির বলিয়াছেন :—কোরআন নাম হওয়ার কারণ এই যে, উহাতে উপাখ্যান, ব্যবস্থা এবং পুরস্কার ও দণ্ডের অঙ্গীকার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ই সমন্বিত এবং সন্নিবেশিত হইয়াছে। (২) আমাদের বিবেচনায় এই উভয়ই অসম্পূর্ণ এবং বিশেত্বহীন, যেহেতু অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদগুলি পরস্পর মিলিত অথবা উপাখ্যান এবং উপদেশ ইত্যাদি সন্নিবেসিত হওয়া কোনরূপ বিশেষ অথবা অসামান্য গুণ নহে।

আমাদের মতে কোরআন মজিদের পূর্ণ এবং সমন্বিত নাম হওয়ার প্রকৃত এবং একমাত্র কারণ এই যে :—

هوالعلم اللدنی الاجمالی' الجامع للحقایق كلها (৩)

কোরআন সর্ব্বতত্বসমন্বিত, সর্ব্বসত্যপূর্ণ—পূর্ণ জ্ঞান এবং উহাতে,

جمع ثمرات الكتب السالفة (৪)

পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় স্বর্গীয় গ্রন্থের সার সঙ্কলিত হইয়াছে।

او الصفات - الاتری اننا اذا قلنا انه المستجمع لجمیع صفات الكمال' فانما یكون مرادنا به' انه هوالفرد الكامل الجامع لجمیع صفات الكمال وهذا انما لایخفی علی من له ادنی حظ من العربیة—كاتبه

(১) لسان العرب ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা। (২) انها به لابن الاثیر ৩য় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা।
(৩) دستورالعلماء ৩য় খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা। (৪) الاتقان—قاله الراغب الاصفهانی ১১৯ পৃষ্ঠা।

এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ে এবং অতুলনীয় পূর্ণতায়, পৃথিবীর কোন গ্রন্থেরই কোরআন মজিদের সহিত তুলনা হইতে পারে না। আর এই জন্যই তাহার নাম হইয়াছে পূর্ণ—অর্থাৎ **কোরআন।**

و الله درالقائل

حسن یوسف' دم عیسی' ید بیضا داری
آنچه خوبان همه دارند' تو تنها داری

প্রকৃত পক্ষে কোরআন মজিদের, কোরআন (পূর্ণ) হইতে উৎকৃষ্টতর অপর কোন নামই হইতে পারে না। জগতের মধ্যে এসলাম পূর্ণাঙ্গ (Perfect) ধর্ম্ম, তাহার ধর্ম্ম-গ্রন্থও সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। তওরাৎ ব্যবস্থা, ইঞ্জিল নীতি-শিক্ষা এবং জবুর প্রার্থনা। কিন্তু কোরআন একাধারে ব্যবস্থা, নীতি-শিক্ষা এবং প্রার্থনা। কোরআন পৃথিবীর সমুদয় সত্যধর্ম্মের সার সংগ্রহ। কোরআন যাবতীয় স্বর্গীয় গ্রন্থের নির্য্যাস। কোরআন সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের আধার এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। কোরআন যাবতীয় অভাবের পরিপূরক—সর্ব্ব ব্যাধির মহৌষধ। কোরআন ইহকাল ও পরকালের পথ-প্রদর্শক। কোরআন ধর্ম্ম-তত্ব, উপাসনা পদ্ধতি, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, দর্শন, সাহিত্য, ব্যবস্থা, সভ্যতা, ধর্ম্ম-নীতি, রাজ-নীতি এবং সমাজনীতি ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার শিক্ষায় সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ।

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল বাকী।

রোজা।

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ۝ ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ۝ و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ۝ فمن تطوع خيرا فهو خير له ۝ و ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ۝

পবিত্রতম গ্রন্থ কোরআন মজিদে খোদাতা'লা ভক্ত বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে বিশ্বাসী বৃন্দ, তোমাদের জন্য রোজা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপ তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহাদের উপর করা হইয়াছিল। যেন তোমরা (পাপ হইতে) বাঁচিতে পার। (ইহা) নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ রুগ্ন হয়, অথবা প্রবাসে থাকে, তবে অন্য সময়ে তাহা পূরণ করিবে। আর যাহাদের ক্ষমতা থাকে, তাহারা এক এক রোজার জন্য একজন দরিদ্রকে ভোজন করাইয়া দিবে। পরন্ত যাহারা স্বেচ্ছায় সৎকার্য্য করে, তাহাদের জন্য তাহাতে মঙ্গল (অবধারিত)। আর যদি তোমরা রোজা রাখ, বুঝিতে পারিলে (দেখিবে, তাহাতে) তোমাদের জন্য মঙ্গল আছে।” (সূরা বকর ১২ রুকু)

এই রোজা ধর্ম্ম জগতে যে নূতন জিনিষ নহে, তাহা সকলেই জানেন। ইহুদীদিগের মধ্যে রোজা আছে, * খৃষ্টানগণের ধর্ম্ম শাস্ত্রে উপবাসের আবশ্যকতা এবং মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে,†

* হজরত মুসা ৪০ দিন রোজা রাখার পর সদাপ্রভুর অনুগ্রহ এবং নিয়ম-গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (দ্বিতীয় বিবরণ ৯অধ্যায় ৯পদ) যিহশূয় নবীর পুস্তকের ৫৭ অধ্যায়ের ৩ হইতে ৭ পদ পর্য্যন্ত রোজার উপকারিতা এবং উহার পালন বিধি লিখিত আছে।

† যিশু স্বয়ং উপবাস করিয়াছেন —মথি ৪ ; ২। যিশু উপবাসের বিধান বর্ণনা করেন—মথি ৬ ; ১৬-১৮। তিনি উপবাসের অনুমোদন করেন—মথি ৯ ; ১৪, ১৫। উপবাস ব্যতীত ভূত ছাড়ান যায় না—মথি ১৭ ; ২১। যিশুর শিষ্যগণ উপবাস করিতেন—প্রেরিত ১৩ ; ১—৩।

বৌদ্ধ ধর্ম্মেও এই বিধান আছে—আর হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে ত ইহার কড়াকর ব্যবস্থা।§ বস্তুতঃ জগতে এমন সম্প্রদায় খুব কম, যাঁহাদের মধ্যে ইহার প্রভাব কিছু মাত্র নাই। কার্য্যতঃ তাঁহারা ইহা পালন করুন আর নাই করুন। খোদাতালা এই রোজা যে মানুষের একটা যন্ত্রণা, একটা বিরক্তির উপদান স্বরূপ করেন নাই, তাঁহার আদেশে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন, 'ইহাতে তোমাদের জন্য মঙ্গল (নিহিত আছে)' যদি তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, (তবে তাহা বুঝিতে পারিবে)'। আচ্ছা, কি মঙ্গল আছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে হয় না? কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদিগকে রোজা কি জিনিষ, তাহাই দেখিয়া লইতে হইবে।

সাধারণতঃ লোকে জানে, দিবাভাগে পান এবং আহার না করার নামই রোজা। ইহার অধিক আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহা নহে, হাদীস শরীফে আবু হোরায়রার (রাঃ) বর্ণনায় লিখিত আছে,—

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه و شرابه
رواه البخارى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বৃথা বাক্য এবং বৃথা কার্য্য বর্জ্জন না করিল, খোদার নিকট তাহার আহার এবং পান বর্জ্জন করার কোন আবশ্যক নাই। বস্তুতঃ প্রবৃত্তি দমন করাই রোজার প্রধানতম উদ্দেশ্য। যখন মানুষের খাওয়ার সময় হয়, সকলে যখন খায়, তখন ধৈর্য্য সহকারে নিজের ইচ্ছার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া প্রবৃত্তি নিচয়কে নিজের আয়ত্ত্ব করাই রোজার কর্ত্তব্য। ইহাতে যে যে উপকার নিহিত আছে নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

১।

মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বায়ু, খাদ্য, এবং পানি আবশ্যক। ইহা ছাড়া স্ত্রীপুরুষের সম্মিলনও অন্যতম আবশ্যক বলিয়া ধরা যাইতে পারে বা ধরা গিয়া থাকে। রোজা প্রদোষ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্তের পর পর্য্যন্ত বায়ু ব্যতীত অন্য পদার্থ গ্রহণ করিতে নিষেধ করে। ঐ সমস্ত পদার্থ আবশ্যক হইলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মানুষ যাহার স্বাদ পায়, যাহা তাহার পক্ষে আপাততঃ আরাম দায়ক মনে করে, তাহা পাইলেই গ্রহণ করিতে চায়। এই অবস্থায়, ক্ষুধা নাই তথাপি খাওয়া, পেটে ধরেনা তথাপি ঠাসিয়া ঠুসিয়া কতকগুলি পদার্থ তাহাতে ভরিয়া দেওয়া—শুধু রসনার তৃপ্তির জন্য; স্বাস্থ্যজনক হইতে পারে না। যে ভার বাহী এক মন উঠাইতে পারে, তাহার উপর দুই বা দেড় মন চাপাইয়া দিলে ঘাড় ভাঙ্গা বই আর কি উপকার পাওয়া যাইতে পারে! পরন্তু অতি ভোজন স্বাদের বিকার ঘটায়। পেট ভরা থাকিলে, মিঠাই মণ্ডা কিছু ভাল লাগে না। যে পর্য্যন্ত বাস্তবিক আবশ্যক বোধ না হয়, ততক্ষণ আহার, পান এবং আর কিছু গ্রহণ করা এই জন্যই নিষেধ। যখন বিশেষ আবশ্যক বোধ করা যায়, তখন তাহা পাইলে বা গ্রহণ করিলে, যে অনির্ব্বচনীয় সুখ হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পক্ষান্তরে নিজে এই সময় চুপ থাকিলেও, দেহের প্রত্যেক অনু

§ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে একাদশী প্রভৃতির আবশ্যক।

পরমানু খোদাতা'লার শুকুর গুজারী করিতে থাকে। খোদা ইহার প্রত্যাসী না হইলেও, আমাদের পক্ষে ইহা একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং যাহাতে অধিক পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক—রোজা এই উদ্দেশ্যে একটী অতুল্য বস্তু।

২।

ক্ষুধা থাকিলে নিতান্ত সামান্য খাদ্যও সুস্বাদু হয়। ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে পেটের ভাত ১৬ ঘণ্টার কমে সম্পূর্ণ হজম হয় না। আমাদের রোজা করিতে হয়—গড়ে তের ঘণ্টা। নিতান্ত বড় দিন যখন, তখন চৌদ্দ ঘণ্টার বেশী সময় উপবাস থাকিতে হয় না। এই অবস্থায় দেখা যায় যে, এক বেলার খাদ্য সম্পূর্ণ হজম না হইতেই আমরা আর এক বেলা আহার করিবার সুযোগ পাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সম্পূর্ণ ক্ষুধা না হইলে খাদ্য সুস্বাদ বোধ হয় না। মুসলমানগণ সারাদিন রোজা রাখিয়া যখন এফতার গ্রহণ করে, তখন তাহারা বাস্তবিক ক্ষুধা বোধ করিবার কাছা কাছি সময়ে আসে, সুতরাং খাদ্য উপাদেয় এবং কার্য্যকরী হয়। ইহাতে একাধারে স্বাস্থ্য এবং তৃপ্তি দুইই পাওয়া যায়।

৩।

এসলাম মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া দেয়। উহার অবশ্যপালনীয় বিধান গুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। কাহারও প্রচুর আহার্য্য আছে, বিলাসিতার উপাদানের অভাব নাই; অমিতাচার তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিল। ফলে রোগ, আলস্য এবং জড়তা আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল—সংসারের জন্য সে কোন কাজেরই রহিল না। পরন্তু এসলাম চায়, মানুষকে সংসারী দেখিতে। ক্ষুধা হউক, সহ্য করিতে হইবে; তৃষ্ণা হউক, দমন করিয়া রাখিতে হইবে; অন্য কোন প্রকার ভোগের ইচ্ছা হইলেও, সময় বিশেষে দমন করা চাই। তাহা না হইলে, প্রয়োজন বোধ হউক, ভোগ্য বস্তু প্রচুর পাইয়া তাহা ব্যবহার করিতে থাকিলে; প্রবৃত্তিতে একটা অদৃঢ়তা আসিয়া পড়ে—ফলে কোন সময় অভাবে পড়িলে ইহাতে কষ্টের একশেষ হয়। এই জন্যই অভ্যাস করিয়া সহ্য গুণ আরও করিয়া লওয়া উচিত। এতদুদ্দেশ্যে রোজা অপেক্ষা আর কিছু অধিকতর উপযুক্ত জিনিষ থাকিতেই পারে না।

৪।

পুনঃ পুনঃ আহার বা পান করা দৈহিক দৃঢ়তার অন্তরায় হইয়া পড়ে। পরন্তু এই জিনিষটী এমন দরকারী যে, ইহা ব্যতীত জীবনই বৃথা। যাহারা বার বার খায়, তাহাদের জীবন গোমহিষাদির ন্যায় সহজে নমনীয় হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে শিকারী জন্তুগুলি দিনে দুই দিনে আহার করিয়া কেমন দৃঢ় এবং নিরালস্য হয়! মানুষের পক্ষে এইরূপ হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বাধ্যবাধকাতায় না পড়িলে, এই প্রকার হইতে পারে না। সুতরাং রোজা তাহাদের জন্য যে একান্ত আবশ্যক, এ কথা বলাই বৃথা।

৫।

যাহারা কষ্ট সহিষ্ণু, দীর্ঘজীবন লাভ তাহাদেরই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অভ্যাস না করিলে, কষ্ট সহ্য করা সহজ সাধ্য হয় না। এই জন্যই ধর্ম্মজগতে নিয়মের অনুসরণ করিবার জন্য

কড়াকড় ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেই সব ব্যবস্থার মূলে কি বিশেষত্ব আছে, তাহা চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিশারদগণ নির্ণয় করিতে পারেন। এস্‌লাম অবৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম নহে, উহার প্রত্যেক বিধি বিধান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুরূপ। রোজা দ্বারা ইহা যাচাই হইতে পারে। যে যত কষ্ট করিতে অভ্যস্ত, কঠিন হইতে কঠিন তর দুঃখে পড়িয়া, সে ততই সহনশীল—ততই ধীর প্রতিপন্ন হয়। ফলে ইহা তাহার জন্য মঙ্গলেরই বিষয়। জগতের ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায়, যাহারা ভোগ বিলাসে অধিক পরিমাণে লিপ্ত থাকে, তাহাদের জরা এবং বার্দ্ধক্য অতি শীঘ্র সমাগত হয়। পক্ষান্তরে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে নিরত যোগীগণ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করেন—জরা এবং বার্দ্ধক্য তাঁহাদের অধীনস্থ বস্তু। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা খুব ভাল হইলেও দায়ে না পড়িয়া কেহ উহা গ্রহণ করিতে চায় না। এই জন্যই এসলামে রোজা পঞ্চ-কর্ত্তব্যের অন্যতম রূপে নির্দ্দিষ্ট। সারা বৎসর অমিতাচার করিয়া শরীরে যে গ্লানি উৎপন্ন হয়, এই এক মাসে তাহা সংশোধন হইয়া থাকে। ইহার আর একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহা চান্দ্র মাস হিসাবে প্রতিপালিত হয়। সৌরমাস চান্দ্রমাস অপেক্ষা এতটুকু বড় যে, প্রত্যেক তিন বৎসরে একটী চান্দ্র মাস সৌর মাসের প্রায় ৩০ দিন আগে বাড়িয়া যায়। এই হিসাবে যাহার জীবনে অনবরত ৩৬ ছত্রিশ বৎসর রোজা রাখা হয়, হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহার পূর্ণ এক বৎসর রোজা করা হইল। যদি এই রোজা সৌর মাস হিসাবে রাখা হইত, তবে জীবন ভরা একই ঋতুতে উপবাস থাকিয়া একটা অভ্যাস হইয়া যাইত। পরন্তু ইহাতে উপকার আশানুরূপ হইত না। তাই খোদাতোলার এই আশ্চর্য্য বিধান।

৬।

রোজা যে শুধু অনাহারে থাকাই নহে, উপরে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। রোজার সময় মানুষকে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য বর্জ্জন এবং চিত্ত-শুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় এবং ষড়রিপু এমনই দুর্দ্দম্য যে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে উহাদিগকে বাগ মানানই দুষ্কর। খোদাতোলা রোজার দ্বারা সেই অসুবিধা দূর করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। রোজার সমস্ত বিধিবিধান পালন করিলে, মানুষ স্বভাবতই সাধুতার কাছে ঘনাইয়া আসে। এই ঝোক কম পক্ষে এক বৎসর কাল থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে বিধান আছে, রোজা একাধারেই তাহা ; বরং তাহার উপরেও কিছু।* প্রকৃত ব্রাহ্মণ তিনি,

---

* গীতা বলে,—

শমোদমোস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

অর্থাৎ শম, দম, তপস্যা, শুদ্ধি, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য (এই কয়টী) ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

মুসলমানগণ দিবসের পঞ্চ-সন্ধ্যায় পাঁচবার উপাসনা ছলে, শম, দম, তপস্যা এবং শুদ্ধি অহরহ সঞ্জীবীত রাখিতেছে। আস্তিক্য তাহাদের সার ধর্ম্ম। ক্ষমা ও সরলতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানব হৃদয়ে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে, মুসলমানগণ ততক্ষণ, সেই হৃদয়ে ঈমানের পূর্ণ প্রভাব স্বীকার করে না; যেহেতু ঈমান এবং উপরোক্ত গুণ, নিচয়ের মধ্যে পরস্পর রক্ত

যিনি এই সমস্ত পালন করেন। চরিত্রের উৎকর্ষই যখন ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য এবং ইহার প্রভাবেই যখন মানুষ উন্নত হইয়া থাকে, তখন মুসলমান এই স্থান পাইবে না, তাহার কোন অর্থ নাই।†

এখন কথা রহিল, যে দেশে চাঁদ দেখা যায় না বা দিবারাত্রি প্রভেদ করিবার উপায় নাই, (যথা Lapland) সেখানে রোজা করিবে কি করিয়া ? পাদ্‌রি সাহেবগণ এই প্রশ্ন দ্বারা অনেক সময় মুসলমানদিগকে জব্দ করিতে চেষ্টা করেন। আমরা বলি, এই প্রশ্নের কোন মাহাত্ম্য নাই। কোরআনে স্পষ্টই বলা হইয়াছে,—

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

অর্থাৎ যাহারা রমজান মাস আসিয়াছে জানিতে, পার তাহারা তখন রোজা রাখিবে।

ল্যাপলেণ্ড প্রমুখ দেশগুলিতে যদি চাঁদ না দেখা যায়, এবং দিবারাত্রির পার্থক্য উপলব্ধি না হয়, তবে সে দেশের লোকের রোজা এই প্রকার হইবে না।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, আমাদের অনেক 'রওশনখেয়াল' মুসলমান ভ্রাতা নাকি রোজার মধ্যে কোন উপকার নিহিত আছে বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং রোজাও রাখেন না। তাঁহাদের মতে-উপবাস করিবে, সে যাহার আহার্য্য নাই। তাঁহারা যদি একটু কষ্ট করিয়া রোজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তবে আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের এই ভ্রম দূর হইবে। এবার রোজা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ফুরাইয়া গেলে জীবনে আর পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। তাই অনুরোধ একবার সকলেই এদিকে একটু মনোযোগ প্রদান করিবেন।

মোহাম্মদ মুজাফফর উদ্দিন।

মাংস সম্বন্ধ। পরন্তু উপযুক্ত জ্ঞান অর্জ্জন না করিলে, এসলাম সম্যক উপলব্ধি করা যায় না; সুতরাং উহা বাধ্য বাধকতা মূলক কর্ত্তব্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। যাহার মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী যে পরিমাণে কম, তাহার ঈমান বা ধর্ম্মবিশ্বাস অথবা আস্তিক্য (ايمان) সেই হিসাবে খর্ব্ব।

অনুশীলন থাকিলেও সময় সময় তাহার উপর পূর্ণবেগ প্রয়োগ না করিলে, জানা বিষয়েও একটা জড়তা আসে—কেমন একটা ভুল ভ্রান্তির সূচনা হয়; এই জন্য সৈন্যদলে সর্ব্বদা কুচ কাওয়াজ চলিত থাকিলেও, কিছুদিন পর পর মক্‌ফাইট (Mock fight-কৃত্রিম যুদ্ধ) হয়। উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষা সঞ্জীবীত রাখা। এসলামের বার্ষিক ব্রত রোজাও ঠিক সেইরূপ—বরং আরও একটু বিশেষত্ব সম্পন্ন। সৈন্য তৈয়ার রাখা হয়, রাজ্যের অজানিত ভবিষ্য-শত্রুর আক্রমণ দমন করিবার জন্য। কিন্তু দেহ-রাজ্যের শত্রু যে প্রবৃত্তি নিচয়, উহারা নিয়তই মানবজীবনের মানবত্ব টুকু কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যস্ত। নমাজ তাহা রক্ষা করে—উহাদিগকে দূর করিয়া দিয়া। আর রোজা আসিয়া বৎসরে একবার করিয়া সেই কার্য্যে পূর্ণ বিজয় লাভ ঘটাইয়া দিয়া যায়।

† মুসলমান প্রকারান্তরে উন্নত ব্রাহ্মণ। কেননা সাধারণ ব্রাহ্মণ সাংসারিক কার্য্য পূর্ণ ভাবে সম্পাদন করিতে অক্ষম; পক্ষান্তরে মুসলমান একাধারে উপযুক্ত সংসারী এবং উপযুক্ত ব্রহ্মচারী। মানবজীবনে এতটুকু না হইলে পূর্ণত্বের অনেকটা বাকী থাকিয়া যায়। শুধু যাগ যজ্ঞ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। উহা আত্মোৎকর্ষ সাধনের উপাদান মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আল্‌-এস্‌লাম।

১ম ভাগ | শ্রাবণ, ১৩২২ | ৪র্থ সংখ্যা

কোরআন শরীফ ও বিজ্ঞান।

কোরআনশরীফ কোন বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক নহে, ইহা ধর্ম্ম পুস্তক। কোরআনের প্রথম অধ্যায়ে যে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা اهدنا الصراط المستقيم 'আমাদিগকে সোজা পথ দেখাও'। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই প্রার্থনার উত্তর স্বরূপ আল্লাহ্‌তালা বলিতেছেন, الم ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 'আলিফ লাম মীম, এই (মুল) গ্রন্থ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; ধর্ম্মভীরু দিগের জন্য ইহা পথ প্রদর্শক।'

কোরআন শরীফ কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তক না হইলেও, ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে। কোরআনে আল্লার মাহাত্ম্য বর্ণনের জন্য প্রাসঙ্গিক রূপে এরূপ অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহা আশ্চর্য্য রূপে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া যায়। যদি দুই এক স্থানে সামান্য কিছু অমিল দেখা যায়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের অপূর্ণতা বশতই। পূর্ব্বে সাধারণে বিশ্বাস করিত, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। কোপার্ণিকসের পর হইতে আর কোন বিজ্ঞব্যক্তি সে মত পোষণ করেন না। আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি সম্বন্ধে পুরাতন বৈজ্ঞানিক মতের (theory) স্থানে এক্ষণে নূতন মত (theory) সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়াছে, তাহাও যে পরে পরিত্যক্ত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এই মত গুলি যে অভ্রান্ত সত্য নয়, তাহা প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই জানেন। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক সত্যের (fact) সহিত কোরআনের কোন বিরোধ নাই। তবে যদি কিছু বিরোধ থাকে, প্রথমতঃ তাহা বৈজ্ঞানিক 'মতের' (theory) সহিত। দ্বিতীয়তঃ তাহা প্রাচীন টীকাকারগণের নিজেদের বুদ্ধি-অনুযায়ী ব্যাখ্যায়।

লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ (Nebular theory) এবং কোরআন।

বিশ্ব জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস (Laplace) এক মত (theory) প্রচার করেন, তাহা নীহারিকাবাদ বলিয়া খ্যাত। সেই মতে সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি সমন্বিত সৌর-জগত এক সময়ে এক বৃহৎ অত্যুষ্ণ বাষ্পাকার নীহারিকা পুঞ্জ ছিল। বর্ত্তমান সূর্য্য সেই বৃহৎ পিণ্ডের অক্ষ স্থানীয় ছিল। নীহারিকা পুঞ্জ স্বীয় অক্ষের চতুর্দ্দিকে লাটিমের ন্যায় আবর্ত্তন করিত। তেজোবিকিরণ বশতঃ তাহা সঙ্কুচিত হওয়ায় গতিবিজ্ঞানের (dynamics) সাধারণ নিয়ম বশতঃ তাহার আবর্ত্তনের গতিও অসাধারণ বৃদ্ধি পায়। তখন কেন্দ্র-বিমুখ শক্তি (centrifrugal force)-প্রভাবে তাহা হইতে এক এক অংশ অঙ্গুরীয়-আকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ হীনতেজ ও সঙ্কুচিত হইয়া এক এক গ্রহে পরিণত হইয়াছে। গ্রহ হইতে তাহার তরলাবস্থায় উক্ত প্রকারে উপগ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে। কেন্দ্র-বিমুখ-শক্তি-প্রভাবে গ্রহ উপগ্রহগণ পৃথক হইয়াও কেন্দ্রাভিমুখ শক্তি (centripetal force)-প্রভাবে তাহাদের পূর্ব্ব কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। এইরূপে গ্রহগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ও উপগ্রহগণ স্বীয় গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। যে গ্রহ সূর্য্য হইতে যতদূরে, তাহা তত প্রথমে নীহারিকা পিণ্ড হইতে পৃথক হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমশঃ ইন্দ্র (Neptune), বরুণ (Uranus, শনি, বৃহস্পতি, ক্ষোদিষ্ঠ গ্রহগণ মঙ্গল, পৃথিবী, হইতে (চন্দ্র) শুক্র, বুধ ও বর্ত্তমান সূর্য্য উৎপন্নহইয়াছে।

এই নীহারিকাবাদ একটি মত মাত্র। ইহার অভ্রান্ততা কোন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বা গণিত শাস্ত্রের গণনা দ্বারা নিরূপণ করা যাইতে পারে না। তথাপি কোরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব আশ্চর্য্যরূপে এই মতের সহিত মিলে। নীহারিকা পুঞ্জকে বোধ হয় কোরআনে ধূম বলা হইয়াছে।

ثم استوی الی السماء وهی دخان

পরে তিনি 'সামার' দিকে মনোযোগ করিলেন এবং তাহা ধূম ছিল। (৪০।২।১০) সমস্ত সৌর জগৎ যে মিলিত ছিল, কোরআনে এরূপ উল্লেখ আছে।

ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقنا هما

'কথা এই যে 'সামাওয়াত' ও পৃথিবী উভয়ে মিলিত ছিল অনন্তর আমি সেই দুইকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি।' (২১।৩।৩০) এই অনুবাদ মহাত্মা এবনে আব্বাসের মতানুযায়ী। তফসীর কবীর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

عن ابن عباس (رضی الله عنهم) ان المعنی كانتا شيئا واحدا ملتزمتين ففصل الله
بينهما و رفع السماء الی حيث هی واقر الارض

এবনে আব্বাস হইতে কথিত হইয়াছে,—ইহার অর্থ তাহারা দু'য়ে মিলিত একটি পদার্থ ছিল। পরে আল্লাহ্ উভয়ের মধ্যে দূরত্ব আনিলেন এবং 'সামাকে' তাহার স্বস্থানে উন্নমিত করিলেন এবং পৃথিবীকে (স্বস্থানে) স্থির রাখিলেন।

নীহারিকাবাদ অনুযায়ী মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি পৃথিবীর পূর্ব্বে এবং চন্দ্র, শুক্র, বুধ ও বর্ত্তমান সূর্য্য তাহার পরে উৎপন্ন। এই জন্য কোরআনে একস্থানে পৃথিবীকে সামার পরবর্ত্তী এবং অন্য স্থানে আবার তাহাকে সামার পূর্ব্ববর্ত্তী বলা হইয়াছে। পৃথিবীর পরে সে সামার সপ্ত সংখ্যাপূর্ণ হইয়াছে, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে।

بنيها ◎ رفع سمكها فسوّٰها ◎ واغطش ليلها و اخرج ضحيها ◎ والارض بعد ذالك دحيها ◎

(আল্লাহ্) তাহাকে (সামাকে) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি তাহার উচ্চতাকে সমুন্নত করিয়াছেন। পরে তাহাকে গঠিত করিয়াছেন, এবং তাহার রাত্রি অন্ধকার করিয়াছেন এবং তাহার দিনের আলো প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ইহার পরে পৃথিবীকে বিছাইয়াছেন। (৮০।২।২৭—৩০)

هوالذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوا هن سبع سموات ◎

সেই তিনি যিনি, তোমাদের জন্য পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে সামার দিকে মনোযোগ করিলেন, পরে তাহাদিগকে সপ্ত সামাওয়াত ঠিক করিলেন। (১।৩।২৯)

এই আয়াতে একটি চমৎকার লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে, সামা এক বচন কিন্তু তাহার সর্ব্বনাম هن (তাহাদিগকে) বহু বচন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, একটি সামাকে সপ্ত সংখ্যক বলা হয় নাই। কিন্তু পৃথিবীর পূর্ব্বের ও পরের সমুদয় সামা দ্বারা এই সপ্ত সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে।

নীহারিকাবাদ দ্বারা ও অঙ্গীকৃত **spectrum analysis** (রশ্মি বিশ্লেষণ) দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহগণ প্রায় এক প্রকার জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত। কোরআনেও আছে—

الله الذي خلق سبع سموات و من الارض مثلهن ط

তিনি আল্লাহ, যিনি সপ্ত সামাওয়াতকে এবং পৃথিবী সম্বন্ধে তাহাদের সদৃশ সৃষ্টি করিয়াছেন। (৬৫।২।১২)।

কোরআনের অনেক স্থানে সামাওয়াত ও পৃথিবী ছয় দিবসে সৃষ্ট হইয়াছে—বলা হইয়াছে। যেমন :—

و لقد خلقنا السموات والارض وما بينهما فى ستة ايام وما مسنا من لغوب ◎

এবং নিশ্চয় আমি সমাওয়াত এবং পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যাহা কিছু আছে, ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি এবং কোন ভ্রান্তি আমাকে স্পর্শ করে নাই। (৫০।৩।৩৮)

এই সকল স্থানে ايام (দিন এক বচনে يوم) শব্দের অর্থ কি ? ইহা কি (১) রবি, সোম ইত্যাদির ন্যায় দিন কিংবা (২) সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সময় (৩) অথবা অন্য কিছু। আমরা কোরআন শরীফের কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে এই يوم শব্দের অর্থ স্পষ্ট হইবে।

مالک یوم الدین

বিচার দিনের (day of judgment or Dooms day) রাজা (১।১।৩)

یوم تأتی السماء بدخان مبین

যে দিন সামা দৃশ্যমান ধূম আনয়ন করিবে। (দোখান ৪৪।১।১০)

تعرج الملئکة والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة

যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর—সেই এক দিনে তাঁহার দিকে স্বর্গীয় দূতগণ ও আত্মা সমুত্থান করে। (মাআরেজ, ৭০।১।৪)

لا اقسم بیوم القیمة

সত্য সত্যইআমি মহাবিচারের (কেয়ামতের) দিনের শপথ করিতেছি। (কেয়ামাহ ৭০।১।১)

উপরি-উদ্ধৃত স্থান কয়েকটি হইতে স্পষ্ট বোধ হইবে, যে یوم শব্দের অর্থও উক্ত রবি, সোম প্রভৃতি এবং সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত গমন কাল পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য অর্থ আছে। এই কয়েকটি স্থানে یوم (দিন) শব্দের যে অর্থ ستة ایام (ছয় দিন) শব্দের ایام (দিন সকল) শব্দেরও সেই অর্থ। এই সকল স্থানে یوم শব্দের অর্থ কালের অংশ, যাহাতে কিছু সংঘটিত হয়। অতএব فی ستة ایام 'ছয় দিনে' ইহার প্রকৃত অর্থ ছয় কালে (stages of time)। বিখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী তাঁহার ভাষ্য তফসীর কবীরের সুরা সাজদাতে ستة ایام 'ছয় দিন' এর এই প্রকার ভাষ্য করিতেছেন যথা :—

وقد ذکرنا ان قوله تعالی فی ستة ایام اشارة الی ستة احوال فی نظر الناظرین ذالک لان السموات والارض و بینهما ثلثة اشیأ ولکل واحد منها ذات و صفات فنظراً الی خلقه ذات السموات حالة و نظراً الی خلقا صفاتها اخرا او نظرا الی ذات الارض و الی صفاتها کذلک و نظراً الی ذوات ما بینهما و الی صفاتها کذلک فهی ستة اشیاء و ستة افعال و انها ذکرالایام لان الانسان اذا نظرا الی الخلق رأه فعلا والفعل ظرفه الزمان والایام اشهر الازمنة والا فقبل السموات لم یکن لیل ولانهار وهذا مثل مایقول القائل لغیره ان یوم ولدت فیه کان یوماً مبارکا

وقد یجوز ان یکون ذالک قد ولد لیلا ولا یخرج عن مراده لان المراد هوالزمان الذی هو ظرف ولادته—جلد ٦ صفحه ٧٥١

"আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আল্লাহ্ তালার উক্তি فی ستة ایام 'ছয় দিনে' ইহা দর্শকের দৃষ্টিতে প্রতীয়মান ছয় অবস্থার (احوال) প্রতি ইঙ্গিত সূচক। উহা এই জন্য যে, সামাওয়াত ও পৃথিবী এবং তাহাদের মধ্যস্থ তিনটি পদার্থ এবং তাহাদের প্রত্যেকের একটি মূল বস্তু (ذات-Substance) ও গুণাবলী (صفات) আছে। অতএব সামাওয়াতের মনাস্তর (ذات)

সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি করিলে এক অবস্থা এবং তাহার গুণাবলীর দিকে দৃষ্টি করিলে এই প্রকার উভয়ের মধ্যস্থ পদার্থের মূলবস্তু ও গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিলে অন্য প্রকার। এইরূপ ছয়টি পদার্থ ও ছয়টি অবস্থা। দিনের (ایام) উল্লেখ এই জন্য হইয়াছে যে, যখন মনুষ্য জগতের দিকে দৃষ্টি করে, তখন তাহাকে কোন প্রকার ক্রিয়মান অবস্থায় দেখিয়া থাকে এবং কার্য্যসময়ের অবস্থান ভূমি এবং দিন সর্ব্ববিধ সময়ের মধ্যে বিখ্যাত। নচেৎ সামাওয়াতের পূর্ব্বে রাত্রি দিন কিছুই ছিল না। একজন যেমন অন্যের প্রতি যাহা বলিয়া থাকে,—নিশ্চয় যে দিন তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে তাহা উত্তম দিন ছিল।' যদি সে ব্যক্তি রাত্রিতে (জন্মগ্রহণ) করিয়া থাকে তাহা হইলেও এই উক্তি সিদ্ধ—অর্থ বিরুদ্ধ নহে, যেহেতু এস্থানে দিনের অর্থ যে কালে (زمان) এই ঘটনা ঘটিয়া ছিল, কোন সীমাবদ্ধ সময় নহে।

উক্ত তফসীরেরে দ্বিতীয় স্থানে সূরা কাফের পূর্ব্বস্থিত আয়াতের ভাষ্যে ইমাম রাজী বলিতেছেন :—

وقد ذكرنا تفسير ذلك فى الم السجدة وقلنا ان الاجسام ثلاثة اجناس احدها السموات ثم حركها و خصصها بامور و مواضع وكذالك الارض خلقها ثم دحاها وكذالك ما بينهما خلق اعيانها واصنافها فى ستة ايام اشارة الى ستة اطوار والذى يدل عليه و يقرره هو ان المراد من الايام لا يمكن ان يكون هو المفهوم فى وضع اللغة لان اليوم عبارة فى اللغة عن زمان مكث الشمس فوق الارض من الطلوع الى الغروب وقبل خلق السموات لم يكن شمس ولا قمر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال يوم يولد للملك اين يكون سرور عظيم و يوم يموت فلان يكون حزن شديد و ان اتفقت الولادة اوالموت ليلا ولا يتعين ذلك ويدخل فى مراد العاقل لانه اراه باليوم مجرد الحين والوقت اذا علمت الحال من اضافة اليوم الى الافعال فافهم ما عند اطلاق اليوم فى قوله ستة ايام * * * * * و اما ما قاله اليهود ونقلوه من التوراة فهو اما تحريف منهم اولم يعلموا تاويله و ذلك لان الاحد والاثنين از منة متميز بعضها عن بعض فلو كان خلق السموات ابتدئ يوم الاحد لكان الزمان متحققا قبل الاجسام والزمان لاينفك عن الاجسام فيكون قبل خلق الاجسام اجسام اخر فيلزم القول بقدم العالم وهو مذهب الفلاسفة—جلد ٧ - صفحه ٤٦٤

"ইহার ভাষ্য আলিফ লাম মিম সেজদায় বলিয়াছি। উহাতে বলিয়াছি, জড় পদার্থ তিন জাতীয়। প্রথম সামাওয়াত, অনন্তর খোদা তাহাকে আবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং তাহার কার্য্য ও

অবস্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; এইরূপ পৃথিবী, তাহাকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, পুনঃ তিনি তাহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং এইরূপে উভয়ের মধ্যস্থিত পদার্থ তিনি তাহার মূল পদার্থ عين ও গুণাবলী صنف (সর্ব্বশুদ্ধ) ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদ্বারা ছয় প্রকারের (اطوار) প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইহার দ্বারা প্রমাণ এবং তর্ক করেন যে, তাহা দিবস অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তিনি উক্ত শব্দের অবস্থা দৃষ্টে উক্ত অর্থ যে সম্ভব, তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। যেহেতু অভিধানে يوم (দিন) পৃথিবীর উপর উদয় হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যের গতিকে বলা হয়। কিন্তু সামাওয়াতের সৃষ্টির পূর্ব্বে চন্দ্র সূর্য্য কিছুই ছিল না। বস্তুতঃ يوم (দিন) শব্দ সময় (وقت) অর্থে প্রযুক্ত ও লক্ষীকৃত হয়; যেমন বলা হইয়া থাকে, যেদিন রাজার পুত্র হইবে, সে দিন কি মহা আনন্দ হইবে এবং যে দিন অসুস্থ ব্যক্তি মরিবে, অত্যন্ত শোক হইবে, যদিও জন্ম কিংবা মৃত্যু রাত্রিতে সংঘটিত হইতে পারে এবং এ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্টি নাই, সুতরাং বুদ্ধিমান এই প্রকারে বুঝিবেন। কেন না তিনি (يوم) 'দিন' শব্দ দ্বারা কালের বা সময়ের এক অংশ লক্ষ্য করেন। কার্য্যের সহিত দিনের সম্বন্ধ দ্বারা যখন তুমি 'অবস্থা' حال জানিলে তখন 'ছয় দিন' শব্দের দিনের অর্থ কি তাহা বুঝিয়া লও। * * পরন্তু যাহা ইহুদীগণ বলেন এবং তওরাত হইতে উদ্ধৃত করেন, হয় তাহা কদর্থ (تحريف) কিংবা তাঁহারা তাহার ব্যাখ্যা বুঝেন নাই। কেন না কালের প্রথম ও দ্বিতীয় হওয়া এক হইতে অন্যের পার্থক্য দ্বারা হয়। যদি সামাওয়াতের সৃষ্টি রবিবারে হইত, তবে জড়ের পূর্ব্বে সময়ের সত্বা মানিতে হয়। কিন্তু সময় জড় হইতে পৃথক নহে। অতএব জড়ের পূর্ব্বে অন্য জড়ের অস্তিত্ব মানিতে হয়, তাহা হইলে জগতের প্রাচীনত্ব মত (قدم) স্বীকৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা দার্শনিকদিগের মত—ইসলামের নহে।

আমরা উপরে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে প্রতীয়মাণ হইবে যে, ছয় দিনের অর্থে ছয় অবস্থা احوال বা ছয় প্রকার (اطوار)। অতএব 'ছয় দিনে' সমাওয়াতের ও পৃথিবীর সৃষ্টি আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধী নহে।

মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ।

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব।

(DOCTRINE OF ATONEMENT.)

খৃষ্টীয়ানগণ বলেন, "পাপের জন্য শাস্তির বিধান করিয়া সদাপ্রভু সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যই করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ চিরকাল যদি কেবল শাস্তিই ভোগ করে, তবে সদাপ্রভুর দয়াগুণটা অবিকসিত অর্থাৎ গুপ্ত থাকিয়া যায়। তাই তিনি স্বীয় পুত্র যীশুর মধ্য দিয়া দয়ার ভাবটা প্রকাশ করিয়া নিজের সর্ব্বশক্তিমানতা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। সোজাসুজি ক্ষমা করা তাঁহার সাধ্যের অতীত নহে; কিন্তু তাহাতে দোষ এই ঘটে যে, এরূপ কার্য্যে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠার কোনই মাহাত্ম্য থাকে না।" বিষয়টা আমরা বুঝিলাম না। না বুঝার কারণ কি, নিম্নে যথাক্রমে তাহা বর্ণন করা হইল।

(ক)

খৃষ্টীয়ানদের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায়, দয়া এবং ন্যায়নিষ্ঠা এক সঙ্গে মিশে না বা মিশিতে পারেনা। মানুষ পাপ করিয়া সদাপ্রভুর রাগ উৎপন্ন করিল, এবং এই রাগের প্রভাবেই শাপগ্রস্ত এবং শাস্তির অধীন হইল। এই অবস্থায় স্বীকার করিলাম, সদাপ্রভুর পক্ষে শাপ দেওয়া খুব ন্যায় সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন মানুষেরও কতকটা ভোগ হইয়া গেল এবং শাপেরও স্বার্থকতা আংশিক ভাবে পূর্ণ হইল, তখন মাফ করিয়া দিলে ত উভয় কুলই রক্ষা পাইল। প্রভুর আদেশ এবং উপদেশের বিরুদ্ধে 'দুঃসাহস করিয়া' কোন দাস যদি অন্যায় কার্য্য করে, তবে প্রভু রাগ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন। দাস বেচারাকে বাচ্চা কাচ্চা লইয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত দুর্গতির একশেষ ভোগ করিতে দেখিলে যদি দয়ালু প্রভুর মনে দয়ার সঞ্চার হয়—তিনি সেই হতভাগ্যকে ডাকিয়া আনিয়া যদি আবার চাকরী দেন, তবে এই কার্য্যে প্রভুর ন্যায়ের মর্য্যাদা নষ্ট হইল বলিয়া ত কেহ ফতোয়া দেয়না! সকলে বরং তাঁহাকে "বড় দয়ালু" বলিয়াই প্রশংসা করে। মানুষ পুরুষানুক্রমে কয়েক হাজার বৎসর শাস্তি ভোগ করার পর সদা প্রভু ন্যায়ের দায়ে ইচ্ছা সত্বেও দয়া প্রকাশ করিতে পারিলেন না! এই যে এক হেয়ালী, ইহার গুণে সদাপ্রভুর মানমর্য্যাদা কতটা বজায় থাকিল, পাদ্রী সাহেবগণ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

(খ)

নাহয় স্বীকার করিলাম, পরমেশ্বর যেমন মহান, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতাও তেমনই উচ্চ দরের। মানুষের সহিত তাঁহার কোন বিষয়েই তুলনা খাটে না। আচ্ছা পরমেশ্বর ত চির মঙ্গলময়, তাঁহার কোন কার্য্যই অমঙ্গল-জনক নহে। মানুষ পাপী হইলে তাহাকে শাস্তির অধীন করাতেও এক মহামঙ্গল এই যে, সে শাস্তির ভয়ে আর পাপ করিতে সাহস

করিবেনা। তা বেস, কিন্তু প্রকৃত পাপীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের ভান করিয়া একজন নিরীহ নিরপরাধকে মারধর করা অবশ্যই ন্যায়ের বহির্ভূত।

(গ)

ন্যায়পরায়ণ তাহাকে বলে, যাহার প্রভাবে কেহ অপর কর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, তাহা পূরণ করিতে ততটুকু গ্রহণ করে, যতটুকু তাহার ক্ষতি হইয়াছে। মানুষের পাপে সদাপ্রভুর ত কোন ক্ষতিই হয় নাই, এ অবস্থায় সমগ্র মানব মণ্ডলীর জীবন লওয়া বা উহাদের একজন প্রতিনিধিকে মারিয়া ফেলা ন্যায়পরায়ণতা নহে, ইহাকে স্বেচ্ছাচার বলিতে হইবে। ক্ষমতা যাহার আছে, এমনই ভাবে তাহা খাটান তাহার উচিত নহে। দুইজন খুনির বিচারের পর ফাঁসীর হুকম হইলে, বিচারপতি তাহাদের সেই নিরাশা ব্যঞ্জক কাঁদো কাঁদো মুখ দেখিয়া যদি দয়াবিষ্ট হন, আর একজন উকীল বা ব্যারিষ্টার যদি সুযোগ বুঝিয়া সেই সময় তাহাদের প্রাণ ভিক্ষা করেন, তবে সেই উকীল বা ব্যরিষ্টারকে তাহাদের বদলে ফাঁসি দিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে,বিচারপতির ন্যায়পরায়ণতার বিজয়ডঙ্কা খুব বাজিবে! বিচারপতি ধরুন স্বয়ং সম্রাট—যাঁহার উপর ক্ষমতা চালনার জন্য আর একজন উপরিস্থ কর্ত্তা নাই।

৩।

যাঁহারা বলেন, ন্যায়-নিষ্ঠা বর্ত্তমানে দয়া গুণের বিকাশ হইতে পারে না, গুণ-বিচারে তাঁহাদের একটা মহা ভ্রম দেখা যায়। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, ন্যায়নিষ্ঠা দয়াগুণের প্রতিরোধক, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বেচ্ছাচার ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিরোধক—বরং অত্যাচারেরই প্রশ্রয়দাতা। ইহাও নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত সকলের দ্বারা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে।

(ক)

'ক' এক জন ছাত্র, 'খ' তাহাকে শিক্ষা দেন। 'ক' আলস্য করিয়া লেখা পড়া শিখে না, 'খ' বলিয়া দিলেন এই প্রকার আলস্য তাহার ভবিষ্যতের জন্য খুব খারাব হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু 'ক' ইহা শুনিয়াও শুনিল না। এই অবস্থায় যদি 'খ' 'ক' এর প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে শাসন না করেন, তবে ন্যায়ের মর্য্যাদা থাকে না। বস্তুতঃ এরূপ স্থলে দয়া এবং ন্যায় এক সঙ্গে মিশিতে পারেনা। এক্ষণে বিচার্য্য এই, দয়া কি ইহাকে বলে? "আপাতমধুর পরিণাম বিরস" যে কার্য্য, তাহার প্রশ্রয় দেওয়া দয়াও নহে—ন্যায় ও নহে। কর্ত্তব্যে যে ব্যক্তি উদাসীন, বিনাশ তাহার জন্য অনিবার্য্য। জ্ঞানীর উচিত তাহার ভালর জন্য, একটু কঠোরতা অবলম্বন করা, ইহাই ন্যায় এবং এই ন্যায়নিষ্ঠাই প্রকৃত দয়া।

(খ)

যদি শিক্ষক 'ক'র প্রতি শাস্তির ব্যবস্থা করেন, তবে দেখিবার বিষয় এই থাকিল যে, 'ক' বাস্তবিক সে শাস্তি পাইবার যোগ্য কিনা? 'ক' হয়ত প্রাইমারী শিক্ষার যোগ্য, শিক্ষক

তাহাকে কলেজের পাঠ্য পড়িতে দিলেন। এ অবস্থায় 'ক' দুর্বোধ্য পাঠ পড়িতে নাপারিয়া এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। এমন দশা হইলে, শিক্ষকের ন্যায়সঙ্গত শাস্তিদানও অন্যায় হইয়া পড়ে। মোট কথা আমরা সহজ জ্ঞানে যে ন্যায় ও দয়ার আভাষ পাই, তাহা ন্যায়ও নহে দয়াও নহে। এই জন্য এই দুইটীর একত্র সমাবেশ সম্ভবপর নহে বলিয়া মনে করি। প্রকৃত ন্যায় তাহাকে বলে, যাহার ফলে কোন এক ব্যক্তি নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কার্য্যের ভার পায় এবং সে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে আলস্য এবং উদাসীনতা প্রকাশ করিলে, তাহার শুভাকাঙ্খীর উচিত, উপযুক্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়া তাহাকে সেই কার্য্য করিতে বাধ্য করে। ইহারই অপর নাম দয়া।

৪।

ন্যায় এবং দয়ার একত্র সম্মিলন যে দুধে চিনির ন্যায় উপাদেয়, এবং এই দুইটী গুণ যে একত্র মিশিতে কোন বাধা হয় না, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

'ক' 'খ'কে কোন একটী কার্য্যের জন্য এক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিল। 'খ' প্রাণ-পণে খাটিয়া তাহা শেষ করিলে যদি, 'ক' তাহাকে টাকার যায়গায় পোনর আনা দেয়, তবে তাহা অন্যায় বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যদি পাঁচসিকা দিয়া বিদায় করে, তবে সে স্থলে দয়া করা হয়। এই দয়া নিশ্চয়ই ন্যায়ের প্রতিরোধক নহে।

দয়া এবং ন্যায়, এই দুই গুণের একটীর অভাবে অপরটীর বিকাশ অসম্ভব, যথা:—'ক' খ'র কার্য্য করিতে যাইয়া দৈনিক বেতনের চুক্তি করিল। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পূর্ণ শেষ করিতে না পারায়, রাত্রিকালে কিছুক্ষণ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিল। মজুরী দান কালে 'খ' 'ক'কে চুক্তির টাকা দিয়া বিদায় করিলে, ন্যায়তঃ তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। যেহেতু সে বেশী কার্য্য করিয়া কম মজুরী পাইল। আর যদি বিচারানুযায়ী ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া হয়, তবে একাধারে দয়া এবং ন্যায়, উভয়েরই মর্য্যাদা উত্তমরূপে রক্ষা পায়। পরন্তু এই ন্যায় দয়াগুণের বিকাশ সাধক—বরং প্রকারান্তরে দয়াই ন্যায়কে কার্য্যক্ষেত্রে টানিয়া আনে।

মানুষ শয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে। যখন সে বুঝিতে পারে যে, তাহার এই কার্য্য অন্যায় হইয়াছে, তখন সে তাহার জন্য অনুতাপ করে। যদি চরিত্র শোধনই শাস্তির উদ্দেশ্য হয়, তবে এই সময় পরমেশ্বর ন্যায়ত তাহাকে ক্ষমা করিতে বাধ্য। শাস্তির ভয়ে দয়া প্রার্থী যখন কত আশা করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হয়, তখন রাজা তাহাকে জরিমানা করিয়া সুবিচারক ও দয়ালু বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। পাপীর জন্য যিশুর প্রাণ বধ এবং তাঁহাকে নরকে দিয়া পরমেশ্বরও এই রাজার শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছেন।

যদি তিনি ন্যায়ের অনুরোধে এ কাজ করিয়া থাকেন, তবে বলিতে হইবে যে, তাঁহার মধ্যে দয়া আদৌ নাই। যত দয়া সব যিশুর ভাণ্ডারে পূর্ণ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে পাপীকে অনুতাপ

করিয়া চরিত্র সংশোধন করিবার সুবিধা না দিয়া, যিশুও দয়ার তাড়নায় অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন।

৫।

যিশু-ভক্তগণ বলেন, যিশুর আত্ম-বলিদান ব্যতিরেকে মানুষের পাপ মোচন হইবার আর কোনই পন্থা ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে এ কথার স্বার্থকতা কতদূর আছে, তাহা আমরা বুঝিনা। মানুষ গুরু ভোজন বা অন্যায় আহার দ্বারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপ করে। সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ খানিকটা জমানিজল, নেমকে ছোলায়মানী বা অন্য কোনরূপ ঔষধ সেবন করিলে, পেটের অসুখের শান্তি হয়। যদি অসুখ হওয়ার পূর্ব্বেই অন্যায় আহারের জন্য কোন একটা ঔষধ ব্যবহার করা যায়, তবে আর অসুখই হয় না। এই প্রকার অসুখের কারণ প্রকৃতির বিধানব্যতিক্রমরূপ পাপ। সদাপ্রভু এই পাপের শাস্তির জন্য যখন প্রকৃতির ভিতরেই একটা উপায় রাখিয়া দিতে পারিলেন, তখন অন্যান্য পাপের জন্য একটা সৃষ্টি ছাড়া অপ্রাকৃতিক নিয়ম করিয়াছেন, এ কথা কি করিয়া বুঝিব! যিশু জগতে আত্মিক পাপের প্রতিকার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য ছিল, উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা মানবের আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা। নিজের আত্মার উপর কষ্টের বোঝা চাপাইয়া সে কার্য্য সাধিত হওয়া বা সাধন করা অসম্ভব। চিকিৎসক কোন রোগীর শরীরে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক দেখিয়া, নিজের শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, সেই রোগ দূর হওয়া কিছুতেই সম্ভব বোধ হয় না। এমন তর কার্য্যের দ্বারা, চিকিৎসক নিজেই বরং চিকিৎসার অযোগ্য বাতুল বা বিকৃতমস্তিষ্ক প্রতিপন্ন হইবেন। যাহা হউক, দৃষ্টান্ত পরম্পরায় ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যিশুর আত্মদান সত্য হইলেও, জগতের পাপ মোচনের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ বৃথা।

৬।

প্রাকৃতিক বিধানের হিসাবে দেখা যায়, উৎকৃষ্ট পদার্থের মঙ্গলের জন্য নিকৃষ্ট পদার্থ বলিদান করা হইয়া থাকে। জীবের প্রাণ বাচাইবার জন্য ক্ষেত্রের শস্য এবং গাছের ফল বলি দেওয়া হয়, বিপক্ষের আক্রমণ কালে দেশ রক্ষক রাজা এবং রাজপুরুষগণের জন্য কতকগুলি সৈন্যের প্রাণ বলিস্বরূপ নষ্ট করা হয়। প্লেগ হইতে জনসাধারণের প্রাণ বাঁচাই-বার জন্য লক্ষ লক্ষ ইন্দুর মারিয়া ফেলা হইতেছে, নানাবিধ রোগের উৎপত্তিজনক কীট গুলিকে বোতল বোতল ফিনাইল ছিটাইয়া এক মুহূর্ত্তে মালেকোলমাউতের হাতে সপিয়া দেওয়া হইতেছে। এইরূপ সাপ বাঘ প্রভৃতি কত কিছু বধ করিয়া মানুষের প্রাণ নিরাপদ করা হইতেছে। ফলপত্র জীবের চেয়ে উৎকৃষ্ট নহে এবং সৈন্য সেনাপতিও রাজা-রাজপ্রতিনিধির সমতুল্য হইতে পারে না। পরন্তু সাপ, বাঘ, ইন্দুর এবং অন্যান্য ক্রিমি কীট মানুষের সমান নহে বলিয়াই উহাদের প্রাণ উপেক্ষিত হয়। খৃষ্টীয়ানগণ যিশুকে যে স্থান (ঈশ্বরত্ব) দান করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিলেও, পবিত্রতার হিসাবে তিনি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। এই অবস্থায় তাঁহাকে মারিয়া সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা—ঠিক ক্ষত স্থানে

উৎপন্ন ক্রিমির প্রাণ রক্ষার্থ রোগীর চিকিৎসা না করার অনুরূপ। এমন অযৌক্তিক ধর্ম্ম বিশ্বাস (?) কোন বিশুদ্ধমস্তিষ্ক ব্যক্তির গ্রাহ্য হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

৭।

প্রায়শ্চিত্ত-তত্বে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, যিশুভক্তগণ জগৎময় ঢেডরা পিটিয়া ফিরেন যে, মানুষ যিশুতে নির্ভর করিলে আর তাহাকে আইন কানুনের বাধ্য হইতে হয় না। মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, যিশু নিজে তাহা সবই শেষ করিয়া গিয়াছেন।* ইহাদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে যিশু যাহা করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তগণের জন্য তাহা কর্ত্তব্য নহে। যিশু উপাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহার ভক্তগণ তাহা করিবেন না, যিশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভক্তগণের তাহাও করার আবশ্যক নাই। সর্ব্বশেষ পাপের জন্য যে মৃত্যু অবধারিত, যিশু ত তাহা একবার গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং খৃষ্টীয়ানগণ আর কষ্ট করিয়া মরেন না। মোটকথা আইন কানুনের অবাধ্য হওয়া যেমন অযৌক্তিক, প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাসী হওয়াও তেমনই জ্ঞান বিরুদ্ধ।

৩য় স্তবক।

প্রায়শ্চিত্ত বাদ যুক্তি তর্কের সাহায্যে প্রমাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এখন দেখা যাউক সমগ্র বাইবেল খানিতে ইহার অনুকূলে কোন প্রকার প্রমাণ আছে কি না। কিন্তু, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এখানে আমাদের বলিয়া রাখা উচিত যে, বর্ত্তমান কালে বাইবেল নামে যে তৌরাৎ, জবুর এবং ইঞ্জিলাদি গ্রন্থ নিচয়ের একত্র সমাবেশরূপ এক খানি পুস্তক খৃষ্টীয়ান সমাজে ঈশ্বরের বাণী নামে পরিচিত এবং আদৃত, উহা নানা প্রকার পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন প্রভাবে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে। শুধু আমরাই যে উহা বিশ্বস করি না, তাহা নহে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতও ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দেন। বাইবেল অবিশ্বাস্য (**Bible untrustworthy**) নামক পুস্তকের গ্রন্থকার মিষ্টার ওয়াল্টার জেকিল ইহার অপ্রামাণ্য হওয়া সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।† ম্যকমিলন কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত আদত গ্রীক নূতননিয়মের পরিশিষ্ট ভাগে যে লম্বা চৌড়া পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত এবং অপ্রামাণ্য শ্লোকাবলীর তালিকা রহিয়াছে, তাহা দেখিলে, বোধ হয় এই পুস্তক এক সময়ে পাদ্রি সাহেবদের খেলার বস্তু ছিল।

যাহা হউক, এই পরিবর্ত্তিত বাইবেলখানা দ্বারাও প্রমাণ হয় না যে, যিশু পাপীদিগের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিবেন এবং এই মহৎ কার্য্যের ফলে যিশুভক্তগণ হাসিতে হাসিতে নির্ব্বিঘ্নে সদাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইবেন। বাইবেলের বহুস্থলে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, পাপের জন্য অনুতাপ, উপাসনা প্রভৃতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে সদাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষমা করিয়া থাকেন। যাত্রা পুস্তকের ৩য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, মহাত্মা মূসা পরমেশ্বরের আদেশ

---

* গালাতীয় ৩ অধ্যায়ে, ৯ হইতে ১৩ পদ।

† (খোদা চাহেত বাইবেল তত্ব প্রবন্ধে তাহা এক এক করিয়া দেখান যাইবে)।

গ্রহণ করিতে যাইয়া কিছুকাল ইস্রাইলীয়দের নিকট হইতে দূরে ছিলেন। ইতিমধ্যে কতক-গুলি লোক একটা গো-বৎস তৈয়ার করিয়া তাহারই পূজা করিতে আরম্ভ করে। সদাপ্রভুর ইহাতে খুব রাগ হয়, তিনি সমস্ত ইস্রাইলীয়দিগকে তাহাদের এই অন্যায় কার্য্যের জন্য হত্যা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই সময় মূসা সেই অপরাধীদের জন্য নিজের প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সদাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন নাই। তবে ইহুদীগণ সম্পূর্ণ দলকে-দল নিহত না হইয়া কয়েকজন রক্ষাও পাইয়াছিল।

এই বিবরণটীর দ্বারা স্পষ্টই এ কথা বুঝা যায় যে, একজনের বা একদলের পাপের জন্য ব্যক্তি বিশেষের শাস্তি ভোগ সদাপ্রভুর অভিপ্রেত নহে। খ্রীষ্টিয়ানগণ বলিতে পারেন, মূসা যখন 'চোর ডাকাতের' দলের একজন, তখন তাঁহার দ্বারা অপরের পাপ মোচন সম্ভব নহে বলিয়াই সদাপ্রভু তাঁহাকে বলি-স্বরূপ গ্রহণ করেন নাই—বিশেষতঃ তিনি মানুষ ছিলেন; যিশুর ন্যায় তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরত্বের কোন গুণই বিদ্যমান ছিল না। মূসাকে বলি স্বরূপ না গ্রহণ করিবার যদি এই শেষোক্ত কারণই প্রধান হইত, তবে পরমেশ্বর এ কথা খুলিয়া বলিয়া দিতেন। মূসার প্রতি তখন তাঁহার কোন প্রকার ক্রোধ বা অসন্তুষ্টির লক্ষণ ছিল বলিয়া বুঝা যায় না। এই অবস্থায় সদাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়া দিতেন যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার ক্ষমতা একমাত্র যিশু ব্যতীত আর কাহারও নাই—মোশির ও না। অনেক আদেশ উপদেশের ভিতরে এই টুকু না থাকায় এবং অবাধ্য শিষ্যগণের পরিবর্ত্তে মূসাকে বলি-স্বরূপ গ্রহণ না করায়; বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রায়শ্চিত্তবাদের এই অমূলক কাহিনী নিতান্ত আধুনিক এবং পরমেশ্বরের অজ্ঞাত।

(২)

দ্বিতীয় বিবরণের ৯ম অধ্যায়ের ১৮-১৯ পদে উক্ত আছে, মোশি তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে যাইয়া বলিতেছেন, "আর তোমরা সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করণার্থে তাঁহার দৃষ্টিতে দুষ্কর্ম্ম করিয়া যে পাপ করিয়াছিলে, তোমাদের সেই সমস্ত পাপের জন্য আমি পূর্ব্বকার ন্যায় চল্লিশ দিবারাত্র সদাপ্রভুর সম্মুখে উবুড় হইয়া রহিলাম, অন্ন ভক্ষণ কি জলপান করি নাই। কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে বিনষ্ট করিতে কোপাবিষ্ট হওয়াতে, আমি তাঁহার ক্রোধ ও প্রচণ্ডতাতে ভীত হইয়াছিলাম; কিন্তু সেই বারেও সদাপ্রভু আমার নিবেদন শুনিলেন।"

মহাত্মা মূসার এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যদি কেহ কোন গুরুতর অপরাধ করে, তবে সদাপ্রভু রাগান্বিত হইয়া তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েন; কিন্তু মধ্যস্থলে যদি কোন মহা-পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হন, যদি অজ্ঞান মানবের মুক্তির জন্য তিনি একান্তমনে প্রার্থনা করেন, তবে দয়াময়ের দয়াগুণের বিকাশ হয়—তিনি ক্ষমা করেন। পাপের প্রায়শ্চিত্তের বা ক্ষমা করিবার মালীক যদি যিশু হইতেন, তবে এস্থলে মূসার প্রার্থনা বৃথা এবং ইস্রাইলীয়গণও নেস্তনাবুদ হইত। আর একান্ত পক্ষে ক্ষমা করিতে হইলেও যিশুর আগমন কাল পর্য্যন্ত এই

মামলা মুলতবী থাকিত। কার্য্যক্ষেত্রে বিপরীত আদর্শ দেখিয়াও কেমন করিয়া প্রায়শ্চিত্তবাদে বিশ্বাস করা যায় ?

(৩)

আদি পুস্তকের ২০ অধ্যায়ে লিখিত আছে, মিশরপতি আবিমেলেক আব্রাহামের ভার্য্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে, সদাপ্রভু স্বপ্নে তাহাকে ইহা হইতে বিরত হইতে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "* * * সে ভাববাদী; সে তোমার জন্য প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি বাঁচিবে।" এই উর্দ্ধৃত শ্লোকটীর দ্বারা বিশেষ ভাবে সপ্রমাণ হয় যে, একজন ভাববাদীর প্রার্থনার মূল্য নিতান্ত কম নহে। ভাববাদী প্রার্থনা করিলে যদি একজন লোক বাঁচিতে পারে, তবে পাপ মোচন হওয়াত সামান্য কথা। এই সামান্যের জন্য যিশুর মত একজন উচ্চদরের ভাববাদীর আত্মত্যাগ একটা অমূলক কথা।

(৪)

মহাত্মা সোলেমান (আঃ) সদাপ্রভুর উপাসনার জন্য এক গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হইলে, সেই মহাপুরুষ যজ্ঞবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে প্রার্থনা করেন, আমরা পাঠকবর্গকে তাহা উপহার দিব। লিখিত আছে;—* সোলেমান ইস্রাইলীয় সমাজের সাক্ষাতে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে অঞ্জলি বিস্তার করিলেন; আর তিনি কহিলেন, হে ইস্রাইলের ঈশ্বর সদাপ্রভু, উপরিস্থ স্বর্গে বা অধঃস্থ পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই। সর্ব্বান্তঃকরণে যাহারা তোমার সম্মুখে চলে, আপনার সেই দাসগণের প্রতি তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক; তুমি তোমার দাস, আমার পিতা দায়ূদের কাছে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা রক্ষা কর; তুমি বলিয়াছিলে, আমার সম্মুখে তুমি যেমন চলিলে, তোমার সন্তানগণ যদি আমার সম্মুখে তদ্রূপ চলিবার জন্য আপন আপন পথে সাবধান থাকে, তাহা হইলে আমার দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসিতে তোমার সম্বন্ধীয় মনুষ্যের অভাব হইবে না। এখন, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, বিনয় করি, তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের কাছে যে কথা তুমি বলিয়াছিলে, তাহা দৃঢ় হউক। কিন্তু ঈশ্বর কি সত্যই পৃথিবীতে বাস করিবেন? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ—তোমাকে ধারণ করিতে পারে না, তবে আমার নির্ম্মিত এই গৃহ কি পারিবে? তথাপি হে আমার ঈশ্বর, সদাপ্রভো, তুমি আপন দাসের প্রার্থনাতে ও বিনতিতে মনোযোগ কর, তোমার দাস অদ্য তোমার নিকটে যে কাকুতি ও প্রার্থনা নিবেদন করিতেছে, তাহা শুন। আর যে স্থানের বিষয় তুমি বলিয়াছ, আমার নাম সেই স্থানে থাকিবে, সে স্থানের অর্থাৎ সে গৃহের প্রতি তোমার চক্ষু দিবারাত্র উন্মিলিত থাকুক, এবং এই স্থানের অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা করে, তাহা শুন। আর এই স্থানের অভিমুখে আপন দাসের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের বিনতিকে মনোযোগ কর, এবং তোমার নিবাস স্বর্গে, তাহা শুন ও শুনিয়া ক্ষমা কর।

"কেহ আপন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করিলে যদি তাহাকে দিব্য করাইবার জন্য কোন দিব্য নিশ্চিত হয়, আর সে আসিয়া এই গৃহে তোমার যজ্ঞবেদীর সম্মুখে সেই দিব্য করে, তবে তুমি স্বর্গে তাহা শুনিও এবং নিষ্পত্তি করিয়া আপন দাসের বিচার করিও; দোষীকে দোষী করিয়া তাহার কর্ম্মের ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইও এবং ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিয়া তাহার ধর্ম্মানুযায়ী ফল দিও।

"তোমার প্রজা ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করণ হেতু শত্রুর সম্মুখে পরাভূত হইলে পর যদি পুনর্ব্বার তোমার দিকে ফিরে, এবং এই গৃহে তোমার নামের স্তব করিয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি করে, তবে তুমি স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং আপন প্রজা ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা করিও, আর তাহাদের পিতৃ পুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, তথায় পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আনিও।"

"তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পাপ প্রযুক্ত যদি আকাশ রুদ্ধ হয়, বৃষ্টি না হয়, আর তাহাতে লোকেরা যদি এই স্থানের অভিমুখে তোমার নামের স্তব করিয়া প্রার্থনা করে, এবং তোমা হইতে দুঃখ পাওয়াতে আপন আপন পাপ হইতে ফিরে, তবে তুমি স্বর্গে তাহা শুনিও এবং আপন দাসদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা করিও ও তাহাদের গন্তব্য সৎপথ তাহাদিগকে দেখাইও, এবং তুমি আপন প্রজাদিগকে যাহা অধিকারার্থে দিয়াছ, তোমার সেই দেশে বৃষ্টি পাঠাইও।

"দেশের মধ্যে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি মহামারী হয়, যদি শস্যের শেষে কি ম্লানি কিম্বা পঙ্গপাল কিম্বা কীট হয়, যদি তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের দেশস্থ সকল নগরে তাহাদিগকে অবরোধ করে, যদি মারীর বা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; পরে আপন আপন মনঃপীড়া জানিয়া কোন ব্যক্তি বা তোমার প্রজা সমস্ত ইস্রায়েল যদি এই গৃহের দিকে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া কোন প্রার্থনা কি বিনতি করে, তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং ক্ষমা করিও, সিদ্ধ করিও, এবং প্রত্যেক জনের অন্তঃকরণ জানিয়া তাহাদের সমস্ত আচরণানুযায়ী প্রতিফল দিও; কেননা একমাত্র তুমিই যাবতীয় মনুষ্য সন্তানের অন্তঃকরণ জ্ঞাত আছ। * * * *

"অধিকন্তু তোমার প্রজা ইস্রায়েলের বহিস্থ কোন বিদেশী যখন তোমার নামের গুণে দূর দেশ হইতে আসিবে, কারণ তাহারা তোমার মহানাম, তোমার বলবন্ত হস্ত ও তোমার প্রসারিত বাহুর কথা শ্রবণ করিবে; যখন সে আসিয়া এই গৃহের অভিমুখে প্রার্থনা করিবে, তখন তুমি আপন নিবাস স্বর্গে তাহা শুনিও; এবং সেই বিদেশী তোমার নিকটে যে কিছু প্রার্থনা করিবে, তদনুসারে করিও। * * * * * *

"তুমি আপন প্রজাদিগকে কোন পথে প্রেরণ করিলে যদি তাহারা আপন শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নির্গত হয়, ও তোমার মনোনীত নগরের অভিমুখে তোমার নামের জন্য আমার নির্ম্মিত গৃহের অভিমুখে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করে, তবে তুমি স্বর্গে তাহাদের প্রার্থনা

ও বিনতি শুনিও, এবং তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও। তাহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে,—কেননা পাপ না করে এমন মনুষ্য নাই,—তুমি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুর হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ কর, ও শত্রু তাহাদিগকে বন্দী করিয়া দূরস্থ বা নিকটস্থ শত্রুদেশে লইয়া যায়; তথাপি সেই বন্দীরা যদি দেশান্তরে নীত হইয়া সেই স্থানে মনে মনে বিবেচনা করে, এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের দেশে থাকিয়া যদি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার দিকে ফিরে, এবং তুমি তাহাদের পিতৃব্যপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, আপনাদের সেই দেশের তোমার মনোনীত নগরের ও তোমার নামের জন্য আমার নির্ম্মিত গৃহের অভিমুখে যদি তোমার কাছে প্রার্থনা করে, তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে তাহাদের প্রার্থনা ও বিনতি শুনিও, এবং তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও * আর যে প্রজারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিও, এবং তোমার বিরুদ্ধে কৃত তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম মার্জ্জনা করিও; আর যাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, তাহাদের করুণার পাত্র করিয়া তাহাদের শত্রুদের করুণা বর্ত্তাইও। * * * * তোমার এই দাসের বিনতিতে ও তোমার প্রজা ইস্রায়েলের বিনতিতে উন্মিলিত চক্ষু হইও, ও তাহারা তোমাকে ডাকিয়া যখন যে প্রার্থনা করে তাহা শুনিও।"

(১ রাজাবলী ৮ম অধ্যায়, ২২ হইতে৫২ পদ)

সোলায়মানের (আঃ) এই প্রার্থণাটীর ভিতরে অনেক কথা আছে। তিনি প্রার্থণাচ্ছলে সদা প্রভুর নিকটে মানবের যাহা প্রার্থনীয়, তাহা সমস্তই জ্ঞাত করিয়াছেন। মানুষ মাত্রই সেই বেনায়াজ খোদা তালার নিকট জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অনেক অনেক পাপ করিয়া থাকে, স্বীয় বিচক্ষণতার গুণে তিনি সেই সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া অনুতাপীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন। ভক্তের এই কাতর প্রার্থনা মাঠে মারা যায় নাই। সদাপ্রভু উত্তরে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তুমি আমার কাছে যে প্রার্থনা ও বিনতি করিয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি; এই যে গৃহ তুমি নির্ম্মাণ করাইয়াছ, ইহার মধ্যে যুগানুক্রমে আমার নাম স্থাপন করিবার জন্য আমি ইহা পবিত্র করিলাম এবং এই স্থানে প্রতিনিয়ত আমার চক্ষু থাকিবে।" উত্তরটীর ভাবে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সদাপ্রভু নিরাপত্তিতে শলোমানের (সোলায়মান এবং শলোমান এক জন) প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। যদি যিশুর আবির্ভাব এবং যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহার দ্বারা হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত থাকিত, তবে এই প্রার্থনা এমন সরল ভাবে গ্রাহ্য করা, হয় পরমেশ্বরের ছলনা, না হয় তিনি নিজের এবং তাঁহার পুত্র (?) যিশুর ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস করিতেন না। জানিনা খৃষ্টীয়ানগণ এ সম্বন্ধে কি মনে করেন!

* ইস্রাইলীয়দিগের পিতৃব্য-বংশ অর্থাৎ ইস্মাইল সন্তানগণ তাহাদিগকে যে দেশ দিয়াছে, অর্থাৎ আরব দেশকে বুঝাইতেছে, এবং "সেই দেশের মনোনীত নগর" অর্থে মক্কা নগর এবং সেখানে সদাপ্রভুর নামের জন্য নির্ম্মিত-গৃহ পবিত্র বায়তুল্লাহ শরীফ —সম্পাদক।

এই প্রার্থণাটীর আর একবার উল্লেখ হইয়াছে—২য় বংশাবলি পুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে। তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ১২ হইতে ১৪ পদে সদাপ্রভুর উত্তর এই ভাবে লিখিত আছে, "সদাপ্রভু রাত্রিতে শলোমনকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার প্রার্থণা শুনিয়াছি, ও যজ্ঞগৃহ বলিয়া এইস্থান আমার জন্য মনোনীত করিয়াছি। আমি যদি আকাশ রুদ্ধ করি, আর বৃষ্টি না হয়। কিম্বা দেশ নষ্ট করিতে পঙ্গপালদিগকে আজ্ঞা করি, অথবা আপন প্রজাদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করি, যদি আমার নামে আখ্যাত আমার প্রজারা নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব, ও তাহাদের দেশে আরোগ্য করিব।"

পূর্ব্বোল্লিখিত উত্তরটী একটু ঢাকা ঢাকা গোছের বোধ হয়, কিন্তু এই শেষোক্ত উত্তরের বাক্য গুলির দ্বারা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাপী সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর দিকে ফিরিয়া কৃত পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং ভবিষ্যতে পাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলে, তিনি যিশুর ন্যায় কোন প্রতিভূ না লইয়াই নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। শুধু ক্ষমা নয় তাহাদিগকে পূর্ব্বের মত ভালও বাসিবেন। পুরাতন নিয়মের এই কথা গুলি যদি "গুলি খোরের বুলি" না হয়, তবে খৃষ্টীয়ানী প্রায়শ্চিত্ত বাদটী কিন্তু হাওয়ায় উড়িয়া যায়।

(৫।)

যিশায়াহ ভাববাদী তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "দুষ্ট আপনার পথ ও অন্যায়ী আপনার সঙ্কল্প ত্যাগ করুক, এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করিবেন, আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক, কেন না তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন।"

(যিশায়াহ ৫৫ অধ্যায় ৬-৭ পদ)!

ভাব বাদীর উক্তি স্বকপোল কল্পিত 'বুলি' নহে। ইহার ভিতরে সার আছে। নতুবা খৃষ্টীয়ানগণ এই সমস্ত উক্তি কিছুতেই "ধর্ম্ম পুস্তকের" অন্তর্গত রাখিতেন না। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যিশায়াহ ভাববাদী কি প্রায়শ্চিত্ত বাদের কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই? যদি জানিতেন, তবে কর্ম্মের প্রভাবে মুক্তি হইবে বলিয়াই ছুটী লইলেন কেন? যিশুর কথাত এখানে একটু উল্লেখ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। (ক্রমশঃ)

মোহাম্মদ মুজাফফর উদ্দীন।

মহাশিক্ষা কাব্য

প্রথম স্বর্গ।

১

পূর্ণকলা শশধর সুনীল গগনে
হাসিছে, ভাসিছে তাহে সৌন্দর্য্য-সাগরে
ধরাতল, মনে হয় অম্বর বিথারি'
স্বরগের আভা যেন পড়েছে মরতে।
এ হেন চন্দ্রিকা-ফুল্ল সুখদ নিশায়
চল গো কল্পনে সখি! কবি সহচরী,
দেখিতে বাসনা যদি রাজধানী-মণি
দামেস্কের মহৈশ্বর্য্য বলবীর্য্য শোভা।
চল, প্রিয়ে! দেখি আজি মাবিয়াতনয়
এজিদ,—নব ভূপতি, পিতৃ-মৃত্যু-অন্তে
বসিয়াছে সিংহাসনে,—কি কূট মন্ত্রণা
করিছে, সচিব আর পারিষদ সনে
প্রদমিতে আলীজাদা এমাম হোসেনে
(স্বাধীনতা উপাসক শূরকুল রবি।

২

প্রফুল্ল পূর্ণিমা তিথি। কৌমুদী সাগরে
ভাসিছে বসুধা আজি। দামেস্ক নগরী—
পৃথিবী-কিরীট-মণি, চন্দ্রকর জালে
শোভিতেছে কি সুন্দর! কিবা মনোহর!
সংখ্যাতীত রম্য হর্ম্ম মর্ম্মর নির্ম্মিত—
কবিচিত্ত সম্মোহন কারুকার্য্যময়,
গর্ব্ব ভরে উর্দ্ধ শিরে আছে দাঁড়াইয়া।
অমল জ্যোৎস্না রাশি ত্যজি সুধাকরে
হরষে পড়ে'ছে ঢলি সর্ব্ব অবয়বে,
ধরিয়াছে সৌধাবলী কি অপূর্ব্ব শোভা!
সুগন্ধ প্রসূন গন্ধ বহি মন্দগতি
বহিতেছে মন্দ মন্দ মোহিয়া মানবে।
কভু বা হরষ ভরে কামিনী কুন্তল
লইয়া করিছে ক্রীড়া, স্খলিত অঞ্চল
লইয়া চঞ্চল কভু বাতায়ন পথে।
প্রস্ফুটিত পুষ্প পুঞ্জ মণ্ডিত নিকুঞ্জে
বিহরিছে বামাদল সখীদল সঙ্গে,
(এদেন উদ্যানে যথা রাজে হুরী বৃন্দ!)
মনোরঙ্গে তুলি ফুল গাঁথিছে মালিকা
হৃদি-পদ্ম-ভৃঙ্গবরে সাজা'তে হরসে!
কেহবা পরিছে দুল শ্রবণ মণ্ডলে
পুষ্প গুঁজে আবরিছে কেহ বা কবরী।
কুসুম-দল-শোভিত স্বচ্ছ সরোনীরে
নাগর নাগরীগণ তরণী সহায়ে
চরিছে আনন্দ ভরে! সঙ্গীত রাগিনী
উঠিতেছে বামাকণ্ঠে মোহিয়া অবনী।
কেহ সরোবর ঘাটে বসি মনঃ সাধে
গাইছে প্রণয়-গীতি ত্রিতন্ত্রীর স্বনে
মিলায়ে স্বকীয় স্বন মধুময় তানে।

৩

রাজপথে জন স্রোতঃ বহিছে সতত,
বরষার স্রোতে যেন প্রান্তরের পথে:
কুমুদ কহ্লার রাশি চলেছে ভাসিয়া।
নানাবিধ সুশোভন পরিচ্ছদাবৃত
শোভে নাগরিক বৃন্দ, উচ্চ খল খলে
হাসিছে পুলকে কেহ, ভাসিছে কেহ বা
প্রণয়ী জনের সহ, ভ্রমিতেছে কেহ
রাজবর্ত্মে রাজোদ্যানে, প্রফুল্ল মানসে
কেহ উচ্চে গাইতেছে সুরস সঙ্গীত;

শোভিছে মস্‌জিদ মালা—স্বর্ণময় শীর্ষে
উড়িছে কেতন কুল সমীর সঞ্চারে।
সুদৃঢ় পাষাণময় সমুচ্চ প্রাচীরে
বলয়িত বৃত্তাকারে দেমাস্ক নগরী।
তোরণে তোরণে শোভে লৌহের কপাট ;
প্রহরী নিয়ত রাজে ভীম দরশন
উলঙ্গ কৃপান পাণি কৃতান্ত উপম।
চৌদিকে পরিখা শোভে সরিৎ সদৃশ
সুগভীর সুবিস্তৃত—তরতর তরে
নিয়ত বহিছে স্রোতঃ গভীর কল্লোলে।
প্রান্তরে শোভিছি দুর্গ, স্পর্দ্ধি' ব্যোমপথ
বিরাট বিশাল যেন ধবল শেখর।
নভোস্পর্শী শীর্ষে তার বৃহৎ পতাকা
(রক্ত বর্ণ) উড়িতেছে হেলিয়া দুলিয়া
মন্দ সমীরণ ভরে,—মহোরগ যথা
মহা সাগরীয় স্রোতে খেলে মনোসুখে।
অঙ্কিত পতাকা পৃষ্ঠে উজ্জ্বল সুবর্ণে
তারাময় চন্দ্রকলা সুন্দর শোভন।
বিচরিছে দুর্গ মাঝে সমরী নিচয়—
নানা প্রহরণ ধারী,—বীর্য্য মদ ভরে
মত্ত করিদল সম গর্ব্বে অনুক্ষণ।
শুভ্র চন্দ্রালোকে আজি আমোদে মাতিয়া
বিশাল দুর্গ প্রান্তরে,—অযুত সৈনিক
করিতেছে নানা ক্রীড়া বীর জনোচিত।

হ্রেষিছে তুরঙ্গগুলি মন্দুরার মাঝে
বারি মাঝে গরজিছে কুঞ্জর নিচয়।
শত অস্ত্রশালা মাঝে স্তূপে স্তূপে স্তূপে
রহিয়াছে অস্ত্র শস্ত্র অসংখ্য প্রকার—
খঞ্জর, পট্টিশ, শেল, শূল, বাণ, অসি,
খড়্গ, ভল্ল, গদা, দাত্র, ছুরিকা, গাণ্ডীব।
নানা জাতি পণ্য দ্রব্য অসংখ্য আপণে
রহিয়াছে শ্রেণী শ্রেণী; দ্রব্য মনোহারী
সজ্জিত সুন্দর ভাবে বিবিধ আকারে!
নগরী কুলের রাণী দেমাস্ক সুন্দরী
হায়রে ঐশ্বর্য্য তার কে পারে বর্ণিতে!
বিশাল নগরী আজি শশি-রশ্মি জালে
বিচিত্র পটের সম, চারু ভঙ্গিমায়
শোভিছে অপূর্ব্ব বেশে। প্রতি গৃহ হ'তে
আমোদ প্রমোদ আর হর্ষোল্লাস ধ্বনি
উঠিতেছে অবিশ্রান্ত। ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্যে
ষোড়শী যুবতী সম, মানিনী মোহিনী
রম্য হর্ম্ম কিরীটিণী দেমাস্ক নগরী।

৬

হেন রাজধানী মাঝে অয়স প্রাচীরে
সুবেষ্টিত সংরক্ষিত বিশাল উদ্যানে
বিরাট শাহী প্রাসাদ—সমৃদ্ধি সম্ভারে
অতুল জগতী তলে,—শোভিছে সুচারু ;
নিরভ্র অম্বর তলে শোভয়ে যেমতি
জল ধনু আবেষ্টিত তারাকুল পতি।
দুর্ল্লভ মহার্ঘ নানা বিলাসের দ্রব্য
শোভিতেছে লক্ষ লক্ষ—কক্ষে কক্ষে তার।
(কি ছার ইহার কাছে সাদ্দাদের স্বর্গ
বিধি ক্রোধে গরাসিল মেদিনী যাহায়।)

৭

আইস কল্পনা সখি! প্রিয়ম্বদা তুমি
ভেটিবে এজিদে যদি, এস ত্বরা করি।
সুরম্য বিশাল কক্ষ নয়নাভিরাম ;
সুবিন্যস্ত সুগঠিত স্তম্ভাবলী শিরে
স্বর্ণ বর্ণ পুষ্প পর্ণ বিখচিত ছাদ
বিরাজে, বিরাজে যথা লতাস্তম্ভ শিরে
শ্যাম পত্র দল যুত, ফল বিশোভিত
প্রকৃতির চারু ছত্র সুবিশাল বট।

কিম্বা গিরি চুড়া শীর্ষে, শোভয়ে যেমতি
ঋক্ষজালে সমাকীর্ণ নির্ম্মল আকাশ।
স্তম্ভে স্তম্ভে পুষ্প মালা, মুক্তামালা সহ
দুলিছে পবন দোলে। দীপাবলী প্রভা
কর্ব্বুর কিরণ পুঞ্জে করি বিকীরণ
বিচিত্র বরণে গৃহ করেছে প্রোজ্জ্বল।
নানাবিধ চিত্রাবলী প্রাচীরের গায়
শোভিতেছে দীপতেজে—মানস মোহন।
মস্‌লিন নির্ম্মিত সূক্ষ্ম চারু যবনিকা
দুলিতেছে দ্বারে দ্বারে। গোলাবের উৎস
উৎসারিয়া গৃহতলে সুস্নিগ্ধ সুগন্ধে
আমোদিছে মহাকক্ষ। বাসন্তী পবন
ধীরে—যেন রাজভয়ে করে সঞ্চরণ—
বাহিরেতে দৌবারিক প্রতি দ্বারে দ্বারে
বিনাশব্দে বিচরিছে মুক্ত অসি করে।

৮

হেন হর্ম্ম্যতলে বসে রাজেন্দ্র এজিদ
দ্বিরদ-রদ-রচিত বিচিত্র আসনে।
ফুল্ল অরবিন্দ সম প্রফুল্ল বদন,
কিন্তু চিন্তা ভ্রমরের সুতীব্র দংশনে
ঈষৎ মলিন যেন—সম্মুখে আসীন
মন্ত্রণা কুশল মন্ত্রী সরজুন রুমী;
পার্শ্বে পার্শ্বচর এক, বামে সেনাপতি।
নিস্তব্ধ গম্ভীর গৃহ, সূচীপাত ধ্বনি
স্পষ্ট হয় অনুভূত! নীরব সবাই।
ভাঙ্গি সেই নীরবতা রাজেন্দ্র এজিদ
কহিতে লাগিলা ধীরে সম্ভাসি সচিবে—
"হে মন্ত্রীন্! মনোভিষ্ট সিদ্ধ এত দিনে
বিধির বিধান বলে, পিতৃদেব অন্তে
আমি এবে রাজ্যেশ্বর; এরাক, আজম,
মিশর তাতার শাম—করতল গত;
ভীত যত শত্রু কুল, সামন্ত নৃপতি
সবাই শরণাগত, বিশাল সাম্রাজ্যে
নাহিক কণ্টক কিছু, কিন্তু এক ভয়,
দুর্ম্মতি স্পর্দ্ধিত শত্রু আলীর তনয়
হোসেনের তরে শুধু, সহচর তার
আবুবকরের পুত্র আবদর্ রহমান,
ওমর ফারুক-পুত্র আবদুল্লা আর
মাদিনা নগরী বাসী রথীন্দ্র নিকর।
ইহাদের তাচ্ছিল্যাতে হৃদয়ে আমার
নাহি বিন্দু মাত্র সুখ; ইহারা থাকিতে
নহি আমি নিরাপদ, কি জানি কখন
কিবা ষড়যন্ত্র করে আলীর তনয়!
কি আর কহিব আমি হে সচিব বর!
যত দিন নাহি বাঁধি দাসত্ব-শৃঙ্খলে
হোসেনেরে, ততদিন এ চিত্ত আমার
ঘটিকা দোলক সম নিয়ত অস্থির!
কি অসাধ্য হোসেনের? কিসের অভাব?
বিশেষ সে মোস্তফার স্নেহের দৌহিত্র।
সুরেন্দ্র কুল তপন আলীর নন্দন,
প্রজাতন্ত্র-প্রথা-সেবী তেজ-দৃপ্ত সিংহ
অনম্য অদম্য নিত্য নির্ভীক স্বাধীন।
হে মন্ত্রি! জানত সব, পিতৃদেব মম
কত কষ্টে কত শ্রমে কত না যতনে
লভেছিলা দেমস্কের রাজ-সিংহাসন।
কিন্তু হোসেনের পিতা আলী হায়দর
করিলা বিষম রণ বিঘোর শত্রুতা,—
দেমস্কের রাজাসন সে রণ তরঙ্গে
কাঁপিলেক থর থর! ঘটনার চক্রে,
পিতৃভাগ্য বলে মম, বিধির বিধানে
নিহত হইলা আলী গুপ্ত অরি-করে।
জনক মাবিয়া মম আনন্দিত মতি
নিষ্কণ্টক বলি হায়! ভাবিলা নিজেরে।
কিন্তু সে আলীর পুত্র হাসান্ হোসেন

(নাগ শিশু নাগ বটে) কিছুতেই তারা
মানিল না, গণিল না, জনকে আমার ;
নিদারুণ ঘৃণা আর অবজ্ঞার বশে
তাঁহার অনুসরণ না করিল কভু ;
ঘটিল বিষম যুদ্ধ হাসানের সনে
পিতৃদেব ভয়ে সদা আকুল পরাণ !
মক্কা ও মদিনা আর কুফা বাসিগণ
নিতান্ত আলীর ভক্ত, প্রাণ পণে তারা
সাহায্যে প্রস্তুত সদা আলী তনয়ের !
তাই, মনে গণি ভয়—গরল প্রয়োগে
বিবিধ কৌশল করি (সুধী মারোয়ান,
কুটীল চক্রান্তেতার) অতীব যতনে
হাসানের নরলীলা সাঙ্গ করিলাম।
সবে মাত্র জীয়ে এবে কনিষ্ঠ এমাম—
পিতৃহীন ভ্রাতৃহীন ঘোর নিরাশ্রয়।
কিন্তু কি দারুণ দম্ভ ! কি ভীষণ স্পর্দ্ধা
অনুমাত্র ভীত নহে, এখন ও গর্ব্বে
বিচরিছে মদিনায়,—ক্ষুব্ধ সিংহ যথা
যুথভ্রষ্ট হ'য়ে হায় ! বিচরে কাননে ;
দীপ্ত দাবানল সম মহাতেজঃ পুঞ্জে।
না জানি কবে কি করে প্রমাদ ঘটন,
মনে তাই সদা ভয়, কনিষ্ট এমামে
দাসত্বের দৃঢ় পাশে আবদ্ধ করিয়া
মদীয় অনুসরণে না করিলে ব্রতী
কিসের গৌরব মম ? দামেস্ক রাজের
কি মর্য্যাদা ? যদি নাহি মানিল তাহার
প্রেরিত পুরুষ শ্রেষ্ঠ-বংশ-অবতংশ।”

৯

এতেক কহিল যদি রাজেন্দ্র এজিদ
উত্তরিলা পার্শ্বচর বিনম্র বচনে—
মহারাজ! হোক তব কল্যাণ কুশল

প্রেরিত পুরুষ শ্রেষ্ঠ-বংশ-অবতংশ = হোসেন

দীর্ঘ জীবি হ'য়ে সুখে পালহ ধরিত্রী।
যা' কহিলে জাঁহাপানা। সত্য সমুদয়
সকলি বিদিত দাস। কিন্তু কোন্ হেতু
ভাসিতেছ হে রাজন ! চিন্তার সাগরে ?
কি ছার হোসেন সেই আলীর তনয়
রাজ্যহীন বলহীন রাজশ্রী বিহীন
শাখা শূন্য মূল শূন্য দগ্ধ কাষ্ঠ সম,
কি ভয় তাহারে এবে ? কিবা শক্তি তার
করে কিছু ষড়যন্ত্র তব প্রতিকূলে ?
পৃথিবী অধীন আজি হে রাজন ! তব,
ইচ্ছ যদি, হে ভূপেন্দ্র ! সহস্র হোসেনে
পলকে বাঁধিতে পার দাসত্ব-নিগড়ে।
অগনন সেনা তব, লক্ষ লক্ষ বীর—
(হোসেন জিনিয়া রণে প্রচণ্ড প্রতাপ)
শির-দানে অগ্রসর আদেশে তোমার।
যদি সে আলীর পুত্র বিনত মস্তকে
তব অধীনতা নাহি করয়ে স্বীকার ;
পাঠাও তা' হলে' সেনা অযুতেক মিত
নাশিতে সবংশে তারে, মদিনা নগরে
ভাসাইতে রক্ত স্রোতে—উমাইয়া বংশের
শত্রুকুল সুনির্ম্মূল হোক একেবারে।

১০

শুনি পার্শ্বচর বাণী কহিলা সেনানী
“হে ভূপাল কুলচূড় ! রাতুল চরণে
অভয় মাগে এ দাস,—অনুজ্ঞা যদি হে
হয় আজি জাঁহাপানা ! সপ্তাহের মাঝে
সমগ্র মদিনাবাসী নরনারী সহ
হোসেনে আনিতে পারি বাঁধিয়া শৃঙ্খলে।
অথবা আদেশ যদি, খণ্ডিত মস্তক
তীক্ষ্ণ শূল অগ্রে গাঁথি—যথা মৎস্য বরে
তীক্ষ্ণ কুম্ভ অগ্রে বিঁধি মৎস্য হন্তাগণ
আপন আলয়ে আনে পুলকিত চিত্তে—
তেমতি আনিতে পারি। কিম্বা যদি আজ্ঞা

হয় এ দাসের প্রতি, মদিনা নগরী
অশ্ব ক্ষুরাঘাতে করি রেনু পরিণত
লোহিত সমুদ্র নীরে পারি ভাসাইতে।
কিবা শঙ্কা হে রাজেন্দ্র! মৃগেন্দ্র কখনো
ডরে কি কুরঙ্গ তরে? দাবানল শিখা
পোড়াইতে পরাঙ্মুখ কবে শুষ্ক তরু?
ফনীন্দ্র নিরস্ত কবে গ্রাসিতে মণ্ডুকে?”
নীরবিলা সেনাপতি। মন্ত্রীবর তবে
নিবেদিলা কর পুটে—“হে নরেশ মণি!
অভয় মাগিও পদে; সমুচিত নয়
সমরের আয়োজন। যদি সে হোসেন
জীবিত চরণে তব লয়হে শরণ,
প্রকৃত গৌরব সেই দামেস্ক রাজের।
প্রথমে আহ্বান তারে কর মহারাজ!
ভয় যুক্তি লোভ রোষ করি প্রদর্শন
অধীন হইতে তব, একান্তই যদি
সে সব নিষ্ফল হয়, পরিণামে তবে
ঘোর ক্রোধানল জ্বালি জ্বালাইও তারে,
অথবা দলিও বলে অমিত বিক্রমে।
তব প্রতিনিধি আছে মদিনা নগরে
অলিদ,—চতুর চূড়া মারোয়ান আর;
লিখহ তাদের তরে দৃঢ় অনুজ্ঞায়
বিহিত উপায়ে যেন হোসেনের তরে
করে তারা বশীভূত। হোসেনের বশে
আসিবেক বশে আর যতেক বলীন্দ্র।
একান্ত হোসেন যদি নাকরে ‘বয়েত’
তবে অবশেষ কালে কাটি তার শির
পাঠায় দামেস্কে যেন; তাহে হে রাজন!
শত্রু শূন্য হবে রাজ্য নিঃশঙ্ক মানস।”
“সত্য বটে, সমীচীন পরামর্শ তবে”—
উত্তরিলা নৃপবর “রজনী প্রভাতে
প্রেরিব সন্দেশ বহে, আজ্ঞা পত্র সহ
নাজেম অলিদ প্রতি।” এতেক বলিয়া
আদেশিলা মন্ত্রীবরে পত্রিকা রচনে।

বয়েৎ—

মোস্তাফা চরিতালোচনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম প্রচারে অস্ত্র ব্যবহার।

অমূলক প্রবাদ।—একটা জনশ্রুতি আছে যে, হজরত মোহাম্মদ এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে কোরআন লইয়া ভয় প্রদর্শন দ্বারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ঐরূপ জনশ্রুতি কোন কোন ভিন্ন জাতীয় ঐতিহাসিক নামধেয় লেখক ও ঔপন্যাসিকের লিপি-কুশলতা ও রচনা-নিপুণতা-প্রভাবে উপমা-অলঙ্কারে সাজিয়া গুজিয়া দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম ও জাতিকে সাধারণের নিকট ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত করিয়া তুলিয়াছে। ঐরূপ জনশ্রুতি যে একেবারে ভিত্তিহীন এবং প্রবাদ ও অপবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে,—মুসলমান ধর্ম্মগুরু যে ধর্ম্ম প্রচারে একেবারে বল প্রয়োগ করেন নাই—আমরা নিম্নে তাহারই প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

কোরআনের বিধান।—ধর্ম্ম প্রচার কামনায় হজরত মোহাম্মদ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি কখনও বল প্রয়োগ করেন নাই। ধর্ম্ম পুস্তক কোরআন শরীফ, ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত অস্ত্র ব্যবহার বা বল প্রয়োগের আদেশ দেয় নাই; বরং এইভাবে নিষেধ করিয়াছে, "ধর্ম্ম প্রচারে বল প্রয়োগ করিও না।" * ধর্ম্ম প্রচার জন্য কোরআন শরীফে হজরত মোহাম্মদের প্রতি এইরূপ আদেশ আছে, "হে পয়গম্বর, যাহা (যে শিক্ষা) তুমি আল্লার নিকট পাইয়াছ, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রচার কর।" † আল্লার ও ধর্ম্মগুরুর আদেশ পালনের জন্য সাধারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, "আল্লা ও পয়গম্বরের আদেশ পালন কর—কিন্তু যদি তোমরা তাহা না কর, তাহা হইলে কেবল প্রকাশ্যভাবে (আমার আদেশ তোমাদিগকে) পঁহছাইয়া বা শুনাইয়া দেওয়াই আমার পয়গম্বরের কার্য্য।" * কেহ হজরত মোহাম্মদের আদেশ পালন না করিলে, বধ্য হইবে, ঐ পবিত্র প্রবচন তাহা বলে না। আল্লাহ অন্যস্থানে হজরত মোহাম্মদকে আদেশ করিয়াছেন, "কিন্তু, যদি তাহারা (অবিশ্বাসীরা) তোমার উপদেশ অবহেলা করে, তাহা হইলে তোমার কর্ত্তব্য কেবল প্রচার করা।" † এখানেও খোদাতালা, উপদেশ অবহেলা জন্য অবিশ্বাসীদের জন্য হত্যাদেশ প্রদান করেন নাই। পবিত্র কোরআনের ঐ সকল মহান্ আদেশ বর্ত্তমান স্থলে, যাঁহারা ভয় প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করা কোরআনের বিধান বলিয়া—হজরত মোহাম্মদের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহাদের উক্তি কোনরূপে গ্রহণ করা উচিত নহে।

* কোরআন শরীফ সুরা বকর (দ্বিতীয় অধ্যায়)।
† কোরআন শরীফ সুরা মায়দা (পঞ্চম অধ্যায়)।
* কোরআন শরীফ, সুরা মায়দা (পঞ্চম অধ্যায়)।
† কোরআন শরীফ, সুরা নহল (ষোড়শ অধ্যায়)।

ধর্ম্ম প্রচারকের দুর্দ্দশা।—হজরত মোহাম্মদ ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ধর্ম্ম প্রচারে দণ্ডায়মান হন; তদবধি ১৩ বৎসর কাল মক্কা নগরে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। ঐ ১৩ বৎসরের মধ্যে কাহারও প্রতি বল প্রয়োগ করা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ করিতে পারেন কি? বরং ঐ সময় মধ্যে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে শত শত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। মক্কাবাসীরা প্রথমে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া, মৃদু ভাষায় তাঁহাকে ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করে; তৎপর ধন সম্পত্তি দিবার লোভ লালসা ও প্রলোভন প্ররোচনা প্রদান দ্বারা, তাঁহার প্রচার বন্ধ করিবার ষড়যন্ত্র করে। ঐরূপ কৌশলে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া পরে তাঁহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে—তাঁহার সহিত আহার বিহার, আদান প্রদান সমস্ত বন্ধ করিয়া দেয়। মক্কাবাসীদের সংশ্রব শূন্য "শয়বে আবুতালেব" নামক স্থানে তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে, বন্দীভাবে অবস্থান করিতে হয়। প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। ধর্ম্ম প্রচারে তায়েফ নগরে গিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের হস্তে তাঁহাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং প্রস্তরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাপ্লুত হইতে হয়। নিরাশ-হৃদয়ে মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া আবার অধিবাসীদের হস্তে নানারূপ নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়।

বিশ্বাসী শিষ্য মণ্ডলীর লাঞ্ছনা।—মক্কার পশু প্রকৃতি নৃশংস অধিবাসীগণের (ধর্ম্মগুরুর সহিত আচরণের কিঞ্চিৎ পরিচয় হইল। আবার শিষ্য শিষ্যাগণের সহিত তাহারা কিরূপ ব্যবহার করিতেছিল, পাঠক, তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করুন। তাহারা ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করাইবার জন্য হজরত এয়াসের ও হজরত এমারকে কত যন্ত্রণা দিল, কত ভয় প্রদর্শন করিল, কত প্রহার করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না। শেষে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের জন্য বিধর্ম্মীদের হাতে প্রাণ দিতে হইল।

হজরত খোবাএব, হজরত সোহেব, হজরত বেলাল, হজরত আমের, হজরত আবু ফকিয়া প্রমুখ দৃঢ় বিশ্বাসী নব মোসলেমগণের উপরও কম নিগ্রহ হয় নাই। নিষ্ঠুরেরা তাঁহাদের বুকে শিল চাপাইয়া অনাহারে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিত, কাহারও অর্দ্ধাঙ্গ উত্তপ্ত বালুকায় পুঁতিয়া দূর হইতে তাঁহাকে পাথর মারিত, কাহাকেও জলে ফেলিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইত, কাহাকেও তপ্ত পাথরে ফেলিয়া পাথরের বড় হাঁড়ি আগুণে গরম করিয়া তাঁহার বুকে চাপাইত, চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, কাহারও পায়ে দড়ি বাঁধিয়া উত্তপ্ত প্রস্তর কণা সমূহের উপর টানিয়া লইয়া বেড়াইত। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য—ধর্ম্ম-মহাত্ম্য রক্ষার জন্য বিনা বাক্যব্যয়ে সেই সকল যাতনা সহ্য করিতেন। ধর্ম্মত্যাগের কথা মনেও আনিতেন না।

বিশ্বাসিনী রমণীগণেরও ধর্ম্ম ভক্তির সীমা ছিল না। এয়াসেরের পত্নী ও এমারের মাতা সমিয়া—নরপিশাচ নির্লজ্জ পাতকী আবু-জেহেল যেরূপ ভাবে সেই ধর্ম্মপ্রাণা বিশ্বাসিনী রমণীর প্রাণবধ করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান যুগের লেখকের লেখণীতে বাহির হয় না। ১৩ শত বৎসরের উর্দ্ধকালের সেই ঘটনা মনে করিলে আজিও শরীর রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়। এই প্রসঙ্গে লবিনা, জন্নিরা, নহদিয়া ও উম্ম অবিসের বিবরণও উল্লেখ যোগ্য। লবিনা—হজরত ওমরের

দাসী; তিনি প্রভুর অগোচরে গোপনে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত ওমর তখনও ইসলামে দীক্ষিত হন নাই—তিনি ইসলাম ধর্ম্ম বিশ্বাসিনী দাসীর ধর্ম্মত্যাগের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে এত প্রহার করিতেন যে, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার অবস্থা না হইলে, তাঁহাকে ছাড়িতেন না। জন্নিরা আবু জেহেলের দাসী ছিলেন—ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করার অপরাধে আবু জেহেল খোঁচা মারিয়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। নহদিয়া এবং উম্ম-অবিসও দাসী ছিলেন—তাঁহারাও আপন আপন প্রভুর হস্তে বারংবার নিগৃহীত হইয়াছিলেন। ঐরূপ যন্ত্রণা পাইয়াও ঐ সকল দৃঢ় বিশ্বাসিনী রমণীর বিশ্বাসের লাঘব হয় নাই—তাঁহারা নারী স্বভাব সুলভ কোমল হৃদয়া হইলেও, ধর্ম্মবিশ্বাসে তাঁহাদের মন পর্ব্বতাপেক্ষা অটল ও দৃঢ় ছিল।

আবিসিনিয়া প্রবাস।—মুসলমানদিগের প্রতি ঐরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ অত্যাচার হইতে থাকা কালে, বিধর্ম্মীদের নিকট কোনরূপ সদ্ব্যবহার পাইবার ও তাহাদের সহিত সখ্য সদ্ভাব পুনঃস্থাপিত হইবার আশা ত্যাগ করিয়া পৈতৃক বাসস্থানের মায়া মমতা ছাড়িয়া ১০১ জন মুসলমান নর নারীকে হজরত মোহাম্মদের আদেশে আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করিতে হয়। তাঁহারা মক্কা ত্যাগ করিয়া গেলেন, তথাপি মক্কার নরপিশাচেরা ক্ষান্ত হইল না। তাহারা আবিসিনিয়ার খৃষ্টানাধিপতির নিকট দূত পাঠাইয়া, গৃহত্যাগী মুসলমানদিগকে আবিসিনিয়া হইতে বহির্গত করিয়া দিবার অনুরোধ করিল।* কিন্তু দরিদ্র মুসলমানগণের পক্ষে হজরত জাফর† খৃষ্টরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন ও মক্কাবাসীদের মোসলেম দলনের বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করায়, তিনি বিধর্ম্মী দূতকে তাড়াইয়া দিয়া নির্ব্বাসিত মুসলমানগণকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহারা নিরাপদে আবিসিনিয়ায় বাস করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মগুরুর মক্কা ত্যাগ।—যে সকল মুসলমান মক্কায় থাকিলেন, তাঁহাদের উপর বিধর্ম্মীদের 'জুলুম জবরদস্তি' পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল; তাঁহাদের কাহারও কাহারও বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কিন্তু সত্য ধর্ম্মের এমনি মহিমা যে, বিধর্ম্মীদের ঐ সকল বাধা বিঘ্ন স্বত্ত্বেও মক্কায় মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সত্য ধর্ম্মের গতিরোধ করে, কা'র সাধ্য? এদিকে বিধর্ম্মীরা স্থির করিল, হজরত মোহাম্মদের প্রাণ বিনাশ করিতে না পারিলে, ইস্‌লামের মূলোচ্ছেদ হইবে না। সুতরাং তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ঘাতক নিযুক্ত হইল, তাঁহার শিষ্যগণের উপর এত অত্যাচার হইতে লাগিল যে, মক্কায় তাঁহাদের তিষ্ঠিবার উপায় থাকিল না। হজরত মোহাম্মদ উপায়ান্তর না দেখিয়া শিষ্যগণকে একে একে মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও শত্রুভয়ে গোপনে রজনীর অন্ধকারে ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদিনায়

* ঐ দূতের নাম 'আমর-এবনেল্‌-আস'। পাঠক, এই আমরকে পরে মুসলমান হইতে ও অত্যাচারী বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিবেন। তাঁহারই বাহুবলে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সময়ে প্যালেষ্টাইন ও মিসরে ইস্‌লামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

† এই হজরত জাফর, আবু তালেবের পুত্র এবং হজরত আলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও হজরত মোহাম্মদের খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি অতি অল্প বয়স্ক ছিলেন।

পলায়ন (হেজরত) করিলেন। তাঁহার ঐ প্রস্থানের দিন হইতে হিজরী সনের গণনারম্ভ হয়।

হজরত মোহাম্মদের মক্কায় ধর্ম্মপ্রচারকালে মদিনাবাসী ৬ জন লোক কার্য্যোপলক্ষে মক্কায় আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর বৎসর আরও ৬ জন, মক্কায় আসিয়া ইস্লামের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে হজরত মোহাম্মদ, ধর্ম্মপ্রচার নিমিত্ত মসাএব (মসাএব বেন্ আমির) (?) নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রচারককে মদিনায় পাঠাইয়াছিলেন। তদ্দারা মদিনায় ইসলাম ধর্ম্মের উজ্জ্বল রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছিল। পর বৎসর মদিনার ৭৫ জন ভক্তিমান মুসলমান, মক্কায় আসিয়া, মদিনায় যাইবার নিমিত্ত হজরত মোহাম্মদকে আমন্ত্রণ দিয়া গিয়াছিলেন। অতএব, ৬২২ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্কা হইতে প্রস্থান করিয়া মদিনায় গিয়া উপস্থিত হইলে, মদিনার অধিবাসীবর্গের অনেকেই সসম্মানে, সমাদরে ও ভক্তি সহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, মদিনার পূর্ব্ব নাম—'এসরব'—তখন হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'মদিনাতুর-রসুল' (পয়গম্বরের সহর) বা মদিনা নামে খ্যাত হইল।

যে সকল বিশ্বাসী নর নারী আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হজরত মোহাম্মদের মদিনা যাওয়ার সংবাদে আহ্লাদিত হইয়া, সানন্দে তথায় গমন করিলেন। যাঁহারা মদিনায় পলায়ন করিলেন, তাঁহাদিগকে 'মহাজের' (ধর্ম্মার্থে গৃহত্যাগী) বলা হয় এবং যে সকল মহাপুরুষ ঐ গৃহত্যক্ত, বিতাড়িত ও বিপন্ন ব্যক্তিবর্গকে আশ্রয় দিলেন, তাঁহারা 'আনসার' (আশ্রয় দাতা) নামে অভিহিত হন।

অবাধ প্রচার ও সন্ধি বন্ধন।—হজরত মোহাম্মদ মদিনায় গিয়া বিনা বাধাবিঘ্নে সানন্দে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার তেজস্বিনী, মর্ম্মস্পর্শিণী এবং হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রভাবে, অত্যল্প দিনেই মদিনার অধিকাংশ অধিবাসী ও ইহুদী একেশ্বরবাদ-ধর্ম্মের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া ইস্লামের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। অবশিষ্টেরা মুসলমান হইল না বটে, কিন্তু মুসলমানের প্রাধান্য স্বীকার করিল। মদিনার মুসলমানেরা প্রতিপত্তিশালী হইলেন।

মুসলমানের দুই দল।—একদল মহাজের ও অন্যদল আনসার। যাহাতে ঐ দুইদল একত্র সম্মিলিত হন ও পরস্পরের মধ্যে জাতিভেদ না থাকে, এবং ভবিষ্যতে দুইদলে গোলযোগ বাধিয়া ইস্লামের অঙ্গভঙ্গ না হয়, এতদর্থে হজরত মোহাম্মদ, মহাজের ও আনসারদিগকে একত্র সমবেত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন করিয়া দিলেন। তদবধি 'ধর্ম্মের ভ্রাতা' সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একে অপরের সুখ দুঃখের সমভাগী হইলেন। ইস্লামের মূল দৃঢ় হইল।

অতঃপর যাহাতে মদিনা ও তৎসন্নিহিত আরবজাতি ও ইহুদীজাতির সহিত মুসলমানদিগের কোনরূপে বিবাদ উপস্থিত হইয়া ইস্লামের বল খর্ব্ব না হয়, তদুদ্দেশ্যে দূরদর্শী হজরত মোহাম্মদ, ঐ উভয় জাতির সাংসারিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা একেবারে অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তাহাদের স্বাধীনতা বজায় থাকিল। তাহাদিগকে ও মুসলমানদিগকে, এক সম্প্রদায় গণ্য

করিয়া লওয়া হইল। ঐ মর্ম্মে অঙ্গীকার পত্র বা সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইল। ঐ সকল জাতির মধ্যে সুখশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

কোরেশের যুদ্ধ ঘোষণা।—পূর্ব্বে আরব জাতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের কোন খ্যাতনামা পিতৃপুরুষের নামে স্বস্ব সম্প্রদায়কে অভিহিত করিত এবং সেই নামে সর্ব্বত্র পরিচিত ও আহুত হইত। ঐ রীতি পদ্ধতি অনুসারে, কোরেশ নামক এক প্রতিভাশালী আরবের বংশধরেরা প্রাচীন কাল হইতে মক্কায় "কোরেশ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। একমাত্র কোরেশেরাই মক্কার মধ্যে, এমন কি সমগ্র আরবের মধ্যে, সম্মান ও সম্ভ্রমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।—তাঁহারাই কালে কালে মক্কার শরীফ-পদে অভিষিক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। গিবন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও তাঁহাদিগকে মক্কার রাজা (Prince of Mecca) বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ঐ কোরেশ কুলেই ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হজরত মোহাম্মদের জন্ম হইয়াছিল।—ধর্ম্ম প্রচারে দণ্ডায়মান হওয়ায় ঐ কোরেশেরাই তাঁহার প্রধানতম শত্রু হইয়াছিল।

হজরত মোহাম্মদ মদিনায় গিয়া সসম্মানে গৃহীত হইলে, মহাজের ও আনসারে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইলে, এবং ইহুদী ও অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধি-বন্ধন হইয়া গেলে, ধর্ম্মদ্রোহী-কোরেশ সম্প্রদায় বিচলিত হইয়া উঠিল। ইস্লাম ধর্ম্ম স্থায়িত্ব লাভ করিলে আরবের প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্মের উৎসাদন হইবে, মুসলমানের দলবল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, নির্ব্বাসিত মুসলমানেরা মক্কার উপর চড়াও করিয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, কোরেশ-দিগকে পদানত হইতে হইবে, সমগ্র আরবে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইত্যাদি রূপ চিন্তায় কোরেশ কুল ব্যাকুল হইল। উপায় কি? একমাত্র উপায়—তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ! এখন ত মুসলমানেরা কোরেশের প্রতিযোগিতা করিবার উপযোগী বলসঞ্চয় করিতে পারে নাই, রণ কৌশলে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র বা সাজ সরঞ্জাম তাহাদের নাই। অতএব, হজরত মোহাম্মদ মদিনায় যাওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই কোরেশেরা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফেলিল!

আত্মরক্ষার্থ কোরআনের ব্যবস্থা।—কোরআন শরীফে ধর্ম্ম প্রচারে অস্ত্রধারণের বিধান নাই; কিন্তু অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের যথেষ্ট আদেশ আছে। হজরত মোহাম্মদ মদিনায় প্রস্থান করিলেও, যখন কোরেশেরা ক্ষান্ত হইল না বরং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, তখন তাঁহার প্রতি আল্লার এইরূপ আদেশ হইল—"মুসলমানেরা বলে, 'এক মাত্র আল্লাই আমাদের প্রতিপালক;' এই হেতুতেই বিধর্ম্মীরা অবিচার ও অত্যাচার দ্বারা তাহাদিগকে তাহাদের বাসস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে; অতএব, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে মুসলমানগণের অধিকার আছে; ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য করিতে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম।"* অত্যাচারীগণের সহিত যুদ্ধ করিবার, হজরত মোহাম্মদের প্রতি কোরআনের এই প্রথম

* কোরআন শরীফ সুরা হজ্জ। (২২শ অধ্যায়।)

আদেশ। ইহা ভিন্ন কোরআন শরীফের অন্যান্য স্থানেও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবার আদেশ আছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা।—আবু-জেহেল কোরেশদিগের প্রধান সরদার; মক্কার সকল অধিবাসীই তাহার আজ্ঞাবহ। তাহার মন্ত্রণায় মদিনা আক্রমণ স্থির হইল—সে সংবাদ অচিরে মদিনায় পঁহুছিল। উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগায়োজন হইতে লাগিল।

ইতাবকাশে—হজরত মোহাম্মদ প্রথম হিজরীর সফর মাসে ও দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিয়াস্-সানি মাসে * মদিনা ও মক্কার পথি মধ্যস্থ ওদ্দান নামক স্থানের এবং লোহিত সাগরের পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী ইয়াম্বু বন্দর সন্নিহিত জিল-আসিয়া নামক স্থানে দুই আরব সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধি করিয়া লইলেন। স্থির হইল যে, কোরেশ ও মুসলমানে যুদ্ধ বাধিলে, তাহারা নিরপেক্ষ থাকিবে, কাহারও সাহায্য করিবেনা। কোরেশেরা মদিনা আক্রমণ করিবার পথে যে সকল আরব সম্প্রদায়কে পাইবে, তাহাদিগকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দলভুক্ত করিয়া লইবে—এই আশঙ্কায় কোরেশের বলবৃদ্ধির পথরোধ করিবার জন্য, হজরত মোহাম্মদকে ঐ দুই আরব সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধি করিতে হইল।

মক্কাবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ গোপনে ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মদিনা পলায়নের প্রতীক্ষা করিতেন; মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিলে বা মদিনা যাইবার কথা প্রকাশ পাইলে, বিধর্ম্মীদের হাতে তাঁহাদের রক্ষার উপায় ছিল না। সুতরাং কোরেশদিগের কোন সম্প্রদায় বাণিজ্য ব্যপদেশে সিরিয়া প্রভৃতি দেশে গেলে, ঐ ছদ্মবেশী মুসলমানেরা তাহাদের দলে মিশিয়া মক্কার বাহির হইয়া পথিমধ্য হইতে মদিনার দিকে চলিয়া যাইতেন। হজরত মোহাম্মদ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে সসমাদরে মদিনায় লইয়া যাইতেন। † ঐ উদ্দেশ্যে এবং কোরেশদিগের গতি বিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার অভিপ্রায়ে, তিনি কখনও নিজে মদিনার বাহিরে যাইতেন এবং কখনও বা মহাজের ও আনসারদিগকে পাঠাইয়া দিতেন। কোরেশদিগের জন্য মুসলমানদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত।

মুসলমানেরা যখন ঐরূপ সতর্ক ভাবে মদিনায় অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সেই সময়ে (২য় হিজরীর রবিঅল আউল মাসে) কোর্জ্জ বেন্ জাবের নামক এক কোরেশ সরদার, কতিপয় দস্যুর সহিত গোপনে মদিনা অঞ্চলে গিয়া, মদিনার বাহিরে মুসলমানগণের পশুপাল বিচরণ করিতে দেখিয়া সে গুলি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। মদিনায় যাওয়ার পর মুসলমানেরা এখনও কোরেশদিগের কোনই অহিতকর কার্য্য করেন নাই—অথচ কোরেশ অগ্রগামী হইয়া

* হিজরী সনের মাস এই গুলি :—১। মহরম ২। সফর ৩। রবিউল আউওল ৪। রবিউস্ সানি ৫। জমাদিউল আউওল ৬। জমাদিয়স্‌সানি ৭। রজব ৮। সাবান ৯। রমজান ১০। সওয়াল ১১। জেলকদ ১২। জেলহজ্জ।

† সেকদাদ বিন্ আমর এবং ওৎবা বিন্ গোরদান (?) উক্ত প্রকারে মদিনায় চলিয়া আসেন।

তাঁহাদের পশুপাল লুটিয়া লইল। ইহা দ্বারা অনুমান হয়, যেন কোরেশদের অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবার জন্য তাহারা প্রকারান্তরে মুসলমানদিগকে আহ্বান ও উত্তেজিত করিয়া গেল।

মুসলমানের দস্যুতাপবাদ ক্ষালন।—ইউরোপীয় জীবনী লেখকগণের অনেকেই মুসলমানের প্রতি দস্যুতার অপবাদ আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই; ঐ অপবাদ গুলি কেবল ভিত্তিহীন কিংবদন্তীর উপর স্থাপিত।+ এইরূপ একটা ঘটনা হইয়াছিল যে, হজরত মোহাম্মদ দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিয়াস্ সানি মাসে, কোরেশদিগের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ ও কোন মুসলমান মক্কা হইতে বাহির হইয়া থাকিলে তাহাকে নিরাপদে আনয়ন জন্য আবদুল্লা (আবদুল্লা বিন্ জহ্‌শ) নামক জনৈক ব্যক্তিকে অপর ৭জন বা ১২ জন মহাজের সহ মক্কার দিকে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট তিনি এই মর্ম্মের এক "হুকুম নামা" দিয়াছিলেন, "তোমরা কোরেশদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাকে সংবাদ দিবে; কোরেশদিগের কেহ স্বইচ্ছায় তোমাদের দলে আসিলে, তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিবে; আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য কাহারও প্রতি বল প্রয়োগ করিবে না।" ঐ হুকুম নামা লইয়া তাঁহারা মক্কা হইতে একদিনের দূরবর্ত্তী পথস্থিত "নাখ্‌লা" নামক স্থানে শিবির নিবেশিত করিয়াছিলেন।

এদিকে কোরেশের ৪ জন ব্যবসায়ী সিরিয়া হইতে বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভার লইয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া মহাজের আবদুল্লার ক্রোধ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ বশতঃ হজরত মোহাম্মদের হুকুমনামার আদেশ বিস্মৃত হইয়া কোরেশদিগকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণ রোধ করিতে গিয়া দল পতি মারা পড়িল; দুইজন বন্দী হইল; অপর ব্যক্তি প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।* মুসলমানেরা তাহাদের বানিজ্য দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া লইলেন।

আবদুল্লা মদিনায় ফিরিয়া গেলে তিনি হুকুমনামার আদেশের বিপরীত আচরণ করার জন্য হজরত মোহাম্মদ তাঁহার প্রতি অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন এবং মৃত কোরেশ দল-পতির জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাহার প্রাণের বিনিময়ে অর্থদান করিলেন।+ বন্দী দুইজন মুক্তিলাভ করিয়া মক্কায় প্রস্থান করিল।

+ এই অপবাদের মূলে কোন কিংবদন্তিও নাই, উহা ইউরোপীয় লেখকগণের স্বকপোল-কল্পিত ও সম্পূর্ণ মৌলিক আবিষ্কার। —সম্পাদক।

* ঐ কোরেশ দলপতির নাম, সামর বিন্ হাজরমি ছিল।

+ কোরআন শরীফে সুরা নেসায় উক্ত হইয়াছে যে, (১) কোন মুসলমান ভুলক্রমে কোন মুসলমানকে বধ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একজন মুসলমান দাসকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দেওয়াইবে এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারেশদিগকে মৃতের প্রতি-মূল্য বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থদান করিবে। (২) শত্রু সম্প্রদায় মধ্যে কোন মুসলমান প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিলে এবং তাহাকে কোন মুসলমান ভুল বশতঃ বধ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একজন মুসলমানের দাসত্ব মোচন করাইতে হইবে। (৩) মুসলমানেরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে

মক্কার মুসলমানদিগের প্রতি কোরেশেরা যে সকল লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিল, আবদুল্লার মনে তৎসমুদায় জাগরূক ছিল; তাহার উপর অল্পদিন পূর্ব্বে কোরেশেরা মুসলমানদের পশু পাল লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল। এমত অবস্থায় আবদুল্লা প্রবল প্রতিহিংসা বশে কোরেশ-দিগের মাত্র এক জনকে বধ করায় ও দ্রব্য সম্ভার লুটিয়া লওয়ায়,—কোরেশদিগের বহু অত্যা-চারের কেবল একটি প্রতিশোধ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ ঘটনা দস্যুতার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেনা। তুমি অগ্রে আমার এক ভ্রাতাকে মারিয়া ফেলিলে, তাহার ঘর লুট করিলে, তাহাতে তোমার অপরাধ হইল না, আর আমি যেমন প্রতিহিংসা বশে তোমার এক ভ্রাতাকে বধ করিলাম ও তোমার দ্রব্য সামগ্রী লুঠ করিলাম, অমনি আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইল! তোমার কার্য্য সাধুতায় ও আমার দস্যুতায় পরিণত হইল! ধন্য বিচারের পদ্ধতি! একদেশ দর্শী "লাইফ" লেখকেরা খুজিয়া খুজিয়া কেবল মুসলমানের দোষগুলিই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

৬২২ খৃষ্টাব্দে হজরত মোহাম্মদের মদিনা যাত্রার পরবর্ত্তী ১০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার পক্ষ হইতে মোটের উপর ৩২ বার যুদ্ধ অভিনয় বা অস্ত্রধারণ করা ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল অভিযানের মধ্যে ৬ বার আত্মরক্ষা জন্য, ৭ বারে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত, ৪ বার বিদ্রোহ দমনে, ১ বার সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ করণে এবং ১৪ বার শত্রুর আক্রমণ নিবারণে তাঁহার পক্ষে অস্ত্র ধারণের আবশ্যকতা হইয়াছিল। আমরা এক একটি পরিচ্ছদে এক এক বিষয়ের অভিযান বা যুদ্ধের বিবরণ উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে নিতান্ত অনিবার্য্য কারণ না হইলে, হজরত মোহাম্মদ কখনও যুদ্ধাদেশ দেন নাই। সকল অভিযানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না; তজ্জন্য কোন কোন স্থানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরের অনিষ্ট জনক কোন কোন ঘটনা হইয়া পড়িয়াছিল। তত্তৎ বিষয়েরও যথা স্থানে বর্ণনা করা যাইবে এবং হজরত মোহাম্মদ তত্তৎ সম্বন্ধীয় ঘটনায় যে একে বারে নিরপরাধ ছিলেন, তাহাও প্রদর্শিত হইবে। (ক্রমশঃ)

আবদুল লতিফ।

এবং তাহাদের মধ্যে কেহ ভ্রম প্রমাদ বশতঃ মুসলমানের হস্তে নিহত হইলে, ঐ হত ব্যাক্তির উত্তরাধিকারীগণকে তাহার হত্যার প্রতি মূল্য বা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ অর্থদান এবং একজন মুসল-মান দাসের দাসত্ব মোচন বিধেয়।

কিন্তু এখানে কোরেশ দলপতি মুসলমান না থাকিলেও এবং তাহার সহিত সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ না থাকিলেও বিনা কারণে মুসলমানেরা তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া হজরত মোহাম্মদ তাহার প্রাণের বিনিময়ে অর্থদান করিয়াছিলেন।

কোরআন।

(লিখন এবং সম্পাদন)

এখন আমরা যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক মহোদয়গণের অসীম অনুগ্রহ, এবং ডাঃ মিঙ্গানা প্রমুখ ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতদিগের অগাধ পাণ্ডিত্যে সম্প্রতি বিষয়টীর গুরুত্ব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে!

"নবাবিস্কৃত হস্তলিপি" সম্বন্ধে আলোচনা।

মোসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, খোদা তায়ালার পরে, খোদার বাণী কোরআন মজিদের ন্যায় সত্য এবং বিকার ও পরিবর্ত্তন শূন্য দ্বিতীয় কিছু নাই। মোসলমানদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া সম্প্রতি কিছুকাল হইতে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণও ঐরূপ দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঈশ্বর প্রেরিত বাণী যে ঈশ্বরের ন্যায় নির্ব্বিকার এবং অপরিবর্ত্তনশীল, এই প্রাথমিক সত্যটী তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যখনই কোরআন ঘোষণা করিল :—

১ لا مبدل لكلمته

খোদার বাণীর কেহই:পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।— ১৫ পা, ১৬ রো।

২ انه لكتب عزيز' لاياتيه الباطل من بين يديه' ولا من خلفه' تنزيل من حكيم حميد *

নিশ্চয় ইহা (এই কোরআন) মহিমান্বিত গ্রন্থ, পূর্ব্বে অথবা পরে কখনও ইহার কোন রূপ বিকৃতি ঘটিতে পারে না, ইহা কীর্ত্তিমান জ্ঞানীর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ২৪, ১৯

৩ افلا يتدبرون القرآن' ولو كان من عند غيرالله' لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

তাহারা কোরআনের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখে না কেন? যদি তাহা খোদা ভিন্ন অন্য কাহার বাণী হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নানারূপ বিকার এবং পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইত। ৫, ৮।

—তখনই অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন,—এবং তওরাৎ, ইঞ্জিল, জবুর ও বেদ প্রভৃতির মধ্যে এ বিষয়ে কিছু মাত্র উল্লেখ না থাকিলেও, উক্ত গ্রন্থগুলির উপযুক্ত ভক্তগণ (گواهان چست) স্বস্ব ধর্ম্ম গ্রন্থের বিশুদ্ধতা, অবিকৃততা এবং প্রামাণিকতা সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

ধনে, জনে ও বলে পৃথিবীতে আজকাল খ্রীষ্টান ভ্রাতাগণই সকলের শীর্ষ স্থানীয়। সুতরাং এই নব বিজয়-অভিযানে তাঁহারাই অগ্রণী হইলেন।

বিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হওয়ায়, অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বিজ্ঞান অসাধ্য সাধন করিবে কি প্রকারে? অসম্ভব কে সম্ভব করিবে কি উপায়ে? খ্রীষ্টান বন্ধুগণ প্রাণ-পন যত্ন করিলেন, নানরূপ বৈজ্ঞানিক কৌশল খাটাইলেন—আমরা আমাদের ভাগ্যবান ভ্রাতা-দিগের অসাধারণ প্রতিভা এবং অটল অধ্যবসায়ে চির দিনই আস্থাবান—সুতরাং ভাবিলাম, এতদিন পরে বুঝিবা মনোরথ সিদ্ধ হয়, এবং প্রচলিত ইঞ্জিল কেতাবের বিশুদ্ধতা এবং অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হইয়া উঠে—এবং খুব সম্ভব তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা সপ্রমাণ করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, সমুদয় পৃথিবী মন্থন করিয়া, সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া, তাঁহারা মূল ইঞ্জিলেরই অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারিলেন না!

কিন্তু কর্ম্মী পুরুষগণ কখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। আর অধুনা জগতের মধ্যে খ্রীষ্টান বন্ধুগণ অপেক্ষা কর্ম্মী পুরুষ কাহারা? যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, পৃথিবীর জন-সংখ্যা হইতে ইঞ্জিলের সংখ্যা অধিক হইলেও, সমগ্র পৃথিবীতে নকল বই এক খানিও আসল ইঞ্জিল নাই, তখন তাঁহারা ইঞ্জিলের বোঝা কোরআনের স্কন্ধে চাপাইতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। পৃথিবীর চতুর্থাংশ-অধিবাসীর প্রায় প্রত্যেকের বাটীতেই কোরআন মজিদ বিদ্যমান। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়,—কুত্রাপি আসল বই এক খানিও নকল কোরআন নাই। এই অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহারা বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন। অবশেষে এক দিন, ফেরআওনদিগের দেশে নীল নদের তীরে, এই হারা নিধির সন্ধান পাওয়া গেল! মিঃ লিউইস ইউরোপ এবং এসিয়া মন্থন করিয়া, পরিশেষে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং মিশর দেশীয় কোন পুরাতন দ্রব্য বিক্রেতার ভগ্ন কুটিরের অভ্যন্তরীণ প্রদেশ হইতে, কএক খানি জীর্ণ চর্ম্মখণ্ড আবিষ্কার করিলেন! আনন্দবিহ্বলচিত্তে লিউইস ঐ জীর্ণ পত্রিকাগুলির মর্ম্মোদ্ধারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। কিন্তু সফলতা লাভের পূর্ব্বেই তিনি লোকান্তর গমন করিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বিদুষীপত্নি শ্রীমতি লিউইসকে এই অমূল্য রত্নগুলি প্রদান করিয়া যান। মিসেস লিউইস স্বামীপ্রদত্ত উপহার লইয়া বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বন্ধুবর ডাঃ মিঙ্গানা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক সেগুলির পাঠ-উদ্ধার করিলেন। (নভেম্বর ১৯১৩) তখন লণ্ডন টাইম্‌সের জবানী সমগ্র জগতবাসী জানিতে পারিল যে ইহা—কোরআনের অতি—অতি—অতি প্রাচীন হস্ত লিপি!

در خرابات مغان نور خدا می بینم

وین عجب بین که چه نورے زکجا می بینم

টেম্‌স্‌-তীরের তত্ত্ববাহক যাহা বলিয়াছেন, লণ্ডনপ্রবাসী মুসলমানগণ তাহার যথোচিত প্রত্যুত্তর দান করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী মুসলমান, আসুন আমরা "প্রবাসী"র লেখক এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহাই শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করি। গত চৈত্রের প্রবাসীতে এই হস্তলিপি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—

১। প্রাপ্ত হস্তালিপিটি কোরআনের একাংশ।

২। ইহা অতি প্রাচীন। খলিফা ওস্‌মান কোরআনের যে সমস্ত পুথি নষ্ট করিতে হুকুম করিয়াছিলেন, এই লিপিটি সেই সব পুথির কোন একখানির অংশ।

৩। প্রচলিত কোরআনের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

৪। খলিফা ওসমান প্রাচীন লিপি নষ্ট করিয়া নূতন পাঠ প্রস্তুত করাইয়া, নূতন প্রণালীতে কোরআনের বচন বিন্যাস করান।

৫। হজরত মোহাম্মদের বাণী তাঁহার মৃত্যুর ১৫ বৎসর পরে ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়।

সুতরাং—(ক) প্রচলিত কোরআন রসুলের সময় লিখিত হয় নাই,

(খ) প্রাচীন কোরআনের সহিত প্রচলিত কোরআনের ঐক্য নাই।

১। প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, প্রাপ্ত হস্ত লিপিতে কোরআন মজিদের কতক গুলি শ্লোক লিখিত রহিয়াছে।

২। দ্বিতীয় বিবরণটি অতিশয় গুরুতর। লেখক তাহা বুঝিয়াছেন এবং সেই জন্যই তিনি এ বিষয়ে ত্রিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন :—

(ক) লিপির অধিকারিণী শ্রীমতি লিউইস মনে করেন যে, ইহা খলিফা ওসমান কর্ত্তৃক প্রচারিত কোরআনের পূর্ব্বকার লেখা! (কি অকাট্য প্রমাণ!)

(খ) বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে লিপিটি অষ্টম শতাব্দির পূর্ব্বকার লেখা।

আরবীয় লিপির ক্রম-বিকশ সম্বন্ধে এই বিশেষজ্ঞদিগের অভিজ্ঞতা যে কিরূপ—তাহা আমরা অবগত নহি; পক্ষান্তরে শ্বেত দীপবাসী প্রত্যেক বিশেষজ্ঞের "অনুমান" ও "স্থিরকরা" আমরা অবনত মস্তকে মানিয়া লইতেও প্রস্তুত নহি। বিশেষজ্ঞ হাণ্টার বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, বিশেষজ্ঞ ষ্টুয়ার্ট সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, বিশেষজ্ঞ মেকলে বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না।

(গ) "প্রাপ্ত হস্তলিপিতে হাম্‌জা বা স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। আরবী লেখায় ঐ সমস্ত চিহ্ন অষ্টম শতাব্দিতে প্রচলিত হয়।" অর্থাৎ এই বিশেষজ্ঞেরা ঐরূপ মনে করেন। নচেৎ আমরা হিজরী সপ্তম শতাব্দিতে লিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি যে :—

ان الناس عبروا يقرؤن فى مصحف عثمان فيفا اربعين سنة الى ايام عبدالملك بن مروان ثم كثرالتصحيف وانتشر بالعراق ففزع الحجاج بن يوسف الى كتابه وسألهم ان يفعلوا لهذه الحروف المشتبه علامات فيقال أن نصر بن عاصم قام بذلك (১)

অর্থাৎ, "হজরত ওসমান কোরআন মজিদের যে বিশুদ্ধ হস্তলিপি প্রচারিত করেন, আবদুল মালেকের সময় পর্য্যন্ত সকলে তাহাই পাঠ করিতে থাকে; কিন্তু ক্রমে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী নানাজাতীয় লোক এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায়, কোরআনের নানারূপ পাঠান্তর এবং উচ্চারণ বিভ্রাট পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে হাজ্জাজে সাকাফী (এরাক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা) বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠেন; এবং তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে বিশুদ্ধ পাঠের উপায় উদ্ভাবন করিতে আদেশ করেন। তখন নাস্‌র্‌ এব্‌নে আসেম স্বরচিহ্নাদি উদ্ভাবন করেন।" আবদুল মালেক ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন, এবং ৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বরচিহ্নাদির ব্যবহার সপ্তম শতাব্দিতে আরম্ভ হইয়াছিল; অষ্টম শতাব্দিতে নহে।

এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, হজরত ওসমানের প্রচারিত হস্তলিপিতেও স্বর চিহ্নাদির ব্যবহার ছিল না। সুতরাং প্রাপ্ত হস্তলিপিটিতে স্বর-চিহ্নাদির ব্যবহার নাই বলিয়াই যে তাহা খলিফা ওসমানের—কোরআনের পূর্ব্বকার—সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এই তথাকথিত বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, এ লেখা অষ্টম শতাব্দির পূর্ব্বকার। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দি হিজরীর ২য়—৩য় শতাব্দি। অষ্টম শতাব্দির পূর্ব্বকার,—কবেকার? বিশেষজ্ঞ ডাঃ মিঙ্গানা বলিতেছেন, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দির। অপর কোন বিশেষজ্ঞ না হয় বলিবেন—প্রথম শতাব্দির।

কিন্তু উভয় শতাব্দির আরব্য হস্তলিপি এখনও জগতে দুর্লভ নহে। প্রথম শতাব্দির প্রারম্ভে রসুলে করিম মিশরাধিপতিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, বিশেষজ্ঞ মিঃ পি, বেজারের ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে তাহার বিশ্বস্ততাও প্রমাণিত হইয়াছে। এখন এই পত্র খানি কনষ্ট্যান্টিনোপলের রাজকীয় পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত। গত জ্যৈষ্ঠের "আল-এসলামে" উক্ত পত্রের একখানা প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবাসী শ্রীমতি লিউইসের কোরআনের অনুলিপি ছাপিয়াছেন; পাঠক, উভয় অনুলিপি একত্র করিয়া মনোযোগের সহিত মিলাইয়া দেখুন; দেখিবেন, উভয় লিপির মধ্যে কিছু মাত্র সামঞ্জস্য নাই।

লণ্ডন প্রবাসী খাজা কামাল উদ্দীন অনেক অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, হজরত ওস্‌মান কর্ত্তৃক প্রচারিত কোরআনের বিশুদ্ধ হস্তলিপির কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন; অধিকন্তু তিনি জামে-এ-আজহার, মিশরীয় সরকারী পুস্তকাগার এবং কনষ্ট্যান্টিনোপলের বিভিন্ন পুস্তকা-

---

(১) ابن خلكان (এব্‌নে খাল্লাকান) ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা।*

লয় অনুসন্ধান করিয়া ১ম, ২য় এবং ৩য় শতাব্দির লিখিত একাধিক হস্তলিপিও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ডাঃ মিঙ্গানার পুস্তকের খণ্ডন করিয়া তিনি যে পুস্তক লিখিতেছেন, তাহাতে উপরোক্ত সমুদয় প্রাচীন হস্তলিপির "ফটো" মুদ্রিত হইবে। এই সকল হস্তলিপির প্রামাণিকতা এবং বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নানারূপ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে,—এবং খাজা কামাল উদ্দীন, সমুদয় বিষয়ের সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দির লিখন-প্রণালীর সহিত শ্রীমতি লিউইসের হস্তলিপির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই।

শ্রীমতির হস্তলিপি যে কোন্ শতাব্দির তাহা আমরা জানি না। "বিশেষজ্ঞেরা"ত এ বিষয়ে বিভিন্ন মত। শ্রীযুক্ত মিঙ্গানা বলিতেছেন যে, ইহা দ্বিতীয় শতাব্দির লেখা; কিন্তু শ্রীমতি লিউইস বলিতেছেন, ইহা খলিফা ওসমান কর্ত্তৃক কোরআন প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বকার,—অর্থাৎ ১ম শতাব্দির প্রারম্ভের লেখা।

৩। "প্রচলিত কোরআনের সহিত এই নবাবিষ্কৃত হস্তলিপির যথেষ্ট পার্থক্য আছে।"—কারণ—এই বিশেষজ্ঞগণ ঐরূপ বলিয়াছেন! কিন্তু প্রাচীন আরবা হস্তলিপির পাঠোদ্ধার এবং তাহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কার্য্যে এই বিশেষজ্ঞগণ কিরূপ দক্ষ, পাঠোদ্ধার কার্য্যে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং হস্তলিপির সহিত উদ্ধৃতপাঠ মিলাইয়া দেখিয়া তাহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কয়জন বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, প্রবাসীর লেখক তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। (১)

(১) সহস্রাধিক বৎসরেরও পূর্ব্বকার হস্তলিপি, অথচ তাহা প্রস্তরফলকে খোদিত নহে, তাম্র বা লৌহপাত্রে উৎকীর্ণ নহে!

লেখার ভঙ্গিমাও কম জটিলতা-ব্যঞ্জক নহে; দক্ষিণ হইতে বামে, বাম হইতে দক্ষিণে, লেখার উপর লেখা—তাহার উপর লেখা, তস্যোপরি লেখা; স্থান বিশেষে তস্যোপরি লেখা অর্থাৎ ৫ প্রস্ত লেখা।

পক্ষান্তরে লিপি-পাঠক হইতেছেন—প্রসিদ্ধ এসলাম-বিদ্বেষী খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক, পর ধর্ম্মের নিন্দাবাদ ও দোষ কীর্ত্তনের পুণ্যময় কর্ত্তব্য পালন করিয়া যিনি নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন!

আরব্য সাহিত্যে অথবা পুরাতন লিপির পাঠোদ্ধার কার্য্যে ইতিপূর্ব্বে জগতবাসী তাঁহার কোনরূপ কৃতিত্বেরও পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই!

এ হেন লিপি, এ হেন লেখা, আর এ হেন পাঠক সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু সম্প্রতি আমরা সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিব না। আমরা তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, ডাঃ মিঙ্গানা ও তাঁহার সহচরী শ্রীমতি লিউইস যাহা পাঠ করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ, এবং পার্থক্য ও বৈষম্য সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিতেছেন, তাহাও সত্য।

من خراباتي و ديوانه ام و عاشق و بس
بیشتر زین چه حکایت بکند غمـــزم ؟

পার্থক্য এবং বৈষম্য সম্বন্ধে বিশদরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে শ্রীমতির হস্তলিপিতে কতকগুলি শ্লোক (আয়াৎ) আছে এবং প্রচলিত কোরআন মজিদের সহিত কোন্ কোন্ শ্লোকে তাহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রদান করা আমরা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

ত্রিত্ববাদের উপাসক ডাঃ মিঙ্গানা ও শ্রীমতি লিউইস এতৎ প্রসঙ্গে লিখিত তাঁহাদিগের নব প্রচারিত গ্রন্থে (১) প্রাপ্ত চর্ম্মপত্রিকাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, নিম্ন লিখিতরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

কোরআন (ক), কোরআন (খ), কোরআন (গ)

কোরআন (ক)

ইহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে :—

১।	সুরা নুর,		১৭	আয়াৎ হইতে	২৯	আয়াৎ পর্য্যন্ত।
২।	,,	কাসাস,	৪১	,,	,,	৮১
৩।	,,	আনকাবুত	১৭	,,	,,	৩০
৪।	,,	মোমেন	৭৮	,,	,,	৮৫
৫।	,,	আস্‌সাফ্‌ফ	প্রথম	,,	,,	৩০
৬।	,,	দোখান	৩৮	,,	,,	৫৯
৭।	,,	জাসিয়া	প্রথম	,,	,,	২০

কোরআন (খ)

নিম্নলিখিত আয়াৎগুলি ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে :—

১।	সুরা হুদ,		২	আয়াৎ হইতে	৩৯	আয়াৎ	পর্য্যন্ত
২।	,,	রাআদ,	১৮	,,	,, ৪৩	,,	,,
৩।	,,	এব্রাহিম	প্রথম	,,	,, ৮	,,	,,
৪।	,,	হাজার্	৮৫	,,	,, ৯৯	,,	,,
৫।	,,	নাহাল	প্রথম	,,	,, ১৩৮		
৬।	,,	আস্‌রায়া	প্রথম	,,	,, ৫৭	,,	,,

কোরআন (গ)

ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াৎ সকল আছে :—

১। সুরা আ'রাফ, ১৩৯ আয়াৎ হইতে ১৬৮ আয়াৎ পর্য্যন্ত।

---

(১) Aligarh Institute Gazetteএর ১১ই এবং ১৮ই নভেম্বর সংখ্যায় এই গ্রন্থের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে ডাঃ মিঙ্গানা ও শ্রীমতি লিউইসের যে সকল উক্তির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই Institute Gazette হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

২। সুরা বারআ'ৎ, ১৮ আয়াৎ হইতে ৭৯ আয়াৎ পর্য্যন্ত।

এই হইল মোট শ্লোক সংখ্যা। এখন পার্থক্যের তালিকা পাঠ করুন। যথারীতি ইহাও তিন ভাগে বিভক্ত।

১ম, বানান অথবা অক্ষরের পার্থক্য, সুতরাং ডাঃ মিঙ্গানা মনে করেন যে, এই পার্থক্যহেতু অর্থের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য ঘটে নাই।

সুরার নাম ওআয়াতের সংখ্যা।	প্রচলিত কোরআনের বানান বা শব্দ।	শ্রীমতি লিউইসের কোরআনের বানান বা শব্দ।
১। রা'আদ ৪৬	الله	والله
২। নাহাল ২২,	ابان	اين
৩। আহ্জাব ৯৪,	واءرض	واءرضن
৪। হুদ ২৪,	الاخسرون	لخسرون
৫। নাহাল ৩৮,	فانظر	وانظروا
৬। নাহাল ৩৬,	فاصابهم	فاصابتهم
৭। আলআসরাআ ২৪,	أانا	انا
৮। হুদ ৩১,	اراكم	اريكم
৯। আলআন্বাআ ১,	بوركلا حوله	بوركنا حوله
১০। তওবা ২৬,	لا يهدى القوم	لا يهدى القوم
১১। মোমেন ৫৮,	فلم يك ينفعهم	فلم يكن ينفعهم
১২। সেজ্দাহ্ ৫,	انما	انما
১৩। নাহাল ৯৫,	يجعلكم	جعلكم
১৪। নাহাল ৩০,	بلى	بل
১৫। দোখান ৪৪,	ايثم	اثم
১৬। নাহাল ১৭,	افلا	اولا
১৭। এব্রাহিম ৩,	خلال	خل
১৮। রাআদ ৩২,	زين	فزين
১৯। হুদ ২৫,	اخبتوا	خبتو
২০। বারআ'ত ৩৬,	فيهن	فيها
২১। বারআ'ত ৩৭,	لايهدى القوم	لايهد القوم
২২। আল-আসরাআ ২৮,	الاتعبدوا	فلاتعبدوا
২৩। হুদ ৩৪,	جادلتنا	جادلت
২৪। বারআ'ত ২৩,	ومن	فمن
২৫। বারআ'ত ৫৪,	وما	ما

২৬। সেজদাহ্	১০,	فقال لها	فقيل لها
২৭। আনকাবুৎ		وقال	قال
২৮। নাহাল	১১২,	عملت	عملته
২৯। নাহাল	৮৭,	واذا	واذ
৩০। নাহাল	২৪,	يسرون	تسرون

২য়, শব্দের পার্থক্য

১। জাসিয়া	১৮,	شيئاً	هكماء
২। জাসিয়া	১৮,	الله	اللهم
৩। বার-আত	৪৩,	وتعلم	وعلمهم
৪। আ'-রাফ	১৫৩,	ورحمة	وعلم

৩য়,—বাক্যের পার্থক্য।

ডাঃ মিঙ্গানা বলেন ঃ—নিম্ন লিখিত স্থান সমূহে প্রচলিত কোরআন-সম্পাদক, কোরআনের মূল বাক্য এবং শব্দগুলি পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত বাক্য এবং শব্দ সংযোজিত করিয়াছেন ঃ—

সুরা এবং আয়াৎ,	প্রচলিত কোরআন,	লিউইস দেবীর কোরআন।
১। বার-আত, ৩৮,	يايها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض	يايها الذين آمنوا اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض
২। বার-আত, ৩৩,	هو الذى ارسل رسوله	هو رسل رسوله
৩। বার-আত, ২৬,	وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة	وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة

ইহাই হইল—প্রায় দুইযুগব্যাপী অনুসন্ধান এবং অনুশীলনের ফল! কিন্তু ফল অকিঞ্চিৎকর হইলে কি হয়, ইউরোপীয় বর্ণনা কৌশলের ফলে তাহা অত্যন্ত গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ডাঃ মিঙ্গানা এবং তাঁহার সহচরী এই সামান্য বিষয় লইয়া ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী একখণ্ড পুস্তকও লিখিয়াছেন। কোরআনের প্রাচীন হস্তলিপির আলোচনা প্রসঙ্গে এস্‌লামের অথবা রাসুলে করিমের দোষ গুণ সমালোচনা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। ডাঃ মিঙ্গানার আলোচ্য বিষয়ের জন্য ৬।৭ পৃষ্ঠাই অতিরিক্ত হইলেও, উপরোক্ত কারণে তাহা ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী কলেবর ধারণ করিয়াছে।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে ডাঃ মিঙ্গানা প্রভৃতি সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, প্রচলিত কোরআন অশুদ্ধ এবং বিকৃত ; কারণ এই নবাবিষ্কৃত প্রাচীন এবং বিশুদ্ধ কোরআনের সহিত তাহার ঐক্য নাই।

তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত হস্ত লিপিটি যে প্রাচীন এবং বিশুদ্ধ, তাহার প্রমাণ এই যে :—

১। "হস্ত লিপির ভাষা প্রচলিত কোরআনের ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ, এবং মোহাম্মদের রচিত কোরআন যে বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত।"

২। "প্রাপ্ত হস্ত লিপিটির বানান এবং লিখন-প্রণালী, খলিফা ওসমানের আদেশে লিখিত কোরআনের ন্যায় বিশুদ্ধ এবং উন্নত নহে। খলিফা ওসমানের পরে লিখিত হইলে লিপিটির বানান এবং লিখন-প্রণালী নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ এবং উন্নত হইত ; যে হেতু কোরআনের অনুলিপি সংকলনে ভুল বানান এবং অশুদ্ধ লিখনপদ্ধতি ব্যবহার করিবার কাহারও আবশ্যক হইতে পারে না।"

কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য! ইহার সার মর্ম্ম এই দাঁড়াইতেছে যে, হজরৎ ওস্মানের আদেশে কোরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার পর পৃথিবী হইতে ভুল লেখা এবং ভুল লেখকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্বনাম-খ্যাত অধ্যাপক আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিশারদ (Doctor of Divinity) সাহিত্যাচার্য্য (Doctor of Literature) শ্রীযুক্ত মিঙ্গানা মহোদয় কিরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, ভাষা-জ্ঞান, বিশ্লেষণ শক্তি এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির কিরূপ বিস্ময়কর পরিচয় দিয়াছেন, পাঠকগণ নিশ্চয়ই তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত উদ্গ্রীব হইয়া আছেন ; কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত আমরা তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়ে—আলোচ্য সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় সম্বন্ধে আমাদের ভুবনবিখ্যাত আচার্য্য মহোদয়, মূল্যবান সময়ের কোনরূপ অপব্যবহার করা, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। তাহার ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকের মধ্যে তিনি এই বিষয়ে তিনটী পংক্তি লিখিয়াছেন ; তাহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ :—

"আরব্য ভাষায় যাহাদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এই হস্তলিপির সহিত প্রচলিত কোরআনের তুলনা করিয়া দেখিলেই স্বীকার করিবেন যে, হস্ত লিপির ভাষাই বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট।"

پری نهفته رخ و دیو در کرشمه و ناز -
بسوخت عقل ز حیرت که این چه بوالعجبی

(ক্রমশঃ)

অস্ত্র চিকিৎসায় মুসলমান।

উন্নতি-যুগে মুসলমানেরা যে চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদী স্বীকার্য্য হইলেও, অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে, তাঁহাদের পারদর্শিতার বিষয়, অনেকেই সন্দিহান। কিন্তু মুসলমানগণের অস্ত্রচিকিৎসার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা এককালে অস্ত্রচিকিৎসায়, উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অস্ত্রচিকিৎসা-সংক্রান্ত বহুবিধ অস্ত্র ও যন্ত্রাদি আবিষ্কার পূর্ব্বক, চিকিৎসা জগতকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাষ প্রদত্ত হইল, যথা :—

অস্ত্র চিকিৎসা বিশারদ—হাকিম জহরাবী।

حکیـــم زهراوي

মুসলমান অস্ত্রচিকিৎসকগণের মধ্যে, পণ্ডিত প্রবর হাকিম জহরাবীর নাম শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার সুনাম ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বর্ত্তমান অনুশীলন-বিমুখ মুসলমান সমাজের নিকট অজ্ঞাত থাকিলেও, ইউরোপের চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত সমাজে তাঁহার নাম বিশেষরূপে পরিচিত। ইউরোপের অনুশীলনকারী সমাজ, চারিশত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে অস্ত্রচিকিৎসা সংক্রান্ত তৎবিরচিত মহামূল্যবান পুস্তকাবলী প্রকাশ পূর্ব্বক, শিক্ষানুরাগের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। হাকিম 'জহরাবী' স্পেনের ভুবন প্রসিদ্ধ রাজধানী-কর্ডোভা মহানগরীর অনতিদূরবর্ত্তী উমাইয়া বংশীয় অষ্টম খলিফা আব্দুর রহমান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধিসম্পন্না 'জহরা' নগরীর অধিবাসী ছিলেন; সেই জনসমাজে তিনি 'জহরাবী' নামে পরিচিত। তাঁহার মূল নাম—আবুল কাসেম খলফ এব্‌নে আব্বাস। তিনি ৮৫০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। কর্ডোভা নগরে তাঁহার সমাধি মন্দির বিদ্যমান।

হাকিম জহরাবীর প্রণীত পুস্তকাবলীর মধ্যে, (التصريف لمن عجز عن التاليف) এই পুস্তকখানি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গ্রন্থকার এই পুস্তকখানিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) শিক্ষাগত বিভাগ (২) কার্য্যগত বিভাগ। প্রথমাংশের তুলনায় দ্বিতীয় অংশের গুরুত্ব ও খ্যাতি অধিকতর। প্রথমাংশে সর্ব্বপ্রকার রোগের বিবরণ ও তৎচিকিৎসাবিধি অতি বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে অস্ত্র চিকিৎসা ও তৎসংক্রান্ত অস্ত্র ও যন্ত্রাদির অতি চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। মুসলমানগণ যে এককালে অস্ত্র চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত অস্ত্রাদি আবিষ্কারে আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্রের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, এই পুস্তকখানি তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

জহরাবীর বর্ণিত অমূল্য গ্রন্থের ১ম ভাগ এখনও মুদ্রিত হয় নাই; দ্বিতীয় খণ্ড ইউরোপে পুনঃপুনঃ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর হইল, ভারতবর্ষেও এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম ভাগে নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি পরিলক্ষিত হয়, যথা:—

(১) যেহেতু জহরাবী, স্পেনীয় খলিফাগণের রাজ-পরিবারের নিয়মিত চিকিৎসক ছিলেন এবং আমির ওমরা ও বড়লোকগণের পক্ষে বিস্বাদ ও তিক্ত ঔষধ ব্যবহার করা নিতান্ত কষ্টকর হইত, সেইজন্য তিনি বাদশাহ ও আমির ওমরাদিগের জন্য তাঁহাদের প্রীতিকর, তিক্ততাশূন্য ও সুস্বাদ "বাদশাহী ঔষধ" শীর্ষক স্বতন্ত্র ঔষধের বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, রোগ বিয়োগার্থে ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত জলবায়ু বা স্থান পরিবর্ত্তন দ্বারা নানা উৎকট দুশ্চিকিৎস্য রোগ প্রশমনের সুব্যবস্থা তাহাতে সন্নিবেশিত আছে। বলা বাহুল্য যে, ইহাকে আধুনিক আবিষ্কার জ্ঞান করা, নিতান্ত ভ্রমাত্মক ধারণা। হাকিম জহরাবী বহুকাল পূর্ব্বে, দ্বীপমালা, পর্ব্বত শিখরাদি এবং নগর ও স্থান বিশেষে অবস্থান দ্বারা যে নানারূপ উৎকট রোগের চিকিৎসা হইতে পারে, তাহা তিনি স্বপ্রণীত উপরোক্ত পুস্তকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুস্তকের আর একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে কেবল খাদ্য দ্রব্যের সাহায্যে কিরূপে বিবিধ রোগের চিকিৎসা হইতে পারে, তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(৩) অনেকের ধারণা,—জগৎ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক মহাপণ্ডিত হাকিম আবু আলী সিনা, রোগের নিদান সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ (قانون) কানুন গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, এবং নজিবউদ্দীন সমরকন্দী তৎপ্রণীত (اسباب الامراض والعلامات) "আস্‌বাবল-আমরাজে আলআলামাত" নামক গ্রন্থে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর কাহারও কোন কথা বলিবার নাই। ইহাই চিকিৎসা শাস্ত্রের চরম তত্ত্ব পুস্তক। জহরাবী প্রণীত গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে এই ধারণার ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কারণ, তাঁহার পুস্তকে এরূপ অনেক সূক্ষ্ম ও কার্য্যকরী তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়,—যাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত কুলের পুস্তকে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিত প্রবর জহরাবী, কাশ রোগের কারণ নির্ণয় ক্ষেত্রে লিখিয়াছেন, পাকস্থলীতে কৃমি উৎপত্তি কাশ রোগের অন্যতম কারণ। এই তত্ত্বাবিষ্কারের নূতনত্ব, চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত সমাজের অবিদিত নাই।

পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ, পণ্ডিতকুলশিরোমণি জহরাবীর অলৌকিক শক্তি এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি অস্ত্র চিকিৎসার যে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়, ইউরোপের পণ্ডিতসমাজ, সেই ভিত্তির উপরেই গগনস্পর্শী উচ্চসৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইউরোপে বহুকাল যাবৎ—মহা পণ্ডিত শেখ আবু আলী সিনা ও এবনে রোশ্‌দ প্রণীত পুস্তকাবলীর প্রতি নির্ভর করিয়াই তৎকালীন মেডিক্যাল কলেজের উচ্চ শিক্ষার কার্য্য সম্পাদন করা হইত সত্য, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে যে অস্ত্র চিকিৎসার বিশেষ কোন বর্ণনাই ছিল না, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মুসলমানদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসের এই কলঙ্ক কালিমা পণ্ডিত প্রবর জহরাবী মোচন করিয়াছেন।

মুসলমান সমাজে জহরাবীর পুস্তকাবলীর যথোচিত সমাদর না হইলেও, বিদেশে এবং বৈদেশিক পণ্ডিত সমাজে তাঁহার উল্লিখিত মূল্যবান পুস্তকের যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর লাভ

ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। উক্ত পুস্তকখানি রচিত হইবার অল্পকাল পরেই তাহার সম্পূর্ণাংশ হিব্রু ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। স্পেনের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তস্থিত কেটলুন প্রদেশের কেটলুনী ভাষায়ও তাহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ওগেসেসবার্গে লাটিন ভাষায় উক্ত পুস্তকের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ—যাহাতে অস্ত্র চিকিৎসার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা সন্নিহিত আছে—১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে "অক্‌সফোর্ড" হইতে লাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদসহ স্বতন্ত্র দুই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রোফেসার টেশানঙ্গ বিশেষ যত্নের সহিত বর্ণিত পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

পুস্তকের শেষাংশ লাটিন অনুবাদসহ মূল আরবী ভাষায় দুইখণ্ডে (ইউরোপে) মুদ্রিত হইয়াছে। এই সংস্করণে অস্ত্রচিকিৎসা-শাস্ত্রসংক্রান্ত যাবতীয় অস্ত্র ও যন্ত্রাদির চিত্র অতি কৌশলে পরম যত্নের সহিত মুদ্রিত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে উক্ত পুস্তকের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও সমুদয় অস্ত্র ও যন্ত্রাদির চিত্র প্রকটিত হইয়াছে। মূল আরবী গ্রন্থের এক প্রস্থ হস্তলিপি, পাটনা—বাঁকিপুরের মহাত্মা খোদা বখ্‌শ খাঁ মর্‌হুমের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীতে বিদ্যমান আছে।

কেহ কেহ মনে করেন, মুদ্রাযন্ত্র এবং ফটোগ্রাফ ও হাফ্‌টোন-ব্লক ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, মুসলমান আমলে, চিত্র বিদ্যার বিশেষ কোনই উন্নতি ছিল না; মুসলমানগণ চিত্রাঙ্কনে নিতান্তই অপরিপক্ক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা যে একেবারে অলীক ও ভিত্তিহীন, তাহার প্রমাণ—মুসলমান আমলের চিত্রযুক্ত প্রাচীন হস্তলিপি পুস্তকাবলী। লেখক স্বয়ং হুগলী এমাম বাড়ীর "মোহ্‌সেনীয়া লাইব্রেরীতে' এবং মোর্শেদাবাদের হাজারদ্বারী প্রাসাদের পুস্তকালয়ে, বাঁকিপুরের কোতবখানায়, লক্ষ্ণৌর 'নদওতল ওলামার' পুস্তকাগারে, দিল্লীর লাল কেল্‌আর নক্করখানার প্রকোষ্ঠে মুসলমান উন্নতিযুগের চিত্রযুক্ত পুস্তকাদি এবং স্বতন্ত্র চিত্র সমূহের যে আদর্শ দেখিয়াছেন, তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া বলিতে পারেন যে, বর্ত্তমান চিত্রবিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান—জর্ম্মণীর তৈল চিত্র, মুসলমান উন্নতিযুগের করাঙ্কিত সুরঞ্জিত রঙ্গিন চিত্র সমূহের তুলনায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়, সৌন্দর্য্যে ও পারিপাট্যে স্বাভাবিকতায় ও সামঞ্জস্যে বিশেষতঃ স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কিছুতেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইবে না।

জহরাবীর বর্ণিত পুস্তকের প্রথম সংস্করণ সর্ব্বাগ্রে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই হিসাবে ৩৯৬ বৎসর হইল, উপরোক্ত পুস্তক খানি মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার প্রায় চারিশত বৎসর পরে, আমরা বর্ত্তমান হতভাগ্য মুসলমান সমাজ, এই অমূল্য পুস্তকের সন্ধান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

পুস্তকের মর্ম্ম বিভাগ।

১ম অধ্যায়।—দাগ বিধি। এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার জহরাবী, আপাদমস্তক শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোগ বিয়োগ উদ্দেশ্যে অনলতপ্ত লৌহের দ্বারা 'দাগ' গ্রহণে যে সুন্দররূপে

চিকিৎসা হইতে পারে,তাহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রোগগ্রস্ত স্থানে লৌহ-দগ্ধ-চিহ্ন স্থাপন করিলে, যে কেবল সাধারণ শ্রেণীর সামান্য রোগের চিকিৎসা হইত তাহা নহে, বরং তদ্দ্বারা পক্ষাঘাত বা অর্দ্ধাঙ্গ, উন্মাদ, নালীঘা, মৃগী, অর্শ, গলিত কুষ্ঠ ও পৃষ্ঠব্রণ ইত্যাদি অতি দুশ্চিকিৎস্য গুরুতর রোগের চিকিৎসা কার্য্যও অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইত।

২য় অধ্যায়।—এই অধ্যায়ে অস্ত্র চিকিৎসার সবিস্তার বিবরণ এবং সর্ব্ব প্রকার ক্ষত স্থানের ও শরীরের সর্ব্ববিধ রোগের চিকিৎসা যে কিরূপে অস্ত্র সাহায্যে সম্পাদিত হইতে পারে তাহার সম্যক অবস্থা লিখিত হইয়াছে। শরীর হইতে "তীর" বহিষ্করণ, দন্ত উৎপাটন, স্বর্ণ রৌপ্যের তার দ্বারা দন্ত বন্ধন, চক্ষু রোগে অস্ত্র চিকিৎসা, নাসিকা কর্ণ ও ছিন্নাঙ্গের সংযোজন, অস্বাভাবিকরূপে গর্ভ সঞ্চার হইলে তাহা নিপাত করার উপায় অবলম্বন, শরীরের স্থান বিশেষের অতিরিক্ত মাংস পিণ্ড ছেদন, মুত্রনালী হইতে প্রস্তর খণ্ড বহিষ্করণ, উদরে ও উদরস্থ অন্ত্রে ফোড়া ইত্যাদি ক্ষতস্থানে অস্ত্র প্রয়োগে, নবজাত শিশুগণের মল মূত্র ত্যাগের পথ অবরুদ্ধ থাকিলে অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত হইলে তাহার সংস্কার সাধন, যমজ সন্তান অথবা এক কিম্বা একাধিক মৃত বৎসকে জরায়ু হইতে বহির্গত করণ ইত্যাদি সকল প্রকার কঠিন অবস্থায় অস্ত্র সাহায্যে চিকিৎসা করার বিশেষ বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে অস্ত্র চিকিৎসার অবস্থা কিরূপ বিস্তৃত ভাবে ও পরিষ্কাররূপে লিখিত হইয়াছে, তাহা এতদ্দারা অনুমান করা যাইতে পারে যে অস্ত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত সম্যক বিবরণ পরিসমাপ্ত করিতে পুস্তকের ৯৬টী পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে।

৩য় অধ্যায়।—এই অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রকার ভগ্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও চূর্ণ অস্থি সমূহের সংস্কার, সংশোধন, সংযোজন ইত্যাদি বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার অস্ত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত শত শত প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্রাদির বিস্তৃত আলোচনা এবং প্রত্যেক অস্ত্র ও যন্ত্রের অবিকল চিত্র অতি সুকৌশলে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। পুস্তকের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় একাধিক চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। এক এক রোগের ও অবস্থার বহুবিধ ছোট বড় বিভিন্ন আকার প্রকারের অস্ত্রাদির চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ এই পুস্তকের অঙ্কিত চিত্রাদি দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মন্তব্য পাঠে জানা যায়, বর্ত্তমান ডাক্তারী চিকিৎসায় যে সকল অস্ত্র ও যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, সে সকলের সহিত হাকিম জহরাবীর আবিষ্কৃত অস্ত্রাদির বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে যৎসামান্য যে পরিবর্ত্তন ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিতান্তই নগণ্য। আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসার উপকরণাদি-কে পণ্ডিত প্রবর জহরাবীর আবিষ্কৃত অস্ত্রাদির নূতন সংস্করণ বলিয়া বর্ণনা করিলে অত্যুক্তি হইবে না। স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে মৃত বৎস বহিষ্করণ সংক্রান্ত-অস্ত্রাদির নির্ম্মাণকৌশল ও প্রয়োগবিধি দর্শন ও পাঠ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। মাতৃগর্ভে মৃত শিশুর শবদেহের কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কিরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া স্বতন্ত্রাকারে বাহির করা যায়, তাহার বহু প্রকার অস্ত্র ও ব্যবহার প্রণালী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণাদি ব্যতীত উক্ত পুস্তকে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য জ্ঞাতব্য সমূহও সন্নিবেশিত আছে, যথা :—

১। জহরাবী কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিত সমাজের চর্ব্বিত চর্ব্বন মাত্র লইয়া তাঁহার সমালোচনাধীন পুস্তকখানি সমাপন করেন নাই। তিনি গ্রন্থ রচনায় অনেক বিষয় স্বীয় স্বাধীন চিন্তাশীলতা ও আবিষ্কার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্থানে স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতমণ্ডলীর ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে এবং তাঁহাদের সহিত তীব্রতার সহিত মতভেদ প্রকাশ করিতেও বিরত হন নাই। অন্যের ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ যুক্তি তর্কের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

২। পুস্তকের প্রারম্ভে জহরাবী লিখিয়াছেন, চিকিৎসকগণের এতদ্বিষয় মতভেদ আছে যে, যাহাদের শরীর উষ্ণ ও শুষ্ক, তাহাদের চিকিৎসায় অনলতপ্ত লৌহজাত দ্রব্যাদির দ্বারা দাগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ও উপকারী কিনা? কোন কোন চিকিৎসকের মতে তাহা আদৌ উপকারী নহে, কারণ অগ্নি নিজেই উষ্ণ ও শুষ্ক, সুতরাং উষ্ণ-শুষ্ক শরীরের পক্ষে তদ্দ্বারা উপকার লাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কেহ কেহ ইহার বিপরীত মত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, মানব শরীরের উষ্ণতা ও শুষ্কতা নাম মাত্র। সুতরাং লোহাপোড়া দাগ দ্বারা উপকার না হইবার কোনই কারণ নাই। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর জহরাবীর মত ও শেষোক্ত দলের অনুকূল। কারণ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি উষ্ণ-শুষ্ক শরীরেও লৌহ পোড়া দাগ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন।

অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে বসন্তকালই দাগ-চিকিৎসার উপযুক্ত সময়, কিন্তু পণ্ডিত প্রবর জহরাবীর মতে সকল ঋতুতেই দাগ গ্রহণ উপকারী ও কার্য্যকরী। কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, দাগ গ্রহণ জন্য ঋতু বিশেষের প্রতীক্ষা করা কখনও সমীচীন নহে। তাহাতে রোগ বৃদ্ধি ও সংক্রামকতার বিশেষ আশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক।

৪। দাগ চিকিৎসার অনেকেই বিরোধী, তাঁহাদের মতে গরম ঔষধ ব্যবহার করান, লৌহদাগ অপেক্ষা অধিকতর উপকারজনক। কিন্তু চিকিৎসক জহরাবী এই মতের ঘোর বিরোধী, কারণ, তাঁহার মতে ঔষধ সেবন করিলে শরীরের প্রায় সর্ব্বাংশেই সেই ঔষধের গুণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহাতে রোগের আশু উপশম হয় সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা যে আংশিকরূপে শরীরের নির্দ্দোষ ও নিরোগ অংশের ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ সহজেই বুঝিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে দাগ চিকিৎসার কার্য্য কেবল শরীরের রোগদুষ্ট অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহাতে অন্যান্য নির্দ্দোষ অঙ্গের কোনই অনিষ্ট হয় না। সুতরাং ঔষধ সেবনাপেক্ষা দাগ গ্রহণ অনেকাংশে নিরাপদ অথচ উপকারী।

জহরাবী এরূপ মন্তব্য প্রকাশের পর লিখিয়াছেন, দীর্ঘকাল পরীক্ষা করায় ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের পর আমি অনলদগ্ধ লৌহের সাহায্যে দাগ চিকিৎসা দ্বারা যে আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছি তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও সন্তোষজনক।

৫। গ্রীক চিকিৎসকগণের মতে স্বর্ণ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির সাহায্যে দাগ দেওয়া অধিকতর উপকারী, কিন্তু জহরাবীর মতে তাহা ভ্রমাত্মক ধারণা। তিনি লিখিয়াছেন, দাগ চিকিৎসা একেত শরীরের অবস্থার প্রতি নির্ভর করে, তদ্ব্যতীত স্বর্ণজাত দ্রব্য উত্তপ্ত করিলে শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া যায়, আবার অধিক উত্তপ্ত করিলে গলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এমতাবস্থায় চিকিৎসককে আর এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। লৌহজাত দ্রব্যে এসকল উৎ-পাতের কোনই সম্ভাবনা নাই।

৬। এই গ্রন্থ পাঠে ইহাও জানা যায় যে, গ্রন্থকারের পূর্ব্বে ভগ্নাঙ্গ ও ভগ্নাস্থি জুড়িবার ব্যবস্থা-শাস্ত্রের প্রচলন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন চিকিৎসকগণের পুস্তকে চিকিৎসা শাস্ত্রের এই শাখা বিভাগ সম্বন্ধে যে যৎসামান্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহা আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে পণ্ডিত প্রবর জহরাবী এই শাখার প্রধান গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র। তিনি স্বপ্রণীত পুস্তকের ১৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, সাধারণ বৈদ্য ও অশিক্ষিত চিকিৎসকগণ পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত মণ্ডলীর পুস্তকাদি আদৌ পাঠ না করিয়া অথবা যৎসামান্য পুস্তকের অংশ বিশেষে ঈষৎ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক চিকিৎসক নামবাচ্য হইতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু আমি প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণের পুস্তকাদি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং গভীর গবেষণার সহিত তাঁহাদের পুস্তকরাশি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া অস্ত্র চিকিৎসার অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমি আমার জীবনের বিবিধ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর করিয়াছি। আমি অতি সংক্ষেপে সমস্ত সার তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধা কল্পে অস্ত্রাদির চিত্র অঙ্কিত করিয়া পুস্তকের মর্ম্ম সরল ও সহজবোধ্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

৭। মুসলমান সভ্যতার যুগে মুসলমান নারীগণও চিকিৎসা বিভাগে বিশেষ খ্যাতি প্রতি-পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এব্‌নে জহর নামক স্পেনের এশাবলিয়ার প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও চিকিৎসকের ভগিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রী চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নারী জাতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহাদের অসাধারণ অধিকার ছিল।

হাকিম জহরাবী ধাত্রী বিদ্যা সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা পূর্ব্বক তাহাতে অনেক আবশ্যকীয় শিক্ষা ও সুব্যবস্থার কথা আলোচনা করিয়াছেন। অস্বাভাবিক গর্ভ নিপাত করিতে হইলে ধাত্রীদিগকে কি কি কৌশল অবলম্বন করিতে হয় এবং তাহার চিহ্নাদি যে কি, পুস্তকে তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে।

৮। চিকিৎসক জহরাবী যে কেবল পুস্তকগত শিক্ষার হিসাবে অস্ত্র চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, বরং তিনি নিজ ব্যক্তিগত পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর করিয়াও অনেক সারগর্ভ কথা ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্বীয় পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ভাঙ্গা হাড় কিরূপে অপূর্ব্ব কৌশলে জোড়া দেওয়া যায়, তিনি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অস্ত্রচিকিৎসা

সংক্রান্ত একটা ঘটনা চিকিৎসা পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। যথা:—তাঁহার চিকিৎসাধীন একটী স্ত্রীলোকের উপর্য্যোপরি দুইটী সন্তান মাতৃ-গর্ভে মরিয়া যায়। তাহাতে স্ত্রীলোকটীর গর্ভস্থান স্ফীত হইয়া তাহা হইতে দুর্গন্ধ গলিত পদার্থ বহির্গত হইতে থাকে। হাকিম জহরাবী দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়াও কোনরূপ ফল লাভ করিতে না পারিয়া, তিনি অন্য এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাহাতে স্ত্রীলোকটীর গর্ভদেশ হইতে একখণ্ড হাড় নির্গত হয়, আবার কয়েক দিন পর আর কয়েকখণ্ড অস্থিচূর্ণ বহিষ্কৃত হয়। জহরাবী কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, মানব গর্ভে হাড় থাকিবার কি কারণ হইতে পারে? তবে স্ত্রীলোকটীর গর্ভাবস্থায় যে দুইটী সন্তান মরিয়া গিয়াছিল, এ সকল কি মৃত:শিশুগণের গলিত শরীরের সেই হাড়? এই ভাবিয়া তিনি স্ত্রীলোকটীর গর্ভ দেশে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া অভ্যন্তর হইতে বহু সংখ্যক অস্থিচূর্ণ বাহির করিলেন। স্ত্রীলোকটী তাহাতে বিশেষ কোনই কষ্ট পাইলেন না—অথচ অতি অল্পকাল মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জহরাবী প্রমুখ মুসলমান উন্নতি যুগের বহুদর্শী চিকিৎসকগণ অস্ত্র চিকিৎসায় কিরূপ পারদর্শী ছিলেন এবং আধুনিক ডাক্তারগণের ন্যায় তাঁহারা যে গর্ভ বিদারণাদি উৎকট রোগের চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং উদর বিদারণ পূর্ব্বক অভ্যন্তরস্থ রোগ বিয়োগের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একমাত্র পণ্ডিত প্রবর জহরাবই যে অস্ত্র চিকিৎসায় এরূপ পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, বরং মুসলমান উন্নতি যুগে, জহরাবীর ন্যায় অস্ত্র চিকিৎসাবিশারদ আরও বহু সনামখ্যাত চিকিৎসকের তত্ত্ব পাওয়া যায়।

বক্ষমান প্রবন্ধের শেষভাগে অস্ত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত অস্ত্র ও যন্ত্রাদির যে সকল চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে সে সকল হাকিম জহরাবীর আবিষ্কৃত। তৎবিরচিত পুস্তক হইতেই এই চিত্রাদি গৃহীত হইয়াছে। লেথু প্রেসের আরবী গ্রন্থ হইতে চিত্রাদি গৃহীত হওয়ায় তাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ইউরোপে টাইপের অক্ষরে হাকিম জহরাবীর পুস্তকের যে সকল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং হাফটোন ব্লক দ্বারা চিত্রাঙ্কিত করিয়া পুস্তকের সৌষ্টব বর্দ্ধন করিয়াছেন, আমরা প্রবন্ধ রচনা কালীন সেই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি গ্রহণের কোনই সুযোগ পাই নাই।

এস্লামাবাদী।
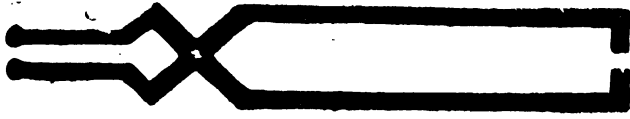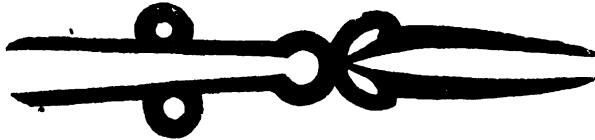
(১) জরায়ুর মুখ প্রশস্ত করার যন্ত্র।

(২) চক্ষুর অস্ত্র।

(৩) দন্তমূলের বর্দ্ধিত মাংস কাটিবার অস্ত্র।

(৪) চক্ষের মধ্যের বর্দ্ধিত মাংস কাটিবার অস্ত্র।

(৫) পলকের মাংস কাটার অস্ত্র।
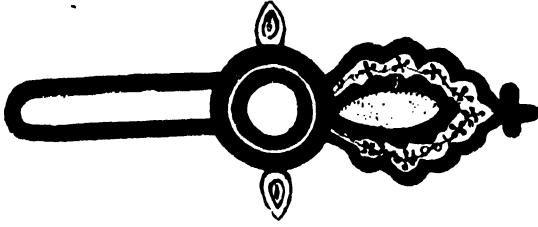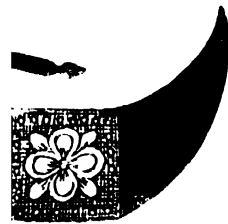
(১) নাকের ছিদ্রে ঔষধ দিবার যন্ত্র।
(২) দন্তমূল স্খলিত করার যন্ত্র।
(৩) মাংস স্খালন যন্ত্র।
(৪) কর্ত্তিত মাংসখণ্ড জরায়ু হইতে বাহির করার যন্ত্র
(৫) মৃত ভ্রূণের অঙ্গ ছেদন করার অস্ত্র।
(৬) তির বাহির করার যন্ত্র।
(৭) মূত্রনালীর "পাথুরে" বাহির করার যন্ত্র।
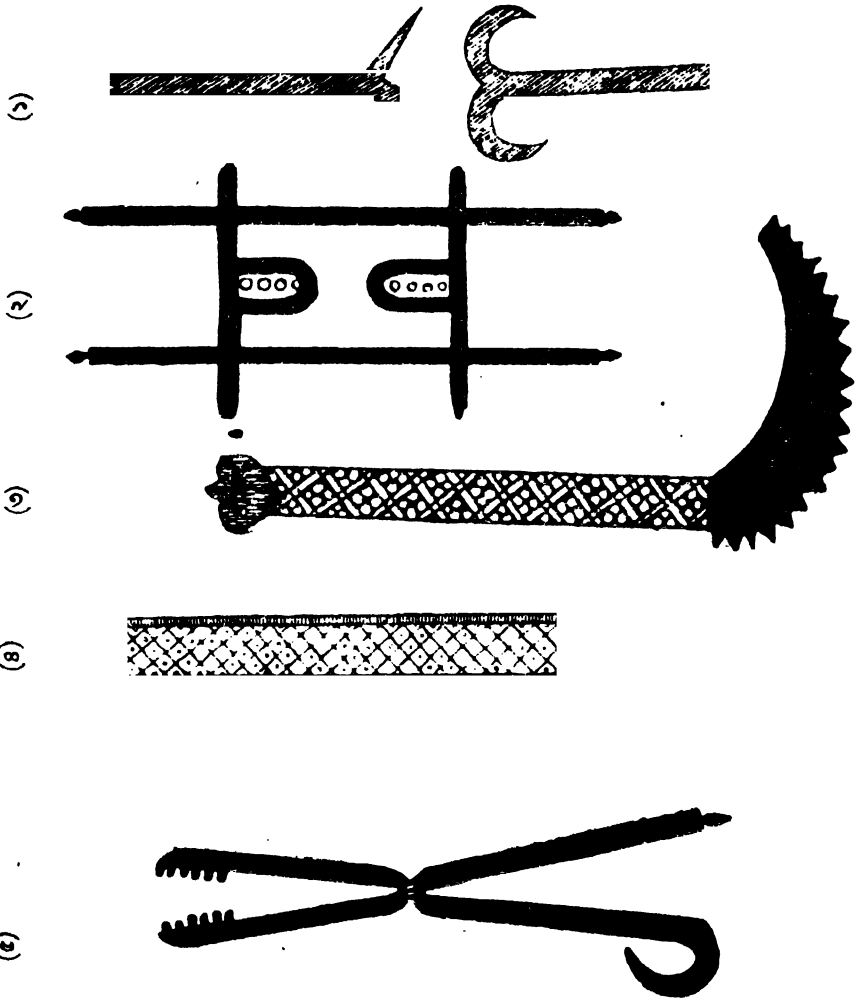
(১) মৃত ভ্রূণকে বাহিরে আনয়ন করার যন্ত্র

(২) ঐ কার্য্যের জন্য আবশ্যকীয়।

(৩) হাড় বাহির করার যন্ত্র।

(৪) সাধারণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত অস্ত্র

(৫) দাঁত তুলিবার যন্ত্র।

বাঙ্গালায় মুসলমানদিগের অবস্থা-বিপর্য্যয়।

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে আমরা বাঙ্গালার মুসলমান জাতির জন-বহুলতা প্রদর্শন করিয়াছি; এই প্রবন্ধে আমরা তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বাঙ্গালা দেশের 'আদম-শুমারীর' পূর্ব্ব প্রদর্শিত ধারাবাহিক তালিকা দৃষ্টে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এতদ্দেশে মুসলমান জাতির জন-সংখ্যা দিন দিন আশাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। খৃষ্টীয় ১৮৭২ হইতে ১৯১১ অব্দ পর্য্যন্ত, এই কতিপয় বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা ৬৬ লক্ষেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য পক্ষে, এই সময়ের মধ্যে এতদ্দেশবাসী হিন্দু-জনসাধারণের বৃদ্ধির পরিমাণ সাড়ে আটাইশ লক্ষ মাত্র।

বেকন নামক জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে, লোকসংখ্যার বৃদ্ধিই দেশ বা সমাজ বিশেষের সুদশার একটী নিশ্চিত চিহ্ন। * সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে স্বজাতির এতাদৃশ সংখ্যাধিক্য ও বর্দ্ধনশীলতা দর্শন করিয়া, বঙ্গীয় মুসলমান মাত্রেরই পুলকিত ও আশান্বিত হইবার কথা। কারণ, কোন সুদূর প্রবাসে তদ্দেশবাসী অন্যান্য জাতি বা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের তুলনায়, স্বজাতি অথবা স্বধর্ম্মাবলম্বী জনগণের বহুলতা ও বর্দ্ধনশীলতা দর্শন করিলে, কাহার হৃদয় না আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে? কিন্তু প্রিয় পাঠক! এই বঙ্গদেশে অবস্থিত অগণিত মুসলমানদিগের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই লোকবহুলতা-জনিত আনন্দ, নিরানন্দে পরিণত হয় না কি? যেহেতু, জনসংখ্যার বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশমধ্যে কোন বিষয়ে তাহাদের জাতীয় পশার প্রতিপত্তি, তাহাদের সাম্প্রদায়িক সুনাম ও সুফল আশানুরূপ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যাইতেছে না। সর্ব্ব বিষয়েই তাহারা যেন অপটু ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া উপেক্ষিত, এবং সর্ব্বত্রই তাহারা নগণ্য বলিয়া বিবেচিত ও অবজ্ঞার কুটিল কটাক্ষে জর্জ্জরিত।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি যে, দ্রুতগতিতে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু অন্য পক্ষে এই সমাজের মুখপত্র স্বরূপ অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরবর্ত্তী প্রাচীন বংশোদ্ভব মুসলমানগণ নানা কারণ বশতঃ বৃষ্টিজল বিধৌত উচ্চ ভূ-খণ্ডের ন্যায় ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সংখ্যা ও আর্থিক অবস্থা দিন দিন এতই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে যে, তাঁহারা জনসমাজে স্বীয় মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছেন।

* "True greatness of a state," says Bacon, "consisteth essentially in population and breed of man, and an increasing population is one of the most certain signs of the well-being of a community."—Encyclopaedia Britannica, 11th Edition.

এই বাঙ্গালা দেশের যেখানে যত পুরুষানুক্রমে সম্ভ্রান্ত ও সম্পত্তিশালী মুসলমানের বসবাস ছিল, সেই সমস্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কৃত প্রাচীনকীর্ত্তি-রাশির ধ্বংশাবশেষের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের শোচনীয় দুরবস্থা দর্শন করিলে, ক্ষোভে ও দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। বঙ্গে এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদের মাননীয় নবাব বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান, জোনাব খোন্দকার ফজলে রব্বি সাহেব তাঁহার প্রণীত 'The origin of the Musalmans of Bengal' নামক ইংরাজি গ্রন্থে নিতান্ত আক্ষেপ করিয়াই লিখিয়াছেন, '**Consequently in our opinion, all the inhabitants of the country have been benefited by the British rule, except the high and ancient Musalman families—almost all of whom have been reduced to a deplorable condition while many of them have been totally wrecked and ruined.**"

অর্থাৎ :—আমাদের মতে বৃটিশ-শাসন এদেশের অপরাপর অধিবাসীদিগের জন্য হিতকর হইলেও, প্রাচীন বংশোদ্ভব সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মুসলমানদিগের প্রতি ইহা তাদৃশ মঙ্গলকর হয় নাই। যেহেতু, এই শাসনাধীনে উপরোক্ত মুসলমানদিগের অধিকাংশের অবস্থা যারপর নাই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে; কতক বা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরবর্ত্তী সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণই যে এতাদৃশ শোচনীয় দুরবস্থা-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নহে; প্রতিবেশী জাতি সমুহের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের প্রত্যেক স্তরের মুসলমানদিগের অবস্থাই যে সন্তোষজনক নহে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তাহা অবগত আছেন। এমতাবস্থায় তাহাদের জনসংখ্যার বর্দ্ধনশীলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা একথা বলিতে পারি যে, কোন সঙ্গতিহীন পরিবারে বহুসংখ্যক সন্তান উৎপাদিত হইতে থাকিলে, তাহার ফলে, ঐ পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের দৈন্য দুর্দ্দশা যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ঠিক তদ্রূপ, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের জনসংখ্যার বাহুল্য ফলে, তাহাদের সমাজে দরিদ্রতার আধিপত্য বাড়ান ভিন্ন আর কিছুই নহে। *

সে যাহা হউক, আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই বঙ্গদেশের জন-সংখ্যার হিসাবে মুসলমানদিগের প্রাধান্য থাকিলেও দেশ মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য

---

* এ সম্বন্ধে অনেকেই হয়ত আমাদের সহিত একমত হইবেন না। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস যে, বহির্ব্বাণিজ্যের কল্যাণে এতদ্দেশজাত পাট, চাউল, চর্ম্ম ও অন্যবিধ পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিদেশ হইতে যে প্রচুর পরিমাণে অর্থরাশি দেশ মধ্যে উপস্থিত হইতেছে, তাহার ফলে ক্রমশঃই দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা ঘটিতেছে। এই বাঙ্গালা দেশের মুসলমানদিগের অধিকাংশই কৃষিজীবী, সুতরাং ইহার সু-ফল অধিক পরিমাণে তাহারাই ভোগ করিতেছে। আমরা কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার বিপরীত অবস্থাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। নানা মারাত্মক কারণে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের ঋণগ্রাহিতার পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, ঋণের দায়ে তাহাদিগকে অন্য জাতির নিকট দাসখত লিখিয়া দিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে 'মোহাম্মাদী' পত্রে জনৈক সমাজচিন্তাশীলব্যক্তি একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ঋণের দায়ে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের হস্ত হইতে প্রতিদিন অন্ততঃ

বা পশারপ্রতিপত্তি আশানুরূপ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এস্থলে আমরা সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিব যে, পশার প্রতিপত্তি কি এবং কিরূপেই বা তাহা সংস্থাপিত ও রক্ষিত হইতে পারে?

বিদ্যাবুদ্ধি, ধনসম্পদ অথবা বিশেষ কর্ম্ম-কুশলতা দ্বারা দেশ মধ্যে যে সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই অপর নাম পশার—প্রতিপত্তি। মান সম্ভ্রম ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। কোন দেশে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের পশার প্রতিপত্তি কিরূপে স্থাপিত ও রক্ষিত হইতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে উপলব্ধি হইবে যে, বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলন, ধন সম্পদ সংস্থান এবং বিশেষ কর্ম্ম-কুশলতা দ্বারা রাজসকাশে অথবা বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনই তাহাদের পশার প্রতিপত্তির মূল। উপরোক্ত বিষয়গুলির যে কোন একটির অভাবে, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের পশার প্রতিপত্তি স্থাপিত ও রক্ষিত হইবার নহে। সে যাহা হউক, যখনই কোন জাতির হস্তে দেশ বিশেষের উপর শাসন দণ্ড পরিচালন করিবার সৌভাগ্য ন্যস্ত থাকে, সে দেশে সেই শাসকজাতির সর্ব্ব-বিষয়ক প্রাধান্যজনিত পশার প্রতিপত্তি যে সুপ্রষ্ঠিত থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ বিষয়ে শাসিত জাতি মাত্রই যে অপকৃষ্ট দশাপন্ন হইবে, তাহা নহে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এতদ্দেশের উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও ব্যবসায়-নিপুণ মাড়ওয়ারীদিগের কথা উল্লেখ করিতে পারি। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় সময়োচিত বিদ্যা বুদ্ধির অনুশীলন করিয়া রাজ-সরকারে বিশিষ্ট কর্ম্ম-কুশলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং শেষোক্ত সম্প্রদায় ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়তায় অগাধ ধন-সম্পদ লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সুতরাং এখন ইহাঁরা উভয়ই শাসক জাতির নিম্নেই—দেশ মধ্যে পশার প্রতিপত্তিশালী, সুতরাং গণ্যমান্য।

কিন্তু অন্য পক্ষে, উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ে জনবহুল বঙ্গীয় মুসলমানদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে দৃশ্য আসিয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়, তাহা কি নিতান্তই ক্ষোভ দুঃখ ও লজ্জাজনক নহে? সমাজ অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া বিদ্যা বুদ্ধি, ধর্ম্ম অর্থ ও নীতি চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে যতদূর সম্ভব অধঃপাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ—তাহারা দেশমধ্যে অন্যান্য উন্নতিশীল জাতি কর্ত্তৃক ঘৃণিত, উপেক্ষিত এবং সময় ও স্থল বিশেষে পদদলিত হইতেছে। সত্য কথা বলিতে গেলে এই বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের উপরোক্ত কোনও একটি বিষয়ে প্রাধান্য—গৌরব করিবার কিছুই নাই। ভারতভূমি হইতে মুসলমান জাতির আধিপত্য বিলীন হওয়ার পর, এই সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশবাসী মুসলমানগণ, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, এদেশে স্বজাতির অস্তিত্ব ও মান মর্য্যাদা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, যে পরিমাণ উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

---

পঁয়ষট্টি কেতা জমি জমা নিলামে বিক্রীত হইয়া অন্য জাতির হস্তগত হইতেছে; এতদ্ব্যতীত মুসলমান জনসাধারণের ঋণের পরিমাণ তিনি জন প্রতি চল্লিশ টাকা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ লেখকের এই গণনা ভ্রম প্রমাদ শূন্য না হইলে, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের আর্থিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

বঙ্গীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক এযাবৎ তাহার আংশিক চেষ্টাও হয় নাই। এক্ষেত্রে তাহাদের সংখ্যা ও সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থার সহিত পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের মুসলমানদিগের সংখ্যা ও অবস্থার তুলনা করিয়া দেখা যাউক। আদম-শুমারীর রিপোর্ট দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ত্রিশ কোটির উপর। তন্মধ্যে মুসলমান সংখ্যা ন্যূনাধিক সাত কোটী মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় জনসংখ্যার কিছু কম চতুর্থাংশ মাত্র মুসলমান। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশের জন-সংখ্যা নির্ণায়ক যে তালিকা সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে উপলব্ধি হইবে যে, ভারতীয় মুসলমান সংখ্যায় কিঞ্চিদধিক তৃতীয়াংশ —এক বাঙ্গালা দেশেই বসতি বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ মুসলমানসন্তান ভারতের অপরাপর প্রদেশে বসবাস করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বঙ্গদেশ ভিন্ন অপরাপর প্রদেশের সমগ্র অধিবাসীর তুলনায় তদ্দেশবাসী মুসলমানগণ মুষ্টিমেয় মাত্র। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত প্রদেশের মুসলমানদিগের সংখ্যার অল্পতা সত্ত্বেও তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা তদ্দেশবাসী অন্যান্য জাতি হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং সময়োচিত শিক্ষা দীক্ষা লাভে, দেশের শিল্পবাণিজ্যে অধিকার সংরক্ষণে, রাজদরবারে সম্মান সম্ভ্রম অর্জ্জনে এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের জাতীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিতে তাহারা সেই সমস্ত দেশের অন্যান্য জাতি হইতে যে অনেক উন্নতস্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাদের কর্ম্মজীবনের জীবন্ত অবস্থাই ইহার সমীচীনতা সপ্রমাণ করিতেছে। অন্যপক্ষে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইতেছেন যে, এই বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যা, প্রতিবেশী হিন্দু-দিগের অপেক্ষা তেত্রিশ লক্ষ অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসংখ্যার হিসাবে তাহাদের প্রাধান্য থাকিলেও দেশমধ্যে অন্য কোন বিষয়েই যে তাহাদের কিছু মাত্র প্রাধান্য নাই, তাহা প্রতিপন্ন করিতে আমরা এই মাত্র বলিব যে, অপেক্ষাকৃত উন্নতাবস্থাযুক্ত লোক পরিপূর্ণ বঙ্গীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ নগর ও বন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য অবস্থাবিশিষ্ট সুদূর কৃষক-পল্লী পর্য্যন্ত যেখানেই লক্ষ্য করিবে, দেখিবে যে সর্ব্বত্রই মুসলমানগণ যেন সর্ব্বপ্রকার সজীবতা এবং কার্য্যকরী-শক্তিহীন অবস্থায় জড় পুত্তলিকার মত—পরমুখাপেক্ষী হইয়া সময়-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে;—অথবা অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির চাপে একরূপ কোণঠাশা হইয়া নিতান্ত নগণ্যভাবে মাত্র তাহাদের জাতীয় অস্তিত্বের সাক্ষী-গোপালের মত অবস্থান করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যদ্দ্বারা জাতি বিশেষের জাতীয়-জীবনে আশাপ্রদ জীবন্ত অবস্থা সূচিত হয়, সময়োপযোগী শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প বাণিজ্য ও রাজদরবারে পশার প্রতিপত্তি অর্জ্জন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে বঙ্গীয় মুসলমানগণ এযাবত কিরূপ দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, প্রিয় পাঠকবর্গকে আমরা একবার তাহা অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

এ, কে, আমিনুল্লাহ।

এস্‌লাম প্রচার।

এসলাম যে মানব জাতির স্বভাবজাত ধর্ম্ম, এস্‌লাম যে একমাত্র স্বীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিক আকর্ষণীশক্তিপ্রভাবে জগতে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে দ্বিধা করিবার কোনই কারণ পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ব্বে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেও যদি এস্‌লামের বিরুদ্ধবাদীদের শান্তি না হয়, এরূপ উজ্জ্বল প্রমাণ থাকিতেও যদি তাহারা 'এস্‌লাম ধর্ম্ম' বলপ্রয়োগে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া অপবাদ রটনা করেন, তাহা হইলে আমরা—তাহাদের জন্য নিম্নে আরও কতিপয় প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

আর্য্য হিন্দু জাতি, বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ও খৃষ্টান-সমাজ, ধর্ম্ম প্রচারকল্পে অনলকুণ্ড স্থাপন, শূলি কাষ্ঠের ব্যবস্থা, নির্ব্বাসন দণ্ড ইত্যাদি নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। আমরা প্রবন্ধান্তরে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিব। কিন্তু কোন মুসলমান অত্যাচারী নরপতির জীবনীতে এরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না যে, তিনি ধর্ম্ম প্রচারকল্পে এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য কোনরূপ অত্যাচারমূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্‌লাম ধর্ম্ম যে তরবারির সাহায্যে বা ভয়ভীতি প্রদর্শনে প্রচারিত হয় নাই, নিম্নে তাহার কতিপয় প্রমাণ উল্লেখিত হইতেছে। দুর্দ্দান্ত মোগল তাতারিগণ যখন হালাকু খাঁর নেতৃত্বে আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানী বোগ্দাদ মহানগরী আক্রমণ করে এবং সেই ভীষণ যুদ্ধে ন্যূনাধিক ১৫ লক্ষ মুসলমান নিতান্ত নৃশংসতার সহিত নিহত হয়, যে মোগলগণের ভীষণ আক্রমণে বোগ্দাদের শিক্ষা সভ্যতা ও শিল্প-সমৃদ্ধির যাবতীয় সম্পদ ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল, রাজকীয় বিরাট পুস্তকাগারের পুস্তকরাশি টাইগ্রীস নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত এবং পুস্তকাবলীর কালি সংমিশ্রণে টাইগ্রীসের জলরাশী কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল, যে মোগলবিপ্লবে বোগ্দাদের প্রসাদমালা, সৌধ শ্রেণী, মস্‌জেদ ইত্যাদি যাবতীয় গৌরবচিহ্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহাদের অত্যাচার হইতে বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী কেহই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে নাই, যে মোগলগণ বিজয়ীবেশে বোগ্দাদ অধিকার করিয়াছিল, যাহারা আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের রাজ্য, রাজত্ব, বিষয় বৈভব সমস্তের একচ্ছত্র অধিকারী হইয়াছিল, সেই মোগলগণ কি কারণে এবং কোন্ বাধ্যবাধকতা বা ভয় ভীতি নিবন্ধন এস্‌লামের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল? কি কারণে তাহারা সত্য সনাতন এস্‌লাম ধর্ম্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল? এস্‌লামের বিরুদ্ধবাদিগণ তাহার কোন হেতু প্রদর্শন করিতে পারেন কি? বীর্য্যবন্ত দিগ্‌বিজয়ী মোগলগণ, বিজয়ীবেশে বোগ্দাদে প্রবেশ করিয়া, নিরীহ বিজিত মুসলমানগণের ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—তাহার একমাত্র কারণ, এস্‌লামের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও সত্যতা ব্যতীত আর কি কারণে হইতে পারে? এস্‌লাম যে বলপ্রয়োগে প্রচারিত হয় নাই বরং

এস্‌লামের স্বভাবজাত আকর্ষণীশক্তি প্রভাবেই তাহার বিস্তৃতি, মোগলগণের স্বেচ্ছায় এস্‌লাম গ্রহণ কি তাহার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ নহে ?

বর্ণিত মোগল-বিপ্লবের ঘটনাপ্রসঙ্গে কেহ বলিতে পারেন, মোগল তাতারিগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান এবং ঘোর অসভ্য ছিল, তাই তাহারা হিতাহিত বুঝিতে না পারিয়া, বিজিত মুসলমানগণের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মহীন জাতির পক্ষে কোন ধর্ম্ম বিশেষের আশ্রয় গ্রহণে দ্বিধা না করাই স্বাভাবিক, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এরূপ অনুমানের মূলে কোন সত্য নিহিত নাই ইহা নিশ্চিত। কারণ মোগলগণ তখন যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিল তাহা সত্য নহে, বরং তখন চীন, তিব্বত, তুর্কিস্থান ও মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যথেষ্টরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রাধান্যও তখন ঐ সকল দেশে কম ছিল না। হালাকু খাঁর প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী, খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। মোগলরাজ গোলবার্গ খাঁর দরবারের দুইজন মন্ত্রী খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মোগল অবাকশিম কনষ্টান্টিনোপলের এক রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোগল বংশীয়দের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে হালাকু খাঁর ভ্রাতা থাকান তকুদার এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই খৃষ্টানমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার পর সোলতান গাজান এস্‌লাম গ্রহণ করেন। তিনি খানিয়া বংশের প্রথম মোগল রাজা। তাহার পর তদীয় ভ্রাতা সোলতান মোহাম্মদ বন্দা এস্‌লাম গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, তিনিও পূর্ব্বে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। তাহার খৃষ্টানী নাম 'নেকোলস'। মোগল তাতারীগণের অন্যতম শাখা শ্রেণীভুক্ত চঙ্গিজ খাঁর পরপৌত্র বোবাক খাঁ সর্ব্বাগ্রে এস্‌লাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তোগলক তৈমুর খাঁর এস্‌লাম গ্রহণান্তে তদঞ্চলের সমুদায় তাতারি ক্রমে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়েন।

পাঠক! দুর্দ্ধর্ষ বিজয়ী মোগলগণের পক্ষে বিজিত মুসলমানগণের হস্তে, ধর্ম্ম গ্রহণে আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত কি এস্‌লামের সত্যতা এবং অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবের জ্বলন্ত প্রমাণ নহে? ইতিহাসের বক্ষে এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকিতেও কি এস্‌লাম-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ বলিবেন যে, এস্‌লাম তরবারি-বলে প্রচারিত এবং বলপ্রয়োগে বিস্তৃত হইয়াছিল ?

(২)

পাদ্রী সাহেবানের অনুসন্ধান মতে বর্ত্তমান সময়ে চীন সাম্রাজ্যে ৬ কোটি মুসলমানের বাস, তদ্ব্যতীত যাবা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি ভারত মহাসাগরের দ্বীপমালায় দুই কোটি, আমেরিকায় পঞ্চাশ হাজার, ব্রহ্ম দেশে অর্দ্ধ কোটি মুসলমান বাস করিতেছে, কিন্তু কখনও কোন মুসলমান, বিজয়ীবেশে বা সেনাপতিরূপে অস্ত্র ও সৈন্য লইয়া ঐ সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন—জগতের ইতিহাসে তাহার কোনই প্রমাণ নাই বরং ঐ সকল স্থানে যে একমাত্র মুসলমান বণিক ব্যবসায়ী, ধর্ম্মপ্রচারক ও সাধু সিদ্ধ পুরুষগণ দ্বারা এস্‌লাম প্রচারিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৩)

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে এখন বহু সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত খৃষ্টান নরনারী এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং ক্রমে বহু লোক এস্‌লামের শান্তিময়ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে লিভারপুলেও বহু খৃষ্টান নরনারী এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এ সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইহাই প্রমাণ হয় যে, জগতে বলপ্রয়োগেই এস্‌লাম প্রচারিত হইয়াছিল ?

(৪)

ভারতের সীমান্ত-প্রদেশ সংলগ্ন স্বাধীন এলাকার আফ্রিদী, মহমন্দ প্রভৃতি জাতি কিরূপ দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্দমনীয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের গোড়ামী ও কঠোর বন্ধনের কথা সর্ব্বজন জ্ঞাত। বৃটিশরাজ, তাহাদিগকে বৃত্তি দান ও তাহাদের প্রতি নানারূপ অনুগ্রহ বিতরণে পক্ষান্তরে মধ্যে মধ্যে স্বীয় প্রবল প্রতাপ প্রদর্শনেও তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত রাখার পথে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে, তাহাদের সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কখনও যদি তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সামাজিকপ্রথা-পদ্ধতি সম্বন্ধে সামান্যরূপ জনরব-জনিত বাধা উপস্থিত করার বিষয়ও প্রকাশ পায়,—তৎক্ষণাৎ তাহাদের স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা নির্ব্বিশেষে সকলেই অস্ত্র ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এতদ্দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদের গোঁড়ামী কতদূর তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃটিশরাজের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী রাজশক্তির পক্ষে এই পার্ব্বত্য অশিক্ষিত স্বাধীন জাতিদিগকে বলপ্রয়োগে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা সম্ভবপর কি না! যাহারা তাহাদের সাহসবীর্য্য, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও বিজাতি-বিদ্বেষ ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে, যাহারা তাহাদের বিগত ইতিহাসের তত্ত্বাবগত আছে তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিবে যে, তাহাদিগকে বলপ্রয়োগে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে বাধ্য করা আদৌ সম্ভবপর নহে। তাহারা আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণবিসর্জ্জন দিবে, সকলে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, কিন্তু তবুও যে তাহারা ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে না ইহা নিশ্চিত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই জাতি যখন এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তখন তাহাদিগকে বলপ্রয়োগে মুসলমান করা হইয়াছিল, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ? তাহাদের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ-ধর্ম্ম বিষয়ে গোঁড়া জাতিকে ভয় প্রদর্শনে ধর্ম্মান্তরে আনয়ন করা কি সম্ভবপর হইয়াছিল ? তাহারা এখন যে স্বভাব সম্পন্ন, পূর্ব্বেও যে সেইরূপ বরং এতদপেক্ষা অধিকতর গোঁড়া ও দুর্দ্দান্ত ছিল ইতিহাসে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব তাহারা যে কোনরূপ বলপ্রয়োগে বাধ্য হইয়া এস্‌লামের ক্রোড়ে আশ্রয় লয় নাই বরং একমাত্র এস্‌লামের সরল ও স্বাভাবিক নির্ম্মল শিক্ষা ও রীতি নীতি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এস্‌লামের সুশীতল শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

(৫)

ভারতবর্ষের রাজপুতগণের সাহস বীর্য্য শৌর্য্য ও রণপাণ্ডিত্যের কথা ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে বর্ণিত আছে। তাহারা জাতীয় গৌরব ও ধর্ম্ম-মন্দিরের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে এবং স্ত্রীলো-

কের সতীত্ব বজায় রাখার নিমিত্ত বহুবার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, আবাল বৃদ্ধ বণিতা নির্ব্বিশেষে অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক জীবনাহুতি দিয়াছে, রাজপুত জাতির ইতিহাসে এরূপ অসংখ্য গৌরব-কাহিনী সুবর্ণাক্ষরে রঞ্জিত আছে। কিন্তু সেই বীর্য্যবন্ত রাজপুত জাতি কখনও তাহাদের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের জন্য বলপ্রয়োগ করার বিরুদ্ধে, অস্ত্রধারণপূর্ব্বক একটী রাজপুতও জীবন দান করিয়াছে বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া মোগল ও পাঠান রাজত্বের ইতিহাসে একটী ঘটনাও কি উল্লিখিত আছে? মুসলমান আমল-দারীর সময় লক্ষ লক্ষ রাজপুত এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে বলপ্রয়োগে মুসলমান করা হইয়াছিল একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই বলপ্রয়োগ-ঘটনা-প্রসঙ্গে রাজপুতগণের ন্যায় স্বভাবজাত বীর জাতি কখনও মুসলমানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এরূপ একটী ঘটনাও কি আমাদের বিপক্ষদল প্রদর্শন করিতে পারিবেন? এস্লাম ধর্ম্ম কখনও বলপ্রয়োগে প্রচারিত হয় নাই, তাই রাজপুত প্রভৃতি জাতি, ধর্ম্মের জন্য কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। রাজনীতিক স্বার্থের জন্য এবং রাজনীতিগত স্বার্থ সংঘর্ষ উপলক্ষে ধর্ম্ম মন্দির ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা দর্শনে, নারীজাতির সতীত্ব ও সম্মান রক্ষাকল্পে তাহারা পুনঃ পুনঃ অস্ত্র ধারণ করিয়াছে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান। এত দেখিয়া শুনিয়াও কি এস্লাম বিদ্বেষীগণ বলিবেন যে এস্লাম তরবারি বলে প্রচারিত হইয়াছিল?

(৬)

ভারতের তথা দিল্লীর সর্ব্বপ্রথম মুসলমান বাদশাহ কুতুবউদ্দীন আইবেক ১১৯১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ ৭১১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৫০০ বৎসর ব্যাপী ভারতবর্ষে মুসলমান বণিক ব্যবসায়ী এবং ফকির দরবেশ ও সাধু সিদ্ধপুরুষগণের দ্বারা এস্লাম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। মান্দ্রাজের মালাবার প্রদেশে, সিন্ধুদেশে, পাঞ্জাবের পশ্চিম উত্তরাংশে, সোল্তান মাহমুদ গজনবী ও সোল্তান মোহাম্মাদ শেহাবুদ্দীন ঘোরীর ভারত বিজয়ের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এস্লাম বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ডাক্তার আর্নল্ড সাহেবের "Preaching of Islam" নামক পুস্তকে ভারতে এস্লাম প্রচারের ইতিবৃত্ত অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। আঞ্জমনে ওলামার এস্লাম মিশন শাখার দ্বারা প্রকাশিত "ভারতে এস্লাম প্রচার" পুস্তিকায় এতৎসংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

(৭)

এস্লাম ধর্ম্ম তরবারিবলে প্রচারিত হইয়াছে অথবা তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-প্রভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করার আর একটী সুন্দর উপায়—আধুনিক লোক সংখ্যার রিপোর্ট।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার রিপোর্টে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক দশ হাজার লোকের মধ্যে ১৫৭ জন লোক ভিন্ন জাতীয়দের মধ্য হইতে এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই অনুপাতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এরূপভাবে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এস্লাম ধর্ম্মে

দীক্ষিত হইতে থাকিলে, ৬৫০ বৎসর মধ্যে দেশের সমুদায় অমুসলমান জাতি মুসলমাম জাতিতে পরিণত হইবে অর্থাৎ বঙ্গদেশে মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন জাতির অস্তিত্ব থাকিবে না।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের মুসলমান সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় ৫ লক্ষ কম ছিল, কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় দেখা যায়, তাহাদের সংখ্যা পূর্ব্বাভাব পূর্ণ করিয়া আরও ১৫ লক্ষ অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বলিতে গেলে বঙ্গদেশে ২০ বৎসর মধ্যে বার্ষিক এক লক্ষ হিসাবে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পাদ্রী টেলার (Tailor) সাহেব লিখিয়াছেন, ১৮৭১ ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের মুসলমান সংখ্যা প্রায় ৯২ লক্ষ ৪০ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হিসাবের মধ্যে, যদি জন্মগত স্বাভাবিক লোক সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত শত করা ২৫ জন হিসাবে বাদ দেওয়া যায়, তাহাতেও বার্ষিক প্রায় ৬ লক্ষ হিসাবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রমাণিত হয়। সুতরাং ১০ বৎসর মধ্যে বার্ষিক ৬ লক্ষ হিসাবে যে সকল মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহারা যে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে আসিয়াছে সে কথা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহা কি অতি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, বৃটিশ রাজত্বেও মুসলমান সংখ্যা বার্ষিক ৬লক্ষ হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে? এস্‌লাম বিদ্বেষিগণ এই ক্ষেত্রে কোন অস্ত্র বলের দোহাই দিবেন এবং কোন্ কল্পিতকাহিনীর অবতারণা করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ভিন্ন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন এরূপ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া কি এস্‌লামের অলৌকিক শক্তি ও স্বভাবজাত প্রভাবের উজ্জ্বল প্রমাণ নহে?

বাদশাহ কুতুবুদ্দীনের রাজত্বকাল বা ১১৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৭ শত বৎসর মধ্যে, উপরোল্লিখিত বার্ষিক ৬ লক্ষের স্থলে কেবল ১০ হাজার হিসাবে নবদীক্ষিত মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি গণনা করিলে, মুসলমানের মোট সংখ্যা ৬ কোটিতে পরিণত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতের মুসলমান জনসংখ্যা মাত্র ৪ কোটি, ৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৩৭ জন ছিল। ইহাতে প্রমাণিত হয়, মুসলমান আমলে বার্ষিক ১০হাজার হইতেও অল্পসংখ্যক লোক, ভিন্ন জাতি হইতে এস্‌লাম ধর্ম্মে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরেজ আমলদারীতে, মুসলমান আমলদারীর তুলনায় বার্ষিক ৬০ গুণ অধিক মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। হিসাব খতাইয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, ইংরেজ শাসন কালে ভারতবর্ষে এক বৎসর মধ্যে যে পরিমাণ মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, মুসলমান আমলে ১২০ বৎসর মধ্যে ঐ পরিমাণ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় এস্‌লাম বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ কি বলিবেন? বৃটিশ আমলে কে তরবারি হস্তে অমুসলমান জাতি সমূহকে এস্‌লাম গ্রহণ জন্য ভয় প্রদর্শন করিতেছে? কে হিন্দু খৃষ্টান প্রভৃতি জাতির প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেছে—যাহাতে মুসলমান আমলের তুলনায় বার্ষিক ৬০ গুণ অধিক মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এস্‌লামের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও আভ্যন্তরীণ আকর্ষণীশক্তি ব্যতীত তাহার অন্য কোন কারণ নির্ণিত হইতে পারে কি?

(৮)

মুসলমান বাদশাহ ও রাজপুরুষগণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে বলপ্রয়োগে এস্‌লাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন—একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মুসলমান আমলদারীর রাজধানী ও শাসন

কেন্দ্রসমূহে, মুসলমান জনসংখ্যা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। বর্ত্তমান উত্তর পশ্চিম ও যুক্ত প্রদেশই মুসলমান আমলের প্রধান কেন্দ্রভূমি। দিল্লী ও আগ্রাতেই মুসলমানগণের রাজধানী ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই শাসন কেন্দ্র-প্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা চারিভাগের একভাগ মাত্র আর শতকরা ৭৫ জন ভিন্ন জাতীয় লোক। দিল্লী আগ্রা টাউনের লোক সংখ্যারও এই অনুপাত। পূর্ব্ববঙ্গ, দিল্লী ও আগ্রা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। মুসলমান শাসনকালে পূর্ব্ব বঙ্গে ও উত্তর বঙ্গে রাজনৈতিক কেন্দ্র বলিয়া কখনও কোন স্থান নির্ণিত হয় নাই। ঢাকা অতি অল্পকাল মাত্র পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঢাকা বিভাগের তুলনায় চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের মুসলমান সংখ্যা অধিক। পশ্চিম বঙ্গে বহুকাল মুসলমানগণের প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র বা রাজধানী ছিল। মুর্শিদাবাদ, হুগলী, পাণ্ডুয়া ও সপ্তগ্রাম সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া মুসলমান শাসনের প্রাদেশিক কেন্দ্রভূমি ছিল, কিন্তু এই পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা অধিক। ভারতের যে অংশে মুসলমানগণের ক্ষমতা প্রতিপত্তি অধিক ছিল, যে অংশে মুসলমান বাদশাহ ও আমির ওমরা এবং সেনাপতিগণ সর্ব্বদা বাস করিতেন, সে সকল অংশে মুসলমান জনসংখ্যা অল্প, অন্য জাতির সংখ্যা অধিক অথচ মুসলমান-ক্ষমতাহীন স্থানে, মুসলমান জনসংখ্যা অধিক। এ সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় যে এস্লাম বলপ্রয়োগে প্রচারিত হইয়াছিল? এস্লাম যদি তাহার স্বাভাবিকগুণে প্রচারিত না হইত, এস্লামের যদি শুধু প্রচার দ্বারা বিস্তৃতি-লাভ না ঘটিত, তাহা হইলে কখনও এরূপ অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত আমাদের নয়নগোচর হইত না।

মুসলমান আমলদারীতে, মুসলমানগণ হিন্দু প্রভৃতি জাতির প্রতি অত্যাচার উৎপীড়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—একথা সত্য হইলে, মুসলমান রাজধানীসমূহে হিন্দু ধর্ম্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। হিন্দু দেবালয়ের জন্য দেবোত্তর ব্রহ্মত্তর সম্পত্তি দেওয়া হইত না। তথাকথিত হিন্দুবিদ্বেষী বাদশাহ আওরঙ্গজেব দেব মন্দিরের জন্য অসংখ্য নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিতেন না—হরিদ্বার, জলামুখী, বেনারশ, ও গয়ার বহু দেব মন্দির-সংক্রান্ত ভূসম্পত্তির সনদপত্র সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত। হায়দ্রাবাদে বার্ষিক ৩ তিন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি হিন্দু দেব মন্দিরাদির জন্য উৎসর্গিত আছে। স্বর্গীয় মৌলানা সিবলী লিখিয়াছেন,—"গয়ার প্রধান বৌদ্ধ ধর্ম্ম মন্দিরের সেবায়েতের নিকট, মোগল আমলদারীর ১৩খানি 'ফরমান' বা সনন্দপত্র এখনও বিদ্যমান আছে। আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল 'ফরমান' দেখিয়া আসিয়াছি।

(১০)

এ সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা হিন্দু প্রভৃতি জাতির প্রতি মুসলমান বিদ্বেষ প্রমাণিত হয় কি? মুসলমানগণ বলপ্রয়োগে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন ইহাই কি সত্য বলিয়া অনুমিত হয়? এরূপ

ধারণার বিরুদ্ধে এত প্রমাণ থাকিতেও কি এস্‌লাম বিদ্বেষিগণ বলিবেন,—এসলাম তরবারি বলে প্রচারিত হইয়াছিল? আমরা অন্য প্রবন্ধে দেখাইব* জগতের কোন্ রাজ্যে কোন্ সময় কাহার কর্ত্তৃক কি উপায়ে এসলাম প্রচারিত হইয়াছিল।

এস্‌লামাবাদী।

সংকল্প।

তোমায় আমি ধর্‌'বো
ওগো ধর্‌'বো—
যা কিছু মোর সাম্‌নে পড়ে
তোমার নামে তর'বো।

চোখে চোখে চেয়ে চেয়ে
নিরিবিলি আস্‌ব ধেয়ে
যা হবার তা হবে আমার
মর্‌তে হয়ত মর্‌বো
তোমায় আমি ধর'বো—
ওগো ধ'র্‌বো।

হৃদয় কুঞ্জের কুসুমগুলি
মনের সাধে নিত্য তুলি
চরণ তোমার আমি ব'র্‌বো
তোমার প্রাণের সুধা দিয়ে
হৃদয় আমার ভর্‌বো।

তুমি আমার প্রাণে প্রাণে
মিশে রবে সকল খানে
তোমার মধুর পরশ দিয়ে
হৃদয় সরস ক'রবো
তোমায় আমি ধ'রবো—
ওগো ধরবো।

শেখ হবিবর রহমান

"আননদ্‌ওয়া" ৬ষ্ঠ বর্ষের ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় পৃষ্ঠা।

তাছাওয়াফ।

আভাষ——পীর——পরিভাষা।

"But the love that leads life upward is the noblest and the best."

Heurq Van Dyke, **(The child)**

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আপনারা সকলে না হউন, অন্ততঃ আপনাদের মধ্যে আমার ন্যায় উদ্ভট রুচি বিশিষ্ট এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা "আল্-এসলামের" প্রবন্ধাদির মধ্যে কোর্আন হাদিছের শিক্ষা, ধর্ম্মতত্ত্ব, ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রভৃতি গভীর গবেণষাপূর্ণ অথচ নিরস বিষয়গুলি ধারাবাহিকরূপে পাঠ করিয়া একটু মনঃক্ষুন্ন হইয়া মুখ বদলাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে পারেন। অধম লেখক সেই জন্য উপরোক্ত 'সরস' বিষয়টী মুখরোচক চাটনি স্বরূপ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে। মূল বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে, আমার এই ৫১ বৎসর বয়সের মধ্যে 'উপরোধে ঢেঁকি গেলা গোছ' এই প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

আমার আলোচ্য বিষয় "তাছাওয়াফ" ইহাকে উপরে 'সরস' বলিয়া কেন উল্লেখ করিলাম তাহার অনেক কারণ আছে। রস ওরফে সুখ-অন্বেষণ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক সকল অনুষ্ঠানই সুখের জন্য। আপনি সংসার বা পরলোক সংক্রান্ত যে কোন কাজই করুন না কেন,কোন না কোন প্রকার সুখের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবেই। এই যে আমি এত বড় গৌরচন্দ্রিকা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি, ইহার মধ্যেও হয় তো কোন সুখের আশা থাকিতে পারে—অর্থাৎ প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া যদি আপনারা প্রীত হ'ন, তাহা হইলেই আমি আত্মপ্রসাদরূপ সুখ লাভ করিব। তাই বলিতেছিলাম, সুখই মানুষের একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয়। সুখ দুইপ্রকার, আশু ও গৌন। আশু সুখটা ঐহিক, সুতরাং সংসারের আর সকল জিনিষের মত অস্থায়ী কিন্তু বড়ই মনোমুগ্ধকর। গৌণ সুখটা পারলৌকিক, সুতরাং 'পরলোকে কি হইবে না হইবে তাহা খোদাতালাই জানেন, এখন তো সুখে সময় কাটিয়া যাইতেছে।' অতএব সে গৌন সুখটা সাধারণতঃ তাদৃশ মনোযোগের সামগ্রী নহে। "তাছাওয়াফ"এর অনুশীলনকারীরাও অবস্থাভেদে দুইপ্রকার সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। ইহার বহিরঙ্গের যাঁহারা সেবক (যে সম্প্রদায় আজ কাল বেশীর ভাগ দেখা যায়) তাঁহারা এই দুনিয়াতেই নিজেদের জন্য স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া লন—সুতরাং তাঁহাদের সকল সুখই আপাতত মধুর। তাহাতে কি না আছে? প্রতিদিন খাইবার জন্য মোরগের রাণ আছে, খাশীর কাল্লা আছে, উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি আছে, মাখন আছে, দুধ আছে ও দুধের সর আছে, পোলাও আছে,

পরঠা আছে, বিনা বেতনের দাসদাসী আছে ও সকলের উপরে আছে পদসেবা ও অঙ্গ-সেবার জন্য যুবতী ও সুন্দরী রমণীবৃন্দ ! আর টাকার তো কথাই নাই, লাইসেন্স নাই, কালেক্টারির মাল্‌গুজারি নাই, অথচ মুরিদানের অঙ্গীকৃত সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, বিনা তলব তাকাদায় ঘরে বসিয়া টাকা। ইহাদের কথাই শরীয়াত, ক্রিয়াকলাপ তরিকত, অবস্থা হকিকত, আর সেই গুপ্ত রহস্য—সেই ভজন সাধন প্রণালী,—হইতেছে মারেফাত। পাঠক ! এই বর্ণচোরা আম্ব হইতে, এই Wolf in the garb of a sheep (মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত ব্যাঘ্র) হইতে, এই বিষকুম্ভ পয়োমুখ প্রকারের জীবগণ হইতে তফাৎ থাকিবেন, ইহাদের নিকট যাওয়া দূরের কথা, কদাচ ইহাদের ছায়াস্পর্শ করিবেন না, ইহাদের কুহকরূপ জাল জাহান্নামের গহ্বর বিশেষ, একবার পড়িলে আর উদ্ধারের আশা নাই। আমি এরূপ পীরও দেখিয়াছি, যাঁহাদের নির্দ্ধারিত বাৎসরিক ট্যাক্স পরিশোধ করিয়া দিতে পারিলে, নামাজ রোজা প্রভৃতি শরীয়তের আহকাম পালনের প্রয়োজন থাকে না। এই পীর সাহেব নামাজ কে "মোহাম্মাদীয় ব্যায়াম" বিশেষ বলিয়া থাকেন এবং আমার প্রতিবাদ করার উত্তর দেন যে (سلطان کجا عیش نہان با رند بازاری کند) 'রাজা, বাজারের উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগকে নিজের প্রমোদ ভবনে কবে স্থান দান থাকেন' ? ভাবার্থ এই যে, সাধারণ লোক খোদাতোলার নৈকট্য লাভের অধিকারী নহে। সাধারণ লোকের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা পীরি মুরিদির ব্যবসায় করে না, কিন্তু শরীয়াতের বরখেলাফ আচরণ করে, তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে তাহারা মারেফাতের দোহাই দিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা দেখে। মহা কবি সাদী বলিয়াছেন—

مپندار سعدی که راه صفا * توان رفت جز بر پئے مصطفی

"হে সাদী ! ইহা ভাবিও না যে আলোক প্রাপ্তির পথ হজরত রসুল (দ)এর অনুসরণ ব্যতীত কেহ লাভ করিতে পারে।" পাঠক ! এই (بد نام کنندۂ نیکو نامے چند) (ভাল লোকদিগের দুর্ণামকারী) মহাত্মারা না পারেন, জগতে এমন কাজই নাই। স্মরণ রাখিবেন যে خلاف پیمبر کسے رہ گزید * ہرگز بمنزل نخواہد رسید সমগ্র বিশ্বজগতে নিজের রহমতের স্বরূপ করিয়া জগৎবাসীদিগের শিক্ষার ও পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহতোলা যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন ও

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا

"অদ্য তোমার জন্য তোমার দিনকে সম্পূর্ণ করিলাম ও তোমার প্রতি আমার রহমত (আশীর্ব্বাদ, Blessings) পূর্ণ করিলাম এবং এস্‌লামকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।" (সুরা আল্‌মায়েদা, রুকু ১) এই বাক্যের দ্বারা যাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের পূর্ণত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহতোলা সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন, সেই হজরত নবি করিম (দ) এর প্রকৃত অনুসরণ ব্যতীত খোদাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। প্রকৃত ও সদ্‌গুরু নির্ব্বাচনে অক্ষম হইয়াই লোক হুজুগে পড়িয়া উপরোক্তরূপ নফছের দাস, অর্থগৃধ্নু, ব্যবসাদার পীরের হাতে পড়িয়া নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনেন ও ইহকাল পরকাল ঝরঝরে করিয়া লন। সদ্‌গুরুর লক্ষণাদি বোজরগানেদিন্ এর (ধর্ম্মগুরু) লিখিত গ্রন্থাদিতে যেরূপ উল্লেখ হইয়াছে তাহা

দেখিয়া গুরু নির্ব্বাচন করিলে ধোকায় পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। দার্শনিক কবি মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী লিখিয়াছে—

اے بسا ابلیس آدم روے هست * پس بهر دستے نباید داد دست

'এ জগতে অনেক ইবলিস্ (শয়তান) মনুষ্যাকৃতিতে বিচরণ করিয়া থাকেন, অতএব যাহার তাহার হস্তে হস্ত প্রদান করিয়া আত্মবিক্রয় করিও না (বায়য়াত হইও না)। আর ধর্ম্মের গুঢ় কথা এই যে, তোমার হৃদয়ে যদি খোদাপ্রাপ্তির তৃষ্ণা বস্তুতঃই প্রবল হইয়া থাকে, তোমার চিত্ত যদি সত্য সত্যই তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজেই তোমার পথ প্রদর্শক হইয়া তুমি যাহাতে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে পার, তাহার উপায় করিয়া দিবেন—তিনি নিজেই এবিষয়ে অঙ্গিকার করিতেছেন, যথা—

الله يجتبى اليه من يشاء و يهدى اليه من ينيب—سورة شورى - ۲۵ پاره

অর্থাৎ 'আল্লাহ তাला মনোনীত করতঃ আকৃষ্ট করিয়া লয়েন নিজের দিকে যাহাকে ইচ্ছা করেন ও পথপ্রদর্শন করেন নিজের দিকে তাহাকে যে তাঁহাকে পাইতে চাহে।' আসল কথা—হৃদয়ের আকর্ষণ চাই, খলুহ (একনিষ্ঠতা) চাই। কোন পারসী কবি বলিয়াছেন—

عشق در هر دل که باشد رهبرے درکار نیست
آب بے رهبر بدریا میرساند خویش را

অর্থাৎ 'যে হৃদয়ে ব্যাকুলতাযুক্ত বিশুদ্ধ প্রেম আছে, তাহার পথপ্রদর্শক অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন হয় না, নদীর জল নিজেকে বিনা পথপ্রদর্শকের সাহায্যে সমুদ্রে পৌছাইয়া দেয়।' অতএব তোমার ব্যাকুল হৃদয় যদি নিয়ত তাঁহার নিকট এই প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকে যে "ওহে প্রেমের জলধি, এ হৃদয়ের নদী, তোমাতে মিশিতে চায়"—তাহা হইলে তুমি দেখিবে যে অচিরকাল মধ্যেই সেই বাঞ্ছাকল্পতরু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য হৃদয়ে প্রেমের উদ্দীপনা করিয়া দিবার জন্য, প্রেম ফুটাইয়া দিবার জন্য প্রথমে সাহায্য আবশ্যক, সে কথা পরে আলোচ্য।

উপরে যে সকল স্বয়ং সিদ্ধ মহাত্মাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই দেশ প্রচলিত ধর্ম্মপুস্তকাদির সহিত কতক অক্ষর পরিচয় থাকে। সেইগুলি হইতে বর্ণাদি উদ্ধৃত করিয়া ও নিজ পোষাক পরিচ্ছদাদির ভাবভঙ্গির দ্বারা ধার্ম্মিকের ভান দেখাইয়া এবং স্থান বিশেষে দালালের দ্বারা প্ররোচিত করিয়া শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই তিন শ্রেণীকেই ফাঁদে ফেলিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশে মুসলমানদের নাম বদনামকারী তথাকথিত ফকিরের আর একদল আছে, যাহাদিগকে শয়তানের ঠাকুরদাদা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা ঘোর মূর্খ এবং সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোক। মূর্খ সম্প্রদয়ের উপরেই ইহাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া থাকে। শরীয়াতের আহকাম (ধর্ম্মের নিয়ম) পালনের কষ্ট এড়াইবার জন্য, অপর ধর্ম্মের বিলাস ব্যসনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কতক স্বধর্ম্মের

অজ্ঞতা নিবন্ধন ও কতক নফছের (লোভ) প্ররোচনায় ইহারা প্রথমে নদীয়া জেলাস্থিত ঘোষ-পাড়ার আউওল চাঁদের ও সতী মায়ের (বৈষ্ণব ধর্ম্মের শাখা বিশেষ) চকচকে ও রঙ্গিন অংশগুলি গ্রহণ করতঃ নিজেদের মনগড়া জেকের বন্দেগী-যুক্ত একটী বিচিত্র মতের সৃষ্টি করে ও তাহার নাম রাখে "ফকিরী ও মারফতী মত"। পরে ইহাদের মধ্যে নানা ফকিরের নানা মত সংযুক্ত হইয়া চারিটী বিভাগ হইয়া পড়ে, যথা—আউল, বাউল, দরবেশ ও শাঁই। এ চারিটী বিভাগের মধ্যে সামান্য পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহারা নিজকে 'মেহেরবান' বলিয়াই পরিচয় দেয়। ইহাদের ব্যবহার অতি ভয়ানক, অতি কদর্য্য। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় পীর মোরশেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মলমুত্রাদি ও স্ত্রী পুরুষের শরীরের যতপ্রকার স্রাব আছে, সে গুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে "সেবা" (ভক্ষণ) করা ও ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা, ইহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বিশেষ। ইহারা স্ত্রী শিষ্যা ও শিষ্য পত্নিগণকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত নেড়ানেড়িদের অনুকরণে নির্জ্জন গৃহে বস্ত্র হরণ করে। অহিংসা পরম ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ছাগমাংসের পরিবর্ত্তে (গোমাংসের তো কথাই নাই) মচ্ছব (মহোৎসব) ও নিমন্ত্রনাদিতে কুক্কুট মাংস ও মৎস্যকুল ধ্বংশ করে। আরবী কোরআন শরীফের আয়েতগুলির অদ্ভুত অর্থ করিয়া (যথা—'লা-শরিকালাহু'র অর্থ (মায়াজান্নহ) 'খোদা কালা, তাই আমরা এত ডাকি তথাপি শুনিতে পায় না'! 'আল্ হামদো লিল্লাহ্' এর অর্থ 'আল্লা এমন হুমদো যে তার নেন্নায় (সীমা) নাই'!) মানুষকে গোমরাহ্ করে। দিনদার নামাজী মুসলমানদিগের প্রতি নানাপ্রকার উপহাস করিয়া থাকে ; খোদাতোলার স্বরূপ নির্দ্ধারণকল্পে কেহ বলে খোদা স্ত্রী জাতি বিশিষ্ট, কেহ বলে তিনি হজরত বিবি ফাতেমা (রাজি) ওরফে বরকত বিবির পেটে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন! এই সকল এলোবিলি সৃষ্টিছাড়া কোফরী কথাই হইতেছে, তাহাদের মুরিদানের প্রতি ধর্ম্ম শিক্ষা। আর সাধন-ভজনের সেই গুপ্ত রহস্য—তাহা লিখিয়া 'আল-এস্‌লামের' পবিত্র পৃষ্ঠাগুলি কলুষিত করিতে চাহি না। * নামাজ রোজাদি শরীয়াতের নিত্যকর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রলোভনে দলে দলে মূর্খ লোকেরা এই সকল মনুষ্যরূপী শয়তানদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইহজীবনে সশরীরে নরক লাভ ও মুসলমান জাতিকে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে।

প্রিয় ভাই ভগিনিগণ! কেবল যে বঙ্গদেশের তিন নকলে আসল খাস্তা তথাকথিত মুসল-মানদের মধ্যেই এইরূপ ধর্ম্মের বীভৎস অভিনয় চলিতেছে, তাহা নহে। এই বিশাল ভারতের অন্যান্য অংশেও ইহাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য, অধিক রসাল ঘটনাবলী ধর্ম্মের আবরণের মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে সে সমুদয়ের উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধটী বৃহৎ পুস্তকাকারে পরিণত ও অধিকন্তু আপনাদের রুচিবিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। তথাপি নমুনাস্বরূপ দুই একটা উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী মির্জ্জাপুর নিবাসী মৌলবী আহমদ আলী নামক আমার জনৈক পরিব্রাজক বন্ধু একবার গুজরাট, শিকারপুরে এক বৃদ্ধ পীর

* ইহাদের শয়তানী ক্রীড়ার বিস্তৃত বর্ণনা কাজী কারামতুল্লা ও মুনশী গোলাম কিবরিয়া সাহেবদ্বয়ের প্রণীত 'উচিৎ কথা' নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

সাহেবের তাকিয়ায় যুবক যুবতী সম্মিলিত সম্পূর্ণ অভিনব ধরণের হালকা ও তাহাতে অশ্রুতপূর্ব্ব আদিরসের ছড়াছড়ি দেখিয়া আসিয়া আমার নিকট যাহা বলিয়াছিলেন অনেক চেষ্টা করিয়াও এস্থলে আমি তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার প্রিয় বন্ধু হায়দ্রাবাদ নেজাম রাজ্যের তাৎকালীন ডাইরেক্টর অফ্‌ পবলিক ইন্সট্রকশন ও বড় লাটের কাউন্সিলের মেম্বর নবাব সৈয়দ হাসান বেলগ্রামী আমার নিকট যেরূপ গল্প করিয়াছিলেন তাহা এই—"জনৈক মূর্খ মাদারিয়া ফকির পশ্চিম দেশে তাহার মুরিদানের মধ্যে যাইয়া একদা সকলের সমুপস্থিতিকালে চক্ষু বুজিয়া মোরকোবার ভান করিয়া বসিয়া থাকেন, অনেকক্ষণ পরে ধ্যানভঙ্গ হইয়া চক্ষু খুলিলে মুরিদেরা কৌতুহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করে যে 'হুজুর এতক্ষণ মোরা কেবায় কি দেখিতেছিলেন?' পীর সাহেব প্রথমে নামমাত্র কিছু ওজর আপত্তি করিয়া শেষে বলিলেন—'দেখিতেছিলাম যে, আরশের উপর আল্লা মিয়া বসিয়া আছেন ও তাঁহার ডানদিকে চেয়ারের উপর মাদার সাহেব (হজরত খাজা বদিউদ্দিন মাদার) ও বামদিকে এক চেয়ারে রসুলোল্লাহ (দ) বসিয়া আছেন।' এ কথায় সকলে আশ্চয্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে 'হজরত রসুলে করিম (দ) বামদিকে বসিয়া আছেন কিপ্রকারে? তাঁহার স্থান তো ডানদিকে হওয়া উচিত ছিল।' তদুত্তরে পীর সাহেব বলিলেন 'তোমরা জান না, আজ যদি আল্লা মিঞার নউজ বিল্লাহ (মৃত্যু) হইয়া যায়, তাহা হইলে মাদার সাহেবই তো তাঁহার জায়গায় স্থান পাইবেন, রসুল তো রসুলই থাকিবেন।' পাঠক! ইহা অপেক্ষা, আর অধিক কি শুনিবেন? বানরের গলায় মুক্তাহার সদৃশ অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া মহান তাছাওয়াফ বিদ্যার এই দুর্গতি হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ এস, এম হোসেন।

১ম ভাগ ভাদ্র, ১৩২২ ৫ম সংখ্যা

তাছাওয়াফ।

আভাষ——পীর——পরিভাষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"But the love that leads life upward is the noblest and the best."

Henry Von Dyke, **(The child)**

ধর্ম্মপ্রাণ পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা এতক্ষণ তাছাওয়াফ বিদ্যার দোহাই দাতা সেই বহিরঙ্গের সেবকবৃন্দের, ওরফে নকল-পীরদের ক্রিয়া কলাপই দেখিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে একবার ইহার অন্যদিক—উক্ত বিদ্যার অন্তরঙ্গের প্রকৃত অনুশীলনকারীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করুন। যাঁহারা জীবদ্দশায় মৃতের ন্যায়, তৈল ও জলের একত্র অবস্থান সদৃশ। সংসারে যাঁহাদের পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে বাস, যাঁহাদের সাংসারিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বার্থের নাম গন্ধ নাই, প্রলোভন যাঁহাদের নিকটে স্থান পায় না, সম্রাটের সিংহাসন ও মৃগাসন যাঁহাদের নিকট সমান, যাঁহাদের ভৌতিক দেহ লোক-লোচনের সমক্ষে ইহসংসারেও আত্মা আপন প্রকৃত জন্মস্থান সেই পূর্ণানন্দধামে নিয়ত বিরাজ করে, যাঁহারা অহেতুকী-প্রেমের ও আত্ম-ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ, সেই পরমারাধ্য প্রেমাধারে যাঁহাদের আমিত্ব লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, কোর্‌আন শরীফের আয়েত اولياء الله لا يموتون (আওলিয়া-আল্লাহদের মৃত্যু নাই) যাঁহাদের যাঁহাদের অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে ও অমর কবি হাফেজ :—

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق * ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

(যাহার হৃদয় প্রেমের দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়াছে সে কখন মরে না, জগতের দফ্‌তরখানাতে আমাদের চিরজীবন প্রমাণিত রহিয়াছে) বলিয়া যাঁহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন, যাঁহারা জগৎবাসির সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়, যাঁহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতোলা বলিতেছেন—

الا ان اولیا الله لا خوف علیهم ولاهم یحزنون *

"জান তোমরা (সতর্কতাযুক্ত সম্বোধনবাচক শব্দ—অর্থ দেখ, জান বা হুশিয়ার হও) যে, আল্লাহ তালার বন্ধুদের জন্য কোন ভয়ের বা দুঃখের কারণ নাই"; তাঁহারাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। খোদাতালার পূর্ণজ্ঞানযুক্ত এই সকল 'আরেফ-বিল্লাহদের' লক্ষণ সম্বন্ধে মহাকবি সাদী লিখিয়াছেন-- که هم دد توان خواند شان هم ملک "ইহাঁদিগকে পশু ও ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) উভয় নামেই অভিহিত করা যাইতে পারে," কারণ—

بیاد ملک چون ملک نارمند * شب و روز چون دد ز مردم رمند

"ইহাঁরা সেই দোন জাহানের একমাত্র অধীশ্বর খোদাতালার চিন্তায় ফেরেস্তাদের ন্যায় বিশ্রামহীন, (মুহূর্ত্তেকের জন্যও সে চিন্তা হইতে বিরত নহেন) অথচ পশুর ন্যায় দিবারাত্র মনুষ্য হইতে পলায়ন করেন"; যেহেতু মনুষ্যের সংশ্রবে তাঁহাদের খোদা-চিন্তার ব্যাঘাৎ জন্মে। ইহাঁদেরই সংসর্গলাভ করিবার জন্য খোদাওন্দ করিম আপনার পবিত্র কালামে আদেশ করিতেছেন, کونوا مع الصادقین "সাদেকদের—সত্য অন্বেষণকারীদের (?) সহবাস অবলম্বন কর।" ফল কথা মানব সমাজে ইহাঁরাই প্রকৃত স্পর্শমণি, ইহাঁদের সংস্পর্শে পাপকলুষিত লৌহহৃদয় স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাঁরাই হজরত নবি করিমের (দ) যথার্থ শিষ্য ও তাঁহার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার শিক্ষার কার্য্যতঃ অনুসরণকারী। ইহাঁদের মধ্য হইতে কতক লোক ফানা ফির রসুলের (১) অবস্থায় ও কতক ফানা ফিল্লাহ হইবার পর বাকা (২) বিল্লাহএর অবস্থায় লোক

(১) ফানা—আমিত্ব লোপ—নিজের অস্তিত্ব জ্ঞান লোপ। ফানা ফিররসুল ও ফানা ফিল্লাহ—হজরত রসুল (দ)তে ও তৎপরে আল্লাহ তালাতে অত্যধিক তন্ময়ত্ব বশতঃ অহং জ্ঞান অর্থাৎ আমি আছি এ জ্ঞান লোপ হওয়া।

(২) বাকা—ফানার পরবর্ত্তী অবস্থা। ফানা ফিল্লাহ (উরুজ عروج) এর পর পুনরায় যখন নিজের অস্তিত্ব জ্ঞান হয় তাহাকে বাকা বিল্লাহ (নজুল نزول) কহে। মানুষ সাধারণতঃ নিজের নফছ (প্রবৃত্তি)এর জন্য বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু এ অবস্থায় নফছানিয়ত (প্রবত্তিপরতা) থাকে না, কেবল আল্লাহ তালার জন্যই বাঁচিয়া থাকা হয়। তখন এ জীবন ষোল আনা ভাবে আল্লাহ তালাতে উৎসর্গীকৃত থাকে।

জনাব হজরত রসুল করিম (দ)এর জীবনে এই ফানা বাকার অবস্থা পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত ছিল। তাঁহার এই অবস্থা সম্বন্ধে কোন কবি লিখিয়াছেন,—

ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق سے شاغل * مثال اس برزخ کبری کا تھا حرف مشدد کا

ভাবার্থ—'এদিকে আল্লাহ তালার সহিত সম্মিলিত ওদিকে সৃষ্টির সহিত সংমিশ্রিত! সেই বরজখে কোবরার (মহান মধ্যস্থের) অবস্থার উপমা আরবী তশ্‌দিদ্ (ّ) চিহ্নযুক্ত অক্ষরের

শিক্ষার জন্য খোদাতালা কর্তৃক নিয়োজিত হয়েন ও তাঁহারাই পীর বা মোরশেদ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগের লোকশিক্ষা সম্পূর্ণ স্বার্থবর্জ্জিত। ইহাঁরা লোকশিক্ষার জন্য কোনপ্রকার পারিশ্রমিক, উপহার বা দক্ষিণা গ্রহণ করেন না, অথচ শিষ্যের প্রতি পুত্রাধিক স্নেহের সহিত তাহাকে খোদাপ্রাপ্তির পথে লইয়া যান। এই 'লইয়া যাওয়া' ক্রিয়াটী কেবল মাত্র মৌখিক শিক্ষা দ্বারা সম্পন্ন হয় না। পীরের কর্ম্মঠ ও উন্নীত (active) আত্মাদ্বারা শিষ্যের অকর্ম্মণ্য মৃতকল্প আত্মা চালিত হইয়া উন্নতিমার্গে ধাবমান হয়; ইহাকে এলকায়ী (القائی) ফয়েজ কহে। পীর সালেক (سالک) হইলে তাঁহার দ্বারা প্রায়শ এই প্রকার ফয়েজ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার ফয়েজ আক্‌সি (عکسی Reflective)। পীরের সহবাসে থাকিতে থাকিতে শিষ্য ক্রমে সকল বিষয়ে পীরের অনুরূপ হইয়া উঠে। পীর মজজুব (مجذوب প্রেমাকৃষ্ট) হইলে তাঁহার দ্বারা সচরাচর এইরূপ ফয়েজই পাওয়া যায়। স্থল বিশেষে উভয়বিধ ফয়েজ পাওয়া যায়। এইপ্রকার সিদ্ধপুরুষদের সাহায্যলাভের জন্যই আল্লাহ-তালা কোর্‌আন করিমে আদেশ করিয়াছেন, যথা—

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة و جاهدو فی سبيله لعلكم تفلحون ◎

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসী (মোমেন) গণ তোমরা আল্লাহ তালাকে ভয় করিও, ও তাহাকে পাইবার জন্য অছিলা (Medium) অন্বেষণ কর, এবং তাহার পথে অগ্রসর হইবার জন্য অতিশয় চেষ্টা (Struggle) কর, তাহাহইলে তোমরা ধন্য হইবে।' হজরত শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী তাঁহার স্বয়চিত গ্রন্থ (قول الجميل) কওলাল জমিলে খোদাপ্রাপ্ত ও খোদা

অনুরূপ ছিল!' আরব্য ভাষায় যে অক্ষরের উপর তশ্‌দিদ্ চিহ্ন থাকে, তাহা একই সময়ে দুইবার উচ্চারিত হয়। হজরতের জীবনেরও ঠিক এইরূপ অবস্থা ছিল, তিনি একাধারে একই সময় খোদার এবং সংসারে লোকের সহিত এই প্রকারেই মিলিত হইতেন। তাঁহার প্রকৃত অনুসরণকারী শিষ্যদের অবস্থাও, সুতরাং তদনুরূপ। বরজখ শব্দের অর্থ অছিলা, মধ্যস্থ, (Medium) শিক্ষাকার্য্যের ও আধ্যাত্মিক সাহার্য্যের দ্বারা বান্দাকে উন্নত করতঃ খোদাতালার সহিত সম্মিলিত করিয়া দিবার জন্য খোদাতালার ও তাঁহার বান্দার মধ্যস্থলে যিনি অবস্থিতি করেন, তাছাওয়াফ শাস্ত্রে তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। মূল প্রবন্ধে বলিয়াছি, আল্লাহ তালা আদেশ করিতেছেন—(وابتغو اليه الوسيلة) "তাঁহাকে পাইবার জন্য অছিলা (মধ্যস্থ) অন্বেষণ কর।' সেই আরব ও আজমের ধ্রুব নক্ষত্র জনাব হজরত রেসালত পানাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওছাল্লাম (তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণও তাঁহাদের ওম্মতের জন্য এই পদাভিষিক্ত ছিলেন) হইতেছেন সেই মূল অছিলা, এই জন্য তাঁহাকে বরজখে কোবরা (প্রধান মধ্যস্থ) বলা হইয়া থাকে। হজরতের শরীয়াত অনুয়ায়ী দেহত্যাগের পর তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তি বিশিষ্ট অথচ অবস্থানুসারে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে সধারণ ভাবে অছিলা বা তাছাওয়াফের ভাষায় বরজখ বলা হয়। এই সকল মহাপুরুষগণ এমন ভাবে সংসারী লোকদের মধ্যে অবস্থান করেন যে, অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। পাঠক! স্মরণ রাখিবেন যে, এস্‌লাম ধর্ম্মে রাহবানিয়ত (সংসার বর্জ্জন-প্রথা) নাই, অতএব এই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষেরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া পূর্ণ সংসারীরূপে এই সংসারেই বিরাজ করিয়া থাকেন। জড় ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতের সহিত ইহাঁদের সম্বন্ধ

অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং এইরূপই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—(১) মজ্জুবে মোতাদারেক বিস্সুলুক অর্থাৎ মজ্জুবে ছালেক। ইঁহারা সর্ব্বাগ্রগণ্য সিদ্ধ পুরুষ, ইঁহাদের সম্বন্ধেই হজরত ফরিদুদ্দিন আত্তার লিখিয়াছেন—

اول شان مجذوب سالک آمده * کو ز اول با خدا واصل شده

ভাবার্থ—'এই দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হইতেছেন মজ্জুব ছালেক, যে হেতু তাঁহারা সলুক শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই খোদাতালার সহিত মিলিত হইয়াছেন।' ইঁহাদের সম্বন্ধে কোরআন মজিদের সুরা শোরারাতে আল্লাতালা বলিতেছেন (الله يجتبي اليه من يشاء) "আল্লাহ তালা মনোনীত করতঃ আকর্ষণ করিয়া লয়েন, যাহাকে ইচ্ছা করেন"। (يجتبي শব্দের مصدر হয় اجتبا। অর্থ, মনোনয়ন পূর্ব্বক আকৃষ্ট করিয়া লওয়া।) ইঁহাদিগকে আহ্‌লে এজ্‌তেবাও বলা হয়। ইঁহারা জীবনের প্রথম হইতেই খোদাতার প্রেমে আকৃষ্ট, সংসারের সঙ্গে বস্তুতঃ সম্বন্ধ শূন্য। নবীদের জীবনে পাপ-সম্ভাবনা আদৌ নাই, তাঁহারা মাছুম্ (সম্পূর্ণ নিষ্পাপ); আর এই শ্রেণীর ওলিআল্লাহ্‌গণ মহফুজ (محفوظ)—পাপ হইতে রক্ষিত, অর্থাৎ পাপ কার্য্যের ইচ্ছা ইঁহাদের হইতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌তালা তাহার অনুষ্ঠান হইতে ইঁহাদিগকে রক্ষা করেন। জগৎপাতা

দেখিতে পাওয়া যায়। কোরআন করিমের অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে(الرحمن على العرش استوى) "আল্লাহ্‌তালা আর্‌শের উপর সমান ভাবে অবস্থিত আছেন।" এ 'সমান ভাবে' মানে কি ? সাধারণ লোকের মধ্যে, যাঁহারা খোদাতালার সম্বন্ধে স্থূল ধারণা (Concrete idea) পোষণ করেন, তাঁহারা হয় তো ভাবিতে পারেন যে, খোদাতালা আরশ রূপ মনিমুক্তাদি খচিত একটী বিরাট সিংহাসনের উপর সমান ভাবেই বসিয়া আছেন, দক্ষিণে বামে কোন দিকে হেলিয়া বা বক্রভাবে অধিষ্ঠিত নহেন। সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ! আপনারা হাঁসিবেন না, ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, অনেকের এইরূপ বিশ্বাসই পাইবেন। আল্লাহতালা কোন অকারণ ও উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্ম করেন না—অতএব নিজের কালাম পাকেও কোন বৃথা শব্দ বা ভাষা ব্যবহার হইয়াছে ? জানি না আমাদের দেশের বিভিন্ন মতের আলেমেরা ইহার কি ব্যাখ্যা করেন। তাছাওয়াফ শাস্ত্রে এই আয়েত শরীফের ব্যাখ্যা এইরূপ করা হয় যে, 'জড় ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতের অর্থাৎ আলমে খলক ও আলমে আমরের সন্ধিস্থলে (**Line of the demarcation between the Material and the Spiritual worlds**) পাক পরওয়ারদেগারের বিরাট আসন বিরাজিত রহিয়াছে, সুতরাং এই উভয় জগতের সহিত তাঁহার সমান সম্বন্ধ। তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, একটার জন্য আর একটাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। এরূপ করা খোদাতালার অভিপ্রেত নহে। যদিও এই জড় জগৎটী, এই (عالم صور) আকৃতি বিশিষ্ট জগৎটী খোদাতালার সৃষ্টিনিচয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি, (?) তথাপি ইহা উপেক্ষার বিষয় নহে। কোনও মহান উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং মাটীর পুতুল আমাকে তিনি এই জগতে নিজের খলিফা (প্রতিনিধি) করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আমাকে আশ্‌রাফোল মখলুকাত বা শ্রেষ্ঠতম-সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সে উদ্দেশ্যটী কি ? আমার সহিত সে উদ্দেশ্যের সম্বন্ধই বা কি ? কোন্ কর্ত্তব্য সমাধা করিবার জন্য আমি এখানে প্রেরিত হইয়াছি ? কোথায় এবং কি প্রকারে আমার কর্ত্তব্য শেষ হইবে ? ইত্যাকার অনেক কথাই এই প্রসঙ্গে বলিবার আছে। স্থানাভাব প্রযুক্ত এবং সন্দর্ভ বাড়িয়া যাইবার ভয়ে আপাততঃ উহা পরিত্যক্ত হইল।

আল্-এস্লাম।

প্রাচীন-মুসলমান-শিল্পের বিবিধ নিদর্শন।
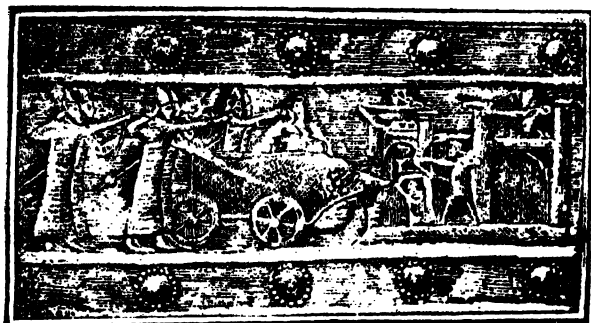
নগর প্রাচীর ধ্বংস করার যন্ত্র বিশেষ।
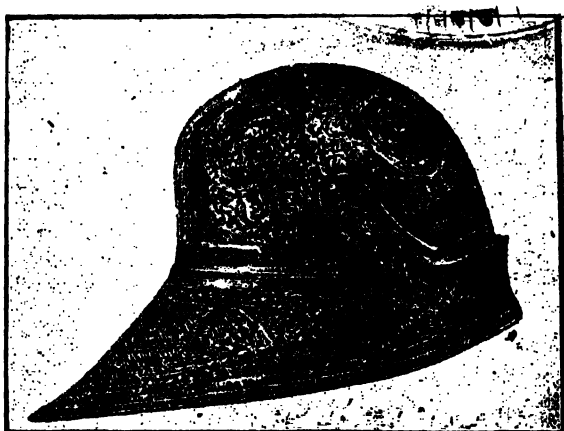
সর্ব্বশেষ স্পেনরাজ আবু আবদুল্লার লৌহমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ

খোদাতালা জগতে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মানব সমাজে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই জামালোল্লাহ্ (তাঁহার রূপ) দেখিবার জন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারাই তাঁহারা। এই জন্য ইহাঁরা আল্লাহ্‌তালার মোরাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগের পূর্ণসিদ্ধি লাভের উপায়ও তিনি নিজেই করিয়া দেন। ইহাঁদের দর্‌জা (محبوبیت) প্রেমাস্পদের, প্রেমিকের নহে; প্রেমিককে অনেক কষ্ট করিয়া ঈশ্বর সম্মিলনে সিদ্ধ হইতে হয়। ইঁহারা বিনা কষ্টে বা অল্পায়াসে সেই সিদ্ধিলাভ করেন। ইহাঁদের সম্বন্ধেই আল্লাহ তালা বলিয়াছেন—(ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء) "ইহা আল্লাহতালার কৃপা বিশেষ, তিনি দান করেন যাহাকে ইচ্ছা করেন।" ইহাঁদের এক দৃষ্টিতেই লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, অমানুষ মানুষ হইয়া যায়। ইঁহাদের সম্বন্ধেই প্রেমিক কবি হাফেজ বলিয়াছেন,—

آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند * آیا بود که گوشهٔ چشمی بما کنند

ভাবার্থ—'যাঁহারা একদৃষ্টিতে মৃত্তিকাকে স্বর্ণ বানাইতে পারেন, কি সৌভাগ্য হইত, যদি তাঁহারা চক্ষুর কোণ দিয়া একবার আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন!" ইহারা প্রথমে ঈশ্বরকৃপায় জজ্‌বা লাভ করিরা পরে ছলুক তয় (স্তর অতিক্রম) করেন। (ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত নিজের চেষ্টায় কখনও জজ্‌বা লাভ হয় না)। অতএব ইহাঁরা আউয়াল দরজার পীর (প্রথম শ্রেণীর গুরু), ইহাঁদের একটী কটাক্ষ মানুষের পূর্ণ সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট। (২) ছালেক মোতাদারক বিল জজ্‌বা অর্থাৎ ছালেক মজ্‌জুব। ইহাঁরা প্রেমিক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাঁদের সম্বন্ধে আল্লাহ তালা উপরোক্ত আয়েতের সঙ্গেই বলিয়াছেন—(ویهدی الیه من ینیب) "আল্লাহতালা পথ প্রদর্শন করেন, তাহাকে যে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করে।" ইহাঁদিগকে আহলে হেদায়েত এবং মুরিদও বলা যায়। ইহাঁদিগকে অনেক চেষ্টা ও 'মোজাহেদা' করিয়া সিদ্ধি-পথে উপনীত হইতে হয়। ইহাঁদিগকে প্রথমে ছলুক শিক্ষা শেষ করিতে হয়, পরে উপযুক্ত পাত্র হইলে খোদাতালার তরফ হইতে জজ্‌বা প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হয়েন। ইহাঁরা দ্বিতীয় দরজার (শ্রেণীর) সিদ্ধ পীর। এই দুই শ্রেণীর বোজর্গদিগকে প্রশংসিত শাহ সাহেব গুরুপদবাচ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁদের শিষ্যরাই উপযুক্ত হইলে সিদ্ধিপথে উপনীত হইতে পারেন। হিন্দু শাস্ত্রেও গুরুর লক্ষণ এইরূপে কথিত হইয়াছে,যথা—"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া। চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥" অর্থাৎ 'অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যে চক্ষু অন্ধ হইয়াছে—তাহাকে জ্ঞানরূপ অঞ্জনের শলাকা দ্বারা যিনি খুলিয়া দেন, সেই 'গুরুকে নমস্কার করি।'

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণং।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌদৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং॥ (ভাগবত)

ভাবার্থ—'যাঁহারা জলে ডুবিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে নৌকা যেরূপ মহা আশ্রয় স্বরূপ হয়, ঘোর সংসাররূপ সমুদ্রে পড়িয়া যে সকল জীব হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ

সাধুরাও তদরূপ হয়েন।' (৩) মজ্‌জুব মোজাররাদ্‌—কেবল মাত্র প্রেমাকৃষ্ট (মজ্‌জুব অর্থ প্রেমাকৃষ্ট)। মিলনের নিকটবর্ত্তী অবস্থা সম্পন্ন, কিন্তু প্রিয় সকাশে উপস্থিত হইবার গন্তব্যপথ অনভিজ্ঞ,হায়রাতের মোকামে আবদ্ধ,নিজে অব্যবস্থিত চিত্ত। ইঁহাদের দ্বারা কোনপ্রকার উপকারের সম্ভাবনা নাই। (৪) ছালেক মোজার্‌রদ্‌—কেবল মাত্র গন্তব্য পথ ভ্রমণকারী (ছালেক অর্থ গন্তব্যপথ ভ্রমণকারী)। জজ্‌বা (প্রেমাকর্ষণ) অপ্রাপ্ত, সুতরাং মিলনে অকৃতকার্য্য। শিষ্যকে সিদ্ধি পথে উপনীত করাইতে অক্ষম বলিয়া ইহাঁরা শিক্ষা কার্য্যে অপটু। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর বোজরগান ভিন্ন আর কেহ পীর আখ্যা (গুরুপদ) পাইবার অধিকারী হইতে পারেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ সংসারী থাকিলেও জানিতে হইবে যে তিনি সংসারের প্রতি একেবারেই আশক্তি শূন্য, সুতরাং নির্লিপ্ত। খোদাতালা ভিন্ন ইহাঁদের অন্য কোন লক্ষ্য নাই—একমাত্র তাঁহার চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাই ইহাঁদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। ইহাঁদের ক্রিয়া কলাপে স্বার্থের লেশ মাত্র নাই। মায়া মোহ বা অন্য কোন পার্থিব আকর্ষণের অধীন ইহাঁরা নহেন। কোন প্রকারের প্রলোভন ইঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না। সম্পূর্ণ দ্বেষহিংসা পরিবর্জ্জিত ও আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া ইঁহারা সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করেন। স্বর্গসুখও ইঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ। এক হিসাবে ইঁহারা খোদাতালা ভিন্ন অপর সকল বিষয় হইতে মৃত। এইরূপ মহাজন সম্বন্ধেই গীতায় উল্লেখ হইয়াছে "জ্ঞেয় সো নিত্য সন্ন্যাসী চো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি"—'সে'ই নিত্য সন্ন্যাসী, যাহার কোনপ্রকার দ্বেষ হিংসা বা আকাঙ্ক্ষা নাই।' হজরত খাজা কুতবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকী (যাঁহার নামে দিল্লীর কুতব মিনারের নামকরণ হইয়াছে) নিজের একটী প্রার্থনায় বলিতেছেন—

نه دنیا دوست میدارم نه عقبی را خریدارم
مرا چیزے نمي باید بجز دیدار یا الله

ভাবার্থ—'আমি সংসারকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করি না, পরলোকের ও (স্বর্গের) ক্রেতা নহি; হে আল্লাহ্‌, একমাত্র তোমার দর্শন ব্যতীত অন্য কোন জিনিষ আমার স্পৃহনীয় নহে।' ফলতঃ ইঁহারা শব্দ ছাড়িয়া অর্থের অনুসন্ধিৎসু। (ইঁহাদের অবস্থার সম্যক পরিচয় দিবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই)। ইঁহাদের আত্মাকেই আল্লাহতালা সম্বোধন করিয়া বলিবেন— يايتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضية مرضية "হে নিষ্কাম নফ্‌ছ (আত্মা) তোমার প্রভুর দিকে চল, তুমি তাঁহার প্রতি এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।" এই সকল ব্যক্তির নফ্‌ছ আম্মারাই শেষে নফ্‌ছ মোতমায়েন্নাতে পরিণত হইয়া যায়। এই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন লোক খোদা প্রাপ্তি পথের শিক্ষাগুরু হইবার উপযোগী হইতে পারেন না। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। আজ কালকার বাজারে যেরূপ পীরের ছড়াছড়ি, এমন কি প্রতিযোগীতা (Compitition) দেখা যায়, তাহাতে তাছাওয়াফ শাস্ত্রের ন্যায় গুরুগম্ভীর বিষয়টী যে বালকের ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও এই সকল মহাপ্রভুর দ্বারা উহার যে

ব্যভিচার হইতেছে, তাহা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। এই সন্দর্ভের প্রারম্ভে যে সকল রঙ্গিন পীরদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত সমাজে আর একদল সাদা (ছুফি পরিচ্ছদ-ধারী) পীর দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কোন পীর, সাহেবের (সেই পীর সাহেব হয় তো সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন) বংশধর, আত্মীয় বা ছাজ্জাদা নশিন (স্থালাভিষিক্ত—অধিকাংশই অনুপযুক্ত), কেহ হয় তো কোন ভাল সিদ্ধ পীরের নিকট ২।৪টা লতিফা পরিচালিত বা দায়রা তয় (অতিক্রম) করিয়া অনুরোধ উপরোধে পীর সাহেবের নিকট হইতে খেলাফতনামা* (মুরিদ করিবার অনুজ্ঞা-পত্র—ইহা উপযুক্ত, শিক্ষিত ও সিদ্ধ শিষ্যকেই দিবার প্রথা হইয়াছে) লইয়া ও কেহবা তাহা না লইয়াই পীর সাজিয়া বসেন ও এতদ্দ্বারা কেহ বা জেন, ভূত তাড়াইয়া, কেহ অভিনব ধরনের চিকিৎসাদি করিয়া, কেহ বা মুরিদ করিয়া, নিজেদের অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিয়া লয়েন। আর একদল খেলাফতনামা শূন্য ভুঁইফোঁড় হটাৎ পীর আছেন, যাঁহারা তরিকতের শিক্ষার আদৌ ধার ধারেন না, কেবলমাত্র কয়েকখানা আরবী পারসী কেতাব পড়িয়া বা কোন মাদ্রাসা হইতে পাশ সার্টিফিকেটরূপ চাপরাস হাসিল করিয়া, পীর সাজিয়া বসেন ও দেশের মধ্যে ওয়াজ, নছিহত ও সেই সঙ্গে তাঁহাদের ভক্তবৃন্দকে মুরিদ করিয়া পয়সা রোজগার করেন। ইহাদিগকে কেহ তরিকতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেন যে, 'আমরা বায়য়াতে তৌবা লইয়া থাকি (?)।' এই শেষোক্ত পীরদের মধ্যে সমসাময়িক ও সমশ্রেণির অপর পীরদের নানা খুটি নাটি দোষ দেখাইয়া তাঁহাদের ও নিজের যজমানদের মধ্যে আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার, তথা মুসলমান সমাজে দলাদলি বাধাইয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিবার প্রয়াসী থাকেন। কেহ বা, 'মোরদা বেহেস্ত মে যায় এয়া দোজখমে' তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহার সম্বৎসরের ধান চাউল, মোরগ মুরগী প্রভৃতি সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনেই ব্যস্ত থাকেন † । ইঁহারা নিজে অহঙ্কারে, স্বার্থপরতায় ও নফছানিয়তে পরিপূর্ণ, অপরের কুৎসা গ্লানি করা ইঁহাদের নিকট দোষাবহ নহে। প্রকৃত এসলামি আখলাক (خلق محمدی)হইতে ইঁহারা অনেক দূরে অবস্থান করেন। আত্মমর্য্যাদা ‡ অর্জ্জন করাই ইঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র ও মুখ্য উদ্দেশ্য। পাঠক! বলুন দেখি, এই সকল (عالم بے عمل) বিরত-অনুষ্ঠান আলেমদিগের হস্তে তওবা করিবার ফল কি?

---

* উপযুক্ত শিষ্যের জন্য কোন ছাড় পত্রের আবশ্যক হয় না। অধুনা এইরূপ লেখার বড়ই অপব্যবহার হইতেছে। পূর্ব্ব যুগে ইহা ছিল না—এখনও না থাকা ভাল। বৃক্ষের পরিচয় ফলে হয়, পত্রেও হইতে পারে। এই ফল এবং পত্র রূপ অখলাফ এবং আমাল দেখিয়াই সিদ্ধ অসিদ্ধ চিনিতে হইবে। সম্পাদক।

† তাহাদের কথা এই, "হরদম খোদাকো ইয়াদ কিজিয়ে, জরু গরু বেচকে মেরা ঝুলি ভর দিজিয়ে!" এমন পীরের নিকট হইতে প্রত্যেককেই সাবধান থাকিতে হইবে। সম্পাদক।

‡ বাস্তবিক শরফোন্নফস (شرف النفس—Self respect) প্রত্যেকেরই থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহার অভাবে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা কখনই সম্ভব নহে। লেখক আত্মমর্য্যাদা অর্থে বোধ হয় আত্মম্ভরিতা বা আত্মপ্রশংসা (خانیت) বুঝাইতে চাহেন। আত্মমর্য্যাদা ইহার বিপরীত পদার্থ। সম্পাদক।

যে নিজে পঙ্কিল জলাভূমিতে আকণ্ঠ প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে সে অপরকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবে কিরূপে? ইঁহাদের হস্তে তওবা করা অপেক্ষা নিজের ঘরে বসিয়া খোদাতালার নিকট কাঁদাকাটা করিয়া পূর্ণ অনুতপ্ত চিত্তে নিজে নিজে তওবা করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। উপরের লিখিত অসিদ্ধ তরিকতের পীরদের মধ্যে আবার অনেকে নিজের যতটুকু শিক্ষা, শিষ্যবৃন্দের মধ্যে তাহা লইয়াই নাড়া চাড়া করেন। কিন্তু তাহাতে জীবনের মূল উদ্দেশ্য খোদাপ্রাপ্তি ও খোদা দর্শন সম্বন্ধে নৈরাশ্য ভিন্ন আর কিছু লাভ হয় না। কোরআন মজিদে উক্ত হইয়াছে—

من كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى

"যিনি এই দুনিয়াতে খোদা দর্শন সম্বন্ধে অন্ধ থাকিবেন, পরলোকেও তিনি অন্ধ উঠিবেন।" এই আয়েত শরীফের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে স্বর্গকামনা জীবনের মুখ্য ও মূল উদ্দেশ্য নহে, খোদাপ্রাপ্তিই প্রধান ও চরম লক্ষ্য। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে সকল রকমে সুখে রাখিবার চেষ্টা করে ও রাখিয়া থাকে, আপনারা স্ব স্ব সাংসারিক জীবনের দ্বারা এবিষয়টা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আল্লাহতালা বলিতেছেন—(يحبهم يحبونه) "তিনি ভাল বাসেন তাহাদিগকে, যাহারা তাঁহাকে ভাল বাসে।" তাহা হইলেই দেখিতে হইবে যে যাহারা খোদাতালার ভালবাসা লাভে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে তিনি যৎপরোনাস্তি ভাল অবস্থায় রাখিবেন ও নানা সুখের আকর "বেহেস্তে" স্থান দিবেনই। কিন্তু তাই বলিয়া বেহেস্ত প্রাপ্তি আমার চরম লক্ষ্যস্থল হইতে পারে না—একমাত্র খোদাই লক্ষ্য। পাঠক বুঝিলেন যে, এই সকল অসিদ্ধ পীরের হস্তে পড়িয়া মানুষ কিরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও গন্তব্যপথ বিস্মৃত হইয়া অন্ধ অবস্থায় এখান হইতে প্রয়ান করিয়া থাকে! অহো কি দুর্ভাগ্য! খোদাতালার নিকট এই সকল পীরদের যে কতদূর দায়ীত্ব, তাহা পীর সাহেবেরা নিজেই অনুমান করিতে পারেন। তবে সত্যের অনুরোধে এটুকু বলা যায় যে, রঙ্গিন পীরদের দ্বারা যেরূপ লোকের ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া থাকে, সাদা পীরদের দ্বারা তাহা না হইয়া বরং সমাজ মধ্যে একপ্রকার নীতিশিক্ষা বিহীন * ধর্ম্মের সাধারণ অঙ্গের শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে এবং অজ্ঞ লোকে শরীয়াতের মোটামুটি আহকাম পালনে ক্রমশ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, যথালাভ মন্দের ভাল। 'নীতিশিক্ষা-বিহীন' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অনেক স্থলে এইপ্রকারে শিক্ষিত অনেক পাকা মুছল্লিকে, পরস্বাপহরণ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান প্রভৃতি বড় বড় গর্হিত কার্য্য করিতে দেখা যায় ও কেহ প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্বাস অনুসারে উক্ত অন্যায় কার্য্যকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। অনেক ধনী মুছল্লিকে বেয়ারিং পোষ্টে ঠিক সময় মত নামাজ আদায় করিতে দেখা যায়, কিন্তু জাকাতের বেলায় তাঁহারা প্রায়ই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন। নীতিশিক্ষা সাধারণ সমাজে যে সকল কার্য্যের দ্বারা প্রদত্ত হয়, সমাজ সে বিষয়ে

---

* ধর্ম্ম যাহা, তাহা নীতিশিক্ষার সহিত রক্তমাংস সম্বন্ধ যুক্ত। সাদা পীরের শিক্ষা তেমনটী বলিয়া মনে হয় না। অবশ্যই আধ্যাত্মিকতা উহাতে খুব বেশী নাই বলিয়া অপূর্ণ বলা যাইতে পারে। লেখকের উক্তি এখানে সীমার অতীত। সম্পাদক।

উদাসীন। এক ওয়াজ নছিহত, তা পীর বা মৌলবী সাহেবের মন মত নজরানার টাকা ও চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় খোরাকের জন্য ছাগল, মুরগী, দুগ্ধ, ঘৃতাদি সংগ্রহ না করিতে পারিলে আর ওয়াজের মজলিসের আয়োজন করা যায় না। যদিও বা কালে ভদ্রে বিশেষ চেষ্টা করিয়া এরূপ মজলিসের অধিবেশন করা হয়, তাহাতে বক্তা সাহেব কি বলিলেন না বলিলেন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রায়ই তাহার ফলভোগ হইতে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহারা তখন পাকশালার বন্দোবস্ত, মজলিসের এন্তেজাম, বক্তা সাহেবের ও তাহার সহিত সমাগত বক্তা সাহেবের সেবকরূপ তালেঁ-বে-এলমদিগের সন্তোষ বিধানের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং মজলিসে সাপ ব্যাং প্রভৃতি কি বলা হইল, তাহা ভালরূপ শুনিতেও পান না। কেবলমাত্র তাঁহাদের দ্বারা একটী বিরাট ওয়াজের মহফেল আহুত হইয়াছিল, এই আত্মপ্রসাদটী লাভ করেন। সমাগত ব্যক্তিরা ওয়াজ নছিহত শ্রবণ করে সত্য, কিন্তু তাহার ক্রিয়া কতকক্ষণ স্থায়ী থাকে ? পাড়ায় কোন লোক মরিলে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যোগদান করিবার কালে লোকের মনে সাংসারিক জীবনের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়া যেমন ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, আবার স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত মিলিত হইলে সে বৈরাগ্য ভাব চিরতরে তিরোহিত হইয়া যায়। উপরোক্ত বৎসর, দুই বৎরান্তে শ্রুত ওয়াজ নছিহতের ক্রিয়া বা ফলও তদ্রূপ গতিপ্রাপ্ত হয়। *এইজন্য প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পূর্ব্বে খোতবারূপে নীতিশিক্ষা* প্রদানের পদ্ধতি এস্‌লাম ধর্ম্মে ব্যবস্থিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা সপ্তাহে সঞ্চিত মানসিক ময়লা ক্রমশঃ কাটিয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের অতিরিক্ত গোঁড়া (Conservative) মৌলবী সাহেবদিগের (যাঁহারা দেশের হাদীরূপে পরিগৃহিত হইয়া থাকেন) ঔদাস্য, অমনোযোগ বা গোঁড়ামীর কল্যানে সে গুড়েও বালি। আরবী ভাষায় লিখিত ও দিল্লী কানপুর প্রভৃতি সহরের ছাপা তোতাপাখীর 'নবিজী রোজী ভেজো' রূপ বান্ধাগতের খোতবাই দেশের শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত খতিবদের দ্বারা পঠিত হয়, আরবী অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকে কেহ হা করিয়া খতিব সাহেবের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার উচ্চারিত শব্দগুলি গিলিতে থাকে, কেহ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখভঙ্গি দেখিতে থাকে, কেহ তন্দ্রার আবেশে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে থাকে, আর কেহ বা খতিব সাহেবের কণ্ঠস্বর ভাল হইলে সঙ্গীতের সুখ উপভোগ করিতে থাকে। সমাজের অবস্থা ও সমাজ শিক্ষকদিগের ব্যবস্থা যখন এইরূপ, তখন নীতিশিক্ষা কি ভুমি ফুড়িয়া বাহির হইবে ?

مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت نیکوست نه که ترتیل سورت مکتوب

অর্থাৎ 'সদাচরণ শিক্ষা দিবার জন্যই কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হইয়াছে, কেবল মাত্র সুর করিয়া পড়িবার জন্য নহে।' খোতবা, যাহাতে কোরআন ও হাদিছ হইতে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, দেশের ধর্ম্মশিক্ষকদের দ্বারা তাহার এইরূপ অপব্যবহার হইয়া থাকে! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে খোতবাতে পারস্য বা উর্দ্দু ভাষার কবিতা সংযোজিত হইতে পারে, কিন্তু মূল খোতবা পাঠান্তে দেশীয় ভাষা

বাঙ্গালায় উহার ভাব ও উদ্দেশ্যগুলি বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না! ইহাতে ঘোর অধর্ম্মের বিভীষিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে!! তাছাওয়াফের কথা বলিতে বলিতে নীতি শিক্ষার কথা পাড়িয়া ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়া ফেলিয়াছি, আমার এই বাচালতার জন্য হয় তো অনেকে বিরক্ত হইতেছেন। কি করিব, কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া এ কথাগুলি বলিতে হইল। বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে আপনারা হয় তো আমার উক্তির পোষকতা করিবেন এবং এরূপ উক্তিকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না। কিন্তু যাঁহাদের লইয়া কথা, দেশের সেই ধর্ম্মশিক্ষকেরা নিশ্চয়ই আমার প্রতি হাড়ে চটিবেন। (الحق مر).'সত্য কথা কটু লাগে।' সত্যম ব্রুয়াৎ প্রিয়ম ব্রুয়াৎ মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম— অপ্রিয় সত্য বলিতে নাই, আমি তাহাই করিয়াছি, সেজন্য তাঁহারা হয় তো মনে মনে আমার প্রতি কত গালি বর্ষণ করিবেন, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না।

سخن کز بہر حق گوئی چه عبرانی چه سریانی
مکان کز بہر حق جوئی چه جابلقا چه جابلسا

উপসংহারে 'তাছাওয়াফ' বিষয়টা কি? ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? ইহার অনুশীলনের ফল কি? ইহা এসলামের অঙ্গ বিশেষ কি না? ধর্ম্মজগতে ইহার আবশ্যকতা কি? ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকে সাম্প্রদায়িক বা অজ্ঞতা নিবন্ধন ব্যক্তিগতভাবে ইহাকে কোরআন ও হাদিছের বহির্ভূত একটী স্বতন্ত্র শাস্ত্র— মানব গঠিত একটী বিভিন্ন মত বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। আমি আল্লাহ তালার পবিত্র কালাম হইতে এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে বিণীতভাবে জিজ্ঞাসা করি যে, ইহার সাধকেরা কি এমন অপূর্ব্ব সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন যাহার আভাষ পাওয়া মাত্র সংসারের অতি আদরের পুত্র কলত্রাদি আত্মীয়স্বজন, অতি যত্নেরসঞ্চিত ধন দৌলত, অনেক উপাসনায় ও তৈল মর্দ্দনে লব্ধ টাইটেল, অতি কষ্টে অর্জ্জিত যশোরাশি,এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার বস্তু রাজসিংহাসন, তাঁহাদের অরুচির ও উপেক্ষার সামগ্রী হইয়া পড়ে?

ازانگه که یارم کسی خویش خواند * دگر با کسم آشنائی نماند

"যে সময় হইতে আমার বন্ধু আমাকে নিজের লোক বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তাহার পর হইতে আর কাহারও সহিত আমার বন্ধুত্ব রহিল না" (সাদী)। বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকা! ইঁহাদের এই অবস্থার ভিতর কি কিছুমাত্র ঐশ্বরিক ভাব পরিলক্ষিত হয় না? ইহা কি আল্লাহ তালার কথিত।সেই واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا, "তোমার প্রভুর নাম স্মরণ কর (তাহাকে ভুলিও না) ও সকলের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া তাঁহার দিকে ঝুকিয়া পড়" (সুরা মোজ্জাম্মেল, ২৯ পারা); সেই یحبهم ویحبونه "আল্লাহতালা ভাল বাসেন তাহাদিগকে যাহারা তাঁহাকে ভাল বাসে;" সেই والذین آمنوا اشد حبا لله, "যাহাদের ইমান আছে তাহারা আল্লাহতালাকে অতিরিক্ত ভালবাসে;" সেই فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا "যাহার ইচ্ছা হয় সে তাহার প্রভুর

পথ অবলম্বন করিতে পারে” প্রভৃতি শিক্ষার ছবক নহে? আল্লাহতালা মোমেন বান্দাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

يا ايها الذين آمنو لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكرالله ج و من يفعل ذالك
فاولئك هم الخسرون ◎

ভাবার্থ—“হে মোমেনগণ, তোমাদের ধন ও সন্তানগণ যেন তোমাদিগকে ভগবৎ চিন্তা হইতে বিরত না রাখে, এবং যাহারা এরূপ করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে” (সুরা মোনাফেকুন—২৮ পারা)। আবার সতর্ক করিয়া বলিতেছেন—الا بذكرالله تطمئن القلوب “জানিয়া রাখ, একমাত্র ভগবৎ চিন্তাতেই হৃদয়ের সকল শান্তি লাভ ঘটিয়া থাকে” পাঠক! পবিত্র কোর্‌আনের এই আয়েতগুলি কি আধ্যাত্মিক শিক্ষা জ্ঞাপক নহে? কোর্‌আন শরীফের এইপ্রকারের শিক্ষা বিশিষ্ট আয়েতগুলিই হইতেছে তাছাওয়াফ শাস্ত্রের মূল মন্ত্র। মোমেন বান্দার লক্ষণ সম্বন্ধে সুরা সেজদাতে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন,—

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون

“তাহাদের পৃষ্ঠদেশ শয্যার উপরে আরাম পায় না, ডাকিবার কারণে তাহাদের প্রভুকে (বিচ্ছেদের) ভয়ে ও (মিলনের) লোভে, এবং তাহাদিগকে ভরণপোষণের জন্য যাহা দেওয়া হয় তাহা আল্লাহ রাহেতে খরচ করে।” যাঁহারা কোরআন মজিদের অর্থ সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় তো বলিবেন যে, এই ‘ভয়’ দোজখের জন্য ও এই ‘লোভ’ বেহেস্তের জন্য হইতে পারে। এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাদিগকে ‘মোমেন’ কাহাকে বলে ও মোমেনের লক্ষণ কি? তাহা কোর্‌আন ও হাদিছ হইতে ভালরূপে জানিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করি।

‘তাছওয়াফ’ পবিত্র কোরআন ও হাদিছের বহির্ভূত কোন পদার্থ নহে, পরন্তু উহা উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ নিচয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বিশেষ। ইহা এস্‌লাম ধর্ম্মের **Esoteric** বা **Spiritual** (আধ্যাত্মিক) অংশ, কিন্তু তাই বলিয়া উহার **Exoteric** বা **Material** (বাহ্যিক) অংশ, হইতে একেবারে সম্পর্ক শূন্য নহে। শরীরের বহিস্থিত ত্বক আহত হইলে যেমন ভিতরের স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠে, এবং স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থল নষ্ট করিয়া দিলে যেমন শরীরের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত সমুদয় অংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, ধর্ম্মের **Esoteric** (আভ্যন্তরিক বা আধ্যাত্মিক) ও **Exoteric** (বাহ্যিক) উভয় অংশের মধ্যেও পরস্পর সেইরূপ সম্বন্ধ—একের বিলোপ সাধনে অপরটী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কোর্‌আন ও হাদিছের শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাহাই। এস্‌লামের বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপের পূর্ণ অনুশীলনের দ্বারা আভ্যান্তরিক পিপাসা (খোদা সম্মিলনাকাঙ্ক্ষা) বর্দ্ধিত হইলে মানুষ ক্রমশ এই সাধনার অধিকারী হয়। বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপ তখনও থাকে, কিন্তু ভাব বদলাইয়া যায়। মনে করুন, আমরা নামাজ পড়ি—তাছাওয়াফের সাধকেরাও নামাজ পড়েন, কিন্তু আমাদের ও তাঁহাদের নামাজে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমরা ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, জমিদারের খাজানা দেওয়ার বা মাথার বোঝা ফেলিবার মত করিয়া সময়মত নামাজটী সারিয়া দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি, নামাজের

সময় আমাদের বাহ্যিক জ্ঞান ষোল আনা বজায় থাকে ; আর ইহাঁদের নামাজ মেয়ারাজোল মোমেনিন এ (খোদা সম্মিলন-পন্থা) পরিণত হইয়া বাহ্য জগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দেয় ও খোদাতোলাতে তন্ময়ত্ব আনিয়া ফেলে। আমি উপরে বলিয়াছি যে পার্থিব সম্পর্কের প্রতি ইঁহাদের অরুচি ও উপেক্ষা হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, ইঁহারা দারা পুত্রাদি লইয়া সংসারে বসবাস করেন না। জনাব হজরত রসুলে করিম(দ) নিজে সংসারী ছিলেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক শিষ্যবৃন্দ তাছাওয়াফএর সাধক ওলিআল্লাহদের মধ্যে যাঁহারা বড় দরের লোক ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বিবাহিত এবং সংসারী ছিলেন। 'ফানা' ও 'বাকা'র টীকার মধ্যে আমি দেখাইয়াছি যে, রাহবানিয়ত (সংসার বর্জ্জন প্রথা) এসলাম ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে (সুরা হাদিদের শেষাংশ দেখ)। কিন্তু আমাদের সংসার করা ও তাঁহাদের সাংসারিক হওয়াতে অনেক পার্থক্য আছে। আমরা সংসারের দাস হইয়া সংসার করি—তাঁহারা সংসারকে দাস বানাইয়া সংসার করেন। আমাদের সংসারের প্রতি ষোল আনা টান আছে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্লীপ্তভাবে কর্ম্মফল আল্লাহতোলাতে সমর্পণ করিয়া সংসারের কর্ত্তব্য (duty) গুলি সমাধা করিয়া যান মাত্র—হৃদয়ের আকর্ষণ ও ষোল আনা সম্বন্ধ প্রভুর দিকেই থাকে। আমরা রিপুর দাস ও বাহন, রিপুগণ যে ভাবে ইচ্ছা আমাদিগকে চালিত করে, তাঁহারা রিপুগণকে দাস ও বাহন বানাইয়া তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন ও নিজের ইচ্ছামত তাহাদিগকে চালিত করেন। আমরা সংসারে অনেকগুলি খোদা (যথা—অর্থ খোদা, বড় সাহেব বা বাবু খোদা, স্ত্রী খোদা, পুত্র খোদা, বিষয়ী লোকের বিষয় খোদা প্রভৃতি) সৃষ্টি করিয়া আমরণকাল পর্য্যন্ত অনন্যমনে তাহাদের উপাসনায় রত থাকি তথাপি আশা পূর্ণ হয় না, যেমন শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দণ্ডং বিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত-কম্পিত শোভিত দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্।

অর্থাৎ—'শরীর গলিয়া গিয়াছে (মাংশ পেশী সকল লোল হইয়া পড়িয়াছে), পক্ক কেশের কারণে মস্তক শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, মুখগহ্বর হইতে দশনপাতি স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, কম্পিত দেহে যষ্টিভর করিয়া চলেন, তথাপি আশাভাণ্ড পরিপূর্ণ হয় না। (তখনও বাঁচিয়া থাকিয়া সংসার করিবার আশা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। (ক্রমশঃ)

যাহারা (প্রার্থনা কালে) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ আমাদিগকে ইহকালে এবং পরকালে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য দান কর ; এবং আমাদিগকে আগুণের শাস্তি হইতে রক্ষা কর ; তাহারাই সেই ব্যক্তি যাহাদের জন্য তাহারা যাহা সঞ্চয় (পূণ্য) করিয়াছে, তাহার বদলা দেওয়া যাইবে—আল্লাহ সত্বরই হিসাব করেন। সূরা বকর ২৫ রুকু।

আল্-এস্লাম।

প্রাচীন-মুসলমান-শিল্পের বিবিধ নিদর্শন।

সুদৃঢ় নগর বা দুর্গ-প্রাকার বিধ্বস্ত করার যন্ত্র বিশেষ।
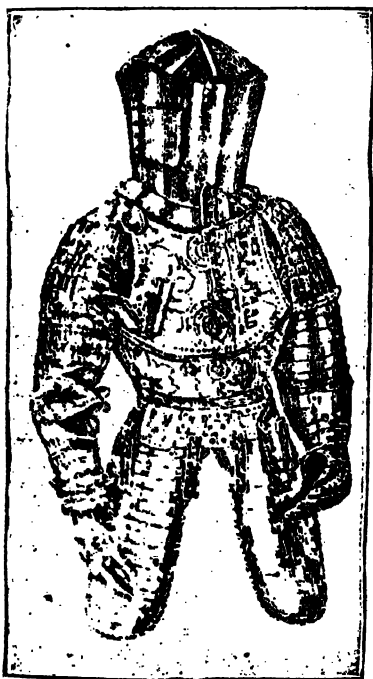
স্পেনের শেষ নরপতি আবু আবদুল্লার
'জেরা' বা তনু-ত্রাণ।

গ্রানাডার বর্ম্মাস্ত্র।
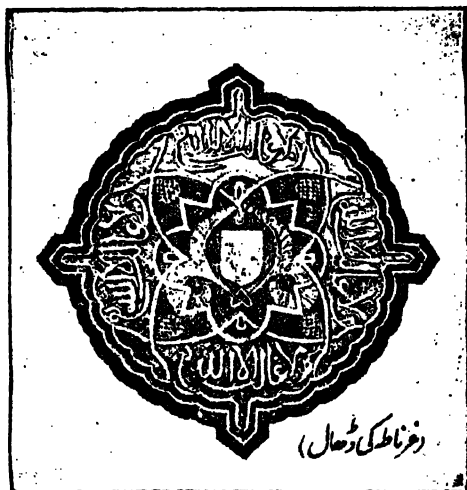
মহাশিক্ষা কাব্য

দ্বিতীয় সর্গ।

সুপবিত্র পুণ্যভূমি মদিনা নগরে
প্রভাতে প্রাসাদকক্ষে বসিয়া অলিদ
কি যেন ভাবিছে মনে—কপোল প্রদেশ
ন্যস্ত করি করতলে, চিন্তার রেখায়
কুঞ্চিত ললাট দেশ। পার্শ্বে মারোয়ান
উপবিষ্ট আসনেতে গম্ভীর বদনে।
ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে নাজেম অলিদ
কহিলেক সহকারী মারোয়ান তরে —
"মারোয়ান! কি বিপদ! কি কঠোরাদেশ!
কি আর কহিব আমি! দামস্ক সম্রাট
লিখেছে কঠোর ভাষে—এমাম হোসেনে
বাঁধিতে দাসত্ব-পাশে বিহিত উপায়ে,
নতুবা মস্তক তার দামস্কে পাঠাতে।
অসাধ্য—অঘট্য কার্য্য ঘোর অসম্ভব।
মহাবাহু মহেষ্বাম বীরেন্দ্র হর্য্যক্ষ
জোল ফোক্কার সম্প্রহারী আলীর নন্দন
দীপ্তপ্রাণ ক্ষুব্ধ করী এমাম হোসেন—
মহানবী মোস্তফার নয়নের জ্যোতি
এস্লামের যশশ্চন্দ্র শূরেন্দ্র প্রধান
সে হইবে বশীভূত দামেস্ক রাজের?
ঘোর অসম্ভব ইহা বাতুল কল্পনা।
দূরে থাক শূরসিংহ হোসেনের কথা
একটী দাসেরো নাহি পাইলাম মত!
এজিদে খলিফা বলি স্বীকার করিতে
কদাপি সম্মত নহে মদিনা নিবাসী।
এজিদ প্রতাপে তারা নহে বিন্দু ভীত,
নিতান্ত নিশ্চিত ইহা; মাসাধিক কাল
পুনঃ পুনঃ অবিশ্রান্ত করিয়া যতন
নানাবিধ যুক্তিতর্ক করি প্রদর্শন
অরণ্য রোদনবৎ সকলি নিষ্ফল।
ঘৃণা রোষে যে হৃদয় মরুতুল্য দগ্ধ,
উপদেশ-বারি তাহে সেচনে কি লাভ?
রোষ কষায়িত নেত্রে প্রতি নরনারী
হেরে নিত্য আমাদেরে; আনায় রক্ষিত
কুরঙ্গে, যেমতি হেরে সংক্রুদ্ধ শার্দ্দুল
রোষ দীপ্ত রক্ত নেত্রে। মহাত্মা হোসেন
(মহাপ্রাণ মহাশয় উদার প্রকৃতি)
যদি নাহি আমাদের জীবন রক্ষায়
হইতেন প্রতিশ্রুত; তবে কোন্ দিন
ভূম্যবলুণ্ঠিত হ'ত মস্তক মোদের।
জলবৎ অর্থরাশি করি নিত্য ব্যয়
একটী প্রাণীও নাহি পাইলাম বশে!
পূজ্যপাদ আলীজাদা এমাম হোসেন
এজিদের 'খেলাফৎ' নাহি স্বীকারিলে
অন্য কেহ স্বীকারিতে না হবে প্রস্তুত।
উপায়, সন্ধানি' কিছু নাহি দেখি আমি
বাঁধিতে দাসত্ব পাশে সে ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলে।
অন্যথা রাজ-আদেশ—খণ্ডিত মস্তক
বর্শা-অগ্রে বিদ্ধ করি পাঠাতে দামস্কে।
হায়! কি কঠোর আজ্ঞা! কি পাপ আদেশ!
কেমনে এ পাপ আজ্ঞা—হেন জুগুপ্সিত
হেন নিদারুণ আর, পালিব মন্ত্রিন্!
অনন্ত নরক ভোগ পরিণাম যার।
ধিক্‌রে দামস্কপতি! শতধিক আর
দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ পাপ রাজকার্য্যে
দাসের জীবনে ধিক্! ধিক্‌রে আত্মন!

নীরব অলিদ যদি এতেক আক্ষেপি'
উত্তারিলা ধীরে তবে ধূর্ত্ত চূড়ামণি
কূটবুদ্ধি মন্দমতি মন্ত্রী মারোয়ান
(কূটবুদ্ধি মন্দমতি যেমতি হামান
পাপাত্মা মিশরাধিপ ফেরাউন-মন্ত্রী ।)
"কিবা চিন্তা ! কিবা ভয় ! বলহে অলিদ !
কিসের বা পাপভীতি ? প্রভুর আদেশ
পালন, কর্ত্তব্য সদা ; ন্যায় কি অন্যায়
বিচারের নাহি তাহে কোন প্রয়োজন ।
পাপ হৌক, পুণ্য হৌক হইবে প্রভুর ।
পাঠাও আহ্বানি' এবে বিশেষ সম্ভ্রমে
সহ সহচর বৃন্দে এমাম হোসেনে ।
আসিলে এখানে তারে এজিদের পত্র
দেহ পাঠ করিবারে ; অনুমানি হেন,
পত্র পাঠে, এজিদের মহা ক্রোধানল
স্মরিয়া শরণাগত হবে সম্রাটের ।
এজিদ বাহিনী সনে যুঝিতে সমরে
কিবা সাধ্য এমামের ? প্রাণদণ্ড ভয়ে
ভীত নাহি হয় বল কোন্ নর হিয়া ?
বিপদের কৃষ্ণমেঘ হেরি দূরাকাশে
অনেকেই উপহাসে, কিন্তু ক্রমে যবে
ঘনাইয়া শিরোপরে প্রলয় মূর্ত্তিতে
বিকট ভ্রুকুটী ভঙ্গে গর্জ্জে ঘোর নাদে
তখন গর্ব্বিত বীরো হয় বিত্রাসিত ।
আমরাও যুক্তি তর্কে—সুধীরে সুভাষে
হিতৈষী বন্ধুর ছলে নানা প্রলোভনে
এজিদের খেলাফত স্বীকার করিতে
বুঝাইব প্রাণপণে ; ভরসা বিশেষ
এ যাত্রায় উপদেশ করিবে শ্রবণ
কিন্তু যদি একান্তই বিফল যতন,
বল তাহে কিবা চিন্তা ? লিখহ সম্রাটে
পাঠাইতে লক্ষ সেনা রণ বিশারদ ।
দেখিব বিশেষরূপে বল-বীর্য্য-তেজ
হোসেনের, দেখা যাবে গর্ব্ব অভিমান
মদিনা বাসির যত । সমর তরঙ্গে
ডুবাইব মদিনায় ধ্বংশের সাগরে,
উন্নত প্রাসাদ মালা রেণু পরিণত
করিয়া মিশাব ধ্রুব মৃত্তিকার সনে,
রক্ত স্রোত বহাইব জলস্রোত সম
মদিনার রাজপথে ! উন্নত মস্তক
ছিন্ন করি পাঠাইব এজিদ চরণে !
সাধিতে প্রভুর হিত সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ।"

৩

নীরবিলা মারোয়ান । ভাষিলা আলিদ
পাঠায়েছি ডাকি আমি এমাম হোসেনে ;
আবদুল্লা ; আবদর্রহমান, ওমর আত্মজে ।
বোধ হয় এতক্ষণ অর্দ্ধ পথে দূত
ফিরিয়া আসিছে পুনঃ আদেশ পালিয়া"
বলিতে বলিতে তথা অলিদের দূত
ফিরে আসি নিবেদিলা কৃতাঞ্জলি পুটে,
"হে রাজন ! তব আজ্ঞা এমাম হোসেনে
নিবেদিনু, নিবেদিনু আর যত জনে ।
আবদুল্লা, আবদরহমান, জোবের তনয়
অসম্মত আগমনে,—ঘোর অবজ্ঞায়
কহিলা কর্কশ ভাষে "হে দূত ! যাইয়া
কহ সেই পাপ মতি এজিদের দাসে,
থাকে যদি প্রয়োজন—আপনি সে যেন
করে হেথা আগমন; আমরা কখনো
যাইব না তার পাশে বিনা প্রয়োজনে ।"
কেবল রাজর্ষিবর এমাম হোসেন
কহিলেন, "যাও তুমি, আসিতেছি আমি,
নিবেদ যাইয়া ইহা আপন প্রভুরে ।"
শুনিয়া দূতের বাণী মন্ত্রী মারোয়ান
আক্ষেপিয়া ক্ষণকাল কহিলা অলিদে,
"বুঝিবা আলীর পুত্র ত্রাসগণি মনে

না আসে একাকী হেথা ষড়যন্ত্র ভয়ে।
অকস্মাৎ হেনকালে বীরেন্দ্র কেশরী
তেজপুঞ্জ-দীপ্ত মূর্ত্তি বিভাবসু সম
প্রবেশিলা সভাতলে, বীরপদ ভরে
কাঁপিল প্রাসাদ ঘন, ঝন্ ঝন্ ঝন্,
পিধানে বাজিল অসি, উষ্ণীষ শীর্ষক
দুলিল মস্তকোপরি। ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে
আসন ত্যজিয়া ত্বরা মন্ত্রী ও অলিদ
অভ্যর্থিলা শূরবরে। বিস্ময়ে সন্ত্রাসে
সহসা হইল পূর্ণ মারোয়ান-হৃদি।
আসন গ্রহিয়া বীর, কুশল জিজ্ঞাসি
কহিলা অলিদ তরে মধুর বচনে ;
"অলিদ! কি হেতু বল, আহ্বান আমার?"
বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তবে, বিনীত বচনে
নিবেদিলা ধীরে ধীরে সরল অলিদ—
"হে এমাম! ক্ষমদাসে, অপরাধ কিছু
নহে মম, দাস আমি দামস্ক পতির।
কি আর কহিবে দাস, হে এস্লাম রবি!
সকলি বিদিত নিজে, কি কহিব আর!
মতিচ্ছন্ন দুরাকাঙ্ক্ষ দামস্ক অধীশ,
(চঞ্চল তদীয় ভয়ে) পুনঃ গত কল্য
লিখিয়াছে রোষাবেশে কঠোর আদেশে,
বিহিত উপায়ে তোমা করিতে সম্মত
তার খলিফীয়-পদে স্বীকৃতি জ্ঞাপনে।"
অলিদ এতেক বলি বিকম্পিত করে
এমাম-কর-পঙ্কজে অতীব যতনে
অর্পিলা এজিদ-লিপি। লিপি পাঠে বীর
কহিলা গম্ভীরভাবে—"শুনহে অলিদ!
অসহ্য ঔদ্ধত্য ইহা, বিকৃত মস্তিষ্ক
হয়েছে এজিদ বুঝি, দুর্ম্মতি বর্ব্বর
তাই লিখিয়াছে হেন—নাহি কি তথায়
সভাসদ জ্ঞানী কেহ? দামস্ক দরবারে
সবাই কি নরপশু? হায়! কি দুরাশা!
কি ঘোর আস্পর্দ্ধা হায়! ফাটে এ হৃদয়
শতখণ্ডে! পাপমতি মদ্যপ কামুক
সে হইবে এ পবিত্র মণ্ডলীর নেতা,
ধর্ম্মাচার্য্য ; হায়! ধর্ম্ম এতদিন পরে
লুপ্ত কি হে বিশ্ব হ'তে? হায়রে ইস্লাম!
কি ঘোর লাঞ্ছনা তব! নবকুল-রবি
কোথা আর্য্য মোহাম্মদ। তোমারি বিধান
প্রজাতন্ত্র প্রথা হায়! মাবিয়া হইতে
হইল বিলুপ্ত কিহে? চরিত্র ও ধর্ম্ম
রসাতল গত কিরে ঐশ্বর্য্যের দম্ভে?
হায়রে! অদূরদর্শী স্বার্থান্ধ মাবিয়া
ঘটাইল কি বিপদ! কোন্ হেতুবলে
কোন্ গুণে ব্যভিচারী মদ্যপ এজিদে
প্রদানিল 'খেলাফৎ'! কোন্ প্রাণে হায়!
অনুসরণিলা তার দামস্ক নিবাসী?
প্রজাতন্ত্র প্রথা হায়! লুপ্ত এতদিনে!
মহাধর্ম্ম পরায়ণ নিঃস্বার্থ উদার
মনীষাসম্পন্ন ধীর গম্ভীরপ্রকৃতি
মণ্ডলীর হিতকামী বিশ্বস্ত সেবক
সমগ্র মোমেন মাঝে যেই মহাজন
খলিফার মহাপদে উপবেশি' সেই
সাধিবে একাগ্র মনে মণ্ডলীর হিত,
ধর্ম্মের বিস্তার আর ধরার কল্যান।
হায়! আজি সে আসনে পাপাত্মা এজিদ
উপবেশি' ঘটাইল ঘোর সর্ব্বনাশ!
সিংহের আসনে আজি বসিল শৃগাল!
গরুড়ের নীড়ে হায়, পশিল বায়স!
উজ্জ্বল ইস্লাম-প্রভা ম্লানীভূত এবে,
বিধান পদ-দলিত, নবী মোস্তফার!
প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্রে হ'ল পরিণত!
ধিক্! এ জীবনে তবে, বল হে অলিদ!

কোন্ প্রাণে কোন্ মুখে হেন পাষণ্ডের
করিব অনুসরণ! বিধান লঙ্ঘিয়া
কেমনে খলিফা বলি করিব স্বীকার ?
কোন্ রসনায় হায়! বল, কোন্ ভাষে
খোত্‌বা পড়িব হেন নারকীর নামে ?
ধিক্, ধিক্‌রে আত্মন্! জলধির জলে
বিসর্জ্জিব প্রাণ তবে,—কোন সুখে হায়!
প্রেরিত-কুল-ভাস্কর-দৌহিত্র বলিয়া
দিব বিশ্বে পরিচয়! কোন্ মুখে তবে
শূরেন্দ্রকুল-তপন ঋষি-শিরোমণি—
আলীর তনয় বলি হইব কীর্ত্তিত ?
কি ভাষিবে চরাচর! যুগ যুগ ব্যাপি
এ ঘোর কলঙ্ক মম রটিবে ধরায়!
ধরণীর অলঙ্কার কবীন্দ্র নিচয়
গাইবে মনের দুঃখে গ্লানির ভাষায়
হেন কাপোরুষ্য মম—ঘোর ঘৃণাভরে!
শুভ্র-কর্ম্মা ধর্ম্মপ্রাণ মদিনা নিবাসী
কি ভাবিবে মনে হায়! পবিত্র ইস্‌লাম
ডুবাব কি হায়! আমি পঙ্কিল সলিলে!
ধিক্! এ জীবনে তরে—যায় যদি প্রাণ,
তবু পণ—কিছুতেই ধর্ম্মের সম্মান
আর প্রজাতন্ত্র-প্রথা নাহি বিসর্জ্জিব,
সুরা-সেবী ব্যভিচারী স্বয়ং নির্ব্বাচিত
নীচমতি এজিদের বশ্যতা স্বীকারি।”

৪

এতেক কহিতে বীর, ক্রোধে মারোয়ান
কহিলেক “হে হোসেন! হও সাবধান!
ভেবে দেখ কোথা তুমি উপনীত এবে!
রসনা চালনা কর আদব রাখিয়া।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজেন্দ্র এজিদ
আমরা থাকিতে হেথা প্রতিনিধি তার,
করিতেছ যাহা ইচ্ছা কটূক্তি বর্ষণ!!
কোন্ প্রাণে? কোন্ বলে? কিসের গরবে?
সাবধান! ক্ষান্ত হও, আনুগত্য তার
লওহে শরণ এবে, নতুবা নিশ্চয়
রোষানলে একেবারে হবে ভস্মসাৎ।”
প্রসুপ্ত মৃগেন্দ্র যথা লোষ্ট্র নিক্ষেপনে
সংক্রুদ্ধ, আরক্ত চক্ষু, সহসা তেমনি
হায়রে! রাজর্ষিবর বীরেন্দ্র হোসেন
শ্রবণি মন্ত্রীর উক্তি ক্রোধের সংক্ষোভে
ধরিলা অনল মূর্ত্তি। পিধান হইতে
নিষ্কোশিয়া দন্তে অসি আঁখির পলকে
আস্ফালিলা (বিনা মেঘে যেন রে সহসা
দ্যুতিল দামিনী-প্রভা হর্ম্ম্যের আকাশে)
উজলিল সভাতল! গরজিলা বীর
“রে দুর্ম্মতি মারোয়ান! হরে সাবধান,
স্বার্থপর নীচজীবী এজিদের দাস
নরকের কৃমিকীট! কি দেখাস্ ভয় ?
পামর! ডরে কি কভু আলীর তনয়
পাপ মতি এজিদেরে? সমগ্র পৃথিবী
হয়রে বিপক্ষ যদি, জানিস্ নিশ্চয়
এ শির হবে না নত এজিদের কাছে।
দুরাত্মণ! ধিক্ তোরে, ডাক সৈন্যদলে,
একা আমি—এই দেখ্, কর্ মোরে বন্দী!
মৃগেন্দ্র কি ভীত কভু হেরি মৃগ দলে ?
রে পাষণ্ড! কি কহিব—ও পাপ রসনা
খণ্ডিতে উচিত বটে তীক্ষ্ম ছুরিকায় ;
কিন্তু তোরে দিনু ছাড়ি, দাস্যজীবি তুই
কি ফল বাঁধিলে তোরে? জানারে এজিদে,
প্রলয়-পয়োধি-নীরে মগ্ন যদি বিশ্ব,
কক্ষ চ্যুত হয় যদি রবি-শশী-তারা,
কালানল তুল্য যদি এজিদ প্রতাপ ;
তথাপি, তথাপি—মূঢ়! আলীর নন্দন
এজিদের অনুগত হবে না কখনো।

যতক্ষণ দেহে প্রাণ, রক্ষিব নিশ্চয়
চিররুচি, পুণ্যপ্রসূ প্রজাতন্ত্র প্রথা,
স্বদেশের সাধীনতা, বীর দম্ভ ভরে।”
বলিতে বলিতে বীর, ক্রোধের আবেশে
ধরিলা প্রচণ্ড মূর্ত্তি, অতি ভয়ঙ্কর!
শোণিত উত্তপ্ত হ’য়ে, উচ্ছ্বাস তরঙ্গে
বহিল ধমনী পথে তর্ তর্ তর্!
হুঙ্কারে কম্পিত হর্ম্ম্য মর্ম্মর নির্ম্মিত!
এমামের দেহ-রক্ষী সৈনিক নিচয়
আকর্ণি সক্রোধ ধ্বনি গুপ্তস্থল হ’তে,
পশিল প্রাসাদ মাঝে ক্ষিপ্ত উল্কা-র’য়ে
উলঙ্গিয়া অসিরাশি বীর-দর্প ভরে!
প্রলয় গণিয়া মনে অলিদ তখন
কর পুটে নিবেদিলা, “হে রথীন্দ্র চূড়!
ক্ষম দাসে, রোষানল করহ শীতল,
মারোয়ান মূঢ় অতি, কাণ্ডজ্ঞান হীন।
আদেশ সৈনিকবৃন্দে অস্ত্র সম্বরণে,
নতুবা পলকে হায়! ঘটাবে প্রলয়!”
নীচমতি মারোয়ান কাঁপিতে কাঁপিতে
(কম্পিত বরষা-স্রোতে বেতশের মত)
এমামের পাদপদ্মে পড়িলেক লুটি।
পরিহরি সভাতল অমনি এমাম
চলি গেলা বাহিরিয়া সঙ্গিগণ সহ।
রহিলেক দাঁড়াইয়া বজ্রাহত যথা—
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ত্রস্ত, নাজেম অলিদ,
চমকিত, বিকম্পিত মন্ত্রী মারোয়ান,
নিশ্চল নিষ্পন্দ যত প্রাসাদ প্রহরী,
মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির মত বাক্‌শূন্য সবে।
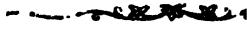
হাদিস ও চিকিৎসা শাস্ত্র।

আরবের মরুভূমি হইতে যে জ্যোতির উৎপত্তি হইয়া সমস্ত জগতকে উৎফুল্ল করিয়াছে, নিবিড় তমসাচ্ছন্ন ‘হেজাজ’ হইতে যে সূর্য্যের উদয় হইয়া সমস্ত জগতকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, নিজে অশিক্ষিত হইলেও যাঁহার বাক্যাবলী আজ বিংশ শতাব্দির তীব্র বিজ্ঞানালোকে মলিনতা প্রাপ্ত না হইয়া আরও উজ্জল দীপ্তি প্রদান করিতেছে, সেই হজরত মোহাম্মদের (দ) পবিত্র বাক্যাবলীকে অনেকেই অসার ও মূল্যহীন বলিয়া বিবেচনা করেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি-দিগের কথা দূরে থাক, অনেক তথা কথিত মুসলমানই যে এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজ অপর জাতি আমাদের গৃহের গুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিয়া ধন্য হইতেছে, পবিত্র হাদিসের (বাক্যের) রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ যশ স্বীয় প্রচার করিতেছে, আর আমরা মূর্খতার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিয়া শর্ষপ-তৈলের মূল্য বৃদ্ধি করিতেছি।

নিম্নের দৃষ্টান্তটী দৃষ্টে অনেকের তন্দ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে আশায় ইহার অবতারণা করা গেল। আমাদের চক্ষে ঘা দিয়া, কিরূপে অপর জাতি হাদিসের সত্যতা দেখাইয়া দিতেছে তাহাই দেখুন।

টিউনিসের النصيحة (আন্নসিহত) নামক সংবাদপত্রের ১৯ সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে;—

জর্ম্মণির বিখ্যাত ডাক্তার "কুক" বলেন "নিসাদল যে 'দা'উলকল্‌ব' (উন্মাদ রোগ বিং) রোগের অমোঘ ঔষধ, যতদিন আমি ইহা বুঝিতে না পারিয়াছিলাম, ততদিন এসলাম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদের (দ) প্রকৃত মহত্ব ও প্রকৃত মূল্য জানিতাম না। হজরত মোহাম্মদ (দ) বলিয়াছেন, যে পাত্র কুকুরে লেহন করে, তাহা সপ্তবার ধৌত কর। 'ছয়, বার শুধু জলের দ্বারা ও একবার মৃত্তিকার দ্বারা।' হজরতের এই হাদিস পাঠ করার পর আমি মনে মনে ভাবিলাম, হজরত মোহাম্মদের (দ) মত মহৎ জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর নিশ্চয়ই কখনও অসার কথা বলিতে পারেন না। অবশ্যই এই আদেশে কোন গুপ্ত রহস্য নিহিত আছে; কেননা কুকুরের লালা—শরীরস্থ হইলে দা'উল্‌কল্‌ব রোগের উৎপত্তি হয়, সেই লালাযুক্ত পাত্রের সংশোধক বস্তুতে নিশ্চয় সেই রোগের প্রতিশেধন-গুণ নিহিত আছে। এই ধারনার উপরে নির্ভর করিয়া আমি মাটির উপাদানগুলির বিশ্লেষণ (Analysis) আরম্ভ করত প্রত্যেক উপাদানকে উক্ত রোগে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু সফলকাম হইতে পারিলাম না। অবশেষে নিসাদল ব্যবহার করিয়া জানিতে পারিলাম যে, দা'উলকল্‌ব রোগের ইহাই প্রকৃত ঔষধ। তখন আমি হাদিসের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও হজরত মোহাম্মদের (দ) মহত্ব বুঝিতে পারিলাম। এবং কেন যে তিনি মাটির দ্বারা পাত্র পরিষ্কার করিবার আদেশ দিয়াছেন, তাহাও আমার অবিদিত রহিল না। যদি তিনি নিসাদল দ্বারা পাত্র সংশোধন করিবার জন্য আদেশ করিতেন, তাহা হইলে উদ্দেশ্যানুযায়ী ফল লাভ হইত না। যেহেতু নিসাদল সকল সময়ে সকল স্থানে প্রাপ্য নহে, কাজেই মাটির দ্বারা পাত্র পরিষ্কারের আদেশই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নিসাদল অপ্রাপ্য হইলেও মাটিতে নিসাদল সকল সময়েই বর্ত্তমান আছে।"

"এতদ্ব্যতীত অনেক চিকিৎসকই, হজরতের এই হাদিস, 'জ্বরকে জল দ্বারা শীতল কর,' দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা তাহাদের পক্ষে অন্যায়, কেননা তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, পৈত্তিক জ্বরের চিকিৎসা জলের দ্বারা করিতে হয়। আজ কাল আমরাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, জ্বরের চিকিৎসা শুধু শীতল জল কেন বরফের দ্বারাও করিতে হয়। এ বিষয়ে সকল চিকিৎসকই একমত। এইরূপভাবে জনাব পয়গাম্বর সাহেবের অন্যান্য হাদিসেও চিকিৎসা শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলির সুন্দর মিমাংসা আছে।"

উপসংহারে ডাক্তার কুক বলেন, "এই সমস্ত কারণে আমি এই মহাতেজা পয়গাম্বরের সম্মান করি। এবং আমার ধারণা এই যে, এ পর্য্যন্ত জগতে যত বিজ্ঞ চিকিৎসক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জনাব পয়গম্বর সাহেব তাহাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

যাহারা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের সাক্ষ্য না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাহাদের পক্ষে বোধ হয় ডাক্তার কুকের উক্তিই যথেষ্ট। ডাক্তার কুক পয়গাম্বর সাহেবকে চিকিৎসকের

আসনে সমাসীন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে তাহার সহিত এক মত নহি। কেননা পয়গাম্বর সাহেব আল্লাহ তালার সংবাদ বাহক। যদিও হজরত মোহাম্মদ (দ) অশিক্ষিত ছিলেন—লেখা পড়া জানিতেন না, তবুও তাঁহার মুখে এইরূপ বৈজ্ঞানিকতত্ত্বপূর্ণ কথা শুনিয়া কে আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবে না! এবং কাহার মনে, 'এসলাম সত্য' বলিয়া প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিবে না!

আবু এহিয়া মোহাম্মাদ আবদুল জব্বার, রোকনী, সিরাজগঞ্জী।

কোরআন ও জ্যোতির্বিদ্যা।

নীতি ও বিজ্ঞানের সার-সংগ্রহ মহাগ্রন্থ কোরআন শরীফে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিস্তৃত আলোচনা না থাকিলেও ইহা হইতে যে উহার আলোচনা একেবারে বাদ পড়িয়াছে, এমত নহে। বরং অতি সংক্ষেপে ঐ সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, আর ঐ সকলের বিস্তৃত আলোচনা করিলে কোরআনের আসল উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম ঘটিত। কতিপয় নীতি ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য মহাগ্রন্থ কোরআন সময়ে সময়ে প্রাকৃতিক জগতের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাহা ছাড়া আল্লার বাণী কোরআনে নৈসর্গিক জগতের অনুমোদিত কোন নিয়ম পদ্ধতির বিরুদ্ধ কথার উল্লেখ নাই। বাইবেল সম্বন্ধে একথা খাটে না, তাই বাইবেলের আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায় পাদ্রী সাহেবগণের নিকট হেঁয়ালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কোরআন আমাদিগকে ঐরূপ হেঁয়ালী হইতে রক্ষা করিয়াছে ও ইহা কতিপয় বিজ্ঞান বিষয়ক জটিল প্রশ্নের উত্তর অতি পরিষ্কারভাবে প্রদান করিয়াছে। এই মিমাংসানুযায়ী কার্য্য করিলে, বিশদরূপে বিজ্ঞালোচনার পথ পূর্ব্বেই উন্মুক্ত হইয়া যাইত। যেমন আল্লাহ বলিতেছেন:—

والشمس تجری لمستقر لها ۞ ذالک تقدیر العزیز العلیم ط والقمر قدرنها منازل حتی
عاد کالعرجون القدیم ۞ لاالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا الیل سابق النهار ط
وکل فی فلک یسبحون ۞

অর্থাৎ "সূর্য্য আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘুরিতেছে।] ইহা মহা ক্ষমতাশালী ও মহা জ্ঞানী আল্লার নির্দ্দেশ। এবং চন্দ্র তালবৃক্ষের পুরাতন শাখার মত না হওয়া পর্য্যন্ত, উহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষ দেওয়া হইল। চন্দ্রকে ধরিয়া ফেলা সূর্য্যের ক্ষমতার বহির্ভূত—রাত্রিও দিনের অগ্রে যায় না, সকলে শূন্যদেশে আপন আপন কক্ষে ঘুরিতেছে।"

শূন্যে যে সূর্য্যের গতি আছে, তাহা অপ্রামাণ্য অনুমান। বর্ত্তমান জ্যোতিষ-শাস্ত্র দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট গ্রহের ন্যায় সূর্য্যেরও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। সূর্য্যের কাক্ষিক

গতি নাই, কিন্তু ইহা আপন অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। ইহা বর্ত্তমান গবেষণার ফল। কিন্তু কোরআনের প্রাগুক্ত আয়েত এই সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। * সূর্য্য সম্বন্ধে যে تجری ও مستقر শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ যথাক্রমে গতি ও কক্ষ। যে সময়ে কোরআন অবতীর্ণ হয়, সে সময়ে লোকের ইহা ধারণা ছিলনা যে, সূর্য্য আপন কক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরে। প্রাগুক্ত আয়েত যে জ্যোতির্বিদ্যার সার একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

মইনুদ্দীন হোসেন।

আকবর শাহের ধর্ম্মমত।

সম্রাট জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ আকবর শাহ দিল্লীর মোগল নৃপতিবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বলিয়া সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত। তাঁহার বলবীর্য্য, তাঁহার রাজ্য পরিচালন-শক্তি, তাঁহার সাহস, সৌজন্য, সরলতা প্রভৃতি গুণাবলী প্রকৃতই যে প্রশংসার্হ তদ্বিষয় সংশয় নাই। তাঁহার প্রখর প্রতিভার নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারেন, এরূপ প্রতিভাবান পুরুষ এ জগতে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি যে সম্প্রদায়ে বা যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার গৌরব ও সম্মান তৎকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হয় নাই। এবং তাহা রক্ষা করা যে তাঁহার স্বকীয় জাতিগত ও বিধিসম্মত অবশ্য পালনীয় কার্য্য, তাহা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করেন নাই। তিনি মুসলমানের সন্তান এবং মুসলমান, কিন্তু তাঁহার আচারব্যবহারের কথা শুনিলে কে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে? তাঁহার ধর্ম্মমত পবিত্র ইস্লাম-সম্মত ছিল না। তাঁহার মহান্ পিতা সম্রাট হুমায়ূন শাহ স্বধর্ম্মে আস্থাবান, সুধী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু সম্রাট আকবর, সেই নিষ্ঠাবান কৃতী পুরুষের ধর্ম্মের—সেই পিতা পিতামহাদির চিরাগত পবিত্র ধর্ম্মের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্ব সমাজে নিন্দিত ও কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন। দুইটী হিন্দু মহিষী ও তাঁহার প্রিয় পারিষদ রাজা বীরবরই যে তাঁহার এই নিন্দার মূলীভূত কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। †

---

* কোরআন সূর্য্যের গতি অস্বীকার করে না و کل فی فلک یسبحون উক্তি দ্বারা বরং বিশেষ ভাবে ইহাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক পদার্থ ই অনন্ত শূন্যে পয়োধি বক্ষস্থিত তরীমালার ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মানববুদ্ধি ইহার বিপরীত কিছু বলিলেই হইল না—প্রমাণাভাবে কোন সিদ্ধান্তই মান্য হইতে পারে না। এমতাবস্থায় খোদার কালাম কোরআন যাহা বলে তাহাই সর্ব্বমান্য হইবে। —সম্পাদক।

† "It was his hindoo wife, who upset his religious faith. "It was principally due to Bir-bar's influence over Akbar that the latter became so much attached to Hinduism and whatever so far as to adapt the Hindu form of worship and perform Hindu religious ceremonies."

আল্-এস্লাম।

প্রাচীন-মুসলমান-শিল্পের বিবিধ নিদর্শন।

তীর নিক্ষেপণের যন্ত্র বিশেষ

মিসরের জনৈক মুসলমান বাদশাহের শিরস্ত্রাণ

দুর্গ ধ্বংসের যন্ত্র বিশেষ।
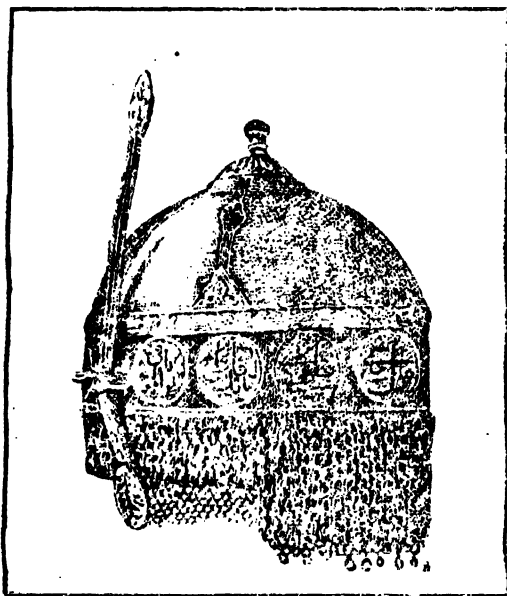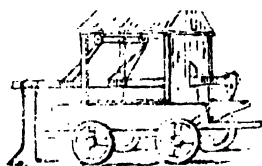
আকবর দুইটী রূপলাবণ্যবতী হিন্দু রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সেই প্রিয়তমা হিন্দু মহিষীদ্বয়ের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ আকবরের যত্নের অবধি ছিল না। সেই মহিষীদ্বয়ের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই আকবর স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারাই তাঁহাকে গো-মাংস, ও পেঁয়াজ রসুন অখাদ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে ও দাড়ি মুণ্ডন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। * এই মহিষীদ্বয় সূর্য্যোপাসিকা ছিলেন; আকবরও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি প্রীতি ও আসক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। ফলতঃ অন্তঃপুরে হিন্দু মহিলাকুলের আবদার এবং বাহিরে বীরবর প্রমুখ হিন্দু পারিষদবর্গের অনুরোধ উপরোধ, তদুপরি তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-সাধন-চিন্তা; এই ত্রিশক্তির একটানা স্রোতে পড়িয়া তিনি হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু আচারব্যবহার প্রকাশ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজকার্য্য সমাপনান্তে যখন তিনি স্থিরচিত্তে শয়নাগারে বিশ্রাম-লাভ করিতেন, তখন জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে হিন্দু ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব শিক্ষাদানের সহিত সূর্য্য, অগ্নি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনা-পদ্ধতির বিষয় উপদেশ প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত আকবর শাহ যোগীপুর বা এবাদৎখানা নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন; সেই সভায় তিনি হিন্দু সুধী পুরুষদের প্রমুখাৎ হিন্দু-সমাজ ও হিন্দু-ধর্ম্ম বিষয়িণী বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। অন্য ধর্ম্মের কথা বলিতে চাহি না, মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম বলে, "মৃত্যুর পর একদিন সমস্ত মানব পুনরুত্থান করিবে এবং তাহাদের পাপপুণ্যের বিচার হইবে।" মুসলমানেরা সেই মহাবিচারের দিনকে রোজ কেয়ামত নামে অভিহিত করেন। কিন্তু সম্রাট আকবর এই শাস্ত্রীয় কথা আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। পক্ষান্তরে তিনি পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করিতেন। গো-মাংস ভক্ষণ বিষয়ে তিনি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। মাংস ভক্ষণের জন্য গো-হত্যা করা অতীব দূষনীয়, ইহা তাঁহার অভিমত ছিল। আবার গো-বিষ্ঠা, যাহা মুসলমানগণ অপবিত্র বলিয়া জানে, তিনি তাহা অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আকবর অগ্নিরও উপাসক ছিলেন। তিনি অগ্নিকে ঈশ্বরের জ্যোতির জ্যোতি জ্ঞান করিয়া যৌবনকাল হইতে যথাবিধি হোম-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। এই দেবতাকে নিত্য জাগ্রত রাখিবার জন্য শাহানশাহ প্রাসাদ-মধ্যে দিবারজনী অগ্নি প্রজ্বালিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় পারিষদ শেখ আবুল ফজল আল্লামী সেই অগ্নিদেবের মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ অগ্নি পূজিয়া তাঁহার এরূপ অনুরাগ ও অচলা ভক্তি জন্মিয়াছিল যে, যখন প্রাসাদে আলোক প্রজ্বালিত করা হইত, তখন তিনি স্বয়ং অগ্নিদেবের সম্মানার্থে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইতেন এবং সভাসদবর্গকেও দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

---

* "Influenced by the numerous Hindu Princesses of the Harem his majesty foreswore not only beef, but also garlic, onions, and the wearing of beard."

হিন্দুগণ পিতৃমাতৃবিয়োগে মস্তক, দাড়ী, ও গোঁপ মুণ্ডন করিয়া থাকেন। আকবর এই প্রথাও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ১৬০৪ খৃঃ সম্রাট-জননী হামিদাবানু বেগম পরলোক গমন করিলে, সম্রাট আকবর হিন্দু ব্যবস্থানুসারে মস্তক, দাড়ী ও গোঁপ মুণ্ডন করিয়া স্বকীয় ধর্ম্ম ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অনুগ্রহ প্রয়াসী চাটুকার সভাসদগণও মস্তক গুম্ফাদি মুণ্ডন করিয়া সম্রাট-প্রীতির চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন।

এস্লামধর্ম্ম-গুরু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আদেশ বাক্য বা তাঁহার অনুমোদিত বাক্যের নাম হাদিস। এই হাদিসানুসারে যে সকল ধর্ম্ম-ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আকবর তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। মৃত্যুর পর পুণ্যবাণের পুরস্কার ও পাপীর দণ্ড হইবে, ইহা তাঁহার বিচারে অমূলক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। শরীর-ধ্বংসের সহিত আত্মারও ধ্বংস হইয়া থাকে, তত্ত্ববাহকদিগের অলৌকিক কার্য্য (মোজেজা) অসার কাল্পনিক কথা মাত্র, স্বর্গীয় দূত বা জেন (Genii) জাতির অস্তিত্ব নাই, ইত্যাকার সিদ্ধান্তে, তিনি সর্ব্ব জাতীয় বহু তার্কিক পণ্ডিতের সংসর্গে থাকিয়া এবং নানা ধর্ম্মের নানা গ্রন্থ ও বিজ্ঞানালোচনা করিয়া, যুক্তিবলে উপনীত হইয়াছিলেন।

আকবর কোনও ধর্ম্ম-মতকে অবজ্ঞা করিতেন না। সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা মহাপুরুষগণই সমপরিমাণে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ভারতের বিভিন্ন জাতিকে এক রাজনৈতিক সূত্রে—ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার প্রবল বাসনাও তাঁহার জন্মিয়াছিল। কিন্তু সেই দুরূহ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্ব জাতিকে এক ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে না পারিলে কিছুতেই তাহা সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে; পরন্তু এ ব্যাপারও অধিকতর দুরূহ ও অসম্ভব; বিশাল হিন্দুজাতি বা এস্লাম-ভক্তগণ কেহই অপরের ধর্ম্মমত প্রাণান্তেও গ্রহণ করিবেন না; ইহা অনুভব করিয়া সম্রাট আকবর সকল ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া চূরিয়া এক নূতন ধর্ম্ম গঠন করিতে ও তৎসহ স্বয়ং ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের পদ ও অমর সম্মান লাভ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এই উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সর্ব্বধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়গত বিশ্বাস সমূহ সংগ্রহ ও আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অনন্তর বহু চিন্তা ও গবেষণার পর তিনি এক নব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং নিজেই তাহার সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের নিয়ন্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম "দিনে-এলাহি"। ইহার মতে খোদা এক ও অদ্বিতীয়। ইস্লামের ধর্ম্মবিশ্বাসের আদি সূত্র "লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদোর রসুলুল্লাহ।" আকবর এই মূল সূত্রের প্রথমাংশ বজায় রাখিয়া শেষাংশে আপনার নাম সংযোগ করত বাক্যটী এইরূপে খাড়া করিয়াছিলেন—"লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ আকবর খলিফাতুল্লাহ।" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই এবং আকবর পৃথিবীতে তাঁহার একমাত্র প্রতিনিধি। যদিও আকবরের এই ধর্ম্ম-মত তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি ইহা অবলীলাক্রমে বলা যাইতে পারে যে, মোহান্ধ আকবর সেই অভিনব মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া খোদাতালার প্রিয় ও পবিত্র এস্লাম ধর্ম্ম ও এস্লাম-ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ও

তাঁহার অবমাননা করিয়া লিখিয়াছেন—তৎসহ সমস্ত মোসলমান সমাজের মস্তকে পদাঘাতও করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ফলতঃ ইহা তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপের পরিচয় ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু পাছে মুসলমান সমাজ,—গোঁড়া এস্লাম-ভক্তগণ অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, পাছে কেহ তাঁহার মত গ্রহণ না করে, এই ভয়ে ভ্রান্তমতি আকবর তাঁহার "দিনে-এলাহি" সাধারণ্যে প্রচার করিতে সাহসী হন নাই,—তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্র তাঁহার প্রাসাদ মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাঁহার অনুগত ভীরু সভাসদবর্গ তদীয় ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মজগতের সার্ব্বভৌমিক প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। বীর, ধীর আকবরের—সাম্যবাদী সুধী আকবরের এই ভীরুতা ও দুর্ব্বলচিত্ততার কথা শ্রবণে কোন ব্যক্তি হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন কিনা জানিনা।

মোল্লা শেরী নামক জনৈক পারসীয়ান কবি এই সময়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী, ধর্ম্মভীরু ও গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। ইস্লাম-বর্হিভূত কোন কার্য্য তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি সম্রাট আকবরের ধর্ম্ম-রাজ্যে পয়গম্বরী লাভের প্রয়াস দেখিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে একটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, আমরা পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থ সেই মূল পারসী কবিতার কয়েকটী চরণের ইংরাজী অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

It is rather confusion of the brain
If a fool should think in his mind,
That love of the Prophet can ever be
Banished from mankind.

The king has laid claim
To be a prophet this year,
After the lapse of a year
Please God, his divivity he will declare" *

কবি শেরী যথার্থই বলিয়াছেন। যদি কেহ জোর করিয়া প্রকৃত তত্ত্ববাহকের প্রতি জগতের প্রীতি-ভক্তি-সম্মান লোপ করত স্বয়ং সেই মহান্ পদে অভিষিক্ত হইতে চায়, তবে, তাহার চিত্ত বৈকল্য জন্মিয়াছে ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? আকবর ভাবিয়াছিলেন, তিনি বিশাল ভারতে সার্ব্বভৌম নরপতি, তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কোটি কোটি নরের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সুতরাং প্রবল রাজশক্তির দ্বারা তিনি যাহা খুসী, তাহাই করিলে শোভা পাইবে। কিন্তু ইহা একবার তাঁহার ভাবা উচিত ছিল যে, "মেজে ঘষে রূপ ও ধ'রে বেঁধে প্রেম হয় না।" এ প্রেম মনের মত করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া খাড়া করিবার সামগ্রী নহে। ইহা অপার্থিব পদার্থ—যে কোন সময়ে যাহার তাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে, বিশেষতঃ

* কবি শেরীর বাক্য নিষ্ফল হয় নাই; আকবর স্বয়ং না বলেন, কিন্তু বহু অনুগ্রহপ্রাপ্ত হিন্দুসমাজ তাঁহাকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

রাজ-প্রাসাদের ভোগবিলাসের মধ্যে ইহার বিকাশ হইতেই পারে না। (জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-দিগের চরিত-কথা পাঠ করিলে ইহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে।)

অদূরদর্শী আকবর এইরূপে ধর্ম্মাধিপতি হইয়া পবিত্র ঐস্লামের পবিত্র অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে কিছু মাত্র কণ্ঠা বোধ করেন নাই। নামাজ অনাবশ্যক, হজ ও রোজা ধর্ম্মগত অন্ধবিশ্বাসের কার্য্য বিবেচনায় তাঁহার দরবার হইতে এই সমস্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মুসলমানগণ যে কোন কার্য্যের প্রারম্ভে বা পত্র দলিলাদি লিখনকালে "বিস্মিল্লাহের রহমানেররহিম" † এই পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করেন বা লিখিয়া থাকেন। কিন্তু যশোলোলুপ আকবর সেই এস্লামানু-মোদিত পবিত্র প্রথা রহিত করিয়া আপনার নাম জাগ্রত ও তৎসহ ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তিত হয়, এবম্বিধ কৌশলে "আল্লাহু আকবর" (১) বলার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন এস্লামের অভিবাদন প্রত্যভিবাদন-পদ্ধতি ও অপর অনুষ্ঠান সমূহ ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইয়াছিল। মদ্য ও বণ্যবরাহ-মাংস, অভক্ষণীয় নহে, কুকুর পবিত্র, দাড়ী মুণ্ডন প্রীতিকর কার্য্য, দিবসে চারিবার সূর্য্যোপাসনা করা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, ইত্যাদি যাহা কিছু এস্লাম-বিরুদ্ধ, যাহা কিছু দূষনীয়, নরপাল আকবর খামখেয়ালের বশে তাহাই প্রচার করিয়া, তাহারই উৎসাহ দিয়া এস্লামের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ফলতঃ ইহা যে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বা সংসর্গ সম্ভূত ফল, তাহা ইতিহাসিজ্ঞ পাঠককে আর বলিয়া দিতে হইবে না। তিনি জন্মিয়া-ছিলেন হিন্দুর আশ্রয়ে, বিবাহ করিয়াছিলেন দুইটী হৃদয়-মনো-মোহিনী হিন্দু নারীকে এবং নিয়ত পরিবৃত থাকিতেন অধিকাংশ হিন্দু সহচর, হিন্দু সুধী ও হিন্দু সাধুবৃন্দে। সুতরাং তাঁহার মতিগতি হিন্দুর দিকে অবনমিত না হইবে তো কোন্ দিকে হইবে? তাই তিনি জিজিয়া রহিত করিয়াছিলেন এবং মুসলমানের ন্যায্য দাবি দাওয়া অগ্রাহ্য * করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায়, মান, ধন-দৌলত, ভূম্যধিকার প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে হিন্দুর কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল এবং মুসলমানগণ অলক্ষ্যে হীনবল ও অবনত হইবার প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখিতে গেলে, আকবর যে মুসলমানের পতনের মূল, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আক-বরের হিন্দু-প্রীতির খাতিরেই তাৎকালিক হিন্দুসমাজ তাঁহাকে "জগদ্গুরু ও দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন এবং আধুনিক হিন্দুগণও সেই কারণে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়া থাকেন।

মোজাম্মেল হক্
শান্তিপুর।

† بسم الله الرحمن الرحيم—পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি।

(১) আকবর শব্দের অর্থ—মহান্।

* "He (Akber) did not favour the Mohammadans, because they belonged to the ruling race."

দাস-প্রথা। *

দাসত্ব কোন কোন অংশে বহু বিবাহের সহিত উপমিত হইতে পারে। বহুবিবাহের ন্যায় উহা প্রত্যেক জাতিতে বিদ্যমান ছিল; মানব-চিন্তার ক্রমোন্নতি ও মনুষ্য-মধ্যে ন্যায়বিচারের প্রাবল্য হেতু উহা ক্রমশঃ লয় পাইতেছে। বহু বিবাহের ন্যায় উহা ঐন্দ্রিয়িক প্রাবল্য ও গর্ব্বের স্বাভাবিক ফল স্বরূপ। তন্নিমিত্ত উহা সামাজিক ও ব্যক্তি বিশেষের অভ্যুত্থানের চিত্রে কোন কোন অংশে বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিবাহের সঙ্গে ইহার অসাদৃশ্য এই যে, ইহা আবহমান কাল হইতে স্বাভাবিক বিচারজ্ঞানের অভিসম্পাত স্বরূপ।

যখন মানব জাতি পরস্পরের স্বত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই, যখন অধিকাংশের জন্য একের বা ততোধিক লোকের আদেশই আইন বলিয়া পরিগণিত হইত, যখন বলবানের ইচ্ছা, অদৃষ্টনেমির নিয়ামক ও পরিচালক ছিল, তখন মানব জাতির মধ্যে প্রকৃতিজাত সামাজিক, দৈহিক ও মানসিক অসাদৃশ্য অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে দাসত্বের আকার গঠন করে; এবং সমাজে একটী রীতি বদ্ধমূল হয়। উহা প্রধানকে অপ্রধানের উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রদান করে। বলবানের নিকট দুর্ব্বলের এই সম্পূর্ণ অধীনতা, বলবানকে মানবের "মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার পরিশ্রমে জীবিকা উপার্জ্জন কর" এই পৌরাণিক অভিশাপ হইতে রক্ষা করে; এবং তাহাকে আপনার অভীপ্সিত কার্য্যে এইপ্রকার সাধন সৌকর্য্য প্রদান করে। "Ancient Law" প্রণেতা বলেন, "একের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনার্থ অন্যের দৈহিক বলের ব্যবহারের ইচ্ছাই দাসত্বের ভিত্তি।"

মানবের সৃষ্টিকাল হইতে দাস-প্রথা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক জাতিতে উহার সম্প্রসার ছিল। সমাজের অসভ্যাবস্থায় উহার বীজ অঙ্কুরিত হয়, এবং যতদিন মানবজাতি অসভ্যতা-গহ্বরে আকৃষ্ট—নিমজ্জিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত সমাজে উহার সমধিক প্রচলন ছিল। পূরাকালে যে সকল জাতির মধ্যে ঘোরতর দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে ইহুদি, গ্রীক ও রোমকগণই প্রধান।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহুদিদিগের মধ্যে দ্বিবিধ দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। পাপ কার্য্যের শাস্তি স্বরূপ অথবা ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত যে সকল ইহুদিকে দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ করা হইত, তাহারা বিদেশজাত দাস অপেক্ষা সমধিক উচ্চস্থান অধিকার করিত। ইহুদি দাসগণ আপনাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিলে ছয় বৎসর দাসত্বের পর মুক্তি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু ইহুদিগণ নির্ম্মম কঠোর যুদ্ধপ্রণালী অথবা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ অতর্কিত আক্রমণ বা অর্থ

* বিশ্ব-বিশ্রুত স্বনামধন্য দি রাইট অনারেবল সৈয়দ আমির আলী এম, এ; সি, আই, ই মহোদয় প্রণীত "Ethics of Islam" অবলম্বনে লিখিত।

দ্বারা যে সকল লোককে দাসশ্রেণীভুক্ত করিত, বিদেশী দাস সেই জাতীয় হউক বা অন্য কোন উপায়ে সংগৃহীত হউক, তাহারা উপরি-উক্ত অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইত। এই অনুগ্রহ জাতীয় পক্ষপাতিত্ব ও সবিশেষ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ প্রদান করা হইত। এই সকল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে অবর্ণনীয় ও অসহ্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। Helots of the soil অথবা পারিবারিক দাসদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করা হইত। তাহারা দয়া মমতাশূন্য প্রভুর অধীনে নীচ কর্ম্ম সম্পাদনে আপনাদের দুর্ব্বহ জীবন অতিবাহিত করিত।

অতি প্রাচীন কালে রোম নগরেও দাস-প্রথা অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ক্রীতদাস দেশীয় হউক বা বিদেশীয় হউক, যুদ্ধলব্ধই হউক বা ক্রয়লব্ধই হউক, তাহারা অস্থাবর সম্পত্তিস্বরূপ পরিগণিত হইত, তাহাদের প্রভু তাহাদের দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা ছিলেন। মানবগণ ও সম্রাটগণের বিজ্ঞতা ও স্বাভাবিক বিবেকজ্ঞান যদিও এই চিরাচরিত রীতির অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল, তথাপি ক্রীতদাসবৃন্দকে তাহাদের ভাগ্য-বিধাতার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইত, সাম্রাজ্যের প্রত্যেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শত সহস্র ক্রীতদাস থাকিত। সামান্য অপরাধে তাহাদিগকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হইত ও অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইত। রোমকগণের মধ্যে—উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর মধ্যে স্বত্বাধিকার লইয়া কত কাল ঘোর বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়াছিল। Patrician গণ কি Plabian গণকে সমান অধিকার প্রদান করিতে সহজে স্বীকৃত হইয়াছিলেন? ইংলণ্ডে নরমান জাতি বিজিত স্যাকশন জাতির উপর কি প্রকার বীভৎস অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রত্যেক ইতিহাসজ্ঞই অবগত আছেন।

খৃষ্ট-ধর্ম্ম দাস-প্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি উত্তোলন করে নাই অথবা এই অন্যায় কর্ম্মের প্রতিরোধার্থ রীতিমত কোন আইন পাশ বা পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।

দাসত্বের অবস্থা।

যতদূর পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, ক্রীতদাসের অবাধ্যতা সম্বন্ধে স্বল্পসংখ্যক মন্তব্য প্রকাশ এবং তাহাদিগের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করণার্থ প্রভুদিগের প্রতি সাধারণ উপদেশ ব্যতীত দাসত্বের অননুমোদন সম্বন্ধে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে—কোন বিশিষ্ট বিধান নাই। পক্ষান্তরে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে তাহাদিগের প্রভুর সম্পূর্ণ বাধ্য থাকিতে কঠোর আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এককালে দাস-প্রথা ইউরোপে একটী সর্ব্বানুমোদিত রীতি স্বরূপ প্রচলিত ছিল। দাস ক্রয়বিক্রয় একটী লাভজনক ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। বাইবেলে সাম্যবাদের যে মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, খৃষ্টান জগতে তাহার অনুশীলন ও দৃষ্টান্ত দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সাম্যবাদী খৃষ্টানজাতি জগতে অসাম্য-বিষ-বৃক্ষের যে চাষ করিতেছেন তাহার ভাবীফল কিরূপ ভয়ঙ্কর হইবে, তাহা তাঁহারা আফ্রিকায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া এখনই কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। শ্বেত কৃষ্ণ ভেদাভেদ তাঁহাদের চরিত্রে এত বিশিষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে যে, স্বয়ং যীশু খৃষ্টকেও তদ্দর্শনে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইত। কৃষ্ণ খৃষ্টান শ্বেত খৃষ্টানের গির্জ্জায় প্রবেশাধিকার পাইবে না—মৃত্যুর পরেও তাহাদের এ ভেদাভেদ দূর হয় না! দেশীয় খৃষ্টানের অযত্ন স্থাপিত আলাহিদা ও পৃথক গোরস্থানই আমার এ বাক্যের

সাক্ষ্য প্রদান করিবে। "রামধনের প্রত্যাবর্ত্তন" বা "ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর" গল্পে শ্রদ্ধেয় প্রভাত বাবু খৃষ্টীয় সাম্যবাদ (?) ও হিন্দুর উদারতার (?) যে সুন্দর নিখুঁত ও সঠিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সম্বন্ধ খৃষ্টানদিগের শ্বেত কৃষ্ণ ভেদ অপেক্ষা আরও কঠোর, নির্ম্মম ও স্বার্থপরতার পূতিগন্ধে পূর্ণ—'অস্পৃশ্যতার' প্রকোপ এত বেশী যে শূদ্রের ছায়া মাড়াইলে ব্রাহ্মণকে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া (গোবর জলে নহে ত ?) শুদ্ধ হইতে হয়। ধর্ম্মগ্রন্থালোচনায় শূদ্রের কোনই অধিকার নাই। ব্রাহ্মণের জন্য এক বিধি আর ব্রাহ্মণেতর অন্য জাতির জন্য অন্য বিধি।* সম্প্রতি হিন্দু নব্যতন্ত্রীরা বা পাশ্চত্য শিক্ষা প্রাপ্ত Reformed হিন্দু বাবুরা 'পতিতোদ্ধার' সাধনে ও 'নমশূদ্রের সমাজে প্রবেশাধিকার' প্রদানে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছেন। তাহাদের এ উৎসাহ উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

এসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, খৃষ্টের মৃত্যুর পর সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া ইহারা ঘোর অন্ধকার কূপে নিমজ্জিত ছিল। তৎকাল-পরিজ্ঞাত কি ইউরোপ কি এশিয়া সর্ব্বত্রই সাধারণ লোকের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। কোন প্রকার সামাজিক অধিকার বা স্বত্বস্বামিত্ব তাহাদের কোন কালেই ছিল না। স্বেচ্ছাচারী ধনী ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের অত্যাচার উৎপীড়ন সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল।† সাসানীয় রাজত্বকালে পারস্য প্রদেশে ভূম্যাধিকার শুধু পুরোহিত শ্রেণীরই এক চেটিয়া ছিল। কৃষক ও সাধারণ দরিদ্র শ্রেণী বিধি বিধান শূন্য বিকৃত অত্যাচারের কঠোর চক্রতলে নিষ্পেষিত হইতেছিল। তদানীন্তন গ্রীস এবং ভারতবর্ষেও ঐশ্বর্য্যসম্পদ, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সমস্তই ঐ এক শ্রেণীর ভাগ্যবানদিগের করতলগত ছিল, আর অবশিষ্টের ভাগ্যে ছিল শুধু দাসত্ব—অত্যাচার ও মৃত্যু।

এই দাসত্বজীবী নিম্নশ্রেণীর হতভাগ্যেরা তাহাদের প্রভুর গৃহে পালিত পশু অপেক্ষাও হীনতর অবস্থায় জীবনযাপন করিত। পৌত্তলিক-প্রভুত্বের সময় দাস-প্রথা বিভিন্ন আকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। দাসদিগের কার্য্য ক্ষমতার তারতম্যানুসারে তাহাদের মূল্য নিরূপিত হইত। তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ আইনবিরুদ্ধ ছিল। স্বাধীন স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীতদাসের বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল। এই আদেশের ব্যতিক্রম ঘটিলে

* খৃষ্টীয় জগতে এককালে এমন অবস্থা ছিল যে, শুধু পুরোহিত সম্প্রদায় ব্যতীত জনসাধারণের পক্ষে বর্ণজ্ঞান লাভ করাও অসাধ্য ছিল। রাজা রাজড়াদের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য পুরোহিতের পদসেবা করিতে হইত। সম্পাদক।

† আদি যুগে হিন্দু জাতির মধ্যে কোন প্রকার ভেদজ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রামায়নের জনক রাজা রাজর্ষি নামে খ্যাত। ক্ষত্রিয় হইয়াও তিনি একাধারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কার্য্য করিতেন,—ইহাতে তাঁহার সম্মানের লাঘব না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়াছিল। কুক্ষণে মহাভারতের যুগ হইতে ভেদ নীতির প্রচলন বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইতে আরম্ভ হয়। একলব্যের কাহিনী পাঠ করিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে। সম্পাদক।

তাহাদিগকে কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইত। স্ত্রীলোকদিগকে শূলে প্রদান করা হইত এবং ক্রীতদাসবৃন্দকে জীবন্তদাহ করা হইত। আমেরিকার নিগ্রো ও আফ্রিকার হাবশী ক্রীতদাসদিগের প্রতি খৃষ্টান জাতি সভ্যতালোক প্রাপ্তির পরেও যেরূপ পশুচিত নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছে তাহা 'Uncal Tom's Cabin' পাঠক মাত্রই সবিশেষ অবগত আছেন। ক্রীতদাসদিগের হস্তপদ লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া প্রভুরা বিক্রায়ার্থ তাহাদিগকে দেশ বিদেশে তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইত।

এমনই পরিত্রাণ হীন নিদারুণ কঠোর অত্যাচার সাধারণ লোকের দগ্ধভাগ্যে-বিধিবদ্ধ ছিল। ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-স্ত্রী-সেবিত পদস্থ ভূম্যাধিকারী ও কপট পুরোহিত সম্প্রদায় ভ্রমেও কখন একবার এই হতভাগ্যদের অন্তহীন ক্লেশের কথা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক মনে করিতেন না। হতভাগা নিম্নশ্রেণীর দুঃখ ও ক্লেশ বিদূরিত করিবার চেষ্টা কাহারও করিবার উপায় ছিল না। সে কঠোর সামাজিক বিধি বিধানের বিরুদ্ধে হস্তত্তোলন করা মহাপাপ বলিয়া খৃষ্টান চার্চ্চের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তৃগণ কঠোর অনুশাসন প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন।

খৃষ্টান জগতের এই নিদারুণ অমানুষিকতার অবসান ঘটিয়াছে শুধু এসলামেরই প্রভাবে সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে জাতি ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছিল,

এস্‌লামে সাম্যবাদ ও দাসত্বের অবস্থা।

এসলামই সেই অধঃপতিত খৃষ্টান জাতিকে সভ্যতা ও উন্নতির সরল পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে। যদি খৃষ্টান সমাজে দাস-প্রথা আমূল প্রবিষ্ট না হইত, তবে এসলামিক শিক্ষা কোন কালে তাহা সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হইত। মাত্র খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজগণ দাস-প্রথা উঠাইয়া দিতে যত্নপরায়ণ হন, এবং আঠার শত পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপ ও আফ্রিকার অধিকাংশ রাজ্য হইতে দাস ব্যবসায় তিরোহিত হয়। তৎকালীন মুসলমান সম্রাটগণের সময়োচিত সাহায্যে ও এসলামিক শিক্ষা প্রচারের গুণেই ইংরেজগণ এত সহজে বহু বিস্তৃত দাস ব্যবসায়ের মূলোৎপাটন করিতে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন। এস্‌লাম ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথমে দাসদিগকে তাহাদিগের স্বত্ব বুঝাইয়া দিতে যত্নবান হইয়াছিল। যখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ক্রীতদাসদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার হইতেছিল, তখন তাহাদিগের উপর এসলামেরই অনুগ্রহ দৃষ্টি পতিত হয়।

এসলাম দাস-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। প্রেরিত পুরুষ বিধি দিলেন,—"দাসমুক্ত করা অপেক্ষা আল্লাহতালার নিকট প্রিয়তর কার্য্য কিছুই নাই। যে দাসগণ আপনাদিগের স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা আপনাদের স্বাধীনতা ক্রয় করিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থদানে মুক্ত করিবে।" এসলাম-ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক আদেশ দিলেন,—"যে কোন পলাতক এসলাম-রাজ্যে পদার্পণ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে।" তিনি ইহাও আদেশ করেন যে, "প্রভু যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিবে, যেরূপ অন্ন ভোজন করিবে, দাসদিগকেও সেইরূপ বস্ত্র পরিধান করাইবে, সেইরূপ অন্ন ভোজন করাইবে। যদি তাহারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করে, তবে তাহাদিগকে বিদায় দান করিবে—তাহাদিগকে কোন কটু কথা বলিতে

পারিবে না।” এসলামরাজ্যের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) এরূপ দৃঢ়তার সহিত এই উপদেশটী পালন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময়ে লোকে মুসলমানদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি হিংসা প্রকাশ করিত। জেরুজালেম অবরোধ কালে যখন হজরত ওমর (রাঃ) তদ-অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি নিজের ও স্বীয় দাসের নিমিত্ত একটী মাত্র উষ্ট্র লইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে আরোহণ ও অবতরণপূর্ব্বক গমন করিতেছিলেন। তিনি আরোহণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেন, তাঁহার দাস উষ্ট্রের নাসারজ্জু ধারণ করিয়া চলিল; আবার তিনি অবতরণ করিয়া দাসকে আরোহণ করাইলেন; স্বয়ং উষ্ট্রের নাসারজ্জু ধরিয়া চলিলেন। এরূপ কয়েকদিন গমনের পর, যে সময় তিনি বয়তুল মোকদ্দসের নিকবর্ত্তী হইলেন, তখন দাসের আরোহণ করিবার পালা। দাস উষ্ট্রোপরি বসিয়া রহিল, এসলামসাম্রাজ্যের গৌরবান্বিত সম্রাট হজরত ওমর (রাঃ) উষ্ট্রের নাসারজ্জু ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে সত্য ঘোষণা করিয়া গেল, বিজয়ী মুসলমানদের ইহাই সুবিচার ও সাম্যবাদ।

এসলাম রাজ্যে কোনপ্রকার শ্রেণী ভেদ বা বর্ণভেদ নাই। নীচ জাতীয় হিন্দুও এসলামিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় শিক্ষা, চরিত্র ও সৌজন্য গুণে সকলের বরণ্য ও সমাজে উচ্চপদ গৌরব লাভ করিতে পারে। এমন কি তাহার পশ্চাতে দাড়াইয়া মুসলমান আমীর, নবাব কেহই নমাজ পড়িতে অনুমাত্র দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করেন না। এসলামের এই সার্ব্বজনীন সাম্যবাদই সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ ও ইহুদিদিগকে পবিত্র সনাতন এসলামের দিকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। এসলাম-রাজ্যে অদ্য যে সামান্য ক্রীতদাস, কল্য সে প্রধান অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তদীয় প্রভু তাহার সহিত আপনার আত্মজ দুহিতাকে পরিণীতা করিতে কোনপ্রকার সঙ্কোচ বোধ করেন না। এসলামের সর্ব্বপ্রথম মোয়াজ্জেন হজরত বেলাল একজন সামান্য হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা কুতুব উদ্দিন আয়বক একজন ক্রীতদাস ছিলেন। প্রতিমা বিধ্বংসকারী, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদকামী, ভারত-ত্রাস মাহমুদ গজনবীর পিতা একজন ক্রীতদাস ছিলেন। দিল্লীর পাঠান সম্রাট-প্রধান আলতামাস-নন্দিনী সোলতানা রিজিয়া জনৈক ক্রীতদাসের কার্য্যকুশলতা ও চরিত্রবল সন্দর্শনে তাহাকে সামান্য অশ্ব-রক্ষকের পদ হইতে আমিরুলওমরা পদে উন্নীত করেন। আর কত উদাহরণ দিব? এসলাম দাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধনার্থ যেরূপ বিধি বিধান করিয়াছে—ক্রীতদাসবৃন্দের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছে, খৃষ্টানদিগের বা অন্য কোন জাতির সমস্ত ইতিহাস ও পুরাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলেও তাহার কণামাত্র নিদর্শন পাওয়া যাইবে না।

তবে এখন বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, দাস-প্রথার বিরুদ্ধে এসলাম যখন এরূপ কঠোর অনুশাসন প্রচার করিয়াছিল, তখন পরবর্ত্তীকালে মুসলমান সমাজে উহা এত প্রসার লাভ করিল কিরূপে? ইহার উত্তর কঠিন না হইলেও নিতান্ত অল্প নহে। তাই আমি স্থানাভাবে অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথায় তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

মুসলমান-কুলকলঙ্ক দামাস্কাধিপতি এজিদের বংশ উমাইয়্যা নামে খ্যাত। যখন উমাইয়্যা রাজগণ জলে স্থলে আপনাদের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিল, তখন তাহারা প্রথম দাস-প্রথার প্রতিষ্ঠা করিল। নরপতি 'মুবিজা' সর্ব্বপ্রথম মুসলমানদিগের মধ্যে ক্রীতদাসের সৃষ্টি করেন। হেরেম রক্ষার্থ তিনিই প্রথম খোজা প্রহরীর পত্তন করেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও খোলফায়ে রাশেদিনদের সময় মুসলমানগণ কেবল যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দীকৃত লোককেই দাসে পরিণত করিতেন, কিন্তু উমাইয়্যা রাজগণের সময়ে অর্থ দ্বারা দাস ক্রয়ের প্রথা প্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়।

যখন মুসলমানগণ আপনাদিগের গৌরবময় উচ্চ আদর্শ—কোর্‌আন ও হাদিসের আদেশ পালনে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে লাগিল, সেই দিন হইতেই তাঁহাদিগের প্রকৃত অধঃপতন হইল। এসলামের অভ্যুদয়-কালে যে জাতি ধর্ম্মরসে মত্ত হইয়া স্বীয় গৌরব রক্ষার্থে প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই,—যাহাদিগের তেজস্বিতা, মনস্বিতা ও অতুলনীয় বল বিক্রম প্রভাবে অর্দ্ধচন্দ্র খচিত বিজয়-বৈজয়ন্তি অচিরকাল মধ্যে আল্‌পস পর্ব্বত হইতে সুদূর চীন-প্রাচীরের মূলদেশ পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়াছিল, এখন সে জাতির অবস্থা কি শোচনীয় আকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে! যাঁহারা একদিন সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্প বাণিজ্য ও বিষয়কর্ম্মে চরমোৎকর্ষ লাভ কয়িয়াছিল, আজ সে জাতির গৌরব-ভাস্কর কালের তমোময় গর্ভে চিরতরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে!! হায়, কবে আমাদের উত্থান হইবে? কবে আমরা আমাদের পূর্ব্বলব্ধ গৌরব এবং অভ্যুদয়ের অত্যুচ্চ শিখরে আসন পরিগ্রহ করিতে পারিব?

আবদুল মালেক চৌধুরী।

শিল্প-ক্ষেত্রে মুসলমান।

(৩)

মুসলমান শিল্পীগণের নাম।

১২ এব্নে আবি ওব্বাদ। ابن ابي عباد — এই মহাত্মা الة ذات الشعبتين অর্থাৎ দ্বিশাখ বিশিষ্ট মান-মন্দিরের যন্ত্র বিশেষের আবিষ্কার জন্য বিশেষরূপে খ্যাত। তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্র সাহায্যে, স্থানের দূরত্ব নিরূপিত হইত। তিনি শিল্প সংক্রান্ত এবং অন্যান্য বিষয় যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, পণ্ডিত প্রবর এব্নে নদীম ابن نديم স্বীয় প্রসিদ্ধ كتاب الفهرست গ্রন্থের ২৭৯ পৃষ্ঠায় সে সকল পুস্তকাবলির সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন।

১৩। হোসেন এবনে-মোহাম্মাদ। حسين ابن محمد — তিনি ঘড়ি নির্ম্মাণে সাতিশয় পারদর্শী ছিলেন, এবং ঘড়ি-শিল্প সম্বন্ধে عمل الساعات নামক একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'এবনে নদীম' স্বীয় গ্রন্থের ২৮০ পৃষ্ঠায় উক্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন।

১৪। মোহাম্মাদ এব্নে-হাসন। محمد بن حسن — গোলাগুলি নির্ম্মাণ বিষয় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি তৎসম্বন্ধে যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহার নাম "صنعة البنادق" "ছন্ আতল্ বানাদেক" অর্থাৎ বন্দুকনির্ম্মাণ শিল্প। এব্নে নদীম স্বকীয় গ্রন্থ-তত্ত্ব বিষয়ক فهرست গ্রন্থের ২৮১ পৃষ্ঠায় এই পুস্তকের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

১৫। কোর্রায়ে হর্রাণী। قرة حراني — এই মহাত্মা একদিকে যেমন প্রসিদ্ধ শিল্পী ও আবিষ্কারক ছিলেন পক্ষান্তরে ভূগোল-শাস্ত্রে ও মানচিত্র অঙ্কনেও সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি পৃথিবীর যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা সমসাময়িক পণ্ডিত সমাজে অতুলনীয় আবিষ্কার বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছিল। এব্নেনদীমের সময় পর্য্যন্ত উক্ত মানচিত্র বিদ্যমান ছিল। তিনি স্বীয় গ্রন্থের ২৮৫ পৃষ্ঠায় সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬। আবুল ফজল মোহান্দেস। ابو الفضل مهندس — তিনি সূত্রধর-শিল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি এই কাষ্ঠ শিল্প উপলক্ষেই জ্যামিতি শাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞানুযায়ী এবং গ্রীক পণ্ডিত 'মেজেস্তীর' (مجسطي) নিয়মানুকূল্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ও তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল, সমর-বিদ্যা এবং রাজনীতি সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ আবিষ্কার-শক্তি ও প্রতিভা দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইতেন।

তৎপ্রণীত সমর-বিদ্যা সংক্রান্ত الحروب والسياسة (আল্ হুরুবো ওয়াস্ সেয়াসাৎ) অর্থাৎ যুদ্ধ ও রাজনীতি নামক পুস্তক অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ও চিত্তাকর্ষক (১)

১৭। এব্রাহিম ফজ্জারী। ابراهيم فزاری — তিনি "ذات الحلق" ও المسطح والمسطح যন্ত্রের আবিষ্কারক। সূর্য্যের গতি নির্ণায়ক একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। (২)

১৮। আবুল হাসান। ابوالحسن — তাপমান যন্ত্রাবিষ্কারের জন্য তিনি বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। উক্ত যন্ত্র সম্বন্ধে তিনি একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সূর্য্যের দূরত্ব নিরূপণ বিষয় তিনি যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম المفروض كيف يعلم ما مضى من النهار من ساعة من غير الارتفاع (৩)

১৯। এবনে খলফ। ابن خلف — তিনি এবং তাঁহার ক্রীতদাসগণ সকলেই শিল্পী এবং শিল্পাবিষ্কারক ছিলেন। আলী এবনে ঈসা (علی بن عیسی) স্বয়ং এবনে খলফের ক্রীতদাস ছিলেন এবং খফিফ, আহমদ ও মোহাম্মদ এই ব্যক্তিত্রয় আলী এবনে ঈসার ক্রীতদাস। আবার আলী এব্‌নে আহমদ ইঞ্জিনিয়ার নামক এক ব্যক্তি, বর্ণিত খফিফের ক্রীতদাস ছিলেন। আবুরবী (ابو ربیع) নামক আর এক ব্যক্তি শেষোক্ত জনের ভৃত্য ছিলেন। ইহারা সকলেই শিল্পী এবং শিল্প বিদ্যায় তাহাদের অসাধারণ অধিকার ছিল।

২০। মোহাম্মদ এব্‌নে মুসা محمد بن موسی — মুসলমানগণের মধ্যে, সর্ব্বাগ্রে তিনিই ভূমণ্ডলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। যন্ত্রাদি সম্বন্ধে তিনিএরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছিলেন যে, তাহা শিল্পীদিগের জন্য তখন আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। পণ্ডিতপ্রবর ঐতিহাসিক 'এব্‌নে খল্‌কান' তাঁহার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "মোহাম্মদ এব্‌নে মুসা সেই ভ্রাতৃত্রয়ের একজন, যাহাদের নামের সহিত আশ্চর্য্য শিল্প ও বৈচিত্র্যময় যন্ত্রাদি আবিষ্কারের সুখ্যাতি চিরাগত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার নাম আহমদ ও হাসান। প্রাচ্য-ভাষা ও জ্ঞানানুশীলনে তাঁহাদের চেষ্টা, উদ্যম ও কার্য্যকীর্ত্তি বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহারা শিল্প-বিজ্ঞান বিভাগে যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অসাধারণ পরিশ্রম ও চেষ্টাউদ্যোগেরই ফল। রোম হইতে তাঁহারা শিল্পবিজ্ঞান সংক্রান্ত দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানানুশীলনের সম্যক পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিল্পজাত দ্রব্যাদি আবিষ্কারে যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা মুসলমান শিল্পীকুলের ইতিহাসে বিরল। (৪)

(১) طبقات الاطباء ২য় খণ্ড, ১৯০-১৯১ পৃষ্ঠা।
(২) فهرست ابن ندیم (ফেহ্‌রেস্তে এব্‌নে নদীম), ২৭৩ পৃষ্ঠা
(৩) ঐ ২৭৩ পৃষ্ঠা।
(৪) ابن خلکان "এব্‌নে খল্‌কান" ২য় খণ্ড, ৭৯ পৃঃ।

২১। জেয়াউদ্দীন-মোহাম্মাদ। ضياءالدين — তিনি একজন প্রসিদ্ধ ভারতীয় যন্ত্র-শিল্পী। সম্রাট হুমায়ুনের নিমিত্ত তিনি খগোল সংক্রান্ত অনেক ব্যবহারিক ও মূল্যবান যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত একটী "ওস্তরলাব" বা দূরদর্শন যন্ত্র এখনও ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত বাক্যাবলি অঙ্কিত আছে, যথা,—عمل ضياءالدين محمد بن قائم محمد بن ملا عيسى بن شيخ الهداد اصطرلابى همايونى لاهورى فى سنة ١٠٥١ هجرى ১০৫৯ হিজরী অব্দে, এই যন্ত্র জেয়াউদ্দীন লাহুরী কর্ত্তৃক নিম্মিত হয়।

২২। হাকিম মীর ফৎহুল্লা শিরাজী। حكيم مير فتح الله شيرازي — "তজকেরায়-ওলামায়হেন্দ" تذكرة علماء هند নামক গ্রন্থপ্রণেতা লিখিয়াছেন, শীর্ষোক্ত হাকিম সাহেবের আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির, মধ্যে, একপ্রকার জাঁতিচক্র বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। উক্ত যন্ত্র স্বতঃ গতিশীল ছিল এবং তদ্দ্বারা অতি সহজেই শস্যাদি চূর্ণ করার কার্য্য সম্পন্ন হইত। তিনি আর একপ্রকার দর্পণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে দূর ও নিকটবর্ত্তী বস্তুর প্রতিবিম্ব সমভাবে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার আবিষ্কৃত একপ্রকার বন্দুকে, একবার ঘোড়া চাপিলে দ্বাদশ বার আওয়াজ হইত, এবং তাহা হইতে দ্বাদশটী গুলি নিক্ষিপ্ত হইত। (১)

২৩। হাকিম আলী গিলানী حكيم علي گيلاني — "সিয়রল্ মোতাআখ্‌খেরিন" سيرالمتأخرين গ্রন্থ প্রণেতা লিখিয়াছেন, হাকিম আলী গিলানী, নিজালয়ে একটী "হাওজ" বা জলাশয় প্রস্তুতপূর্ব্বক তাহার একপার্শ্বে সলিলগর্ভে, একটী অত্যুজ্জ্বল আলোক বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুস্তক ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামাদি অতি শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই "হাওজ" নির্ম্মাণ কার্য্যে, হাকিম সাহেব এক অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রকোষ্ঠ-অভ্যন্তরে, এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বায়ু সঞ্চালিত করিয়াছিলেন যে, প্রবল বায়ুর প্রতিকূল গতির প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন, কক্ষের মুক্তদ্বার দিয়া হাওজের প্রকোষ্ঠে জল প্রবেশ করিতে পারিত না। দর্শকগণ জলে ডুব দিয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক বস্ত্র পরিবর্ত্তন অন্তে সেখানে নিরাপদে বিচরণ করিতে পারিতেন। প্রকোষ্ঠে দ্বাদশ জন লোক বসিয়া পরস্পর আলাপ আপ্যায়ন ও আহার বিহারের কার্য্য সমাপন করিতে পারিতেন। সম্রাট জাহাঁগীর, হাকিম গিলানীর অপূর্ব্ব সলিল-কক্ষ দর্শন মানসে, বর্ণিত উপায়ে জলে ডুব দিয়া উক্ত সজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে লোক মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া অধিকতর বিস্মিত ও সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং হাকিম সাহেবের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও অপূর্ব্ব আবিষ্কার-ক্ষমতার জন্য তাঁহাকে দুই হাজারী পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঁগীর এই অপূর্ব্ব জলাশয় ও তদভ্যন্তরস্থ প্রাসাদকক্ষের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা স্বপ্রণীত জীবনীতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (২)

---

(১) تذكرة علماء هند ১৬০ পৃষ্ঠা।

(২) سيرالمتأخرين "সিয়রল্ মোতা আখ্‌খেরিন" ১ম খণ্ড ২৪৩ পৃষ্ঠা।

২৪। মামুন শাহে স্পেন
مامون شاه اندلس

রাজ প্রাসাদে তিনি একটী আশ্চয্যজনক জলাশয় ও উপসাগরের আকারবিশিষ্ট জলপ্রণালী খনন করিয়াছিলেন। জলাশয়ের মধ্যদেশে একটী গুম্বজাকারের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুম্বজের নিম্নদেশ হইতে অতি সুকৌশলে গুম্বজের শিরোভাগ পর্য্যন্ত পাইপের সাহায্যে জল নীত হইত। গুম্বজের সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া জলধারা প্রবাহিত হইত। পণ্ডিত তরতুসী طرطوسي علامة লিখিয়াছেন, প্রাসাদের জলধারা সর্ব্বদাই প্রবাহিত থাকিত। এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রবাহের বিরাম হইত না। দর্শক মনে করিতেন, প্রাসাদটী যেন স্বাভাবিক চিরপ্রবাহিত জলধারার বস্ত্রাবরণে আচ্ছাদিত। বাদশাহ স্বয়ং প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে জলধারা ঝর ঝর রবে প্রবাহিত হইত (১) দিল্লীর লালকেল্‌আর অভ্যন্তরে যে সকল প্রাসাদ মালা ছিল তাহাতেও এরূপ কৃত্রিম জলধারা প্রবাহের সুব্যবস্থা ছিল। 'শ্রাবণ' ও 'ভাদ্র' নামে দুইটা অট্টালিকার ভগ্নাবশিষ্ট এখনও পরিলক্ষিত হয়। উক্ত অট্টালিকাদ্বয় হইতে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের মুষলধারে বারি প্রবাহের ন্যায় কৃত্রিম উপায়ে জলধারা প্রবাহিত হইত বলিয়া উক্ত অট্টালিকাদ্বয়ের শ্রাবণ ও ভাদ্র নামে নামকরণ করা হইয়াছিল।

২৫। সদিদদ্দীন এবনে রাকিকা।
سديد الدين ابن رقيقة

তিনি আবিষ্কার ব্যাপারে অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি একপ্রকার জলপাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যভাগে গোলাকার একটী দ্রব্য সংস্থাপিত ছিল। তদুপর একটী পাখী-মূর্ত্তি সংরক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত পাত্রে জল নিক্ষেপ করা মাত্রই পাখীটী পাখা নাড়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিত এবং ডানা স্পন্দন করিয়া যাহার নিকট গিয়া বসিত সেই ব্যক্তি কোন অজ্ঞাত কারণে পিপাসাতুর হইয়া জল পান করিতে বাধ্য হইত। উক্ত জলপাত্র হইতে জলপানান্তে তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও পাখিটী অবিরত শব্দ করিতে বিরত হইত না। এরূপভাবে শত বার জলপানান্তেও পাত্রে কিছু মাত্র জল অবশিষ্ট থাকিলেই পাখীর রব থামিত না। পাত্রের জল সম্পূর্ণরূপে নিশেষিত হইলে তবেনি পাখীর চেঁচানীর নিবৃত্তি হইত। (২) এই জলপাত্রে নিম্নলিখিত আরবী কবিতাটী প্রকটিত ছিল। যথা :—

(১) انا طائــــر فی هيـــاة الزر زور * مستحسن التكوين والتصوير
(২) فاشرب على نغمی سلاف مدامة * صرفا تنير حنادس الديجور
(৩) صفراء تلمع فی الكوائس كانها * نار الكليم بدت باعلى الطور
(৪) و اذا تخلف من شرابک درهما * فی الكاس نم به عليک صفيری

(১) আমি 'জরজুর' নামক পক্ষীর আকার বিশিষ্ট একটী পাখী। আমার আকৃতি প্রকৃতি সুশোভন ও পবিত্রতম। (২) আমার গান শ্রবণে (সানন্দে) এরূপ নিখুত সুরাপান

---

(১) "সেরাজুল মুলুক" سراج الملوک ৫০ পৃষ্ঠা।
(২) عيون الانباء "অয়ুনল্ আম্বা" ২য় খণ্ড ২২৭ পৃঃ।

কর, যদ্দ্বারা রজনীর অন্ধকার তিরোহিত হইবে। (৩) হরিদ্রা বর্ণের সুরা (পান কর) যাহা সুরাপাত্রে এরূপ উজ্জ্বল প্রতিপন্ন হয়, যথা 'তুর' পর্ব্বতে হজরত মুসার অনল-শিখা প্রজ্জলিত হইয়াছিল। (৪) তোমার সুরা পানান্তে যদি তাহার কিছু মাত্র অংশ সুরা পাত্রে থাকিয়া যায় তাহা হইলে আমার সঙ্গীত-রব তোমার গ্লানি করিবে ইহা নিশ্চিত; অর্থাৎ আমার চীৎকারের বিরাম হইবে না।"

২৬। আবু মোহাম্মদ এব্‌নে আবি। হাকিম ابو محمد بن ابي الحكيم — তিনি গণিতশাস্ত্রে, জ্যামিতিতে ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। (১)

২৭। এহিয়াল বেয়াসী يحي البياسي — যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সূত্রধরের কার্য্যের সহিত তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি দেশের অগ্রণী ছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত এব্‌নে নক্কাশ علامه ابن نقاش এর জন্য অনেক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ যন্ত্রই ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সংশ্লিষ্ট। (২)

২৮। আবুস ছল্‌ত ابو الصلت — আবিষ্কার ক্ষমতার জন্য তিনি এস্‌লাম জগতে সবিশেষ পরিচিত। তিনি বহু প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জল নিমজ্জিত জাহাজ উত্তোলন নিমিত্ত মাধ্যাকর্ষণ পদ্ধতির সূত্রাবলম্বনে অনেক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (৩)

২৯। আবু আলী সিনা ابو علي سينا شيخ الرئيس — পণ্ডিত প্রবর এব্‌নে আবি উছায়বা ابن ابي اصيبعه স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মহাপণ্ডিত আবু আলী সিনা জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংক্রান্ত এরূপ বহু যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহার অস্তিত্ব তাঁহার পূর্ব্বে আদৌ ছিলনা। জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রাদির বিষয় তাঁহার একখানি পুস্তকও আছে। 'এছফেহানে' বাদশাহ আলাউদ্দৌলার জন্য তিনি যে 'মানমন্দির' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে তৎ আবিষ্কৃত বহু যন্ত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছিল।

৩০। খলিফা মকৃতদর বিল্লা। مقتدر بالله خليفه — তিনি বোগদাদের প্রসিদ্ধ دار الشجره 'দারশ্ শজরা' অর্থাৎ 'বৃক্ষ-প্রাসাদ' নামক অপূর্ব্ব সৌধের নির্ম্মাতা বলিয়া প্রশংসিত। পণ্ডিত প্রবর এয়াকুতে হোমবী علامه ياقوت حموي লিখিয়াছেন, "দারশ্-শজরা" বা বৃক্ষ-প্রাসাদ রাজপুরীর একটা অংশবিশেষ। খলিফা মকৃতদরবিল্লা এই অতুল স্থাপত্যকীর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা। ইহা অতি প্রশস্ত ও সুবিস্তৃত সুশোভন অট্যালিকা। ইহার চতুর্দ্দিকে, অতি উত্তম ও সুসজ্জিত পরম রমণীয় দৃশ্যসঙ্কুল উদ্যানরাজি বিরাজিত ছিল। ইহার নাম বৃক্ষ-প্রাসাদ হইবার তাৎপর্য্য এই যে, রাজমহলের সৌধশ্রেণীর সম্মুখে, একটী প্রকাণ্ড হাওজ

(১) طبقات الاطباء "তবকাতুল্ আতেব্বা" ২য় খণ্ড ১৫৫ পৃঃ।
(২) عيون الانباء ২য় খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা।
(৩) ঐ পুস্তক ৮ পৃষ্ঠা।

বা জলকুণ্ড বিরাজমান ছিল। এই গোলাকার জলাশয়ের মধ্যভাগে, স্বর্ণ রৌপ্য বিনির্ম্মিত একটী অতুল শোভনীয় সুদৃশ্য বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষে অষ্টাদশটী স্বর্ণ রৌপ্যের ডাল এবং প্রত্যেক ডালে বহু প্রশাখা, আবার প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় বিবিধ জাতীয় জহরাত বিজড়িত অসংখ্য ফল ফুল বিলম্বিত ছিল। বৃক্ষের ডাল পালে অবস্থিত নানা জাতীয় স্বর্ণ রৌপ্যের পাখী সমূহের সঙ্গীত-তানে চতুর্দ্দিকের শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে সুধাধারা বর্ষিত হইত। প্রাসাদের একপার্শ্বে জলাধারের দক্ষিণদিকে পঞ্চদশ জন অশ্বারোহী সৈনিকের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত ছিল এবং সৈনিকগণের শরীর রেশম বস্ত্রে সুশোভিত ও তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে উজ্জ্বল তরবারি ও বিদ্যুৎ আলোকিত বর্শা বিলম্বিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা ক্ষণে ক্ষণে সকলেই বর্শা ও মুক্ত তরবারি সঞ্চালিত করিয়া নিজদের সজীবতা ও উৎসাহ উদ্যমের পরিচয় দিতেছিল। দর্শক মনে করিতেন, প্রত্যেক সৈনিকপুরুষই যেন অপরের প্রতি আক্রমণ জন্য উদ্যত। (১) এই অপূর্ব্ব শিল্পের মূল আবিষ্কারক কে তাহার স্থির নিশ্চয়তা নাই বটে, কিন্তু ইতিহাসে খলিফা মক্তদর বিল্লার নামের সহিত এই শিল্প-গৌরব সংযোজিত।

৩১। এবনে সাআ্তী। ابن الساعاتی } এই মহাত্মা ঘড়ি-নির্ম্মাণ-শিল্পে সাতিশয় প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতপ্রবর 'এবনে আবি উছায়বআ' ابن ابی اصیبعه লিখিয়াছেন, সময় নিরূপণ কৌশল ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। দামস্কের জামে মস্জেদের সম্মুখের ঘণ্টা-ঘরের তিনিই নির্ম্মাতা। এই অপূর্ব্ব কৌশলপূর্ণ ঘড়ি তিনি সোল্তান নূরদ্দীন মাহ্মুদ এবনে জঙ্গীর আমলে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সোল্তান তাঁহার অসাধারণ আবিষ্কার ক্ষমতা ও শিল্পজ্ঞান দর্শনে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কৃত এবং তাঁহার জন্য উপযুক্ত বৃত্তির সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই শিল্পী পণ্ডিত প্রবরের উচ্চ পদমর্য্যাদা এবং সম্মান সৌভাগ্য দর্শনে তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিত সমাজ, তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইলে, তিনি একটী কবিতা রচনা করিয়া শত্রুকুলের মুখ বন্ধ করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহার সেই কবিতাটী যথা :—

یحسدنی قومی علی صنعتی * لاننی بینهم فارس ط

سهرت فی لیــلی واستــنعوا * لن یستوی الدارس والناعس ط

অর্থ,—আমার স্বজাতিগণ, আমার শিল্প-গুণ দর্শনে আমার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিয়া থাকে, যেহেতু আমি যেন তাহাদের মধ্যে অশ্বারোহী সেনাপতি স্বরূপ অর্থাৎ অগ্রণী। আমি বহু রজনী জাগ্রতাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছি। আমার শত্রুদল তখন সুখ-শয্যায় শায়িত ছিল, সুতরাং কর্ম্মী পুরুষ ও অলস নিদ্রিত কাপুরুষ এই উভয় কি কখনও সমান হইতে পারে? (২)

৩২। এবনে হায়ছম। ابن الهیثم } নানারূপ শিল্পকার্য্যে তাঁহার সম্যক পারদর্শিতা ছিল। তিনি নীল নদের উপর সেতুবন্ধনের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার

(১) معجم البلدان ৪র্থ খণ্ড ৫২০।৫২১ পৃঃ।

(২) طبقات الاطباء ২য় খণ্ড ১৮৪ পৃষ্ঠা।

জীবনে সে সংকল্প পূর্ণ হইতে পারে নাই। যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। (১) ছায়া-যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার রচিত পুস্তক বিশেষ প্রশংসার বস্তু। বনি মুসা, যন্ত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এবনে হায়ছম সে সকল যন্ত্রের চিত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

'বঙ্কাম' যন্ত্র সম্বন্ধে তিনি আর একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। 'বঙ্কাম' মূলত পারস্যজাত 'হাঙ্গাম' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। 'হাঙ্গাম' অর্থ সময়। এই যন্ত্র সাহায্যে সময় নিরূপণ কার্য্য সম্পাদিত হইত বলিয়া তাহা ঘড়ি যন্ত্ররূপে মান-মন্দিরে ব্যবহৃত হইত। "কশ্‌ফজ্‌জুনুন" كشف الظنون গ্রন্থকার "এলমল্ বঙ্কাম" علم البنكام শীর্ষক প্রবন্ধে ঘড়িজাত যন্ত্র-বিজ্ঞান বিষয় সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন।

৩৩। এবনে করনাস। ابن قرناس } তিনি স্পেনের অধিবাসী ছিলেন। দর্পণাদি নির্ম্মাণে তিনি বিশেষ খ্যাত ছিলেন (২)। এবনে কর্‌নাস সম্বন্ধে, ঐতিহাসিক মকরী نفح الطيب গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কাঁচ-নির্ম্মাণ-শিল্পের কার্য্য সর্ব্বাগ্রে স্পেনের স্বনামখ্যাত শিল্পী পণ্ডিত আবুল কাসেম আব্বাস এবনে করনাস আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 'মেছকাল' ميقال নামক একপ্রকার প্রসিদ্ধ যন্ত্রও তাঁহারই আবিষ্কৃত। আকাশ মার্গে উড্ডীয়মান হইবার জন্য

বায়ু-যান — একপ্রকার বায়ু-যান সর্ব্বাগ্রে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীয় আবিষ্কৃত উড়' কলের সাহায্যে আকাশমার্গে অনেক দুর উর্দ্ধে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কলের একটী দোষ এই ছিল যে, ইচ্ছা মত উর্দ্ধদেশ হইতে নিম্নে অবতরণ করার কৌশল তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন না। এজন্য একবার উড়িবার সময় তাঁহাকে বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হইয়াছিল। তিনি নিজালয়ে এক অতি প্রকাণ্ডকায় কৃত্রিম আকাশ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দর্শকগণ তাহাতে যথা নিয়মে গ্রহ উপগ্রহাদির অস্ত উদয় এবং নক্ষত্রমালার গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান-যুগে ইউরোপে যে সকল নানা শ্রেণীর বায়ু-যান নির্ম্মিত হইয়াছে সে সকলকে এবনে কর্‌নাসের উড়' কলের নূতন সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাস্তবিকপক্ষে মুসলমানগণ যে এক কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্প-কৌশলে অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, বর্ণিত ঘটনাবলি তাহারই উজ্জ্বল নিদর্শন। বর্ত্তমান শিল্প-বিমুখ মুসলমান সমাজ যদি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অতীত গৌরবকাহিনী এবং শিল্প-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমৃদ্ধি বৈভবের পুরাতন স্মৃতি হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক পুনরায় শিল্পবিজ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে অচিরে যে তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে, তাহাদের সৌভাগ্যতপন সমুদিত হইবে, আবার যে তাঁহারা সভ্য জগতে সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

এস্‌লামাবাদী।

---

(১) طبقات الاطباء ২য় খণ্ড ৯৪ পৃষ্ঠা।
(২) নফহাতুৎতিব نفح الطيب تاريخ اندلس ২য় খণ্ড ৮৭৩ পৃষ্ঠা।

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব।

(Doctrine Of Atonement)

(৫)

৬। দ্বিতীয় বিবরণের ২৪ অধ্যায়ের ১৬ পদ পাঠ করিলে জানা যায় যে, "সন্তানের জন্য পিতার, কিম্বা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না, প্রতি জন আপন আপন পাপ প্রযুক্ত প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে।" এই উক্তি দ্বারা ইহা স্পষ্টত প্রমাণ হয় যে, আদম (আঃ) নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করিয়া যে পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনিই দায়ী, অপর কেহ তাঁহার এই পাপের উত্তরাধিকারী নহে, সুতরাং জন্মগত পাপ কাহারই নাই। এই অবস্থায়, যীশু প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়া থাকিলে, নিশ্চয়ই প্রত্যেকের স্বকৃত পাপের জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, " প্রতিজন আপন আপন পাপ প্রযুক্ত প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে।" পরমেশ্বর যদি মিথ্যাবাদী বা প্রবঞ্চক (نعوذ بالله) না হন, তবে (হজরত) মুসার নিকট তাঁহার এই উক্তি অনুসারে যীশুর মৃত্যু সাধারণ পাপীর উদ্ধারের জন্য না হইয়া নিজেরই কৃতকর্ম্মের ফল হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। খৃষ্টীয়ানগণ যদি মনে করেন, আমরা এই উক্তিটী বুঝিতে পারি নাই, তবে তাঁহারাই অনুগ্রহ করিয়া ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশ করুন। বোধ হয় পারিবেন না।

৭। যিরামিয় ভাববাদীর পুস্তকে লিখিত আছে, * "সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে যে, আমি ইস্রায়েল-কুল ও যীহুদা কুলরূপ ক্ষেত্রে মনুষ্যরূপ বীজ ও পশুরূপ বীজ রোপণ করিব ; * * * * * * তৎকালে লোকে আর বলিবে না, পিতারা অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইয়াছিলেন, তাই সন্তানদের দাঁত টকিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে ; যে ব্যক্তি অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইবে, তাহারই দাঁত টকিয়া যাইবে।" প্রায়শ্চিত্তবাদ যদি সদাপ্রভুর ইচ্ছা বা অনুমোদনক্রমে নির্দ্ধারিত হইত, এবং উহার যদি কোন মূল্য থাকিত, তবে সদাপ্রভু যিরমিয় নবীর নিকট এই উক্তি বলিতেন না বা বলেন নাই। এই অবস্থায়, বল খৃষ্টীয়ানভ্রাতৃগণ, তোমরা বাইবেল ও তাহার লেখককে বিশ্বাস করিবে, কিম্বা সদাপ্রভুর সত্যবাদিতার প্রতি নিঃসন্দেহ থাকিবে ? যদি বাইবেল বিশ্বাস করা যায়, তবে সদাপ্রভুর দূরদর্শীতা প্রমাণিত হন না। পরন্তু যদি এই গ্রন্থ অবিশ্বাস্য হয়, তবে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি কোথায় দাঁড়াইবে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। সমস্যা দাঁড়ায়, 'এদিকে ব্রাহ্মণের ক্ষেত, আর ওদিকে গোপাট' এখন দাঁড়াই কোথায়! মোট কথা, এই উক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তবাদরূপ ধপধপে সাদা কর্পূরখণ্ড আলোচনার বাত্যাঘাতে উড়িয়া কোন দূর দূরন্তরে চলিয়া যায়, তাহাও আমরা নির্ণয় করিতেও অক্ষম।

---

* যিরমিয় ৩১; ২৯-৩০।

৮। যিহিস্কেল নবীর পুস্তকের ১৮শ অধ্যায়ে যে সমস্ত উক্তি দেখা যায়, তাহা পাঠ করিলে কোন সহজ জ্ঞানশীল ব্যক্তিই বলিবে না যে, বিনা:প্রায়শ্চিত্তে মানুষের পাপ ক্ষমা হইতে পারে না।. উক্তি নিচয়ের বিশদ ব্যাখ্যা না করিয়া আমরা পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য মূল কথাগুলি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহা এই;—"পরে সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, পিতৃপুরুষেরা অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইলে, সন্তানদের দাঁত টকিয়া যায়; এই যে প্রবাদ তোমরা ইস্রায়েল দেশের বিষয়ে বল, ইহাতে তোমাদের অভিপ্রায় কি? প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, ইস্রায়েলের মধ্যে তোমাদের এই প্রবাদের ব্যবহার আর করিতে হইবে না। দেখ, যাবতীয় প্রাণ আমার; যেমন পিতার প্রাণ আমার, তেমন সন্তানের প্রাণও আমার; যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে। পরন্তু কোন ব্যক্তি যদি ধার্ম্মিক হয়, এবং ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, পর্ব্বতের উপরে ভোজন কি ইস্রায়েল কুলের পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, আপন প্রতিবাসীর স্ত্রীকে ভ্রষ্টা না করে, ও ঋতুমতি স্ত্রীর নিকটেও না যায়; এবং কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য না করে, ঋণীকে বন্ধক ফিরাইয়া দেয়, কাহারও দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ না করে, ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে বস্ত্র দেয়, সুদের লোভে ঋণ না দেয়, কিছু বৃদ্ধি না লয়, অন্যায় হইতে আপন হস্ত ফিরায়; মনুষ্যদের মধ্যে যথার্থ বিচার করে, আমার বিধি মতে আচরণ করে, এবং সত্য আচরণের উদ্দেশ্যে আমার শাসন কলাপ পালন করে, তবে সেই ব্যক্তি ধার্ম্মিক; প্রভু সদাপ্রভু কহেন, সে অবশ্য বাঁচিবে! কিন্তু সেই ব্যক্তির পুত্র যদি দস্যু ও রক্তপাতকারী হয়, এবং পরের প্রতি সেই প্রকার কোন একটা কার্য্য করে; অর্থাৎ পিতা যাহা যাহা করে নাই (তাহা যদি করে,) যদি পর্ব্বতের উপরে ভোজন করে, ও আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করে, দুঃখী দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করে, পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, বন্ধক দ্রব্য ফিরাইয়া না দেয়, এবং পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ও বীভৎস কার্য্য করে; যদি সুদের লোভে ঋণ দেয় ও বৃদ্ধি লয়, তবে সে কি বাঁচিবে? সে বাঁচিবে না; সে এই সকল বীভৎস কার্য্য করিয়াছে; সে অবশ্য মরিবে; তাহার রক্ত তাহারই উপরে বর্ত্তিবে।

"আবার দেখ, ইহার পুত্র যদি আপন পিতার কৃত সমস্ত পাপ দেখিয়া বিবেচনা করে, ও তদনুযায়ী কার্য্য না করে, পর্ব্বতের উপরে ভোজন না করে, ইস্রায়েল কুলের পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ভ্রষ্টা না করে, কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য না করে, বন্ধক দ্রব্য না রাখে, কাহারও দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ না করে, কিন্তু ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে বস্ত্র দান করে, দুঃখী লোকের উপর উপদ্রব হইতে আপন হস্ত নিবারণ করে, সুদ বা বৃদ্ধি না লয়, আমার শাসন সকল পালন করে, ও আমার বিধিপথে গমন করে, সে আপন পিতার অপরাধে মরিবে না, সে অবশ্য বাঁচিবে। কিন্তু তাহার পিতা ভারী উপদ্রব করিত, ভ্রাতার দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করিত, স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে অসৎকর্ম্ম করিত; তাই দেখ, সে আপন অপরাধে মরিল। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, সেই পুত্র কেন পিতার

অপরাধ বহন করে না? যখন পুত্র ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, ও আমার বিধি সকল রক্ষা করে, ও পালন করে; সে অবশ্য বাঁচিবে। যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে, পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না, ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহারই মস্তকে বর্ত্তিবে। অধিকন্তু দুষ্ট লোক যদি আপন কৃত সমস্ত পাপ হইতে ফিরে, ও আমার বিধি সকল পালন করে, এবং ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তবে সে অবশ্য বাঁচিবে! সে মরিবে না। তাহার পূর্ব্বকৃত কোন অধর্ম্ম তাহার বলিয়া স্মরণে আনা যাইবে না, সে যে ধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, তাহা দ্বারা বাঁচিবে। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দুষ্ট লোকের মরণে কি আমার কিছু প্রীতি আছে? বরং সে আপন কুপথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতে কি আমার প্রীতি হয় না? আর ধার্ম্মিক লোক যদি আপন ধার্ম্মিকতা হইতে ফিরিয়া অন্যায় করে, ও দুষ্টের সমস্ত বীভৎস ক্রিয়ানুরূপ আচরণ করে, তবে সেকি বাঁচিবে? তাহার কৃত কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম স্মরণে আনা যাইবে না, সে যে, সত্য লঙ্ঘন ও পাপ করে, তদ্দারাই মরিবে। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, প্রভুর পথ সরল নয়; হে ইস্রায়েল কুল, একবার শোন, আমার পথ কি সরল নয়? তোমাদের পথ কি অসরল নয়? ধার্ম্মিক লোক যখন আপন ধার্ম্মিকতা হইতে ফিরিয়া অন্যায় করে ও তাহাতে মরে, তখন আপনার কৃত অন্যায়েই মরে। আর দুষ্ট লোক যখন আপনার কৃত দুষ্টতা হইতে ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তখন আপন প্রাণ বাঁচায়। সে বিবেচনা করিয়া আপনার কৃত সমস্ত অধর্ম্ম হইতে ফিরে, এইজন্য সে অবশ্য বাঁচিবে, সে মরিবে না! কিন্তু ইস্রায়েল কুল বলিতেছে, প্রভুর পথ সরল নয়। হে ইস্রায়েল কুল আমার পথ কি সরল নয়? তোমাদের পথ কি অসরল নয়? অতএব হে ইস্রায়েল কুল, আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহারানুসারে তোমাদের বিচার করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। তোমরা ফির, আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম্ম হইতে বিমুখ হও, তাহাতে তাহা তোমাদের অপরাধজনক বিঘ্ন হইবে না। তোমরা আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম্ম আপনাদের হইতে দূরে ফেলিয়া দাও, এবং আপনাদের জন্য নূতন আত্মা প্রস্তুত কর, কেননা, হে ইস্রায়েল কুল, তোমরা কেন মরিবে? বস্তুতঃ যে মরে, তাহার মরণে, আমার কিছু প্রীতি নাই, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন; অতএব তোমরা মন ফিরাইয়া বাঁচ।"

৯। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম হইতে যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রায়শ্চিত্ত-বাদের অসারতা প্রমাণ করিয়াছি, তাহাতেই বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খৃষ্টীয়ান-প্রায়শ্চিত্ত-বাদ একটা কল্পিত ধারণা মাত্র। ইহাতে যেমন সদাপ্রভুর অনুমোদন নাই, তেমনই তাহা যুক্তিরও বহির্ভূত। কিন্তু খৃষ্টীয়ানগণ এককথায় আমাদের এই সব যুক্তি কাটিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা নূতন নিয়ম খুলিয়া যোহনের সুসমাচার হইতে ১০ অধ্যায়ের ৮ম পদ দেখাইয়া বলিয়া দিবেন যে, যীশুর পূর্ব্বে যাহারা আসিয়াছিলেন, সেই মহা মহা পয়গম্বরগণ সকলেই "চোর ও দস্যু" (یوحنا ۸:۱۰) তাঁহাদের দ্বারা এমন একটী মহা সত্য অপ্রকাশিত থাকা সম্ভব। আচ্ছা, যদি

তাহাই হয় তবে একবার নূতন নিয়মের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক—দেখি উহাতে কি লিখিত আছে ?

(ক) যীশু বলেন, " আর তোমরা কেন আমাকে প্রভো, প্রভো, বলিয়া ডাক, অথচ আমি যাহা বলি, তাহা কর না ? যে কেহ আমার নিকট আসিয়া আমার বাক্য শুনিয়া পালন করে, সে কাহার তুল্য, তাহা আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি। সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য যে গৃহ নির্ম্মাণ সময়ে গভীর খাত করিল, ও পাষাণের উপর ভিত্তিমূল স্থাপন করিল ; পরে বন্যা আসিলে সেই গৃহে জলস্রোত বেগে বহিল, কিন্তু তাহা হেলাইতে পারিল না ; কারণ তাহা উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি শুনিয়া পালন না করে, সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যে ভিত্তিমূল ব্যতিরেকে মৃত্তিকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করিল ; পরে জলস্রোত বেগে বহিয়া সেই গৃহে লাগিল, আর অমনি তাহা পড়িয়া গেল, এবং সেই গৃহের ভঙ্গ ঘোরতর হইল।" (লুক-৬ অধ্যায় ৪৬—৪৯ পদ)। উপরোক্ত উক্তি সকলের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে যীশুকে যাঁহারা প্রভু বলেন তাঁহারাও ক্রিয়া ব্যতিরেকে মুক্তি পাইবেন না। মুক্তির একমাত্র উপায় বলিতে গিয়া তিনি বহু স্থানে শুধু আজ্ঞা সকল পালনের আদেশ দিয়াছেন। (দেখ, মথি, ১৯;১৯। ২২; ৩৪-৪০। লুক-১০ ১০;২৭। ইত্যাদি)

(খ) মথির বিবরণানুযায়ী জানা যায়, যীশু বলেন,—"যাহারা আমাকে প্রভো, প্রভো, বলিয়া বলে, তাহারা সকলে যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমন নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে সেই পাইবে।" (দেখ মথি ৭ অধ্যায় ২১ পদে) আরও স্পষ্টতর ভাবে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, যীশু তাঁহাতে অন্যায়রূপে নির্ভরকারী তথা-কথিত ভক্তগণের জন্য কোনপ্রকার দায়ীত্ব গ্রহণ করিবেন না। ইহার পরবর্ত্তী পদ দ্বারা ইহাও প্রমাণ হয় যে, অনেকেই সেই মহা বিপদকালে তাঁহার শরণাপন্ন হইবে, তাঁহার আশ্রয় পাইবার জন্য চাটুবাক্য ত বলিবেই, তাহা ছাড়া কাকুতি মিনতিও বিস্তরই করিবে। যাঁহারা এই কার্য্য করিতে যাইবেন, বাইবেল আমাদিগকে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, তাঁহারা খৃষ্টীয়ান * এই খৃষ্টীয়ানদিগকে যদি তিনি এমন জবাব দিয়া বিদায় করেন, অথবা তাঁহা-দিগকে যদি তাঁহার নিকট করুণা ভিক্ষা করিতে যাইতে হয়, তবে প্রায়শ্চিত্তরূপ এই মহারত্ন কাহার জন্য ! সেই যে কঠোর যন্ত্রনা, যাহার ভয়ে যীশুর সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ঘাম দেখা দিয়াছিল, তাহা কি তবে বৃথা ? খৃষ্টীয়ান হইয়া ও, 'অনেক প্রভাবের কার্য্য করিয়া' এবং যীশুর নামে 'ভাবোক্তি প্রচার করিয়াও, যদি মানুষ মুক্তি হইতে বঞ্চিত হয়, তবে পাদ্‌রি মহাশয়গণ আর কোন্ আশায় হাটে-মাঠে "হারান মেষ কুলকে" ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান হইতেছেন !

---

* তাঁহারা তাঁহার নামে যে ভুত ছাড়াইয়াছেন এবং ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছেন বলিয়া বলিবেন, তাহাতেই পাঠক, আমাদের উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারেন। কারণ খৃষ্টীয়ানগণই যীশুর নামে ভাবোক্ত প্রচার করেন—আর কেহ না। ভূত ছাড়ান অবশ্যই সকলের দ্বারা হইয়া উঠে না।

একবার নিজের চিন্তাটা করিয়া লউন, দেখুন "ক্রিয়া ব্যতিরেকে শুধু বিশ্বাস দ্বারাই" কোন লাভ হইবে কিনা। দুঃখের বিষয় এই, যীশু মরিলেন—কষ্টের একশেষ ভোগ করিলেন (?) অনেকে তাহা বিশ্বাসও করিল; মনে করিল, বিপদের কালে এই বিশ্বাসের প্রভাবে অনন্তজীবন পাইবে। কিন্তু হায়! এই সাধের আশায় ছাই! যখন, যীশুই বলিতেছেন, তিনি বলিবেন, اگر زر داری بیا و بیار। অর্থাৎ তোমার যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আন, নিজেও আইস; নতুবা ঐ তফাৎ—এদিকে আসিও না!!! * বুঝুন পাঠক, প্রায়শ্চিত্ত কি? এবং উহার মূল্যই বা কত?

(গ) মথি লিখিত পুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২ পদে যীশু শিষ্যদিগকে পাপ মোচনের জন্য এই-রূপে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিতেছেন,—"আর আমরা যেমন আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি, তদ্রূপ তুমিও (হে স্বর্গস্থ পিতা) আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর।" ইহার পরেই আবার আদেশ। তিনি বলেন, "বস্তুতঃ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।" প্রায়শ্চিত্ত-বাদের মূলে যদি কোন সত্য থাকিত, তবে যীশু এই উপদেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ উহারও একটু আভাষ দিতেন। দুঃখের বিষয় তাহা কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না! শিষ্যদিগকে চোখ বান্ধা কলুর বলদের ন্যায় ঘুরাইয়া মারিবার জন্য, (?) তিনি বলেন, তোমার ডান গালে একজন চপেটাঘাত করুক, তুমি তাহাকে বাম গাল ফিরাইয়া দেও; সে তোমার বিরুদ্ধে পাপ করুক, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর—ইহাতে তোমার বুকের রক্ত শুকাইয়া যাউক, তবে তুমি পরমেশ্বরের ক্ষমার পাত্র হইবে। † যদি প্রায়শ্চিত্ত-বাদ সম্বন্ধে যীশু বিন্দু বিসর্গও জানিতেন, তবে তাহা স্পষ্টতঃ না হউক অন্ততঃ ইসারায়ও বলিয়া দিতেন। কেন দেন নাই?

(ঘ) মথি লিখিত পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ের উক্তি মতে বুঝা যায় যে, পাপ দুই প্রকার। একপ্রকার পাপ মার্জ্জনার যোগ্য এবং আর এক রকমের পাপ কিছুতেই মার্জ্জনীয় নহে। উক্ত অধ্যায়ের ৩১।৩২ পদে যীশু বলেন, "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যের সকল পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে না। আর, যে কেহ মনুষ্য পুত্রের বিরুদ্ধে কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে; কিন্তু যে কেহ পবিত্রআত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহার ক্ষমা

* যীশু বলেন, "যে কাহারও নিকটে আছে, তাহাকে দত্ত হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে নীত হইবে।" (মথি ২৫;২৯)

† যীশুর উপদেশানুযায়ী দুষ্টকে দুষ্টামি হইতে দমন করিয়া সৎপথে আনার আবশ্যক নাই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা অন্যায়। সাধ্য থাকিলে, তাহাকে যে কোন উপায়ে দমন করিয়া সৎপথে আনয়নকরা নিতান্ত আবশ্যক। সাধ্য থাকা সত্বেও কেহ দুষ্টের দমন না করিলে এস্লামের মতে সেও দুষ্ট বলিয়া গণ্য।

ইহলোকে কি পরলোকে কখনও হইবে না।" যীশুর এই উক্তির উপরে বেশী কথা বলার আবশ্যক নাই; তবে তিনি, যে পাপকে বিনা শাস্তিতে একেবারেই ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বলেন না, সেই "পবিত্র আত্মার নিন্দা" আজ কাল বহু লোকের মুখেই শুনা যায়—পূর্ব্ব যুগেও মাত্র দশ বার জন লোক ব্যতীত সকলেই এ দোষে দোষী ছিল। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা যীশুর আত্মত্যাগে বিশ্বাস করিয়াছেন বা করেন, তাঁহাদের মুক্তি পাওয়ার কোন সনন্দ পাওয়া যায় নাই। বিশেষত যাহা কিছুতেই মার্জ্জনীয় নহে, ইহ এবং পরকাল, কোন কালেই যাহার জন্য শাস্তি ভোগ না করিয়া উপায় নাই, সেই মহা পাতক হইতে যদি যীশু আমাদিগকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নিয়া আসিতেন, তবে তাহা খুব জোর কলমে লেখা উচিৎ ছিল। সুসংবাদ লেখকগণ তাহা করেন নাই কেন? খুজিলেই তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়, তবে একটু ধীরতা অবলম্বন করিয়া গভীর ভাবে শাস্ত্রালোচনা করিতে হয়। পাঠক, বাইবেল খানা খুলিয়া দেখুন, যীশু বলেন, "সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা সর্ব্বনাশ যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকে তাহা দিয়া প্রবেশ করে। কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তাহা পায়।" (মথি ৭ অধ্যায় ১৩-১৪ পদ)। সৎকার্য্য করা অপেক্ষা যীশুর প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস এবং নির্ভর করা যে খুব সহজ এবং প্রশস্ত পথ, একথা শিশুও স্বীকার করিবে। সুতরাং অনেকেই এদিকে অগ্রসর হইবার কথা। পক্ষান্তরে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, অপরাধীকে ক্ষমা করা প্রভৃতি ইহার তুলনায় সঙ্কীর্ণতম পথ—শুধু সঙ্কীর্ণই নহে, "দুর্গমও" অতি মাত্রায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যীশুর প্রায়শ্চিত্ত আমাদের "জীবনের পথ" না 'বিনাশের পথ'? আজ কাল জগতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় খৃষ্টীয়ানের সংখ্যা অনেক বেশী; এদিকে যীশু বলেন, জীবনের পথ অল্প লোকেই পায়, বেশী লোকে নহে। এখন পাঠক বিচার করুন, প্রায়শ্চিত্ত-বাদ কেমন ধরণের জীবনের পথ?

(ক্রমশঃ)

মোহাম্মদ মুজাফফর উদ্দীন।

গণিত-শাস্ত্রে মুসলমান

জগতে যতগুলি জাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে, গণিত-শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে তাহাদের কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। যেহেতু যখনই কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, যখনই তাহাদের রাজ্যের পরিসর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে; তখনই স্বভাবতঃ তাহাদিগকে বাণিজ্যের হিসাব রাখিবার জন্য, রাজ্যের আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, বাধ্য হইয়া গণিত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইয়াছে। এই জন্যই জগতে সকল জাতির মধ্যেই গণিতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই গণিতের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, তথাপি তাহাকে বিবিধ নিয়মে, বিবিধ ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে যে বহু উর্ব্বরমস্তিষ্কের প্রয়োজন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং কালক্রমে সকলেই কষ্টসাধ্য নিয়মের পরিবর্ত্তে উন্নত ধরণের নিয়মাবলীও যে আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতেও দ্বিধা রাখিতে পারা যায় না। সকল জাতির মধ্যেই গণিতের প্রচলন থাকিলেও, বাণিজ্য বা অন্যান্য কারণবশতঃ এক জাতি অপর জাতির সংসর্গে আসিলে, তাহাদের মধ্যে যে উহার বিনিময় না হইয়াছে; তাহাও ধারণা করিতে পারা যায় না। এরূপ স্থলে গণিতের বহু শাখা প্রশাখার মধ্যে কোন্‌টী যে কাহাদের আবিষ্কৃত তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; তবে মোটামুটি ভাবে, প্রত্যেক জাতির গণিতের পুস্তক দৃষ্টে, কাহারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গণিত-শাস্ত্রে মুসলমানগণ যে অসাধারণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের হিজরীয় ৪র্থ, ৫ম শতাব্দী ও তদ্‌পরবর্ত্তিসময়ের লিখিত পুস্তকাদি দৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয়, ও তাঁহাদের লিখিত পুস্তকেব নিয়মাদি ও ভাবের সন্নিবেশের সহিত, আধুনিক ইউরোপীয় গণিত-শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকের নিয়মাদি ও ভাবের সামঞ্জস্য দেখিয়া; ইউরোপীয় গণিতের উন্নত ধরণ যে মুসলমানদিগের নিকট হইতে গৃহীত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত এই ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে আবও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। এমন কি এ পর্য্যন্ত বহু আরবীয় শব্দ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় তাঁহাদের ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যথা, আরবীতে ১২ اصابع 'এসবা' তে ১ قدم 'কদম' হয়। اصابع 'এসবা' (অঙ্গুলি) ইঞ্চি (Inch) قدم 'কদম' (পা) ফুট (Foot) درم 'দেরেম' ড্রাম, (Dram) الجبر 'আলজবর' আলজাবরা (Algabra) كعب (Cube) سلب 'সল্‌ব' (Salve) ইত্যাদি।

নিম্নে গণিতের শাখা প্রশাখাগুলির পৃথক পৃথক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। তাহা দেখিয়া, জগত, গণিত-শাস্ত্রে মুসলমানদিগের নিকটে ঋণী কি না, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা বিচার করিবেন।

الارثماطيقى আল্-আরতামাতেকী, (বোধ হয় ইহাকেই Arithmatic বলা হয়) ইহাতে সংখ্যাগুলির গুণের বিষয়ে উল্লেখ আছে। যথা, পর্য্যায়ক্রমে লিখিত অঙ্কের দুই পার্শ্বের দুইটী একত্র যোগ করিলে যত হইবে, তদ্ পশ্চাদবর্ত্তী দুইটী ২ একত্র যোগেও তত হইবে। যথা, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, এস্থলে ১৬+২১=৩৭, ১৭+২০=৩৭, ১৮+১৯=৩৭ ইত্যাদি। এই বিষয় ابن البناء "এব্নোন্নবা" কৃত كتاب رفع الحجاب কেতাব "রফওল হেজাব" ও ابن سينا "এব্নে সিনা" কৃত النجاة "আন্নাজাত," প্রসিদ্ধ।

صناعة الحساب "ছানাআতোল হেসাব," অঙ্ক বিদ্যা। ইহাতে যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, ভগ্নাংশ দশমিক ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই বিভাগে شمسية الحساب "শামছিয়াতোল-হেসাব" مفتاح الحساب "মেফ্‌তাহোল হেসাব" ইত্যাদি বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে।

الجبر والمقابلة "আল জবর ওয়াল মোকাবেলা," বীজ গণিত। (Algabra বীজগণিতের সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কারক কে, এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু ابن خلدون "এবেন্থলদুন" তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ৬০৪ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার উক্তির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আবু আবদুল্লাহেল খারজমীই সর্ব্বপ্রথমে বীজ গণিতের আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই আবু আবদুল্লাহেল খারজমীর বিস্তৃত জীবনী কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

বীজগণিতের Equation সমীকরণ কে حل Solve করিবার জন্য প্রথমে ছয়টী নিয়ম উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু عمر خيام ওমরখইয়াম ও অন্যান্য কয়েকজন বিজ্ঞ লোকের উর্ব্বর মস্তিষ্ক পরিচালনায়, তাহা বিংশতির সংখ্যা এড়াইয়া উঠে। দেখুন এবে্ন খালদুন লিখিয়াছেন—

" আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, পুর্ব্বদিগের (গ্রন্থকারের স্পেনে বাড়ী ছিল) কতক শিক্ষিত মহাত্মা বীজগণিতের ছয় নিয়মের স্থলে বিংশতির অধিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। এবং সকল গুলিকেই জ্যামিতিক প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

المعاملات আল-মোয়ামেলাত। ইহা অনেকাংশে শুভঙ্করীর মত বা পাটীগণিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে বহু দৃষ্টান্ত সহ, সহজে মনে রাখা যায়, এইরূপ ভাবে গণিতের যাবতীয় বিষয়গুলি একত্রে লিখিত হইয়াছে। معاملات الزهراوى মোয়ামেলাতোজ জাহরাবী, معاملات ابن السمح মোয়ামেলাতে এবেনাস সাম্‌হ ও معاملات ابى مسلم মোওয়ামেলাতে আবি-মোসলেম এ বিষয়ের আদর্শ পুস্তক।

خلاصة الحساب 'খোলাসা তোল্ হেসাব' নামক একখানি গণিতের পুস্তক এ সময়ে আমার সম্মুখে রহিয়াছে। পাঠকদিগকে ইহার সংক্ষিপ্ত সূচি-পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা দৃষ্টে পুস্তকখানি কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

১ম অধ্যায়	অমিশ্র অঙ্ক।	২য় অধ্যায়	মিশ্র অঙ্ক।
৩য় "	ত্রৈরাশিক।	৪র্থ "	দুই ভুলের দ্বারা অঙ্কের ফল নির্ণয় করা।
৫ম "	কি উপায়ে অঙ্ক করিতে হয়।	৬ষ্ঠ "	জরিপ করা।

৭ম অধ্যায় নহর ও কূপ খনন, ৮ম „ বীজ গণিত।
নদীর প্রস্ততা, কূপের গভীরতা,
পর্ব্বতের উচ্চতা ইত্যাদি নিরূপণ করা।
৯ম ও ১০ম অধ্যায়, বিবিধ নিয়ম সকল।

প্রশ্নের উত্তরে যে কোনও একটী সংখ্যা ধরিয়া লইতে হইবে। (তাহার নাম المفروض الاول আল-মফ্রূজোল আউওয়াল) এবং সেই ফলের দ্বারা আঁক কষিয়া যদি ভুল হয়, তবে যত ভুল হইবে তাহার নাম الخطاء الاول "আলখাতাওল-আউওয়াল"। পুনরায় অপর একটী ফল ধরিয়া লইয়া (তাহার নাম المفروض الثانی আল মফ্রূজোস্সানী) আঁক কসিলে যদি ভুল হয় তাহার নাম الخطاء الثانی "আল খাতাওস্ সানী।" পরে "আল মফ্রূজোল আউওয়াল" কে, "আল্ খাতাওস্সানী"তে, ও "আল্ মফ্রূজোস্সানীকে" "আল খাতাওল্আউওালে" পূরণ দিয়া, পূরণ ফলদ্বয়কে যথাক্রমে المحفوظ الاول "আল মহফুজোল আউওয়াল" ও المحفوظ الثانی "আল-মহজোস্সানী" বলিয়া নাম রাখিবে। যদি দুইটী ভুলই প্রকৃত ফল হইতে বেশি বা কম হয়, তবে উভয় 'মহফুজের' বিয়োগ ফলকে উভয় 'খাতার' বিয়োগ ফল দ্বারা ভাগ করিতে হইবে, এবং যদি দুইটী ভুলের একটী প্রকৃত ফল হইতে কম ও অপরটী বেশি হয়, তবে উভয় "মহফুজের" যোগ ফলকে উভয় "খাতার" যোগ ফল দ্বারা ভাগ করিতে হইবে।

যথা, কোন্ সংখ্যার সহিত তাহার $\frac{২}{৩}$ ও এক যোগ করিলে ১০ হইবে ?

'আল মফ্রূজোল আউওয়াল' ৯ ধরিয়া লইলাম। তাহার $\frac{২}{৩}$ ও ১ একুনে ৭, ৭+৯=১৬, ১৬-১০=৬ এস্থলে ৬ "আল্ খাতাওল্ আউওয়াল" বেশি ভুল। পুনরায় "আলমফ্রূজোসসানী" ৬ ধরিয়া লইলে, তাহার $\frac{২}{৩}$ ও ১ একুনে ৫, ৫+৬=১১, ১১-১০=১ এস্থলে ১ "আল খাতাওস্ সানী" বেশি ভুল। ৯×১=৯ "আলমহফুজোল আউওরাল" ও ৬×৬=৩৬ "আল- মহ-*ফুজোস্সানী"। দুই ভুলই বেশি বলিয়া ৩৬—৯=২৭ কে ৬-১=৫ দ্বারা ভাগ করিতে* হইবে। ২৭÷৫=৫$\frac{২}{৫}$ ইহাই উত্তর।

কোন্ সংখ্যার সহিত তাহার $\frac{১}{৪}$ যোগ করতঃ পুনরায় তাহার সহিত যোগ ফলের $\frac{৩}{৫}$ যোগ *করিয়া, যোগ ফল হইতে ৫ বিয়োগ করিলে পূর্ব্ব সংখ্যাই হইবে ?*

আল মফ্রূজোল আউওয়াল ৪ হইলে, তাহার $\frac{১}{৪}$ এক হইবে। ৪+১=৫, পাঁচের $\frac{৩}{৫}$ তিন ৫+৩=৮ আট হইতে পাঁচ বিয়োগ করিলে ৩ থাকে। ৪-৩=১ ইহাই কম "আল খাতাওল্ আউওয়াল।" পুনরায় "আল্ মফ্রূজোস্সানী" ৮ ধরিয়া লইলে ৮+২=১০, ১০+৬=১৬, ১৬-৫=১১, ১১-৮=৩ ইহাই বেশি "আল্ খাতাওস্সানী"। ৪×৩=১২ "আল্মহফুজোল সানী।" দুইটী ভুলের একটী বেশি ও অপরটী কম ভুর্ল বলিয়া ৮+১২=২০ কে ১+৩=৪ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। ২০÷৪=৫ ইহাই উত্তর।

ইহা ছাড়াও আরও কতকগুলি এমন সুন্দর সুন্দর নিয়ম এই পুস্তকে লিখিত আছে যে, আধুনিক অন্য কোন পুস্তকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূরণ না করিয়া সুধু ফল লিখিয়া যাইবার প্রণালীও তাঁহাদের অন্যতম আবিষ্কার।

علم هندسة Geometry জ্যামিতি। আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলিফা আবিজাফর আল মনসুরের সময়ে, গ্রীকদিগের জ্যামিতির পুস্তকের আরবীতে অনুবাদ করা হয়। এই সময় হইতেই মুসলমানগণ জ্যামিতিতে মনোনিবেশ করেন। نصیرالدین طوسی নসির উদ্দিন-তুসী লিখিত تحریر اقلیدس "তাহরিরে উক্লিদস" বিশেষ প্রসিদ্ধ। এবং এজিদী, জওহরী, আবুল হাফস আল হারেস, আবুল ওফা, আবুল কাসেম আহমদ, আবু ইউসফ, ও অনেকেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি করেন।

লোক মুখে শুনিতে পাই যে, জ্যামিতি মোট ১২ খণ্ড। কিন্তু তিহারান হইতে নসির উদ্দিন তুসী লিখিত যে "তাহরিরে উকলিদস্" আমরা আনাইয়াছি তাহা ১৫ খণ্ড। তাহাতে সর্ব্ব সমেত ৪৬৮টী প্রতিজ্ঞা আছে।

১ম	খণ্ডে	৪৮	প্রতিজ্ঞা,	২য়	খণ্ডে	১৪,	৩য়	খণ্ডে	৩৬
৪র্থ	"	১৬	"	৫ম	"	২৫,	৬ষ্ঠ	"	৩৩
৭ম	"	৩৯	"	৮ম	"	২৭,	৯ম	"	৩৮
১০ম	"	১০৯	"	১১শ	"	৪১,	১২শ	"	১৫
১৩শ	"	২১	"	১৪শ	"	১০,	১৫শ	"	৬

মূল اقلیدس (উকলিদস্) জ্যামিতির উপরে নসির উদ্দিন তুসী যে নোট লিখিয়াছেন তাহা অতি মূল্যবান। আজ কালের সমস্ত নোটই তাহা হইতে গৃহীত। এই পুস্তক রোম, লণ্ডন এবং ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত হইয়াছে।

مختصر اقلیدس (মোখ্‌তাসারে উকলিদস্) সংক্ষিপ্ত জ্যামিতি। আজ কাল যেরূপ জ্যামিতির পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন করা হইয়াছে, সেইরূপ মুসলমানেরাও সহজে সমস্ত জ্যামিতি আয়ত্ত করিবার জন্য, তাহাকে নূতনভাবে, নূতন ছাঁচে সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিলে সহজেই সম্পূর্ণ জ্যামিতিতে বুৎপত্তি লাভ হয়। এই বিষয়ে ابن الصلت এব্নোস্‌সাল্‌ত কৃত کتاب الاقتصار "কেতাবোল এক্‌তেসার" বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

الاشكال الكرية (আলআশকালোল কুররিয়া) বৃত্ত সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞা সকল। প্রাচীন খগোল-শাস্ত্রে (Astronomy) যেরূপ কাল্পনিক বৃত্ত ব্যবহারের বাহুল্য দেখা যায়, আধুনিক খগোল-শাস্ত্রে সেরূপ নাই। সেই সমস্ত বৃত্তগুলির বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ এই বিভাগে লিখিত হইয়াছে।

الاشكال المخروطات (আলআশকালোল মখরূতাত) ইহাকে কতকটা Mechanics বলিয়া নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে, বাড়ী ঘর নির্ম্মাণে, সূত্রধরের কাজে, মূর্ত্তিগঠনে, ভারবস্তু এক স্থান হইতে স্থানান্তর করনে, (ও ইত্যাদিতে) যে সকল জ্যামিতিক কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এই বিষয়ে بنی شاکر বানীশাকেরের লিখিত الحیل العملیة "আল হিয়ালোল আমলিয়া" নামক পুস্তক প্রসিদ্ধ।

المناظر والمرايا (আল মানাজের ওয়াল মারায়া) দৃষ্টি-বিজ্ঞান। ইহাতে দৃষ্টি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্যামিতিক প্রমাণগুলির উল্লেখ আছে। ابن الهیثم এব্নোল হায়সামের পুস্তকই এ বিষয়ে অগ্রগণ্য।

المساحة (আলমাসাহাত) সার্ভে। এই বিভাগে জরিপ করা, নহর খনন, উচ্চতানিরূপণ ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। নহর খনন কার্য্যে মুসলমানগণ কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের কৃত "নহরে জোবেদাই" জলন্ত সাক্ষী। এবং সার্ভ বিভাগে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রকার ত্রিভূজের, বীজগণিতের সাহায্য ব্যতীত সহজে দৈর্ঘ্য নিরূপণের নিয়ম একটী আশ্চর্য্য বস্তু। এই বিভাগে অসংখ্য পুস্তক রচিত হইয়াছে।

علم مثلث (এল্‌মে মোসল্লস্‌) ত্রিভূজ বিদ্যা। (Trigonometry) সমকোণ ত্রিভূজের যে কোন দুই বাহুর পরিমাণ জানা থাকিলে, অপর বাহুর পরিমাণ জ্যামিতির দ্বারা সহজেই নিরূপণ করা যাইতে পারে। এইরূপ আরও কতকগুলি ত্রিভূজের অজ্ঞাত বাহুর পরিমাণ নির্ণয় করিবার নিয়মও জ্যামিতিতে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু ত্রিভূজের কোণ ও বাহুর পরিমাণ জানা থাকিলে তদ্দ্বারা অজ্ঞাত বাহু বা কোণের পরিমাণ নিরূপণ করিবার উপায় জ্যামিতি কর্ত্তৃক নিদৃষ্ট হয় নাই। তাহা এই علم مثلث Trigonometryর সাহায্যে বাহির করা হইয়া থাকে। আজকাল যে ' লগারিথম টেবিলের ' বই দেখিয়া প্রথমে লগারিথম ঠিক করিয়া, পরে Trigonometyর সাহায্যে আঁক কসিবার নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা পণ্ডিত-প্রবর নসিরউদ্দিন তুসীরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই নিয়ম ছাড়া প্রাচীন পুস্তকে আরও একটী নিয়ম দেখা যায়। তাহাতে একটী নির্দ্দিষ্ট বাহুর অনুপাতে, কি পরিমাণের কোণে সম্মুখস্থ বাহুর পরিমাণ কত হইবে, তাহার একটী টেবিল প্রদত্ত হইয়াছে। সেই টেবিল (তালিকা) দৃষ্টে সহজেই বিনা পরিশ্রমে ফল নিরূপণ করা যাইতে পারে। শুধু এক ত্রৈরাশিক জানিলেই হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই নিয়মটী আদৌ কগতে প্রচলিত হয় নাই। এবং এ পর্য্যন্ত এই আবিষ্কারের যুগে কাহারও মস্তিষ্ক এদিগে পরিচালিত হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত গণিতের আরও কতকগুলি শাখা প্রশাখা আছে। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহাদের অবতারণা করা গেল না।

মোটের উপরে কথা এই যে মুসলমানগণ গণিত-শাস্ত্রে অপর কোন জাতির নিকট ঋণী থাকুন বা নাথাকুন, কিন্তু আধুনিক সমস্ত জাতিই যে গণিত-শাস্ত্রে মুসলমানদিগের নিকটে ন্যূনাধিক ঋণী একথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, আমরাই জগতের গুরু ছিলাম বলিয়া মনে মনে গৌরান্বিত হইলে কোনই ফল হইবে না। তাঁহারা যেরূপ জগতের শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন, জ্ঞানহীনকে জ্ঞানদান করিয়া অতুল যশের অধিকারী হইয়াছেন, নূতন নূতন বিষয় নূতন নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছেন, আমরাও তাঁহাদের মত হইব বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। এবং এক মনে, স্থির চিত্তে প্রতিজ্ঞা সাধনের জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আবু এহিয়া, মহাম্মাদ আবদুল জাব্বার,

রোকনী—সিরাজগঞ্জী।

মোস্তফা-চরিতালোচনা।

(৩)

আত্মরক্ষার যুদ্ধ।

(১) বদর-যুদ্ধ ঃ—বদর-যুদ্ধের সূচনা এই যে, মক্কার একদল সওদাগর সিরিয়া দেশ হইতে বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহারা মদিনার নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদের দলপতি আবু সুফিয়ান মুসলমানগণের দ্বারা লুণ্ঠিত হইবার অমূলক ভয়ে, মক্কার কোরেশ-কুল-নায়ক আবু জাহ্‌লের নিকট কতকগুলি সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। আবু-জাহ্‌ল এসলামের প্রধান শত্রু, আবু সুফিয়ানের সৈন্য প্রার্থনার সুযোগে মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে মক্কার ঘরে ঘরে এস্‌লামের অপযশ কীর্ত্তন করিয়া অনতি বিলম্বে একদল সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করিল এবং আবু সুফিয়ানের সহায়তা জন্য সসৈন্যে মক্কা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

এদিকে আবু সুফিয়ান বণিক দল লইয়া অন্য পথে নির্ব্বিঘ্নে মক্কায় পঁহুছিয়া আবুজেহেলকে ফিরিয়া যাইবার জন্য পত্র দিলেন। কিন্তু আবুজেহেল মদিনা আক্রমণ করতঃ তথাকার অল্পসংখ্যক মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস না করিয়া বাড়ী ফিরিবে না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিল এবং মদিনার দিকে ক্রমেঅগ্রসর হইতে লাগিল। আবুসুফিয়ানের পত্রানুসারে মক্কায় ফিরিয়া গেলে, আর কোরেশ ও মুসলমানগণের মধ্যে যুদ্ধ বাধিত না; কিন্তু কোরেশ-কুলপতি আবু জেহেল সে পত্রকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বিনা কারণে প্রথমেই মদিনাআক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। আবু সুফিয়ান ঐ সংবাদ অবগত হইয়া, কোরেশ সৈন্যের সাহায্যকারীরূপে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া পথিমধ্যে আবুজেহেলের সঙ্গে যোগ দিলেন। কোরেশের সৈন্য সংখ্যা ৯৫০ জনে দাড়াইল।

হজরত মোহাম্মদ(সঃ) কোরেশদিগের অভিযান ব্যাপার অবগত হইয়া যাহাতে মদিনা আক্রান্ত ও অবরোধ হইতে না পায়, তজ্জন্য ৭৭ জন মহাজের ও ২৩৬ জন আন্‌সার, মোট ৩১৩ জন বীরপুরুষ লইয়া পথিমধ্যে কোরেশ সৈন্যদিগকে বাধা দিবার নিমিত্ত মদিনার বাহির হইলেন। দ্বিতীয় হিজরীর ১৬ই রমজান দিবাগত রাত্রে মুসলমানগণ 'বদর' নামক মরুময় প্রান্তরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

মুসলমানেরা এক সপ্তাহের অধিক কাল মদিনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। মরুময় পথে তাঁহারা উপযুক্তরূপ পানীয় জল পান নাই, বদর প্রান্তরের কূপ ও নির্ঝরিণীর শীতল-সলিলে তৃষ্ণা নিবারণ ও অবগাহনাদি করিয়া পথ-শ্রান্তি দূর করিবেন, মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলেন, কোরেশরা পূর্ব্ব হইতেই কূপ ও নির্ঝরিণীগুলি দখল করিয়া

মুসলমানদিগের সোজা পথে কাঁটাবন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। একে সে প্রান্তর বালুকা রাশিতে আচ্ছন্ন—পা দিলে হাঁটু পর্য্যন্ত গাড়িয়া যায়, তাহার উপর জলাভাব! উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় মুসলমানেরা যুদ্ধ করিবেন কিরূপে? তাঁহাদের নিকট যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম ছিল না বলিলেও চলে, মাত্র ৩টী ঘোড়া—আর ৭০টী উট। হজরত মোহাম্মদ ভাবিয়া আকুল হইলেন! কিন্তু খোদা যাঁহার সহায়, তাঁহার আর চিন্তা কি?—অকস্মাৎ আকাশমণ্ডল ঘনমেঘ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ও অবিরল ধারায় বৃষ্টি হইতে লাগিল! মুসলমানেরা সেই বৃষ্টিজলে স্নান করিয়া এবং পানোপযোগী জল সংগ্রহ করিয়া পরম পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হইলেন।

প্রভাতে প্রথমেই কোরেশ সৈন্য রণপ্রান্তরে উপস্থিত হইল। তখন হজরত মোহাম্মদ, মোসলেম বীরবৃন্দকে শত্রুসৈন্যের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপিত করিয়া উপদেশস্থলে বলিলেন, "যতক্ষণ কোরেশ সৈন্য তোমাদিগকে আক্রমণ না করিবে, ততক্ষণ তোমরা স্ব স্ব স্থানে অচলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। অগ্রে তাহাদিগকে আক্রমণ করিও না।" ইত্যবকাশে কোরেশ পক্ষে রাবিয়ার পুত্র ওৎবা; আপন ভ্রাতা শয়বা ও পুত্র ওলিদকে লইয়া মুসলমানের দিকে অগ্রসর হইল এবং মুসলমানদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। তৎক্ষণাৎ মুসলমান পক্ষে আন্‌সার দলের তিনজন বিশ্বাসী বীরপুরুষ শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাহির হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ওৎবা গর্ব্বভরে বলিয়া উঠিল, মদিনার কৃষকদিগের সহিত আমরা যুদ্ধ করিব না; ইচ্ছা হয়, মোসলেম কোরেশেরা আমাদের বল পরীক্ষা করুক।" অগত্যা আনসারেরা ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের স্থলে হজরত হামজা, হজরত আলি এবং হজরত ওবায়দা * রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। কোরেশত্রয় প্রথমেই মোস্‌লেমত্রয়ের উপর অস্ত্রাঘাত করিল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে শেরে-খোদা † হজরত আলি, তরবারি প্রহারে ওলিদকে দুইখণ্ড করিয়া ফেলিলেন; হজরত হামজার ভীম পরাক্রমে ওৎবার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিল। হজরত আবু-ওবায়দা আহত হইয়াও শয়বাকে যমালয়ে পাঠাইলেন।

বীরত্রয়ের পতনে কোরেশ সৈন্যগণ রোষে ক্ষোভে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সকলে একত্রে একেবারে মোসলেম বীরবৃন্দের উপর আক্রমণ করিল। মোসলেম বীরগণও—তাঁহাদের নেতা ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে অস্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন। কোরেশ সৈন্য নিমিষে নিমিষে ভূপতিত হইতে লাগিল। কোরেশ-কুলনেতা আবুজেহেল, মোসলেম বীর মাউজের হস্তে অন্তকপুরে প্রস্থিত হইল; তৎসঙ্গে ৭০ জন খ্যাতনামা কোরেশ সরদারের মুণ্ডও ধূলিরক্তে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ঐ সরদারগণের মধ্যে কয়েকজনকে একা হজরত আলিই ভূপতিত করিয়াছিলেন। হোশ্‌চামের পুত্র আশ, হজরত ওমরের মাতুল

---

* এই হজরত ওবায়দা, আবদুল মতলেবের পৌত্র এবং হারেসের পুত্র ছিলেন।

† শেরে-খোদা মানে ঈশ্বরের ব্যাঘ্র। উহা—হজরত আলির অন্যতম উপাধি ছিল। এই যুদ্ধের সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর মাত্র ছিল।

ছিল, হজরত ওমর স্বহস্তে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। মোসলেম বীরবৃন্দের তাদৃশ রণপিপাসা ও শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া—অল্পক্ষণেই কোরেশদল রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মুসলমানেরা পলায়িত কোরাশদিগের ৭০ জনকে বন্দী করিলেন এবং তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলি কুড়াইয়া লইলেন। (২য় হিজরী ১৭ই রমজান—৬২৩ খৃষ্টাব্দ।)

আহত ও বন্দীকৃত কোরেশদিগের মধ্যে হারেছের পুত্র নসর ও আবি মুইতের পুত্র আকবা, এই দুইজন ইসলাম ধর্ম্মের প্রধান শত্রু থাকায় মুসলমানেরা কেবলমাত্র ঐ দুইজনকেই বধ করিলেন। অবশিষ্ট বন্দীদিগকে উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া এবং নিজেরা পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া—যত্ন পূর্ব্বক বন্দীদিগকে শিবিরে লইয়া গেলেন। আপনারা শুষ্ক খর্জ্জুর ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন ও বন্দীদিগকে উপাদেয় ভক্ষ্য ভক্ষণ করাইলেন। বন্দীগণ মুসলমানের যত্নে ও আদরে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। বন্দীগণের প্রতি মুসলমানগণের এই সদ্ব্যবহারের বিষয় ইউরোপীয় লেখক সার ইউলিয়ম মেওর সাহেবও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। *

হজরত মোহাম্মদ সেনা সমস্ত লইয়া তিনদিন বদর প্রান্তরে অবস্থিতি করিলেন। ইত্যবসরে যে ১৪ জন মুসলমান, যুদ্ধে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শব সমাধিস্থ করা হইল। রণস্থলে পতিত, আবুজেহেল, ওৎবা, শয়বা এবং আবুসুফিয়ানের পুত্র হেন্‌জেলা প্রভৃতি কোরেশদিগের মৃতদেহ, হজরত মোহাম্মদের আদেশে গর্ত্ত মধ্যে পুঁতিয়া ফেলা হইল।

অতঃপর হজরত মোহাম্মদ মদিনাভিমুখে ফিরিয়া যাইবার কালে, পথিমধ্যে "ওয়াদিয়ে সফরা" নামক প্রান্তরে শিবির নিবেশিত করিয়া বদরক্ষেত্রের লুণ্ঠনপ্রাপ্ত দ্রব্যজাত সমস্ত সৈন্যের মধ্যে সমানাংশে বিভাগ করিয়া দিলেন এবং ঐ বিভক্ত দ্রব্যের একটিমাত্র অংশ নিজে লইলেন।—নিজে পয়গাম্বর ও নেতা বলিয়া কণামাত্র অধিক অংশ লইলেন না। ধৃত কোরেশ গণ তখনও বন্দীভাবেই ছিল ; তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়াই লইয়া যাওয়া হইবে কি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, তাহার মীমাংসা হওয়া উচিত বোধে হজরত মোহাম্মদ সমবেত সভ্য মধ্যে ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। হজরত ওমর এবং হজরত সাদ (সাদ বেন্ মাজ), বন্দী কোরেশ-দিগের প্রাণবধের যুক্তি দিলেন। কিন্তু ধীর বুদ্ধি হজরত আবু বকর, বন্দীদিগের প্রতি-মূল্য স্বরূপ অর্থ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। হজরত মোহাম্মদ, জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠ হজরত আবুবকরের যুক্তিই গ্রহণ করিলেন ও কিছু কিছু অর্থ লইয়া কোরেশ বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

মুসলমানগণের ঐ বদর-বিজয়বার্ত্তা আরবের চারিদিকে বায়ুবেগে প্রচারিত হইয়া পড়িলে, এস্‌লাম ধর্ম্মের শত্রুবর্গ ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ মদিনার অধিবাসী যে সকল ইহুদী, বদর যুদ্ধে মুসলমানের ধ্বংস কামনা করিতেছিল ও ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের সূচনা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা ঐ বিজয়-বার্ত্তায় মর্ম্মাহত হইয়া প্রকাশ্যে মুসলমানের বিরুদ্ধে

* Life of Mohammad Val III Page 122.

খড়্গ ধারণে প্রস্তত হইল। এই ইহুদি-বিদ্রোহ বা বিভ্রাটের কথা বিদ্রোহদমন পরিচ্ছেদে বলা হইবে।

(২) ছাতুর অভিযান।—বদর যুদ্ধের পর তিন মাস কাল গত না হইতেই মুসলমান ধ্বংসের জন্য মক্কার কোরেশকুলে আবার রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। বদর যুদ্ধে আবু-সুফিয়ানের পুত্র হেন্‌জেলার পতন হইয়াছিল। তিনি সে শোক তখনও ভুলিতে পারেন নাই—নিজে আহত হইয়াছিলেন, সে দাগও মিটে নাই। তিনি শোকে ক্ষোভে ও আক্ষেপে মক্কার ঘরে ঘরে বদরযুদ্ধে পতিত কোরেশদিগের শোকগীতি গাহিয়া সমস্ত অধিবাসীকে বিচলিত ও মুসলমানের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত করিয়া তুলিলেন। অবিলম্বে ২০০ শত সৈন্য সমবেত হইল—আবুসুফিয়ান, আবুজাহলের স্থলে, কোরেশের সরদার মনোনীত হইলেন। অতএব ঐ নবদলপতি আবুসুফিয়ান ২০০ শত সৈন্যের সেনাপতি হইয়া অতি গোপনে ক্ষিপ্রগতিতে মদিনার দিকে চলিলেন। মুসলমানদিগকে এ অভিযানের কোন সংবাদ জানিতে দেওয়া হইল না।

আবুসুফিয়ান বদরযুদ্ধে মোস্‌লেমগণের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন; ৯৫০ জন কোরেশ সৈন্য, ৩১৩ জন মুসলমানের হাতে যেরূপভাবে পরাজিত ও পলায়িত হইয়াছিল, তাহা তিনি ভুলিয়া যান নাই। কাজেই কেবলমাত্র ২০০ শত সৈন্য লইয়া মদিনা আক্রমণ করিয়া, নিদ্রিত ব্যাঘ্রদিগকে জাগাইয়া দেওয়া ও তাহাদের গ্রাসে পতিত হওয়া, তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তিনি মদিনার তিন মাইল দূরবর্ত্তী "আরিজ" নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন। কিন্তু সেখান হইতে মদিনার দিকে একপদও অগ্রসর হইবার তাঁহার সাহস হইল না। যেমন বদর-যুদ্ধের কথা মনে হইতে লাগিল, তেমনি দুরুদুরু করিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু মদিনার নিকটে গিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চুপে চুপে মক্কায় ফিরিয়া গেলে, তাঁহার সেনাপতিত্বে কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হইবে, তাঁহার কাপুরুষতার জন্য সমগ্র আরব হাসিবে, চারিদিক্ হইতে নিন্দা ও অপমানজনক করতালি পড়িবে—মক্কায় মুখ দেখান ভার হইবে। অতএব মুসলমান-দিগের কোন না কোন অনিষ্ট করাই কর্ত্তব্য ভাবিয়া, মুসলমানদিগের অধিকৃত কতকগুলি উদ্যানে অগ্নি সংযোগ করিলেন ও দুইজন নিরস্ত্র মুসলমানের প্রাণবধ করিয়া ফেলিলেন।

আবু সুফিয়ানের ঐ অত্যাচার সংবাদ ঝটিতি মদিনায় পঁহুছিল এবং তৎক্ষণাৎ হজরত মোহাম্মদ দুইশত মোসলেম বীর লইয়া তীব্র গতিতে আরিজে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আবুসুফিয়ান সদলবলে মক্কা পথে প্রধাবিত; কিন্তু রসদবাহী জন্তুগুলি লইয়া বড়ই বিপন্ন ও বিব্রত। সে জন্তুগুলি ত আর রসদ লইয়া অশ্বারোহীদের সঙ্গে ছুটিতে পারে না। সেনাপতি যদি ঐ জন্তুগুলির মমতা ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সৈন্যগণকে হয় ইস্‌লাম বীর বৃন্দের অসিমুখে পতিত হইতে হয়, না হয় বন্দী হইতে হয়। আর জন্তুগুলি ত্যাগ করিয়া গেলে, সেগুলি মুসলমানের কর-কবলিত হয়। অতএব জন্তুগুলির পৃষ্ঠ হইতে রসদস্বরূপ ছাতুর বস্তাগুলি ফেলিয়া, তাহাদিগকে হাঁকাইয়া লইয়া কোরেশকুল প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

মুসলমানেরা অনেক ছুটিয়াও তাহাদের নিকটে পঁহুছিতে পারিলেন না; কেবল ছাতুর বস্তাগুলি, তাঁহাদের হস্তগত হইল। এজন্য এই অভিযান, মুসলমান ইতিহাসে "ছাতুর অভিযান" নামে অভিহিত হইয়াছে। (২য় হিজরী—জেলহেজ্জ মাস—৬২৩ খৃষ্টাব্দ।)

(৩) **ওহদ-যুদ্ধ।**—বদর যুদ্ধের ঠিক এক বৎসর পরেই তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে (৬২৪ খৃঃ অঃ) আবার কোরেশে ও মুসলমানে মদিনার নিকটবর্ত্তী "ওহদ" নামক পর্ব্বতের নিম্নদেশে এক তুমুলযুদ্ধ হইল। কোরেশ পক্ষে এবারেও সেই আবুসুফিয়ান সেনাপতি; তাঁহার পতাকাতলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তিন সহস্র আরবা সৈন্য; এতদ্ব্যতীত দলে দলে আরব রমণী বীরাঙ্গনাবেশে রণপ্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছিল। কোরেশকুলের প্রধান দেবতা 'হবলে'র প্রতিমূর্ত্তিও উটের উপর উঠাইয়া রণক্ষেত্রে আনা হইয়াছিল। আরবের এই সম্মিলিত শক্তি মদিনা আক্রমণ ও মুসলমান উৎখাদনে দেবতার নামে শপথ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছিল।

হজরত মোহাম্মদ—শত্রু সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য মদিনা হইতে ১০০০ হাজার সৈন্য লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু পথি মধ্য হইতে "আবদুল্লাবেন্ আবি" নামক জনৈক পাপমতি মোনাফেক সরদার তিন শত সৈন্য সহ মদিনায় ফিরিয়া গিয়াছিল। * এজন্য রণক্ষেত্রে ৭০০ শতের অধিক মুসলমান সৈন্য উপস্থিত হইতে পারে নাই। ঐ ৭০০ শত সৈন্য লইয়া হজরত মোহাম্মদ, ওহদ পর্ব্বতকে পশ্চাতে এবং আনিন পর্ব্বতকে বামে রাখিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। আনিন পর্ব্বতে এক রন্ধ্র ছিল; যাহাতে কোরেশ সৈন্য অন্য দিক্ হইতে ঐ রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মুসলমানদিগের বামপার্শ্ব বা পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার জন্য ৫০ জন মুসলমান তীরান্দাজ ঐ রন্ধ্র মুখে প্রহরী ছিল।

মদিনায় আউস নামক এক আরব সম্প্রদায়ের বাস ছিল। হজরত মোহাম্মদ মদিনায় গেলে ঐ সম্প্রদায়ের জনৈক জ্যোতিষী আবুআমের, স্বসম্প্রদায়স্থ প্রায় যাবতীয় লোককে লইয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু আবু আমের পরে এস্লামধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মক্কায় গিয়া কোরেশ দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং কোরেশদিগকে মদিনা আক্রমণের উত্তেজনা দিয়া নিজেও সশরীরে ওহদ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছিল।

ওহদের রণপ্রাঙ্গণে ঐ আবু আমেরই সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান সৈন্যের উপর অস্ত্রচালনা করিল। তৎপর পর্য্যায়ক্রমে মহাবীর খালেদ বেন্ অলিদ ও তল্হা প্রমুখ সেনানেতৃগণ প্রচণ্ডবেগে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। হেন্দা—আবুসুফিয়ানের পত্নী—তিনি বীরাঙ্গনাকুলের নেত্রী—তাঁহার পিতা ওৎবা, ভ্রাতা ওলিদ, পুত্র হেনজেলা এবং পিতৃব্য শয়বা, বদরযুদ্ধে মুসলমানের হস্তে নিহত হইয়াছিল। সে শোকে তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া অপরাপর বীর রমণীগণকে সঙ্গে লইয়া রণরঙ্গিনীবেশে এলায়িত কেশে দফ্ বাজাইয়া শোকসমন্বিত বীর্য্যগাথা গাহিয়া

* যাহারা মুখে আপনাদিগকে এস্লামের মিত্র বলে ও মনে শত্রুতা রাখে এবং এস্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁহাদিগকে মোনাফেক বলা হয়।

কোরেশ সৈন্তের চারিদিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। * সেই কোরেশ কামিনী-কুলের কর-কমলের মধুর বাদ্যধ্বনি ও কলকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতরাগ, কোরেশ বীরগণের রণোৎসাহ শতগুণে বাড়াইয়া তুলিল। তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় লম্ফ দিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া চলিল। এদিকে মুসলমান পক্ষে হজরত হামজা, হজরত আলি এবং হজরত জোবের (জোবের বেন্ ওয়াম) প্রমুখ মহাবল পরাক্রান্ত বীর-পুরুষগণ তীর, তরবারি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্ররাজির ক্ষীপ্র সঞ্চালন দ্বারা বিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে হঠাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহারা হতবল ও হতোৎসাহ হইয়া পড়িল এবং মোস্লেম বীরগণের প্রচণ্ডতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। মুসলমানেরা অনেকদূর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়া করিয়া গেলেন; কিন্তু তাহারা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। মুসলমানেরা প্রত্যাগত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে রণক্ষেত্রে পতিত দ্রব্যজাত কুড়াইয়া লইতে লাগিলেন। যে ৫০· জন তীরান্দাজ রন্ধ্রমুখে পাহারা দিতেছিল, যুদ্ধে জয় পরাজয় যাহাই হউক, তাহারা রন্ধ্রমুখ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে না, ইহাই তাঁহাদের প্রতি হজরত মোহাম্মদের আদেশ ছিল। কিন্তু ধনলোভ তাহাদিগকে সে আদেশ ভুলাইয়া দিল; তাহারা রন্ধ্র মুখ ছাড়িয়া লুণ্ঠন কার্য্যে নিরত হইয়া পড়িল।

কোরেশের আবুসুফিয়ান প্রমুখ সরদারগণ স্ব স্ব সম্প্রদায় লইয়া অনেক দূরে পলাইয়াছিল; কিন্তু চতুরচূড়ামণি খালেদ, আপন দলবল সহ পশ্চাতে থাকিয়া পর্ব্বতান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন আনিন পর্ব্বতের রন্ধ্রমুখ জনশূন্য দেখিলেন, তখনই ঝটিতি সসৈন্যে রন্ধ্রের বিপরীত দিক্ দিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে লুণ্ঠন-নিরত মুসলমান সৈন্যের পশ্চাদ্দিক আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে ওমরা (আলকোমার কন্যা ওমরা) নাম্নী এক বীর্য্যবতী কোরেশ কামিনী, কোরেশের যুদ্ধপতাকা উন্নত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। আবুসুফিয়ান দূর হইতে ঐ পতাকা আন্দোলিত হইতে দেখিয়া সসৈন্যে ফিরিয়া আসিলেন। মুসলমানেরা সম্মুখ ও বিমুখ এই উভয় দিক হইতেই কোরেশদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কোরেশের ঐ যুগপৎ আক্রমণে মুসলমানের মধ্যে অনেকে ভীত, চকিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যদিগের উপরে, কোরেশরা অবিরল অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। বীরকুলশিরোমণি হজরত হামজা, এক আবিসিনীয় দাসের হস্তে স্বর্গলাভ করিলেন। + অনেকে আহত হইলেন, ক্রমে কোরেশের

---

* দফ্ একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র; এ দেশের খঞ্জনি ঠিক দফের আকৃতি বিশিষ্ট। তবে দফ্ খঞ্জনি অপেক্ষা বৃহৎ।

* আবুসুফিয়ানের পত্নী হেন্দা, ঐ আবিসিনীয় দাসের মালিক ছিলেন। তিনি ঐ দাসকে আশা দিয়াছিলেন যে, সে যদি হজরত হামজাকে মারিতে পারে, তাহা হইলে তাহার দাসত্ব-বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। দাস ঐ আশায় রণস্থলে এক বৃহৎ প্রান্তরের অন্তরালে থাকিয়া, রণমত্তাবস্থায় হজরত হামজার প্রতি বর্শাঘাত করিয়াছিল।

অধিক সংখ্যক সৈন্তই হজরত মোহাম্মদের দিকে অগ্রসর ও তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। বীরকেশরী হজরত আলি প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিয়া দুই তিনবার তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়াও, অধিকক্ষণ হজরত মোহাম্মদকে নিরাপদ রাখিতে পারিলেন না। কোরেশের সেনাদল ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ক্রমশই তাহারা হজরত মোহাম্মদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। তখন তাঁহার নিকটে ৩০ জনের অধিক শিষ্য ছিলেন না। এই শিষ্যগণ আপনাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পয়গম্বরের চতুর্দ্দিক এমনভাবে বেষ্টন করিলেন যে, শত্রুসৈন্য তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না। যীশুর প্রিয় শিষ্যেরা তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত মোহাম্মদের শিষ্যগণ তাহা করেন নাই বরং তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাপ্লুত হইলেন, তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না।

কোরেশগণ উপর্য্যুপরি আক্রমণ করিয়া হজরত মোহাম্মদের নিকটস্থ কতিপয় শিষ্যকে হত এবং কতিপয়কে আহত ও ভূপতিত করিল। শত্রুসৈন্য ও হজরত মোহাম্মদের মধ্যে আর অধিক দূরত্ব নাই—তাঁহার পবিত্র দেহ শত্রুর পাপ-কর সঞ্চালিত পাপাস্ত্র স্পর্শে আর বিলম্ব নাই—এমন সময়ে "আনিসা" নাম্নী এক বীর রমণী রণমদে মত্ত হইয়া গম্ভীর গর্জ্জনে এস্লাম শত্রুকে আক্রমণ করিলেন—কোরেশ সৈন্য ভীতচিত্তে তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল। * বীরাঙ্গনা আনিসা তৎকালে ঐরূপ বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন না করিলে, নিশ্চয়ই হজরত মোহাম্মদ শত্রুর অস্ত্রাঘাতে আহত হইতেন। কোরেশ সৈন্য, ধর্ম্মগুরুর প্রতি সেই বীরললনার ভক্তি ও তাঁহার রক্ষার্থ আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

অন্যদিকে হজরত মোসায়েব (মোসায়েব বেন্ আমির) মোসলেম পতাকা ধারণ করিয়া মহাতেজে শত্রুর আক্রমণ রোধ ও তাহাদের নিপাত সাধন করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে শত্রুদল তাঁহার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, অস্ত্রাঘাতে তাঁহার দেহ হইতে রুধিরধারা বহিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার আসন্নকাল নিকট হইল। তিনি তখন উচ্চৈঃস্বরে কোরেশ দিগকে বলিলেন—"বিধর্ম্মিগণ! এ যুদ্ধে হজরত মোহাম্মদের স্বর্গলাভ হইলেই যে, তাঁহার প্রচারিত সত্যধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল, তাহা মনে করিও না—এ ধর্ম্ম অনন্তকাল পর্য্যন্ত জগতে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া তাহার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদকে চিরজীবী ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তোমাদের অন্ধ বিশ্বাস চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে।"

মোশায়েব রণশয্যায়-শায়িত হইলে কোরেশদিগের সাহস বাড়িয়া উঠিল। তখন হজরত মোহাম্মদের চতুর্দ্দিকে যে ৩০ জন শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের ১৬ জন হতাহত হইয়া পড়িয়াছেন।

* এই আনিসা—কাবের কন্যা; ইনি রণস্থলেপিপাসার্ত্ত মোসলেমদিগকে জল বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন। বিধর্ম্মীদের অস্ত্রাঘাতে ইহার দেহে ১৩টী জখম হইয়াছিল।

কেবল মাত্র ৭ জন মহাজের ৭ জন আনসার—মোট ১৪ জন তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। * কোরেশের বিপুলবাহিনী তখন ঐ ১৪ জনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, তাঁহাদের সকলেই আহত হইলেন। কিন্তু আহতাবস্থাতেও তাঁহারা এমন প্রচণ্ডভাবে কোরেশদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন যে, তাহারা কোনমতেই হজরত মোহাম্মদের নিকবর্ত্তী হইবার সুযোগ পাইল না। অতএব তাহারা দূর হইতে হজরত মোহাম্মদের প্রতি অবিরল প্রস্তরবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই প্রস্তর তাঁহার ললাটে, মুখমণ্ডলে ও বাহুতে লাগিয়া ক্ষত বিক্ষত করিল—তাঁহার চারিটি দাঁত ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল—ক্ষতস্থান দিয়া শোণিতধারা বহিয়া যাইতে লাগিল; তিনি স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা সেই রুধিরধারা মুছিয়া যাইতে লাগিলেন এবং বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"হে আল্লাহতায়ালা! এই সম্প্রদায় (কোরেশ) অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন; ইহাদের পাপ মার্জ্জনা কর।" † পাঠক দেখুন, শত্রু হস্তে আহত হইয়াও মুসলমান ধর্ম্মগুরু তাহাদিগকে অভিসম্পাত করার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ইতিহাসে কয়টা এমন মহাপুরুষের সহিষ্ণুতা ও বিপদে ধৈর্য্যের প্রমাণ আছে?

অতঃপর ঐ ১৪ জন শিষ্য অবসন্ন হইয়া পড়িলে, এব্‌নে কমিয়া নামক জনৈক কোরেশ সৈন্য ক্ষিপ্রহস্তে উপর্য্যুপরি দুইবার হজরত মোহাম্মদের প্রতি তরবারাঘাত করিল; প্রথমাঘাত তল্‌হা নিজের হাতে ধরিয়া লইলেন; তাঁহার হাত একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল।—দ্বিতীয় আঘাত হজরত মোহাম্মদের কটিদেশে পড়িল—কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় পরিচ্ছদে আবৃত থাকায় সে আঘাত ব্যর্থ হইল। কিন্তু তিনি সেই আঘাতের বলে মুহ্যমান হইয়া অশ্ব হইতে গড়াইয়া এক গর্ত্তমধ্যে পতিত হইলেন। হজরত মোহাম্মদকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কোরেশ বজ্রধ্বনিতে প্রকাশ করিল, "মুসলমান ধর্ম্মগুরুর মৃত্যু হইয়াছে"—মুসলমান জনগণে প্রচারিত হইল—"হজরত মোহাম্মদের মৃত্যু হইয়াছে।" ঐ ভয়াবহ সংবাদ শ্রবণে ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া ঐ ১৪ জন শিষ্য ব্যতীত অপর সমস্ত মুসলমানই দিগদিগন্তে প্রস্থান করিলেন—মুসলমান সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। ‡

(ক্রমশঃ)

আব্দুল্লতিফ।

* হজরত আবুবকর, হজরত আলি, আবদুর রহমান বেন্‌উফ্‌, জোবের বেন্‌তয়াম, সাদবেন্‌ বেকাস, তল্‌হা এবং আবুওবায়দা বেন্‌জেরাহ এই ৭ জন মহাজের ও আবুবেজানা, আসেম, উসিদবেন্‌ হজির, হোবাব বেন্‌ মন্দর, সহল, সাদবেন্‌ মওয়াজ ও হারেস এই ৭ জন আনসার তৎকালে হজরতের নিকটে ছিলেন। (ইতিহাস নাসেখৎ তওয়ারিখ হইতে গৃহীত।)

† কোরাণ শরীফ।

‡ প্রবন্ধের যে সকল স্থানে হজরত মোহাম্মদের নাম লিখিত হইয়াছে। মুসলমান পাঠকবর্গের পক্ষে তাঁহার নাম উচ্চারণ কালীন দরুদ পাঠ করা আবশ্যক। অন্যান্য আছহাবগণের নামের পর আশীর্ব্বাদসূচক বাক্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

مسلمانانِ روس

বা

রুশীয় মুসলমান।

কালচক্রের আবর্ত্তনে, যদিও রুশের এস্লামীয় রাজত্বের অবসান হইয়াছে, কিন্তু রুশের মুসলমান আজও তাহার নিদর্শন স্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের মুসলমানগণের তুলনায় অনেকাংশে উন্নত।

"ক্রিমিয়ার" বিখ্যাত এস্লামিক সংবাদ-পত্র "তরজোমান" (ترجمان) যাহা রুশীয় ও তুর্কী ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহাতে রুশীয় মুসলমানদের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। যথা:—

ইউরোপীয় রুশ।

প্রদেশের নাম।		লোক সংখ্যা	প্রদেশ নাম।		লোক সংখ্যা
হাজী তারখান,	...	৩০৭০০৯০ জন	সামারা,	...	২৫৮০১৩ জন
ইয়ানশিকি,	...	১২৯৫২৮ „	সামারাতুফ,	...	৯৭৩৭৭ „
কাজান,	...	১২৫৮৪৮ „	সিম্ পর,	...	১৩১৮৫৩ „
উরেনবার্গ	...	৩৬২৭৯৯ „	তাওরিদ বা ক্রিমিয়া,		১৯০৫১৪ „
পিন্‌ম,	...	১৪৮৪৬০ „	আওফা,	...	১০৯৮৯২৮ „

এই সমস্ত শহর ব্যতীত "নিজগুর্ত্ত, নিপজা, রাজিয়ান, তাম্বুফ, মস্কো," এবং সেণ্টপিটার্স-বার্গের মুসলমানদের সংখ্যা একত্রিত করিলে সমস্ত ইউরোপীয় রুশীয়ার মুসলমান সংখ্যা ৩৫৫৫৬৩৫ জনে পরিণত হয়।

এশিয়ীও রুশ।

প্রদেশ।		সংখ্যা	প্রদেশ।		সংখ্যা
আক্‌মনলা,	...	৪৩৯৬৬৩ জন	শিরদরিয়া,	...	১৪১৩৪১১ জন
তমকামান,	...	৪৩৪৯৩১ „	তুরগায়,	...	৪১২৮৩৬ „
সমর কান্দ,	...	৮৩৮৬৬৯ „	উরাল	...	৪১২৮৬৯৫ „
ছিমপুলাদ,	...	৬১৬৭৩৯ „	থাকান্দ,	...	১৫৬১৪৭৬ „
এডিল্ল	...	৮৯৩০২০ „			
					৬৯৮৮৬৫০

ককেশীয় প্রদেশ।

প্রদেশ।	সংখ্যা	প্রদেশ।	সংখ্যা
বাকু, ...	৬৭৮৩৫২ জন	সোটায়ারদ পোল, ...	৩৮২৯৫ জন
দাগস্তান, ...	৫৪০৯৬১ ,,	উত্তর ককেশাস, ...	৪৮৬৪৬২ ,,
এলিজাবেথ পোল, ...	৫৫২৮৪৮ ,,	তিফলীশ, ...	১৮৯৬৫৭ ,,
কার্স, ...	১৪৫৭৮১ ,,	আচর মুমুর, ...	৩১১০ ,,
কুবান, ...	১০৩৩১৩ ,,	ইরওয়ান ...	৩৫২৩৫১ ,,
বাটুম, ...	১১৭৬২৭ ,,		
			৩২০৮৮৫৭

সাইবিরিয়া ... ... ১২৬০৮৬ জন

এই তালিকা অনুযায়ী সমস্ত রুশের মুসলমান সংখ্যা ১৩৮৭৯৪৬১ জন। ইহা ব্যতীত বিশ লক্ষ মুসলমান "বোখারায়" এবং ৬৫০০০০ মুসলমান "খিবায়";—রুশ সাম্রাজ্যের অধীনে রহিয়াছেন। এই সমস্ত মিলাইয়া মোট সংখ্যা ১৬ "মিলিয়ন" বা এক কোটি ষাট লক্ষ। কিন্তু মনে রাখিবেন যে, এই সংখ্যা ১৬ বৎসর পূর্ব্বেকার সময়ের। ইহার মধ্যে সরকারী হিসাবে আরও চার "মিলিয়ন" বা ৪০ লক্ষ মুসলমান বেশী হইয়াছে। এই সংখ্যা অনুপাতে মোট ২০ বিশ "মিলিয়ন" মুসলমান বর্ত্তমানে রুশে অবস্থান করিতেছেন। ইহার মধ্যে ১২ "মিলিয়ন" সুন্নী (سنی) ও প্রায় ৬ মিলিয়ন শিয়া (شیعہ) এবং অবশিষ্ট দুই মিলিয়ন অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত।

রুশ সাম্রাজ্যে মুসলমানদের অনেক মাদ্রাসা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে "আপানাইক" (اپانائف) আওবাজী (اوباجی) শমছুদ্দীন (شمس الدین) এবং উলুগমুল (الغ مول) মাদ্রাসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং বাকুতে যে বিশ্ববিদ্যালয় (دارالعلوم) রহিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন বিদ্যার সঙ্গে আধুনিক সময়োপযোগী বিদ্যারও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

রুশিয়ায় মাদ্রাসা ও মসজিদের রীতি মত তত্ত্বাবধান করা হয়। এবং "জাকাত (زکوة) সংগ্রহের ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের অতি সুচারু নিয়ম প্রচলিত আছে।

রুশে চারিখানি শক্তিশালী মুসলমান সংবাদ-পত্র বিদ্যমান, যথা—"তরজোমান (ترجمان) যাহা ক্রিমিয়া" হইতে রুশীয় ও তুর্কী ভাষায় প্রকাশ হয়। "কাজানে মখবেরী" (قزان مخبری) যাহা কাজান হইতে তুর্কী ভাষায় বাহির হয়। "কাছপী" (کاسپی) বাকু হইতে প্রকাশিত হয়। "মশ্‌রেকী রুশ" (مشرقی روس) তিফলিশ হইতে বাহির হয়। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকখানি সংবাদ-পত্র আছে, কিন্তু অনুমান হয় রুশের মুসলমানগণ বিদ্যা চর্চ্চায় ততটা অগ্রসর নহেন। কারণ রুশীয় মুসলমানদের বই পুস্তক বড়বেশী প্রকাশ হয় না।

রুশ-জাপান যুদ্ধের পর হইতে রুশ সম্রাট মুসলমানদিগকে অনেক বিষয় সুবিধাদান করিয়াছেন। এবং মুসলমানরাও নবজীবন লাভ করিয়া উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছেন। নুতন

ধরণে স্কুল, কলেজ, স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহার সঙ্গে এস্‌লামিক শিক্ষার ও "তালিমে-আখলাক" (تعليم اخلاق) বা চরিত্রগঠন বিদ্যা শিখাইবার সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। এই সকল স্কুল, কলেজ, পরিচালনার জন্য শুধু চাঁদার প্রতি নির্ভর না করিয়া, প্রত্যেক স্কুল, কলেজের স্থায়িত্বের জন্য পৃথক পৃথক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া "ওয়াক্‌ফ করিয়া দেওয়া হয়।

ইরানের বিখ্যাত সংবাদ-পত্র "খোলাছাতল হাওয়াদেছ" (خلاصة الحوادث) লিখিয়াছেন যে, রুশের মুসলমানদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক "সুন্নী" সম্প্রদায় ভুক্ত, এবং তাঁহাদের অধিকাংশই "কাজান" ও উরেনবার্গে অবস্থান করেন। "কোহকাফ" (كوه قاف) জেলায় চার লক্ষ শিয়ার বাসস্থান আছে। "দাগস্থানে"—যাহা পূর্ব্বে পারস্যের অধীন ছিল, তাহাতে পাঁচ লক্ষ শিয়ার বাস। "সুন্নী" মুসলমানদের ধর্ম্ম সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা কাজানে যে, "কাজীয়ল কোজাত" (قاضى القضات) বা প্রধান বিচারপতি আছেন, তাঁহার নিকটেই হয়। এই কাজীয়ল্ কোজাত কে রুশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সমস্ত মুসলমান প্রজার জন্য "শেখল এসলাম" (شيخ الاسلام) নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন।

রুশের মুসলমানগণ মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহ তাঁহাদের নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনপ্রকার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেন না। ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় যেমন—বিবাহ, তালাক এবং মিরাছ (ميراث) ইত্যাদির মীমাংসা আদালতে হয় না। এই সমস্ত বিচার কাজী, মুফ্‌তীর নিকটেই হইয়া থাকে। এই সকল কাজী, মুফতী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন।

কাজী, মুফতীর বিচারে যদি কোন পক্ষ সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহারা সরকারী আদালতে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ বিচার উক্ত আদালতে মুসলমান বিচারকের দ্বারা মহাম্মাদীয় শরা অনুযায়ী সম্পাদিত হইয়া থাকে।

রুশের সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিবার জন্য খৃষ্টান প্রজা যেমন বাধ্য, মুসলমান প্রজাও তদ্রূপ বাধ্য। রাজ্ঞী "ক্যাথারাইনের" (Catharine) রাজত্বকালে ছয় "ডিভিসন" মুসলমান সৈন্য ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ইহাদের বীরত্ব ও অসীম সাহস দর্শনে রুশ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। রুশ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডার মুসলমান সৈন্য ছয় ডিভিসনের স্থলে দশ ডিভিসনে পরিণত করেন। রুশ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রতি অনেকটা নির্ভর করেন। বর্ত্তমানে রুশীয় সৈনিক বিভাগে ৪৩ হাজার মুসলমান নিযুক্ত আছে। "কাজানের" মুফতী হাজী মির্জ্জা মহাম্মদ সোলতানের আবেদন অনুসারে যাহাতে সৈন্যদিগকে ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদনে কোনপ্রকার অসুবিধা বোধ করিতে না হয় তজ্জন্য রুশ সম্রাট রাজকীয় ব্যয়ে প্রত্যেক সৈনিক বিভাগে এক একজন এমাম বা ধর্ম্ম যাজক নিযুক্ত করিয়াছেন।

রুশের মুসলমানগণ বড়ই ধর্ম্মানুরাগী এবং জাতীয় সহানুভূতি সম্পন্ন। তাঁহারা কর্ম্মী এবং স্বভাবতঃ খুব পরিশ্রমী। ব্যবসায় বাণিজ্যে তাঁহারা ভারতীয় মুসলমানগণ অপেক্ষা অনেক উন্নত। শরিয়ত অনুযায়ী "বোরকা" পরিয়া তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা হাট বাজারে বেচাকিনী করিয়া

থাকে। কোরাণের শিক্ষা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিবাহ ইত্যাদি উৎসব খুব সাদাসিদে ধরণে সম্পন্ন হয়।

মিসরীয় সংবাদ পত্র "আসশর্কে" (الشرق) একটী প্রবন্ধ প্রকাশ হয়, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময় হইতে দশ বৎসর পূর্ব্বে রুশে বিদ্যা শিক্ষা শুধু ধর্ম্ম বিদ্যা শিক্ষার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং তাহাতেও "হাদিস" "তফসীর" শিক্ষা দেওয়া হইত না। শুধু "ছরফ" (صرف) "নহো" (نحو) ও "ফেকা" (فقه) শিক্ষার প্রচলন ছিল। সাহিত্য চর্চ্চার মোটেই প্রচলন ছিল না। এবং আলেমদের মধ্যে এমন কম সংখ্যক মৌলবী ছিলেন যাঁহারা অনায়াসে আরবীতে কথোপকথন করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে রুশের মুসলমানগণের মধ্যে নব জীবনের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা সময় উপযোগী প্রত্যেক বিদ্যা রীতিমত শিখিতেছেন। কোরআন শরীফ তফ্‌সীর সহ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। "হাদিস," "ওছুলে হাদিস" (اصول حديث) খুব ভালরূপে শিখিতেছেন। ঐস্লামিক ইতিহাস, ভূগোল শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রত্যেক ছাত্রকে বাধ্য করা হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রতি খুবই মনোযোগ দেখা যাইতেছে। এবং আরবী সাহিত্যের এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে, প্রায় প্রত্যেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করেন।

"ককেশাস," ও "ক্রিমিয়া" প্রদেশে ৪৩ লক্ষ 'তাতারী' মুসলমান অবস্থান করেন। প্রথমতঃ ইহাদিগকে অসভ্য এবং যুদ্ধপ্রিয়, প্রান্তর নিবাসী বলিয়া ধারণা করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাদের সম্বন্ধে প্রফেসার "ওয়েমব্রি" সাহেব তাঁহার "তাতারী মুসলমানের জাগরণ" নামক প্রবন্ধে লেখিয়াছেন যে, "বর্ত্তমানে রুশ সাম্রাজ্যে অন্য কোনও সম্প্রদায়, তাতারী মুসলমানদের মত শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী, এবং ধার্ম্মিক নাই। ইহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক ব্যবসায়ী ও শিল্পী বর্ত্তমাম। কেহ কেহ আবার চাকুরী অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের সত্যবাদিতা ও সরল ব্যবহার, এবং প্রতিজ্ঞা পালন অতি প্রশংসনীয়।

এই সমস্ত তাতারী মুসলমানদের ধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাসের জন্যই খৃষ্টান পাদরীগণ শত চেষ্টাতেও ইহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন না। বরং ইহারাই ব্যবসায়ী বেশে, ইউরোপীয় দক্ষিণ রুশে গমন করিয়া তত্রত্য প্রতিমা পূজক অসভ্য তাতারীদিগকে খৃষ্টান পাদরীদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া পবিত্র শান্তিময় এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছে।

আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল, একজন "কারগেজ" (قرغز) নিবাসী তাতারী মুসলমান সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক "সোপেনহরের" এবং ইংরাজ লেখক (আর্ভিং) (Irving) লিখিত হজরত মহাম্মদের (দঃ) জীবন চরিত সম্বন্ধে এক বিস্তৃত সমালোচনা লেখিয়া এবং তৎসঙ্গে এক বিস্তৃত পত্র পার্শি ভাষায় লেখিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি তাহা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, ইউরোপের লিখিত বই পুস্তক ইহাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, এবং ইহারাও এতদূর উপযুক্ত হইয়াছেন যে, এই সমস্ত পুস্তকের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম। এই সমস্ত তাতারী মুসলমানগণ বর্ত্তমানে যথেষ্ট বই পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন।

এবং বর্ত্তমান সভ্যতা ও আচার ব্যবহারে ইহাদিগকে সমলঙ্কৃত দেখিতেছি, ইউরোপীয়গণ যে, এতদিন ইহাদিগকে অলস ভাবিয়াছে তাহা যথার্থ নহে। এখন উঁহারা ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে ”

উপরোক্ত প্রফেসার “ ওয়েমব্রি ” সাহেবের মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাতারী মুসলমানগণ এখন আর সেই পূর্ব্বকালের অসভ্য তাতারী নাই। তাহারা এখন সভ্যতায় ও জ্ঞান বিজ্ঞানে এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে সকল দিক দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। ইহারা তুর্কী ভাষায় ‘ সাইক্লোপিডিয়ার ’ অনুবাদ করিতেছেন॥

বর্ত্তমান সময়ে শেখ এসমাইল লিমৃফ আফেন্দী (شیخ اسمعیل لماوف آفندی) নামক এক মহাত্মা “ ক্রিমিয়া ” প্রদেশস্থ “ বাগচা ছারায় ” (باغچه سرای) নামক শহরে মুসলমান শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য এক উন্নত ধরণের “ ট্রেইনিং ” মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছেন। এই মাদ্রাসায় আরবী শিক্ষার সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা এই মাদ্রাসা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইবেন, তাঁহারা সমাজের আদর্শ ব্যক্তি স্বরূপ হইবেন। এই মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছেন।

রুশীয় মুসলমান ভ্রাতারা ; ভারতীয় মুসলমানদের মত “জাকাতের” অর্থ নানারূপ সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। এই জাকাত সংগ্রহের জন্য এক কমিটি আছে। সেই কমিটির নিযুক্ত ব্যক্তিরা জাকাত সংগ্রহ করেন। এবং যাহারা জাকাত-মাল গ্রহণের উপযুক্ত যেমন—গরিব অনাথ, আতুর, ইত্যাদি ; তাহাদিগকে এই কমিটির সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করিতে হয়। দরখাস্ত অনুসারে সেক্রেটারী প্রার্থীদিগকে জাকাতের মাল বিতরণ করেন।

এক সময়ে যখন রুশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান প্রজাদের উপর অত্যাচার এবং তাহাদের ধর্ম্মের স্বাধীনতার প্রতি আঘাত করিতেছিলেন, সেই সময় অনন্যোপায় হইয়া ৮৷১০ লক্ষ মুসলমান তাঁহাদের মাতৃভূমি রুশরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ওসমানীয় গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে হেজরত (هجرت) করিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপ হেজরতের জের বহুদিন যাবৎ চলিতেছিল। হঠাৎ এমন সময় রুশ জাপান যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সেই সময় রুশের সমস্ত প্রজার মধ্যে রাজবিদ্বেষের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। স্থানে স্থানে প্রজারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে ছিল। কিন্তু এই সমস্ত কাজ মূলতঃ খৃষ্টান প্রজার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমান প্রজা এই কার্য্য হইতে পৃথক ছিল। এবং তাহারা সাধ্যমত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও এই সমস্ত মুসলমান প্রজার উপর অত্যাচারের মাত্রা কমিয়াছিল না। এইরূপ অত্যাচারে যখন তাঁহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন, সেই সময় সমস্ত মুসলমান মিলিয়া রুশ সম্রাট জারের নিকট তাঁহাদের ধর্ম্মের স্বাধীনতা ও তাহাদের পূর্ব্ব স্বত্বাধিত্বের ; যাহা পূর্ব্বে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাহার পুনঃপ্রাপ্তির দাবী করিয়া এক আবেদনপত্র পেশ করেন। আবেদনপত্র পাইয়া রুশ সম্রাট সর্ব্বসাধারণ রুশ প্রজার মত

ইহাদিগকে ধর্ম্ম কার্য্যে স্বাধীনতা ও ন্যায্য প্রাপ্য বিষয়ে সমান অধিকার দান করেন। কারণ যুদ্ধের সময় এই সমস্ত মুসলমান প্রজা খৃষ্টান প্রজাদের মত দেশে বিদ্বেষ-অগ্নি প্রজ্জলিত করেন নাই। এবং রাজপ্রাসাদ "ডিনামাইট" দ্বারা উড়াইবার চেষ্টাও করেন নাই। বরং ইঁহারা সাধ্যমত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন।

রুশ সম্রাট মুসলমানদের আবেদন পত্রের উত্তরে যে রাজকীয় আদেশ প্রচার করেন তাহার ৬, ৭, দফায় ইহাও লেখা রহিয়াছে যে, "রাজ্যে একটী কমিটি গঠন করিয়া রুশীয় মুসলমানদের" হেজরত বা রাজ্য ত্যাগ করার কারণ অনুসন্ধান করিয়া, ইঁহাদের রাজ্য ত্যাগের কারণ দূর করতঃ সকল বিষয়ে ইহাদিগকে অন্যান্য খৃষ্টান প্রজার ন্যায় সুবিধা ও স্বত্ব দেওয়া হউক।"

অতপর হইতে রুশীয় মুসলমানগণ একপ্রকার সুখেই বসবাস করিতেছেন।

আবুল ফয়েজ মহাম্মদ নুরউদ্দীন
রোকনী—সিরাজগঞ্জী।

"কোথা পাব তারে?"

১

কোথা পাব তারে?
আমার—প্রাণ যারে চায়,
আমি—কোথা পাব তারে?
আমি—খুজেছি বাইবেলে, খুজেছি পুরাণে
খুজেছি তৌরিতে, খুজেছি কোরাণে
খুজিয়াছি বেদে
খুজেছি জব্বুরে!
আমি—কোথা পাব তারে?

২

আমার—হৃদয় দুয়ারে স্বপন আবেশে,
ঘোর নিশাকালে অথবা দিবসে
কে যে উকি মারে,
আমি—চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি
কেমনে চিনিব তারে?
আমি—দেখিনি কখন, জানিনে কেমন,
কোথা সে এখন,
আছে কতদূরে!

আমি—খুজেছি গগনে, খুজেছি ভুবনে,
খুজেছি সলিলে,
খুজেছি সমীরে !
আমি—কোথা পাব তারে ?

৩

আমার—আকুল পরাণে কি বাজনা বাজে,
আমার—আকুল হৃদয় কারে জানি খোজে
আমি চিনি না তাহারে !
আমি—চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি,
কেমনে চিনিব,—
দেখি নি যারে ?
আমি—খুজেছি বিশ্বের অণু পরমাণু
প্রতি বালু-কণা, হিমাচল সানু
নিকটে ও দূরে !
আমি—খুজেছি অনলে, খুজেছি ভূতলে,
খুজেছি আলোকে,
খুজেছি আঁধারে !
আমি—কোথা পাব তারে ?
আমি—ফুলের সৌরভে তারি গন্ধ পাই,
চারি দিকে খুজি, কোথাও সে নাই
চমকিয়া উঠি
তারি সুধা স্বরে !
আমি—খুজেছি কাননে, খুজেছি কন্দরে,
খুজেছি পাষাণে, খুজেছি ভূধরে,
খুজেছি মরুভূ,
খুজেছি সাগরে !
আমি—কোথা পাব তারে ?
আমার—প্রাণের দুয়ারে কে জানি দাঁড়ায়ে
কহিল আমারে !
"কেন হেথা হোথা বেড়াও ঘুরিয়া
আঁধারে আঁধারে !"
"তুমি—খুজিছ যাহারে ?

জগৎ ব্যাপিয়া আছে সেই জন,
এ বিশ্ব তাহারি লীলা-নিকেতন!
সাগর তাহারে দিন রাত ডাকে,
রবি শশী হৃদে তারি জ্যোতিঃ রাখে!
তারি আশে নদী সদা যায় ধেয়ে
আত্মহারা গিরি তারি পানে চে'য়ে!
তাহারি লাগিয়া গীত গায় পাখী,
কমল কুমুদ মেলে ছুটি আঁখি!
তারি আশে বায়ু করে ছুটাছুটি,
ফুলগুলি থাকে গাছে গাছে ফুটি!
হুর পরী গুলি তারি গুণ গায়
ফেরেস্তা সকল তারি প্রীতি চায়!
সর্ব্ব শক্তিমান সেই মহা প্রাণ,
এ সৌর জগৎ তারি মহা দান!
অনাদি অনন্ত নাহি তার সীমা!
কে বুঝিবে তার অনন্ত মহিমা!
ইসা মুসা নূহ কত প্যাগাম্বর,
তারি কৃপা লভি হ'য়েছে অমর!
প্রভু মোহাম্মদ * অতি প্রিয় তার,
তাহারি কারণে নিখিল সংসার
সবাই তাহারে করিছে অর্চ্চনা (১)
জীব হৃদে এ "এল্‌লেল্লা" বাজিছে বাজনা!
তুমি কেন তারে দেখিতে না পাও,
পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াও!
কোরাণের আলো, জ্বেলে হৃদি মাঝে,
খোজ তুমি তারে!
শোণিতের সনে, লুকায়ে গোপনে
সে আছে তোমার
প্রাণের ভিতরে!"
আমি—কোথা পাব তারে?

কায়কোবাদ।

---

* দরূদ। (১) অর্থাৎ সম্মান।

আল্-এস্‌লাম।

১ম ভাগ　　আশ্বিন, ১৩২২　　৬ষ্ঠ সংখ্যা

মোস্‌লেম-বীরাঙ্গনা

(১)

ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমর প্রসঙ্গে, আজকাল পাঠকগণ, সংবাদ পত্র-পৃষ্ঠায়, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুশ ইত্যাদি যুদ্ধ-প্রলিপ্ত রাজ্য সমূহের বীরাঙ্গনাকুলের স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি-বাৎসল্য ও রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শনের কত গৌরব-কাহিনী যে পাঠ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। রুশীয় ৬নং উরাল কসাক সৈন্যের কর্ণেল বীরাঙ্গনা 'মাদাম কোকোভং সেডার' ন্যায় কত পাশ্চাত্য রণরঙ্গিনী সমর-নিপুণা বীর নারীগণের যুদ্ধকৌশল, বুদ্ধি-প্রাখর্য্য এবং বীরত্বের নিদর্শনজনিত সুদৃশ্য ছায়াচিত্রাদি যে সংবাদ পত্র-পৃষ্ঠার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আবার এই প্রসঙ্গে ইউরোপের পূর্ব্বতম ইতিহাস-প্রসিদ্ধা জ্যারাগোজার বীরাঙ্গনা অগষ্টিনা, ফ্রান্সের বিশ্ববিশ্রুত বীরাঙ্গনা জোয়ানঅব্ আর্ক, গ্রীক বীরনারী হেলেন কনষ্টান্টিনাইডিস প্রভৃতি বীর ললনা কুলের বীরোচিত পুরাতন স্মৃতি এবং তাঁহাদের সামরিক কৃতিত্বের বীর্য্য-বার্ত্তা লইয়া দেশময় ঘোর আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। শুধু কি তাই? ইউরোপের বর্ত্তমান ও পূর্ব্ববর্ত্তিনী বীরাঙ্গনাগণের আলোচনা প্রসঙ্গে, আমাদের সুযোগ্য হিন্দু সাহিত্যিক ভ্রাতৃগণও নীরবে বসিয়া নাই। তাঁহারা পুরাতন ইতিহাস পৃষ্ঠা হইতে রাজপুত ও মারাঠা বীরাঙ্গনা—রাণী সংযুক্তা, অহল্যা বাই, দুর্গাবতী, লক্ষ্মী বাই, তুলসী বাই, রাণী তারাবাই ও রাণী প্রার্ব্বতী প্রভৃতি ভারতীয় হিন্দু বীরাঙ্গনাগণের জীবন বৃত্তান্ত এবং তাঁহাদের সামরিক কৃতিত্বের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। ইহাতে একদিকে দেশে সুস্থকায় সৎসাহসিনী বীর

নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার আশা ; অন্যদিকে সমাজে উদ্যমশীল সুস্থাঙ্গ, সতেজ কর্ম্মী সন্তান উৎপাদনে জাতীয় গৌরব বর্দ্ধনের প্রয়াস।

মুসলমানগণের দিগ্বিজয় ও জাতীয়-জীবনের বিস্মৃত ইতিহাস-পৃষ্ঠায় তাঁহাদের মাতৃ জাতির পক্ষে গর্ব্ব গৌরব ও শ্লাঘা প্রকাশ এবং তাঁহাদের সৎসাহস ও বল বিক্রমের বিষয় আলোচনা করার মত কোনরূপ উপযুক্ত উপকরণ আছে কিনা, সাময়িক ভাবে সেই আলোচনার প্রতি কৌতূহলাক্রান্ত হওয়া মোসলেম লেখক ও পাঠকবর্গের পক্ষে সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। এই সাময়িক ও স্বাভাবিক প্ররোচনাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধ রচনার মূলীভূত কারণ। সমাজে সুস্থকায় সৎসাহসী বল বিক্রমশালী সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ইহা রাজা প্রজা কাহার্ না বাঞ্ছনীয় ? নারীজাতিকে জ্ঞানিগণ শস্যক্ষেত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শস্যক্ষেত্র উর্ব্বরা ও সার সম্বলিতা না হইলে যেমন তাহাতে উৎকৃষ্ট শস্যোৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, মানব-জন্মের শস্যক্ষেত্ররূপ মাতৃ-জাতীয় নারী সমাজ, যদি সুস্থাঙ্গিনী, বল বিক্রমশালিনী না হয়, সেই নিস্তেজ সারহীন শুষ্ক শস্য-ভূমির ফসলের যে শোচনীয় পরিণাম হইবে, তাহা সর্ব্বজন বিদিত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা। স্বভাব-ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয়। যাহারা এই স্বভাব-ধর্ম্মের শাসন মানিয়া চলে, জগতে তাহারাই উন্নত ও প্রধান। যাহারা ঐশ্বরিক বিধানের প্রতিকূলাচারী, তাহাদের পতন ও লাঞ্ছনা অবশ্য-ম্ভাবী। যাহা হউক, এখন আসুন পাঠক ! আমরা মোস্লেম-বীরাঙ্গনা কুলের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

এ ক্ষেত্রে আর একটী কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই প্রবন্ধের সহিত নারী জাতির পর্দ্দা-প্রথার ব্যতিক্রমের কোন সম্বন্ধ নাই। পর্দ্দা ও বীরত্ব এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ প্রতি-কূল সম্বন্ধ নাই। এস্লাম-ধর্ম্মনীতি, নারীজাতির নিমিত্ত যে পর্দ্দা প্রথা অর্থাৎ যে সকল নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবৃত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মোস্লেম নারীর পক্ষে বীরত্বের পরিচয় দেওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। প্রাথমিক যুগের আদর্শ মুসলমান নারী সম্প্রদায়ের ইতিহাস তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। অতএব এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে, কেহ নারীজাতির পর্দ্দা-প্রথা সম্বন্ধে তর্কে প্রবৃত্ত না হন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। এস্লাম ধর্ম্ম-বিধি, স্ত্রীলোকদিগের জন্য যেরূপ পর্দ্দা-প্রথার বিধান করিয়াছেন, তাহার সহিত লেখক সম্পূর্ণ ঐকামত, এবং সম্পূর্ণরূপে তাহার সমর্থক ও পরিপোষক।

আরব মহিলাগণের পূর্ব্বাবস্থা।

আরব-গগনে এস্লাম-রবি সমুদিত হওয়ার পূর্ব্বে, তত্রত্য নারীসমাজ, চিরাচরিত দেশ-প্রথানুসারে, তাঁহাদের যোদ্ধৃ পুরুষগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান করিতেন। তাঁহারা [illegible]রাচর রণভূমির পশ্চাৎভাগে অবস্থান পূর্ব্বক, আহত সৈন্যগণের সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসাকার্য্যে সহায়তা করিতেন, সৈন্যগণের আহার বিহারের সুবন্দোবস্ত করা, রসদ সম্ভারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং উষ্ট্র ও অশ্বাদি ভারবাহী পশুপালের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কার্য্যভারও তাঁহাদের প্রতি অর্পিত

হইত। তদ্ব্যতীত তাঁহারা আবশ্যকমতে জাতীয় সঙ্গীতের উদ্দীপনাময়ী বীণার ঝঙ্কারে, এবং বীর-গাথা সমন্বিত তেজঃবীর্য্যপূর্ণ বক্তৃতার ভাবোচ্ছ্বাসে, ভগ্নহৃদয় ও পরাজয়োন্মুখ যোদ্ধৃদলের হৃদয়ে নব উৎসাহের সঞ্চার করিতেন, নিরাশের ছায়াচিত্রাবিষ্ট মৃতপ্রায় দেহে বিজয়োন্মাদনার বিদ্যুৎ-লহরী প্রবাহিত করিতেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবজনিত গর্ব্ব-কাহিনী ও বংশগত শৌর্য্যবীর্য্যের অতুল কৃতিত্বের যশঃবার্ত্তা শুনাইয়া পলায়মান সৈন্যদিগকে পুনরায় সম্মুখ-সমরে নব উৎসাহে ধাবিত হইতে বাধ্য করিতেন। রণক্ষেত্রে হতাহত শত্রুগণের অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক পোষাক পরিচ্ছদ খুলিয়া লওয়া, এবং শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে আহত লোকদিগকে পশ্চাৎবর্ত্তী চিকিৎসা-শিবিরে প্রেরণ করা ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যাদিও অনেকাংশে তাঁহারাই সম্পাদন করিতেন।

আরবের প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি ওমর এব্‌নে কুল্‌সুম (عمرو بن كلثوم) জাতীয় শ্লাঘা ঘোষণা উপলক্ষে তৎকালীন যুদ্ধের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাদের উক্তির সত্যতা প্রতি-পাদিত হইতেছে, যথা :—

(১) على آثارنا بيض حسان * نحاذر ان تقسم اوتهونا

(২) اخذن على بعولتهن عهدا * اذا لاقوا كتائب معلمينا

(৩) لكى يسلبن افراسا و بيضا * و اسرى فى الحبال مقرنينا

(৪) ضعائن من بنى جشم بن بكر * خلطن بميسم جادوينا

(৫) يقتن جيادنا ويقلن لستم * بعولتنا اذا لم تمنعونا

অনুবাদ,-

(১) আমাদের ব্যূহ শ্রেণীর পশ্চাদ্দেশে, গৌরাঙ্গী সুন্দরী ললনাগণ দণ্ডায়মান। পাছে শত্রু-হস্তে তাঁহাদের অবমাননা হয় এবং তাঁহারা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, আমরা সেজন্য সতত সন্ত্রস্ত। (২) তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীগণের নিকট, রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন ও দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। (৩) (আমাদের সাহচর্য্যে নারীগণের অবস্থানের উদ্দেশ্য এই যে) তাঁহারা রণক্ষেত্রে (হতাহত) শত্রুগণের খাদ্য এবং অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইবেন এবং শত্রুদিগকে বন্দী করিবেন। (৪) তাঁহারা জশম এব্‌নে বকরেরই جشم بن بكر বংশধর—তাঁহাদের দৈহিক সৌন্দর্য্যের সহিত বংশগত সম্মান ও ধর্ম্মগত গৌরবও বিদ্যমান আছে। (৫) তাঁহারা আমাদের অশ্ব সমূহের খাদ্যদান ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এবং তাঁহারা বলিয়া থাকেন, তোমরা যদি আমা-দিগকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিতে না পার, তাহা হইলে তোমরা আমাদের স্বামীনামে বাচ্য হইতে পার না।”

এসলাম যুগের অবস্থা।

আরবে এস্‌লাম প্রচারিত হওয়ার পরেও তদ্দেশে যুদ্ধকালে, পুরুষগণের সহিত মহিলাগণের সহগামিনী হইবার প্রথা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত ছিল। শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের(সঃ)

প্রধানা ও প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী বিবি আয়শার (র) রণক্ষেত্রে গমন এবং স্বহস্তে 'মশক' বা চর্ম্মাধারে জল পূর্ণ করিয়া আনিয়া আহত সৈন্যগণের সেবা শুশ্রূষা করার দৃষ্টান্ত ইতিহাস-পৃষ্ঠায় স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। স্থান বিশেষে অকর্ম্মণ্য স্ত্রীলোকদিগকে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) রণক্ষেত্র গমনে নিষেধ করার যে আদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল স্থান ও পাত্র ভেদে অবস্থানুযায়ী চিরনীতির সদ্ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

হাদিস-তত্ত্ব-বিশারদ মহাত্মা আবু নইম ابونعیم محدث এক হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, 'খয়বর' যুদ্ধে, মুসলমান সৈন্যদলের সহিত ছয়টী স্ত্রীলোকও অভিযান করিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহাদের বিষয় অবগত হইয়া ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—কে তোমাদিগকে যুদ্ধে যোগদান নিমিত্ত অনুমতি দিয়াছে? তাঁহারা সবিনয় উত্তর করিয়াছিলেন, হজরত! আমাদের সঙ্গে আবশ্যকীয় ঔষধ পত্র এবং আহত সৈন্যগণের সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি বিদ্যমান আছে, আমরা আহত যোদ্ধৃগণের ক্ষতস্থানে পটি বন্ধন করিব, তাহাদের শরীর হইতে বাণ বহিষ্কৃত করিব, তাঁহাদের আহার বিহারের সুব্যবস্থা করিব—এসকল সদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছি। হজরত মোহাম্মদ ইহা শুনিয়া তাঁহাদিগকে সেনাদলে অবস্থানের জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং খয়বর যুদ্ধে জয়লাভ ঘটিলে, হজরত রসুলেকরিম, বর্ণিতা স্ত্রীলোকদিগকেও পুরুষদলের সহিত যুদ্ধে প্রাপ্ত-ধনরত্নের অংশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক "এব্‌নে জরীর তবরী" কাদেসিয়ার মহাযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট 'আগ্‌ওয়াস' (اغواث) ও 'আরমাছ' (ارماث) যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যুদ্ধে নিহত মুসলমান যোদ্ধৃগণের শবদেহ, পশ্চাৎবর্ত্তী সমাধি-ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত লোকগণের নিকট প্রেরিত হইত। তাঁহারা শবদেহগুলি স্ত্রীলোকগণের হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাঁহারা যথাযোগ্যরূপে অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সমাপন করিতেন। স্ত্রীলোক ও বালকগণ সচরাচর কবর খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতেন। (১)

কাদেসিয়া যুদ্ধেলিপ্ত একজন মহিলা উক্ত যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন, যথা :—"যুদ্ধাবসানে আমরা আঁটিয়া সাটিয়া বস্ত্র পরিধান অন্তে যষ্টিহস্তে রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলাম। রণক্ষেত্রের যে কোন স্থানে আহত মুসলমান সৈন্য আমাদের নয়নপথে পতিত হইলেই আমরা তাহাদিগকে সযত্নে বহন করিয়া লইয়া আসিতাম। (২)

হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—"বোখারী শরিফে" উল্লেখ আছে, দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর স্বীয় রাজত্বকালে, 'উম্মে সলিত' ام سليط নাম্নী একজন আরব নারীকে একটী বিশেষ বৃত্তি দ্বারা পুরস্কৃতা করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত মহিলা ওহদ جنگ احد যুদ্ধে 'মোশক' পূর্ণ

(১) "তারিখে-তবরী" ৬ষ্ঠ খণ্ড ২১৬৭ পৃঃ।
(২) "তারিখে-তবরী" تاریخ طبری ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৩৬৩ পৃঃ

করিয়া জল সরবরাহের গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন"। ওহদ যুদ্ধে 'আনিছা' নাম্নী একটী বীরাঙ্গনা হজরত রসুলে করিমকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া গুরুতররূপে আহত হওয়ার ঘটনাও ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। সময় সময় স্ত্রীলোকেরা সমরক্ষেত্রে পুরুষদিগকে এরূপ দুঃসময় সাহায্য করিয়াছিলেন যে, সেরূপ বিপদ-সঙ্কুল-অবস্থায় পুরুষগণ স্ত্রীলোকদিগের সাহায্য ও উৎসাহ উদ্দীপনা প্রাপ্ত না হইলে সে যুদ্ধে পরাজয় সংঘটিত হওয়া তাহাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ছিল। পরবর্ত্তী ধারাবাহিক ঘটনা নিচয় দ্বারা এ সকল বিষয়ের সত্যতা সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইবে।

এস্‌লামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, আরবগণের দিগ্বিজয়-ব্যাপারে, এমনকি প্রধানতম প্রত্যেক যুদ্ধেই পুরুষ নিচয়ের সহিত নারীগণের সংযোগ ও সহযোগিতা, কার্য্যতঃ অনিবার্য্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। রণক্ষেত্রে মুসলমান নারীগণ কিরূপ কার্য্য দক্ষতা ও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং মুসলমান সৈন্যগণ তাঁহাদের মাতা, ভগিনী ও সহধর্ম্মিনীগণের দ্বারা কি পরিমাণ সাহায্য লাভ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করা হইতেছে।—

খন্দক যুদ্ধের ঘটনা।

'খন্দক' বা পরিখা যুদ্ধে, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহার সহচরবৃন্দ সমভিব্যবহারে 'বনু কোরেজা' بنو قريضة নামক এহুদী সম্প্রদায়ের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রলিপ্ত ছিলেন। পশ্চাৎ-বর্ত্তিনী নারীগণের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত তখন বিশেষ কোনই উপায় ছিল না। ইত্যবসরে হঠাৎ একজন এহুদীকে, আপনাদের শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা সশঙ্কিতা হইলেন। এই গুপ্তচরটী বনি কোরেজার নিকট আরব মহিলাগণের অবস্থিতি স্থানের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিলে, শত্রুপক্ষ তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিতে পারে, এই ধারণার বশীভূত হইয়া হজরত মোহাম্মদের পিতৃস্বসা—মহাত্মা জোবেরের মাতা বিবী ছফিয়া, صفيه মহাত্মা হাস্‌সান এবনে ছাবেতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই শত্রুপক্ষীয় তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিকে অবিলম্বে নিহত করা উচিত। মহাত্মা হাস্‌সান তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করায়, বিবী ছফিয়া স্বহস্তে শিবিরের একটী দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক উল্লিখিত গুপ্তচরের দিকে ধাবিতা হইলেন এবং তাহাকে গদাঘাতে হত্যা করিয়া নারী সমাজের আসন্ন বিপদ দূরীভূত করিলেন। মোস্‌লেম নারীজাতির ইতিহাসে তাঁহাদের বীরত্বের ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিজ্ঞাত।' (১)

'উম্মে আম্মারা' ام عمارة নামক এক আরব বীরাঙ্গনা, তাঁহার স্বামী জয়েদ এবনে আছেমের সহিত 'ওহদ' যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। হিজরী ৬ষ্ঠ অব্দে, যখন হজরত মোহাম্মদ(সঃ) তাঁহার বহুসংখ্যক সহচর ও শিষ্যদল সমভিব্যাহারে মদিনা হইতে মক্কা নগরে হজ্জব্রত উদ্যাপন

(১) "ওসদল্‌গাবা" اسد الغابة ৫ম খণ্ড ৫১৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, এবং মক্কার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইয়া কোরেশ বংশীয়দের সহিত পূর্ব্ব-সন্ধির মর্ম্মানুযায়ী নগর প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ উদ্দেশ্যে মহাত্মা ওস্‌মানকে দূতরূপে প্রেরণ করেন, তখন মহাত্মা ওস্‌মানের প্রত্যাবর্ত্তনে অস্বাভাবিক বিলম্ব দেখিয়া মুসলমানগণ সকলেই তাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিলেন। মুসলমানগণের মধ্যে তাঁহার নিহিত হওয়ায় জনরব প্রকাশিত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে মহা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার শিষ্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক, কোরেশগণের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য অসি ধারণ নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই প্রতিজ্ঞাকারীগণের দলে বর্ণিতা বীরাঙ্গনা উম্মেআম্মারার নামও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিও কোরেশগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

এমামা যুদ্ধের ঘটনা।

প্রথম খলিফা মহাত্মা আবুবকর (র) এর আমলে, 'মোসায়লেমা.কাজ্জাব' নামে একজন প্রবল ক্ষমতাশালী ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তির সহিত মুসলমানগণের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে যদিও মুসলমানগণ পরিণামে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন এবং মোসায়লেমা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্বেও মুসলমান পক্ষে এত অধিক সংখ্যক লোক নিহিত হইয়াছিলেন যে যদ্ধাবসানে মহাত্মা ওমর (র) কোরাণ কণ্ঠস্থকারী ব্যক্তি (হাফেজ) বর্গের অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা করিয়া হতাবশিষ্ট 'হাফেজ'গণের সাহায্যে কোরআন শরিফ লিপিবদ্ধ করার জন্য খলিফা হজরত আবুবকরকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। ফল কথা, বর্ণিত ঘটনা দ্বারা এই যদ্ধের ভীষণতা সহজেই অনুভূত হইতেছে। এই মহাযুদ্ধে উল্লিখিত বীরাঙ্গনা উম্মে আম্মারা উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি প্রাণ খুলিয়া শত্রুগণের সহিত যদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি গুরুতর রূপে আহত না হওয়া পর্য্যন্ত তরবারি সঞ্চালনে বিরত হইয়াছিলেন না। এই যুদ্ধে তাঁহার শরীরের দ্বাদশ স্থানে অস্ত্রের আঘাত লাগিয়াছিল। এই দ্বাদশ আঘাতের পরেই তাঁহাকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। (১)

কাদেসিয়া ও এরমুক যুদ্ধে আরব বীরাঙ্গনাগণের কৃতিত্ব।

দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা ওমরের সময় পৃথিবীর দুইটী প্রাচীন ও প্রবল পরাক্রমশালী রাজ শক্তির ভাগ্য বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। অর্থাৎ কাদেসিয়া প্রান্তরে পারস্য রাজশক্তি এবং 'এরমুক' যুদ্ধে রোমকগণের ভাগ্য পরীক্ষার শেষ অভিনয় কার্য্য সমাপ্ত হয়। এস্‌লাম জগতের ইতিহাসে এই দুই মহাযুদ্ধের স্থান সর্ব্বোচ্চে স্থাপিত। এই উভয় যুদ্ধে আরবের নারীসমাজ যেরূপ অসধারণ বলবিক্রম, অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং অসাধারণ সমর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আরবীয় বীরাঙ্গনাগণ একদিকে যেমন স্বহস্তে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, অন্যদিকে শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য ও সমরকৌশল এবং পর্য্যাপ্ত রসদ ও রণ সম্ভারাদির অনুকূল অবস্থা দর্শনে, হতাশহৃদয়—রণসম্ভার শূন্য মুষ্টিমেয়

(১) "ওসদলগাবা" ৫ম খণ্ড ৬০৫ পৃঃ।

আরব সৈন্যগণকে যেরূপ উৎসাহোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীতের সতেজ ঝঙ্কারে এবং বীরগাথা সমন্বিত উদ্দীপনাময়ী উত্তেজক জ্বালাময়ী বক্তৃতার মোহিনী শক্তি দ্বারা উৎসাহিত এবং নবভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন সে সকল আদর্শ ঘটনাবলী, মোস্‌লেম নারীজাতির গৌরব মণ্ডিত ইতিহাসে, স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার মত আদরের সামগ্রী।

হিজরী দ্বাদশ অব্দে, কাদেসিয়া প্রান্তরে, আরব ও পারসিক সৈন্যগণ-সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হয়। পারস্য পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষের অধিক। মুসলমান পক্ষে কিঞ্চিদধিক ৩০ সহস্র। এই যুদ্ধে বহু সহস্র মুসলমান সৈন্য হতাহত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের সহগামিনী স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণ সমাধি খননে এবং নিহিত ব্যক্তিগণের শবদেহ সমাহিত করণে ও আহত সৈন্যগণের সেবা শুশ্রূষা ব্যাপারে তৎপর ছিলেন।

কাদেসিয়া যুদ্ধে আরব মহিলাগণের মধ্যে কিরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা ও মহা উত্তেজনার ভাব বিদ্যমান ছিল, তাহা অনুমান করার জন্য আমরা নিম্নে দু'একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি,

এক আরব বৃদ্ধার বীরোক্তি।

'নখা' বংশীয় একটী বৃদ্ধা নারী, তাঁহার স্নেহাধার প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রদিগকে 'কাদেসিয়া' রণক্ষেত্রে প্রেরণ কালে উদ্দীপনাময়ী তেজ বীর্য্যপূর্ণ ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ দেখুন,—

انكم اسلمتم فلم تبدلوا و هاجرتم فلم نترببوا
و لم تلنب بكم البلاد و لم تقحهكم السنة
ثم جئتم بامكم عجوز كبيرة فوضعتموها
بين ايدى اهل فارس والله انكم بنو رجل واحد كما انكم بنو امرة واحدة ما .
خنت اباكم و لا فضحت خالكم انطلقوا و اشهدوا اول القتال و آخره -

বঙ্গানুবাদ—

স্নেহাস্পদ পুত্রগণ! তোমরা পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহা আর কখনও পরিবর্ত্তন কর নাই, অতএব তোমরা ধর্ম্ম বিশ্বাসে অটল। তোমরা জন্মভূমি মক্কাধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদিনায় নির্ব্বাসিত হওয়ায় তাহাতে কেহ তোমাদের নিন্দাবাদ করিতে পারে নাই। তোমাদের জন্মভূমি তোমাদের পক্ষে কোনরূপ অপ্রীতকর ছিল না এবং সেখানে দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নাদিও কিছুই ছিল না, তোমরা কেবল ধর্ম্মার্থেই স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলে। বৎসগণ! তোমরা তোমাদের বৃদ্ধা মাতাকে পারস্যবাসী শত্রুদলের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছ, আমি এই ক্ষেত্রে খোদাতাআলার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা যেমন একই মাতার সন্তান, তেমনই

তোমরা একইমাত্র পিতার ঔরসজাত পুত্র। আমি সতী সাধ্বী নারী, আমি না কখনও তোমাদের পিতার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ করিয়াছি, না কখনও তোমাদের মাতুলবংশের সুযশে কলঙ্কারোপ করিয়াছি। অতএব, স্নেহাধার বৎসগণ! যাও তোমরা অবিলম্বে রণক্ষেত্রে যাও! সাবধান! কখনও রণভূমি পরিত্যাগ করিও না। প্রথম হইতে যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত কখনও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইও না। (১)

বৃদ্ধার পুত্রগণ যুগপৎ ভীম বিক্রম ও প্রবল পরাক্রমের সহিত শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। মাতৃ-আদেশের পবিত্র স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া তাহাদিগকে নববলে বলীয়ান এবং নব ভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছিল, তাহারা বৃদ্ধার দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইলে, বৃদ্ধা আকাশের দিকে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক নিজ সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আল্লাহতাআলার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, বৃদ্ধার পুত্রগণ বহুক্ষণ অতুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করার পর যুদ্ধজয়ান্তে নিরাপদে তাঁহাদের স্নেহময়ী জননীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধ-বিজয়-লব্ধ শত্রুপক্ষের ধন রত্নের প্রাপ্ত অংশ তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।

বীরাঙ্গনা খন্সা। (خنساء)

কাদেসিয়ার প্রসিদ্ধ রণভূমিতে, আরবের প্রসিদ্ধা নারী কবি খন্সাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার চারিটী পুত্র যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। রজনীর তৃতীয় প্রহরে যখন সৈন্যগণ প্রত্যুষ-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন বীরাঙ্গিনা কবি খন্সা তাঁহার হৃদয়-রত্ন পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া যে জ্বালাময়ী উদ্দীপনা পূর্ণ ভাষায় তাহাদিগকে বীর জনোচিত উপদেশ দিয়াছিলেন নিম্নে সংক্ষেপের অনুরোধে তাহার বঙ্গানুবাদ মাত্র দেওয়া হইল, যথা—

স্নেহাস্পদ পুত্রগণ! তোমরা স্বেচ্ছায় এস্লাম গ্রহণ করিয়াছ এবং সাগ্রহে নির্ব্বাসন ব্রত ধারণ করিয়াছ, আমি একমাত্র উপাস্য খোদাতাআলার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা যেমন একমাত্র মাতার সন্তান, তেমনই তোমরা একমাত্র পিতার ঔরসজাত পুত্র। আমি না তোমাদের পিতার সহিত কোনরূপ বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ করিয়াছি, না তোমাদের মাতুল কুলের সম্মানের হানিজনক কোন অপ্রীতকর ব্যবহার করিয়াছি, না আমি তোমাদের বংশ-গৌরবে কোনরূপ কলঙ্ক-রেখা অঙ্কিত করিয়াছি, খোদাতাআলা বিধর্ম্মীদিগের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধের নিমিত্ত যে অক্ষয় পুণ্য সম্পদের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তোমাদের অবিদিত নাই। বৎসগণ! ইহা স্মরণ রাখিও, পরকালের নিত্য সুখ সম্পদ এই অনিত্য নশ্বর জগতের তুলনায় সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। খোদাতাআলা পবিত্র কোরআন শরিফে উল্লেখ করিয়াছেন। "হে মোস্লেম বৃন্দ! তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, দৃঢ়তা অবলম্বন কর, ঈশ্বর-ভীতি সর্ব্বদা হৃদয়ে স্থাপন করিয়া রাখ, তাহাতে তোমরা কৃতকার্য্য হইবে। আগামী কল্য যখন তোমরা নিরাপদে প্রভাত

---

(১) "তবরী" ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৩০৭ পৃঃ।

করিবে, তখন তোমরা নিতান্ত দূরদর্শিতা ও সাবধানতার সহিত বিশ্বনিয়ন্তার নিকট করুণা-ভিক্ষা ও বিজয়-কামনা পূর্ব্বক শত্রুগণের প্রতি সিংহবিক্রমে ধাবিত হইবে। আর যখন দেখিবে, সমরানল ভীষণরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই বিশ্বদাহী যুদ্ধের দাবানল চতুর্দ্দিকে ভীষণতার প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিতেছে, তখন তোমরা সেই অনলকুণ্ডের কেন্দ্র স্থানাভিমুখে ধাবিত হইবে, এবং যখন দেখিবে, শত্রুগণ ক্রোধানলে জ্বলিতেছে, তখন তোমরা শত্রুপক্ষের সেনাধ্যক্ষের প্রতি বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া পড়িবে। খোদাতাআলা তোমাদিগকে ইহ-লোকে যুদ্ধে-বিজয়লব্ধ ধন সম্পদ দান করুন এবং পরকালে তোমরা অনন্ত সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হও। (১)

প্রত্যুষে রণদামামা বাজিয়া উঠিলে, খন্সার পুত্র চতুষ্টয় সিংহনাদে গর্জ্জন করিয়া শত্রুদিগকে ভীম বিক্রমে আক্রমণ করিলেন, তাঁহারা বহুক্ষণ ব্যাপিয়া অতুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু শত্রুসৈন্যকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্য ও রণ-প্রতাপ দর্শনে, শত্রু মিত্র সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল, কিন্তু এস্লামের এই বীরসন্তান চতুষ্টয় একে একে সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। খন্সা এই মর্ম্মান্তুদ সংবাদ পাইয়া বলিলেন, ধন্য খোদাতাআলা! যিনি আমাকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহিতশহিদ-পুত্রের মাতৃসম্মানে চরিতার্থ করিয়াছেন। খলিফা হজরত ওমর (র) খন্সাকে তাঁহার নিহত পুত্র চতুষ্টয়ের বৃত্তি-সমষ্টির প্রাপ্য ৮০০ শত স্বর্ণ মুদ্রা সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে বিতরণের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

"বোয়েব" যুদ্ধের একটী ঘটনা।

কাদেসিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ 'বোয়েবে' পারশিকগণের সহিত মুসলমানগণের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধে সুযোগ পাইয়া মুসলমানগণ শত্রুপক্ষের প্রচুর রসদসম্ভার হস্তগত করিতে সমর্থ হন। আরব মহিলাগণ সৈন্যশ্রেণীর বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। সেনাপতি 'মুছন্না' (مثنى) যুদ্ধ বিজয়লব্ধ রসদসম্ভার, একদল অশ্বারোহী সৈন্যের তত্ত্বাধানে পশ্চাৎ-বর্ত্তিনী স্ত্রীলোকগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ অশ্ব ধাবিত করিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দূর হইতে আরব মহিলাগণ, সম্মুখবর্ত্তী আকাশমার্গে ধূলিকা সমাকীর্ণ অন্ধকার দেখিয়া অনুমান করিলেন, শত্রুসৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ-উদ্দেশ্যে ক্ষিপ্র বেগে অগ্রসর হইতেছে, অথচ নারীগণের নিকট যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না। তাঁহারা আত্ম-রক্ষার জন্য অনন্যোপায় হইয়া শিবিরের খুটী ও দণ্ডাদি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হই-লেন। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে সর্ব্বপশ্চাতে রাখিয়া তাঁহারা গদাহস্তে শ্রেণিবদ্ধ ভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। যথাসম্ভব প্রস্তরখণ্ড ও লোষ্ট্রাদিও সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। আগমনকারী সৈন্যদলের নেতা ওমর এবনে আব্দুল মসিহ عمرو بن عبد المسيح এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে আনন্দ ভরে উচ্চৈঃস্বরে আত্ম পরিচয় দিয়া বলিলেন, মুসলমান সৈন্যদলের মহিলাগণের

(১) ওসদলগাব্বা اسد الغابة এবনে আছির জজরী, ৫ম খণ্ড ৪৪২ পৃঃ

পক্ষে এরূপ বীরাঙ্গনা হওয়াই শোভনীয়। তিনি যুদ্ধ-বিজয় সংবাদ জ্ঞাপনান্তে নারী নিচয়ের হস্তে শত্রুগণের নিকট প্রাপ্ত রসদ সম্ভারাদি সমর্পণ করিলেন। (১)

মিসান যুদ্ধের একটী ঘটনা।

টাইগ্রীস নদীতীরে মিসান প্রান্তরে পারশিকগণের সহিত আরবগণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে স্ত্রীলোকগণ পুরুষগণের বহু পশ্চাতে অবস্থিত ছিলেন। উভয় সৈন্যদলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধারম্ভ হওয়ার পর মুসলমান সৈন্যদলে পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় 'আরদা' বেন্‌তে হারেছ ازدة بنت الحرث নাম্নী এক আরব মহিলা তাহার সমভিব্যহারিনী অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই দুঃসময়ে আমরা আমাদের পুরুষদলকে সাহায্য করিতে পারিলে বিশেষ ফলোদায়ক হইত। এই বলিয়া তিনি রণসাজে সজ্জিত হইয়া নিজ দুপট্টা উড়্‌নীখণ্ডকে পতাকারূপে ধারণ করিলে, অন্যান্য মহিলাগণ সকলেই তাঁহার অনুকরণে স্ব স্ব বস্ত্রখণ্ডকে পতাকা রূপে ব্যবহার পূর্ব্বক জাতীয় সঙ্গীত তানে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া এবং সেই পতাকা সঞ্চালিত করিয়া যোধারাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রণোন্মত্ত একদল নূতন সৈন্য পশ্চাৎদিক হইতে আসিতেছে দেখিয়া, মুসলমান সৈন্যগণের উৎসাহ উদ্যম শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। নূতন সৈন্য দলের সহকারিতায় যুদ্ধ জয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাদের অন্তরে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করিল। শত্রুপক্ষ এই আকস্মিক নূতন সৈন্যদলের আবির্ভাব দর্শনে ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। পরিণামে শত্রুপক্ষ রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। (২)

দামস্কসের যুদ্ধে আরব নারীগণের অতুল বীরত্ব।

আরবের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকরের রাজত্বকালে, হিজরী ত্রয়োদশ অব্দে, সর্ব্বপ্রথম মুসলমানগণ দামস্ক আক্রমণ করেন। কয়েকটী যুদ্ধের পর রোমকগণ দুর্গপ্রাচীরের সীমাদেশে আশ্রয় লইয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মুসলমানগণ নগর অবরোধ করিয়া থাকিলেন। ইত্যবসরে 'আজনাদিন' প্রান্তরে রোমীয়গণের ৯০ সহস্র সৈন্য সমবেত হওয়ার ভয়ঙ্কর সংবাদ মুসলমান সৈন্যদলের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তখন মুসলমান সৈন্যদল সিরিয়ার বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নাবস্থায় বিচরণ করিতেছিল। তাহারা শত্রুসৈন্যের কেন্দ্রীভূত হওয়ার সংবাদ পাইয়া বিভিন্নদিক হইতে আজ্‌নাদিন প্রান্তরে সমবেত হওয়ার জন্য ধাবিত হইলেন। সেনাপতি মহাবীর খালেদ ও মহাত্মা আবু ওবায়দা এরাক-বিজয়ান্তে দামস্কসের সম্মুখে একত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও দামস্কসের অবরোধ উঠাইয়া লইয়া আজনাদিন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীরবর খালেদ প্রধান সেনাদল লইয়া অগ্রগামী হইলেন, মহাত্মা আবু ওবায়দা স্ত্রীলোক এবং সৈন্যগণের শিবির ও রসদ সম্ভার লইয়া তাহার পশ্চাৎগামী হইলেন। মুসলমান্দিগকে স্থানান্তরিত হইতেছে দেখিয়া দামস্কসবাসী রোমকগণের মধ্যে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল, তাহারা পশ্চাৎদিক হইতে মুসলমান মহিলাদিগকে আক্রমণ করিল। ইতঃমধ্যে আর একদল

---

(১) তারিখে তবরী, ৫ম খণ্ড ২১৯৭ পৃঃ।
(২) তারিখে তবরী ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৩৪৭ পৃঃ।

নূতন রোমীয় সৈন্য দামস্কসবাসীদের সাহায্যার্থে আগমনকালে শত্রুসৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তন দর্শনে সম্মুখ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পাঠকগণ! এ সময় মুসলমানগণের অবস্থা কিরূপ বিপদ সঙ্কুল হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া দেখুন। একে মুসলমানবাহিনীর প্রধান অংশ মহাত্মা খালেদের নেতৃত্বে পূর্ব্বেই অগ্রগামী হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে, মহাত্মা আবু ওবায়দা মাত্র মুষ্টিমেয় একদল লোক লইয়া স্ত্রীলোক ও রণ-সম্ভারাদি রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত। এমতাবস্থায় তাঁহাদের সম্মুখভাগ, শত্রুপক্ষের নূতন সৈন্যদল দ্বারা আক্রান্ত এবং পশ্চাৎ-বর্ত্তিনী স্ত্রীলোকগণ নগরবাসীদের কবলে পতিতা, এরূপ দুঃসময় আরবগণের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবারই কথা, কিন্তু তাঁহারা অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্মুখদিকে আরব পুরুষগণ নবাগত শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, পশ্চাৎদিকে নগরবাসী খৃষ্টানগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত আরব মহিলাগণ প্রস্তুত হইলেন। দামস্কসবাসিগণ সুযোগ পাইয়া মুসলমান নারীদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পুরুষদল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহাদিগকে শহরের দিকে তাড়া করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এই বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় আরব নারীগণ একে অন্যের দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইত্যাবকাশে বীরাঙ্গনা আজ্‌ওর কন্যা খওলা, তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগিনিগণ! তোমরা কি বিধর্ম্মী শত্রুহস্তে বন্দী হইতে এবং তাহাদের কর-কবলে নিপতিত হইতে সম্মত? তোমরা কি আরবজাতির শৌর্য্য বীর্য্যে কলঙ্কারোপ করিতে ইচ্ছুক? তোমরা আরবের বংশ গৌরব ও জাতীয় পদ মর্য্যাদা নষ্ট করিতেই কি লালায়িত? আমার মতে এরূপ অসম্মান ভোগ ও শত্রুহস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা সসম্মানে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াই শতগুণে শ্রেষ্ঠ। খওলার এই উত্তেজনাপূর্ণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা শ্রবণে আরব মহিলাগণের মধ্যে এক অবর্ণনীয় উদ্দীপনার সঞ্চার হইল, তাহাদের শিরায় শিরায় ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বিদ্যুৎলহরী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁবুর দণ্ডরাশি স্বহস্তে অস্ত্ররূপে ধারণ পূর্ব্বক, বৃত্তাকারে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। সর্ব্বাগ্রে আজওর কন্যা খওলা সেনানায়িকারূপে জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়া অগ্রগমন করিতে লাগিলেন। আফ্‌ফার কন্যা 'আফিরা' عفيرة بنت عفار ওতবার কন্যা উম্মে আব্বান أم ابان লোমান কন্যা সল্‌মা سلمى بنت نعمان প্রভৃতি বীরাঙ্গনাগণ পর পর শ্রেণিবদ্ধ ভাবে রণোন্মাদিনীবেশে শত্রুকুলের প্রতি আক্রমণ করিলেন। দামস্কসবাসিগণ আরব মহিলাগণের ঈদৃশ বীরত্ব ও রণকৌশল এবং তাহাদের অপূর্ব্ব সাহস বিক্রম দর্শনে বিমুগ্ধ হইল। এই সময় দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আরব বীরাঙ্গনাগণ অল্প সময়ের মধ্যে, শত্রুপক্ষের ৩০ জন যোদ্ধৃপুরুষকে গদাঘাতে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিলেন। রোমীয়গণ এতদ্দর্শনে ক্ষোভে রোষে মুহ্যমান হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে ভীম বিক্রমে আক্রমণ করিল, কিন্তু আরব মহিলাগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার পাত্রী ছিলেন না। তাঁহারা পুনরায় রণোন্মত্ত হইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্য এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য্য ও শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন আরব মহিলাগণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল, ইত্যবকাশে মুসলমান সৈন্যগণ তাহাদের

সম্মুখবর্ত্তী নবাগত শত্রু সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তিনী স্ত্রীলোকগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ধাবিত হইলেন। নারীগণ তাঁহাদের পুরুষ সৈন্যদলের সাহায্য প্রাপ্তে নববলে বলীয়ান ও নবতেজে অনুপ্রাণিত হইয়া শত্রুসংহারে অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দামস্কসবাসী, মুসলমান নব সৈন্যগণের আগমন দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং পূর্ব্ববৎ দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া পুনরায় আজনাদিন প্রান্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ইউরোপের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন সাহেব তাঁহার ইতিহাসে এই ঘটনা প্রসঙ্গে, মুসলমান মহিলাগণের সতীত্ব, বীরত্ব ও সাহস বিক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের তরবারি চালনা, বর্শা ব্যবহার, ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতা ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত উচ্চ সমালোচনা করিয়াছেন।

এর্‌মুক যুদ্ধে আরব বীরাঙ্গনাগণের অতুল বীরত্ব।

মুসলমানগণের প্রাথমিক যুগের যুদ্ধাদির মধ্যে, এরমুক (یرموک) যুদ্ধই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধানতম নিয়মিত সমরনীতি প্রযুক্ত মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলমান পক্ষের সৈন্য সংখ্যা মোট ৪০ হাজার এবং রোমীয়দের পক্ষে কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ ছিল। রোমক সৈন্যগণ এরূপ বল বিক্রম ও আড়ম্বরের সহিত প্রবল ঝটিকাবেগে অগ্রসর হইতেছিল যে, তাহাদের সেই আড়ম্বর জনিত হাব-ভাব ও উৎসাহ উদ্যম দর্শনে মনে হইতেছিল, তাহাদের বিপুল বাহিনীর প্রবল স্রোতে মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্যদল, তৃণবৎ ভাসিয়া চলিয়া যাইবে। এরমুকপ্রান্তরে উভয় সৈন্যদল সম্মুখীন হইল। মুসলমানের তুলনায় রুমীয়দের সৈন্যসংখ্যা ৪ গুণ অধিক। তদুপর ৩০ হাজার রুমীয় সৈন্য স্ব স্ব পদ যুগল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য তাহারা অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া শত্রুসংহারে প্রলিপ্ত থাকিবে। তাহারা যেন ইচ্ছা করিলেও পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে না পারে এবং রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হয়, এই উদ্দেশ্যেই পদ যুগল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। রুমীয়গণ দুই লক্ষ সৈন্যবল লইয়া এরূপ ভীম বিক্রমে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল যে, মুসলমানগণ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সেই প্রবল গতি নিবারণ করিতে পারিলেন না। মুসলমান সৈন্যশ্রেণীর দক্ষিণ বাহু ক্রমে ক্ষীণবল ও পশ্চাৎপদ হইয়া মহিলা-শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। মুসলমান বাহিনীর বাম পার্শ্বে, লখম (لخم) ও জোজাম (جذام) নামক দুই সম্প্রদায়ের লোক বহুকাল ব্যাপিয়া রোমীয় খৃষ্টানগণের অধীনে ছিল। অল্পকাল পূর্ব্বেই তাহারা এস্লাম গ্রহণ পূর্ব্বক মুসলমান সৈন্যদল ভুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং এস্লাম সম্বন্ধে তাহাদের দৃঢ়তার বিষয় সহজেই অনুমেয়। তাহারা মুসলমান সৈন্যশ্রেণীর বাম বাহু রক্ষা করিতেছিল। তাহারা রোমকগণের প্রবল প্রতাপ দর্শনে ভীতি বিহ্বল হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। রোমীয় সৈন্যগণ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া লইয়া গিয়া নারী-শিবির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

এস্লামাবাদী।

মোস্তফা-চরিতালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোরেশগণ আনন্দোৎসবে নিমগ্ন; এতশীঘ্র মুসলমানেরা যে, তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহা তাহারা মনেও স্থান দেয় নাই; এমত অবস্থায় সহসা মুসলমানগণকে নিকটাগত দেখিয়া তাহারা বিচলিত হইয়া উঠিল। ওহদের সমর-প্রাঙ্গণে কা'ল যাঁহারা গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছেন, তাঁহারাই আজ আবার কি প্রকারে যুদ্ধাভিযান করিলেন? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, মুসলমানেরা পরাস্ত হইয়াও ভগ্ন-সাহস হন নাই; বিশেষতঃ ধর্ম্মবল তাঁহাদের সহায় হইয়া তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে। এমত স্থলে কেবল কোরেশ কেন, আরবের সকল সম্প্রদায় এমন কি পৃথিবীর সমস্ত বীরপুরুষ একদিক্ হইলেও সে তেজ, সে সাহস দমিত করিতে সমর্থ হইত না। ওহদের রণ প্রান্তরে মুসলমানেরা পলায়িত এবং আহত হইলেও কোরেশেরা তাঁহাদের অমিত তেজ ও সাহসের যথেষ্ঠ পরিচয় পাইয়াছিল। সুতরাং কোরেশেরা বুঝিল, মুসলমানেরা এবার "মরিয়া" হইয়া বাহির হইয়াছেন, কা'ল তাঁহারা যে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন, আজ তাঁহারা প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেন না। এই ভাবিয়া কোরেশ সৈন্য নীরবে শিবির উঠাইয়া মক্কার দিকে পলায়ন করিল। কেবলমাত্র দুইজন সৈন্য মুসলমানের হস্তে ধৃত হইয়া পরে তাহাদের কৃতাপরাধ জন্য তরবারি মুখে পতিত হয়। (তৃতীয় হিজরী, শওয়াল মাস।)

৫। বদরের শেষ অভিযান।—"হামরায়ল আসদ" হইতে পলায়ন কালে, আবু-সুফিয়ান বলিয়া গিয়াছিলেন, আগামী বর্ষে পুনরায় কোরেশেরা বদরপ্রান্তরে মুসলমানদিগকে যুদ্ধাহ্বান করিবে এবং মুসলমান বীর বৃন্দের দর্প চূর্ণ করিবে। তদনুসারে তিনি পর বৎসর মুসলমানগণের মনে ভীতি উৎপাদন জন্য দূত মুখে বলিয়া পাঠাইলেন যে, কোরেশের অসংখ্য বীর সৈন্য শস্ত্রপাণি হইয়া মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বদর প্রান্তরে অপেক্ষা করিতেছে। ঐ দূতকে মদিনা পাঠাইয়া তাহার পশ্চাতে তিনি কোরেশ সৈন্য লইয়া বদর প্রান্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দূত মদিনায় পঁহুছিয়া মুসলমানদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিবার জন্য, পথে, ঘাটে—বাজারে—সর্ব্বত্র কোরেশ সৈন্যের বীরত্ব গাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল এবং যাহাতে মুসলমানেরা ভয়ে মদিনার বাহির না হন, তজ্জন্য ওহদ যুদ্ধে কোরেশের হাতে মুসলমানের শোচনীয় পরিণামের কাহিনী ঘরে ঘরে প্রচার করিতে লাগিল। কিন্তু কোন মুসলমানই, তাহার কথায় সাহস শূন্য বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। হজরত মোহাম্মদ সাহসী মুসলমান বীরবৃন্দের অধিনায়ক একমাত্র আল্লার উপর আত্ম নির্ভর করিয়া মদিনা হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব কথিত প্রান্তরে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

আবু সুফিয়ান তথনও বদরের উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এ অভিযানে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। তবে পূর্ব্ব বৎসরে তিনি বদরপ্রান্তরে পুনরায় মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া একপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিলেন—তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিলে কোরেশদিগের নিকট তাঁহার মান থাকিত না। কাজেই অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁহার অভিযানের আন্তরিক ইচ্ছা না থাকার কারণ এই যে, তিনি প্রথম বদর যুদ্ধে "ছাতুর" অভিযানে, ওহদের রণপ্রাঙ্গণে এবং 'হমারয়ল আসদের' অভিযানে স্বচক্ষে মুসলমান বীরবৃন্দের পরাক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মুসলমানের সমরে সে জয় লাভ করিতে পারিবেন না, তাহাতে তাঁহার কোনই সন্দেহ ছিল না। মুসলমানের শৌর্য্য-বীর্য্য যেন প্রতিনিমেষে তাঁহার নয়ন সমক্ষে অভিনীত হইতেছিল। এজন্য বদরের শেষ অভিযানে দূত মুখে মুসলমান কেশরীগণের শিবির নিবেশের বার্ত্তা শুনিয়া ভয়ে তাঁহার বক্ষঃস্থল দুরুদুরু করিয়া উঠিল—পা কাঁপিতে লাগিল—আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না।—দুর্ভিক্ষ রসদাভাব ইত্যাদির ভান করিয়া পথিমধ্য হইতে তিনি সসৈন্যে মক্কাভিমুখে পলায়ন করিলেন। হজরত মোহাম্মদ প্রিয় শিষ্য ও সহচরবর্গ সহ সপ্তাধিককাল তথায় অবস্থিতি করিয়া এবং বাণিজ্য-ব্যবসার দ্বারা বিপুল লাভবান হইয়া নির্ব্বিঘ্নে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন। (৪র্থ হিজরী জি-কায়দা মাস—৬২৫ খৃষ্টাব্দ)।

খন্দকের যুদ্ধ।—মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের উপর আরব অধিবাসীদিগের শত্রুতা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। মুসলমানগণের প্রথম শত্রু মক্কার কোরেশ দল, দ্বিতীয় শত্রু সমস্ত আরব পৌত্তলিক, এবং তৃতীয় শত্রু ইহুদিজাতি—তিন শত্রুই প্রবল। তাহারা একে একে শত্রুতা সাধন দ্বারা মুসলমানদিগকে দমিত করিতে পারিল না—দলে দলে পৃথক পৃথক ভাবে যুদ্ধ করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিল না—ঐ তিন সম্প্রদায় পরস্পর ষড়যন্ত্র করিয়া একত্র ও এক দলবদ্ধ হইয়া মুসলমান দলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ঐ সম্মিলিত শক্তিত্রয়ের সেনা সংখ্যা দশ হাজার।

হজরত মোহাম্মদের মাত্র তিন হাজার শিষ্য; তাঁহাদিগকে লইয়া মুক্ত প্রান্তরে দশ হাজার শত্রুর সম্মুখীন হওয়া কঠিন; অপিচ, নগর পুরুষশূন্য দেখিয়া কোরেশদিগের কতক সৈন্য চুপে চুপে তাহা আক্রমণ ও অধিকার লওয়াও বিচিত্র নহে। অতএব, হজরত মোহাম্মদ, শিষ্যগণের নিকট নগর রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সাল্‌মান ফারসী বিশেষ রণ-নিপুণ ও রণ-কৌশলজ্ঞ ছিলেন। * তাঁহার পরামর্শে মুসলমান বীরগণের মদিনায় থাকিয়া তাহা রক্ষা করা স্থির হইল—শত্রুর অবাধ-আক্রমণ নিবারণার্থে নগর-বাহিরে সুপ্রশস্ত ও সুগভীর খাত (খন্দক) খননের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইল। মুসলমানগণ প্রাণ-

---

* এই সালমানের বাস ফারস্তানে (পারসে) থাকায়, ইনি সোলায়মান ফারসী নামে আখ্যাত ছিলেন।

পণ যত্নে প্রবল উৎসাহে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ছয় দিবসে ঐ খাত খনন পূর্ব্বক আত্মরক্ষার উপযোগী মুরুচা শ্রেণী প্রস্তুত করিয়া লইলেন।

(পঞ্চম হিজরীর জি-কায়দা মাস—(৬২৭ খৃঃ অঃ *)—কোরেশ-কুল-নায়ক আবু সুফিয়ানের সেনাপতিত্বে দশ হাজার আরব সৈন্য মদিনা অবরোধ করিল। হজরত মোহাম্মদ একান্ত ভক্ত বিশ্বাসী তিন হাজার শিষ্য লইয়া অতুল সাহসে বিপুল বিক্রমে শত্রুর গতিরোধে দণ্ডায়মান হইলেন। নগর পার্শ্বে—মুসলমান শিবির—তাহার পরে মুসলমানের খণিত জলপূর্ণ প্রশস্ত খাত; ঐ খাতের পারে শত্রু শিবির। মুসলমানেরা ঐরূপে আত্মরক্ষা ও নগর রক্ষায় নিরত ও শশব্যস্ত—ঠিক সেই সময়ে মদিনার বণি-কোরায়জা সম্প্রদায়ের ইহুদিগণ, সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মুসলমান বহিঃশত্রুর হস্তে আত্মরক্ষা করিবে, না ভিতরের বিদ্রোহ দমন করিবেন? এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়া মুসলমানকে নিশ্চয় ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হইবে, বণি-কোরায়জার বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করিবার ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্রোহীগণের এই উদ্দেশ্য, বুঝিতে হজরত মোহাম্মদের বিলম্ব হইল না—এজন্য তিনি বিদ্রোহ দমনে বল নিয়োগ করিলেন না; তাহাদের অনেকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমানের বিপক্ষে অবরোধে যোগ দিল, তাহাতে তিনি সামান্য মাত্রও বাধা দিলেন না—কেবলমাত্র মুসলমানগণের বাসস্থান রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত তিন শত সৈন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন!

মুসলমানের ভিতরে শত্রু, বাহিরে শত্রু; তাহার উপর খাদ্যাভাব। ক্ষুধায় অবসন্ন ও ক্লান্ত কলেবর হইয়াও তাঁহারা একমাত্র আল্লার উপর নির্ভর করিয়া বিপুল সাহসে প্রাণপণে শত্রুর প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন। শত্রুপক্ষ মুরুচা অধিকার জন্য বারংবার চেষ্টা করিয়াও মোসলেম বীরগণের প্রতাপ পরাক্রমে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কোরেশ কুলাঙ্গারেরা রজনীর অন্ধকারে নিঃশব্দে খাত পার হইয়া, হজরত মোহাম্মদের শিবির আক্রমণের উদ্যোগ করিল, সশস্ত্র মোসলেম প্রহরীর সতর্কতা ও ভক্তি প্রবণতা, তাহাদিগকে বিফলোদ্যোগ করিয়া দিল। স্বয়ং সেনাপতি আবু সুফিয়ান মুসলমান শিবির-আক্রমণোদ্দেশ্যে দলে দলে সাহসী সৈন্যসহ সাঁতার দিয়া বারংবার খাত পার হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা মুরুচা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ ও প্রস্তর ক্ষেপণ দ্বারা সে উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অতঃপর একদা আমর (আমর বেন্ আব্দওদ) নামক এক খ্যাতনামা কোরেশ বীর, কতিপয় দুর্নিবার কোরেশ সৈন্য লইয়া সাঁতার দিয়া মুসলমানের বাধা বিঘ্নকে তাচ্ছিল্য করিয়া খাত পার হইয়া প্রান্তরে দাঁড়াইয়া মুসলমান শিবির দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "হল মেন মোবারেজেন্।" (কে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে?) তাহার ঐ অহঙ্কার পূর্ণ কঠোর কণ্ঠধ্বনি বজ্রধ্বনির ন্যায় ভয়ঙ্কর; তাহাতে অনেক মুসলমানের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! ভয়ে পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরকুলকেশরী মহাবল আলী, শত্রুসৈন্যের ঐ সকল সমরাহ্বান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মগুরুর আজ্ঞা লইয়া ক্রোধারক্ত

* কোন কোন ইউরোপীয়-ঐতিহাসিক ৬২৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন।

লোচনে "জুলফেকার" নামক অসিহস্তে শক্র-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমর তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার উপর লম্ফ দিয়া পড়িল। উভয়ে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। উভয় পক্ষ রণপ্রাঙ্গণে দুই সমতুল্য বীরের রণ কৌশল দূর হইতে নিশ্চল ও নিস্পন্দ ভাবে নিবদ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। উভয় অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিল; শেষে "আল্লাহো-আকবর" এই গুরু গম্ভীর মহান ধ্বনির সহিত আমরের ছিন্ন মুণ্ড রণস্থলে গড়াইয়া পড়িল। তৎপর মহাবল আলি অপর কোরেশদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে জুলফেকারে ভীষণাঘাতে যমঘরে প্রেরণ করিলেন; অবশিষ্টেরা ভীতি বিহ্বল চিত্তে সবেগে সন্তরণে খাত পার হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

আবু সুফিয়ান প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, দশ হাজার সৈন্য এক কালে মদিনা বেষ্টন করিতে যাইতেছে শুনিলে, মুষ্টিমেয় মুসলমান ভয়ে নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে—মদিনা অবরোধ হইলে মুসলমানেরা রসদের অভাবে কাতর হইয়া আত্ম সমর্পণ করিবে—যুদ্ধ করিলে নিশ্চয় ধ্বংস মুখে পতিত হইবে—মদিনায় মুসলমানের নাম গন্ধ থাকিবে না। কিন্তু, নগর অবরোধের পর মুসলমানের বল পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ভ্রম দূর হইল।—বুঝিলেন একটি মাত্রও মুসলমান জীবিত থাকিতে তাহারা পলায়ন বা আত্ম সমর্পণ করিবে না কিম্বা নগর অধিকার করিতে দিবে না। তাঁহার এক দিকে ঐ চিন্তা—অন্য দিকে রসদের চিন্তা—অবরোধে ২০ দিন কাটিয়াছে—সঞ্চিত রসদ শেষ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু, ইহুদী ও আরব জাতির মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়া তাহাদের একতা ভঙ্গ হইয়াছে। উভয় জাতিই অবরোধ ছাড়িয়া পলায়নে উদ্যত হইয়াছে। আবু সুফিয়ান ঐ উভয় জাতির মনোমালিন্য মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু দৈব তাঁহার প্রতিকূল হইয়া সে সুযোগ বা অবকাশ দিল না। রাত্রিকালে আকাশ সহসা ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইল—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের কড় কড় ডাক—মহা ঝটিকা। সেই ভীষণ ঝটিকা পূর্ণ প্রভাবে অবরোধকারী সৈন্য দলের উপর আপতিত হইল—তাহাদের শিবির সকল বায়ুতাড়নায় প্রতিহত ও ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া তুলা রাশির ন্যায় উড়িয়া গেল—দ্রব্য সামগ্রী ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল—দৈব বল তাহাদিগকে একেবারে হত বল করিয়া ফেলিল। কোনরূপে তাহাদিগকে তিষ্ঠিতে দিল না। তাহারা ঐরূপে বিপন্ন ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অবরোধ ছাড়িয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল। আবু সুফিয়ান বিফল মনোরথ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া মক্কার দিকে পলায়ন করিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে মুসলমানেরা অক্ষত শরীরে নগর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।—মুসলমান ইতিহাসে এই যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)

আবদুল লতিফ।

আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম।

আজ পৃথিবীময় প্রতিধ্বনি হইতেছে—"নূতন জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন, ধর্ম্মের ভিত্তি উৎপাটিত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে"। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, দর্শনের এই আন্দোলন, কোন নূতন ঘটনা নহে, চিরদিনই এতদুভয়ের মধ্যে, যুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, এবং চির দিনই দর্শন, ধর্ম্মের সম্মুখে এইরূপ অযথা আন্দোলন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু দর্শনের পক্ষ হইতে আজ এরূপ দাবী করা হইতেছে যে, "পৌরাণিক দর্শন অনুমান ও কল্পনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই জন্য তাহা ধর্ম্মের মুলোৎপাটন করিতে সমর্থ হয় নাই ; কিন্তু বর্ত্তমান দর্শন পরীক্ষাও প্রত্যক্ষের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ধর্ম্ম এখন আর কোনরূপেই তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না"।

আধুনিক ইউরোপ হইতে, এই ধ্বনি উত্থিত হইয়া তাহা সমস্ত জগৎময় প্রতিধ্বনিত হই-হইতেছে। কিন্তু এই উদ্ভট মতের মধ্যে কতটুকু সত্য নিহিত রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

কতিপয় জিনিষের সমষ্টিই পৌরাণিক গ্রীকদিগের দর্শন ছিল। কি প্রকৃতি তত্ত্ব, কি ঈশ্বর-তত্ত্ব, কি আকাশ-তত্ত্ব, কি ভূ-তত্ত্ব, স্বাদ-তত্ত্ব, বর্ণ-তত্ত্ব ইত্যাদি সবই দর্শন নামে অভিহিত হইত। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, নিতান্ত দক্ষতার সহিত এ সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সকল বিষয় পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, তাহা "সায়ান্স" (বিজ্ঞান) নামে অভিহিত হইতেছে, এবং যে সকল বিষয় এখনও পরীক্ষার সীমার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহা "দর্শন" (ফিলসফি) নামে অভিহিত হইতেছে।

এই আধুনিক দর্শন বিজ্ঞান, "পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইয়া গিয়াছে" বলিয়া যে মত প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহাতে প্রথম ভ্রম এই যে, যে জিনিস স্থির সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা কেবল বিজ্ঞানের বিষয় সমূহ মাত্র, এবং এইজন্য বিজ্ঞান-সম্মত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে পণ্ডিত-গণের মধ্যে মতদ্বৈধতা পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু দর্শনের অবস্থা অন্যরূপ, বর্ত্তমান পাশ্চাত্যদেশে দর্শনের বহু বিদ্যালয় বিদ্যমান, এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এতই অধিক মতদ্বৈধতা পরিদৃষ্ট হয় যে, সে সমস্ত বিষয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা আর একই জিনিষকে একবার সাদা বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনরায় কাল বলিয়া গ্রহণ করা, একই কথা।

এখন দেখিতে হইবে যে, ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কি ? বিজ্ঞান যে সমস্ত জিনিষের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করে, সেই সকল জিনিসের সহিত ধর্ম্মের বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ আছে কি ? জড়-পদার্থ (عنصر) কত প্রকার, জলের সহিত কি কি জিনিষের সংমিশ্রণ আছে ? বায়ুর ওজন কি ? বিদ্যুতের গতি কিরূপ ? ইত্যাদি বিষয় সমূহ বিজ্ঞানের পরীক্ষার বা আলোচনার বিষয়,

কিন্তু এই সকল বিষয়ের সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রবই নাই। ধর্ম্ম, যে সকল বিষয় লইয়া বিতর্ক বা আলোচনা করিয়া থাকে তাহা, যথা—আল্লাহতাআলার অস্তিত্ব আছে কিনা? পাপ পুণ্য বা সত্য মিথ্যা ও ভাল মন্দ বলিয়া কোন জিনিষ আছে কিনা? শাস্তি এবং পুরস্কার আছে কিনা? মানব কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায় যাইবে? ইত্যাদি। ইহার মধ্যে কোন্‌ বিষয়টি এমন আছে, বিজ্ঞানের মাপ-কাটি যাহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিতে সক্ষম? এই সকল বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞান-গুরুগণ যখনই যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "এই সকল বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের নাই, "ইহা পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়" কিম্বা "এই সকল বিষয়ে আমাদিগের বিশ্বাস নাই, যেহেতু আমরা মাত্র ঐ সকল বিষয়ে বিশ্বাস করি, যাহা পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে"।

যাহাদের দৃষ্টি-শক্তি নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব, তাহারা সকল বিষয়েই "উহা কিছু নয়" বলিয়া আস্ফালন করিতে অত্যন্ত অভ্যস্ত। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, "এ সকল বিষয় আমরা অবগত নহি" অনভিজ্ঞেরা তাহার এই অর্থ করিয়া লইয়াছে যে, "এই সকল বিষয়ের অস্তিত্বই নাই। বস্তুতঃ এই দুইটী মতের মধ্যে, আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। ইউরোপে শ্রম-বিভাগ-নীতির উপর কর্ম্ম-বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তথাকার সুধী মণ্ডলী পরস্পর আপনাপন কর্ম্ম-কেন্দ্র নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। যিনি বা যে সম্প্রদায় যে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; তাঁহার বা সেই সম্প্রদায়ের সেই কার্য্যে এতই অভিনিবেশ যে, অন্য বিষয়ের চিন্তা করিবার অবসরও তাঁহারা পান না, এবং এরূপ করাও তাঁহারা অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া মনে করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে, এক সম্প্রদায় জড়বাদী আছেন। জড়বিজ্ঞানের আলোচনা ও সাধনাই তাঁহাদিগের জীবনের মুখ্য লক্ষ্য। ইহাঁরা জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে অত্যদ্ভুত এবং অভিনব বিষয় সকল আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই এক সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, "ইহাঁরা ধর্ম্মের অস্তিত্ব, খোদার অস্তিত্ব, বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বরং তাঁহারা বলেন যে, "এই সকল বিষয়ের প্রমাণ আমাদিগের অনুসন্ধানের সীমার বাহিরে"। এই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত পণ্ডিত প্রফেসর "লিথার" বলিতেছেন যে, "যেহেতু প্রাকৃতিক জগতের আদি কোথায় ও অন্ত কোথায়, সে সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ, এইজন্য যেমনি কোন অনাদি অনন্ত বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করাও আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে, তেমনি এই সকল বিষয়ের অনুকূলের প্রমাণ সংগ্রহ করাও আমাদিগের নির্ব্বাচিত কর্ম্মসীমার অন্তর্ভুক্ত নহে। জড় বিজ্ঞানের সাধক সম্প্রদায় সৃষ্টির মূলতত্ত্বের আলোচনায় একেবারে বিরত রহিয়াছেন, যেহেতু এতৎ সংস্পৃষ্ট কোন প্রকার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগের নাই। আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণকারীও নই, এবং অস্বীকারকারীও নই, আমাদিগের কর্ম্মকেন্দ্র এতদুভয়ের সীমার বাহিরে অবস্থিত"।

একবার ফ্রান্সের এক মেডিকেল ম্যাগাজিনে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, "মস্তিকে যে ফস্‌ফরাস্‌ আছে, তাহা হইতেই চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হয়, এবং

মানবের গুণ সকল—যেমন, বীরত্ব, সত্যবাদিত্ব, নম্রতা ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার ফল মাত্র ”। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ফ্রান্সের বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ “ কিমাল ফালা মারিয়া” এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উক্ত প্রবন্ধকারের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, “ তোমাদিগের এরূপ দাবী করিবার কি অধিকার আছে ? ‘নিউটন’ কোন বিষয় বর্ণনা করিবার সময় বলিতেন যে, “ বাহ্যতঃ এইরূপ বোধ হইতেছে ” তোমরা তাহার বিপরীত নীতি অবলম্বন করতঃ, “ ইহা স্বতঃসিদ্ধ,” “ জ্ঞান কর্ত্তৃক ইহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে,” “ আমরা ইহা পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছি,” “ ইহা অবিসম্বাদিতরূপে সত্য ” ইত্যাদি বলিয়া দাবী কর। কিন্তু বস্তুতঃ তোমাদিগের এই দাবীতে জ্ঞানের কণামাত্রও নাই। বরং যদি তোমাদিগের এই অন্যায় দাবী জ্ঞানের কর্ণে প্রবেশ করে (এবং প্রবেশ করাই চাই, যেহেতু তুমি জ্ঞানের সন্তান) তাহা হইলে তোমাদিগের এই দুঃসাহস দৃষ্টে তাহার হাসি পাইবে ”।

ইহা গেল যথার্থ বৈজ্ঞানিকের কথা, কিন্তু অপরাপর সঙ্কীর্ণচেতা নিকৃষ্ট জড়বাদিগণ, নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের দিকে দৃকপাৎ না করিয়া, নিজের সীমা অতিক্রম করতঃ এই সকল গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে একেবারেই “ না ” বলিয়া বসেন, এবং তাঁহাদিগেরই অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদিগের দেশের যুবকগণ “ প্রত্যক্ষ না করিয়া কোন বিষয়ের অনুকরণ করা জ্ঞানের বিপরীত” বলিয়া দাবী করিয়া একেবারে জাত অন্ধ অনুগামী সাজিতেছেন, ইহাঁরা এবম্বিধ নিকৃষ্ট মানবের অনুকরণ করিবার সময় বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, কিন্তু যে সমস্ত মহাপুরুষগণ কেবলমাত্র বিশ্বমানবের সর্ব্ববিধ হিত কামনায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, জীবনের প্রথম হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাঁহারা কেবলই মানবের ইহ-পরকালের হিতচিন্তা ও তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা জীবনে কখনও মিথ্যার সংস্পর্শে যান নাই, অতি ঘৃণ্য লোভ ও স্বার্থের লেশ মাত্রও যাঁহাদিগকে কখনও স্পর্শও করিতে পারে নাই, সংসারের আবর্জ্জনা ময়লা রাশি যাঁহাদিগের পবিত্র অঙ্গ পর্য্যন্তও কখনও পৌছিতে পারে নাই। সেই সকল খোদা তাআলার অতি প্রিয়পাত্র, বিশ্ব-মানবের অতীব ঘনিষ্টতম বন্ধু, কোটি কোটি নর নারীর ইহ পরকালের নিয়ামক, যাঁহাদিগের অতীব মহান পবিত্র জীবনের প্রভাবে এখনও জগত তিষ্ঠিয়া আছে, তাঁহাদিগেরই অনুকরণ করিবার সময় যত আপত্তি, যত গোলমাল। কিন্তু একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আমাদিগের জীবনকে কোন পথে চালিত করিতেছি ? আমরা বিজ্ঞান বিষয়ে যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিতেছি, তাহাদিগের মধ্যে কি মতদ্বৈধতা নাই ? এবং যে পরমাণুর উপর বিজ্ঞান রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহাও কি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়াছি ? ফল কথা, অনুকরণ না করিয়া বাঁচাবাঁচি নাই, তা কি বিজ্ঞান বিষয়ে, কি আধ্যাত্ম বিষয়ে। বিজ্ঞান বিষয়ে “ নিউটনের ” মতন জ্ঞান আমার নাই বলিয়া যেমন তাঁহার অনুকরণ করি, তেমনই আধ্যাত্ম-বিষয়ে সেরূপ জ্ঞান আমার নাই বলিয়া আধ্যাত্ম গুরুর অনুকরণ করিতে আমি বাধ্য। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও আধ্যাত্ম-জগতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারেন নাই, আর পারিবেনও না। অতদূর যাইবার আবশ্যক কি ?

বিদেশে বসিয়া সংবাদ পাইলাম, ছেলের জ্বর হইয়াছে, অমনি প্রত্যক্ষ না করিয়া মাত্র সংবাদের অনুকরণ করি। আমরা এস্থলে একটা অতীব গুরুতর বিষয়—আত্মা সম্বন্ধে, এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত কি তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। ডাক্তার "শ্যাফ্‌লার" বলেন "আত্মা জড় প্রকৃতির একটা শক্তির নাম মাত্র"। "দেরশু" বলেন—"আত্মা এক প্রকার মিকানিকেল ক্রিয়া মাত্র," "বু্‌শোজার" বলেন "মানুষ জড় প্রকৃতির একটা ফল মাত্র"। এ সম্বন্ধে এবম্বিধ শত শত উদ্ভট মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, আমরা অনর্থক প্রবন্ধ বাড়িবার ভয়ে এবং পাঠকের বিরক্তির আশঙ্কায় ক্ষান্ত রহিলাম।

ইহাঁদিগের এই সকল পরস্পর বিরোধী মত দৃষ্টে কেহ কি বলিতে পারিবেন যে, ইহাঁদের মত স্বতঃসিদ্ধ। এবং ইহাও কি কেহ বলিতে সাহসী হইবেন যে, ইহাঁরা আত্মাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। মূল কথা এই যে, ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান পরস্পরের সীমানার মধ্যে একটা ব্যবধান আছে, বিজ্ঞানের ক্রিয়া কলাপের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং ধর্ম্ম যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক করে, তাহাতে বিজ্ঞানের প্রবেশাধিকার নাই। বস্তুতঃ যদিও ধর্ম্মের সহিত দর্শনের কখনও কখনও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং হওয়ার সম্ভাবনাও আছে, কিন্তু তাহাতেও বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু দার্শনিকদিগের মত যে স্বতঃসিদ্ধ, এমন দাবী কেহই করিতে পারেন না, ইহাঁদিগের মধ্যে মতদ্বৈধতার পরিসীমা নাই, একজনের সহিত অপরের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের, এক বিদ্যালয়ের সহিত অপর বিদ্যালয়ের, কোনই সামঞ্জস্য নাই। বরং অত্যন্ত মতদ্বৈধতা বিদ্যমান। ইহাঁদিগের মধ্যে যেমন কেহ কেহ নাস্তিক আছে তেমনই আবার বহু আস্তিকও আছেন। অনেকে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, আবার কেহ কেহ স্বীকার করেন না। নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে এক সম্প্রদায়ের যাহা মত, অন্য সম্প্রদায়ের তাহার মত ঘোর বিপরীত। এ ক্ষেত্রে শত্রুকে পরস্পর যুদ্ধে মগ্ন দেখিয়া ধর্ম্ম দূরে বসিয়া তামাসা দেখিবার অবসর পায়। পক্ষান্তরে দর্শন যখন শিষ্ট শান্তভাবে ধর্ম্মের ক্রোড়ে যাইয়া আশ্রয় লয়, তখন সে ভক্তি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে তাহাকে বলিতে বাধ্য হয় যে, হে মহাশয়! আমি নীচ, তুমি উচ্চ, আমি শিষ্য তুমি গুরু, আমি অপূর্ণ তুমি পূর্ণ, আমার যেস্থানে সমাপ্তি সেই স্থান হইতে তোমার আরম্ভ।

প্রশ্ন জটিল হইতে জটিলতর হয় তখনই, যখন বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে কেহ নিজের সীমা অতিক্রম করতঃ অন্যের সীমায় অনধিকার প্রবেশ করে। বস্তুতঃ এই জটিল প্রশ্নই নাস্তিক ও ধর্ম্ম অস্বীকারকারীদিগের ধারণাকে আরও দৃঢ়তর করিয়াছে। বরং আমাদিগের মনে হয়, এই জটিল বিতর্কই নাস্তিক ও অবিশ্বাসীদলের সৃষ্টি করিয়াছে, প্রথমে ইউরোপে ধর্ম্মের প্রসার এতই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, কোন প্রকার শিক্ষা বা জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন ধর্ম্মের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইত না। ধর্ম্ম মতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলে কিনা তাহার অনুসন্ধান লইয়া তাহাদিগের প্রতি ধর্ম্মচ্যুতির ব্যবস্থা প্রদান করতঃ শাস্তি প্রদান উদ্দেশ্যে "স্পেন" দেশে "এন কেভি জেসন" নামে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সমিতি ১৪৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে

১৪৯৯ পর্য্যন্ত আঠার বৎসরের মধ্যে ১০,২২২ দশ হাজার দুই শত বাইশ জন লোককে ধর্ম্ম-চ্যুতির অপরাধে জলন্ত অগ্নিতে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়াছিল। এই সমিতি তাহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার (৩৪০০০০) মানুষের বিরুদ্ধে ধর্ম্মদ্রোহীতা ও নাস্তিকতাবাদ দোষ আনায়ন করতঃ তাহাদিগের অধিকাংশকেই জীবন্ত, আগুনে পুড়াইয়া মারিয়াছিল।

যে সকল কথা লইয়া এই শত সহস্র ঈশ্বরের দাসদিগের উপর ধর্ম্ম-চ্যুতির 'ফতোয়া' প্রদান করতঃ তাহাদিগকে জীবন্ত, অনলে দগ্ধিয়া হত্যা করা হইয়াছিল, পাঠকদিগের গোচরীভূত করিবার জন্য উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে আমরা তাহার দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব মাত্র। "কুপার নিক্স" যখন পৌরাণিক গ্রীক পণ্ডিত "বেত্‌লিমিউসের" মতের বিরুদ্ধে সপ্রমাণ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন যে, "পৃথিবী এবং চন্দ্র, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তখন উক্ত সমিতি তাঁহার এই মত "পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তকের (বাইবেলের) বিরুদ্ধ" বলিয়া তাঁহার উপর ধর্ম্ম-দ্রোহিতার ফতোয়া জারি করিল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা "গেলিলিউ" "কুপার নিক্সের" পক্ষ সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করতঃ তাহাতে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন—"পৃথিবী এবং চন্দ্র, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।" ইহাতে সমিতি তাঁহাকে শাস্তির উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করতঃ তাঁহাকে উপস্থিত করিয়া স্বীয় মত পরিহারের জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি স্বীয় বিশ্বাস পরিহার করিলেন না, এ জন্য তাঁহাকে দশ বৎসর কাল কারাগৃহে বাস করিতে হইয়াছিল।

"কলম্বাস" যখন কোন নূতন দ্বীপ আবিষ্কারের আশায় সমুদ্র ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ধর্ম্ম-যাজক ব্যবস্থা দিলেন যে, "এবম্বিধ ধারণা ধর্ম্ম মতের বিরুদ্ধ।" "পৃথিবী ঘূর্ণায়মান এই মত প্রচার হইলে পাদ্রীগণ ইহা পবিত্র পুস্তকের (বাইবেলের) বিপরীত মত বলিয়া ঘোষণা করতঃ তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন।

ফল কথা, কি বিজ্ঞানের উন্নতি, কি শিল্পের উৎকর্ষ, কি জ্ঞানের উন্নতি, কি দর্শনের আলোচনা, যে দিকেই যাও, সেই দিকেই সর্ব্ববিধ উন্নতি ও আবিষ্কারের প্রতিকূলে ধর্ম্ম পুস্তক "বাইবেল" হস্তে লইয়া লৌহপ্রাচীরবৎ খ্রীষ্টপাদ্রীগণ দণ্ডায়মান। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, প্রকৃতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা সময়ের স্রোতের প্রতিকূলে কে, কবে তিষ্ঠিতে পারিয়াছে? বরং অন্যায় ভাবে যে দাঁড়াইয়াছে, ঐ স্রোত তাহাকেই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। পাদ্রীদিগের সকল চেষ্টা বিফল ও সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, জ্ঞান উন্নতি লাভই করিয়াছে, পরন্তু ধর্ম্ম-যাজকগণও ধর্ম্মের নামে বিদ্বেষ ও মিথ্যা দ্বারা জ্ঞানকে ধামা চাপা দিতে পারিলেন না, কিন্তু ইহার শেষফল কি হইল? এই নব যুগের নব ভাবের ভাবুক নূতন শিক্ষিত সম্প্রদায়, পাদ্রীদিগের এই অদ্ভুত ধারণা ও মিথ্যার উপাসনাকেই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া ধর্ম্মের নামে

চিরদিনের জন্য (অন্ততঃ প্রকৃতি আবার যতদিন ইহাদিগকে সত্যের পথে পরিচালিত না করে) ভীতিশীল হইয়া গেল। এবং এইজন্য " ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিপন্থী " এই ধারণা তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গেল। প্রত্যুত সেই প্রাথমিক ধারণা আজ পর্য্যন্ত ইউরোপ হইতে পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির প্রারম্ভে, যদি তাহার প্রতিকূলে এইরূপ উদ্ভট ধর্ম্ম লইয়া পাদ্রীগণ দণ্ডায়মান না হইতেন, এবং যদি কেহ যাহা যথার্থ ধর্ম্ম, যাহা মানবের যথার্থ স্বভাবের অনুকূল বই প্রতিকূল নহে, তাহাই তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ জগতের সম্মুখে এই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইত না, এবং মানবের ভবিষ্যৎ-বংশীয়-দিগের সর্ব্ববিধ উন্নতির চরমমার্গে আরোহণের জন্য যে, জ্ঞানসৌধ রচিত হইয়াছিল, তাহাই আজ উপড়াইয়া পড়িয়া মনুষ্যজাতিকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত হইত না। ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের যোগে, কর্ম্মের সাধনাকে মধুময় করিয়া তুলিত, এবং ভবিষ্য মানব-সন্তানগণ যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহার ফলভোগের অধিকারী হইতে পারিত। কিন্তু হায়! মানবের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হয় নাই, বরং পাশ্চাত্যের এই ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত কর্ম্মের সাধনা, এতদবধি কেবল দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, এবং বিকট স্বার্থের উৎকট দাবদাহে ইন্ধন যোগাইয়া আসিয়াছে, এবং আজ, " তাহা আরও কিছুদিন এইভাবে পিশাচের তাণ্ডব লীলা করিতে সমর্থ হইবে, না সমূলে ধ্বংসরূপে পরিণত হইবে," সেই প্রশ্ন উত্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ খৃষ্ট ধর্ম্ম যাজকগণ ধর্ম্মের নামে যে জিনিষটাকে বিজ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তাহা বিজ্ঞানের সম্মুখে তিষ্ঠিতে কখনই সক্ষম নয়। কিন্তু এস্‌লাম প্রথমেই বলিয়া দিয়াছিল যে,—

انتم اعلم بامور دنياكم

অর্থাৎ—"পার্থিব জগতের বিষয়ে তোমরাই অধিকতর অবগত"। এ কথা বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই যে, সর্ব্ববিধ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এই পার্থিব জগতের সংসৃষ্ট জিনিষ। আত্মা ও পরলোক তত্ত্বের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই।

এস্থলে একটি বিশেষ চিন্তার বিষয় এই যে, মুসলমানদিগের মধ্যে বহু সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং সামান্য সামান্য বিষয়ে মতদ্বৈধতা লইয়া এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ধর্ম্মের হিসাবে গুরুতর দোষে দোষী সাব্যস্ত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই "। সকলই হইয়াছে—কিন্তু জ্ঞানোন্নতি, শিল্পের উৎকর্ষ, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা, ইত্যাদি বিষয় লইয়া কখনও কোন সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই। বরং এস্‌লাম মণ্ডলীর সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ব্যবস্থাপকগণ সর্ব্ববিধ উন্নতির পৃষ্ঠ পোষক হইয়া আসিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাতা-গণের মধ্যে অনেকের ধারণা ছিল যে, "আকাশ হইতে বারি বর্ষণ হয়, অর্থাৎ আকাশে এক-নদী আছে, মেঘ সেই নদী হইতে জল লইয়া ভূতলে বর্ষণ করে। সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন সে এক

ঝরণায় আত্মগোপন করে, পৃথিবী স্থিতিশীল,” এই সকল বিষয় তাঁহারা কোরআনের উক্তি হইতে সত্য বলিয়া বুঝিতেন। পরবর্ত্তী কালের পবিত্র কোরআনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা বহু বিদ্যাবিৎ, বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিত এমাম ফখর-উদ্দিন রাজি পৌরাণিক ব্যাখ্যাতৃগণের ঐ সকল মত তাঁহার সুবিখ্যাত “ তফসির-কবীরে ” উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের উপাসক, আব্বাছ বংশীয় খলিফাগণের শাসনকালে, দর্শন বিজ্ঞানের উন্নতির সহিতই লোকে কোরআনের পৌরাণিক ব্যাখ্যাতাগণের ঐ সকল মত অস্বীকার করিয়া নূতন ব্যাখ্যা জন সমাজে প্রচার করিয়াছিল। ইহাতে যাহারা পৌরাণিক ব্যাখ্যাতাগণের অনুকরণে কোরআনের ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহারা এই নব ব্যাখ্যাতাদিগের প্রতি ধর্ম্মচ্যুতি, বিপথগামী ইত্যাদি কোনরূপ দোষ আনায়ন করেন নাই। ফল কথা, যতই অনুসন্ধান কর না কেন? এস্‌লাম জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও নব নব আবিষ্কারের অনুকূলে পরম হিতৈষী বন্ধুরূপে দণ্ডায়মান হওয়া ব্যতীত, শত্রুরূপে তাহার প্রতিকূলে কখনও দণ্ডায়মান হয় নাই। বরং এস্‌লাম ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দাতৃগণ, পরিষ্কাররূপে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন যে, জড়তত্ত্ব প্রভৃতি প্রেরিতত্বের সীমার অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়, এবং প্রেরিত পুরুষগণের আবিভাবের মুখ্যোদ্দেশ্য, মানব জাতিকে আধ্যাত্মতত্ত্ব, বা আত্মাতত্ত্ব, নীতি ও চরিত্র শিক্ষা প্রদান এবং তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলিত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সর্ব্বশাস্ত্রে মহা পণ্ডিত কোরআনের নিগূঢ় মর্ম্মোদ্ঘাটক সুবিখ্যাত শাহ অলি-উল্লাহ্ মোহাদ্দেস্ সাহেব, তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক “ হোজ্জাতুল্লাহেল বালেগা ” (حجة الله البالغة)তে লিখিতেছেন।

و من سيرتهم ان لا يشتغلوا بما لا يتعلق بتهذيب النفس و سياسة الامة ابيان اسباب حوادث الجو من المطر والكسوف والهالة و عجائب النبات والحيوان و مقادير سيرالشمس والقمر و اسباب الحوادث اليومية و قصص الانبياء والملوك والبلدان ونحوها اللهم الا كلمات يسيرة الفها اسماعهم و قبلها عقولهم يؤتى بها فى التذكير بالاء الله والتذكير بايام الله على سبيل الا ستطراد بكلام اجمالى يسامح فى مثله بايراد الاستعارات والمجازات و لهذا الاصل لما سالوالنبى عن لمية نقصان القمر و زيادته اعرض الله تعالى عن ذالك الى بيان فوائد الشهور فقال يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج

অর্থ :—“ পয়গম্বরের ” (প্রেরিত পুরুষের) শিক্ষার আর এক নীতি এই যে, যে সকল বিষয় আত্মার উৎকর্ষ ও মণ্ডলীর নৈতিক চরিত্র গঠনের ও শৃঙ্খলা সম্পাদনের সহিত সংসৃষ্ট নয়, সে সকল বিষয়ে তাঁহারা লিপ্ত হন না। যথা মেঘের উৎপত্তি, (চন্দ্র সূর্য্যের) গ্রহণ, ও চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির হেতু, অথবা উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের বৈচিত্রতা, কিম্বা চন্দ্র সূর্য্যের গতি, এবং প্রাকৃতিক জগতের দৈনন্দিন পরিবর্ত্তনের কারণ, পয়গম্বর ও রাজ্যাধিপতিদিগের কাহিনী,

এবং নগরাদির অবস্থা বর্ণনা করা। এই সকল বিষয় লইয়া তাঁহারা আলোচনা করেন না, তবে অবশ্য যে সকল সাধারণ বিষয় লোকে শ্রুত হইয়াছে এবং তাহাদের জ্ঞান যে সকল বিষয়কে গ্রহণ করিয়াছে, পয়গম্বরগণের দ্বারা খোদাতাআলার অসীমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনার সহিত গৌণরূপে এমন কতিপয় বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়া থাকে। এবং এস্থলেও তাঁহারা বিষয়ের মৌলিকত্বের ব্যখ্যা না করিয়া অন্যার্থে কার্য্য সমাধা করেন। এইজন্য চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির হেতু সম্বন্ধে লোকে হজরতের নিকট প্রশ্ন করিলে, তিনি প্রত্যাদেশ অনুযায়ী, ইহার উত্তর দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে ইহার দ্বারা মাস (সময়) নির্ণয় হয় এই গুণ ব্যখ্যা করিয়াছিলেন" যথা—

و یسئلونک - الخ

"শাহ সাহেবের এই সিদ্ধান্তের পরে কে বলিতে পারিবেন যে, আধুনিক দর্শন বিজ্ঞান এস্লামের প্রতি বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপে সমর্থ হইবে"।*

আহ্মদ আলী।

* "এসলামই জগতের একমাত্র প্রাকৃতিক ধর্ম্ম" নামে যে সারগর্ভ ও মূল্যবান পুস্তকখানি "মোহাম্মদী-প্রেসে" মুদ্রিত হইতেছে, তাহার একটী অধ্যায় এই প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইল। —লেখক।

শ্রীহট্টে এসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।

পবিত্র তেজপুঞ্জঃ সিদ্ধপুরুষ হজরত শাহজালাল আজ বিজয়ী-বেশে শ্রীহট্টে সম্পস্থিত। 'একমেবাদ্বিতীয়ম' বা একেশ্বরবাদ-তত্ত্বের বজ্র-গম্ভীর-নির্ঘোষে বহুদেববাদ, পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গাবলী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পবিত্র সনাতন এসলামের জয়ধ্বজা আজ শ্রীহট্টে সুপ্রথিত। এসলামের সেই একদিন আর আজ একদিন। যে দিন অগণিত উগ্র-স্বভাব কোরেশগণের উদ্ধত তীক্ষ্ণধার তরবারি-সম্মুখে, এসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার মুষ্টিমেয় ভক্ত ও শিষ্য, পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদন ও সনাতন একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে যাইয়া, নির্ম্মমভাবে প্রহৃত ও নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন; সেদিন কে ভাবিয়াছিল যে, দুই দিন পরে, সেই এসলাম, সুদূর হিস্পানী হইতে জাপান পর্য্যন্ত আপনার কীর্ত্তিধ্বজা প্রতিষ্টিত করিতে পারিবে—জগতের ভ্রমান্ধ ও মোহান্ধ এবং কুসংস্কার-তমসাচ্ছন্ন মানবমণ্ডলীকে একমাত্র নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাসী ও ভক্তিমান করিতে সমর্থ হইবে?

কতিপয় এসলামদ্বেষী-লেখক প্রায়শঃ প্রচার করিয়া থাকেন যে, এসলাম ধর্ম্ম ক্ষাত্র-শক্তিতে তরবারি বলে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের এই স্বকপোলকল্পিত অপবাদের অমূলকতা ও অসারতা প্রত্যেক ন্যায়দর্শী ও সত্যাশরণ ব্যক্তিই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন। আজ যে ইংলণ্ডে, চীনে, জাপানে ও আফ্রিকায় দলে দলে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো' মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছেন, তাহা কোন তরবারি-সাহায্যে? খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রধান পীঠস্থান লণ্ডনের বক্ষে বাস করিয়া, আভিজাত্য বংশ সম্ভূত ষষ্ঠি বর্ষীয় বৃদ্ধ খৃষ্ট-শিষ্য লর্ড হেডলী যখন পবিত্র এসলাম-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া স্বেচ্ছায় অনুতপ্ত অন্তকরণে এসলামিক মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তখন তরবারি কোথায় ছিল? আর আজ যে মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার অগণিত জনসংঙ্ঘ খৃষ্ট পাদ্রি-প্রচারিত বাইবেলের প্রেমধর্ম্ম ও বিশ্ববাণীর আহ্বানে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া দলে দলে মুসলমান হইতেছে—এখনই বা সে তরবারি কোথায়? বস্তুতঃ এসলামের সুমহান সাম্যনীতি ও সুগভীর ঈশ-তত্ত্ববাদই আজ পৃথিবীকে এসলামের দিকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। 'এসলাম' শব্দের অর্থ—খোদাতালায় বিশ্বাস ও আত্মসমর্পন। "আল্লাহো আকবর" একমাত্র খোদাই সর্ব্বাপেক্ষা মহান, আর কেহ নহে, এবং হজরত মোহাম্মদ তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট শেষ পয়গম্বর; ইহাই মুসলমানের ধর্ম্মমত-সার। এসলাম অর্থাৎ ঈশ্বরে আত্মসমর্পন ও তাঁহাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ট সুখ অনুভব করাই প্রকৃত মুসলমানের জীবন। কোরআন-প্রচারিত ধর্ম্ম কিরূপ সুমহান বিশ্বজনীন ও সাম্যবাদের আশ্রয় স্থল, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধ ও প্রতীত হয়। জগতের যাবতীয় দেশের মুসলমানের মন্ত্র এক, উপাসনার ভাষা এক, ধর্ম্মক্রিয়া-পদ্ধতি এক, ধর্ম্ম মন্দির এক, এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে সকলের অধিকার এক। "মানব মানবের ভ্রাতা" ইহা একমাত্র

এসলামই শিক্ষা দেয়। এসলামের নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত যেরূপ প্রকৃত গভীর ঈশ্বরভক্তি ও বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দেয়, জগতের অন্য কোন ধর্ম্মে সেরূপ শিক্ষাসুদুর্ল্লভ। এসলামে পুরোহিত প্রথা নাই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পুরোহিত বা ধর্ম্মোপদেষ্টা, ইহাই এসলামের নীতি। জনৈক পাশ্চত্য লেখক বলিয়াছেন,—" মুসলমানের প্রার্থনা মন্দির মানব হস্ত নির্ম্মিত নহে। ঈশ্বর-সৃষ্ট: পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে অথবা তাঁহার আকাশ তলে মুসলমানের উপাসনা-মন্দির। বস্তুতঃ মুসলমানের নিকট স্থানাস্থান ভেদ নাই; উপাসনার সময় সমাগত হইলে ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের গুনানুবাদ করা যাইতে পারে, ইহা এসলাম ধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব।" পবিত্র কোরআনের "ঈশ্বর প্রাণময়, অসীম, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। তন্দ্রা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না; নিদ্রা ও নহে; স্বর্গে ও মর্ত্তে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার। এমন কে আছে, যে তাঁহার নিকট মধ্যস্থতা করিতে পারে। তিনি জানেন, কোনটা অতীত, কোনটা মানবের ভাবী এবং তিনি যাহা জানিতে না দেন, তাহা কেহ জানিতে পারে না। দ্যুলোকে ও ভূলোকে তাঁহার সিংহাসন বিস্তৃত। ইহাদিগকে তিনি ধারণ করিয়া আছেন, কিন্তু ইহারা তাঁহার পক্ষে ভারস্বরূপ নহে! উপাসনা কালে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাইলেই মানুষ ধার্ম্মিক হয় না। কিন্তু তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক, যিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন, শেষ বিচারের দিন, দেবদূত বা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে, এবং প্রেরিত পুরুষদের প্রতি যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বশতঃ আপনার ধন সম্পত্তি যিনি জ্ঞাতি, কুটুম্ব, দরিদ্র, অনাথ ও পথিকদের অভাব মোচনের জন্য ও দস্যুকর্ত্তৃক বন্দীদিগকে উদ্ধারের জন্য ব্যয় করেন। যিনি যথাবিধি দান করেন ও নিয়মিত প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আপনার ব্যবসায়ে যিনি বিশ্বস্ত, যিনি কষ্টসহিষ্ণু ও দুঃখে ধৈর্য্যশীল এবং ন্যায়বাদী, সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীরু তিনিই ধার্ম্মিক।" * কি সুমহান পবিত্র আদর্শ। এই ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মনীতি যে ধর্ম্মের মূলভিত্তি, বিশ্বজগতে তাহার সুপ্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসার অবশ্যম্ভাবী।

মূর্খতা ও কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ, পৌত্তলিকতা ও জড়োপসনার লীলাভূমি, অশান্তি, অত্যাচার ও অনাচারের তাণ্ডব-নৃত্য-মুখর-শ্রীহট্টে, যখন হজরত শাহ জালাল শান্তি সাম্যের বিজয় বৈজয়ন্তী হস্তে আবির্ভূত হইলেন, তখন শ্রীহট্টের দৃশ্যপট এক নূতন ও অভিনব ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল। বিজয়ী হজরত শাহ জালাল, প্রেম ও করুণা বিস্তার পূর্ব্বক দেশবাসীকে সুপবিত্র সুমহান সনাতন এস্‌লাম-ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। তাঁহার মুখে এসলাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা শ্রবণ করিয়া, সর্ব্বোপরি তাঁহার জলন্ত-ধর্ম্মোৎসাহ, নির্ম্মলপুত চরিত্র ও অনন্য সাধারণ বৈরাগ্য অবলোকন করিয়া, শ্রীহট্টের আবালবৃদ্ধ বণিতা পবিত্র এসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। কল্যাণের স্নিগ্ধ-মধুর-ত্রিধারা—ঐক্য, সাম্য ও আধ্যাত্মিকতার পুণ্য-পীযুষ-প্লাবনে অভিষিক্ত হইয়া, দেশবাসী আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। শান্তি ও শক্তির সমাবেশে, আধ্যাত্ম ও কর্ম্মের সমবায়ে, ঐক্য ও সাম্যের

* হেমলতা দেবী কর্ত্তৃক কোরআন হইতে অনুদিত।—লেখক।

সংযোগে এবং প্রেম ও করুণার সংমিশ্রণে শ্রীহট্টে যে বিরাট সুমহান ও স্বাভাবিক এসলাম-সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে আশ্রয় গ্রহণার্থ চতুর্দ্দিক হইতে দেশবাসী ব্যাকুল হৃদয়ে ও অনুতপ্ত অন্তকরণে হজরত শাহ জালাল সকাশে আগমন করিয়া পবিত্র এস্‌লামিক মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল।

শ্রীহট্ট বা শাহ জালালাবাদের অপর নাম 'তিনশ ষাট আউলিয়ার মুলুক'। তিনশ ষাটজন ধর্ম্মপ্রাণ অনুসঙ্গী সমভিব্যহারে হজরত শাহ জালাল শেষ হিন্দুরাজা গৌড়-গোবিন্দকে পরাভূত করিয়া শ্রীহট্টে এসলামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। হজরত শাহ জালালের অনুচরবর্গ প্রত্যেকেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ও দৈবশক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

যাহা হউক, হজরত শাহ জালাল শ্রীহট্টে অধিষ্ঠিত হইয়া পারিপার্শ্বিক দেশ সমূহে তদীয় সঙ্গী অনুচরবর্গকে এসলামের প্রচার সাধনে প্রেরণ করিলেন। সুদূর ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ঢাকা, নোয়াখালী, রঙ্গপুর, আসাম, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা প্রচারোদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। হজরত শাহ জালাল ও তদীয় অনুচরবর্গের প্রচার মাহাত্ম্যে, এসলামের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, সর্ব্বোপরি ইহার সার্ব্বজনিনতায় ও উদারতায় আকৃষ্ট হইয়া, দলে দলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কায়স্থ, বৈশ্য, উচ্চনীচ, ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে স্ব স্ব পিতৃ পিতামহ অনুষ্ঠিত পৌত্তলিকতা ও বহু-দেববাদ-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম' বিঘোষক এসলামের শান্তি ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যখন ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে পর্ব্বত প্রমাণ প্রভেদ বিদ্যমান, যখন বিধান বলে, দুঃশীল বহুদোষবিশিষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণ পূজ্য, প্রণম্য ও সম্মানার্হ; কিন্তু শূদ্র সংযতেন্দ্রীয় হইলেও সে পূজনীয় হয় না, যখন শূদ্রের দেবারাধন পাতিত্যজনক, প্রজা সাধারণ যখন ব্রাহ্মণের জাতি-গৌরবের কঠোর চক্রতলে নিষ্পেষিত—তাহাদের একদেশদর্শিতামূলক স্বার্থপরতা-দুষ্ট কঠোর বিধানে পিষ্ট—নিরাশার ঘোর অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন এসলাম আশার বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া দিগন্ত প্রসারী কুলিশকঠোরনাদে ঘোষণা করিল,—বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা, ব্রাহ্মণ শূদ্রে, চণ্ডাল বৈশ্যে ভেদ নাই, মানব মানবের ভ্রাতা, সকলেই সমান, খোদা এক, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তদ্‌ প্রত্যাদিষ্ট শেষ পয়গম্বর এবং তদ্‌ প্রবর্ত্তিত এসলাম চির-সত্য ও সনাতন। ধর্ম্মগ্রন্থে, ধর্ম্ম আরাধনায় সকলেরই সমান অধিকার"। বৈষম্য পীড়িত, নির্য্যাতিত জন সাধারণ এ মহামন্ত্র শুনিয়া বিচলিত হইল, মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই উদার ও সাম্যবাদী সত্যধর্ম্ম আলিঙ্গন করিল।

এইরূপে হজরত শাহ জালাল ও তদীয় সাধুচরিত পুতচেতা আউলিয়াগণের ঐকান্তিক ঈশভক্তি, কঠোর সাধনা ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে অচিরকাল মধ্যে পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে এস-লামের জয়ধ্বজা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। হজরত শাহ জালালের ত্রিংশ বৎসরের কঠোর সাধনা সিদ্ধি লাভ করিল। দেশের দিকে দিকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে সর্ব্বশক্তিমান খোদাতাআলার অপার মহিমাগীত হইতে লাগিল। শ্রীহট্ট ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

আবদুল মালেক চৌধুরী।

ডাঃ মিঙ্গানা ও কোরআন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"আল্-এস্লামের" পাঠকবর্গের মধ্যে আরব্য ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব নাই। তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা "বিশেষ" না হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে ডাঃ মিঙ্গনার অভিজ্ঞতা হইতেও কম, সেরূপ শিষ্টাচারের পরিচয় দিতে আমরা সম্মত নহি।

ডাঃ মিঙ্গনা প্রদত্ত তালিকার কয়েকটী শ্লোক পাঠকদিগের সমীপে উপস্থিত করিতেছি;— আপনারা প্রথমে কোরআন মজিদের মূল আয়াৎ পাঠ করুন, তৎপরে এই جر جائی وقت ও جا حظ زمان যে اصلاح এবং পরামর্শ দিতেছেন, তৎসম্বন্ধে ভাবিয়া দেখুন।

يزيدك وجهه حسنا

اذا مازدته نظرا ؟

১। সূরাহ জাসিয়া, আয়াৎ ১৮শ :—

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون - انهم لن يغنوا عنك من الله شيأ - و ان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولى المتقين - ١

অর্থ :—অতঃপর আমি তোমাকে ধর্ম্ম-পথ প্রদর্শন করিলাম, অতএব তুমি সেই পথের অনুসরণ কর; এবং মূর্খদিগের ইচ্ছার অনুসরণ করিও না; কারণ খোদার নিকট তাহারা তোমার কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিবে না। অত্যাচারীগণই অত্যাচারীদিগের সহায় হইয়া থাকে, কিন্তু খোদা সৎলোকদিগের সহায় হন।

ডাক্তার মিঙ্গনা বলেন, شيأ শব্দের পরিবর্ত্তে هكماء এবং الله শব্দের স্থানে اللهم হইবে। شيأ শব্দের অর্থ "কিছুমাত্র"। هكماء শব্দের অর্থ যে কি, তাহা আমরা لسان العرب ও قاموس প্রভৃতির ন্যায় আরব্য-শব্দ কোষ অন্বেষণ করিয়াও স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না! অভিধানে هكم ধাতু আছে, কিন্তু তাহার مجرد এর اشتقاق নাই; مزيد এর আছে, কিন্তু তাহা হইলে এই همزه কোথা হইতে আসিল? هكم শব্দের অর্থ:—المتقحم على ما لا يعنيه (২) অতিশয় দুষ্ট বৃথা কার্য্যে তৎপর (অনধিকার চর্চ্চার অভ্যস্ত) এই هكم হইতে هكماء শব্দ হইলে, তাহার অর্থ হইবে—"অতিশয় দুষ্টা স্ত্রীলোক," কিন্তু ترکیب এর গলায় দড়ি। اللهم শব্দের অর্থ :—"হে আমার খোদা।"

(১) কোরআন মজিদ, পারা ২৫, রুকু ১৮।

(২) কোৎরোল মহীত (قطر المحيط) ২য় খণ্ড, ২০৩৬ পৃষ্ঠা

এইবার ডাঃ মিঙ্গনার আদেশানুযায়ী আয়াৎটীর অনুবাদ করিতেছি, পাঠকগণ প্রণিধান করুন :—

অতঃপর আমি তোমাকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করিলাম, তুমি সেই পথের অনুসরণ কর, এবং মূর্খদিগের ইচ্ছার অনুসরণ করিও না, কারণ খোদার নিকট তাহারা তোমার " দুষ্টা স্ত্রীলোকের" উপকার করিতে পারিবে না, অত্যাচারীগণই অত্যাচারীদিগের সহায় হইয়া থাকে, কি হে আমার খোদা,—সৎলোকের সহায়— جواب الداء فی بطن الدکثور !

ডাঃ মিঙ্গনা বলেন, ইহাই শুদ্ধ এবং সঙ্গত। আমরা আর কি বলিব! আমরা কেবল ভাবি যে, দুন্য়াখানা কেমন বিচিত্র আজায়েব খানা!

২। সুরা বার-আত্, ৪৩ আয়াৎ :—

عفا الله عنک ' لم اذنت لهم؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا '
و تعلم الکذبین ۔ (১)

অর্থ:—খোদা তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি কেন তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিলে? (কেন অপেক্ষা করিলে না?) তাহা হইলে তুমি সত্যবাদীদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে, এবং মিথ্যাবাদীদিগকেও জানিতে পারিতে। (তাবুক অভিযানের সময় কতকগুলি লোক নানারূপ মিথ্যা ছল করিয়া রসুলে করিমের নিকট বাটীতে থাকার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল, এই আয়াতে সেই বিষয় বলা হইয়াছে।)

ডাঃ মিঙ্গনা বলেন, تعلم শব্দের পরিবর্ত্তে منهم হইলে ভাল হইত। تعلم শব্দের অর্থ— " জানিতে পারিতে," منهم এর অর্থ—" তাহাদিগের মধ্যে "।

ব্যাকরণ অভিজ্ঞ পাঠক বলিবেন, এস্থানে منهم হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে :—

১। منهم কাহার উপর عطف হইয়াছে?

২। کاذبین এর উপর ال কেন?

৩। کاذبین এর منصوب হওয়ার কারণ কি? কিন্তু তাঁহারা জানিয়া রাখুন, আমরা ব্যাকরণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি, কিন্তু ডাঃ মিঙ্গনার পাণ্ডিত্যে সন্দেহ করিতে পারি না। সুতরাং ডাঃ মিঙ্গনা মহোদয়ের ব্যবস্থানুযায়ী শ্লোকটির অনুবাদ করিতেছি,—

" তুমি কেন তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলে, কেন অপেক্ষা করিলে না, তাহা হইলে তুমি সত্যবাদীদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে, এবং তাহাদিগের মধ্যে মিথ্যাবাদীগণ "।

৩। সুরা বার আ'ত, আয়াৎ ৩৮শ :—

(১) কোরআন মজিদ, পারা ১০, রুকু ১৩।

يايها الذين امنو مالكم ! اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله ' اثا قلتم الى الارض ! ارضيتم بالحيوة الدنيا ؟ (১)

অর্থ :—মুসলমানগণ, তোমাদিগের অবস্থা কি ? খোদার পথে অগ্রসর হইতে বলিলে, তোমরা পশ্চাৎপদ হও কেন ? তোমরা কি পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইলে ?

ডাঃ মিঙ্গনা বলেন مالكم শব্দ হইবে না। সুতরাং আয়াতের অর্থ হইবে :—মুসলমানগণ, যখন তোমাদিগকে খোদার পথে অগ্রসর হইতে বলা হয়, তোমরা পশ্চাৎপদ হও। তোমরা কি পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইলে ?

অভিজ্ঞ পাঠক বলিবেন, এরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। কারণ এই আয়াতে মুসলমানদিগকে খোদার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত এবং উত্তেজিত করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তিকে উৎসাহিত এবং উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে তাহার সমুদয় চেতনা এবং অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, তৎপর তাহাকে যাহা বলা হইবে, সে সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং তদানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে। শ্রোতার চেতনা এবং অনুভূতি জাগ্রত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—সম্বোধন এবং জিজ্ঞাসা। সম্বোধনের দ্বারা শ্রোতার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, জিজ্ঞাসার দ্বারা তাহার উত্তর প্রদানের প্রবৃত্তি জন্মে। সুতরাং সমস্ত বিষয় তাহার চেতনা এবং অনুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠে।

মুসলমানগণ খোদার কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে বলিলে তাহারা পশ্চাৎপদ হইতেছে, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া কর্ত্তব্য পথে চালিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ; মুসলমানদিগকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে সাধারণতঃ *তিনি রসুলকেই সম্বোধন করিয়া থাকেন, কিন্তু এস্থলে সেরূপ না করিয়া তিনি স্বয়ং* মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিতেছেন :—

يايها الذين امنوا

"হে মুসলমানগণ,"

এরূপ সম্বোধনে মুসলমান স্বভাবতই অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইল, এবং যাহা বলা হইবে, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তখন বলা হইল—

مالكم ؟

"তোমাদিগের হইয়াছে কি ?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই তাহাদিগের অবস্থার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এবং সম্ভবতঃ তাহারা কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং নিজের ব্যবহার

(১) কোরআন মজিদ, পারা ১০, রুকু ১২।

এবং তাহার ফলাফল ও পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য তাহাদিগের হৃদয়ে চেতনা এবং অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। তখন খোদাতায়ালা বলিলেন :—

اذا قيل لكم ' انفروا فى سبيل الله ' اثا قلتم الى الارض

"তোমাদিগকে খোদার পথে অগ্রসর হইতে বলিলে তোমরা পশ্চাৎপদ হও কেন?" এখন তাহারা ভাবিয়া দেখিল, সত্যইত তাহাদিগের ব্যবহার ঐরূপ, তবে কি ঐরূপ ব্যবহার করা খুব অন্যায় হইয়াছে? তখন বলা হইল :—

ارضيتم بالحيواة الدنيا ؟ فما متاع الحيواة الدنيا والاخرة الا قليل !

"তোমরা কি পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইলে? কিন্তু পরলৌকিক মঙ্গলের তুলনায় পার্থিব সুখ অতি নগণ্য।"

এইবার তাহারা জানিতে পারিল, নিশ্চয়ই তাহারা গুরুতর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে অনুতাপ এবং অনুশোচনা আরম্ভ হইল। তখন খোদা বলিলেন :—

الا تنفروا ' يعذبكم عذابا اليما ' و يستبدل قوما غيركم ' و لا تضروه شيا -

والله على كل شئ قدير

"যদি তোমরা অগ্রসর না হও, খোদা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিবেন, এবং তোমাদিগের স্থানে অন্য জাতিকে আনয়ন করিবেন, তোমরা কোন উপায়েই তাহাতে বাধা দিতে সমর্থ হইবে না, এবং খোদা সমস্তই করিতে পারেন।"

এইবার তাহাদিগের মন অনুতাপ এবং অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল, এবং কি উপায়ে তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা হয়, কি করিলে তাহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা জানিবার জন্য তাহারা ব্যস্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তখন খোদাতায়ালা বলিলেন :—

انفروا خفافاً و ثقالا و جاهدوا باموالكم و انفسكم فى سبيل الله - ذالكم خير لكم

ان كنتم تعلمون -

"সুখে দুঃখে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও, এবং খোদার পথে ধন ও প্রাণ দিয়া জেহাদ কর; যদি তোমরা জ্ঞানী হও তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে এইরূপ করাই তোমাদিগের পক্ষে মঙ্গলময়।"

কিন্তু ডাঃ মিঙ্গনা যাহা বলিতেছেন, তাহাতে কেবল শ্লোকটির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতেছে না, তাহার উদ্দেশ্যেও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

পাঠক আরও বলিবেন, ডাক্তার মিঙ্গনার মতানুযায়ী শ্লোকটির বাক্য বিন্যাস হইলে, শেষোক্ত বাক্য ارضيتم بالحيواة الدنيا (তোমরা কি পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইলে?) টিও استفهامية অর্থাৎ

প্রশ্নাত্মক না হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু পাঠক জানিয়া রাখুন—ডাক্তার মিঙ্গনা না শুনেন ব্যাকরণের কাহিনী !

৪। সূরা বারাআ'ত, ৩৩শ আয়াৎ :—

هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق (১)

অর্থ :—খোদা, যিনি তাঁহার রসুলকে জ্ঞান এবং সত্য ধর্ম্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন।

ডাঃ মিঙ্গনা বলেন ارسل শব্দের পরিবর্ত্তে رسل হইবে। ارسل শব্দের অর্থ "প্রেরণ করিয়াছেন"। رسل শব্দের অর্থ "القطیع من الابل والغنم (২) উষ্ট্র এবং মেষের পাল" رسل ক্রিয়া হইলে তাহার অর্থ—

رسل البعیر یرسل رسلا ' و رسالة ' کان رسلا (৩)

"উষ্ট্র এবং মেষাদির বিভিন্ন পালে এবং দলে বিভক্ত হওয়া।" কেহ হয়ত বলিবেন যে رسل শব্দের অর্থ "প্রেরণ করা" ও হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। বিখ্যাত খ্রীষ্টান-অভিধান লেখক পিটর বোস্তানী বলিতেছেন :— رسل یرسل ' بعث

رسولا ' المجردعات ' والمستعمل - ارسل من افعل (৪)

অর্থাৎ "প্রেরণ করা" অর্থে رسل ক্রিয়ার ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে ; ঐ অর্থে ارسل শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্য কেহ বলিবেন যে مجرد পরিত্যক্ত হইয়াছে ; কিন্তু مزید ? সুতরাং مزید এর অর্থ শ্রবণ করুন :—

ارسل القوم ' ای کثر رسلهم (৫)

অর্থাৎ رسل ক্রিয়ার অর্থ "উষ্ট্র এবং মেষাদির পাল বৃদ্ধি হওয়া"। এখন ডাক্তার মিঙ্গনা মহোদয়ের উপদেশানুসারে আয়াৎটির অনুবাদ করিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন :—

"তিনি তাঁহার রসুলকে জ্ঞান এবং সত্য ধর্ম্মসহ "উষ্ট্র এবং মেষের পালে বিভক্ত" করিয়াছেন। অথবা, "জ্ঞান এবং সত্য ধর্ম্মসহ তাহার উষ্ট্র এবং মেষের পাল" বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

ডাঃ মিঙ্গনা বলেন, ইহাই বিশুদ্ধ এবং সুন্দর ! বলুন, আমরা সেই অবসরে গোলেস্তাঁর সেই پشم باسنے کاشتن গল্পটা পাঠ করিয়া ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করি।

(১) কোরআন মজিদ, পারা ১০ রুকু ১১।
(২) লেসানুল আরব (لسان العرب) ১৩শ খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা।
(৩) কোতুরল মহিত্ ১ম খণ্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠা।
(৪) (قطر المحیط) ১ম খণ্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠা।
(৫) قطرالمحیط (কোতুরোলমহিত্) ১ম খণ্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠা।

পাঠক, আমরা কেবল চারিটী শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, সমুদয় বিষয়ের সমালোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসর প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। মুসলমানগণ কোরআন মজিদের যেরূপ সেবা করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কোরআন মজিদের চর্চ্চা এবং অনুশীলন আজকাল যে কোন কারণে শিক্ষিত মুসলমানদিগের নিকট কুসংস্কার এবং মোল্লাগীরির পরিচায়ক হইলেও, খোদার কৃপায় আজিও পৃথিবীতে কোরআনের সেবকের অভাব নাই। পক্ষান্তরে কোরআন মজিদের প্রত্যেক শব্দটীর বিষয়ে স্বতন্ত্র এবং বিস্তৃতরূপে আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ এখনও জগতে দুর্লভ নহে। ইচ্ছা করিলে ডাক্তার মিঙ্গনার তালিকাভুক্ত প্রত্যেক শ্লোকটী সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং বিশদরূপে আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে, ব্যাকরণের দিক দিয়াই হউক, কিংবা ভাষার সৌন্দর্য্য এবং সম্পদের দিক দিয়াই হউক, অথবা শব্দের বিশুদ্ধতা এবং শ্রুতি মধুরতার দিক দিয়াই হউক, কোরআন মজিদের ব্যবহৃত শব্দ এই তথাকথিত হস্তলিপির শব্দ হইতে সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রশস্ত। কিন্তু আমরা সেরূপ করিব না। কারণ প্রথমতঃ آئینه در محلت کوران ব্যতীত তাহার কোনই ফল নাই।

অতএব এই খ্রীষ্টিয়-ন্যায়ের ফাঁকীতে সময়ের অপব্যবহার করিবার আমাদের কোনই আবশ্যক নাই। আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, এইগুলি কোরআনের কোন প্রামাণিক এবং বিশ্বাস যোগ্য হস্তলিপি নহে, সুতরাং তাহার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় বৃথা সময় ক্ষেপণের আবশ্যক কি?

তবে এই অদ্ভুত চর্ম্ম পত্রিকাগুলি কি? সম্ভবতঃ তাহা জানিবার জন্য পাঠক উৎসুক হইয়া থাকিবেন।

সকলেই অবগত আছেন যে, হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সকল দেশেই বালকদিগকে লেখা মশ্‌ক্ করিতে হয়। পূর্ব্বকালে আজিকালির ন্যায় কাগজ সুলভ ছিল না, সুতরাং লেখা মশ্‌ক্ করিবার জন্য সেকালের বালকদিগকে কাগজের পরিবর্ত্তে অন্যান্য বস্তু ব্যবহার করিতে হইত। আমাদের দেশের বালকগণ ঐ উদ্দেশ্যে সে কালে তাল-পত্রের ব্যবহার করিত, (এখন সেলেট ব্যবহার করিয়া থাকে)।

আরব দেশীয় বালকগণ মাতৃগর্ভ হইতে লিখন পটু হইয়া জন্মগ্রহণ করিত না। হস্তাক্ষর সুন্দর করিবার জন্য নিশ্চয় তাহারাও মশ্‌ক্ করিত। এই উদ্দেশ্যে তাহারা কাগজ স্বরূপ কোন্ কোন্ বস্তু ব্যবহার করিত, তাহার ঠিক ইতিহাস আমরা অবগত নহি। তবে এই চর্ম্মপত্রিকাগুলির অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, যেন ইহাই তাহাদিগের তাল-পত্র এবং সেলেটের কার্য্য করিত। আমাদের তাল-পত্রের ন্যায় এই চর্ম্ম পত্রগুলিও লিখিয়া ধুইয়া লইলে আবার তাহাতে লেখা চলিত। পক্ষান্তরে এগুলি আমাদের তাল পত্র অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হইত"।

আমাদের বিশ্বাস, প্রাপ্ত হস্তলিপিগুলি সে কালের কোন আরবীয় বালকের পূর্ব্বোক্তরূপ "ওয়াস্‌লী" (চর্ম্ম-শ্লেট) ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের এইরূপ বিশ্বাসের কারণ কি? নিম্নে তাহাই নিবেদন করিতেছি :—

১। বিশুদ্ধরূপে কোরআন লিখিয়া কোন মুসলমান তাহা নষ্ট করিতে পারেন না, বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া করিতে হইলে, তাহাকে অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত অথবা মৃত্তিকা গর্ভে সমাহিত করিতে হয়। হজরত ওসমানের সময় কোরআনের যে সকল অশুদ্ধ হস্তলিপি নষ্ট করা হয়, সে সমস্তই পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল * লিখিত পত্রগুলি ধুইয়া অথবা মুছিয়া ফেলা হয় নাই।

ডাক্তার মিঙ্গনা বলেন, তাঁহাদের প্রাপ্ত হস্তলিপি হইতে কোরআনের শ্লোকগুলি মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। এইরূপ হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, তাহা কোরআনের হস্তলিপি নহে, কোন বালকের চর্ম্ম সেলেট। হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন মানসে, বালক কোন লিখিত কোরআনকে আদর্শ স্বরূপ দেখিয়া ঐগুলি লিখিয়াছিল, এবং লেখা শেষ হইলে পুনরায় লিখিবার জন্য পত্রগুলি ধুইয়া ফেলিয়াছিল।

২। পাঠক পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, যে এই হস্তলিপিগুলিতে কোরআনের তেরটী অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশ লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ নহে। ইহার দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, চর্ম্ম পত্রগুলি বালকের চর্ম্ম সেলেট ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। লিখিত কোরআন দেখিয়া লেখা মশ্‌ক্ করিবার উদ্দেশ্যে বালক কোরআন খুলিয়াছে, এবং যে স্থান বাহির হইয়াছে, তাহাই দেখিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কারণ, বালকের উদ্দেশ্য ছিল—হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন, কোরআন মজিদের হস্তলিপি সঙ্কলন তাহার অভিপ্রেত ছিল না।

৩। প্রাপ্ত হস্তলিপিগুলিতে নানারূপ বানান ভুল এবং আরবীয় লিখন-প্রণালীর ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীমতি লিউইস বলেন, ইহার কারণ এই যে, ঐগুলি খলিফা ওস্‌মানের শাসনকালের পূর্ব্বেকার লেখা, সে সময় আরবা লিখন-প্রণালীর উন্নতি হয় নাই। এবং সেইজন্যই খলিফা ওস্‌মানের কোরআনের ন্যায় হস্তলিপিগুলির বানান এবং লেখা বিশুদ্ধ হয় নাই। والله يعلم انهم لا تذبون

আমরা তর্কস্থলে স্বীকার করিতেছি যে, হস্তলিপিগুলি হজরত ওস্‌মানের পূর্ব্বের লেখা, বরং রসুলে করি:মর সময়ের লেখা, কিন্তু শ্রীমতি লিউইস প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, রসুলে করিমের মৃত্যুর মাত্র ১৫ বৎসর পরেই খলিফা ওস্‌মানই কোরআন মজিদের হস্তলিপি প্রচার করেন। সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই যে, মাত্র ১৫ বৎসরের মধ্যে বানান, অক্ষর বিন্যাস এবং লিখন প্রণালীর এরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, পৃথিবীর কোন দেশে কোন যুগে ঘটিয়াছে কি? ঘটা সম্ভব কি?

আমাদের বিবেচনায় এই বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি দোষের কারণ এই যে, হস্তলিপিগুলি কোন লিখনানভিজ্ঞ বালকের লেখা। বালক তাহার লেখার দোষ বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং সেই

---

* এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, হাদিসের تحرق শব্দের পরিবর্ত্তে تخرق শব্দও বর্ণিত আছে। —সম্পাদক।

জন্য সে নিজের অক্ষমতার নিদর্শনগুলিকে যত্নের সহিত মুছিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু হায়, সে জানিতে পারে নাই যে, সুদূর ভবিষ্যতে সহস্রাধিক বৎসরেরও পরে, তাহার এই লেখা, এশিয়া, আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া এক দিন ইউরোপে গিয়া উপস্থিত হইবে এবং সেই বৈজ্ঞানিক দেশের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার অক্ষমতার নিদর্শন-গুলিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবেন, এবং কালের বিচিত্র পরিবর্ত্তনে তাহার অক্ষমতা ও অকৃত-কার্য্যতার এই হাস্যকর নিদর্শনগুলি, দক্ষতা এবং সফলতার গৌরব চিহ্নের আকার ধারণ করিবে।

ডাঃ মিঙ্গনার ৪র্থ এবং ৫ম বিষয় সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, এই উভয় বিষয়ই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ইতিহাস বিরুদ্ধ। পার্সীতে একটী প্রবচন আছে যে :—

دروغ گو را حافظه نباشد -

অর্থাৎ মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি থাকে না—লেখক যে মিথ্যাবাদী এমন কথা আমরা বলিতেছি না, তবে তাঁহার স্মরণ শক্তির যে যথেষ্ট অপচয় ঘটিয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, " মোহাম্মাদের বাণী তাঁহার মৃত্যুর পনর বৎসর পরে ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়," কিন্তু ইহার কয়েক পুংক্তি পরেই লিখিতেছেন যে, " ওস্‌মানের আদেশে কোরআন লিপিবদ্ধ করিবার বার বৎসর পূর্ব্বে আর একবার ওমরের প্ররোচনায় ও আবু বকরের আদেশে ঐ জায়দই কোরআন লিপিবদ্ধ করেন।" হজরত আবুবকর রসুলে করিমের স্বর্গারোহণের তৃতীয় বৎসরে পরলোক গমন করেন। সুতরাং তাঁহার সময়ে যে কোরআন লিখিত হইয়াছিল, তাহা রসুলুল্লাহের মৃত্যুর পর তিন বৎসরের মধ্যেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। অথচ লেখক পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন যে, " মোহাম্মাদের বাণী তাঁহার মৃত্যুর ১৫ বৎসর পরে ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়।" এই পরস্পর বিরোধী উক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী সত্য ? "প্রবাসী"র লেখক অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বলিয়া দিবেন কি ?

লেখকের জানা উচিত যে, এস্‌লামের ইতিহাস, জাতি বিশেষের লুপ্ত গৌরবের কাল্পনিক ইতিহাস নহে। সম্পূর্ণ কোরআন কবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ত' অনেক বড় কথা, লেখক ইচ্ছা করিলে, কোরআনের প্রত্যেক অধ্যায় এমন কি প্রত্যেক শ্লোকটী পর্য্যন্ত কবে কোন সনে, কোন্ মাসের কোন্ দিবসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারও সত্য ইতিহাস মুসলমানেরা বলিয়া দিতে পারেন। অথচ সেজন্য তাঁহাদিগকে ভগ্নস্তূপ খনন করিতে কিম্বা শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিতে হইবে না, মার্সেডন, এলফিনষ্টন এবং টড ইত্যাদির শরণাপন্নও হইতে হইবে না।

حریف ناوک مژگان خون ریزم نهٔ ناصح
بدست آور رگ جانے و نشتر را تماشا کن

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল বাকী।

কোরআনের আদর্শ।

(১)

পরোপকার ।

واعبدوا الله و لا تشركوا به شيأ و بالوالدين احسانا و بذى القربى واليتمى والمسكين
والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت
ايمانكم - ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا - الذين يبخلون و يأمرون الناس
بالبخل و يكتمون ما أتهم الله من فضله و اعتدنا الا كفرين عذابا مهينا -

" অনুবাদ—

১। তোমরা খোদাতাআলার উপাসনায় নিরত থাক, তাহার সহিত কোনবস্তুকে অংশী করিও না, এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আত্মীয় স্বজন, অনাথ, দীনদুঃখী, আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্বচর, পথিক ও ক্রীত দাসদাসী ইহারা সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং তাহাদের উপকার সাধন করিবে। আল্লাহতাআলা গর্ব্বিত স্বভাব-দাম্ভিকদিগকে ভাল বাসেন না। যাহারা কৃপণতা করে এবং লোকদিগকে কার্পণ্য অবলম্বন জন্য উপদেশ দান করে এবং তাহাদিগকে খোদাতাআলা নিজ দান হইতে যাহা দিয়াছেন, তাহা সংগোপন করে, আমি (ঐরূপ) ধর্ম্মদ্রোহীদিগের জন্য কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।"
(৫ম পারা, সুরা নেসা, ৬ষ্ঠ রুকু)।

কোরআনের এই আয়াৎ দ্বারা যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সারাংশ যথা:—

১। হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক খোদাতাআলার উপাসনায় নিরত থাক; সাবধান! সেই একমাত্র খোদার সহিত কোন বস্তুকে অংশী করিও না।

২। তোমাদের পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে ও তাঁহাদের উপকার সাধন করিবে।

৩। আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধান ও তাহাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে।

৪। অনাথদিগের সাহায্য করিবে।

৫। দীন দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া বিতরণ করিবে।

৬। আত্মীয় প্রতিবেশীর উপকার সাধন করিবে।

৭। অনাত্মীয় প্রতিবেশীর খবরগিরি করিবে।

৮। পার্শ্বচর ও বন্ধু বান্ধবগণের উপকার সাধনে বিরত হইবে না।

৯। পথিক প্রবাসীগণের আশ্রয় দানে এবং তাহাদের অভাব বিমোচনে যত্নবান হইবে।

১০। ক্রীত দাসদাসী ও বাড়ীর ভৃত্যদের হিত সাধনে তৎপর হইবে।

১১। খোদাতাআলা ঔদ্ধত্য স্বভাব এবং গর্ব্বিত ও দাম্ভিক লোকদিগকে আদৌ ভাল বাসেন না।

১২। যাহারা স্বয়ং কৃপণ, আবার অন্য লোকদিগকে কৃপণতা শিক্ষা দেয়, এবং তাহাদিগকে খোদাতাআলা যে ধন সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা লোকহিতকরঅনুষ্ঠানে ব্যয় না করিয়া গোপন করিতে প্রয়াসী, তাহাদের জন্য খোদাতাআলা পরকালে, কঠোর দণ্ডের বিধান করিয়া রাখিয়াছেন।

জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিত সদ্ব্যবহার এবং অভাবগ্রস্ত লোক জনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের বিশ্বজনীন-প্রেম-নীতির উজ্জ্বল শিক্ষা এই আয়াতে বিদ্যমান আছে।

و احسنوا ان الله يحب المحسنين ط

" অনুবাদ—

২। তোমরা পরোপকার সাধন কর, খোদাতাআলা পরোপকারী ব্যক্তিদিগকে ভাল বাসেন"। (২য় পারা, সুরা বকর, ২৪ রুকু)

ان الله يامر بالعدل والاحسان ط

" অনুবাদ—

৩। অবশ্যই খোদাতাআলা সুবিচার ও পরোপকার ব্রতের জন্য আদেশ করেন"। (সুরা নহল, ৩ রুকু)

পিতৃমাতৃ-ভক্তি।

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما ط واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ط

" অনুবাদ—

৪। তোমার প্রতিপালক খোদাতাআলা আদেশ করিয়াছেন, সাবধান! তোমরা একমাত্র খোদাতাআলাকে ব্যতীত আর কাহারও পূজা করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। যদি তাঁহাদের মধ্যে একজন বা উভয় বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উহু! শব্দ পর্য্যন্ত বলিও না এবং তাঁহাদিগকে শাসাইও না, এবং তাঁহাদের সহিত বিনয় ও সম্মানের সহিত কথা বলিও, তাঁহাদের প্রতি মমতার হস্ত প্রসারণ কর, আর বল হে খোদাতাআলা! তাঁহাদের প্রতি দয়া বিতরণ কর, যেমন তাঁহারা আমাকে বাল্যজীবনে প্রতিপালন করিয়াছেন।" (সুরা বনি এস্রাইল, ৩ রুকু)

পিতৃমাতৃ-ভক্তি এবং তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য কোরআন কিরূপ উদার ও উচ্চশিক্ষা দান করিয়াছে, তাহা অবশ্যই অনুধাবনীয়।

এস্‌লামাবাদী।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম-ধর্ম্ম।

("ভারত-মহিলা" হইতে উদ্ধৃত)

আমাদের স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে প্রশান্ত-মহাসাগরের গর্ভে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। তিন হাজার একশত চল্লিশটী ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। তন্মধ্যে ৪০০ দ্বীপের অধিবাসী মুসলমান। ফিলিপাইন ও তন্নিকটবর্ত্তী মালয় দ্বীপপুঞ্জে কিরূপে ইসলাম ধর্ম্ম এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। সে সকল দ্বীপপুঞ্জ সুলতান মামুদ, শাহাবুদ্দিন, বা বক্তিয়ার খিলিজির ন্যায় কোন প্রবল মুসলমান আক্রমণকারী বা নরপতি কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই। বোধ হয় আরবীয় বণিকগণের দ্বারাই ইসলাম ধর্ম্ম তৎসমুদয় দ্বীপাবলীতে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময় ব্রুনাই, আচিন, জহর প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ষ্টেট্গুলি সুলতান উপাধিধারী আরব শাসনকর্ত্তাদ্বারা শাসিত হইতেছে। (১)

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জহর-রাজ্যের উনৈক শরিফ ও আরবের শরিফ মখদুম এই দুইজন প্রচারকের চেষ্টায় উক্ত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম ধর্ম্ম সবিশেষ বিস্তৃত হইয়াছে। চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত তথাকার মুসলমানেরা স্পেনিয়ার্ডদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্পেনিয়ার্ডগণ তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে অথবা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত দ্বীপগুলিতে প্রায় দশ লক্ষ মুসলমান বসবাস করিতেছে। কয়েক বৎসর হইল তাহারা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রবল প্রতাপের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

চারিশত বৎসর পুর্ব্বে তাহারা ইসলাম ধর্ম্মের আলোক লাভ করিয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যেও ইসলামের বিমল প্রখর জ্যোতিঃ পূর্ণমাত্রায় তথায় প্রকাশিত হয় নাই। কারণ তাহারা মহাদেশস্থ মুসলমান রাজ্য সকল হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছে। মুসলমান রাজ্য হইতে কোন ইসলাম ধর্ম্মতত্ত্ববিদ প্রচারক তথায় গমন করেন নাই। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপে অনেক কালিমার সমাবেশ হইয়াছে। তবুও প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক ফিলিপাইন-বাসী মুসলমান হজ্জব্রত উপলক্ষে ইসলামের জন্মভূমি মক্কা নগরীতে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা মক্কা ও মদিনা নগরীদ্বয় হইতে প্রত্যাগত হাজীগণের মুখে উক্ত পবিত্র নগরীদ্বয়ের রক্ষক ও সেবক, মুসলমান জগতের খলিফা তুরস্কের মহামান্য সুলতানের যশঃগৌরব কাহিনী

(১) ডাক্তার আর্ণাল্ড সাহেব "Preaching of Islam" বা এস্লাম প্রচার নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐতিহাসিক প্রমাণ বলে সাব্যস্ত করিয়াছেন, যে ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে, দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই এসলাম প্রচারের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উক্ত পুস্তকে ইহাও উল্লেখিত আছে যে, ৬৭৪ খৃষ্টাব্দের চীনের ইতিহাসে একজন মুসলমান রাজার নামের উল্লেখ

শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ যাবৎ ফিলিপাইনবাসী কোন মুসলমানই রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে পৌঁছিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তাহারা মহামান্য তুর্কি সুলতানের (খলিফার) নিকট পরিচিত হইতে এবং তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ উপদেষ্টা পাইবার জন্য জমুয়েঙ্গা নামক দ্বীপের গবর্ণর কর্ণেল ফিনলিকে (Colonel Finley) অর্থ সাহায্য করিয়া কনষ্টান্টিনোপলে প্রেরণ করে। গত ১৯১৩ সনের মার্চ্চমাসে কর্ণেল ফিনলি তুর্কি রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে উপনীত হইয়াছিলেন। এই অভূতপর্ব্ব ঘটনা রাজদরবারে আলোচনার বিষয় হইল। কারণ, এ যাবৎ কোন ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী লোক ইসলামের প্রতিনিধিরূপে খলিফার দরবারে আগমন করে নাই।

"শেখ-উল-ইসালাম" কর্ণেল ফিনলিকে এই কার্য্যে সবিশেষ সাহায্য করেন। তাঁহার চেষ্টায় শীঘ্রই মহামান্য সুলতানের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হইল। কর্ণেল ফিনলি সুলতানের নিকট হইতে "শাহি ফরমান" ও মসজিদের জন্য একখানা "খোতবা" প্রাপ্ত হইলেন।

কয়েক দিন পর তিনি যুবরাজ ইউসুফ এজ্জদ্দীন আফেন্দির সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুবরাজ তাঁহাকে ফিলিপাইন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে কর্ণেল ফিনলি স্বীয় কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়া হৃষ্টচিত্তে ফিলিপাইন যাত্রা করিলেন। মহামান্য সুলতান মাসিক ৫০ পাউণ্ড বেতন ধার্য্য করিয়া ৫ বৎসরের জন্য জামাল আফেন্দি নামক একজন ইসলাম ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্ম বিধানজ্ঞ ব্যক্তি ও অন্যান্য দুইজন প্রচারককে কর্ণেল ফিনলির সঙ্গে ফিলি-

আছে। তদ্দ্বারা অনুমান করা হইয়াছে, সেই মুসলমান রাজা সম্ভবতঃ সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত এই প্রবন্ধের লিখিত 'আচিন' নামক স্থানেরই অধিপতি ছিলেন। সুমাত্রার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেখ আবদুল্লা আরেফ নামক একজন সাধু মুসলমান প্রচারক দ্বারা সেখানে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। ১১৭৭ খৃষ্টাব্দে তদীয় সুযোগ্য শিষ্য শেখ বোরহানুদ্দিন পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপমালায়ও ইসলাম প্রচার করেন। তৎকালীন মুসলমান প্রচারকগণের মধ্যে, জাহাঁশাহ নামক আরও একজন সাধু পুরুষের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পরিশেষে আচিনের রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ফল কথা, দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতেই যাবা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবেস (Celebes) হইয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ঠিক কোন্ সময় ইসলামালোক বিকীর্ণ হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কিঞ্চিৎ সমস্যাসঙ্কুল বটে, কিন্তু কাপ্তান ফরেষ্ট সাহেব ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে লিখিয়া গিয়াছেন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ সীমান্তস্থিত সর্ব্বপ্রধান দ্বীপ 'মিণ্ডানও' (Mendanao) প্রদেশে তিনশত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে আরব জাতির যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে যখন স্পেনার্ডগণ সেখানে উপস্থিত হয়, তখন সেখানে বহু মুসলমানের বাস ছিল। এ সকল প্রমাণ দৃষ্টে বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতেই ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই প্রবন্ধে ফিলিপাইনে এসলাম প্রচারের যে সময় নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা হইতে তিনশত বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই সেখানে ইসলামের প্রভাব বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত হয়।

পাইনে প্রেরণ করিয়াছেন। জামাল আফেন্দি একজন উপযুক্ত লোক। তিনি আরবি ও তুর্কি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মেণ, সংস্কৃত ও উর্দ্দু ভাষায়ও তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে।

মোস্‌লেম-জগতে নৌ-বহর।

ইতিহাস আলোচনায় যতদূর জানা যায়, মুসলমানগণ, ৪র্থ খলিফা হজরত ওছমানের (রাঃ) খেলাফতের সময়, সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ জাহাজ পরিচালনা আরম্ভ করেন। মহাত্মা "আব্দুল্লাহ বেন্নে কোবায়ছল হাবেছী" (عبدالله بن قيس الحارثي) মোসলেম-নৌবহরের সর্ব্বপ্রথম, "আমিরল বহর" (امير البحر) বা নৌ-সেনাপতি (Adm'ral) পদে নির্ব্বাচিত হন। "এস-কেন্দরীয়া" (اسكندريه) বা আলেকজেন্দ্রীয়াতে (Alexandria) মুসলমানগণের এই প্রথম নৌ-যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

"আল্লামায়ে মক্‌রেজী" (علامه مقريزى) তাঁহার "কেতাবল খততঅল্-আছার" (كتاب الخطط والآثار) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মুসলমানগণের সর্ব্বপ্রথম নৌযুদ্ধ হিজরী ৩৪ অব্দে, "আলেকজেন্দ্রীয়াতে" সংঘটিত হয়। এবং এই যুদ্ধে "আব্দুল্লাহ বেন্নে আবি ছরজ" (عبدالله بن ابى سرح) প্রধান সেনাপতি পদে বরিত ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, নৌ-বহরের উন্নতি হিজরী প্রথম শতাব্দীতেই সম্পাদিত হয়। কেননা ৮৪ হিজরীতে প্রাচ্যদেশ-(ديار مغرب) বিজয়ী সেনাপতি "মুসা বেন্নে নসির" টিউনিসে (تونس) (Tunis) এক বিরাট নৌ-বহর স্থাপন করেন।

মূল প্রবন্ধে—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ লিখা হইয়াছে কিন্তু ইহা ঠিক নহে। সুইজারলেণ্ডের জেনোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক মসিউমোনেটেট সাহেব প্যারিসের রাজকীয় বিদ্যালয়ে এসলাম সম্বন্ধে যে ৭টী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার ১ম বক্তৃতা এসলাম প্রচার বিষয়। তিনি উক্ত বক্তৃতায় প্রমাণ করিয়াছেন, একমাত্র যাবাদ্বীপ অঞ্চলেই প্রায় তিনকোটি মুসলমানের বাস। কায়রো নগরীতে পাদ্রীগণের যে কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল, সেই কন্‌ফারেন্সের রিপোর্ট দৃষ্টেও দেখা যায়, যাবা অঞ্চলে প্রায় তিনকোটি মুসলমানের বাস। এই সংখ্যা যদি আমরা কেবল যাবার অধিবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না করিয়া সমগ্র পূর্ব্ব ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লই, তাহাতেও প্রমাণিত হইবে যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মুসলমান সংখ্যা কিছুতেই ৫০ লক্ষের ন্যূন হইবে না। —সম্পাদক।

"কেতাবল এমামা ওয়াছিয়াছা"র (كتاب الامامة والسياسة) গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, মহাত্মা মুসা যখন "জেওয়ান" (زغوان) "হাওয়া রাহ" (هوارة) "জেনাতাহ" (زناتة) "কোতামা" (كتامة) "ছাহাজা" (صنهاجة) এবং "ছজুমা" (سجوما) ইত্যাদি স্থান বিজয় করিয়া "কিরওয়ানে" (قيروان = Kairwan) অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সমস্ত রাজ্য তাঁহার করতল গত হইয়াছিল, এবং চতুর্দ্দিক হইতে বিজয়ের পর বিজয়বার্ত্তা প্রতিদিন তাঁহার নিকট আসিতেছিল। এই সমস্ত বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে জন সাধারণ সেনাপতি মুসার প্রতি সাতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ মহাত্মা "মুসা" বিধর্ম্মীদিগকে মুসলমান হইবার জন্য কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা উৎপীড়ন করিতেন না।

তিনি "কোরআনের" নিয়োদ্ধৃত আয়াতের মর্ম্মানুযায়ী সর্ব্বদা কার্য্য করিতে উদ্গ্রীব থাকিতেন,

" لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر "

অর্থাৎ—"এসলাম ধর্ম্মে কোনরূপ বলপ্রয়োগ বিধি নাই, সরল পথ, বিপথ হইতে পৃথক হইয়াছে, যাহার ইচ্ছা সে এস্লাম গ্রহণ করুক, এবং যাহার ইচ্ছা সে কাফের বা অমুসলমান হইয়া থাকুক"।

মহাত্মা "মুসার" আর একটী গুণ এই ছিল যে, যুদ্ধের বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা মুসলমান হইয়া ভদ্রোচিত ভাবে এস্লাম-ধর্ম্মে স্থিরতর থাকিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিত, তাহাদিগকে তিনি এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য উপদেশ দিতেন, যাহারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত, তাহাদিগের জ্ঞানের পরীক্ষা করতঃ তাহাদিগকে স্বাধীনতা দান করিয়া, নিজ সৈন্যদলে গ্রহণ করিতেন। এবং অবশিষ্ট সকলকে ধর্ম্মযোদ্ধা (مجاهدين) দিগের ভৃত্যরূপে নিয়োগ করিতেন।

"মুসার" এইরূপ সরল ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারে যখন জন সাধারণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং দিন দিন যখন তাঁহার দল প্রবল হইতে লাগিল, তখন তিনি "টিউনিসে" এক নৌ-বহরের কারখানা খুলিবার এবং সমুদ্র হইতে এক খাল খনন করিয়া উক্ত কারখানার সঙ্গে তাহা সংযোগ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। মুসলমানগণ নিজদের অনভ্যস্ততা নিবন্ধন এই আদেশকে অত্যন্ত কঠোর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন, 'এই কার্য্য আমাদের সাধ্যাতীত, আমাদের দ্বারা এই কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই।'

মুসলমানগণ যখন বর্ণিতরূপ কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলেন, তখন "বরবর" (بربر) সম্প্রদায়ভুক্ত একজন নবদীক্ষিত মুসলমান দাঁড়াইয়া "মুসাকে" বলিতে লাগিলেন, "আমার বয়স এখন একশত বিংশতি বর্ষ অতীত হইয়াছে, আমাকে আমার পিতা একদা বলিয়াছিলেন, "কার্থেজের" শাসনকর্ত্তা যখন তথায় সমুদ্র হইতে খাল খনন করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত লোকজন তাঁহার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল, এই কার্য্য অত্যন্ত কঠিন, ইহা আমাদের

দ্বারা সমাধা হইবার নহে। কিন্তু সেই সময় উপস্থিত জন মণ্ডলীর মধ্যে একজন উঠিয়া বলিয়াছিল, হে আমির! যদি আপনি উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাহা সম্পূর্ণ হইবে। কারণ বাদশা ঃ শক্তি সামর্থ্যে ও কর্ত্তব্য কার্য্যে কখন দুর্ব্বল হইতে পারেন না”। এইজন্য আমি বলি, হে আমির! আপনি অভিলষিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন, খোদাতাআলা নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করিবেন এবং উক্ত কাজের জন্য পুরস্কৃত করিবেন।

“মুসা” এই উৎসাহোদ্দীপক কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দানুভব করিলেন, এবং মনোনীত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বলা বাহুল্য যে, সেই বৎসরেই “টিউনিসে” এক বিরাট জাহাজের কারখানা স্থাপিত হইল, এবং সমুদ্র হইতে দ্বাদশ মাইল দীর্ঘ একটী খাল খনন করিয়া উক্ত কারখানার সহিত তাহা সংযোগ করিয়া দেওয়া হইল।

হিজরীর ৮৪ সনে উক্ত কারখানায় নৌবহরের সমস্ত জিনিসপত্র প্রস্তুত হইল, এবং ঐ বৎসরেই “টিউনিসের” বন্দরে উক্ত নৌবহর সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করিল। তৎকালীন কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালেই নৌযুদ্ধ হওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল, এবং শীতকালে জাহাজ সকল “ডকে” নঙ্গর করিয়া থাকিত। সেনাপতি মুসার আদেশ মত রমজান মাস হইতে জেলহজ্জের মধ্যে ১০০ শতখানি নূতন জাহাজ প্রস্তুত হইয়া গেল।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বীরবর মুসার এই নৌবহর ব্যতীত মিসরে মুসলমানগণের আরও এক নৌবহর ছিল। খলিফা আবদুল মালেকের ভ্রাতা আবদুল আজিজ বেনে মারওয়ান উক্ত নৌবহরের প্রধান “অফিসার” ছিলেন। আবদুল আজিজ ভূমধ্যসাগর অবস্থিত “সার্ডেনিয়া” (Sardinia) দ্বীপ দখল করিবার বাসনা বহুদিন হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এবং এই সংকল্প সাধন উদ্দেশ্যে “আতাবেনে নাফেউল হাজেলী” কে (عطاء بن نافع الهذلي) এক বিরাট নৌবহরের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে রওয়ানা করিলেন। “আতা” “সুসার” (سوسه) “ডকে” (যাহা কিরওয়ান ও টিউনিসের মধ্যে অবস্থিত) উপস্থিত হইয়া জাহাজ সকল নঙ্গর করিবার জন্য আদেশ করিলেন। মুসা আতার জন্য রসদাদি সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে পাঠাইয়া দেন, এবং আতাকে এক পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করেন যে, “এ সময় নৌযুদ্ধের আর সময় নাই, কারণ শীতঋতু সমাগত প্রায়, সুতরাং গ্রীষ্মঋতু না আসা পর্য্যন্ত আপনি তথায় অবস্থান করিতে থাকুন”।

আতা মুসার পত্রের কোনও উত্তর দিলেন না, বরং রসদাদির দ্বারা জাহাজ সকল পূর্ণ করতঃ “জজিরায়ে ছেল ছেল” (جزيرة سلسله) বা লিমুছা দ্বীপ দখল করিয়া যুদ্ধ-লব্ধ দ্রব্যজাত দ্বারা জাহাজ সকল পূর্ণ করতঃ যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় সমুদ্রে তুফান উপস্থিত হইয়া জাহাজ সকল ডুবাইয়া দেয়।

মুসা যখন এই শোচনীয় নিমজ্জনবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি “এজিদ বেন্নে মছরুক” (يزيد بن مسروق) কে নিমজ্জিত জাহাজগুলির ধ্বংসাবশেষের অন্বেষণে সমুদ্র উপকূলে

পাঠাইলেন। এজিদ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যতটা জাহাজ ও নাবিকদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন, তাহাদিগকে " টিউনিসের " ডকে লইয়া আসিলেন।

হিজরীর ৮৫ সনে, যখন গ্রীষ্মঋতুর সমাগম হইল, তখন মুসা লোকজনদিগকে নৌযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিলেন। এবং স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে নৌবহরের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া রওয়ানা করিলেন। ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের এই প্রথম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিরাট অভিযান। ইতিঃপূর্ব্বে আর কখন এত বড় অভিযান হয় নাই। এই নৌবহর " সিসিলী " দ্বীপের উপর ধাওয়া করে এবং মুসলমান সৈন্যেরা উক্ত দ্বীপের একটা শহর দখল করিয়া, যুদ্ধ-লব্ধ দ্রব্যজাত এতই অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক সৈনিকের ভাগে শত আশরফি বা স্বর্ণমুদ্রা করিয়া পড়িয়াছিল।

মুসলমানদের জাহাজের কারখানা শুধু " টিউনিসের " মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং হিজরীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমানদের প্রত্যেক রাজ্যে ইহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তুর্কীরা জাহাজের কারখানাকে " তারছানা " (ترسانه) বলেন। এবং আরবেরা "দারছ্ছানায়া" (دارالصناعه) বলিয়া অভিহিত করেন।

" খলিফা মযেজলেদিনিল্লাহ " (خليفه معزلدين الله) স্থাপিত " মক্‌ছের " (مقس) কারখানা তৎকালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। " আলজিরায় " এক বড় কারখানা ছিল। " মিসরে " " আখসিদের " (اخشيد) স্থাপিত এক কারখানা যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিল। " ওন্দলস " (اندلس) বা স্পেনে খলিফা আব্দুর রহমান নাসেরের এক বিরাট কারখানা ছিল। " দমিয়াত " (دمياط) ও " এসকেন্দরীয়ার " (اسكندريه) " খোলফায়ে ওবায়দিনের " (خلفاے عبيديين) এক বৃহৎ কারখানা ছিল। খোলফায়ে ওবায়দিনের জাহাজের কারখানার মত বড় ও প্রসিদ্ধ কারখানা ও নৌবহর মুসলমান রাজত্বে অন্য কোথায়ও ছিল না। " মক্‌রেজী " " কেতাবল খতত-অল-আছার " নামক গ্রন্থে এই বিষয় বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। " এবনে খল্লদুনে " (ابن خلدون) লিখিত আছে যে, খোলফায়ে ওবায়দিনের ২০০ শত উৎকৃষ্ট যুদ্ধ জাহাজ ছিল।

যতদিন পর্য্যন্ত রাজ্য-বিজয়ী আরবদের রাজত্ব ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত মুসলমানগণ সতত নৌযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এবং এক সময় এই সকল এসলামীয় নৌবহরের তাড়নায় ইউরোপের মাথার উপর এক প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল।

হায় বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তৎকালে যদি মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে আজ সেনাপতি মুসার ঐ উচ্চ আশা অসম্পূর্ণ থাকিত না, যাহা তিনি স্পেনের " জারা গুজা " জয় করিয়া আরও উত্তরদিকে অভিযান অভিলাষী হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার সৈন্যগুলি অসন্তুষ্ট হইয়া, বলিয়াছিলেন যে, আর আপনি কতদূর অগ্রসর হইবেন! যে রাজ্য আমাদের অধীনে আছে তাহাই যথেষ্ট। বীরবর মুসা ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, " ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমরা আমার আজ্ঞা পালন করিয়া আমার অনুগামী হইতে

তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে "রোম" (Rome) পর্য্যন্ত লইয়া যাইতাম। এবং ঈশ্বরানুগ্রহে সে সমস্ত রাজ্য আমার হস্তগত হইত।

"ভাগ্যে যাহা নাহি ঘটে চেষ্টাতে কি হয়"

"সকলই বিফল হায়! হ'লে অসময়।"

আবুল ফয়েজ মহাম্মদ মুরউদ্দীন রোকণী,—সিরাজগঞ্জ।

মহাকবি খাকানী। *

কবির প্রকৃত নাম 'আফজালদ্দীন এবরাহিম' কিন্তু সকলের নিকট তিনি 'খাকানী' নামে পরিচিত। পূর্ব্বে কবি স্বরচিত কবিতা সমূহের ভণিতায় 'হাকায়েকী' নাম ব্যবহার করিতেন, ইহার কারণ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য কবিদের ন্যায় তিনি সাধারণতঃ কল্পনা প্রসূত অপ্রকৃত ঘটনা সমূহের বর্ণনায় লেখনী পরিচালনা করিতে ভাল বাসিতেন না। বাস্তব ঘটনাবলীর বর্ণনায় রচনা-চাতুর্য্য দেখাইতে ও কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিতে তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এজন্য কবি আপন নাম 'হাকায়েকী' (প্রকৃত ঘটনাবলীর পক্ষপাতী) রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তারপর পারস্য দেশস্থ রাজা "খাকান মনুচাহার" তাঁহাকে রাজধানী 'শিরওয়ান' নগরে আপন প্রিয় পরিষদ শ্রেণীভুক্ত করিয়া 'খাকানী' উপাধি প্রদান করেন, সেই অবধি কবি আপন নামের সহিত রাজার নাম 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর' অমর অক্ষয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আজীবন আপনাকে 'খাকানী' নামেই অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি 'খাকানী' জীবিতকালে যশঃ ও প্রতিপত্তি লাভে বঞ্চিত হন নাই। তৎকালীন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্দ্ধন, পণ্ডিত ও সাধারণ জনমণ্ডলী সকল শ্রেণীর সকল লোকই তাঁহাকে একজন মহা পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় কবি বলিয়া বিশেষরূপে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। পারস্য কবিদের মধ্যে তাঁহার আসন বহু উচ্চে। কবি ও পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছেন, তন্মধ্যে একজন বিখ্যাত পারস্যকবি 'খাকানী''র প্রশংসা গানে (صفیرالضمیر) 'সাফিরজ্জমির' নাম দিয়া কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "খাকানী কাব্য-জগতের রাজা ও অন্যান্য কবিগণ তাঁহার অধীনস্থ প্রজা ছিলেন। প্রেরিত মহা-

* ফরাসী বিদুষী Lucy Gray প্রণীত Rose Garden of Persia, মহাত্মা দৌলৎ শাহ প্রণীত বৃহৎ تذکرۃ الشعراء ও বিভিন্ন কবিগণের বিভিন্ন টীকা টিপ্পনী অবলম্বনে লিখিত। (লেখক)

পুরুষ 'হজরৎ' এব্রাহিম (দঃ) যেরূপ অলৌকিক ঘটনাবলী প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বরের একত্ব ও সত্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর 'খাকানীকেও' সেইরূপ সুন্দর ভাবময় রচনা-চাতুর্য্য দেখাইয়া পারস্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

তাঁহার পিতার নাম মহাত্মা 'আলিনাজ্জার শিরওয়ানী'। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, কবি, পারস্য দেশস্থ 'শিরওয়ান' নগরে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য কবি ও পণ্ডিতমণ্ডলীর ন্যায় সাধারণ ভাবেই তিনি লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার রচিত কবিতা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, ন্যায়, দর্শন ও অন্যান্য সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অধিকার ছিল, কবি অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিলেও তাঁহার সাহিত্য জ্ঞানের অসাধারণত্ব, বর্ণনা চাতুর্য্যের অলৌকিকত্ব দেখিয়া মহা মহা সাহিত্য রথীগণও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছেন, অন্যান্য কবিদের ন্যায় তাঁহার রচনা সরল ও সাধারণ বোধগম্য নহে, তাঁহার রচিত কবিতা সমূহের শব্দের প্রাকার ভেদ করিয়া ভাব-রাজ্যে প্রবেশ লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

তাঁহার রচিত 'তোহ্ফাতুল এরাকেয়েন্' (تحفة العراقين) নামিত কাব্য গ্রন্থখানি জগৎ বিখ্যাত। এই গ্রন্থখানি সাধারণে 'খাকানী' নামেই পরিচিত। এই গ্রন্থে কবির ভাষার পারিপাট্য, শব্দের ঝঙ্কারে ও ভাবের মৌলিকত্ব দেখিয়া সকলকেই বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়। একবার কবি একটী সুন্দর ক্রীতদাস ও কিছু মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রার্থনায় একটী কবিতা লিখিয়া রাজা 'মনুচাহারে'র নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই কবিতায় কবির লিখিত 'ط' অক্ষরের একটী نقطه দুইটীর ন্যায় দেখাইতেছিল, এই সামান্য পরিবর্ত্তনে ভাবের এরূপ বিসদৃশ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল যে কবি, গুণগ্রাহী রাজার অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে নিগ্রহে পতিত হইলেন; এমন কি রাজা, কবির প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। কবি এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া তখনই একটী মক্ষিকার পক্ষোৎপাটন করিয়া মক্ষিকাটীকে রাজ-সদনে প্রেরণ করিলেন, এবং লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মক্ষিকার মসী-সিক্ত পদ সংযোগেই আমার কবিতার 'ا' অক্ষরটী 'ٮ' অক্ষরে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং এ দোষ আমার নহে, তজ্জন্য যদি শাস্তিভোগ করিতে হয়, এই মক্ষিকাটীই সেই শাস্তি ভোগের উপযুক্ত, রাজা কবির কবিত্ব শক্তি ও এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কবির প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া বহু ধনরত্ন ও কবির প্রার্থিত মণিমাণিক্য-খচিত পরিচ্ছদ ও কয়েকটী ক্রীতদাস কবির নিকট প্রেরণ করিলেন। পুরাকালীন অন্যান্য রাজাদের সম্বন্ধেও এই প্রকার "ক্ষণেতুষ্ট, ক্ষণেরুষ্ট" ভাবের অনেক গল্প প্রচলিত আছে, এ সকল গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অনেক সময় সন্দেহ উপস্থিত হয়; কিন্তু রাজাদের সম্বন্ধে "বড়র পীরিতি বালির বান্ধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ" এ কথা মনে হইলে অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কবি শেষ বয়সে সাংসারিক যশঃ ও প্রতিপত্তির প্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ হইয়া ভগবদারাধনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে রাজার নিকট বিনীত ভাবে বিদায় প্রার্থনা করি-

লেন। রাজা তাঁহার ন্যায় মহাকবির সঙ্গ-সুখভোগে বঞ্চিত হইতে হইবে ভাবিয়া কিছুতেই তাঁহার বিদায় প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। কবি পরম্পর এই প্রকারে রাজার সম্মতিলাভে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে সকলের অজ্ঞাতে 'শিরওয়ান' পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'বেয়্‌লকান' (بيلقان) নগরে উপনীত হইলেন, এ নগরটীও রাজা 'মুনচাহারের' রাজ্যভুক্ত ছিল; সুতরাং রাজাজ্ঞানুসারে তত্রত্য রাজকর্ম্মচারিগণ কবিকে বন্দী করিয়া রাজ-সদনে প্রেরণ করিলেন, রাজা কবিকে মহা সম্মান সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, এমনকি চতুর্গুণ বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য নানাপ্রকারের অনুকম্পা প্রদর্শনের লোভ দেখাইলেন, কিন্তু সাংসারিক কোন প্রলোভনই কবিকে তাঁহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প-চ্যুত করিতে পারিল না। কবি কিছুতেই আর রাজ-সংশ্রবে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না, তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে, আমার ঐহিক ভোগ-লালসা, যশঃ প্রতিপত্তির আশা শেষ হইয়াছে, জগতের সমস্ত ধনরাশি একত্র করিয়া ও পার্থিব সকল প্রকার যশঃ ও প্রতিপত্তির সুরভি-কুসুমে মালা গাঁথিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেও কেহই আমাকে আমার পবিত্র সঙ্কল্প হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না। রাজা নানাপ্রকারে বুঝাইয়াও যখন কিছুতেই তাঁহাকে আপন প্রস্তাবে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন কবির প্রতি রাজাজ্ঞা অবহেলার গুরু অভিযোগ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিলেন। 'সামেরাণ' নামক দুর্গে কবি সাত মাস বন্দী ছিলেন। কবি কারাজীবনে অগ্ন্যুপাসকদিগের অবস্থা, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন, সাধারণের পক্ষে ঐ সকল কবিতার ভাব গ্রহণ একরূপ অসম্ভব। 'জওয়াহেরল্‌ আস্‌রার্‌' (جواهر الاسرار) নামিত গ্রন্থে "সেখ আরেফ্‌ আজ্‌রী" উল্লিখিত কবিতা সমূহের দুরূহ অংশের মর্ম্ম সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং টীকা ও টিপ্পনীর দ্বারা তৎসমূহ সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

কবি সাত মাস কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করেন, তারপর সম্পূর্ণরূপে 'খাকান মুনচাহারে'র সংশ্রবপরিশূন্য হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে ও ঈশ্বরারাধনায় মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি তাপস প্রবর মহাপুরুষ 'জামালুদ্দীন মুস্‌লী'র পবিত্র সাহচর্য্য লাভ করিয়া তাঁহার সহিত পবিত্র 'হজ্জ'ব্রত সমাপনেচ্ছায় 'হেজাজ্‌' অভিমুখে তীর্থযাত্রা করেন। পথিমধ্যে হেজাজ ভূমির পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য এবং জামালুদ্দীনের প্রশংসাসূচক কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলি আজিও পারস্য-সাহিত্য বাজারে বিশেষ মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। মূল কথা তাঁহার ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কবিতাই সাহিত্য-জগতে বিশেষ আদরের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছে এবং সকলেই তাঁহাকে একবাক্যে কবি-কুল-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত তোহফাতুল এরাকায়েন (تحفة العراقين) গ্রন্থখানি সাহিত্য-জগতে এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে যে, মহা মহা সাহিত্য-রথী অধ্যাপকগণও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আপনাকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন।

তুর্কীস্থানবাসী পণ্ডিত প্রবর আসিরুদ্দীন (اثیرالدین) মহাকবি 'খাকানীর' সম-সাময়িক কবি ছিলেন। সে সময় 'খাকানীর' নাম ও তাঁহার যশঃবিভা দেশ বিদেশে এরূপ বিকীর্ণ হইয়াছিল যে, বুধশ্রেষ্ঠ মহাত্মা আসিরুদ্দীন মহাকবি খাকানীর সহিত সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা প্রদর্শন উদ্দেশ্যে স্বদেশ হইতে বহুদূরবর্ত্তী 'শিরওয়ান' অভিমুখে যাত্রা করেন, মধ্যপথে ঘটনাক্রমে মহাগুণগ্রাহী সম্রাট মহাতমা "মুগিসদ্দীন আর্ সালান্" এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল, সম্রাট তাঁহার গুণপনা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বহু সাধ্য সাধনায় আপন সভাসদ শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। সম্রাট তাঁহার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন যে, তিনি স্থায়ীভাবে রাজসদনে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন। পণ্ডিত প্রবর আসিরুদ্দীন রাজানুগ্রহে সাংসারিক সকল অভাব অনাটনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আজীবন মহাকবি খাকানীর সহিত কবিতা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দেখাইতেন। একবার মহাকবি খাকানী আত্ম-গৌরব প্রকাশক সাতটী কবিতা বুধশ্রেষ্ঠ আসিরুদ্দীনের নিকট পাঠাইয়া দেন। মহাত্মা আসিরুদ্দীন তদুত্তরে ঠিক সেই ভাবে, সেই ছন্দে আটটী কবিতা খাকানীর নিকট প্রেরণ করেন। কবিবর খাকানী ও বুধশ্রেষ্ঠ আসিরুদ্দীনের সাহিত্য আসরে আজীবন প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল; কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কাহারও প্রতি কোন প্রকারের ঈর্ষা ভাব পোষণ করিতেন না; বরং প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন ও একে অন্যের রচনার যারপর নাই প্রশংসা করিতেন।

সম্রাট 'মুগীসদ্দীনের রাজত্বকালে, মহাকবি খাকানী, জাহীর ফার্ইয়াবী, আসীরুদ্দীন আখিগুনী, মুজীর বেয়্লকানী, কামালদ্দীন নাখ্জওয়ানী, সাহাপুর নেসাপুরী, জুল্ফোকার্ সরওয়ানী সৈয়দ আজ্জুদ্দীন ও আল সোলজুকের ইতিহাস লেখক এই নয় জন মহাকবি এক সময়ে নবগ্রহের ন্যায় আপনাপন উজ্জ্বল বিভার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য ভাণ্ডারে এক সময়ে এরূপ নবরত্নের একত্র সমাবেশ অন্য কোন রাজার রাজত্ব কালে ঘটিয়া উঠে নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে উল্লিখিত সাহিত্য-রথিগণ সকলেই মহাকবি 'খাকানীর' সমসাময়িক ছিলেন; সুতরাং এই সকল মহারথিগণের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া যশঃসৌরভে দিগ্দশ আমোদিত করা 'খাকানীর' পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নয়।

কিন্তু অহো! অসাধারণ মনীষা, অগাধ বিদ্যাবত্তা ও অসীম যশঃ প্রভা কিছুতেই মহাকবি খাকানীকে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তিনি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদিগকে কান্দাইয়া সাহিত্য-জগৎকে অন্ধকার করিয়া হিঃ ৫৫৮ সালে তাব্রিজ নগরে পরলোক গমন করেন। কবির মৃত্যু কালীন বয়স সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, কিন্তু তিনি যে অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, নানাসূত্রে তাহা জানিতে পারা যায়। তাব্রিজের 'সোর্খাব' سرخاب নামক স্থানে মহা জাঁকজমকের সহিত কবির সমাধি প্রদত্ত হয়। ঐস্থানে তাঁহার দুই

পার্শ্বে সুধীশ্রেষ্ঠ জাহির ফারইয়াবী ও সাহপুর নেশাপুর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। সুখ সম্পদ ও যশঃ প্রতিপত্তির এই অনিত্যতা দেখিয়া একজন পারস্য-কবি রচিত নিম্নলিখিত কবিতা কয়টী স্বতঃই মনে উদিত হয়।

هر طلوعے را غروبے در پئے ست
هر بقائے را بود آخر فنا
آنکه بر قصر معلیٰ بوده است
آنکه باشد خوابگاهش بوریا
جمله را در زیر زمین آید مقام
اے دریغا زین مقام بے دغا

কাজী নওয়াজ খোদা
মঙ্গলকোট ; বর্দ্ধমান।

তাছাওয়াফ।

আভাষ——পীর——পরিভাষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহ বলিতেছেনঃ— ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا "যদি তোমার প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিবার আশা রাখ, তাহা হইলে পুণ্য (তাঁহার সন্তুষ্টি জনক) কার্য্য কর ও তোমার একমাত্র প্রভুর দাসত্বে অপরকে অংশভাগী করিও না (সুরা কাহাফের শেষ আয়েত) সুফীগণ এই আয়েত শরীফের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইয়া জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত একমাত্র প্রকৃত খোদার উপাসনাতেই রত থাকেন, অন্যদিকে চক্ষু ফিরান না। খোদাতালা বলিতেছেন, نحن اقرب اليه من حبل الوريد "আমি তাহার (মানুষের) শরীরাভ্যন্তরস্থ শিরা (Jugular vein or vena cava) অপেক্ষাও অধিক নিকটে আছি"—অর্থাৎ উক্ত শিরাটী মানব-দেহের মধ্যে তাহার যত নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে, খোদাতালা তদপেক্ষা অধিকতর নিকটে আছেন (সুরা কাফ্ ২৬ পারা), ইহা জানিয়াও আমরা তাঁহাকে অনেকদূরে অবস্থিত এমনকি অনেকস্থলে অবিদ্যমান বলিয়া মনে করিয়া থাকি (তাঁহাকে বিদ্যমান জানিলে পাপের অনুষ্ঠান কখনই সম্ভব হইত না)।

আবার অনেকের বিশ্বাস 'তাছাওয়াফ' শরীয়াতের সহিত সম্পর্কশূন্য। ইহা ভুল ধারণা। শরীয়াতের উদ্দেশ্য যদি এই জড় দেহ লইয়া কেবলমাত্র জড় জগতের কর্ম্মের নিয়ম পালন করা হয়, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। আর যদি তাহার উদ্দেশ্য انا لله وانا اليه راجعون "আমি আল্লাহ্‌তালার জন্যই আছি ও তাঁহার দিকেই ফিরিয়া যাইব" হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন যে, তাছাওয়াফের অনুশীলন ব্যতীত শরীয়াত কখনই মজবুত হয় না ও তাহার নিয়ম ও যথোচিত ভাবে পালিত হইতে পারে না। তাছাওয়াফের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ব্যতীত শরীয়াত শাঁস শূন্য নারিকেল বিশেষ। অতএব তাছাওয়াফ্ শরীয়াতের বহির্ভূত একটা স্বতন্ত্র বস্তু নহে। *শরীয়াত হইতে তাছাওয়াফ্ বাদ দিলে শরীয়াত অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। শব্দ ছাড়িয়া অর্থের অনুসরণের নামই হইল 'তাছাওয়াফ্'। ইহা হজরত নবি করিম (দঃ) কর্ত্তৃক তাঁহার পারিষদ মণ্ডলীকে বিতরিত আধ্যাত্মিক শিক্ষা মাত্র। ইহাদ্বারা জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হয় ও হৃদয়ে ভগবৎ প্রেম জাগিয়া উঠে। ইহার নামকরণ 'তাছাওয়াফ' কেন হইল, তাহা পরে বলিব। ইহার শিক্ষা চারিটী শাখায় বিভক্ত ; যথা :—শরীয়াত, তরিকত, হকিকত ও মায়ারেফাত। এই চারিটী বিভাগ নিম্নলিখিত ভাবে হজরত রসুলে আকরমের (দঃ প্রতি মনসুব হইয়া থাকে। যথা :—

الشريعة اقواله - الطريقة افعاله - الحقيقة احواله - المعرفة سره

---

* কিন্তু লেখক এইমাত্র শরীয়াত ও তাছাওয়াফকে প্রকারান্তরে স্বতন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। —সম্পাদক।

অর্থাৎ ‘শরীয়াত তাঁহার বাক্য, তরিকত তাঁহার কর্ম্ম, হকিকত্‌ তাঁহার ভাব বা অবস্থা ও মায়ারেফাত তাঁহার জীবনের প্রকৃত রহস্য।’ ইহাই ‘তাছাওয়াফ’ ’এর শিক্ষা। ইহা প্রত্যেক মুসলমানের পালনীয় কিনা তাহা আপনারা মীমাংসা করিয়া লইবেন। উপরে দেখাইয়াছি যে, ইহার শিক্ষার মূল ভিত্তি কোরআন ও হাদিছের শিক্ষার উপর স্থাপিত রহিয়াছে। এক্ষণে আপনারা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এসলামের মধ্যে যতগুলি সম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে জড়বাদী (Materialist) ভিন্ন অপর সকলেই অর্থাৎ যাঁহারা কোরআন ও হাদিসের শিক্ষার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার আভাষ দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ‘তাছাওয়াফ্‌’এর শিক্ষার গণ্ডীর ভিতরে রহিয়াছেন। ‘তাছাওয়াফ্‌’ মূল এসলাম ধর্ম্মের বহির্ভূত কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। নাছাফি প্রমুখ দুই একজন লেখক কোরান মজিদের কেবলমাত্র বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতী, তাঁহারা উহার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করাকে এলহাদ (কোফর) বলিয়া থাকেন। খোদাতা'লার পবিত্র বাণীর আধ্যাত্মিক অর্থ করা যদি দুষণীয় হয়, তাহা হইলে এসলাম ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক শিক্ষাশূন্য হইয়া পড়ে, অথচ হিন্দু-শাস্ত্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লার প্রদত্ত শিক্ষার কি মূল্য হইতে পারে ও এরূপ করায় এসলামের মধ্যে (Materialism) জড়বাদিত্বের প্রশ্রয় দেওয়া হয়না কি ? ‘তাছাওয়াফ্‌’ পবিত্র কোরআনের সুরা রহমানে উক্ত كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام “একমাত্র তোমার সেই মহা প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যশালী প্রভু ব্যতীত জগতে আর যাহা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল”—এই আয়েত শরীফের নির্দ্দেশ অনুসারে মানুষকে তাহার সকল প্রকার পার্থিব ও পারলৌকিক চিন্তা গুটাইয়া লইয়া একমাত্র খোদাতা'লাতে কেন্দ্রীভূত করতঃ তাঁহাতে তন্ময়ত্ব লাভ করিতে ও আত্মহারা হইতে শিক্ষা দেয় ও اتصال بے تکیف بے قیاس * هست رب الناس را با جان ناس ‘চিন্তা ও কল্পনার অতীত যে একটী সংযোগ মানুষের ও তাহার প্রভুর মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে’ তাহা মানুষকে উপলব্ধি করাইয়া দেয়। ইহারই নাম খোদা সম্মিলন—ইহারই নাম তৌহিদ (توحيد)। ইহাই মানবজীবনের Summum Bonum একমাত্র ঈপ্সিত-সার ও লভনীয় পদার্থ। এই মহারত্নের অন্বেষণে লোকের উদাসীন থাকা কম পরিতাপের বিষয় নহে।

“যে দিল করুণা করি যুগল নয়ন,
উচিৎ কি নয় তাঁর রূপ দরশন ?
যে দিল করুণা করি রসনা ললিত,
কেন রে না গাও তাঁর মহিমার গীত ?
যে তোমারে প্রেম করে দিল প্রেমহেম,
উচিৎ কি নয় ওরে তাঁরে করা প্রেম ?
যাদের ক্ষণিক প্রেম ক্ষণ প্রভা প্রায়,
তাদের প্রণয় পঙ্কে লিপ্ত কর কায় !

(আর) যাহার সহিত নাই বিচ্ছেদ কখন,
মাখিলে না অঙ্গে তার প্রণয় চন্দন !
ওরে রে হাফেজ ! কেন বিমুগ্ধ এমন ?
রতনের লোভে হও কুপেতে মগন !"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার) *

কবি ঠিক কথাই বলিয়াছেন—রত্নাহরণ (মুক্ত উত্তোলন) করিতে হইলে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া দরকার, সামান্য কুপমধ্যে তাহা দুষ্প্রাপ্য। পার্থিব পদার্থে তুমি সেই অতুলনীয় স্বর্গীয় ও আত্মা-তৃপ্তিকর প্রেম অনুসন্ধান করিতেছ ? ইহা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপর কেহ গাহিয়াছেন—

প্রেম পাব ব'লে লোকে ব্যভিচার সদা করে।
প্রতপ্ত মরুর মাঝে পাওয়া যায় কি সরোবরে ?

দোয়া সুরিয়ানিতে খোদাতালার তরফ হইতে উক্ত হইয়াছে—

انا المقصود فاطلبني تجدني * فان تطلب سوائي لم تجدني

"আমিই তোমার লভনীয় বস্তু আমাকে তুমি অন্বেষণ করিলে পাইবে। যদি তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য জিনিষ অন্বেষণ কর তাহা হইলে আমাকে পাইবে না।" মৌলানা রুমী বলিতেছেন—

عاشق صنع خدا بافر بود * عاشق مصنوع او کافر بود

"যাহারা খোদাতালার সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া তাঁহার প্রতি আশক্ত হয়, তাহারাই সম্পদ লাভ করে। পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আশক্ত হয়, তাহারাই কাফের উপাধিতে অভিহিত হয়।" শঙ্করাচার্য্য চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন :—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ অর্থাৎ	'কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার পুত্র ?
সংসারোঽমতীব বিচিত্রঃ	সংসারের ব্যাপার অতীব বিচিত্র।
কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াতঃ	তুমি কে ও কোথা হইতে আসিয়াছ,
তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ	হে ভ্রাতঃ সেই তত্বই চিন্তা কর।

অহো কি দুর্দ্দৈব ! অন্যান্য ধর্ম্মে আধ্যাত্মিক শিক্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব, আর এসলাম সেই অতুলনীয় ধন হইতে মানুষকে বঞ্চিত রাখিবে ? আধ্যাত্মিক অর্থ বাদ দিয়া কোরআনের কদর্থ করিতে হইবে ? কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং ? †

---

* ইনি কবিকুল শিরোমণি হাফেজের আত্মাকে গুরুপদে বরণ করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন এবং তাঁহারই ভনিতাকে নিজ নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছেন।

† এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিৎ যে অন্যান্য ধর্ম্মে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দ্বারা ঈশ্বর সম্মিলনের পন্থা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও 'নির্ব্বিকল্প সমাধি' হজরত রসুলে (দ) এর পদঙ্কে অনুসরণ ব্যতীত লাভ হইতে পারে না, ইহা যশোহর, খড়কীর পীর জনাব মৌলানা আব্দল করিম সাহেব তাঁহার 'খোদা প্রাপ্তি তত্ব' নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রমান করিয়া দেখাইতেছেন।

এসলামের এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মানুষকে 'ইমান তছদিকি' লাভ করিতে সমর্থ করে। সাধারণ ইমানকে 'ইমান তকলিদি' কহে, ইহার ভিত্তি শ্রুতির উপর। লোক মুখে শুনিয়া বা পুস্তকগত বিদ্যার দ্বারা শিক্ষা করিয়া যে ইমান লাভ হয়, তাহাকে ইমান তকলিদি বলা যায়। আর স্বয়ং খোদাতা'লাকে দর্শন করিয়া যে ইমান লাভ হয়, তাহাকে ইমান তছদিকি আখ্যা প্রদান করা হয়। এই দর্শন ক্রিয়া সাধনা সাপেক্ষ, ইহা জ্ঞান চক্ষুর (چشم بصيرت) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, বাহ্য চক্ষুর (چشم بصارت) দ্বারা নহে, কারণ জড় জগতে খোদাতা'লা (غير مرئى) বাহ্য চক্ষুর গোচরীভূত নহেন। খোদাতা'লার আত্মপ্রকাশকে তাজাল্লি কহে, ইহা তিন প্রকার, যথা—(১) (تجلى افعال) তাজাল্লিয়ে আফ্‌য়াল (ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশ) ; (২) (تجلى صفات) তাজাল্লিয়ে ছেফাত (গুণের দ্বারা প্রকাশ) ও (৩) تجلى ذات তাজাল্লি জাত (স্বয়ং প্রকাশ)। খোদা দর্শকেরা নিজেদের সাধনার ক্রম অনুসারে তাঁহাকে পর পর এই প্রকারে দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাস ও (يقين) উক্ত ক্রম অনুসারে পর পর ৩ প্রকারে ঘনীভূত হইয়া আসে, যথা—(علم اليقين) এলমোল একিন, (عين اليقين) আয়নোল একিন ও (حق اليقين) হাক্কোল একিন। পাঠক ! ইমান তকলিদি ও তছদিকির মধ্যে বিশ্বাসের পার্থক্য দেখিতে পাইলেন কি ?

ترا دیده و یوسف را شنیده * شنیده کے بود مانند دیده

অর্থাৎ 'তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতেছি ও ইউসফের সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়াছি, অতএব শ্রবণ কখনই দর্শনের সমতুল্য হইতে পারে না।' ইমান তছদিকি ব্যতীত মৃত্যুকালে কখনও মানুষের প্রকৃত খাতেমা-বেল-খায়ের (خاتمه بالخير) হইতে পারেনা ! মৃত্যুকালে ما سواء الله 'খোদা-তা'লা ব্যতীত অপর সকল বিষয়ের' চিন্তা হইতে বিরত হইয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁহাতে তন্ময় হওয়াকে 'খাতেমা-বিল-খায়ের' কহে। কোন প্রেমিক কবি লিখিয়াছেন—

منم و همین تمنا که بوقت جان سپردن * برخ تو دیده باشم تو درون دیده باشی

"আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই যে প্রাণটী তোমাকে সমর্পণ করিবার সময় আমি তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি ও তুমি আমার চক্ষুতারকার মধ্যে অবস্থিত থাক।' ইহারই নাম 'খাতেমা-বিল-খায়ের'। হৃদয়কে সকল বিষয় হইতে সম্পর্ক শূন্য না করিতে পারিলে কদাচ এ ভাব উপস্থিত হইতে পারে না। এ সময় তৌহিদের একান্ত প্রয়োজন। এ সময় শয়তান মানুষকে ঈশ্বরের একত্ব ও অস্তিত্ব অস্বীকার করাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। 'তৌহিদ' মজবুত থাকিলে মানুষ শয়তান কর্ত্তৃক বিপথগামী হইতে পারে না। 'তৌহিদ' কাহাকে বলে, তাহা সংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হইয়াছে। জীবনে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শেরেক করাতে অভ্যস্ত থাকে, তাহাদের এ সময় ভয়ঙ্কর বিপদ। নাস্তিকের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। আমি যশোহর জেলায় অবস্থান কালে একজন ২৪ ঘণ্টা এবাদতে লিপ্ত পীর সাহেবের উক্তি তাঁহার কোন কোন শিষ্যের প্রমুখাত শুনিয়াছি। তিনি নাকি 'তৌহিদ'কে কোফর বলেন।

এক্ষণে বিবেচনার বিষয় এই যে, যাহারা আজীবন সংসারে নিবিষ্টচিত্ত থাকেন ও মৃত্যুর পূর্ব্বে পরম প্রভুতে আত্মসমর্পণ করেন নাই, তাঁহারা মৃত্যুকালে কেবল মাত্র কলমা শরীফ বা খোদার নাম শুনিয়াই অন্তিমের গতি সেই আল্লাহ্‌তালাতে কি প্রকারে চিত্ত সমাবেশ করিতে পারেন ? তখন তাঁহাদের সংসারে তরিত্যা স্ত্রী পুত্রাদির টাকা কড়ি বিষয় আশয়ের পরিণাম ভাবনা কি একেবারে মন হইতে উড়িয়া যাইবে ? موتوا قبل ان تموتوا 'মরিবার পূর্ব্বে মরিয়া যাও' —তাছাওয়াফের এই শিক্ষা ও পূর্ব্বলব্ধ ইমান তছদিকি ব্যতীত কি প্রকারে আজীবনের সম্বন্ধরূপ বিষয় চিন্তা হইতে মন অপহৃত হইয়া চরম লক্ষ্যে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে ? শঙ্করাচার্য্যের উক্তি, যথা—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্ত,	অর্থাৎ	' বাল্যকাল খেলা করিতে করিতে গেল,
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্ত,		যৌবনকাল যুবতী স্ত্রীর আনুরক্তিতে কাটিল,
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্ন,		বৃদ্ধকাল সংসার-চিন্তায় অতিবাহিত হইল,
পরমে ব্রহ্মনি কোঽপি ন লগ্ন।		পরম ব্রহ্মে (খোদাতালাতে) চিত্ত সমাবেশ করিবার সময় হইয়া উঠিল না।

এবম্বিধ অবস্থায় খাতেমা-বিল-খায়েবের আশা শূন্যমার্গে প্রাসাদ নির্ম্মাণের কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যশোহর কালীগঞ্জের একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আশা করি পাঠক পাঠিকারা ইহাকে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করিবেন না। উক্ত স্থানের বাজারে ফরিদপুর নিবাসী জনৈক শুড়ি জাতীয় হিন্দু তুলার কারবার করিত। তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে হরিনাম শুনাইতে ও 'হরিবল' 'হরিবল' করিয়া তাহার মুখ হইতে অন্তিম সময়ে হরিনাম বলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ তুলা কিনিতে আসিয়া ফাও চাহিতেছে এই ভাবিয়া সে 'হরিবল' কথার উত্তরে নিয়ত 'তার নামে এক মাকাটিও না ' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ও এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। সংসারের মোহ শেষ সময় পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িল না। এ প্রকারের আরও অনেক ঘটনা আছে, যাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ও আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। যতটুকু লেখা হইয়াছে, আশা করি তাহার দ্বারা আপনারা ' তাছাওয়াফ্‌'এর শিক্ষা ও সাধনার মাহাত্ম্য ও তাহার ফল স্বরূপ ইমান তছদিকি লাভের আবশ্যকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এক্ষণে ' তাছাওয়াফ্‌' নামের ব্যুৎপত্তি ও এসলামের এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার এবম্বিধ নামকরণ কেন হইল, এ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিলে আমার কর্ত্তব্য আপাততঃ শেষ হয়। এসলাম ধর্ম্মের অন্তর্গত বিবিধ বিষয়ের শিক্ষার জন্য ফেকাহ্‌, অসুল প্রভৃতি যেমন বিভিন্ন শাস্ত্রাবলী আছে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ের শিক্ষার জন্য যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে এই নামেই অভিহিত করা হয়। মূলে ইহা কোরআন ও হাদিসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা উপরে এক প্রকার দেখান হইয়াছে। ইহার উক্তরূপ নামকরণ খুব সম্ভব ইহার সাধকদের দ্বারা জনাব হজরত রসুল (দঃ)এর পরবর্ত্তী সময়ে হইয়াছে, এবং এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত কিম্বদন্তি ভিন্ন অন্য কোন ইতিহাস খুজিয়া পাওয়া যায় না,

অতএব এই নামের উৎপত্তির ঠিক কারণ ও সময় নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ বলেন, তাবেয়ীন-দের সময়ে ইহার সাধকদের একদল সৃষ্টি হয় (?) তাঁহারা নিজেদের সম্প্রদায়ের নাম اصحاب صفه আছহাবে ছোফ্‌ফা রাখেন, তাহা হইতেই এই নামের উদ্ভব হইয়াছে। কেহ বলেন, ইহার সাধকেরা অধিকাংশ দরবেশ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা 'ছুফ' নামক কাল বস্ত্র পরিধান করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ছুফী বলা হইত, সেই সূত্র ধরিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। কেহ বলেন ছুফী তাঁহাদিগকেই বলা যায়, যাঁহারা নিজের হৃদয়-মন্দিরকে ماسوا الله (খোদা ব্যতীত অপর সকল পদার্থ) হইতে (ছাফ) শূন্য করিতে সক্ষম এবং যে শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন তাহাকে তাছাওয়াফ কহে। কেহ বলেন, গ্রীক ভাষার Theosophy ' থিওসফি ' শব্দ হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ নানা লেখকের নানা মত চলিয়া আসিতেছে। ফল কথা, ইহার উক্তরূপ নামের উৎপত্তি যে কোনও সময়ে ও যে কোন কারণে হইয়া থাকুক না কেন, ইহার আদি সূত্র যখন কোরআন ও হাদিছে সম্বদ্ধ রহিয়াছে ও ইহার নকশ্‌বন্দিয়া শাখার মূলে ১ম খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)কে ও অবশিষ্ট প্রায় সমুদয় শাখা প্রশাখার মূলে ৪র্থ খলিফা হজরত আলী (রাঃ)কে দেখা যাইতেছে ও স্বয়ং ধর্ম্মগুরু হজরত রসুল করিম (দঃ) বলিতেছেন :— انا مدينة العلم و علي (رض) بابها " আমি (ঐশ্বরিক) জ্ঞানের নগর ও আলী তাহার প্রবেশ দ্বার " তখন ইহা উপেক্ষার বিষয় নহে। অধিকন্তু যখন ইহা সাধনা সাপেক্ষ বিষয়, তর্কের ও বাদানুবাদের দ্বারা মীমাংসার বস্তু নহে, তখন একটু কষ্ট করিয়া সাধনা করিয়া দেখিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। ফল খাওয়াই উদ্দেশ্য, বৃক্ষ গণনার প্রয়োজন কি ? তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা বাজে কথা লইয়া হট্টগোল করেন না, কর্ম্মের দ্বারা মর্ম্মাবগত হইয়া থাকেন।

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,	অর্থাৎ ' নিরত মনে মনে তত্ত্ব চিন্তা করিবে,
পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।	বিনাশশীল ধনের চিন্তা পরিত্যাগ করিবে।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা,	এই পৃথিবীতে ক্ষণ এক সাধুসঙ্গ কর,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।	ভবসমুদ্র পার হইবার তিনিই নৌকা স্বরূপ হইবেন।

(শঙ্করাচার্য্য।)

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-তত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা।
ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক মুক্তি কেহ বা সুখম্॥

(পঞ্চদশী।)

অর্থাৎ—' যতদিন মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ঈশ্বরতত্ব না জানিতে পারেন, ততদিন তাঁহারা ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হন। এ অবস্থায় তাঁহাদের মুক্তি কোথায় আর সুখই বা কোথায় ?*

ডাঃ এস্‌, এম্‌, হোসেন।

---

* এই প্রবন্ধের ভাব, ভাষা ও রচনা প্রণালীর অনেক বিষয়ের আমাদের মতানৈক্য না থাকিলেও, তাছাওয়াফ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একদল লোকের যাহা বিশ্বাস, মোটামুটি ভাবে তাহার আভাষ দিবার জন্য এই প্রবন্ধটী মুদ্রিত হইল। —সম্পাদক।

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার।

(১)

আভাষ।

হিন্দু ও মুসলমান, ভারত-মাতার যুগল সন্তান। তাঁহারাই দেশের প্রধান অধিবাসী। মাতৃভূমির প্রকৃত সুখ সম্পদ ও সমৃদ্ধি গৌরব যে, এই উভয়ের সমবেত চেষ্টা, পরস্পর একতা ও সম্প্রীতির উপর নির্ভর করে, তাহা চিন্তাশীল ও জ্ঞানীলোক মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই উভয় ভ্রাতার পরস্পর মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দ স্থাপনের উপায় কি, তদ্বিষয় অতি অল্প লোকই চিন্তা করিয়া থাকেন। সভা সমিতির ক্ষণস্থায়ী বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে, কন্‌ফারেন্স ও কংগ্রেসের জনাকীর্ণ অধিবেশনের আন্দোলন আলোচনা বা প্রস্তাব নির্দ্ধারণে কখনও এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। বিগত ৩০ বৎসর ব্যাপিয়া ঈদৃশ চেষ্টার পরিণামফল আমাদের উক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, যেমন প্রথমতঃ তাহার উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে হয়, এবং ঠিক অবস্থানুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেই সুফল লাভ হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও সেই চিরন্তন প্রাকৃতিক বিধান লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। তবে যদি শুধু বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন পূর্ব্বক ' দেশ-সেবক ' উপাধি ধারণ করা অভিপ্রেত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা।

দেশের প্রকৃত হিতৈষী ও চিন্তাশীল লোকগণের মতে, বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের লিখিত ভারতের অলীক ও ভিত্তিহীন ইতিহাস, এবং তাঁহাদের আদর্শ-অবলম্বনে রচিত এতদ্দেশীয় *অনুকরণ-প্রিয় লেখকগণের কল্পনা কাহিনী বনামে ভারতের ইতিবৃত্ত, এ সকলই হিন্দু মুসল-*মানের পরস্পর মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। আধুনিক নভেল ও নাটক-রচক এবং ঔপন্যাসিকগণ দেশের স্বভাবগত অনুকরণ-প্রিয়তার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, পূর্ব্বালোচিত ভারতের কল্পিত ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে বাজারের রুচি অনুসারে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়া দেশের হাটে মাঠে ঘাটে ছড়াইতেছেন, সে সকল পুস্তক যে দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির পক্ষে কতদূর সহায়তা করিতেছে এবং সেই বিষ-বৃক্ষের ফলভোগ করিয়া যে দেশবাসী হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায়ন্তর নাই। সাহিত্যই দেশের ও সমাজের জাতীয়-জীবন গঠনের সহায়, কোন জাতিকে উন্নতি ও অভ্যুত্থানের পথে আকর্ষণ করার পক্ষে সাহিত্যই প্রধান অব-লম্বন। পক্ষান্তরে দোষদুষ্ট সাহিত্যের কল্যাণেই দেশে পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ও গৃহবিবাদের সৃষ্টি হয়, তদ্দ্বারা দেশ ও দেশবাসী বিনাশের পথে অগ্রসর হয়। বৈদেশিক লেখকগণের পুস্তকাবলী দ্বারা এই শেষোক্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি সফল হইয়াছে দেখিয়া, অমর জগৎ হইতে তাঁহাদের আত্মা, অট্টহাস্য ও আনন্দ ধ্বনি করিতেছে।

ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া জাতীয় সৎসাহিত্য ও মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধনের চেষ্টা করাই দেশবাসী ও সাহিত্য সেবকগণের প্রধান কর্ত্তব্য। এরূপ সাধু চেষ্টার কিরূপ শুভময় মধুর ফল ফলিতে পারে, তাহার আদর্শ দৃষ্টান্ত বঙ্গের সুসন্তান ঐতিহাসিক বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও অসাধারণ অধ্যবসায়ী শ্রদ্ধেয় বাবু যদুনাথ সরকার আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়াছেন। "সেরাজদ্দৌলা," "মীর কাশেম" ও "আওরঙ্গজেব" পুস্তক নিচয় দেশবাসীর কত অলীক ও ভিত্তিহীন ধারণা দূরীভূত করিয়া হিন্দু মুসলমানের পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ বিদূরণে সহায়তা করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদের অবিদিত নাই। এই অধম দেশ সেবকও নিজ ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এই সাধনা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। এই নগণ্য প্রবন্ধটী আমার প্রাণের আবেগজনিত উচ্ছ্বাসের সামান্য প্রতিবিম্ব মাত্র। পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসে, অতীত যুগের ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের অনেক সমৃদ্ধি গৌরবের পুণ্য কাহিনী উজ্জ্বল বর্ণে লিখিত আছে; দুঃখের বিষয় যে সে সকল গুপ্ত রত্নোদ্ধারের প্রতি দেশবাসীর তেমন আগ্রহ ও উৎসাহ নাই। এই ক্ষেত্রে ইহা বলিয়া রাখা নিষ্প্রয়োজন যে, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে মুসলমানগণের শাসন যুগে, হিন্দুগণের কিরূপ ধর্ম্মগত ও সামাজিক এবং রাজনীতিক অধিকার ছিল, তাহাই আলোচিত হইবে।

মুসলমান আমলে হিন্দুগণের ধর্ম্মগত অধিকার।

অনেকেই মনে করেন, এস্‌লাম ধর্ম্ম, পৃথিবীতে তরবারি সাহায্যেই প্রচারিত হইয়াছে, বল প্রয়োগেই সর্ব্বত্রে ইস্‌লাম, বিস্তার লাভ করিয়াছে; কিন্তু এরূপ ধারণা যে, সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন ও ঐতিহাসিক প্রমাণ শূন্য, তাহা প্রমাণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, মৎপ্রনীত "ভারতে মুসলমান সভ্যতা" ও "ভারতে এস্‌লাম প্রচার" পুস্তকদ্বয়ে এবং "আল্ এস্‌লামে" প্রকাশিত 'এস্‌লাম প্রচার' প্রবন্ধে এতদ্বিষয় ঐতিহাসিক প্রমাণ বলে যথোচিতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে এই ক্ষেত্রে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এস্‌লাম ধর্ম্ম বিধি, ধর্ম্ম প্রচারব্রতে অস্ত্র ধারণ বা বল প্রয়োগ নীতি আদৌ অনুমোদন করে না। কোরআন শরিফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে لا اكراه في الدين "লা একরাহা-ফিদ্দিনে" অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রচার ক্ষেত্রে কোনরূপ বল প্রয়োগ বিধি নাই (১) কোরআনের আর একস্থানের উক্তি যথা—

فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر

অর্থাৎ হে মোহাম্মদ! তুমি লোকদিগকে উপদেশ দান কর, যেহেতু তুমি উপদেশ দাতা বই আর কিছুই নহ, তুমি তাহাদের প্রতি ক্ষমতা পরিচালক দারোগা স্বরূপ নহ। (২) কোরআনে এরূপ উক্তি প্রচুর।

মুসলমানগণ, কার্য্যক্ষেত্রেও তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের উক্ত আদেশ যথাযথ ভাবে পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ইতিহাস তাহার প্রধান সাক্ষী। ভারতবর্ষে, প্রধানতঃ

(১) কোরআন, তৃতীয় ভাগ আয়তল কুর্সী।
(২) কোরআন শেষ ভাগ সুরা গাছিয়া ২০।২১ পদ।

প্রচার-মহাত্মো এবং মুসলমান সাধু সিদ্ধ ওলি দরবেশগণের অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবেই যে, এসলামধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছে, বিশেষ তত্ত্বান্বেষিগণ উপরোল্লেখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করিলেই তাহার সম্যক বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

জেহাদের নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা 'জেহাদের' প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, তাঁহাদের আতঙ্কের আর কোন কারণ থাকিবে না। স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে, আক্রমণকারী বহির্শক্রর গতি রোধ করিবার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তাহারই নাম ' জেহাদ '। ধর্ম্ম প্রচার জন্য যুদ্ধ করা দূরে থাকুক কোন প্রকারের সামান্যরূপ কঠোরতা অবলম্বন করাও বিধেয় নহে। দেশ-বিজয় বা রাজ-নৈতিক স্বার্থের জন্য যে যুদ্ধ করা হয় এসলাম ধর্ম্মে তাহা জেহাদ নামে অভিহিত হইতে পারে না। তাহা আরবীতে 'হরব' নামেই আখ্যায়িত। মুসলমানগণ ভারতবর্ষে, ধর্ম্মপ্রচার জন্য কখনও কোনরূপ জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ-করেন নাই। তাঁহাদের এতদ্দেশীয় সমস্ত যুদ্ধই রাজনিতিক স্বার্থ বিজড়িত ঘটনা।

মোহাম্মদ এব্‌নে কাসেম ও ধর্ম্মাধিকার।

ভারত বিজয়ী মুসলমানগণের মধ্যে, মোহাম্মদ এব্‌নে কাসেমের নাম সর্ব্বাগ্রেই দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। তিনি ৭১১ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ জয় করিয়া, তত্রত্য হিন্দু অধিবাসীদিগকে যে ধর্ম্মগত অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় ঘোষণা পত্রদ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়, তাহার বঙ্গানুবাদ যথা—"সকলেই তাহাদের আরাধ্য দেব দেবীর পূজা অর্চনা করিতে পারিবে, এবং ব্রাহ্মণদিগকে দান দক্ষিণা করা পূর্ব্ববৎ সাহায্য করিবে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় পূজা অর্চ্চনাদি এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মগত ও সামাজিক উৎসবাদি যথা নিয়মে নির্ব্বিবাদে সম্পাদন করিতে পারিবে। পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যের আয়ের শতকরা ৩৲ টাকা দেবালয়ের ও ব্রাহ্মণের সেবাব্রতে ব্যয়িত হইবে। পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মণদিগকে যে নিয়মে দান দক্ষিণা দেওয়া হইতেছিল, সেই নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম করা হইবে না। (১)

প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা এবং অন্যান্য মুসলমান বাদশাহগণ, বিজিত ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজা সাধারণের সহিত যেরূপ সন্ধি পত্রে আবদ্ধ হইতেন, আরবী পার্সী ইতিহাসে তাহার প্রতিলিপি বিদ্যমান আছে, তাহার চুম্বক যথা—(১) শত্রুর আক্রমণ হইতে করবাহী প্রজাপুঞ্জের ধন প্রাণ রক্ষা করা হইবে (২) তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। (৩) কর বা ' জিজিয়া ' দিবার জন্য প্রজাদিগকে রাজকীয় তহসিল কাছারীতে যাইতে হইবে না বরং কর আদায়কারী তহসিল মোহরের প্রজাদের বাড়ী হইতেই কর আদায় করিয়া আনিবে। (৪) তাহাদের বিষয় সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে। (৫) পথিক প্রবাসী ও বণিকদিগের ধন প্রাণ রক্ষা করা হইবে (৬) স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। (৭) পাদ্রী

(১) "মকরেজী" প্রসিদ্ধ আরবী ইতিহাস ২য় খণ্ড ৪০২ পৃষ্ঠা ও "তারিখে" হেন্দোস্থান মৌলবী জকাউল্লা প্রণীত।

ধর্ম্ম মন্দিরের পুরোহিতদিগকে পদচ্যুত করা হইবে না। (৮) ক্রুশ ও প্রতিমার কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করা হইবে না (৯) ভিন্ন জাতীয় প্রজার নিকট মুসলমান প্রজার ন্যায় "ওশর" অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের দশম অংশ এবং জকাৎ অর্থাৎ বৎসরান্তে ব্যয় অবশিষ্ট স্বর্ণ রৌপ্য ধন রত্নের চল্লিশ ভাগের একভাগ গ্রহণ করা হইবে না (১০) যতদিন তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিবে, ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হইবে না। (১১) তাহাদের পূর্ব্বপ্রাপ্ত কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। (১২) সন্ধির সময় যাহারা উপস্থিত নাই, তাহারাও পুরুষানুক্রমে এই সন্ধির ফল ভোগ করিতে পারিবে। (১)

ভারতের মুসলমান বাদশাহগণও এই মর্ম্মানুসারে, অধীনস্থ রাজা ও প্রজা সাধারণের সহিত উপরোক্তরূপ সন্ধি স্থাপন করিতেন এবং যথাযথরূপ সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ত্রুটী করিতেন না।

ধর্ম্ম মন্দিরের জন্য সম্পত্তি দান।

ভারতের মুসলমান বাদশাহগণ, যেমন মস্‌জেদ ও মজারের জন্য নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিতেন, হিন্দু দেবালয়ের জন্যও তদ্রূপ লাখেরাজ ও নিষ্কর স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে বিমুখ ছিলেন না। এখনও ভারতের অনেক দেবালয়ের দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির রাজকীয় পার্সী সনদপত্র কালেক্টারীতে ও মন্দিরের সেবায়েত ব্রাহ্মণের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের "নদ্‌ওতল্‌ওলামা" নামক প্রাচ্য-শিক্ষা-বিস্তারিণী সভার বেনারসস্থ অধিবেশনের সময় পুরাতন হস্তলিপির একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। উক্ত কনফারেন্সের তৎকালীন সেক্রেটারী মৌলানা শিবলী তৎপ্রণীত "আওরঙ্গজেব আলমগীর" পুস্তকে লিখিয়াছেন, সংগৃহীত হস্তলিপি সমূহের মধ্যে, অধিকাংশই মুসলমান বাদশাহগণের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির সনদপত্র। তন্মধ্যে আবার সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রদত্ত ফরমান ও সনদ পত্রের সংখ্যাই অধিক ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আওরঙ্গজেব প্রদত্ত সনদ পত্র সমূহের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু রাজ কর্ম্মচারী অথবা ব্রাহ্মণ ও জমিদারগণের জায়গিরের সনন্দ এবং হিন্দু দেবালয় সংক্রান্ত উৎসর্গিত ভূসম্পত্তির সনদ পত্র। কাশী ও হরিদ্বারের জ্বালামুখী তীর্থের দেব মন্দিরের সম্পত্তির সনদ পত্র সম্রাট আওরঙ্গজেবেরই প্রদত্ত। তবে এই অপরাধেই কি আওরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী ও হিন্দুর দেবালয় ধ্বংসকারী নামে তথা কথিত ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছেন?

ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মাণের অধিকার।

রায় বাহাদুর লালা বিজয় নাথ স্বপ্রণীত "হিন্দোস্থানে গুজশ্‌তা ও হাল" অর্থাৎ "অতীত ও বর্ত্তমান ভারত" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, যাহারা মনে করেন, মুসলমান বাদশাহগণ হিন্দুদিগকে নূতন ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মাণের অধিকার দিতেন না, তাঁহাদের ধারণা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক ও প্রমাণ শূন্য। মুসলমান শাসনের কেন্দ্রস্থানে শাহী আমলের নির্ম্মিত বহু দেব-মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। দৃষ্টান্ত স্থলে বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, গোপীনাথজী, মদনমোহনজীর

---

(১) "ফতুহুল্‌ বোলদান" আরবী ইতিহাস ৫৯।৬৪।৬৫ পৃষ্ঠা।

প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সকল দেবমন্দির মহাপ্রভু চৈতন্যজীর চেলা রূপসনাতন গোসাঁইর তত্ত্বাবধানে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বোম্বাই গেজেটিয়ার ১০ম খণ্ড ১৩২ পৃষ্ঠা এবং যষ্ঠদশ খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মুসলমান আমলদারীতে, দাক্ষিণাত্যে অমুসলমান প্রজাপুঞ্জের মধ্যে, সর্ব্ববিধ ধর্ম্মগত স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল।

ভ্রমণকারী ডাক্তার বার্ণিয়ার সাহেব, তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তের ২য় খণ্ডের ১৭২ ও ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, " মুসলমানগণ দেশের অসভ্যতা ও কুপ্রথা পদ্ধতি নিবারণের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন জাতির ধর্ম্মগত প্রথা পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা রাজধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। তাই হিন্দু সমাজের সতীদাহ-প্রথা নিবারণের জন্য তাঁহারা কোনরূপ কঠোর বিধান বিধিবদ্ধ করেন নাই। তবে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কোন স্ত্রীলোককে সতীদাহ-প্রথা পালন করিতে দেওয়া হয় না। স্ত্রী স্বেচ্ছায় সতী হইতে আগ্রহ ও প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, রাজ পুরুষগণ কখনও সতীদাহের অনুমতি প্রদান করেন না "। মুসলমানগণ হিন্দুধর্ম্মের এক একটী রীতি নীতির মর্য্যাদা রক্ষার প্রতি কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখিতেন তাহা কি অনুধাবন করিবার বিষয় নহে?

বার্ণিয়ার সাহেব স্বকীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে, দিল্লীর যমুনাতীরে সূর্য্য-গ্রহণ উপলক্ষে স্নানের যে মহা মেলা হইয়াছিল, তাহা দর্শন করিয়া তৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, " মোগল বাদশাহগণ মুসলমান হইলেও হিন্দুদের পুরাতন ধর্ম্মনীতি ও সামাজিক প্রথা পদ্ধতি পালনে কোনরূপ বাধা প্রদান করেন না, তাহার কারণ হয়ত তাঁহারা অন্যের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা আদৌ পছন্দ করেন না, অথবা তাঁহারা বাধা প্রদান করিতে সাহস করেন না।"

থানেশ্বরের মেলা।

বাদশাহ সেকান্দর লোদী নিতান্ত গোঁড়া, স্বধর্ম্মভীরু ও একগোঁয়ে প্রকৃতির নরপতি ছিলেন। মেলাদিতে নৃত্যগীত ও রঙ্গ তামাসা নানারূপ অবৈধ আমোদ প্রমোদ হয় বলিয়া তিনি সৈয়দ সালার মস্‌উদ গাজীর ' নেজার ' মেলা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী তিনি হিন্দু সমাজের প্রসিদ্ধ থানেশ্বরের মেলা বন্ধ করিতেও আদেশ করেন। তাঁহার দরবারের নির্ভীক ও ন্যায় পরায়ণ ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক পণ্ডিত মৌলানা মিঞা আব্দুল্লা, রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বাদশাহকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, বিজিত ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য প্রজাসাধারণের ধর্ম্ম কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আপনার নাই এবং তাহা এসলাম ধর্ম্ম-বিধানের অনুমোদিত নহে। প্রজার প্রাণে আঘাত করা রাজধর্ম্মের প্রতিকূল। স্বেচ্ছাচার রাজা ঈদৃশ অস্বাভাবিক তীব্র প্রতিবাদ শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া কোষমুক্ত অসি হস্তে মৌলানার প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং মৌলানাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, তুমি মুসলমানদের ধর্ম্মগুরু মৌলানা হইয়া বিধর্ম্মী

হিন্দুদের পক্ষ সমর্থন করিতেছ, কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এই তোমার কৃত কর্ম্মের ফল গ্রহণ কর, এই বলিয়া বাদশাহ তরবারি হস্তে তাঁহার প্রতি আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। ধর্ম্মবলে বলিয়ান মৌলানা, ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং তিনি তেজোপূর্ণ ভাষায় বলিলেন, এসলাম ধর্ম্মের যাহা আদেশ, আমি তাহাই আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এখন ইচ্ছা হয় আপনি তাহা মস্তকে ধারণ করুন, অথবা তাহা পদদলিত করুন। আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল, আমি তাহা পালন করিয়াছি, এখন আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই আপনি পালন করুন। সেকান্দর, ধর্ম্মের আদেশবাণী শুনিয়া ভীত ও লজ্জিত হইলেন এবং মৌলানার অপরাধ ক্ষমা করিয়া মেলা বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। (১)

প্রসিদ্ধ ফরাসী ভ্রমণকারী মসিউ থেয়োনির (Tavernier) ১৬৫৫ হইতে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনিও হিন্দুদের ধর্ম্মগত স্বাধীনতার বিষয় এবং হিন্দু যাত্রীবর্গের শকটারোহণে নির্ব্বিবাদে মেলা দর্শনাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করা হইল না।

হিন্দুদিগের ধর্ম্ম প্রচারে অধিকার।

মুসলমানগণ, কোন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাধুপুরুষ বা ধর্ম্ম পণ্ডিতকে তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচারে বাধা প্রদান করিতেন না। সকলেই স্বাধীনভাবে স্বকীয় ধর্ম্মমত বা সংস্কার মূলক মত জন সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার অধিকারী ছিলেন। গুরু রামানন্দ, বাবা কবির দাস, গুরু নানক, মহাপ্রভু চৈতন্যজী, রূপ সনাতন গোঁসাই, বল্লভ আচার্য্য, বাবা সুরদাসজী, গোসাঁই তুলসী দাস, বাবা তোকারাম প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারক ও প্রচারকগণ স্বাধীন ভাবে সর্ব্বদা স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন, তাহাতে রাজপক্ষ হইতে কোনরূপ বাধা প্রদান করা হইত না। হিন্দু মুসলমান তাঁহাদিগকে সমান ভাবে সম্মান করিতেন। অবশ্য যাহারা ধর্ম্ম প্রচারের ভাণ করিয়া রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করিত, অথবা বাদশাহের নিকট সেরূপ বিশ্বাস করার কারণ উপস্থিত করা হইত, তদবস্থায় নিশ্চয় তাহাদিগকে বাধা প্রদান করা হইত এবং রাজদ্রোহমূলক কোন অপরাধের বিষয় প্রমাণিত হইলে ঐরূপ ভণ্ড বক ধাম্মিকদিগকে উপযুক্তরূপ শাস্তি দেওয়া হইত।

জিজিয়ার কথা।

মুসলমান বাদশাহগণ হিন্দু প্রজাপুঞ্জের প্রতি 'জিজিয়া' নামক অত্যাচার মূলক ও অপমান-জনক কর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, মুসলমান শাসনের ইহা একটী বিশেষ কলঙ্কের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমি স্বপ্রণীত 'ভারত মুসলমান সভ্যতা' পুস্তকে সবিস্তার আলোচনা পূর্ব্বক জিজিয়ার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জিজিয়া একটী সামরিক ট্যাক্স ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা।

(১) "তারিখে ফেরেশ্‌তা"। পুরাতন পার্সী ইতিহাস।

বলা বাহুল্য যে এই সামরিক কর মুসলমানগণের আবিষ্কৃত কোন নূতন প্রণালীর কর ছিল না, বরং তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আদর্শসুবিচারের জন্য জগৎবিখ্যাত পারস্য-সম্রাট নওশের ওয়ানেরই আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত যুদ্ধ কর প্রথার নূতন প্রবর্ত্তন মাত্র ছিল। ইহার একটী স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, 'জিজিয়া' মূলতঃ আরবী শব্দ নহে, বরং ইহা পারস্য শব্দ 'গিজিয়া' হইতে উৎপন্ন। 'গিজিয়া' অর্থ পারস্য ভাষায় কর। আরবী ভাষায় 'গাফ' বা 'গ' অক্ষরই নাই। গ সম্বলিত কোন শব্দ আরবীতে ব্যবহার করিতে হইলে তাহা 'জিম' অর্থাৎ 'জ' অক্ষর দ্বারা পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়, যথা—'হুগ্‌লী' শব্দ আরবীতে ব্যবহার করিতে হইলে, হুজ্‌লী বলিতে হইবে। এরূপে 'গিজিয়া' শব্দ আরবীতে জিজিয়া রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আরবে এস্‌লাম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, আরবের এয়মন প্রদেশ ও তায়েফ প্রভৃতি স্থান পারস্য রাজার শাসনাধীন ছিল। তখন পারস্য রাজের প্রবর্ত্তিত জিজিয়া কর আরব দেশেও প্রচলিত ছিল। মুসলমানগণ সেই প্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহাদের বিজিত দেশ সমূহে এই সামরিক করের প্রচলন করিয়াছিলেন।

যাহারা সমর বিভাগে কাজ করিত, তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে, সামরিক দায়ীত্ব হইতে অব্যাহত লোকদিগকেই ঐ কর-ভার বহন করিতে হইত। মুসলমানগণ ধর্ম্মতঃ ও আইনতঃ সামরিক সেবার জন্য বাধ্য ছিলেন বলিয়া তাহাদের নিকট সামরিক ট্যাক্‌স গ্রহণ করা হইত না। তবে মুসলমানগণ 'ওশর' ও 'জকাৎ' নামক যে কর প্রদান করিতেন তাহার পরিমাণ জিজিয়ার তুলনায় কম ছিল না। হিন্দু প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে সমরসেবার জন্য বাধ্য করা, তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় বলিয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম তাহাদের জন্য সমর-সেবা বাধ্যগত করিতে পারে না। যাহারা সমর বিভাগের দায়ীত্ব হইতে অব্যাহত ছিল কেবল তাহাদিগকেই জিজিয়া কর বহন করিতে হইত। ইহার একটী বিশেষ প্রমাণ এই যে, ভিন্ন জাতীয়দের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছায় সমর বিভাগে প্রবেশ করিত, তাহাদিগকে মুসলমানগণের ন্যায় জিজিয়া দিতে হইত না। জিজিয়া সামরিক কর ব্যতীত কোনরূপ অপমানজনক কর হইলে হিন্দুগণ কোন অবস্থাতেই জিজিয়ার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন না।

তৃতীয় খলিফা হজরত ওস্‌মানের সময়, 'জরাজেমা' সম্প্রদায়ের লোকেরা সমর বিভাগে প্রবেশ করায় তাহাদিগকে জিজিয়ার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল (১)। বোগ্দাদের আব্বাস বংশীয় খলিফা ওয়াসেক বিল্লার শাসনকালে, তাঁহার জনৈক শাসনকর্ত্তা ভুলক্রমে উপরোক্ত জরাজেমা বংশীয় লোকদিগর প্রতি জিজিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা রাজ দরবারে আপিল করা মাত্রই তাহাদিগকে জিজিয়ার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় (২)। জিজিয়া যে সামরিক ট্যাক্‌স, তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে, কোন ভিন্ন জাতীয় লোক এক বৎসরের জন্য সমর বিভাগে প্রবেশ করিলেও তাহাকে সেই বৎসরের জিজিয়ার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত।

(১) "মোজমল বোলদান" আরবী ইতিহাস।
(২) ফতুহল বোলদান বেলাজরী ১৫৯।১৬১ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সময় আজরবিজান ও আর্ম্মিনিয়ার ভিন্ন জাতীয় প্রজাগণ সামরিক বিভাগে প্রবেশ করায় তাহাদিগকে জিজিয়ার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল (১)।

এখন একবার ভারতের পূর্ব্বাবস্থার বিষয় স্মরণ করুন। পাঠান আমলে নববিজিত দেশের লোকেরা, যেমন একদিকে বিজয়ী রাজার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া পছন্দ করিতেন না, পক্ষান্তরে রাজাও সহজে বিজাতীয় প্রজা সাধারণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অবাধে সৈন্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিতেন না। এজন্য পাঠান আমলে কোন কোন সময়ে জিজিয়া প্রচলিত ছিল, আবার কোন বাদশাহ তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মোগল আমলে, সর্ব্বাগ্রে সম্রাট আকবর 'জিজিয়া' প্রথা উঠাইয়া দেন, তাহার কারণ এই যে, মোগল ও পাঠানদিগের মধ্যে, বহুদিন হইতে যে শত্রুতা ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিয়া আসিতেছিল, তাহা নির্ম্মূল করণ ও পাঠানদিগের শক্তি ধ্বংস করার উদ্দেশে, আকবর সমর প্রিয় বীর্য্যবন্ত রাজপুত ও মারাঠাদিগকে সমর বিভাগে গ্রহণ করেন, এবং তিনি এই নব কৌশল অবলম্বনে শত্রুদমন ব্যাপারে বিশেষ সফলতা লাভ করেন।

মহাশিক্ষা-কাব্য

তৃতীয় সর্গ।

এস গো কল্পনে! এস আজি পুনঃ
দামেস্ক নগরে যাই,
ভূপেন্দ্র এজিদ কি করিছে এবে
দেখিবার সাধ তাই।

২

মর্ম্মর খচিত বিশাল প্রাসাদ
ভূতলে তুলনা নাই,
জগতের যত মনোহর দ্রব্য
পূর্ণিত সকল ঠাঁই।

রক্ত পীত নীল পাটল ধবল
বিচিত্র স্ফটিক ঝাড়,
কর্পূর বাসিত মন্মথ-বর্ত্তিকা
জ্বলে তাহে কি বাহার!

৪

উর্দ্ধে চন্দ্রাতপ মুকুতা-খচিত
চারু কারুকার্য্য ময়,
প্রদীপ প্রভায় ঝলসিছে কিবা
কতই না শোভাময়!

(১) তারিখে কবি তবরী।

বাসন্তী পবন সুমন্দ প্রবাহে
করিতেছে সঞ্চরণ,
চুম্বি' ফুল কুল সুরভি তাহার
করিতেছে বিতরণ।

৬

দ্বিরদের রদ* বিখচিত দ্বারে
দোলে চারু যবনিকা,
রেশম নির্ম্মিত মুকুতা খচিত
বৈভব পরিচায়িকা।

৭

কনক রচিত বিচিত্র আসন
মণি মুক্তা বিশোভিত,
বসেছে তাহায় রাজেন্দ্র এজিদ
চারু ভূষা বিভূষিত।

৮

রহস্য রসিক অনুচর দ্বয়
বসিয়াছে দুই পাশে,
আনন্দের উৎস উথলি উঠিছে
তাদের সরল হাসে।

৯

সম্মুখে নাচিছে সুন্দর সুবেশে
মোহিনী নর্ত্তকীগণ,
রবাব এস্রাজ সারেঙ্গ বাজিছে
তুলিয়া মধুর স্বন।

১০

অপ্সরীর সম রূপে নিরুপম
নাচিছে যোষিৎগণ,*
হেলিয়া দুলিয়া সুধীরে চলিয়া
কভু বা কাঁপিয়া ঘন।

* দ্বিরদের রদ—হস্তীর দন্ত।
* যোষিৎগণ—বামা সকল।

১১

থমকে থমকে থর থর থর
নাচে সবে ঘুরি ঘুরি,
ধরি করে কর চলি পরস্পর
অহো! কি সুন্দর মরি!

* * * * * * *

১৯

প্রমত্ত এজিদ নির্ণিমেষ আঁখি
রমণী সুষমা পানে,
প্রমত্ত এজিদ অবশ মানস
হায়! সে প্রেমের গানে।

২০

বাহ্‌বা! বাহ্‌বা! মরি মরি হায়!
সাবাস! সাবাস ধ্বনি,
ধ্বনিতেছে হর্ষে পুনঃ পুনঃ পুনঃ
এজিদ নৃপতি মণি।

২১

মুষ্টি পূরি পূরি সুবর্ণের মুদ্রা
আনন্দে করিছে দান,
পরিবর্ত্তে তার প্রত্যেক সুন্দরী
দিতেছে সুরার জাম। †

২২

কমল-করেতে প্রত্যেক সুন্দরী
সোহাগে চিবুক ধরি,
সরাবের জাম ধরিতেছে মুখে
পাত্র হ'তে ভরি' ভরি'।

২৩

প্রমত্ত এজিদ হরষ বিভল
একটু একটু তার,
প্রতি জাম হ'তে করিতেছে পান
আনন্দের নাহি পার।

† সরাবের জাম—সুরাপূর্ণ পাত্র।

২৪

যতেক সুন্দরী সুরাপান করি
আনন্দে উৎফুল্ল মতি,
হরষে উল্লাসে আবেশে আবেশে
নাচিছে বিবিধ গতি।

* * * * * * *

২৬

কটাক্ষের শর জর জর জর
করিছে এজিদ প্রাণ,
হৃদয় ভেদিয়া মরমে যাইয়া
বিঁধিছে সে তীক্ষ্ণ বাণ!

২৭

কিবা সে নর্ত্তন ভবে অতুলন!
কি বাঁকা ভঙ্গিমা হায়!!
মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় অনুচর সহ
এজিদ প্রমত্ত তায়!

২৮

হেন কালে তথা কর্ণিশ করিয়া
হামিদ—প্রিয় কিঙ্কর,
দাঁড়াইলা আসি যুড়ি করপুট
জিজ্ঞাসিলা পৃথ্বীশ্বর—

২৯

"বলরে হামিদ! কিসের কারণ
হেথা তোর আগমন?
কি আছে সম্বাদ বল্ ত্বরা করি
প্রফুল্ল হউক মন।"

৩০

কহিলা হামিদ হরষের ভরে
"জয় হোক হে রাজন!
বুমুসা আশরী * দ্বারে উপনীত
করিতে আজ্ঞা পালন।"

বুমুসা আশারী—আবু মুসা আশারী, এজিদ ইহাকেই ঘটক নিযুক্ত করিয়া বিবী জয়নবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৩১

শুনি হেন বাণী রাজেন্দ্র এজিদ,
পুলকে পুরিত প্রাণ,
হামিদের তরে হীরক অঙ্গুরী
আনন্দে করিয়া দান

৩২

কহিলা—"সত্বরে আন্‌রে আতসি'
মুসা আশরীর তরে'"
এতেক বলিয়া নর্ত্তকীর দলে
দিলেক বিদায় ক'রে।

৩৩

বিস্মিতা যতেক বিলাসিনী বামা
চলি গেল নিজ স্থলে,
আবু মুসা আসি কুর্ণিশ করিয়া
দাঁড়াইল সভাতলে।

৩৪

রাজেন্দ্র এজিদ মধুর বচনে,
কহিলা আবেগ ভরে,
"হে মুসা আশারী বল ত্বরা করি
বিলম্ব সহেনা মোরে!

৩৫

যেই সাধনায় পাঠাইনু তোমা
বল কি করিলে তার?
রে সন্দেশ বহ* কহ রে সন্দেশ
মানসে উৎকণ্ঠা ভার।

৩৬

যাহার লাগিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
এ তনু হয়েছে ক্ষীণ,
বলরে ত্বরায় প্রেম বাণী তার
বিষাদ হউক লীন। (ক্রমশঃ)

* সন্দেশ বহ—বার্ত্তাবহ।
(সন্দেশ—বার্ত্তা)।

আল—অ
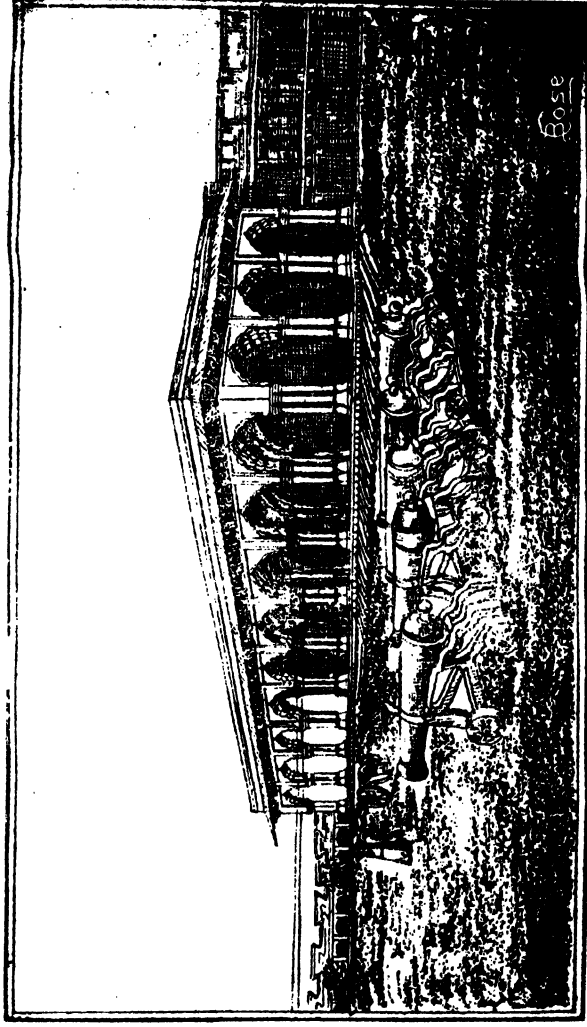
بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

১ম ভাগ | কার্ত্তিক, ১৩২২ | ৭ম সংখ্যা

জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি।

"নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব।" কোরআন।

"আমি জিন এবং মানবকে আমার সেবা করিবে এতদ্ভিন্ন সৃষ্টি করি নাই।" কোরআন।

"অনন্তর তোমরা কি মনে করিয়াছ যে আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার দিকে ফিরিয়া আসিবে না?" কোরআন।

"নিশ্চয় আমরা আল্লার জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহার দিকে ফিরিয়া যাইব।" কোরআন।

ভুলেছ কি একেবারে? ভুলেছ কি নর!
কে তুমি? কিসের তরে এলে ধরা পর?
রক্ত তুমি? মাংস তুমি? ভূতময় দেহ?
জড় পৃথিবীর কিংবা জড়ময় কেহ?
মাটি হ'তে জনমিয়া উদ্ভিদের মত,
মাটিতে মিশিয়া যাবে—এই তব ব্রত?
গো গর্দ্দভের মতন খেয়ে দেয়ে শুয়ে,
কীট পতঙ্গের মত নেচে কুদে নিয়ে,

দিন দুই পরে ম'রে প'চে গ'লে যাবে—
এজন্যে শুধু এ জগ্যে জনমেছ ভবে ?
নীল বারিধির কোলে বুদ্বুদ যেমতি
জনমি মিটিয়া যাবে এ তব নিয়তি ?
হে নর ! হে জীব শ্রেষ্ঠ ! হে ধরা-ঈশ্বর !
অনন্তের বক্ষোজাত তুমি অনশ্বর।
ভুলে গেছ আপনার জনমের কথা,
তাই দীনহীন তুমি, রাজপুত্র যথা
আশৈশব কাঙ্গালের ভবনে পালিত
পিতার বিভব বার্ত্তা নহে সে বিদিত।
সাজায়েছে ধরারাজ্য তব তরে বিধি,
রাজ রাজেশের তুমি প্রিয় প্রতিনিধি।
পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ, অভাব, দীনতা,
নর হ'য়ে নরে ঘৃণা, মোহ, অজ্ঞানতা,
জড়তা, ভীরুতা, হিংসা, নীচতা, মাৎসর্য্য
বিদলিবে বিনাশিবে এই তব কার্য্য।
ধরার সুন্দর মুখে অসুন্দর যত
সৌন্দর্য্যে ছাইয়া দিবে—এই তব ব্রত।
জীবে সেবি জীবেশেরে করিবে ভকতি
জীবনের এই তব মূল মহানীতি।
সমাপিয়া ব্রত তব কার্য্যকাল শেষে
যেথা হ'তে এসেছিলে যাবে সেথা হেসে।
বুঝেছ কি এইবার ? বুঝেছ কি নর !
কে তুমি ? কিসের তরে এলে ধরা পর ?

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার।

(২)

হিন্দুগণ সামরিক গুরুভার গ্রহণ করায় তাঁহারা জিজিয়ার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। সম্রাট জাঁহাগীর ও শাহজাহানের সময়ও প্রায় এই নিয়মই প্রচলিত ছিল। এই তিন যুগে হিন্দুগণ সমর বিভাগ, শাসন বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা গবর্ণরের পদ হইতে প্রধান মন্ত্রীর পদ পর্য্যন্ত তাঁহারা অধিকার করিতে সমর্থ হন। রাজস্ব বিভাগটা হিন্দুদের একচেটিয়া হইয়া পড়িয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট আকবর, পাঠান বংশের ক্ষমতা নির্ম্মূল করিয়া ভারতভূমে মোগলরাজত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য যে রাজপুত ও মারাঠাদিগকে এত উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, এবং জাঁহাগীর ও শাহজাহান যে নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক হিন্দুদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর অধিকার প্রদানে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে, হিন্দু রাজপুত ও মারাঠাদিগের সেই অসাধারণ ও একচেটিয়া ক্ষমতা প্রতিপত্তি মোগলরাজত্বের ধ্বংসের কারণে পরিণত হইয়াছিল। ক্ষমতা-মদমত্ত রাজপুত ও মারাঠাগণ স্বেচ্ছাচার নীতির বশীভূত হইয়া মোগলরাজত্বের ভিত্তি উৎপাটিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তখন রাজনীতিক আওরঙ্গজেবের পক্ষে, পৈতৃক রাজত্ব ও জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য বিহিত উপায় উদ্ভাবন করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তখন অগত্যা তিনি আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার জন্য ক্রমে সমর ও শাসনবিভাগ হইতে রাজপুত ও মারাঠাদিগকে সরাইতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমর বিভাগে যাহারা কাজ করে না, তাহাদিগকেই সামরিক কর 'জিজিয়া' দিতে হয়, এজন্য আওরঙ্গজেব পুনরায় সামরিক কর্ম্মভার হইতে অব্যাহত হিন্দুজাতির প্রতি জিজিয়া স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহার আমলে সকল হিন্দুকেই যে জিজিয়া দিতে হইত, এ কথা সত্য নহে; বরং কেবলমাত্র অবাধ্য বিদ্রোহী বা সমর বিভাগ হইতে অপসারিত লোকদিগকেই ঐ করভার বহন করিতে হইত। বাদশাহের বাধ্য অনুগত ও অনুকূল হিন্দুদিগকে কখনও জিজিয়া দিতে হয় নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, রাজপুতানার সমুদয় রাজন্যবর্গ সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে জিজিয়ার দায় হইতে অব্যাহত ছিলেন। উদয়পুরের রাণা পুনঃপুনঃ বিদ্রোহাচরণ ও অবাধ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, কেবল তাঁহাকেই জিজিয়া দিতে হইত। তাহাও তিনি জিজিয়ার পরিবর্ত্তে তাঁহার রাজ্যের 'মাণ্ডেলপুর' ও বদলপুর নামক দুইটী পরগণা রাজ-সরকারে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

এই জিজিয়া জিনিষটা যে কি, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত। জিজিয়া পরিমাণ ৩৲ হইতে ৬৲ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেবল স্থান বিশেষে তাহার পরিমাণ কচিৎ ঊর্দ্ধসংখ্যা ২০৲ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইত। লক্ষপতি হইলেও কোন লোককে কোন অবস্থায়

২০৲ টাকার অধিক জিজিয়া দিতে হইত না। স্ত্রীলোক এবং ২০ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন লোক, পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত, কাণা, অন্ধ, উন্মাদগ্রস্ত ও দীন দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাৎ যাহার নিকট ২০০ দেরেমের মত (৫০৲) সম্বল নাই, এই শ্রেণীর লোকদিগকে জিজিয়া দিতে হইত না। পাদ্রী ও পুরোহিতদিগকেও জিজিয়ার দায় হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছিল। এখন তুলনায় সমালোচনার সুবিধার জন্য, সভ্যদেশের করের তালিকার প্রতি লক্ষ্য করুন। যথা সদর রাজস্ব, পথকর, জলকর, বনকর, ইন্‌কম ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, চৌকিদারী ট্যাক্স, কষ্টম ডিউটী, পাস-পোর্ট ডিউটী, চুঙ্গির মাশুল, সময় সময় সামরিক ট্যাক্স, সার্ভে ট্যাক্স ইত্যাদি কত প্রকার কর যে প্রচলিত আছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবার জন্যও অঙ্ক শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার আবশ্যক। অসভ্য এলাকায় জুরির বা জুড়ীর খাজানা নামে বার্ষিক ৫৲ হিসাবে আরও একটী কর আদায় করা হয়। এই সকলের তুলনায় মুসলমান আমলের একমাত্র সামরিক ট্যাক্স জিজিয়ার গুরুত্ব কি, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ধর্ম্মমন্দির ধ্বংসের কথা।

মুসলমান বাদশাহগণ, হিন্দুদিগের দেবালয় বিধ্বস্ত করিয়া হিন্দু সমাজের প্রাণে আঘাত করিয়াছিলেন, ইহা মুসলমান আমলের একটী দুরপনেয় কলঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সভ্য জগতের ইতিহাসে ইহাপেক্ষা কলঙ্ক-জনক ও আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই নাই। এরূপ কার্য্য এস্লাম ধর্ম্ম বিধানের অনুমোদনীয় নহে বলিয়া, মুসলমানগণের পক্ষে তাহা অধিকতর দুঃখ ও লজ্জার কারণ, সন্দেহ নাই।

ইহা প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে, এস্লাম ধর্ম্ম, কোন জাতির ধর্ম্মমন্দিরের অবমাননার আদৌ অনুমোদন করে না, বরং এস্লামে তদ্বিষয় কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা ও বাদশাহগণ বিজিত রাজ্যের সহিত যে সন্ধি স্থাপন করিতেন এবং অভিযানকারী সৈন্যদলের অধিনায়কের হস্তে যে রাজকীয় পরওয়ানা দেওয়া হইত, তাহাতে স্পষ্ট লেখা থাকিতঃ—"তোমরা যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের বালক, বালিকা, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদিগকে কখনই হত্যা করিও না, তাহাদের শস্যক্ষেত্র নষ্ট করিও না, ফলবান বৃক্ষ ছেদন করিও না, ধর্ম্মযাজক বা পুরোহিতদিগকে বধ করিও না, কোন জাতির ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করিও না"। (১) সাধারণতঃ মুসলমান বাদশাহগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও এই আদেশের ব্যতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাহার দু'একটী প্রমাণ গ্রহণ করুন, দামস্কসের ভুবন বিখ্যাত জামে মসজেদ নির্ম্মাণকালে খলিফা ওলিদ মসজেদ সংলগ্ন একটী গির্জ্জা খৃষ্টান-পাদ্রীগণের নিকট হইতে হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি গির্জ্জা ঘরের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যথেষ্ট অর্থ দান করিতে চাহেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না

(১) কেতাবুল খেরাজ, এমাম আবু ইউসফ, ৮০।৮৪।৮৬ পৃষ্ঠায় সন্ধিপত্রের চুম্বক লিখিত আছে।

পারিয়া অবশেষে ভয় প্রদর্শনে তাহা হস্তগত করিতে প্রয়াসী হওয়ায়, পাদ্রীগণ সমস্বরে বলিয়াছিলেন," যোহনের পবিত্র ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করার ক্ষমতা কোন মানুষের নাই। যে ব্যক্তি এ কাযে উদ্যত হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর অবশ হইয়া সে ব্যক্তি মারা যাইবে।" খলিফা এরূপ তর্ক বিতর্কে ক্রোধান্বিত হইয়া স্বহস্তে মন্দির ধ্বংস করিতে অগ্রসর হন। ফলে গির্জ্জাটী বলপূর্ব্বক মস্‌জেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। পরবর্ত্তী খলিফা আবদুল আজিজের সময়, খৃষ্টান পাদ্রীগণ, তাঁহার নিকট এই ঘটনার পুনর্ব্বিচার প্রার্থী হইলে, তিনি ধর্ম্ম-পণ্ডিত মুফতীর ব্যবস্থা মতে মস্‌জেদ ভাঙ্গিয়া গির্জ্জাটী খৃষ্টানগণের হস্তে প্রত্যার্পণের আদেশ প্রদান করেন। দামস্কসের মস্‌জেদ জগতের অতুলনীয় স্থাপত্য-কীর্ত্তি সমূহের অন্যতম। মুসলমানগণ মস্‌জেদ ধ্বংসের আদেশ শ্রবণে মর্ম্মাহত ও অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং পরিশেষে চেষ্টা করিয়া খৃষ্টানগণের সহিত বহু অর্থ ও নানাবিধ অধিকারের বিনিময়ে সন্ধি স্থাপন করিলেন। (১)

ভারতের কোন মুসলমান বাদশাহ শান্তির সময় শুধু ধর্ম্মগত বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া, যে কোন হিন্দু দেবালয় ধ্বংস করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রিয় পাঠকগণ! আমি বেশ বুঝিতেছি, আমার এই উক্তি শ্রবণে, আপনাদের মধ্যে অনেকেরই শরীরে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া থাকিবে, বিশেষতঃ হিন্দু পাঠকগণের মধ্যে হয়ত অনেকেই—ইতিহাস হস্তে আমার উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু ভ্রাতৃগণ! একটুকু ধৈর্য্য ধারণ করুন, আসুন আমরা একবার ধীরভাবে, সোল্‌তান মাহমুদ গজনবীর মথুরা ও সোমনাথের মন্দির ধ্বংসের বিবরণ, সেনাপতি কুতুবুদ্দীনের পক্ষে দিল্লীর পৃথ্বীরাজের অপূর্ব্ব মন্দির বিনাশ এবং আওরঙ্গজেবের আদেশে বৃন্দাবন ও কাশীর হিন্দু দেবালয় ধ্বংসের ঘটনাগুলির বিষয় সূক্ষ্মভাবে সমালোচনা করিতে প্রয়াসী হই।

সোলতান মাহমুদ।

সোলতান মাহমুদ গজনবী সপ্তদশবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোনবারেই ভারতে স্থায়ীভাবে থাকিতে বা এখানে রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি ভারতের ধন রত্নের লোভেই যে পুনঃপুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। রাজ্য স্থাপন বা এস্‌লাম প্রচার করা যে তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, ইতিহাসে এই বিষয়ের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি এই সপ্তদশবার আক্রমণ উপলক্ষে একজন হিন্দুকেও মুসলমান করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখনকার ন্যায় সেকালেও অন্য জাতিকে, মুসলমান করা জাতীয় গৌরবের বিষয় এবং ধর্ম্মগত শ্লাঘার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং ঘটনা সত্য হইলে, সাময়িক ইতিহাসে বিশেষরূপে তাহার উল্লেখ থাকা নিশ্চিত ছিল। তবে তিনি যে, হিন্দুদের দেবালয় ধ্বংস করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু কি জন্য এবং কিরূপ অবস্থায় তিনি মন্দির

---

(১) 'ফতুহুল্ বোলদান' ১২৫ পৃষ্ঠা।

ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য। তিনি যে ধর্ম্মগত বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া হিন্দু-জাতির কোন মন্দির নষ্ট করেন নাই, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মুসলমান আমলের ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন, তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লব জনিত যুদ্ধের সময়, রাজনীতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, যখন প্রজাপক্ষীয় শত্রুগণ নিরুপায় হইয়া পুরাতন কালের প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় মন্দির সমূহকে দুর্গরূপে বা যুদ্ধের কেন্দ্রস্থান স্বরূপ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিত, অথবা শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহাকে সুরক্ষিত সামরিক আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিত, তখন মুসলমান বাদশাহদিগকেও বাধ্য হইয়া শত্রুর সেই আশ্রয় স্থান আক্রমণ করিতে হইত। এই উপলক্ষে স্থানে স্থানে কতকগুলি দেবালয় বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এখন পাঠক-গণ সোমনাথ আক্রমণের ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করুন, ভীষণ যুদ্ধে সোমনাথ দুর্গের পতনের পর, হতাবশিষ্ট হিন্দুসৈন্য ও ব্রাহ্মণগণ, মন্দিরে ও মন্দিরের চতুর্দ্দিকে আশ্রয় লইয়া বহুক্ষণ যুদ্ধ চালনা করে। অবশেষে তাহারা রণে পরাজিত হয়। মাহমুদ বিজয়ীবেশে মন্দিরে উপস্থিত হন। এই ভীষণ আক্রমণের সময় মন্দিরের নানাস্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু মূল প্রতিমা ও তৎসন্নিহিত অংশ যে অক্ষত ছিল ইহা নিশ্চিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাহমুদ অর্থলোভী ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের নিকট প্রচুর অর্থ দাবী করিলেন। তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, মন্দিরে ও প্রতিমার অঙ্গে ও তৎঅভ্যন্তরে অগণিত ধনরত্ন সঞ্চিত আছে। পুরোহিতগণ তাঁহার আকাঙ্খিত পরিমাণ অর্থদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, মাহমুদ দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিবার ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাতে সমবেত ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মভাবে উন্মত্ত হইয়া ক্রোধভরে কটূক্তি করিয়া বলেন, 'দেবতার ঘর ভাঙ্গিবার সাধ্য তোমার নাই। তুমি পূর্ব্বে মথুরা প্রভৃতি স্থানে যে সকল সাধারণ দেবমন্দির ভাঙ্গিয়াছ, তাহার প্রতিফল এখানেই প্রাপ্ত হইবে। তোমার বিনাশ নিশ্চিত'। এরূপ বাকবিতণ্ডার বাড়াবাড়িতে সেখানে আর একটী ছোট খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং মাহমুদ ক্রোধান্ধ হইয়া স্বহস্তে দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিবার জন্য ধাবিত হন, তাঁহার সৈন্যগণ ও তাঁহার অনুসরণ করে। তিনি এই মন্দিরে প্রাপ্ত ধনরত্ন লইয়া গজনীতে চলিয়া যান। একজন হিন্দু গবর্ণরের হস্তে বিজিত রাজ্য সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করেন। ফল কথা, যুদ্ধের সময় রাজনীতিক স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া মাহমুদ সোমনাথ ও মথুরার হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তদ্দারা ধর্ম্মগত হিন্দু-বিদ্বেষ প্রমাণ করা সম্পূর্ণই যুক্তি বিরুদ্ধ। আওরঙ্গজেবের সময় রাজপুত ও মারাঠাগণ ধর্ম্মমন্দির সমূহকে রাষ্ট্রবিপ্লব ও রাজ-নীতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থানরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সমস্তই সেখানে সঞ্চয় করা হইত, গুপ্ত মন্ত্রণাদির কাজ সেখানেই বিশেষ সুবিধার সহিত সম্পাদিত হইত। আওরঙ্গজেবের সৈন্যদলের পক্ষে এ সকল রাজনীতিক আড্ডা আক্রমণ কালীন ভীষণ যুদ্ধের সময় অনেক দেবালয় বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। ধর্ম্মমন্দির সমূহ পূর্ব্বকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও বিদ্রোহীদলের আড্ডায় পরিণত হইত কি না, তাহার প্রমাণ অনুসন্ধান করিলে সহজেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে। পাঠকগণ! আপনারা একবার সিপাহী

বিদ্রোহের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন বিদ্রোহী সিপাহীগণ শাহী আমলের বড় বড় মস্‌জেদ ও সুদৃঢ় বৃহৎ দেবালয় সমূহকে দুর্গরূপে ব্যবহার করিয়াছিল। তাহার ফলে, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ মস্‌জেদ ও মন্দির সমূহ বৃটিশ গোলন্দাজ সৈন্যগণের কামানের গোলাঘাতে আহত ও স্থান বিশেষে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এখনও অনেক মস্‌জেদ ও মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে তৎকালীন গুলিগোলার চিহ্ন বিরাজমান। বিদ্রোহ দমনের বহুকাল পর পর্য্যন্ত, অনেক মস্‌জেদ ও মন্দির গবর্ণমেণ্টের অধিকারে ছিল। দিল্লীর জামে মস্‌জেদ বহুকাল পরে অনেক চেষ্টা ও আবেদন নিবেদনের ফলে, মুসলমানগণের হস্তগত হইয়াছে। লাহোরের বাজীয়াপ্ত শাহী মস্‌জেদটী মুসলমানদিগের অধিকারে আসিয়াছে। এখনও অনেক মস্‌জেদ ও মন্দির সিপাহীবিদ্রোহের স্মৃতিচিহ্ন এবং আমাদের উক্তির সত্যতার সাক্ষীস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের অধিকারেই আছে। রাজমহলের সুবৃহৎ শাহী মস্‌জেদ লেখকের ভ্রমণকালেও গবর্ণমেণ্ট আফিসের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছিল। এখন তাহা মুক্তি পাইয়াছে কিনা জানি না।

এরূপ রাজনীতিক স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া শিবাজী, শম্ভুজী, শাহজী বিশেষতঃ পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি হিন্দুগণ, মুসলমানের যত মস্‌জেদ, দুর্গ ও মাজার বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তত্তুলনায় মাহমুদ, আওরঙ্গজেব ও টিপু সোল্‌তানের মন্দির ধ্বংসের পরিমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পাঠকগণ বৌদ্ধ প্রভাবের কথা একবার স্মরণ করুন, তাঁহারা ভারতে কোন হিন্দু দেবমন্দিরে অস্তিত্ব রাখিয়াছিলেন কি? আবার হিন্দুগণ যখন ক্ষমতা লাভ করিয়া সামলাইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহরা বেচারা বৌদ্ধদের যে কি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাঁহারা বৌদ্ধদের নিকট সুদে আসলে প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। বৌদ্ধমন্দিরের অস্তিত্ব কোথায়ও রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সেই তুলনায় পাঠান ও মোগল আমলের ৭।৮ শত বৎসর শাসনের মধ্যে কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা ও সোমনাথের ৪।৫টী রাজনীতিক ঘটনার এত গুরুত্ব দিবার কি আছে, তাহা সকলে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন। যত দোষ নন্দ ঘোষ, একা মুসলমান আমলদারীই কি জগতের যাবতীয় দোষারোপের গুরুভার বহন করিবার জন্য দায়ী? রাজনীতিক উদ্দেশ্যের দায়ে পড়িয়া মুসলমানগণ যে কেবল হিন্দুদের দেবালয় ভাঙ্গিয়াছিলেন তাহা নহে, বরং আবশ্যক মতে তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ কালে মস্‌জেদ ও সমাধি মন্দির বিধ্বস্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উমাইয়া বংশীয় খলিফাগণের রাজত্বকালে গবর্ণর হজ্জাজ হজরত জোবেরের সহিত যুদ্ধের সময় কাবা মন্দিরে অগ্নি সংযোগ করিতে এবং তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বলা বাহুল্য যে, জোবের কাবা মন্দিরকে আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। কাবার সীমার মধ্যে, নর-হত্যা দূরের কথা, কোন প্রকার প্রাণীহত্যা করাও নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজনীতিক ব্যাপারে সেখানে অনেকবার রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছিল। আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ উমাইয়া বংশীয় রাজপুরুষদিগকে সমূলে বধ করিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা বরং, লর্ড কিচনারের

ন্যায়, শত সহস্র উমাইয়া বংশীয় নরপতির সমাধি মন্দির বিধ্বস্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজনীতিক স্বার্থ বড়ই মারাত্মক বালাই, ইহার জন্য অনেক অঘটন ঘটিয়া থাকে। শান্তির সময় দেশে একটী লোকের গায়ে সামান্য একটুক্ আঁচড় দিলেই দণ্ড বিধি আইন শাস্তির বিধান করে, কিন্তু আজ যে ইউরোপের মহাসমরে লক্ষ লক্ষ লোককে কামানের গোলায় উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা কি কেহ অপরাধ জনক কায বলিয়া মনে করিতেছেন ? ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, রাজনীতি মূলক ঘটনা এবং জাতি বিরোধজনিত ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রাজনীতিক ব্যাপারের শত দোষ মার্জ্জনীয়। কিন্তু শান্তির সময় জাতি বিদ্বেষ বা অনুরূপ সামান্য একটু কটুক্তিও অমার্জ্জনীয় দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকে। কোন জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের সমালোচনা ও ন্যায় অন্যায় নির্দ্ধারণ কালে, এ সকল বিষয় লক্ষ্য করা একান্ত আবশ্যক।

সম্রাট আওরঙ্গজেব।

এখন সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলা যাউক। বাজার প্রচলিত ইতিহাসে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নাম হিন্দু দেবালয় ধ্বংসের জন্য বিশেষরূপে কলঙ্কিত। পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে, সম্রাট আকবর পাঠান বংশের মূলোৎপাটন জন্য রাজপুত ও মারাঠাগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে শাসন ও সমর বিভাগের উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ প্রদান করেন। তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহার পর সম্রাট জাহাঁগীরের সময়ও হিন্দুদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। জাহাঁগীর রাজা উদয়সিংএর কন্যা যোধবাই এবং রাজা মান সিংএর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংএর কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার সময় হিন্দুদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি যে কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবগত আছেন যে, আকবর-মন্ত্রী আবুল ফজলকে জাহাঁগীরের ইঙ্গিতে নরসিং দেব ধোকায় ফেলিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু মূল্যবান দ্রব্য সম্ভার এবং রাজস্বের অর্থরাশি যাহা সঙ্গে ছিল, নরসিং তৎ সমস্তই লুট করিয়া আত্মসাৎ করিলেন। জাহাঁগীর সিংহাসন আরোহণ করিলে নরসিংহ দেব মথুরায় দেবালয় নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং মন্ত্রী আবুল ফজলের লুণ্ঠিত ধনরত্ন ব্যয় করিয়াই ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মাণ করেন। (১) ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুগণ মুসলমানের অর্থে নিজদের দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না (১)। সম্রাট শাহ জাহানের আমলে হিন্দুগণ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা রাজ পুরুষ এমন কি স্বয়ং সম্রাটকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। মুসলমানদের প্রতি তাঁহারা যদৃচ্ছ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে, এমন কি মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের সহিত বল পূর্ব্বক পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও বিরত ছিলেন না। তাঁহারা স্বেচ্ছায় মুসলমানগণের মসজেদ ধ্বংস করিয়া সে সকলকে নিজদের বাড়ী বা দেব-

---

(১) তজ্‌কেরায় মরাতল খোয়ল (ذکرہ مرات الخیال) ১২৬-১২৫ পৃঃ।

মন্দিরে পরিণত করিয়া লইতেন। আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিত "শাহ জাহান নামা" (شاهجهان نامه) যাহা সম্রাট শাহ জাহানের আদেশ মতে তাঁহার জীবদ্দশায় লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে ইহার বিস্তৃত ঘটনা বর্ণিত আছে। (২য় খণ্ড ৫৭।৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের শেষভাগে, শাহজাদা দারা-শেকোহ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত হিন্দুপ্রিয় এবং হিন্দুধর্ম্ম ভক্ত ছিলেন। তিনি কোরআনকে উপনিষেদের ভাবানুবাদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার সময় রায় রায়ান মোগলরাজত্বের প্রধান মন্ত্রীব পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার চির শত্রুতা ছিল, তিনি আওরঙ্গজেবকে দমন করিবার জন্য হিন্দুদিগকে যতদূর ক্ষমতা দেওয়া সম্ভব, তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। ফল কথা, আক্‌বরের সময় হইতে রাজপুত ও মারাঠাগণ ক্রমে শাসন ও সামরিক বিভাগে এতটা ক্ষমতাপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তখন ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব কি মুসলমান রাজত্ব বিরাজমান, তাহা সহজে নির্দ্ধারণ করা যাইত না। বর্ত্তমান বঙ্গদেশে মুসলমান জমিদারগণের যে অবস্থা অর্থাৎ নায়েব, ম্যানেজার হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য মোহরের পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মচারী যেমন হিন্দু, এবং জমিদারী শাসনের ভার সম্পূর্ণরূপে হিন্দু কর্ম্মচারীর প্রতি বিন্যস্ত, শাহজাহানের সময়ও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের সূচনা কিরূপ গৃহবিবাদের সহিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মারাঠা ও রাজপুতগণ পর পর তিনটা যুগ ধরিয়া যে রাজনীতিক ক্ষমতা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের সাহস ও স্পর্দ্ধা ক্রমে ক্রমে খুবই বাড়িয়া যায়, এবং অবশেষে তাঁহারা ভারতে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। দেশময় ভীষণ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময় শিবাজী রাষ্ট্রবিপ্লবের অধিনায়ক স্বরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজ্যের নানাস্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ, ষড়যন্ত্র ও বিপ্লববাদের সূত্রপাত হইল। হিন্দু দেবমন্দির সমূহ রাজদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধের সময় অধিকাংশ স্থানে তাহারা দেবমন্দির সমূহে আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিত। তৎকালে ধর্ম্মমন্দির সমূহ দুর্গ ও দৃঢ় মরুচার কার্য্যসিদ্ধি করিত। বিশেষতঃ দেবালয়ের আশ্রয়ে 'যবন দলে'র সহিত যুদ্ধ করিলে দেবতাদের আশীর্ব্বাদে যুদ্ধে জয়লাভ ঘটিবে, এরূপ বিশ্বাস জাগাইয়া হিন্দু যোদ্ধৃদিগকে উৎসাহিত করার জন্য তাহা একটী বিশেষ অবলম্বন ছিল। তত্ত্বান্বেষিগণ ইতিহাস খুলিয়া দেখিবেন, মথুরা, বেনারস, উদয়পুর ও যোধপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব ও বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতেই, আওরঙ্গজেব তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ভীষণ বিপ্লব দমন প্রসঙ্গে যে সকল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতেই হিন্দু দেবমন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছিল। একদিকে যেমন হিন্দুদের দেবালয় বিধ্বস্ত হইয়াছিল, অন্যদিকে হিন্দুগণ মুসলমানদের মস্‌জেদ বিধ্বস্ত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, দাক্ষিণাত্যের সুবাদার আদেল শাহ ৯৭৬ হিজরীতে বিজা নগরের রাজা রামরাজকে নেজাম শাহ বাহ্‌মনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। রামরাজ সাহায্যের জন্য আসিলেন সত্য, কিন্তু স্বয়ং তাঁহার মিত্ররাজ আদেল শাহের রাজ্যের সমুদয় মস্‌জেদ ধ্বংস করিয়া দিলেন। (ক্রমশঃ)

এস্‌লামাবাদী।

বাঙ্গালীর মাতৃভাষা।

মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা বুদ্ধিমান জনোচিত কাজ নহে। আমরা যে কোন ভাষাই পড়িনা কেন, তাহা মাতৃভাষার সাহায্যেই বুঝিয়া থাকি, কারণ বাল্যকাল হইতে সেই ভাষা দ্বারাই আমাদের অন্তরে কথা বুঝিবার শক্তি গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগকে নানাদেশ ও নানাজাতিতে বিভক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছেন এবং দেশ ও জাতি বিশেষে বিভিন্ন ভাষাও দিয়াছেন। এজন্য কাহারও লজ্জিত হওয়ার কারণ নাই। বাঙ্গলা, ইংরেজী, উর্দ্দু ও ফারসী ইত্যাদি ভাষা অর্থাৎ আরবী ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাই মুসলমানের জন্য সমান এবং সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সকল ভাষাই হিন্দুর জন্য সেইরূপ। মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দ্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিম্বা 'বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি' এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁহাদের এরূপ নীতি অবলম্বন করা কি বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত লজ্জা জনক নহে? যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজমুখে নিজের মায়ের এবং দেশের দীনতা হীনতা জ্ঞাপন করে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষা করা এবং তাহার উন্নতি সাধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিলে তাহা উর্দ্দু প্রভৃতি হইতে কোন মতেই হীন হওয়ার কথা নহে। আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই তদ্দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। মায়ের কাজ মায়ের দ্বারাই সম্পন্ন করাইতে হইবে, অপরের দ্বারা তাহা কখন পূর্ণ হইবে না। এইরূপ না করার ফল এই হইয়াছে যে, আজকাল সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তির বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনার জন্য যেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের ভক্তিভাজন মৌলবী মৌলানা সাহেবানের আরবী-উর্দ্দু ওয়াজ শুনিবার জন্য শীরণী, রসগোল্লা, লাড্ডু ও জিলাপী ইত্যাদি বিতরণের প্রলোভন সত্বেও সভায় লোক উপস্থিত করা মহা মুস্কিল হইয়া থাকে।

মাতৃভাষার উন্নতি আমরা দুই রকমে করিতে পারি। প্রথমতঃ, ঐ ভাষায় ধর্ম্ম সংক্রান্ত কেতাব সকল তরজমা করা এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাদশা, অলী ও দরবেশগণের জীবন চরিত ইত্যাদি লেখা। দ্বিতীয়তঃ আজকালের নূতন আবিষ্কৃত হেকমত বা জ্ঞান বিজ্ঞান ও হিসাব ইত্যাদি পার্থিব উন্নতি বিষয়ক পুস্তকাদি লিখিয়া তাহা জন সমাজে প্রচারের সুবিধা করা।

আজকাল আমাদের দেশে দুই রকমের বাঙ্গালা দেখা যাইতেছে। একটী আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের অবলম্বিত সংস্কৃত বহুল শব্দ বিজড়িত বাঙ্গালা, ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ান বাঙ্গালা ভাষার নূতন সংস্করণ নামে অভিহিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময় অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমানও তাঁহাদের অনুকরণে ঐরূপ সাধু ভাষাজড়িত বাঙ্গালা বই

পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই রকম বাঙ্গালাই আজকাল স্কুলে পড়ান হয়। এই ভাষাতে বাঙ্গালীর পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সব শব্দ কখনও শুনেন নাই, তাহা অতি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছে। এমন কি, তাহা ভালমতে বুঝার জন্য মৃত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা এবং ওস্তাদ ও অভিধানের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। বাঙ্গালার সাধারণ লোকে কখনও ঐরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে না। ইহাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না বরং তাহা মাতৃভাষার বিকৃতি মাত্র।

অনুরূপ বাঙ্গলা এই দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। তাহাতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ধর্ম্ম ও কারবারের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত শব্দের ব্যবহার ও স্থান আছে। এই ভাষাই বাস্তবিকপক্ষে এদেশের লোকের মাতৃভাষা।

এইরূপ ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গলা বলা ঠিক হয় না, কারণ এই ভাষায় আমরা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি পুরুষানুক্রমে কথা বার্ত্তা ও লেখা পড়া করিয়া আসিতেছি। কাগজ, কলম, কেতাব, আদালত, আরজী, ইন্সাফ, কুরছি, মেজ, দোয়াত, সির, সির্নী, মগজ, বরতন, পেয়ালা, তস্তরী, পালং, তোষক, বালিশ, গয়রহ ইত্যাদি শব্দ আমরা উভয় সমাজে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি। কিন্তু আজ ২০।২৫ বৎসর হইতে দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ শিক্ষা দোষে বাঙ্গালী হিন্দু ভ্রাতাদের মনে মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ভালবাসা কমিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা মুসলমানগণ হইতে পৃথক হওয়ার উদ্দেশ্যই যেন মাতৃভাষার অন্তরাঙ্গস্বরূপ পুরুষানুক্রমে প্রচলিত শব্দ সমূহের স্থলে, নূতন শব্দ ব্যবহার করত এবং তাহাকে নানা রকমের বিকৃত আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া তাঁহারা যেন বৃদ্ধ মায়ের এক যুবতী সতীন গড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ প্রিয় কতক মুসলমানও ইহার পরিণাম ফলের বিষয় চিন্তা না করিয়া মায়ের গায় কুড়াল মারিতে ত্রুটী করেন নাই। এতদিন ত মুসলমানগণ লেখা পড়ার দিকে বিশেষ কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই। তাহাদের বাদশাহী গেলেও কিন্তু বাদশাহী খেয়াল যায় নাই এবং পূর্ব্বপুরুষগণের ঝুটা (উচ্ছিষ্ট) সব খাইয়া জীবন ধারণ করিতে ছিলেন। কিন্তু এখন তাহাও ফুরাইয়া যাওয়ায় উপায়ন্তর না দেখিয়া বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুল পাঠশালার দিকে ছুটিয়াছেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, তাহাদিগকে মাতৃভাষা নামে এক নূতন ভাষা শিখিতে হইবে। তাঁহাদের মা বাপের নিকট যাহা কিছু শিখিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সেখানে কোন কাজে লাগিবে না এবং বাধ্য হইয়া তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। বাস্তবিক বিগত ২০।২৫ বৎসর মধ্যে আমরা পূর্ব্ব প্রচলিত অনেক শব্দই ভুলিয়া গিয়াছি এবং কতক নিত্য ব্যবহারের শব্দও কমাইতে শিখিয়াছি। হায়! কি দুর্দ্দশা! যে জাতিকে মাতৃভাষাও নূতন করিয়া শিখিতে হয়, তাহারা কি শিক্ষা ক্ষেত্রে অপর লোকদের সমানে পড়া চলাইতে পারে? এখনও সময় আছে, শিক্ষার উন্নতির সহিত হিন্দুদের বেরাদরি ভাব বাড়িতেছে, এবং শিক্ষিত মুসলমানগণও এখন এত কম নহেন যে তাঁহাদিগকে তুচ্ছ করা যায়। বলাবাহুল্য যে

সকলেই এখন উন্নতির দিকে ছুটিয়াছে। এমন সুসময়ে উভয় সমাজের লেখকগণের পক্ষে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া এ বিষয়ে—যে ক্ষেত্রে দেশের হিন্দু মুসলমান এই উভয় জাতি একত্রে সম্মিলিত হইতে পারে, মাতৃ ভাষাকে সেরূপ ভাবে গড়িয়া তোলা আবশ্যক, এবং আমি ভরসা করি, সকলে এই বিষয় মনোযোগী হইবেন।

এখন আমি মুসলমান লেখকদের প্রতি কয়েকটী কথা বলিতে চাহি। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নূতন শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই সংসর্গ দোষে সাবেক ভাষাকে ঘৃণা করিয়া নয়া ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন এবং তাঁহাদের শক্তি সাধারণতঃ কাব্য কবিতা ও উপন্যাস লিখনে ব্যয় হইয়াছে। তাঁহারা সময় সময় সমাজের বা ধর্ম্মের উপকারের জন্য সে সকল বহি লিখেন তাহার ভাষা সধারণ লোকে সহজে বুঝেনা বলিয়া নিজ সমাজে সে সকল পুস্তকের আশানুরূপ আদর হয় নাই। হজরতের যে সব জীবন বৃত্তান্ত ছাপা হইয়াছে, তাহা প্রায়ই কবিতা বা উপন্যাসের সুরে দুর্ব্বোধ্য নূতন বাঙ্গালায় লিখিত। লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ 'আল্লাহ' স্থলে ঈশ্বর, রসুল স্থলে প্রেরিত পুরুষ, বিবি স্থলে দেবী, সাহেব স্থলে দেব, নমাজ রোজা স্থলে উপাসনা, উপবাস, মস্‌জিদ স্থলে ভজনালয় ইত্যাদি ব্যবহার করিতে ও কুণ্ঠিত হন নাই।

হায়! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এতকাল যাবত আবশ্যক মতে আরবী ও পারসী হইতে শব্দাদি লইয়া বাঙ্গালা ভাষার যে অভাব পুরণ ও যে উন্নতি করিয়াছিলেন তাহা কি আমরা নাকাবেল কাপুরুষ সন্তানগণ গঙ্গায় ভাসাইয়া দিব? (১) যে আরবী ভাষা ১০০০ হাজার বৎসর যাবত এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান ইতিহাস, অঙ্ক, চিকিৎসা গয়রহ সমগ্র শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ হিন্দু মুসলমানগণ মুসলমান আমলে ও ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে যে সব আবশ্যকীয় শব্দ লইয়া নিজ বাঙ্গালা ভাষা গড়াইয়াছিলেন, তাহা কি আমাদের ভুলিয়া যাওয়া কিম্বা উঠাইয়া দেওয়া উচিত! পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষা ভুলিয়া নূতন ভাষা শিখিতে কি জাতীয় জীবনের বলক্ষয় হইবে না? এই অতিরিক্ত বলক্ষয়ের পর জীবন সংগ্রামে আমরা কি অপর জাতিদের সমানে দাঁড়াইতে পারিব? ভ্রাতৃগণ চিন্তা করুন, মুসলমানগণের এশিয়াবাসী হইয়া জাতীয় শব্দের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা ভাল দেখায় না। এখন ও সময় আছে। সরকারী সেরেস্তার এখনও সাবেক ভাষা রহিয়াছে। লেখকগণের মুখে এখনও সাবেক কথাই প্রবল।

এক্ষেত্রে সাবেক ও নূতন বাঙ্গালা শব্দের কতক উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) এইরূপ যুক্তি গ্রহণীয় হইলে, লাটিন, গ্রীক আরবী হইতে যে সকল শব্দ ইংরেজীতে লওয়া হইয়াছে তাহা ইংরেজদের ফেলিয়া দেওয়া উচিত Eolneateon স্থলে Learnig, Department স্থলে Branch ঘসিবে ইত্যাদি এবং এই করিতে করিতে আবার সেই জঙ্গলী Saken হইবে।

পুরাতন ও প্রচলিত শব্দ।			নূতন শব্দ বা যাহা শিখিতে হইবে।
আল্লাহ্, খোদা	...	...	প্রভু, পরমেশ্বর, ঈশ্বর।
নবি, রসুল, পয়গম্বর	...	...	প্রেরিত পুরুষ, ভাববাদী।
কালাম, লফ্জ	...	...	বাক্য, শব্দ।
ওয়াজ, নছিহুত	...	...	বক্তৃতা, উপদেশ।
আকল, সমজ্	...	...	বোধ, জ্ঞান।
শখ্‌ছ, মরদ	...	...	ব্যক্তি।
জানানা, আওরত	...	...	স্ত্রীলোক।
বিবি ...	...	...	স্ত্রী।
মাবুদ ...	...	...	উপাস্য।
এল্‌ম ...	...	...	বিদ্যা।
পয়দা ...	...	...	জন্ম।
এন্তেকাল, মউত	...	...	মৃত্যু, স্বর্গারোহণ।
জেওর ...	...	...	অলঙ্কার।
লেবাস্, পোষাক	...	...	পরিধেয় বস্ত্র।
কেতাব ..	...	...	পুস্তক, গ্রন্থ
কলম ...	...	...	লিখনী।
দোয়াত ...	...	...	মস্যাধার।
হায়া, শরম	...	...	লজ্জা, লজ্জাশীলতা।
বেহায়া, বেসরম	...	...	নির্লজ্জ।
আদাওত, দুস্মণী	...	...	শত্রুতা।
লাএক ...	...	...	উপযুক্ত।
মত্‌লব ...	...	...	উদ্দেশ্য।
দানা, আকলমন্দ	...	...	জ্ঞানী, বুদ্ধিমান।
বেহোশ্ ...	...	...	সংজ্ঞাহীন, নির্ব্বোধ।
বে আকল / বে অকুফ	...	...	বুদ্ধিহীন।
বে এল্‌ম, নাদান	...	...	অজ্ঞান, মূর্খ।
বে রহম ... / বে দিল ...	...	...	নির্দ্দয়।
দীন ...	...	...	ধর্ম্ম।

পুরাতন ও প্রচলিত শব্দ।	নূতন শব্দ বা যাহা শিখিতে হইবে।
বেদীন	বিধর্ম্মী।
বে মতলব ...	উদ্দেশ্যহীন।
না মরদ	পুরুষত্বহীন।
না লায়েক ...	অনুপযুক্ত।
নেহায়ত	অতি, অত্যন্ত।
শুরু	আরম্ভ।
আখীর ...	শেষ।
মঞ্জুর, নামঞ্জুর	গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য।
আরজ, মোনাজাত	নিবেদন, প্রার্থনা।

অনেকে বলেন যে নয়া বাঙ্গালাই প্রকৃত বাঙ্গালা এবং এই ভাষা সকলকে শিখাইতে হইবে। যদি ইহাতে আর ও ১০০ বৎসর লাগে তবুও চেষ্টা করা উচিত, কারণ ইহাতে হিন্দু মুসলমানের ভাষা এক হইয়া যাইবে। এই কথাটী বলিতে বড় সুন্দর শুনায়, কিন্তু কাজে কতদূর সফল হইতে পারে, তাহাই ভাবিবার কথা। আমরা না হয় আরবী ফারসীর সংশ্রব ছাড়ান দিয়া একশতাব্দী ব্যাপিয়া আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের ও সংস্কৃতের সেবা করিলাম। কিন্তু এই সেবায় কি জাতীয় জীবনের অতিরিক্ত বলক্ষয় হইবে না? এবং এই সেবায় আমাদের যে সময় ও বলক্ষয় হইবে, আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ এই সময়ের মধ্যে আমাদিগকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবেন না? তখন কি সংস্কৃত মন্ত্রে আমাদের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে? লোকের অবস্থা, আচার, ব্যবহার ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে ভাষাতে শব্দের সৃষ্টি হয় এবং অভাব বোধ হইলে অন্য ভাষা হইতে তাহা লওয়া হয়। ইংরেজগণ খৃষ্টান হওয়ার পর লাটীন ভাষা হইতে অনেক শব্দ লইয়াছেন। তাঁহারা বিজ্ঞান শিক্ষার পর আরবী ও গ্রীক ভাষা হইতে অনেক শব্দ লইয়াছেন। সেই সব শব্দ কি এখন তাঁহারা ফেলিয়া দিয়া নূতন শব্দ গঠনের চেষ্টা করিয়া নিজদের বলক্ষয় করিতেছেন? তবে আমাদের কেন এই রোগ? মুসলমান হওয়ার পর আমাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সব নূতন হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের ভাষা তদনুযায়ী গঠিত হইয়াছে। আমরা আবার পুনঃ হিন্দু হওয়া ভিন্ন কিছুতেই সেই গঠন ভাঙ্গিতে পারিব না।

আমরা যদি জোর করিয়া অধর্ম্মবলে তাহা সম্প্রতি ভাঙ্গিয়া দি, কিছুকাল পরে তাহা আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের পক্ষে অন্য শিক্ষার সহিত আরবী শিক্ষা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান দুরবস্থার যতই দূর করার চেষ্টা হইবে, পুনঃ সুসময়েতে তাহা আসিয়া পড়িবে। তবে ফল কথা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ২০।২৫ পুরুষ যাহা করিয়াছেন, আমরা যদি তাহা ব্যর্থ করিতে থাকি, এবং আমরা যাহা করিব আমাদের পরবর্ত্তীগণ তাহা বিফল করিবে। তোমাকে তাহা হইলে ইহার পরিণাম ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহা অবশ্য চিন্তার

বিষয়। আমরা কেবল মাতৃভাষা নিয়া গোল করিতে থাকি, আর অপর জাতিগণ উন্নতির দিকে দৌড়িতে থাকুক। আজকালের সংসারে এক পদ পিছ্ পড়িলে তাহা সারিতে কত পুরুষ লাগে তাহা বলা যায় না। এ বিষয়ে আমাদের কি ভাবা উচিত নহে? হিন্দু ও মুসলমানের ভাষায় কতক ফরক অবশ্যই থাকিবে। হিন্দুর দৌড় সংস্কৃত, বেদ, রামায়ণের দিকে, আর মুসলমানের দৌড় আরবী ও কোরআনের দিকে থাকিবে। একজন দেব দেবীর নাম ও পূজায় পদ্ধতি লিখিবে, আর একজন আল্লার তৌহিদ ও এবাদত তালীম করিবে। এইরূপ বিপরীত দিকে যাহাদের গতি তাহাদের সুরত, সীরত, ভাষা ও আচার ব্যবহারে কতক পার্থিক্য নিশ্চয় হইবে ও থাকিবে, এইজন্য কাহারও উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই। কারণ ইহাতে নেক্ (ক) ভিন্ন বদ্ কিছুই নাই, তবে কি আমরা একদেশের লোক আমাদের সাংসারিক স্বার্থপ্রায় জড়িত। আমরা একে অন্যকে সম্মান সমাদর করিব। একে অন্যের কথা ও ভাব বুঝিতে শিখিব, আবশ্যক মতে একে অন্যের সাহায্য এবং একত্র হইয়া কার্য্য করিব। কিন্তু এজন্য অসম্ভব সম্ভব হইবে না।

নিজ নিজ রীতি নীতি ধর্ম্ম ও ভাষা বজায় রাখিয়া সব করিব। আর এক কথা এই যে আমাদের মধ্যে বোধ করি এক লাখ লোক ও নূতন শব্দ শিখে নাই। শিখিলে ও সাবেক শব্দ সবগুলি বেশ মনে আছে। আমাদের লোক সংখ্যা প্রায় তিন শত লাখ হইবে। এই এক লাখের জন্য তিন শত লাখকে নূতন শব্দ সব শিখান যেরূপ মুস্কিল, কিন্তু এই এক লাককে নিজও তিন শত লাখ লোকের ভাষা গ্রহণ করিয়া তাহা চাছাছিলা করতঃ তাহার উন্নতি করা এত মুস্কিল নহে। এবং ইহা দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই জাতীয় দেহে নূতন জীবন দেওয়া হইতে পারে। কারণ এই ভাষায় বহি লেখা হউক, খবরের কাগজ লেখা হউক, সকলই লোকে বুঝিবে এবং তাহার দ্বারা ফল পাইবে। সমাজেরও উন্নতি হইবে। খবরের কাগজ ও বহি ইত্যাদি ফেল হইবে না। ঐ ভাষায় লিখিত হাজার হাজার পুথী (১) ও মস্‌লা মসায়েলের কেতাব এখনও লোকের মধ্যে চলিত আছে এবং প্রত্যহ লেখা ও ছাপা হইতেছে। তবে কি

(ক) পাঠক যাহার মধ্যে এই পার্থক্য নাই তাহার আখেরত কার্ সঙ্গে হইবে? আলেম-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে নিশ্চয় মোমিনের সঙ্গে নহে।

(১) অবশ্য আমি পুথীর ভাষার বিশেষ পক্ষপাতী নহি। কারণ তাহাতে অনাবশ্যকীয় অনেক শক্ত আরবী ফারসী শব্দ আছে। যে সব শব্দ আমাদের ভাষাতে নাই, তাহা লওয়া উচিত নহে এবং যে সব শব্দ আমাদের ভাষাগত হইয়াছে তাহা রাখা উচিত, অতিমাত্রায় কোন বিষয় ভাল নহে। অনেক মুসলমান তাঁহাদের বহি হিন্দু পড়িবে মনে করিয়া কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া বিদ্যার দৌড় দেখান, কিন্তু ফলতঃ ঐ সব বহি হিন্দুও পড়ে না এবং মুসলমানও পড়িতে পারে না। মুসলমান লেখকের সাধারণতঃ মনে করা উচিত যে, তাহার বহি মুসলমানই অধিক পড়িবে। অতএব ভাষা শুদ্ধ রাখিয়া যাহাতে অধিক মুসলমান বুঝিতে পারে, তাহাই করা উচিত। যে লেখা সহজ, শুদ্ধ এবং অধিক লোকে বুঝে তাহাই ভাল। লিখিবার উদ্দেশ্য বিদ্যা প্রকাশ করা নহে বরং ভাব প্রকাশ করা এবং প্রচার করা।

সমাজের নেতা ও নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মেহেরবানী করিয়া এই ভাষা উদ্ধার ও সংস্কার করিলেই পূর্ব্ব পুরুষদের কীর্ত্তি বজায় থাকে এবং সমাজের কল্যাণ হয়। এই ভাষাতে উর্দ্দু ভাষা অপেক্ষা আরবী ফারসী শব্দ কম নহে। এই ভাষা জানে, সে কেবলমাত্র উর্দ্দু ব্যকরণ শিখিলেই প্রায় সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়। তাহার আরবী, পারসী, তুর্কি শিখিবারও অতি সুবিধা, কারণ অনেক শব্দ পূর্ব্ব হইতে জানা থাকে। যেমন আকল শব্দ মাতৃভাষায় থাকিলে আরবী (عقل)

শব্দ বুঝিতে কষ্ট হইবে না। যেমন (شغل) সোগল শব্দ (তুমি কি সোগলে আছ) মাতৃভাষায় থাকিলে আরবী পড়ার কালে (شغل) বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তুর্কি, ফারসী এবং উর্দ্দুতেও এই সব শব্দ থাকায় ঐ সব ভাষা বুঝিতে ও শিখিতে অনেক সুবিধা। ৮ পৃষ্ঠার হায়ৎ, এল্‌ম, কেতাব, কলম ও লেবাস শব্দের সম্বন্ধেও এই যুক্তি খাটে। আমাদের আরবী, ফারসী ও তুর্কি বুঝিবার ও শিখিবার সুবিধা হইবে তেমনী আরব, ফারস দেশের লোকেরও আমাদের ভাষা শিখিবার ও বুঝিবার সুবিধা হইবে।

আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণকে এই বিষয়ে একটু চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। ভাষার উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতি যেন এক অন্যের মনের ভাব বুঝিতে এবং প্রকাশ করিতে পারে। ভাষা যত অধিক লোকে বুঝে ততই তাহার ভাল। আমরা বাঙ্গালাতে বা ভারতে চিরকালের জন্য আবদ্ধ থাকিতে, বোধ করি কেহই চাই না। ভারতের বাহিরে গেলে এখন আর জাতি যায় না। পূর্ব্বে লোকের নিকট ভারতই এক প্রকার পৃথিবী বলিয়া বোধ হইত। আগে দিল্লি সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের খবর পাইতে যেরূপ সময় ও কষ্ট লাগিত এখন দিল্লি হইতে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতার খবর পাইতেও এত সময় ও কষ্ট লাগে না। পূর্ব্বে পাঞ্জাবে বাঙ্গালার বিষয় লোকের যেরূপ ধারণা ছিল এখন রেল, তার, প্রেস্ আখ্‌বার ইত্যাদির সম্বন্ধে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত অধিকতর ঘনিষ্ট হইয়াছে। আমাদের কি ইচ্ছা হয় না যে আমরা পৃথিবীর অপর দেশীয় ভাইদের সহিত মিশি, তাহাদিগকে আমাদের কিছু শিখাই কিংবা তাহাদের কিছু আমরা শিখি, এবং সকলে মিলিয়া মানবজাতির উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করি? আমাদের বাঙ্গালা ভাষা এখনও ভালমতে গড়া হয় নাই, তাহার মাত্র গড়নের 'সামান' সব হইতেছে। যখন ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি মানবের যত বিষয় জানিবার আছে, সমস্ত এই ভাষাতে আসিয়া স্থান পাইবে, তখন ভাষার গঠন পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব এই সময় আমাদের একটু চিন্তা করা উচিত। আমাদের বিবেচনা করা উচিত, কোন ভাষায় শব্দ অক্ষর বা অঙ্ক গ্রহণ করিলে আমাদের অধিক সুবিধা হয়।

খাদেমোল্ এসলাম

বঙ্গবাসী।
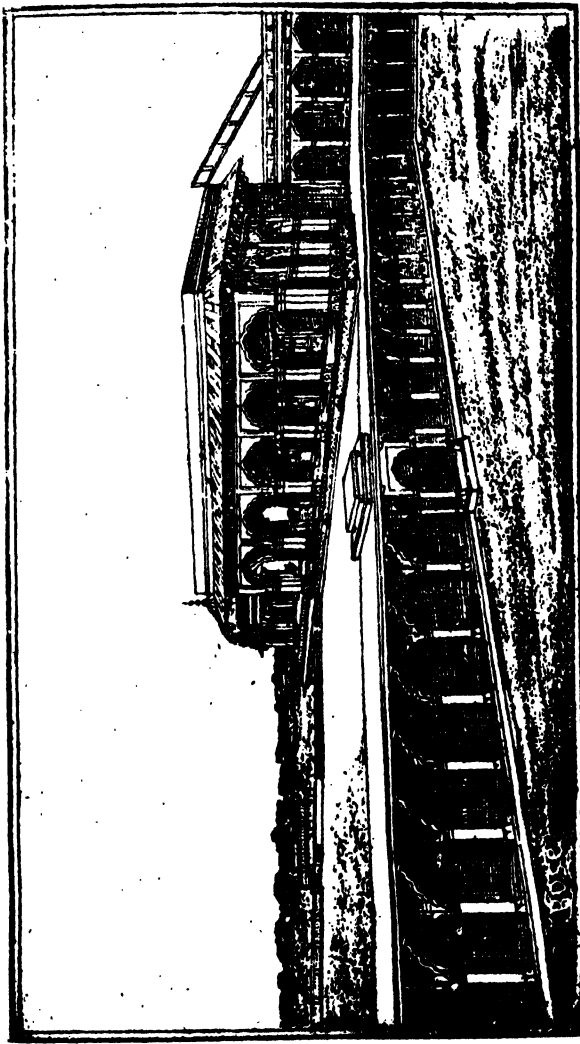
The New Age Press. Calcutta.

দেওয়ানে খাস— আগ্রা।

মোস্তফা চরিতালোচন

প্রতিশোধ গ্রহণ।

(১) বয়ের ময়ুনার ঘটনা।—আরবের নজদ প্রদেশে বনি-আমের নামক এক সম্প্রদায়ের বাস ছিল। ঐ সম্প্রদায়ের নেতা আবুবরা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলেও উহার শত্রু ছিল না; বরং ইস্‌লামের প্রচারে তাহার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। এজন্য সে বনি-আমের সম্প্রদায় মধ্যে ইস্‌লাম প্রচার করইবার উদ্দেশ্যে, মদিনায় গিয়া নজদ অঞ্চলে কতকগুলি ধর্ম্ম প্রচারক পাঠাইবার নিমিত্ত হজরত মোহাম্মদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিল। * আরবেরা স্বভাবতঃ উদ্ধত প্রকৃতি ও যুদ্ধ প্রিয়; নব ধর্ম্মের নামে তাহারা জ্বলিয়া উঠিবে ও ধর্ম্ম প্রচারকদিগকে হয় প্রাণে মারিয়া ফেলিবে, না হয় তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত করিবে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া হজরত মোহাম্মদ প্রথমতঃ নজদে ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণে ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু, আবুবরার ভ্রাতুষ্পুত্র আমের, নজদের শাসন কর্ত্তা থাকার সাহসে, সে নিজে ধর্ম্ম প্রচারকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখ-সুবিধার ভার লওয়ায় হজরত মোহাম্মদ তাহার প্রস্তাবে সম্মত এবং তাঁহার আদেশে চল্লিশ জন ধর্ম্ম-প্রচারক একত্রে নজদের অভিমুখে ধর্ম্ম-প্রচারে বাহির হইলেন।

ধর্ম্ম প্রচারকেরা নজদের অন্তর্গত "বয়ের ময়ুনা" নামক স্থানে পঁহুছিয়া, হজরত মোহাম্মদের উপদেশ মত প্রথমেই নজদের শাসন কর্ত্তা, আমেরকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য পত্র দিলেন। কিন্তু, ঐ পত্রোক্ত প্রস্তাব তাহার নিকট নিতান্ত অপমানজনক বোধ হইল এবং সে ক্রোধ বশতঃ পত্র বাহককে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিল। ধর্ম্ম-প্রচারকেরা আমেরের নিকট আশাজনক উত্তর পাইবার প্রতীক্ষায় পত্র বাহকের পথপানে চাহিয়া ছিলেন; কিন্তু আমের বহুতর সজ্জিত ও শিক্ষিত সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। ভ্রাতুষ্পুত্র বশ্যতাপন্ন না থাকায়, আবুবরা তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি পালন ও ধর্ম্ম-প্রচারকদের রক্ষা করিতে পারিল না। নিরীহ ও নিরপরাধ ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের ৩৮জন, আমের সম্প্রদায়ের হস্তে নিহত হইলেন, কেবল মাত্র আমরু (আমর বেন্ উম্মিয়া অল জমিয়া) ও অপর একব্যক্তি প্রাণ লইয়া মদিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বয়ের মযুনার ঐ লোমহর্ষণ কাণ্ড চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে (৬১৫ খৃষ্টাব্দে) সংঘটিত হয়।

* সম্ভবতঃ আবুবরার স্ব সম্প্রদায়ের অনেককে ইস্‌লামে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া, নিজে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণকরিবার ইচ্ছা ছিল।

আমরু পলায়ন কালে বনি আমের সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে পথিমধ্যে বৃক্ষতলে নিদ্রিত দেখিয়া, তাহারাও ঐ প্রচারকদিগের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, এইরূপ সন্দেহ করিয়া প্রবল প্রতিহিংসা বশে তাহাদিগকে তরবারাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। আমরু মনে করিলেন, ঐ নিদ্রিত ব্যক্তিদ্বয়ের হত্যা করণ দ্বারা নির্দ্দোষ ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের নৃশংস হত্যার কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিশোধ লওয়া হইল। কিন্তু উক্তরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ দ্বারা একটা গুরুতর হাঙ্গামার ও হজরত মোহাম্মদের প্রাণান্ত ঘটিবার সূচনা হইয়াছিল—যে ঘটনা পরে উল্লেখ করা যাইবে।

(২) রজিয়ের ঘটনা।—বয়ের ময়ূনায় যে সময়ে ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের প্রতি অত্যাচার চলিতেছে, ঠিক সেই সময়ে ৭জন মক্কাবাসী, মদিনায় গিয়া আসেম আনসারী নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের অতিথি হইল এবং মুসলমান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিল। আসেম ঐ নবাগত অতিথিগণের প্রতি যথেষ্ট যত্ন ও সমাদর প্রদর্শন করিলেন। তাহারা নানা ছলে আসেমের নিকট সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ বৎ করিয়া ফেলিল। অধিকন্তু, আসেম মক্কায় গেলে তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলেই ইস্লাম গ্রহণ করিবে, এইরূপ আশা দিয়া হজরত মোহাম্মদকে পর্য্যন্ত, আসেমকে মক্কা পাঠাইবার প্রস্তাবে সম্মত করিয়া লইল। আসেম অপর পাঁচজন ধর্ম্ম-প্রচারক সঙ্গে লইয়া মক্কার দিকে চলিলেন। (৪র্থ হিজরীর সফর ৬২৫ খৃষ্টাব্দ।)

কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে আসেমের ঐ অতিথিগণ মুসলমান ছিল না—তাহারা মক্কার গুণ্ডা ও ইস্লামের ঘোর শত্রু ছিল। ওহদ যুদ্ধে সলাকা নাম্নী এক আরব মহিলার এক পুত্র ও কতিপয় আত্মীয় আসেমের হস্তে নিহত হওয়ায় সলাকা নিতান্ত মর্ম্ম পীড়িতা হইয়া প্রবল প্রতিহিংসা বশে ঘোষণা করিয়াছিল, যে কেহ আসেমের মস্তক আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে একশত উৎকৃষ্ট উষ্ট্র পুরস্কার দেওয়া যাইবে। সুফিয়ান (সুফিয়ান বেন্ খালেদ হজলি) নামক এক ধর্ম্ম-জ্ঞানহীন পাষণ্ড আসেমের মস্তক আনিয়া সলাকার পুরস্কার লাভের লালসায়, ঐ গুণ্ডাদিগকে ছদ্মবেশে মদিনায় পাঠাইয়াছিল। ষড়যন্ত্র সমস্ত ঠিক ছিল। আসেম, সঙ্গীদিগকে লইয়া যখন মক্কার নিকটবর্ত্তী রজিয় নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন সুফিয়ান ২০০ শত সৈন্য লইয়া তাঁহাদের উপর পতিত হইল। আসেম ও তাঁহার সহচরগণ বিপুল বিক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। মুসলমানেরা প্রকৃত বীরের ন্যায় শত্রু সৈন্যের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, ২০০ শত সৈন্যের নিকট ৬জন মুসলমান কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারেন? আসেম তাঁহার আর তিন সহচর সহ রণ স্থলে প্রাণ দিলেন—অবশিষ্ট দুইজন, সুফিয়ানের নিকট বন্দী হইলেন।

সুফিয়ান মক্কায় গিয়া সলাকার নিকট প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করিল, অপিচ মুসলমান বন্দীদ্বয়কে কোরেশদিগের হস্তে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইল। কোরেশেরা ঐ নির্দ্দোষ বন্দীদ্বয়কে শূলে চড়াইয়া চল্লিশজন ঘাতক দ্বারা বর্শা ও খোঁচার দ্বারা আঘাত করাইয়া তাঁহা-

দের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করাইয়া ফেলিল—তাঁহারা হাসিতে হাসিতে এ মরধাম পরিত্যাগ করিলেন। *

সুফিয়ান প্রলোভন, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা ঐ ছয় জন ধর্ম্ম-প্রচারককে হত্যা করায়, ইস্‌লামের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার তাহার সাহস জন্মিয়াছিল। সেই সাহসে নির্ভর করিয়া মদিনা আক্রমণ ও মুসলমানদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য গোপনে গোপনে বল-বৃদ্ধি করিতেছিল। তাহার ঐ গুপ্তাভিসন্ধির বিষয় টের পাইয়া আব্দুল্লা (আব্দুল্লা বেন্ আনিস্ আনসারী) নামক এক মোসলেম বীর ছদ্মবেশে মক্কায় গিয়া তদীয় মস্তকচ্ছেদন করিয়া দিলেন।

(৩) **বনি গৎফানের দমন।**—আরবের বনি গৎফান নামে এক দস্যু-সম্প্রদায় ছিল—অনিবা—ঐ দস্যু দলের সর্দ্দার। মুসলমানদিগের কতকগুলি উষ্ট্র প্রান্তরে বিচরণ করিতেছিল দেখিয়া আনিবা—সুযোগ ক্রমে সে গুলি লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং বনি গৎফান দলের এক নিরীহ মুসলমানকে অকারণে নিহত করিয়া তাহার বিধবা পত্নীকে জোরে ধরিয়া পলায়ন করিল। ঐ সংবাদ মদিনায় যাইবা মাত্র, হজরত মোহাম্মদ ঝটিতি সাদ (সাদ বেন্ জয়েদ) নামক এক সেনাপতি সমভিব্যবহারে কতকগুলি সৈন্য দিয়া তাঁহাকে দস্যু দমনে প্রেরণ করিলেন এবং নিজেও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

সালমা বেন্ আমরু বেন আফু—একজন সাহসী মোসলেম বীর; তিনি ঐ দস্যুদলের নিকটে ছিলেন। মদিনায় সংবাদ পঁহুছিতে এবং তথা হইতে সৈন্য আসিতে কিছু বিলম্ব হইবে; ততক্ষণ দস্যুদল অনেক দূরে চলিয়া যাইবে; সুতরাং তাহাদের হস্ত হইতে অপহৃত উষ্ট্রগুলির ও সেই অনাথা বিধবার উদ্ধার দুরুহ হইবে; এই ভাবিয়া তিনি একাকী দস্যুদলের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। তাহার ফলে উষ্ট্রগুলির উদ্ধার হইল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই মুসলমান সেনাগণ দস্যুদলের নিকটবর্ত্তী হইলেন। পলায়মান দস্যুদল তখন দাড়াইল ও উভয় পক্ষে রণ ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। সামান্যক্ষণ যুদ্ধেই কতিপয় দস্যু রণস্থলে পতিত হইল; অবশিষ্টেরা রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিল। মুসলমান বিধবার উদ্ধার হইল। (৬ষ্ঠ হিজরীর—রবিয়স্‌সানি—৬২৭ খৃষ্টাব্দ।)

(৪) **ওম্মে ফের্‌কার উৎসাদন।**—ফেরারা নামক আর এক দস্যু-সম্প্রদায়ের অত্যাচারে আরব ভূমি ত্রস্তব্যস্ত থাকিত। ওম্মে ফেরকা নাম্নী এক বীর্য্যবতী রমনী ঐ সম্প্রদায়ের নেত্রী ছিল। ঐ দস্যুনেত্রী সুযোগক্রমে মদিনার অদূরে কতিপয় মুসলমান

* আরবেরা হজরত মোহাম্মদকে চারিদিকে বিব্রত করিয়া রাখায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ হন্তাদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে না পারিলেও ষষ্ট হিজরীতে তাহাদের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য সসৈন্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি বনি লহিয়ান নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, তথাকার অধিবাসী ঐ প্রচারক হন্তৃগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পর্ব্বতাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং মুসলমানেরা বিনা যুদ্ধে মদিনায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

বণিকের বানিজ্য সম্ভার লুণ্ঠন করিয়া লইল। এ সংবাদে হজরত মোহাম্মদ, ঐ দস্যুনেত্রীর দমনে জয়েদ বেন্ হারেসকে নিযুক্ত করিলেন। জয়েদ দ্রুত গতিতে সৈন্য-চালনা করিয়া দস্যু-দলকে আক্রমণ করিলেন।—নেত্রী তাহার এক কন্যা সহ মুসলমান হস্তে ধৃত হইল; দস্যুদল প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল। সেনাপতি ও সেনাগণের উপর হজরত মোহাম্মদের আদেশ ছিল, "কোন স্ত্রীলোক বা কোন বালক বালিকাকে কখনও হত্যা করিও না।" কিন্তু জয়েদের এক নিষ্ঠুর সৈন্য, ধর্ম্ম-গুরুর ঐ চির নিষেধাজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, ঐ দস্যুনেত্রীকে পথি মধ্যেই অশেষ কষ্ট দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। (৬ষ্ঠ হিজরী—৬২৭ খৃষ্টাব্দ।)

(৫) বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান।—আকল ও আরণার কতিপয় ইহুদী, পূর্ব্বে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, মুসলমানগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু সময় বিশেষে তাহারা স্বকীয় পূর্ব্ব ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া ইসলামের ঘোরতর শত্রু হইয়াছিল। একদা তাহারা হজরত মোহাম্মদের উষ্ট্র প্রান্তর হইতে অপহরণ করিয়া লইল এবং উষ্ট্র পালকদিগের চক্ষু ফুড়িয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল। মোস্লেম বীর কোর্জ্জ বেন্ জাবের অল ফেহরী, মদিনার বাহির হইয়া ঐ দস্যুদলের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।—তাহারা অনতি বিলম্বে আক্রান্ত ও ধৃত হইল। ইহুদী শাস্ত্রে আছে, "কেহ কাহারও চক্ষু নষ্ট করিলে; তাহারও চক্ষু নষ্ট করাই উচিত দণ্ড।" ঐ ইহুদীগণ মুসলমান উষ্ট্র পালকদের চক্ষু ফুড়িয়া মারিয়াছিল বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের বিধান মতে তাহাদেরও চক্ষু ফুড়িয়া মারিয়া ফেলা হইল। (৬ষ্ঠ হিজরী—৬২৭ খৃষ্টাব্দ)

(৬) মক্কায় গুপ্তাভিযান।—কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ান, মুসলমানের প্রকাশ্য শত্রু ছিলেন; আর এক আবু সুফিয়ান (আবু সুফিয়ান বেন্ হরব) গোপনে ইসলামের শত্রুতা সাধন করিত। ঐ আবু সুফিয়ানের ষড়যন্ত্রে এক পিশাচ প্রকৃতির গুপ্ত ঘাতক, মদিনায় গিয়া হজরত মোহাম্মদের গুপ্ত হত্যার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল।—অনুসন্ধানী মুসলমানগণ তাহাকে সশস্ত্র ধৃত করিয়া হজরত মোহাম্মদের নিকটে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিজে নির্দ্দোষ ও কেবল আবু সুফিয়ানের কুমন্ত্রণায় হজরত মোহাম্মদের প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা নিবেদন করায়, হজরত মোহাম্মদ তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন ও তাহাকে অব্যাহতি দিলেন।

অনন্তর আবু সুফিয়ানের ঐ হত্যাভিসন্ধির গুপ্তভাবে প্রতিকার করিবার জন্য, আমরু (আমরু বেন্ উম্মিয়া) এবং সাল্মা (সল্মা বেন্তে আসলব) এই দুই জনে ছদ্মবেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু, তাঁহাদের গুপ্তাভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ায়, মক্কার অধিবাসী বর্গ তাঁহাদের উপর খড়্গ হস্ত হইল; তাঁহারা কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া মদিনায় ফিরিয়া গেলেন।

(৭) মুতার যুদ্ধ।—হজরত মোহাম্মদ সাহসী ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন; তাঁহার ধর্ম্মবল সমন্বিত উচ্চ সাহস, তাঁহাকে জগতের যাবতীয় রাজন্যবর্গকে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণের আহ্বান পত্র দিতে উৎসাহ দিয়াছিল। সেই একেশ্বরবাদের আহ্বান পত্র লইয়া মুসলমান দূতগণ দিগ্দিগন্তে বাহির হইয়াছিলেন। ঐ পত্র বাহকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই নির্ব্বিঘ্নে মদিনায়

ফিরিয়া গিয়াছিলেন; কেবল একমাত্র হারেসকে নিঃসহায়াবস্থায় শত্রুকবলে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। হারেস ইস্লামের আহ্বান পত্র লইয়া বসরার শাসনকর্ত্তার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজগণের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে পত্র বাহকেরা চিরকাল অবধ্য; কিন্তু সেই চিরপ্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া প্যালেষ্টাইনের সীমান্তর্গত মুতা নামক গ্রামে, তথাকার খৃষ্টান সীমানাদার সজ্জিল, বিনা কারণে হারেসকে নিহত করিয়া ছিল। ঐ সংবাদ মদিনায় পঁহছিবা মাত্র, মুসলমানেরা নির্দ্দোষ হারেসের অযথা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। হজরত মোহাম্মদ তিন হাজার সৈন্য একত্র করিয়া হারেসের পুত্র জয়েদের অধিনায়কত্বে মুতা-অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন।

মুসলমানগণের ঐ অভিযান সংবাদ পাইয়া, সজ্জিল ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়কে একত্র সমবেত করিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে প্রস্তুত করিল। রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াসের এক দল সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যও তাহাদের সহিত যোগদান করিল। খৃষ্টান সৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষের নিকটে দাড়াইল।

যথা সময়ে উভয় পক্ষ রণ স্থলে উপস্থিত হইলেন।—প্রথমেই মুসলমান সেনাপতি হারেস পতাকা হস্তে লম্ফদিয়া খৃষ্ট বাহিনীর উপর পতিত হইলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ ধার তরবার প্রহারে অনেকে হতাহত হইল। কিন্তু, অবিলম্বে খৃষ্টীয় সৈন্যগণ তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং বর্ষার বারি সম্পাতের ন্যায় চারিদিক হইতে তাঁহার উপর অস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল। অতএব তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় রণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে চির নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

জয়েদকে সম্মুখ সমরে শায়িত হইতে দেখিয়া বীর কেশরী জাফর ছুটিয়া গিয়া রণ পতাকা ধারণ করিলেন। * তিনি "আল্লাহো আকবর" রবে, খৃষ্ট বাহিনীর হৃদয় প্রকম্পিত করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন—তাঁহার অস্ত্র প্রহরণে অনেকে অন্তকপুরে প্রস্থিত হইল। পরে কিন্তু, তিনিও চারিদিক্ হইতে বেষ্টিত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার উপর অবিরাম তীক্ষ্ণ শর ও বর্ষা বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি আহত হইয়াও উন্নত পতাকা আন্দোলিত করিয়া মুসলমান সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, ইত্যাবকাশে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত খসিয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পতাকা বাম হস্তে ধারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ মুসলমান-দিগকে উত্তেজনা দিতে লাগিলেন।—ক্ষণ বিলম্বে বাম হস্তও স্থানচ্যুত হইল—শেষে ঐ রণ-পতাকা বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া—মুসলমান সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাপ্লুত হইয়াছে—রুধির ধারা বহিয়া চলিয়াছে—একেশ্বর বিশ্বাসী মোসলেম বীরের সে দিকে দৃষ্টি নাই—কেবল "মার মার" শব্দ! কিন্তু অচিরে শত্রুর এক তীক্ষ্ণ অসি, তাঁহার কটিদেশ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল!—তাঁহার ধর্ম্মময় জীবন—স্বর্গধামে প্রস্থিত হইল!

* এই জাফর আবু তালেবের পুত্র এবং হজরত আলির ভ্রাতা ছিলেন।

এবারে আবদুল্লার (আবদুল্লা বেন্ রওয়াহার*) পালা পড়িল, তিনিও প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। জাফর গতাসু হইবা মাত্র তিনি রণস্থলে উপস্থিত হইয়া পতাকা ধারণ করিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় সৈন্যের ক্ষিপ্র অস্ত্র প্রহরণে অল্পক্ষণ মধ্যে তাঁহাকেও পূর্ব্বোক্ত সেনাপতি দ্বয়ের অনুসরণ করিতে হইল। মুসলমান সৈন্যগণ তখন হতোৎসাহ হইয়া পড়িলেন এবং রণস্থল হইতে পশ্চাদপসারণ আরম্ভ করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মহাবীর খালেদের চক্ষুস্থির হইল। * "খালেদ উপস্থিত থাকিতে মুসলমান সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করিবে ?" এই বলিয়া তিনি গুরুগম্ভীর "আল্লাহো আকবর" নিনাদে মুসলমান সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে করিতে রণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্ব কথিত সমর পতাকা উন্নত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মোসলেম বীরবৃন্দ প্রচণ্ড বেগে খৃষ্টান বাহিনী আক্রমণ করিলেন। খালেদের সমর পিপাসা সমধিক প্রবলা হইয়া তাঁহাকে ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তুলিল। মত্ত করীর শুণ্ড সঞ্চালনের ন্যায় তাঁহার হস্ত হইতে তরবারি চালিত হইতে লাগিল। এক, দুই, তিন, চারি করিয়া ৯ খানি তরবারি তাঁহার বজ্রমুষ্টির ভীষণ ভাবের শত্রু আঘাতে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। খৃষ্টীয় সৈন্য পলকে পলকে ধরাশায়ী হইতে লাগিল—কত ছিন্ন মুণ্ড সৈনিক শ্রেণীর পদ তাড়নায় "ফুট বলের" ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিল—কাহারও জয় পরাজয় হইল না। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিলে, উভয় পক্ষ সে দিনের মত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন।

মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্য লইয়া ঐ বিপুল খৃষ্টীয় বাহিনীর সমকক্ষতা করা সুকঠিন; আর পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করাও অপমান ও লজ্জার কথা।—খালেদ অসম সাহসী—খালেদ দুর্দ্ধর্ষ—খালেদ সমরে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা বিহীন—পৃষ্ঠ প্রদর্শনের পাত্র নহেন। তিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন; যুদ্ধ করাই স্থির হইল। তবে তাঁহার চিন্তা নিঃসৃত কৌশলে সৈন্য শ্রেণীর সমাবেশ দৃশ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিল। কল্য যে সকল সৈন্য অগ্রভাগে ছিলেন, তাঁহারা পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইলেন—যাঁহারা পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহারা সম্মুখে স্থাপিত হইলেন। প্রভাতে সেই পরিবর্ত্তিত দৃশ্য সৈন্য শ্রেণী মহাবীর খালেদের অধিনায়কতায় সিংহ বিক্রমে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। খৃষ্টীয় বাহিনীও অগ্রসর হইল। খালেদের ক্ষীপ্র তরবারি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় তাঁহারা ভয়ঙ্কর "আল্লাহো আকবর" ধ্বনির সহিত বিদ্যুচ্চকিত তরবারাঘাতে সম্মুখে—দক্ষিণে ও বামে খৃষ্টীয় সৈন্যের রাশি রাশি মুণ্ড দেহচ্যুত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অপরাপর সেনাগণও সৈন্যগণের উপর অস্ত্র চালনায় প্রভূত ক্ষীপ্রকারিতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। মুসলমানের সে তেজ ও বিক্রম দেখিয়া খৃষ্টানেরা অবাক হইলেন; দেখিলেন কাল যে সকল মুসলমান রণস্থলে ছিল, আজ তাহারা নাই—রাতারাতি কোথা হইতে, নূতন সৈন্যদল মুসলমানের সাহায্য হেতু যোগদান

---

* ওহদ যুদ্ধে এই খালেদই মুসলমান দলনে প্রভূত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরে ইনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

করিয়াছে, তাই মুসলমানেরা আজ নব বলে বলীয়ান হইয়া রণদৃশ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। এই ভাবিয়া খৃষ্টান সৈন্যগণ আতাঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং এ যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। খালেদ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন!

খালেদের কৌশলে মান রক্ষা হইল ইহাই সৌভাগ্যের কথা; তাহার উপর আর অধিক লোভের আকাঙ্খা করা উচিত নহে ভাবিয়া তিনি পলায়িত বিপক্ষ দলের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন না—হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বিজয়ীবেশে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন। এই, খৃষ্ট-মোস্‌লেম সমরে খালেদের রণ নৈপুণ্যের ও বিপুল সাহসের পরিচয় পাইয়া হজরত মোহাম্মদ তাঁহাকে "সয়ফুল্লা" (ঈশ্বরের তরবারি) এই উচ্চ উপাধিতে সম্মানিত করিলেন। (৮ম হিজরী, জমাদিয়ল-আউওয়াল—৬২৯ খৃষ্টাব্দ।)　　(ক্রমশঃ)

আবদুল লতিফ্।

শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান।

(৪)

মোসলেম জগতে শিল্প-চর্চ্চা সম্বন্ধে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের সাক্ষ্য।

প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক মসিউ সেডিও (Sediwat) আরব জাতির শিক্ষা সভ্যতা সম্বন্ধে "**Historic Generate dus Arabes**" নামক ফরাসী ভাষায় যে উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, প্রাচ্য জগতের তত্ত্ববিদ পণ্ডিত সমাজে উক্ত পুস্তকখানির আসন অতি উচ্চ। বলিতে কি মুসলমান জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই উল্লেখিত গ্রন্থখানির ছায়া অবলম্বনে লিখিত। অন্যতম ফরাসী ঐতিহাসিক মসিউ লিবান (Leborw) "**La Cirt'esation dus Arabes**" নামক যে গ্রন্থখানি আরবের সভ্যতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তাহাও প্রধানতঃ বর্ণিত মসিউ সেডিওয়ের পুস্তকাবলম্বনেই লিখিত। মিসরে, উক্ত পুস্তকখানির আরবী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নাম "খোলাছতে তারিখুল আরব" (خلاصة تاريخ العرب) যাহা হউক প্রাচ্য জগতের তত্ত্বজ্ঞানে মহা পারদর্শী মসিউ সেডিও, মোস্‌লেম জগতে শিল্প-চর্চ্চা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার পুস্তকের আরবী অনুবাদ অবলম্বনে নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম, যথা :—

"আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের আমলে, খোরাসান রাজ্যে লৌহের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রযত্নে কেরমান শহরে তাম্রখনি আবিষ্কৃত হয়। এরাক ও সিরিয়া রাজ্যের

এলাকায় বিশেষতঃ মোছেল, হলব ও দামস্কস নগরে বস্ত্র নির্ম্মাণের প্রচুর কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। মুসলমানগণ ক্রেরোচিন তৈল, চীনামাটী, তুরিসপাথর, কর্কচলবণ, গন্ধক ইত্যাদি দ্রব্যের খনি আবিষ্কারেও বিরত হন নাই। যন্ত্র বিজ্ঞানে তাঁহারা অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের স্বনামখ্যাত সম্রাট শার্লেম্যানের নিকট, খলিফা হারুণর রশিদ যে ঘড়ি উপহার পাঠাইয়াছিলেন তাহা তৎকালীন মুসলমানগণের সূক্ষ্মতম শিল্পাবিষ্কারের উজ্জ্বল নিদর্শন। ফ্রান্সের রাজ সভার সদস্যগণ উক্ত ঘড়ির নির্ম্মাণ কৌশল এবং কল কব্জার সূক্ষ্মতম শিল্প নৈপুণ্য ও ব্যবহার প্রণালীর তত্ত্বোদ্‌ঘাটন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। (১) আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের আমলে বিভিন্ন ভাষা ও বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার সৌকর্য্যার্থে বোগদাদ মহা নগরীতে একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণই সচরাচর রাজকীয় অনুবাদ বিভাগের দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে বোগদাদে আর একটী উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল, তাহাতে ৬০০০ ছয় সহস্র ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। সে সময় রাজ্যের নানাস্থানে, প্রসিদ্ধ নগর ও জনপদে সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার স্থাপিত ছিল। জন সাধারণ অবাধে সেখানে উপস্থিত হইয়া উপকৃত হওয়ার অধিকারী ছিল। আরবী সাহিত্য তখন এশিয়া মহাদেশের প্রায় সর্ব্বত্রেই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরবী ভাষা অনেকাংশে দেশের সাধারণ ভাষারূপে ব্যবহার হইতেছিল। দেশীয় ভাষার প্রভাব সে সময় অনেক পরিমাণে খর্ব্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সচরাচর লোকে আরবী ভাষায় কথোপকথন করিত এবং তাহারই সাহায্যে ভাবের বিনিময় করিত। খলিফা মামুন ও তাঁহার সভাসদগণ, সচরাচর বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শিক্ষা প্রণালী পরিদর্শন করিতেন। খলিফা মামুনের সময় হইতেই মোসলেম জগতে গণিত শাস্ত্রের উন্নতির সূচনা হয়। দেশের স্থানে স্থানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্দেশ্যে মানমন্দিরে, জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংক্রান্ত গভীর গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহারের ফলে, বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। মানমন্দিরের জন্য জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ নানাবিধ উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি আবিষ্কার করেন। মেডিক্যাল কলেজে যথারীতি ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। উদ্ভিদাদির রাসায়নিক তত্ত্বাবিষ্কার হেতু বহু কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। (২)

খলিফা মামুনের দরবারে যে দিবস গ্রীকের রাজ প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে দিবস খলিফার সম্মুখে স্বর্ণ বিনির্ম্মিত একটী বৃক্ষ সংরক্ষিত হইয়াছিল। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সমূহে অসংখ্য বহুমূল্যের মণি মুক্তা বিজড়িত ফলফুল ঝুলিতেছিল।

স্পেনের আরবগণ শিল্পক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা রোমান ও ফিনিশিয়ানদিগের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া তাহাতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

(১) "খোলাছতে তারিখুল আরব" خلاصة تاريخ عرب
(২) তারিখে খোলছতল্ আরব ১১৪ পৃঃ।

তাঁহারা খনি হইতে নানাবিধ খনিজ পদার্থ বহিষ্কার করণ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। পারদাদি নিতান্ত দুসাধ্য বস্তুর খনি আবিষ্কার করিতেও তাঁহারা অপারগ ছিলেন না। 'মলকা' ও 'বিস্তাদিকা মেরিস'এর নিকট এয়াকুত পাথরের খনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমুদ্র গর্ভ হইতে স্পেনের নিকট মুক্তা উত্তোলন ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন মুসলমানগণ, চর্ম্ম রঞ্জন ও বস্ত্র বয়ন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আরবগণ রেশম ও পশম শিল্পে অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বরাজ্য ও আফ্রিকার তলিতলার (টলিডু) অস্ত্র-শিল্প ও গ্রাণাডার রেশমবস্ত্র, কর্ডোভার 'জিন' ও পাকা চামড়া অতি প্রসিদ্ধ ছিল। কভন্সিয়া ও ভালন্সার শিল্প দ্রব্যাদি সমগ্র ইউরোপে পরম সমাদরে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইত। আরবগণের মধ্যে যে হুণ্ডির প্রচলন ছিল তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। বনস্পতি বিদ্যায় আরবগণ চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহদের কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির নিদর্শন এখনও স্পেনের গ্রাণাডা, ভিজিগাথ ও হোসেতাত প্রভৃতি স্থানে পরিলক্ষিত হয়। 'হোসেতাত' নামক স্থানে জল সিঞ্চনের আশ্চর্য্যজনক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। নদী যেখানে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছে, তাহার তিন মাইল উর্দ্ধদেশে একটী সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জলধারা অবরোধ করা হইয়াছিল। সেখান হইতে পল্লীগ্রাম ও মাঠের দিকে ৭টী প্রণালী খনন করিয়া জল সরবরাহের অভিনব উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। সপ্তাহের সপ্ত দিবসের হিসাবে প্রত্যেক দিন এক একটী প্রণালীর দ্বার খুলিয়া দিয়া সেদিকে জল প্রবাহের ব্যবস্থা করা হইত। উল্লিখিত ৭টী খাল হইতে অসংখ্য শাখাপ্রণালী খনন করিয়া দেশের সর্ব্বত্রে নীত হইয়াছিল। সর্ব্বক্ষণ প্রচুর পরিমাণে জলরাশি ব্যবহারার্থে পাওয়া যাইত। যাহাতে প্রত্যেক কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ হইতে পারে তাহার সুবিহিত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। স্পেনদেশ, এ সকল সুবন্দোবস্ত হেতু মুসলমান আমলে রমণীয় নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্পেনে সর্ব্বপ্রথম আরবগণই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। স্পেনের যে অংশ আরবগণের অধিকার ভুক্ত ছিল তাহাতে ছয়টী প্রাদেশিক রাজধানী, ৮০টী প্রসিদ্ধ বৃহৎ নগর, এবং ৩০০ শত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নগর বিদ্যমান ছিল। কস্‌বা, পরগণা ও গ্রামের সংখ্যা করাই অসম্ভব। স্পেনে মুসলমান সভ্যতা ও সমৃদ্ধি গৌরবের বিষয় অনুমান করার জন্য এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, একমাত্র স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা নগরীতে দুই লক্ষ বাড়ী, ৬০০ মস্‌জেদ, ৫০টী হাস্পাতাল, ৮০টী কলেজ, ৭০০ 'হাম্মাম' বা স্নানাগার এবং রাজধানীতে ১০ লক্ষ লোকের বাস ছিল। বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় তখনকার কর্ডোভা কত উন্নত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন যে সেই কর্ডোভার কত শোচনীয় অবস্থা ও ভীষণ পরিণাম! তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তখন রাজ্যের আয় ছিল, এককোটি ২০ লক্ষ ৪৫ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত ধন সম্পত্তি ও 'জাকাতাদির এবং 'ওশরের' আয় স্বতন্ত্র।

স্পেনের আরবীয় স্থাপত্য কীর্ত্তি সমূহ দর্শনে, বিস্ময়াপন্ন না হইয়া থাকা যায় না। কর্ডো-

ভার ভুবন প্রসিদ্ধ জামে মস্‌জেদ এখনও কালের বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই অতুল মস্‌জেদটী দীর্ঘে ৬০০ শত ফুট, প্রস্থে ২৫০ ফুট, দক্ষিণদিকে প্রস্থভাগে ৩৮টী এবং বামদিকে ২৯টী প্রাঙ্গণ আছে, 'রোখাম' প্রস্তরের ১০৯৩টী স্তম্ভ বিদ্যমান। দক্ষিণ পার্শ্বে তাম্র বিনির্ম্মিত ১৯ খানি কপাট আছে। এ সকল কপাটের মধ্যভাগ স্বর্ণপাত বিজড়িত নানারূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিখচিত অতি সুশোভন। ছাদের উপর তিনটী স্বর্ণ বিমণ্ডিত গোম্বজ আছে। গুম্বজের শিরোদেশে নিখুত স্বর্ণের একটী 'আনার' ফল অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত ও সংরক্ষিত। মস্‌জেদে চারি সহস্র ও সপ্তশত ঝাড় ফানুস বিলম্বিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে মস্‌জেদের 'মেহরাবে' একটী ঝাড় বহুমূল্য মণিমুক্তা ও স্বর্ণ বিমণ্ডিত। (১)

আরবগণ, কাগজ, দিক্‌দর্শন যন্ত্র ও বারুদ আবিষ্কার পূর্ব্বক জগতের সভ্যতা এবং রাজনীতি ও সমরনীতি ক্ষেত্রে যে মহা পরিবর্ত্তন ও যুগান্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন, সভ্য জগৎ তাঁহাদের সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল মহদবিষ্কারের গৌরব-মুকুট নিজদের মস্তকে পরিধান করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা বৃথা প্রয়াস ও সত্য ধর্ম্মের অপলাপ করা মাত্র। ইউরোপবাসী ঐ সকল শিল্পাবিষ্কার জন্য আরব জাতির নিকট ঋণী এ কথা গোপন রাখা কৃতঘ্নতার পরিচায়ক। ইহাও কথিত হইয়া থাকে যে, চীনবাসিগণ বহুকাল পূর্ব্বেই ঐ সকল দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই মতের পোষকতা করিবার জন্য তাঁহারা কতকগুলি কল্পিত ও ভিত্তিহীন পুস্তকের প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, চীনরাজ্যে অষ্টম শতাব্দী হইতে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য যে এ সকল উক্তি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ শূন্য। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, রেশম জাত কাগজ প্রস্তুত প্রণালী আরবগণ চীনবাসীগণের নিকটেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীন দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু একটী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড বিশেষ। এরূপ অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত লোকদিগকে দিগদর্শন যন্ত্রের আবিষ্কারক বলিয়া স্বীকার করা অপেক্ষা হাস্যস্পদ বিষয় আর কি হইতে পারে তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

আরবগণ নানা প্রণালীতে বারুদের ব্যবহার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। চীন দেশীয়গণ বারুদের বিষয় কিছুই জানিতেন না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ৬৯০ খৃষ্টাব্দে মক্কার অবরোধ কালে আরবগণের মধ্যে বারুদের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিসরের মুসলমানগণ কামান ব্যবহার পূর্ব্বক সামরিক জগতে মহা পবিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে টিউনিসের বাদশাহ ও এশ্‌বেলিয়ার অধিপতির সমবেত চেষ্টায় নৌযুদ্ধের যে প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে সামরিক কৌশলে বারুদের সাহায্যে অনল

(১) "খোলাছতে তারিখুল্‌ আরব" ১৬৬।১৬৮ পৃঃ।

বর্দ্ধণের নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে জিব্রাল্টরের অবরোধ কার্য্যে এবং ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে গ্রাণাডার শাহ এস্মাইল কর্ত্তৃক 'বায়ভা'র অবরোধ সময় এবং ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে স্পেনের 'তারিফা' নগর অবরোধ কালে ও ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে আলজিরিয়ার যুদ্ধে মুসলমানগণ বারুদ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক 'কেরারসের' মতে মুসলমানগণ বারুদ ব্যবহার দ্বারা উপরোক্ত যুদ্ধ সমূহে গোলাগুলি নিক্ষেপ করার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্পেনের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সময় হইতেই মুসলমানগণের সংস্পর্শে বারুদ ব্যবহার করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ব্যবহার আরবগণের মধ্যে একাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত হইয়াছিল, জাহাজ পরিচালনায়, সামুদ্রিক ও স্থলপথের ভ্রমণ কার্য্যে, মসজেদের কেবলা নির্দ্ধারণে মুসলমানগণ দিক নির্ণায়ক যন্ত্র ব্যবহার করিতেন।

৬৫০ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দ ও বোখারা নগরে রেশমজাত কাগজ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। ৭০৬ খৃষ্টাব্দে ইউসফ এবনে ওমর, কার্পাসের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত কারখানা হইতে যে সকল কাগজ প্রস্তুত হইত তাহা বাজারে সচরাচর "কাগজেদামেস্কী" নামে প্রখ্যাত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণও এ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। স্পেনে পুরাতন বস্ত্রাদি দ্বারা কাগজ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। বোগ্দাদ নগরীতেও বহু সংখ্যক কাগজ প্রস্তুত করার কারখানা বিদ্যমান ছিল। (১)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'ক্যাষ্টলে' আরবীয় কাগজ ব্যবহারের প্রচলন হয় এবং সেখান হইতেই ফ্রান্স, ইটালি, ইংলণ্ড ও জর্ম্মণীতে ক্রমে উক্ত কাগজ ব্যবহার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া পড়ে। এখানে এ কথা বলা বাহুল্য যে, যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি পুস্তক আরবীয় কাগজে লিখিত হইয়াছিল তাহা সৌন্দর্য্যে, পারিপাট্যে ও ঔজ্জ্বল্যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় কাগজের তুলনায় বহু অংশে শ্রেষ্ঠ। সুরঞ্জন ও বর্ণ বৈচিত্র্য ও লতা পাতা বিশিষ্টতা ইত্যাদির নানাদিক দিয়া তুলনা করিলে ইউরোপীয় কাগজ হইতে আরবীয় কাগজের শ্রেষ্ঠতা সহজেই প্রতিপাদিত হয়।

ইউরোপীয় বর্ত্তমান সভ্যতা ও উন্নতির প্রত্যেক বিভাগ ও শাখা প্রশাখাতেই আরবজাতি এককালে তাহার অনুরূপ উন্নতির সম্যক পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমানগণ শিক্ষা সভ্যতা ও শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় জগতের শিক্ষা গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিহাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, জীবন চরিত, সমালোচনা, শিল্পাবিষ্কার, স্থাপত্য কীর্ত্তি, ইত্যাদি বিষয় মুসলমানগণের শিক্ষা সভ্যতার চরম উন্নতির উজ্জ্বল নিদর্শন। অতএব আমরা ইউরোপীয় অধিবাসীদের পক্ষে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সভ্যতার পথ-প্রদর্শক মুসলমান জাতির প্রতি যথোচিতরূপে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক আমরা আমাদের শিক্ষাগুরু আরব জাতির প্রতি দ্বেষ হিংসা প্রকাশ করিতে এবং তাহাদিগকে অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অসভ্য বলিয়া

(১) "মাজমল বোলদান" (معجم البلدان) ৪র্থ খণ্ড—৫১২ পৃষ্ঠা।

তাহাদের নিন্দাবাদ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করি না, তাহাদের সম্মান ও গৌরবের হানিজনক অন্যায় ব্যবহার করিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি, ইহা নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে।

'টিকা' দেওয়াকে আরবী ভাষায় 'তল্‌কিহ' (تلقيح) বলা হয়। আরবের মূর্খতার যুগেও আরবস্থানে টিকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। কোর্‌আন শরিফেও এই টিকার কথা উল্লেখ আছে, যথা :—

ارسلنا الرياح لواقح

ইউরোপবাসী স্বীকার করিয়াছেন, টিকা দেওয়ার প্রথা তাঁহারা আরবজাতির নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম 'লেডী মেরীওয়াটলি মাণ্টগিটুর' ১৭২১ খৃষ্টাব্দে টিকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে মুসলমানগণের নিকট এই টিকা-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। গোঁড়া পাদ্রীগণ প্রথমাবস্থায় এই টিকা প্রথা প্রচলন ব্যাপারে কঠোর বাধা উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মুসলমানগণের প্রবর্ত্তিত একটী নিয়ম স্বদেশে প্রচলন করাকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছিলেন, কিন্তু টিকা প্রথা বসন্ত-রোগের একটী বিশেষ ফলপ্রদ উপায় ইহা দেশবাসী বুঝিতে পারায়, তাহারা পাদ্রীগণের বাধা বিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ক্রমে সর্ব্বত্রে তাহার প্রচলন করিয়া দেন।" (সমাপ্ত)

এস্‌লামাবাদী।

কোর্‌আন শরীফ ও জ্যোতিষ।

নভোমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের উদয় অস্ত, গ্রহগণের সঞ্চরণশীলতা, চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি স্বভাবতঃ ভাবুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আস্তিক এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া ভগবৎ-প্রেমে গলিয়া যান। এই জন্য কোরআন শরীফে বহুস্থানে জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় কোরআনে এমন কতকগুলি জ্যোতিষিক সত্যের উল্লেখ আছে, যাহা সেই সময়ের লোকদিগের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল এবং বিজ্ঞান যাহা কেবলমাত্র অধুনাতন সময়ে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কোরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান (علم هيئة Astronomy) আলোচনা করিতে উৎসাহ প্রদান করে, যথা :—

و كاين من اية في السموات والارض يمرون عليها و هم عنها معرضون ●

"এবং আকাশে ও পৃথিবীতে কতই না আল্লার নিদর্শন আছে, যাহার উপর দিয়া তাহারা চলিয়া যায় কিন্তু তাহারা তাহা হইতে বিমুখ।

(ইয়ুসফ, র ১২, ১৫০ আয়াত)

এই জ্যোতির্বিজ্ঞান অর্থে সেই অসার শাস্ত্র (علم نجوم Astrology) নহে, যাহাতে কোন্ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে লোকের ভাগ্য কি প্রকার হয়, নক্ষত্র বিশেষে যাত্রা সঙ্গত কি অশুভ ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা আছে। এই প্রকার অসার বিদ্যার আলোচনা মোসলেম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে কতকগুলি জ্যোতিষ্কের আপেক্ষিক অবস্থান স্থির এবং কতকগুলির অবস্থান পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, যেন তাহারা আকাশ সমুদ্রের নক্ষত্র দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সঞ্চরণশীল অর্ণব পোত। খালি চক্ষে দেখিলে শেষোক্ত প্রকারের ৭টী জ্যোতিষ্ক পরিলক্ষিত হয়, যথা—চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি, ও শনি। ইহাদিগকে কোরআন শরীফে سبع سموٰت সপ্ত 'সামাওয়াত' বলা হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে এই সপ্ত জ্যোতিষ্ককে নভোমণ্ডলের এক সমতল ক্ষেত্রস্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রমাণিত করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পর হইতে বহু সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত। বাস্তবিক যখন তাহারা সমসূত্রে অবস্থান করে, তখন তাহাদের আপেক্ষিক অবস্থানকে সপ্ততল প্রাসাদের সাতটী ছাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই জন্য কোরআনে এই সপ্ত জ্যোতিষ্কের অবস্থানকে طبقا উপরি উপরিরূপে বলা হইয়াছে।

الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طبقا و جعل القمر فيهن نورا
و جعل الشمس سراجا ۞

তোমরা কি দেখ নাই কি প্রকারে আল্লাহ্ সপ্ত সামাওয়াতকে উপরি উপরিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তাহাদের মধ্যে চন্দ্রকে জ্যোতিঃ ও সূর্য্যকে দীপ করিয়াছেন।

سموٰت 'সামাওয়াত' এর প্রতিশব্দ রূপে কোরআনে আর দুইটি শব্দ আসিয়াছে। যথা :—

(১) طرائق (পথ বিশিষ্ট)।

و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق

" এবং নিশ্চয় তোমাদের উপরে সপ্ত বর্ত্ম বিশিষ্টকে সৃষ্টি করিয়াছে।

(সুরা মু'মেনুন, ১র,)।

طرائق 'তরায়েক' শব্দ দ্বারা সপ্ত জ্যোতিষ্কের (সাধারণ চক্ষে প্রতীয়মান) গতিপথকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(২) شداد 'শেদাদ' (কঠিন), যথা :—

و بنينا فوقكم سبعا شدادا

এবং আমি তোমাদের উপর সপ্ত কঠিনকে নির্ম্মাণ করিয়াছি। (সুরা আম্ম, ১র)।

شداد 'শেদাদ' শব্দ দ্বারা তাহাদের জড়ত্বের ও কাঠিন্যের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'সামাওয়াত' যে স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত নহে, কিন্তু পৃথিবীর ন্যায় উপাদানে গঠিত, তাহাও কোরআনে উল্লেখিত হইয়াছে, যথা :—

الله الذى خلق السموات و من الارض مثلهن

"তিনিই আল্লাহ্, যিনি সপ্ত সামাওয়াতকে ও তাহাদের সদৃশ পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন"।

উক্ত জ্যোতিষ্ক সপ্তের মধ্যে, দৃশতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি নিয়মিতরূপে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে এবং অন্য পাঁচটির গতি কখন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, কখন পুনরায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে, কখন বা দৃশ্যতঃ স্থির প্রতীয়মান হয়। জ্যোতিষ্ক সপ্তের এই বিচিত্র গতিকে লক্ষ্য করিবার জন্য কোরআনে বলা হইয়াছে—

فلا اقسم بالخنس ط الجوار الكنس ط

অনন্তর আমি পশ্চাদ্গমনকারী, সরল গমনকারী, স্থির অবস্থানকারীদিগের শপথ করিতেছি।

(সুরা তক্ওয়ার, ১র,)।

উক্ত জ্যোতিষ্ক সপ্ত সাধারণ চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয়। দূরবীক্ষণের আবিষ্কারের সহিত বরুণ (Uranus), ইন্দ্র (Neptune) এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোরআনে জ্যোতিষ্ক সপ্তের উল্লেখে তাহাদের সত্যের ও অন্য গ্রহ উপগ্রহের অনস্তিত্ব বুঝায় না। ইমাম রাজী (سبع سموات) এর ভাষ্যে বলিতেছেন :—

فان قال قائل فهل يدل التخصيص على سبع السموات على نفى العدد الزائد

قلنا الحق ان تخصيص العدد بالذكر لا يدل نفى الزائد

"অনন্তর যদি কেহ বলেন, সপ্ত 'সামাওয়াত' শব্দ কোরআনে আসায় তাহা দ্বারা কি অতিরিক্ত সংখ্যার নিষেধ প্রমাণ হইতে পারে না? তবে আমরা বলি, "সত্য কথা এই যে, কোন এক সংখ্যার উল্লেখে তদরিক্ত সংখ্যার নিষেধ প্রমাণ হইতে পারে না।"

তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড, ৩৭৪ পৃঃ।

সাধারণ মুসলমানগণ যেমন বিশ্বাস করেন, সপ্ত 'সমাওয়াত' বা সাত আসমানের কোনটি স্বর্ণ নির্ম্মিত, কোনটি রৌপ্য নির্ম্মিত, কোনটি বা হীরক নির্ম্মিত ইত্যাদি, ইহার স্বপক্ষে কোরআনে কোন প্রমাণ নাই। এবং আমার বিশ্বাস তাহারা প্রামাণ্য (সহি) হাদীস হইতেও কোন দলিল আনিতে পারেন না।

কোরআন শরীফে 'সমা' (এক বচন) এবং 'সমাওয়াত' (বহু বচন) কয়েকটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা :—

(১) নীল আকাশ।

الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء ص

যিনি তোমাদের নিমিত্ত পৃথিবীকে শয্যা এবং আকাশকে (সমা) ছাদ করিয়াছেন।

(সুরা বকর,)

(২) ঊর্দ্ধদেশ, যথা :—

خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك ط

তোমার প্রতিপালকের (অন্য প্রকার) ইচ্ছা হওয়া ব্যতীত যে পর্য্যন্ত উর্দ্ধদেশ (সমাওয়াত) ও অধোদেশের (আরজ) স্থিতি সে পর্য্যন্ত তাহারা তথায় নিত্য স্থায়ী।

(সুরা হুদ, ৯ র, ১০৮ আয়াত)

(৩) মেঘ, যথা :—

يرسل السماء عليكم مدرارا

তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বর্ষণকারী মেঘ (সমা) প্রেরণ করিবেন।

(সুরা নূহ, ১ র, ১১ আয়াত)

(৪) আধ্যাত্মিক জগৎ, যথা :—

لا تفتح لهم ابواب السماء و لا يدخلون الجنة

তাহাদের জন্য আধ্যাত্মিক জগতের (সমা) দ্বার সমূহ উন্মুক্ত হইবে না এবং তাহারা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না। (সুরা এরাফ, ৫র, ৪২ আয়াত)

(৫) উর্দ্ধ জগৎ, যথা :—

وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام

এবং তিনিই যিনি উর্দ্ধ জগৎ সমূহকে ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন।

(সুরা হুদ, ১র, ৭ আয়াত)

সমাওয়াত শব্দ সমা শব্দের বহু বচন। যখন সামাওয়াত শব্দ সপ্ত (سبع) শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার অর্থ (যেমন পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে) সূর্য্যাদি সপ্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল। যখন সামাওয়াত শব্দ সপ্ত শব্দের সহিত প্রযুক্ত না হইয়া পৃথকরূপে ব্যবহৃত হয়, কিংবা একবচনে সমা ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার অর্থ উর্দ্ধ জগৎ সমূহ বা উর্দ্ধদেশ কিংবা আধ্যাত্মিক জগৎ। উর্দ্ধ জগৎ অর্থে কোরআনে পৃথিবী ভিন্ন সমুদয় স্থানকে (p'ace) লক্ষ্য করা হইয়াছে। শূন্যকে (space কোরআনে (و ما بينهما) (যাহা উভয়ের অর্থাৎ পৃথিবী ও উর্দ্ধ জগৎ সমূহের মধ্যে আছে) বলা হইয়াছে যথা :—

و لقد خلقنا السموات والارض و ما بينهما فى ستة ايام

এবং নিশ্চয় আমি উর্দ্ধ জগৎ সমূহ এবং পৃথিবী এবং যাহা উভয়ের মধ্যে আছে, ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি। (সুরা কাফ, র, আয়াত)

কোরআন শরীফ কখন বলেন না যে, পৃথিবী মৎস্যের পৃষ্ঠে বা গরুর শৃঙ্গে অবস্থিত। কোন কোন ভাষ্যকার ن والقلم (সুরা কলম)

এই আয়াতের আরম্ভস্থিত ن অক্ষরের ব্যাখ্যায় বলেন ن অর্থাৎ نون মৎস্য, সেই মৎস্য যাহার উপর পৃথিবী অবস্থিত। তাঁহারা এই মতের সপক্ষে যে হাদীস উদ্ধৃত করেন, এমাম

বগুজী هوزی তাহার অপ্রামাণিকত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। বরং কোরআনের ভাষা ভঙ্গীতে পৃথিবীর শূন্যে অবস্থান প্রতীয়মান হয়। (সুরা হা'মীম সিজদার রু১.)

و جعل فیها رواسی من فوقها

"এবং তিনি তাহাতে (পৃথিবীতে) তাহার উপর হইতে পর্ব্বত স্থাপন করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এমাম রাজী বলিতেছেন :—

قالوا لانه تعالى لو جعل فيها رواسي من تحتها لاوهم ذلك ان تلك الاساطين التحتانية هي التي امسكت هذه الارض الثقيلة عن النزول ولكنه تعالى قال خلقت هذه الجبال الثقال فوق الارض ليرى الانسان بعينه ان الارض والجبال اثقال على اثقال و كلها مفتقرة الى ممسك و حافظ و ما ذاك الحافظ والمدبر الا الله سبحانه تعالى (تفسير كبير و جلد هفتم صفحه ٣٥٣)

আমরা বলি যেহেতু যদি মহান্‌ আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে তাহার নিম্ন হইতে পর্ব্বত স্থাপন করিতেন (অর্থাৎ যদি কোরআনে (من فوقها) না বলিয়া (من تحتها) বলা হইত) তবে এই প্রকার অনুমান হইত যে ইহারা নিম্নস্থিত স্তম্ভ সমূহ, যাহারা এই গুরু পৃথিবীকে অধোগমন হইতে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তিনি বলিলেন "এই গুরু পর্ব্বত সমূহকে পৃথিবীর উপর সৃষ্টি করিয়াছি" এ জন্য যেন মনুষ্য স্বচক্ষে দেখে যে পৃথিবী ও পর্ব্বত সমূহ এক গুরু ভার অন্য গুরু ভারের উপর অবস্থিত এবং উভয়ে এক অবরোধকারী ও রক্ষাকারীর উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই কার্য্য সম্পাদক এবং রক্ষাকারী পবিত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কে?

পৃথিবীর পরিভ্রমণশীলতার বিষয় কোরআন শরীফে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

১। و کل فی فلک یسبحون ۝

এবং আকাশস্থিত সমুদয়ই চলিতেছে। (সুরা ইয়াসীন রু৩, আয়াত ৪০)

২। الم نجعل الارض مهادا ۝

আমি কি পৃথিবীকে দোলনা করি নাই ? (সুরা নবা, রু১, আয়াত)

সাধারণ চক্ষে পৃথিবীকে স্থির বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবী অতি দ্রুতভাবে স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। কোরআন বলিতেছেন :—

৩। و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب ۝

এবং তুমি পর্ব্বত সকলকে দেখিতেছ, তাহাদিগকে স্থির মনে করিতেছ, বস্তুতঃ তাহারা জলদ-গতিতে গমন করিতেছে। (সুরা নমল, রু৭, আয়াত ৮৮)

কেহ কেহ এই আয়াত দ্বারা পর্ব্বত সমূহ যে প্রলয়কালে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যাইবে এইরূপ বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উক্ত প্রকার ব্যাখ্যার কয়েকটি প্রমাদ লক্ষিত হইতেছে। যথা—

و تکون الجبال کالعهن المنفوش

(১) "এবং পর্ব্বত সমূহ ধুনিত উর্ণার ন্যায় হইয়া যাইবে"। (সুরা কারিয়া) এই আয়াত এবং অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রলয়কালে বাস্তবিক পর্ব্বত সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন (تحسبها جامدة) "তাহাদিগকে স্থির মনে করিতেছ" এই বিশেষণ প্রলয়কালীন পর্ব্বত সমূহের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। (২) প্রলয়কালে কেহ জীবিত থাকিবে না। সুতরাং ترى "তুমি দেখিতেছ" ইহা প্রয়োগ উপযুক্ত হয় না। (৩) এই আয়াত প্রলয়কালীন পর্ব্বতের প্রতি প্রযুক্ত হইলে ইহার শেষ ভাগ

صنع الله الذى اتقن كل شئ ط

"সেই আল্লারই সৃষ্টি কৌশল যিনি প্রত্যেক পদার্থকে দৃঢ় করিয়াছেন" এই অংশ পূর্ব্বাংশের* (পূর্ব্বোক্ত আয়াতের) সহিত খাপ খায় না। এই সকল কারণে আমার মনে হয়, উক্ত আয়াত প্রলয়কাল সম্বন্ধীয় নহে, বরং তাহা সাধারণভাবে বর্ত্তমান ঘটনা বিবৃত করিতেছে।

والله اعلم بالصواب

সূর্য্য যে এই সপ্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের দীপ স্বরূপ হইয়া গ্রহ উপগ্রহবর্গকে আলোকিত করিতেছে, কোরআনে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা :—

و بنينا فوقكم سبعا شدادا ۙ و جعلنا سراجا و هاجا س

এবং আমি তোমাদের উপরে সপ্ত কঠিনকে নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং উজ্জ্বল দীপ সৃষ্টি করিয়াছি। (সুরা নবা, ২র,)

الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طبقا لا و جعل القمر فيهن نورا
و جعل الشمس سراجا ۝

তোমরা কি দেখ নাই কিপ্রকারে আল্লাহ্ সপ্ত 'সামাওয়াতকে' উপরি উপরি রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে চন্দ্রকে জ্যোতিঃ ও সূর্য্যকে দীপ করিয়াছেন। (সুরা নূহ)

চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী হইয়া থাকে। ইহাও কোরআন হইতে সপ্রমাণিত হয়। *

والقمر قدرنه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ۝

এবং চন্দ্রের জন্য অবস্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত না প্রচীন খর্জ্জুর শাখার ন্যায় (বক্র ও ক্ষীণ) পরিণত হয়। (সুরা ইয়াসীন, ৩ র,)

এই আয়াতে চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ سبب বর্ণন করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত আয়াতে কয়েকটি উদ্দেশ্য حكمت বর্ণিত হইয়াছে :—

* সূর্য্যের আলোকেই যে চন্দ্রের দীপ্তি সে কথাও এখানে বলা হইয়াছে। সূর্যকে 'সেরাজ' বলা হইয়াছে, উহার অর্থ দীপ্তি প্রদানকারী।

৫

يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج ط

তাহারা তোমাকে নবীন চন্দ্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। বল তাহা মনুষ্যের সময় নির্দ্ধারণ জন্য। (সুরা বকরা, ২৪রু, ১৮৯ আয়াত)

কোরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতে উল্কাপাতের একটি উদ্দেশ্য বর্ণন করা হইয়াছে মাত্র —

و حفظنها من كل شيطن رجيم ۞ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ۞

এবং আমি সমুদয় বিতাড়িত শয়তান হইতে তাহাকে (সামাকে) রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু যে লুকাইয়া শ্রবণ করে, অনন্তর উজ্জল উল্কাপিণ্ড তাহার অনুসরণ করে।

(সুরা হেযর, ২র, ১৭, ১৮, আয়াত)

এখানে উল্কাপাতের কারণের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। বিজ্ঞান যে কোন কারণ দর্শাইবে, কোরআন তাহার সহিত ঝগড়া করিতে যাইবে না। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মাদের জন্মের পূর্ব্বে 'জিন'গণ আসমানে যাইত, পরে তাহাদের ঊর্দ্ধদেশে গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে তাহারা উপরে যাইতে গেলে ফেরাশ্‌তাগণ তাহাদিগকে উল্কাপিণ্ড দ্বারা দূরীভূত করে, এই হাস্যজনক উপকথার জন্য পবিত্র কোরআন দায়ী নহে।

১৭৬৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ হালী (Halley) কয়েকটি তারার (star) দৃশ্যমান প্রাত্যাহিক পশ্চিমাভিমুখীন গতি ভিন্ন তাহাদের নিজস্ব গতি (proper motion) আছে বলিয়া স্থির করেন। তাঁহার পরে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সাবধানপর্য্যবেক্ষণের ফলে অনেকগুলি নক্ষত্রের নিজস্ব গতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নক্ষত্র সমূহের নিজস্ব গতির বিষয় আলোচনা করিয়া ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে সার উইলিয়ম হার্শেল (Sir W. Herschel) নিশ্চয় করেন যে সমস্ত সৌরজগৎ শায়া হারকুইলিস (Hercu is) নামক নক্ষত্রের অভিমুখে চলিতেছে। হার্শেলের পরে অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদগণ স্বাধীনভাবে সৌর জগতের গতি পথ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের ফলে সাধারণতঃ ঐক্য দেখা যায়। মেএদলার (Madler) নামক জর্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদ্‌ অনুমান করেন যে, সূর্য্য তাহার সোপগ্রহ, গ্রহাবলী ও ধূমকেতুপুঞ্জ লইয়া কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জস্থিত আলকুওন (Alcyone) নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়া বহু লক্ষ বৎসর ব্যাপী কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হইয়াছে—

والشمس تجرى لمستقر لها ط ذلك تقدير العزيز العليم ۞

এবং সূর্য্য তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য চলিতে থাকে। ইহা পরাক্রান্ত জ্ঞানময়ের বিধান।

(সুরা য়াসীন, ৩র, ৩৮ আয়াত)

অপিচ

و كل فى فلك يسبحون

এবং আকাশে সমুদয় চলিতেছে। (ঐ, ৪০ আয়াত)

এই আয়াতগুলিতে সূর্য্যের দৃশ্যমান্ গতি বুঝাইলেও তাহারা যে পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেও লক্ষ্য করে নাই তাহা কে বলিবে? কোরআন শরীফ স্বয়ং কি বলে নাই?—

و لا رطب و لا یابس الا فی کتب مبین ◎

এবং এমন কোন সরস ও বিশুষ্ক বিষয় নাই যাহা বর্ণনকারী গ্রন্থে নাই।

(সূরা আন'আম, ৭র, ৫৯ আয়াত)

অপিচ

و لا اصغر من ذلک و لا اکبر الا فی کتب مبین ◎

এবং ইহা (অণু) অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর এমন কিছুই নাই যাহা বর্ণনকারী গ্রন্থে নাই।

(সূরা য়ূনুস, ৭র, ৬১ আয়াত)

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

মোসলেম নারীর শিক্ষা-নৈপুণ্য।*

পূর্ব্বকালে মুসলমানগণ যে, শিক্ষার অত্যুচ্চ গিরি শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, পৃথিবীর সভ্য জাতি সমূহের নিকট অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য।

পুরুষগণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল শিক্ষিতা নারীবৃন্দের জীবন কাহিনী আলোচনা করিলে, আমরাই যে শিক্ষাক্ষেত্রে এককালে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলাম তাহা প্রমাণিত হয়। অনেক মুসলমান নারী, কোরআন, হাদিস, ফেকাহ্, ইতিহাস এবং গণিতশাস্ত্রে যে, অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠকগণ তাহা বেশ অবগত আছেন।

বলা বাহুল্য যে, ঐ শ্রেণীর শিক্ষিতা নারীবৃন্দের মধ্যে অনেকেই মুসলমান সমাজের প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ অনেক মুসলমানআলেমের শিক্ষাদাত্রীরূপে পরিচিতা। মোস্লেম শিক্ষাকাশের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র সুবিখ্যাত আল্লামা, এমাম সিউতি (امام سیوطی) মহোদয়ও একজন উচ্চ শিক্ষিতা মুসমমান মহিলার সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে।

আজ আমরা একজন মুসলমান মহিলার অভূতপূর্ব্ব শিক্ষা নৈপুণ্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, আল-এস্লামের শিক্ষানুরাগী পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দানে কৃত সংকল্প হইয়াছি। এই মহিলা-রত্ন মহাত্মা আবদুল্লা বেন্ মোবারকের সহিত কথোপকথন কালে যেরূপ গুণপনা ও শিক্ষা নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বর্ত্তমান কালে তাহার দৃষ্টান্ত অতীব দুর্লভ।

* "আল্-লুলুও-ওয়াল্ মারজান" নামক গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত

আবদুল্লা বেন্‌ মোবারেক মোসলেম জগতের অন্যতম সুবিখ্যাত মহাদ্দেস্‌ (হাদিসবেত্তা) ও অসাধারণ জ্ঞান গরিমা ভূষিত সুপণ্ডিত। তিনি হজরত এমাম আবু হানিফা (রঃ)র সমকালীয় লোক এবং হজরত এমাম মালেকের শিষ্য। তিনি বলিয়াছেন, একদা তিনি পবিত্র ধাম মক্কা শরীফের হজ্জ ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক স্বকীয় উষ্ট্রারোহণে একাকী পুণ্যভূমি মদিনা শরিফের উদ্দেশ্যে গমন করিতে ছিলেন। পথিপার্শ্বে জনৈকা বৃদ্ধা মহিলাকে একাকিনী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, আবদুল্লা বেন্‌ মোবারেক তাঁহাকে "সালাম" করিলেন।

বৃদ্ধা তদুত্তরে কোরআনের 'সুরা ইয়াসিনের' নিম্নলিখিত আয়েৎ পাঠ করিলেন —

سلام قولا من رب الرحيم -

অর্থাৎ "দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হইতে "সালাম" কথিত হইতেছে।" আবদুল্লা বেন্‌ মোবারক বৃদ্ধার মুখে কোরআন শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখানে একাকিনী বসিয়া আছেন কেন?

বৃদ্ধা— 'সুরা মোমেনের' নিম্নলিখিত আয়েৎ পাঠ করিয়া উত্তর দিলেন।—

و من يضلل الله فماله من هاد -

অর্থাৎ "খোদাতালা যাহার পথ ভুলাইয়া দেন, তাহাকে কেহ পথ প্রদর্শন করিতে পারে না"। আবদুল্লা তাহাতে বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধা পথ হারাইয়াছেন। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কোথায় যাইবেন?

বৃদ্ধা— 'সুরা বানিএস্রাইলের' নিম্নলিখিত আয়েৎ পাঠ করিয়া উত্তর দিলেন।

سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى -

অর্থাৎ "সেই খোদায়েতাআলা অতিশয় পবিত্র, যিনি একই রাত্রে আপন দাসকে মক্কা হইতে জেরুজালেম পর্য্যন্ত ভ্রমণ করাইয়াছেন" ইহাদ্বারা মহাত্মা আবদুল্লা বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধা হজ্জ ক্রিয়া সমাধা করিয়া এখন জেরুজালেমে যাইবেন। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখানে কয় দিন যাবৎ রহিয়াছেন?

বৃদ্ধা— 'সুরা মরিয়মের' নিম্নলিখিত আয়েৎ পড়িয়া উত্তর দিলেন।—

ثلاث ليال سويا

অর্থাৎ "তিন রজনী পূর্ণ হইয়াছে।" তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পানাহারের সুবিধা কি?

বৃদ্ধা— উত্তরার্থে 'সুরা শোয়ারা' নিম্নলিখিত আয়েৎ পাঠ করিলেন।—

هو يطعمنى و يسقين

অর্থাৎ "সেই খোদা (ই) আমাকে পানাহার করান।" তৎ পর আবদুল্লা বলিলেন, আমার সঙ্গে খাবার আছে, খাইবেন কি?

বৃদ্ধা— উত্তরে কোরআনের 'সুরা বাকারের' নিম্নলিখিত আয়েৎ পাঠ করিলেন।—

ثم اتموا الصيام الى الليل

অর্থাৎ "রজনী পর্য্যন্ত রোজাকে সমাধা কর"। আবদুল্লা ইহাতে বুঝিলেন যে, বৃদ্ধা রোজাদার কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিলেন, ইহাত রম্‌জানের মাস নয়!

বৃদ্ধা— সুরা বাকারের নিম্নলিখিত দুইটী আয়েত পর, পর পড়িয়া উত্তর দিলেন।—

و من تطوع خيرا فهو خير له

অর্থাৎ যে কেহ নফল রোজা রাখে তাহা, তাহারই মঙ্গলার্থে এবং

و ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون

অর্থাৎ "যদ্যপি রোজা রাখ তাহা তোমারই মঙ্গলার্থে যদি তাহা জান"।

মহাত্মা আবদুল্লা, বৃদ্ধার অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে, বিমোহিত হইলেন, এবং পবিত্র কোরআন মজিদে তাঁহার অসাধারণ অধিকার দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। এবং বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কোরআনের আয়েৎ ছাড়িয়া দিয়া সাধারণভাবে কথোপকথন করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

বৃদ্ধা— সুরা মোজাম্মেলের নিম্নলিখিত আয়েৎটী পাঠ করিয়া উত্তর দিলেন।—

فاقرؤا ما تيسر من القران

অর্থাৎ "কোরআনের যাহা সহজ, তাহাই পাঠ কর।" আবদুল্লা বুঝিলেন যে, কোরআন ছাড়া উক্ত মহিলার কথা বলিবার অভ্যাস নাই। যখন প্রয়োজন হয় তখন তিনি কোরআনের ঐ মর্ম্মের যে কোন একটী আয়েৎ পাঠ করিয়াই আপনার বক্তব্য শেষ করেন। তিনি কৌতুহল পরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন্ বংশীয়া?

বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত— সুরা বানিএস্রাইলের নিম্নলিখিত আয়েৎ পড়িয়া উত্তর দিলেন।—

و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا

অর্থাৎ "অজ্ঞানতাপূর্ণ বাক্যের পশ্চাদ্ধাবন করিও না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং মন ইহাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাস্য আছে।" আবদুল্লা বুঝিলেন যে, বৃদ্ধা পরিচয় প্রদানে অসম্মত। সুতরাং তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধা সুরা ইউসোফের নিম্নলিখিত আয়েৎ পড়িয়া উত্তর দিলেন।—

يغفر الله لكم

অর্থাৎ "আল্লাহতালা, আপনাকে ক্ষমা করুন"। অতঃপর আবদুল্লা বৃদ্ধাকে বলিলেন,

আপনাকে আমি নিজের উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া অবিলম্বে আপনার সহযাত্রীদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে ইচ্ছুক, আপনি ইহাতে সম্মত আছেন কি ?

বৃদ্ধা— সুরা বাকারের নিম্নলিখিত আয়েৎ পাঠ করিয়া উত্তর দিলেন।—

و ما تفعلوا من خير يعلمه الله

অর্থাৎ "সদ্ভাবে যাহা করিবে, খোদা তাহা জানেন"। আবদুল্লা, বৃদ্ধার সম্মতি বুঝিয়া আপনার উষ্ট্র সজ্জিত করিলেন। এবং বৃদ্ধাকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, বৃদ্ধা তখন 'সুরা নূরের' নিম্নলিখিত আয়েৎটী পাঠ করিলেন।—

قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم

অর্থাৎ "তুমি (হে মোহাম্মদ! সঃ) বিশ্বাসীদিগকে বল যে, তাহারা আপনার দৃষ্টি নত করুক"। আবদুল্লা বেন্ মোবারক বৃদ্ধার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বৃদ্ধা সলজ্জ অথচ সন্ত্রস্তে উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক খোদাতাআলাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

এদিকে আবদুল্লা দ্রুত গতিতে উষ্ট্র চালাইয়া বহু শ্রমে পর দিবস যাত্রীদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং বৃদ্ধাকে বলিলেন, ঐই যাত্রীদলে আপনার কেহ আছে কি ?

বৃদ্ধা— 'সুরা কাহাফের নিম্নলিখিত আয়েৎ পাঠ করিয়া ইহার উত্তর প্রদান করিলেন।—

المال والبنون زينة الحيوة الدنيا

অর্থাৎ "সম্পদ এবং সন্তানগণ পার্থিব-জীবনের সৌন্দর্য্য বিশেষ"। ইহাতে আবদুল্লা বেশ বুঝিলেন যে, যাত্রীদলে বৃদ্ধার সন্তানগণ আছে। সুতরাং তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার ছেলেরা কি কাজ করে ?

বৃদ্ধা— তদুত্তরে 'সুরা নাহলের' নিম্নলিখিত আয়েৎ পাঠ করিলেন।

و بالنجم هم يهتدون

অর্থাৎ "নক্ষত্র সাহায্যে উহারা পথ প্রদর্শিত হয়"। আবদুল্লা তাহাতে বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধার পুত্রগণ এই যাত্রীদলে পথ প্রদর্শকের কাজ করে। কাজেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাদের নাম কি ?

বৃদ্ধা— উত্তরচ্ছলে যথাক্রমে 'সুরা নেসার' দুইটী এবং 'সুরা মরিয়মের' একটী আয়েৎ পাঠ করিলেন, যথা—و اتخذ الله ابراهيم خليلا ও و كلم الله موسى تكليما এবং يا يحيى خذ الكتاب بقوة উল্লেখিত আয়েৎত্রয়ের মর্ম্মে, মহাত্মা আবদুল্লা বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধার তিনটী পুত্র আছে। উহারা যথাক্রাম এব্‌রাহিম, মুসা এবং য়্যাহ্‌য়্যা নামে অভিহিত। সুতরাং তিনি ঐ ঐ নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকারের ফলে, তিনটী যুবক তাঁহার সন্নিধানে

উপস্থিত হইয়া, তাহাদের আহূত হইবার কারণ জিজ্ঞাসু হইল। আবদুল্লা সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। যুবকগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আপনাদের বৃদ্ধা জননীকে সসম্মানে অবতারণ পূর্ব্বক শিবিরে লইয়া গেল।

বৃদ্ধা— ছেলেদের উদ্দেশ্যে সুরা কাহাফের নিম্নলিখিত আয়েৎটী পাঠ করিলেন।—

فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه

অর্থাৎ "তোমাদের কাহাকে বাজারে পাঠাইয়া দাও এবং তাহার পক্ষে উচিত যে, সে যেন খাদ্যাদি হইতে যাহা ভাল, তাহাই লইয়া আসে" জননীর আদেশ প্রতিপালিত হইল। বাজার হইতে উৎকৃষ্টতর খাদ্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া উপকারী অভ্যাগতের সম্মুখে স্থাপন করিল। বৃদ্ধা উপকারীর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত আয়েৎ পাঠ করিলেন।—

كلوا و اشربوا هنيئا بما اسلفتم فى الايام الخالية

অর্থাৎ "আপনি আমার সহিত গত কালে যেমন ভদ্রব্যবহার করিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তে আজ পরিতৃপ্তির সহিত পানাহার করুন।" আবদুল্লা পানাহার করিলেন এবং ছেলেদের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, তাহাদের মাতা ইহার ৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে কেবলই কোরআনের সাহায্যে কথোপকথন করিয়া থাকেন। ধন্য মুসলমান মহিলার প্রতিভা—ধন্য তাহার ধর্ম্মানুরাগ ও শিক্ষানিপুণতা! মোসলেম-জগতে এরূপ অমূল্য নিধির আশু অভাব হইলেও তাহাদের প্রাচীন কাহিনীতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

খোন্দকার আহ্‌মদ আলী, আকালুবী।

বীর

তেরশ' বছর আগে একদিন
আরবের জনহীন প্রান্তরে
বৃক্ষের ছায়ায় পথিক জনৈক
আসিয়াছিল শ্রান্তিদূর তরে।
মাথার উপর শাখার সহিত
রে'খেদিল কৃপাণ্‌খানা ঝুলা'য়ে
ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছের ছায়ায়
ক্লান্ত পথিক পড়্‌ল ঘুমায়ে।
কিছুদূর হতে দেখ্‌ল যখন
তাহারে সেথায় সুপ্ত একেলা,
রকত-পিপাসী শক্রর পরাণ
আনন্দে করিয়া উঠিল খেলা।
ভাবিল "এবার পেয়েছি সুযোগ
কাজ নাই মিছে করিয়া দেরী,
মোহাম্মদের কর্ম্ম এ'বার দিব
চিরদিনের তরে সাঙ্গ করি'।"
অতি তাড়াতাড়ি যেয়ে' সে সেথায়
তরবারি নিল আপন হাতে,
ঠিক্ সে সময় উঠিয়া বসিল
বিনিদ্রিত নবী ভূশয্যা হ'তে।
জিজ্ঞাসা করিল সেই যে দুষ্মন,
সুবিধা পাইয়া কঠোর স্বরে,
"বল বল, এইবার মোহাম্মদ
কে তোমারে আর রক্ষা করে?"

নিরস্ত্র যদিও নির্ভীক, অচল,
নবী বলিল দৃঢ়তর স্বরে
"করিবে সে রক্ষা যে জন সৃজন
করিছে আমায় অবনী'পরে।"
শুনিয়া শক্রর দুর্ব্বল হৃদয়,
ভয়ে, অতিভয়ে কম্পিত হ'ল,
কাঁপিয়া উঠিল সর্ব্বাঙ্গ তাহার
হাতের অস্ত্র খসিয়া প'ল।
নিরভিক বীর তুলিয়া লইল
ভূপতিত অস্ত্র আপন করে,—
জিজ্ঞাসা করিল শক্রকে আপন,
কে তখন আর বাঁচাবে তারে?
বিকম্পিত স্বরে বলিল পামর
"নাই কোন'জন বাঁচাতে মোরে।"
সহর্ষে রসুল বলিল তখন
"যা' আমি ছাড়িয়া দিলাম তোরে।
মানবে মানব-অতীত আচার
আঘাত করিল হৃদয়ে তার,
মি'টে গেল ভুল, ঘুচিল আঁধার
খু'লে গেল তার হৃদয় দ্বার।
সে আসিয়াছিল বধিতে রসুলে,
ভক্ত অনুগামী হইল তার,
বিলাইয়া দিল আপন শকতি
যা' ছিল সব নামেতে আল্লার।

মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ।

এসলামে নারীর সম্মান।

"হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদিগকে একজন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহা হইতে তাহার পত্নীকে উদ্ভূত করিয়াছেন এবং এই যুগল (দম্পতি) হইতে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। আর (হে মানবজাতি!) তোমরা আল্লাকে ভয় কর, যাঁহার নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হও; এবং (হে মানবজাতি! তোমরা) নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, যাহারা তোমাদিগকে (গর্ভে) ধারণ করিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লা তোমাদিগকে দেখিতেছেন।" (কোরআন্ ৪—১)।

"ত্রিদিব জননীর চরণতলে অবস্থান করিতেছে।" হজরত মোহাম্মাদ (দঃ)।

কোরআন্ হইতে জানা যায় যে ফেরাউন-জায়া বিবি মরিয়ম, হজরত এবরাহিমের প্রিয়পত্নী বিবি হাজেরা, হজরত মুসার জননী এবং হজরত জাকারিয়ার প্রিয়তম সহধর্ম্মিনী আল্লার দিদার বা নৈকট্য লাভ করিতেন এবং ঐশী বার্ত্তা প্রাপ্ত হইতেন"। এইরূপে কোরআন্ নারী-জাতির স্থান সম্মানের উচ্চতম শিখরে উন্নীত করিয়াছে। ইহার আশ্চর্য্যরূপ বৈপরীত্যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম স্ত্রীজাতির নিমিত্ত এক অতি নিম্নস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং তাঁহাদিগকেই ভূমণ্ডলে পাপ প্রবর্ত্তনের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে।

খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস—আগু পাপ নারীই করিয়াছে। সেই পাপের প্রভাব এত দূরগামী (Far reaching) যে, কোনো প্রকার নৈতিক উন্নতিই মানবজাতিকে অবনতি-গহ্বর হইতে উত্তোলন করিতে পারে না, সহস্র অনুতাপও ক্ষমা অর্জ্জন করিতে পারে না এবং সহস্র অনুনয় বিনয়ও—যে আল্লাকে অনন্ত করুণার পুণ্য প্রস্রবণ বলা হইয়া থাকে—সেই আল্লাকে বিচলিত করিতে পারে না। বাইবেল হইতে এই বিশ্বাসের সমর্থনে বহু পদ উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

নারীর এই পাপের জন্য স্বয়ং সদাপ্রভুকে অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাঁহার স্বীয় নিষ্ঠুর ক্রোধ প্রশমনের জন্য এক উপায় স্থির করিতে হইয়াছিল। তিনি ব্যবস্থা করিলেন—এই পাপের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গের জন্য তাঁহার এক "পুত্র"—"একমাত্র পুত্র" জন্মিবে। তাহাও আবার স্ত্রীলোক হইতে। কারণ একটী স্ত্রীলোকই আদমকে পাপকার্য্যে লিপ্ত করিয়া-ছিল—যাহার জন্য প্রেমময় স্বর্গস্থ পিতাকে কতকগুলি ইহুদীর নিকট স্বীয় পুত্রকে অবমানিত এবং ক্রুশবিদ্ধ (Crucified) হইতে দিতে হইয়াছিল। নারীর জন্য কেবল নারী নহে পরন্তু পুরুষকেও পাপী বলিয়া অভিশপ্ত হইতে হইল এবং তজ্জন্য একজন পবিত্র নিরপরাধ পুরুষকে উৎসর্গ করিতে হইল। ইহাই নারীত্বের "খ্রীষ্টানী" ধারণা।

হজরত মোহাম্মাদ (দঃ) যীশুর পরে আসিয়া দুর্নীতিমূলক প্রায়শ্চিত্তবাদের ধ্বংস সাধন পূর্ব্বক নারীচরিত্র আবর্জ্জনাবিহীন করেন। কোরআন্ ঘোষণা করিতেছে—"নারী তোমাদের অঙ্গাবরণ।" এতদপেক্ষা সুন্দরতর উপমা আর কিছুই হইতে পারে না। নারী আমাদের

দোষাচ্ছাদন করে—নারী আমাদিগকে পাপপ্রলোভন হইতে নিবৃত্ত করে—নারী আমাদের গৃহ সুষমাময় করিয়া তুলে এবং নারীই মনুষ্যরূপী পশুকে স্বর্গীয় দুতে পরিণত করে। কোরআনের মতে, নারী পাপের প্রতিকূলে কবচ—শয়তানের নিকট অনধিগম্য দৃঢ় দুর্গপ্রাকার এবং পুণ্য ও আত্মসংযমের পক্ষে আলোকগৃহ। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন—পুণ্যাত্মা পত্নী "মানবের পক্ষে অমূল্য রত্ন"। খ্রীষ্টানদের মতে নারী যে কেবল নিজে জন্মগতভাবে পাপী এমন নহে, পরন্তু মানবকে পাপী করিবার কারণভূত। আর মুসলমানের মতে নারী পাপের বিরুদ্ধে কবচ স্বরূপ।

মুসলমানের বাইবেল কোরআন্—যাহা আল্লার শেষ বাণী এবং যাহা অদ্যাপি বিশুদ্ধ এবং অবিকৃত বলিয়া স্বীকৃত—নারীজাতির অধিকার আলোচনায় একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় (সুরা নেসা) নিয়োগ করিয়াছে। কোরআন্ নারীর ঐহিক অধিকার হইতে পারত্রিকঅধিকার কিছু কম দেয় নাই। "মাতাপিতা অথবা আত্মীয়জন-পরিত্যক্ত দ্রব্যের একাংশ পুরুষের প্রাপ্য এবং মাতা পিতা অথবা আত্মীয়জন পরিত্যক্ত দ্রব্যের একাংশ স্ত্রীজাতিরও প্রাপ্য, তাহা অল্প হউক আর অধিক হউক, তাহারা একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ পাউক।" (কোরআন্ ৪—৮) ইহাই আবার বিশেষ করিয়া প্রেরিত পুরুষ কহিয়াছেন—"স্ত্রীলোকগণের অধিকার পবিত্র। দেখিও যেন স্ত্রীলোকেরা তাহাদের অধিকারে রক্ষিতা হয়।" তিনি আরো পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন—পত্নীর প্রতি ব্যবহার সর্ব্বথা সদয় হওয়া উচিত। "তোমাদের মধ্যে যে পরিবারবর্গের সহিত সর্ব্বোত্তম ব্যবহার করিবে, সে-ই সর্ব্বোত্তম।" এই নিদেশের সহিত প্রত্যেক মুসলমান পরিচিত। প্রেরিত পুরুষ পর্ব্বতে উপদেশ দিবার সময় যে বলিয়াছিলেন—"হে মানব, তোমাদের অধিকার আছে; আর হে নারীজাতি, তোমাদের (ও) অধিকার আছে। হে ভর্তৃগণ, তোমরা তোমাদের ভার্য্যাকুলকে প্রেম কর এবং তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহকে সাক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ" তাহা কি আমরা বিস্মৃত হইয়াছি?

"ত্রিদিব জননীর চরণতলে।" ইহা, দুঃখের বিষয় যে, অপরিণত বয়স্কেরা বৃদ্ধ জনক জননীর সেবা না করিয়া স্বর্লোকসুখের অধিকারী হইতে পারেনা।" এই পুণ্য পূতবাণী কি মোসলেম কর্ণে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে না? এই নিদেশ সমূহ অনুরক্ত সন্তানগণ পুজিতা মোসলেম জননী-গণকে এক অদ্বিতীয় স্থানে উন্নীত করিয়াছে। এই ধর্ম্মাদেশ— যাহা স্বর্গকে নারীর পদতলে স্থাপন করিয়াছে—ভিন্ন অন্য কি তাঁহাদিগকে উচ্চতর অবস্থায় লইয়া যাইতে পারিত? আর সেই বিশ্বাস— যাহা তাঁহাদিগকে "ঈশ্বরের মূর্ত্তি"—(Image of God) কে পাপ কর্ম্মে প্ররোচিত করিয়া ত্রিদিব হইতে টানিয়া আনিবার জন্য দোষী করিয়াছে—ভিন্ন অন্য কি তাঁহাদিগের অবস্থা নিম্নতর করিতে পারে? হজরত মোহাম্মাদ (দঃ) মানবজাতিকে নারীর প্রতি সম্মান দেখাইতে শিখাইয়াছেন আর যীশুখ্রীষ্ট শিখাইয়াছেন—"তোমার ইচ্ছা তোমার ভর্ত্তার অনুগামিনী হউক। সে তোমার উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবে (He will rule over thee)"। "মানব স্ত্রীজাতির জন্য সৃষ্ট হয় নাই, পরন্তু স্ত্রীজাতি পুরুষের জন্য"।

যাহকে একজন প্রকৃত খৃষ্টান বলা হইয়া থাকে, সেই সেণ্ট্ পল্ (St. Paul) স্ত্রীজাতির স্থান শোচনীয়তরে পরিণত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— "সর্ব্বথা বিনয়ের সহিত নারী নীরবে শিখিয়া যাউক; কারণ আমি একজন নারীকে পুরুষের উপর অথবা কর্ত্তৃত্ব দিতে পারি না। নারী নীরব হউক।"

এমন কি সভ্যতালোক প্রাপ্ত যাজকেরা যেরূপ বিশ্বাস করেন, "ভিকার অব্ ক্র্যাণ্টকে" তাহা এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

(ক) মানুষের সৃষ্টিপুরোবর্ত্তিতা। আদম প্রথমে সৃষ্ট হন, তৎ পরে হাওয়া।
(খ) সৃষ্টিরীতি। মানুষ নারী হইতে নহে, কিন্তু নারী মানুষ হইতে।
(গ) সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মানুষ নারীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই, পরন্তু নারী মানুষের জন্য।
(ঘ) সৃষ্টির ফল। মানুষ ঐশী মহিমার প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু নারী মানবীয় মহিমার।
(ঙ) পতনে নারীর পুরোবর্ত্তিতা। আদম প্রতারিত হয় নাই,। নারী প্রতারিত হইয়া আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল।
(চ) উদ্বাহ-সম্বন্ধ। গির্জ্জা যেরূপ খ্রীষ্টের অধীন, ভার্য্যা তদ্রুপ ভর্ত্তার অধীনা।
(ছ) স্ত্রীপুরুষের প্রাধান্য। প্রত্যেক মানুষের নেতা যীশু; তদ্রুপ প্রত্যেক নারীর চালক পুরুষ।

প্রকৃত পক্ষে, যে ধর্ম্ম মহান্ ভাববাদী যীশুর প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে সেই ধর্ম্মে স্ত্রীজাতির স্থান যত নিম্নীকৃত এবং হীনতাব্যঞ্জক, এরূপ আর কোথাও নাই। হজরত মোহাম্মাদ (দঃ) কে পৃথিবীতে পদার্পণ পূর্ব্বক, যীশুর কলঙ্কস্বরূপ এই বিশ্বাসগুলি দূরীভূত করিতে হইয়াছিল। তিনি নারীজাতির স্থান উন্নত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং সামাজিক ও পারমার্থিক বিষয়ে স্ত্রী এবং পুরুষের সমান সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন।

"কিন্তু পুরুষ হউক, স্ত্রী হউক, যে-ই পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদন করে এবং বিশ্বাসী হয়, সে-ই ত্রিদিবের সুখময় জীবনে প্রবেশ করিবে।" কোরআন্।

"নিশ্চয়ই যে মানবগণ আত্মাকে আল্লায় সমর্পণ করিয়াছে, এবং যে রমণীগণ আত্মাকে আল্লায় সমর্পণ করিয়াছে; বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী স্ত্রী; ভক্ত মানব এবং ভক্ত অঙ্গনাকুল; সত্যবাদিগণ এবং সত্যবাদিনীগণ; ধৈর্য্যশীল পুরুষেরা এবং ধৈর্য্যশীলা ললনাগণ; বিনীত পুরুষেরা এবং বিনীতা স্ত্রীলোকেরা; যে সকল পুরুষ ভিক্ষা প্রদান করে এবং যে সকল নারী ভিক্ষা প্রদান করে; আল্লা তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং বমূহুল্য প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।" কোরআন্। *

মোহাম্মাদ ওয়াজেদ আলি।

* "Islamic Review and Muslim India" "ইসলামিক রিভিউ য়্যাণ্ড্ মোসলেম ইণ্ডিয়া" নামক পত্রে "The cause of women vindicated by Islam" "ইসলাম কর্ত্তৃক নারীজাতির পক্ষ সমর্থন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটী তাহারই বঙ্গানুবাদ। নবেম্বর, ১৯১৫।

এসলাম সম্বন্ধে খৃষ্টানের সাক্ষ্য।

"রিলিজিয়স্ সিষ্টেম অব্ দী ওয়ার্ল্ড" (Religious Systems of the World) নামক পুস্তকে সুপণ্ডিত ডাক্তার জি, ডবলিউ, লিট্নার, এল, এল, ডি; এম, এ; পি, এইচ, ডি; ডি, ও, এল; (G. W Leitner, L. L. D., M. A., PH. D., D. O. L. Etc.) মহোদয়, "মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম" (Muhammadanism) নামক প্রবন্ধে, এসলাম সম্বন্ধে যে সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সুহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম" সম্বন্ধে, অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে "কনষ্টান্টি-নোপলের" এক মসজিদের বিদ্যালয়ে, আমি প্রথম শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হই, এবং অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার সহিত তথায় পবিত্র কোরআনের কতিপয় অংশ আমি কণ্ঠস্থ করিতেও সমর্থ হই। তুরস্ক, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশবাসী মুসলমানদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত এক দিকে আমি সখ্যতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, অন্য দিকে আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতেও যথা সম্ভব চেষ্টার ক্রটী করি নাই, কারণ কোরআন ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য পুস্তকাদি আরবী ভাষাতেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং আরবী ভাষায় জ্ঞানলাভ না করিয়া এস্লাম অথবা মুসলমানদিগের সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা, এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পক্ষান্তরে এস্লাম এবং মুসলমানদিগের সহিত সখ্যতা স্থাপন ও তাহাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে না পারিলে, কেবল আরবী ভাষা শিক্ষায়, তাদৃশ ফল লাভের আশা সুদূর পরাহত। সহানুভূতি এমনই জিনিষ যে, তদ্দ্বারা জ্ঞান মার্জ্জিত হয় এবং তাহা জ্ঞানকে চরম উন্নীত করিয়া থাকে। কোন জাতির প্রতি সহানুভূতি বর্জ্জিত হইয়া তাহার ধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলে, সেই অন্তঃসার শূন্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কোন স্বার্থকতাই হইতে পারে না। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত, মুসলমান ও তাহাদের ধর্ম্মের সহিত কোনরূপ সহানুভূতি পোষণ করিতেন না, তাঁহারা এসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বড়ই অবিচার করিয়াছেন। *

"এসলাম" শব্দটী অত্যন্ত সুন্দর ও শ্রুতি মধুর। কিন্তু তাহাতে ইহুদী, খৃষ্টান ইত্যাদি যাবতীয় পয়গম্বরের ধর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে, এজন্য আমি আমার এই প্রবন্ধের "মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম" নামকরণ করিয়াছি। পূর্ব্বকার যাবতীয় পয়গম্বরের ধর্ম্মই "এসলাম" ছিল, এই

* সার উইলিয়ম মূর এসলাম সংক্রান্ত আলোচনায় যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি অনেকস্থলে অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইলেও বহু স্থানে যে তিনি ইচ্ছা করিয়াই ঐরূপ সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; ইহার কারণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা সহানুভূতির অভাব। —সম্পাদক।

হিসাবে ইহুদী এবং খৃষ্টানও মোসলমান। বিশেষতঃ হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কোন নূতন ধর্ম্মের প্রচার করেন নাই, বরং খোদার নির্দ্দিষ্ট যে ধর্ম্মের প্রচার ঈসা, (খৃষ্ট) ও মুসা করিয়াছিলেন, তিনি সেই ধর্ম্মেরই প্রচার করিয়াছেন। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, হেতু কি ? হেতু এই যে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মের মূল শিক্ষা ও সরল পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল এবং তাই সত্য ধর্ম্মের প্রচার ও পূর্ণতা সম্পাদনার্থ একজন পূর্ণ পয়গম্বর বা সংস্কারকের আবশ্যক হইয়াছিল। উল্লিখিত তিনজন পয়গম্বরের প্রত্যেকেরই শিক্ষা এই যে "খোদা-তাআলা এক, তাঁহার কেহই অংশী নাই, এবং তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন"। এই মূল শিক্ষায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না—বরং সকলেই তুল্য। বলা বাহুল্য যে, এমন এক সময় ছিল, যখন ইহুদী ও খৃষ্টানগণও আপনাদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকারী ছিল ; কিন্তু যখন তাহারা খোদার নির্দ্দেশিত সত্য ধর্ম্মকে মিথ্যার আবর্জ্জনা দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন ঐশীধর্ম্মের চিরন্তন নীতি অনুসারে শেষ একবার সম্পূর্ণরূপে ঐশী ধর্ম্মের পূর্ণতা সম্পাদনার্থ একজন পূর্ণ পয়গম্বর প্রেরণ করা আবশ্যক হইয়াছিল, তাই হজরত মোহাম্মদ (সঃ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সত্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, "কোরআন" হজরত মোহাম্মদের (সঃ) স্বরচিত গ্রন্থ, এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে, সে সকলই "তৌরাত" ও "ইঞ্জিল" (বাইবেল) ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে"। কিন্তু আমি বলি, পৃথিবীতে প্রত্যাদেশ (এল্‌হাম) বলিয়া যদি কোন জিনিষ থাকে এবং তার অস্তিত্ব যদি সম্ভবপর হয়, তবে পবিত্র কোরআনে তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে। অপিচ পবিত্র কোরআন যে স্বর্গীয় বাণী তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, এবং ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। নিষ্কাম, নিরাকাঙ্খ আত্মত্যাগ, এবং বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ও একনিষ্ঠ সাধনা, এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের পথের অন্তরায় স্বরূপ পর্ব্বত তুল্য বিঘ্নরাশিকে হেলায় উপেক্ষা করা, ও তাহা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিকূল বিপদরাশিকে খোদাতালার আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে সানন্দে গ্রহণ করা, এবং সমাজের দোষ দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা নির্ণয় করিয়া, যথাযথভাবে উপলব্ধি করতঃ তাহার সংস্কারার্থ একশেষ নির্ভুল চিন্তায় উপনীত হইয়া কার্য্যতঃ তাহাকে ফল ও পুষ্পে সুশোভিত করা—এই সকল গুণ যদি প্রেরিতত্বের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিদর্শনাবলীর মধ্যে পরিগণিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি সত্যান্তঃকরণের সহিত, নিতান্ত শিষ্ট ও শান্ত ভাবে এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, "হজরত মোহাম্মদ (সঃ) বাস্তবিকই আল্লার প্রেরিত সত্য পয়গম্বর ছিলেন, এবং আল্লার নিকট হইতে তাঁহার প্রতি যে, প্রত্যাদেশ (ওহি) অবতীর্ণ হইত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

হজরত এব্রাহিম যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, হজরত মোহাম্মদ যে সেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাহা তিনি বহুবার পরিষ্কাররূপে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে যে বিশ্বের হিত-চিন্তা উদ্বেলিত হইয়াছিল তাহা তৎ প্রচারিত ধর্ম্মনীতির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই দেদীপ্যমান।

এস্থলে, "মাত্র আরব দেশের জন্যই এসলাম প্রেরিত হইয়াছিল," এ কথা বলিলে নিতান্তই অন্যায় ও মিথ্যা বলা হইবে।—সমগ্র বিশ্বের পথ প্রদর্শন ও উদ্ধারের জন্যই যে এসলামের আবির্ভাব, তাহা পবিত্র কোরআনে পষ্কািররূপে উক্ত হইয়াছে। এবং এই এসলামেরই পুণ্য-ময়ী প্রভাবে জগতের নানা দেশের লক্ষ লক্ষ, মনুষ্যত্ববিহীন অসভ্য মানব, সভ্যতা ও উন্নতির চরম মার্গে বারোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং সত্য ও মনুষ্যত্ব যে কি তাহাও তাহারা বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। অসভ্যজাতীয় নব ধর্ম্ম-ভ্রাতাদিগের সহিত ঐসলামিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতঃ তাহাদিগকে নিজের অঙ্গের সহিত মিলাইয়া লওয়ার এই যে পবিত্রতম ও অতি উদারভাব, ইহা এসলামেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। অন্য কেহই এরূপ উন্নত, উদার আদর্শ স্থাপনে সমর্থ হন নাই, এ কথা বলা আদৌ অতি রঞ্জিত নহে।

বহু খৃষ্টান লেখক তাঁহাদের মজ্জাগত অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতাবশতঃ হজরৎ মোহাম্মদের (সঃ) প্রতি অমানুষোচিত ও অতিঘৃণ্য আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল আক্রমণের মূলে যে, অলীক মিথ্যা ব্যতীত সত্যের লেশ মাত্রও সংশ্লিষ্ট নাই, তাহা কিঞ্চিদালোচনার পরেই স্থিরীকৃত হয়। প্রত্যেক মুসলমানই অপনাপন ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ। এবং স্বাধীনভাবে স্ব স্ব মত প্রকাশের অধিকারী। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা প্রত্যেকেই মনে করে যে আমরা সকলেই তুল্য মুসলমান।

খৃষ্টানগণের পক্ষে যেরূপ পাদ্রী ব্যতীত উপাসনা আরাধনা ইত্যাদি ধর্ম্মকার্য্য করিবার অধিকার নাই, মুসলমানগণ তাহাদের মৌলবীগণের দ্বারে সেরূপ অভাবগ্রস্ত নয়। তাহারা প্রত্যেকেই মৌলবী মোল্লার মধ্যবর্ত্তিতা ও নেতৃত্ব ব্যতীত স্বাধীনভাবে নিখিল বিশ্বের অধিপতি খোদাতাআলার উপাসনা করিতে অধিকারী, এবং তাহাদের জন্য ইহাও আশুক নাই যে, নামাজের জন্য মস্‌জিদ না হইলে চলিবেনা, বরং উপাসনার সময় তাহারা যে যেখানেই উপস্থিত থাকুক না কেন সে সেই স্থানেই আল্লার নির্দ্দেশিত কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে পারে, খোদাতাআলাকে ডাকিতে পারে।

মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারক ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থাপক প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতগণের মধ্যে অহমিকতা স্থান পাওয়া ত দূরের কথা বরং যে কার্য্য বৈধ তাহার কোনটিই অবলম্বন করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। পূর্ব্বকার বহু মুসলমান মনীষী প্রভৃতি এমামগণ জুতা শেলাইয়ের কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

মুসলমানদিগের মধ্যে "পোপ" বা তদ্রূপ অন্য কোনরূপ পৌরোহিত্য প্রথার প্রভাব নাই।

পবিত্র কোরআনের এক স্থানে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে তিরস্কার করা হইয়াছে যে, "তুমি একজন ধনবানের কথা শুনিবার জন্য, একজন দরিদ্র অন্ধের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলে? এবং ইহাদ্বরা তাহার অন্তরে বেদনা প্রদান করিলে।" এস্থলে খৃষ্টানেরা যাহা বলিয়া থাকে, যদি তাহাই হইত, এবং বাস্তবিকই যদি তিনি সত্য পয়গম্বর না হইতেন ও পবিত্র

কোরআন যদি তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে এই আত্ম-নিগ্রহ ব্যঞ্জক শব্দ কি তাহাতে স্থান পাইতে পারিত? কথনই নয়।

নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত প্রভৃতি কার্য্য সমূহ পালন করা এবং অন্তরের বিশ্বাসের সহিত একেশ্বরবাদের মন্ত্র "লা এলাহা-ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ করা, মুসলমানের বাহ্য নিদর্শন। এবং এ সকল কার্য্য পালনের বিধি ব্যবস্থা ও নিয়মাদি তাহাদের বিভিন্ন ধর্ম্ম-পুস্তকে অতি পরিষ্কার ও বিশদরূপে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। এবং সমুদয় আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ সেই সকল পুস্তক দৃষ্টে, বরং "শেখুল্ এস্‌লামের" উক্তি অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানের নিকটে শিখিতে পারা যায়। এস্থলে কোন খৃষ্টান পাদ্রী,—তাহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নির্দ্দেশিত অবশ্য পালনীয় বিষয় সমূহের নিয়মাদি প্রত্যেক খৃষ্টান অবগত আছে বলিয়া দাবী করিতে সাহসী হইবেন কি?

নমাজ ও জাকাত।

এসলাম নমাজ পড়িবার পূর্ব্বে অঙ্গসুদ্ধি (ওজু) করাকে অবশ্য কর্ত্তব্য (ফরজ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; ইহার উদ্দেশ্য—বাহ্য অঙ্গশুদ্ধির সহিত অন্তঃসুদ্ধির চেষ্টা করা। এসলাম জাকাত দানকে আর্থিক উপাসনা বলিয়া বাস্তবিকই জগতে এক মহদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার বাৎসরিক আয়ের এক-চত্তারিংশতাংশ অর্থাৎ শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকা হিসাবে দীন, দরিদ্র, দুঃখী, অভাজন ইত্যাদি যাহাদের দাবী আছে, তাহাদিগকে দান করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। অপিচ এই সাধারণের দেয় জাকাত, যখন মুসলমান রাষ্ট্রনায়ক কর্ত্তৃক বাদ্‌শাহী কোষাগারে সংগৃহীত হয়, তখন ইহাদ্বারা অন্যান্য সৎকার্য্য সম্পাদন ব্যতীত, দাস মুক্ত করা একটী মহা পুণ্যকার্য্য সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। যদিও দাসত্ব প্রথার ও তাহার ভিত্তি দৃঢ় করণের অপবাদ নির্দ্দোষ এসলামের স্কন্ধে চাপান হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কি বাস্তবিক সত্য? সত্য কথা এই যে, এসলামই পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথমে এই হতভাগা দাসদিগের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। এবং প্রথমে সেই এস্‌লামই ইহাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে মানবীয় স্বাধীনতা দানে ও তাহাদের অবস্থার সংস্কারের ভার নিজের স্কন্ধে বহন করিয়াছিল। এবং তাহাদের জন্য নানা প্রকারে এমনই সুন্দর বিধি ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াছে যে, তাহারই প্রভাবে পৃথিবী হইতে আজ দাসত্ব প্রথা চির দিনের জন্য বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। এই ঘৃণ্য দাসদিগকে এস্‌লাম যে সকল স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করিয়াছে, পৃথিবীর অপর কোন জাতি বা ধর্ম্মই তাহাদিগকে তাহা দিতে সমর্থ হয় নাই।

জাকাতদাতার পক্ষে তাহার অর্থ সদুপায়ে অর্জ্জন করা আবশ্যক, চুরি, ডাকাতি ও অন্যবিধ অসদুপায়ে অর্থার্জ্জন করিয়া তাহা হইতে জাকাত প্রদান করা কোন মতেই এস্‌লাম ধর্ম্মে বিধেয় নহে। জাকাত ব্যতীত এস্‌লামে অন্যবিধ বহু প্রকার দানের ব্যবস্থা আছে, এবং যিনি অধিক দান করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক এমন দয়াদ্র্চিত্ত, উদারমনা, দানশীল, মহদাশয়

ব্যক্তি তাঁহার সঞ্চিত ধনের চত্তারিংশতাংশের একাংশের অতিরিক্ত দান করিতে পারেন, এবং তাহাতে তাহার জন্য অধিক পুণ্য লিখিত হয় ও খোদার নিকট তাহার যথোচিত পুরস্কার তিনি পাইবেন।

হজ্জ।

কাবাগৃহের হজ্জের মধ্যে এক অতি উচ্চ ও নিগূঢ়তম উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এই হজ্জ উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্নদেশীয় নানা ভাষা ভাষী মুসলমানগণ, পবিত্র মক্কাধামে উপস্থিত হইয়া এসলামিক একতা ও ভ্রাতৃভাবকে নব জীবনে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের প্রাণে প্রাণে মিলিত হওয়ার একটী প্রকৃষ্টতম উপায়। এবং ইহা সমগ্র বিশ্ববাসী মুসলমানদিগের জন্য এমনই এক অভিনব উপাসনাগার ও সম্মিলন-ভূমি যে, খৃষ্টানদিগের ভাগ্যেও তাহা লাভ হয় নাই। ইহা ছাড়া এই হজ্জের প্রভাবেই আরবীয় সভ্যতা এবং আরব আদর্শ ও আরবী সাহিত্য দুনিয়াময় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। পক্ষান্তরে আরবী ভাষা কেবল যে মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের কুঞ্জিকা স্বরূপ তাহা নয় বরং তাহাদিগের অন্তরের কুঞ্জিকা নামেও অভিহিত হইতে পারে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মুসলমানের নিকট আরবী ভাষা উপস্থিত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আরবী শব্দ বুঝিতে পারে। এবং প্রত্যেক দেশের নানা ভাষা ভাষী মুসলমানগণ তাহাদের জাতীয় সভ্যতার অংশ স্বরূপ আরবী ভাষাকে উত্তরাধিকারিত্বের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া যে এক বিরাট, বিশাল ও অভিনব জাতীয়তা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কুত্রাপিও নাই। তাহারা যেন সকলেই এক তারে গাথা।

রোজা।

একনিষ্ঠ কঠোর সাধনার বলে কিরূপে যে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও অধ্যাত্ম-জীবনকে উন্নত করা যায়, তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে রোজার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও প্রকটিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে রোজার দ্বারা এক দিকে যেমন আধ্যাত্ম জীবন উন্নত হয় ও নীতিনিষ্ঠতা শিক্ষা করা যায়, তেমনি দৈহিক স্বাস্থ্যের উপরও ইহার প্রভাব বড় কম নয়। বরং ইহার প্রভাবে অতি মাত্রায় স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান হইয়া থাকে। কি সংযম শিক্ষায়, কি আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা সাধনে, কি শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে, রোজা ও অন্যান্য ফরজ কার্য্য (ওজু নামাজ ইত্যাদি) সমূহের কার্য্যকারিতা অতি অশ্চর্য্যজনক। সুতরাং এই সকলকে অবশ্য পালনীয় (ফরজ) বলিয়া ঘোষনা করিবার অধিকার জ্ঞানগর্ব্বী এস্লামের অবশ্যই আছে।

এস্লাম, মদ্য, বরাহ, শাস্ত্রনীতি বিরুদ্ধ বলিদত্ত জন্তুর মাংসাদি ভোজনে নিষেধ করিয়া যে সুনীতি ও বিশুদ্ধ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, কেবল মাত্র কষ্ট প্রদানোদ্দেশ্যে তাহা মানুষকে পালন করিতে বাধ্য করা হয় নাই, বরং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা নিয়মিত করা হইয়াছে।

মুসলমান জাতির সামাজিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তথায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে না। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ইতর, ভদ্র, সকলেই পাশাপাশিভাবে পায়ে পায়ে, স্কন্ধে স্কন্ধে সংযোজিত হইয়া যুগল মূর্ত্তিতে মিলিত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া খোদার উপাসনা করিতেছে, এবং একই আসনে উপবেশন করতঃ পূত-সাম্যের উজ্জ্বল আদর্শকে প্রকটিত করিয়া এক সঙ্গে আহার করিতেছে। কোন মুসলমানের গৃহের একজন ক্রীত দাস কেবলই যে সে তাহার পরিজনবর্গের মধ্যের একজন বলিয়া গণ্য হয় তাহা নয়, বরং সমাজে ও রাষ্ট্র-তন্ত্রে যে সম্মান ও অধিকার লাভের সুযোগ তাহার আছে, কোন স্বাধীন, দরিদ্র খৃষ্টান তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে না। প্রভু যাহা পানাহার করেন, তাহাদের দাস দাসীরাও তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাদের সমাজের দরিদ্র ক্ষুধার্ত্তগণ যথায় তথায় যে কোন মুসলমানের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারে। এবং কেবল যে দীন, দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাহাদের উপর উপকার স্থাপনের জন্য, তাহারা দানের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা-নয়, বরং এসলামিক দানের বিধি ব্যবস্থা এমনই সুন্দর ও মহৎ যে, দাতা দান করিয়া দান-গৃহীতার নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হন না, বরং দান-গৃহীতাই দান গ্রহণ করিয়া দাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকে। দাতা দান করিয়া দান-গৃহীতার উপকার করেন না, দান গ্রহণকারীই দান গ্রহণ করিয়া দাতার উপকার করিয়া থাকে, এমন আকাঙ্খাবিহীন নিষ্কাম দান ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত অন্যত্র কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় কি ?

যদিও খৃষ্টান-ধর্ম্ম, দান ও উদারতা শিক্ষা দেয় বটে, কিন্তু আমি ক্কচিৎ কখনও কোন সৎ সংকল্প প্রণোদিত খৃষ্টানকে তাহা করিতে দেখিয়া থাকিব, তবে যদি কোন খৃষ্টান সেরূপ কোন দান দক্ষিণা করে, তাহা হইলে বলিতে হয়, মূলতঃ সে ব্যক্তি মুসলমানরূপেই হজরত ঈসা (খৃষ্ট) কে খোদার প্রেরিত পয়গম্বর জ্ঞানে যথার্থ সম্মান করিয়াছে, অথবা সে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ইহুদী বলিয়াই মরণোন্মুখ খৃষ্টানের রোগের শুশ্রূষা করিয়াছে মাত্র।

মসজিদের মধ্যে সকল মুসলমানই তুল্য পদ ও সম মর্য্যাদা বিশিষ্ট। খৃষ্টানদিগের গীর্জ্জার ন্যায় তথায় পদানুসারে বসিবার আসনের পার্থক্যনীতি আদৌ লক্ষিত হয় না। এমাম অথবা এমামের অনুপস্থিতিতে অন্য যে কোন মুসলমানের নেতৃত্বে (এমামতে) সমবেত নামাজ সম্পাদিত হইয়া থাকে। এবং যখন এমামের শব্দের অনুকরণ করতঃ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উঠা বসা করিয়া মুসলমানগণ নামাজ সমাপন করে, তখন দর্শকের মনে স্বভাবতই এ ধারণা জাগরূক ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে যে, এই সর্ব্ববিধ আড়ম্বরবিহীন, শৃঙ্খলাময়, এবং সম্পূর্ণ নীরব সাধনার নামই বাস্তবিক "খোদার উপাসনা"।

অধিকাংশ বিরুদ্ধবাদী ও সমালোচকগণ, নীতি ও নিয়মের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র বাহিরের দিকটা লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হন, এই জন্য অনেক মিথ্যা ও অনর্থপাতেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যদিও দানশীলতা একটি অতি উচ্চ গুণ ও শ্রেষ্ঠ পুণ্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু (খৃষ্টান সমাজের) দানের চাঁদা সংগ্রহ ও বিতরণ করিতে সমাজ যে সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কানুনের বাধ্য, তাহাতে তাহার (দানের) মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব একেবারেই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নীতি ও নিয়ম যে মনুষ্যের পথ প্রদর্শনের জন্য, তাহা আইন গড়িবার সময় আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই।

আজ যদি এসলামিক নিয়মের উপর ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহা হইলে "নিহিলিষ্ট" "এনারকিষ্ট" ইত্যাদি চরমপন্থী দলের অস্তিত্ব চির দিনের তরে ভূপৃষ্ঠ হইতে সমূলে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যে হেতু এস্লাম লোকদিগকে দুর্লোভ ও অসহিষ্ণু করিয়া গড়িয়া তুলে না, অথবা সে প্রত্যেক উপস্থিত বিষয়ের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে ও লোক দিগকে শিক্ষা দেয় না, ধৈর্য্য ও সংযম শিক্ষাই এস্লামের মূল মন্ত্র। পক্ষান্তরে ইহার ঘোর বিপরীত শিক্ষার উপরেই ইউরোপীয় সমাজ, তথা সভ্যতা ও উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এবং লোকদিগকে দুর্লোভ, অসহিষ্ণু ও অসংযমী করিয়া গড়িয়া তোলা ও প্রত্যেক বিষয়েই অসন্তুষ্টি প্রকাশের শিক্ষা দান করাই যেন তাহার সভ্যতার মুখ্যোদ্দেশ্য।

বিবাহ পদ্ধতি।

মুসলমানদিগের মতে, বিবাহ পদ্ধতি ধর্ম্মকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত, এবং পয়গম্বরের অনুসৃত নীতি (সুন্নত) রূপে তাহা অবশ্য পালনীয়। তাহাদের বিবাহে মাত্র দুইজন সাক্ষী উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। এবং বিবাহের পরে স্বামী, স্ত্রীকে তাহার সহিত যথা ইচ্ছা দূরদেশে যাইতে বাধ্য করিতে পারে না। সে সম্বন্ধে স্ত্রীর স্বাধীনতা আছে। এবং এরূপ অবস্থায়ও (অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত স্বতন্ত্রভাবে দূরপ্রবাসে অবস্থানকালেও) স্ত্রীর ভরণ পোষণ যোগাইতে স্বামী ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কোন পারিবারিক ব্যাপার লইয়া স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসার্থ (অর্থাৎ ব্যাপার গুরুতর হইলে) বিচার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা আছে। এবং কোনরূপেই যদি তাহাদের উভয়ের মনোমালিন্যের অপনোদন না হয়, তবে তদবস্থায় "তালাক" দিবার (স্ত্রী বর্জ্জনের) ব্যবস্থা আছে। বিবাহ ও তালাক সম্বন্ধে এস্লাম যে সুন্দর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সুখ্যাতি করা ব্যতীত প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। এবং অনভিজ্ঞ অথবা বিদ্বেষপরায়ণ খৃষ্টানগণ তৎ প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছে তাহা যে নিতান্তই নিরর্থক ও ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ এবং তাহাদের অজ্ঞতার ফল স্বরূপ, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

যাহারা বলে—এস্লাম পুরুষদিগকে যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে এবং যথেচ্ছা তালাক দিতে অনুমতি দিয়াছে, তাহাদের কথা যে একেবারেই ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতালকমূলক, এ কথা বলাই বাহুল্য,—এরূপ উক্তিকে এস্লামের প্রতি অযথা দোষারোপ করা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে তালাক দিবার ব্যবস্থা নাই এবং তাহাতেও কাজীর মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যক করে।

বিবাহের সময় মোহর (যৌতুক যাহা স্ত্রীর প্রাপ্য) নির্দ্দেশ ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে না। এবং এ বিষয়ে নারীদিগের পূর্ণ অধিকার আছে। কাজেই বিবাহের সময় অধিকাংশ নারীই (অথবা তাহাদের অভিভাবকগণ) স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত মোহর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহাতে পুরুষ ইচ্ছা থাকিলেও স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না, যেহেতু তালাকের সময় স্বামী নির্দ্দেশিত মোহর সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে বাধ্য। এস্থলে আমাকে গভীর পরিতাপের সহিত এ কথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তালাক সম্বন্ধে মুসলমানগণ অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা লাভ করা স্বত্বেও, তাহাদের তুলনায় খৃষ্টানদিগের মধ্যেই তালাকের (ডাইভোর্সের) সংখ্যা অধিক দেখিতে পাই। এবং এ কথা বলিতেও আমি লজ্জিত হইব না যে, নিকট-আত্মীয়গণের প্রতি, বৃদ্ধদিগের প্রতি, পণ্ডিত (আলেম) দিগের প্রতি, অপরিচিত আগন্তুকদিগের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ও তাহাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপনে, এবং পশু দিগের প্রতি সদয় ব্যবহারে অধিকাংশ মুসলমানই, এই শ্রেণীর খৃষ্টানদিগের আদর্শ স্থানীয়। ইহারা (খৃষ্টানরা) তাহাদিগকে আদর্শ করিয়া যথেষ্ট সভ্যতা শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

বহুবিবাহ।

বহু বিবাহের সমর্থনকারী বলিয়া খৃষ্টানগণ, এস্লামের প্রতি যে দোষারোপ করিয়া থাকে, তাহারও মূলে কোন সত্য নাই, কেন না যদিও বহু বিবাহের দ্বারা নারীজাতির সংখ্যাধিক্যের সুবন্দোবস্ত হইয়া থাকে, এবং অসচ্চরিত্রতা ও অসৎসংস্পৃষ্টে নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে পুরুষগণ তথা সমাজ উদ্ধার পাইয়া থাকে, তবুও এস্থলে বিবেচনা করিবার বিষয় এই যে, অধিক সংখ্যক মুসলমান মাত্র এক বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। এরূপ কেন হয়? এসলামিক বিধি ব্যবস্থার সুনিপুণতা ইহার মূলীভূত কারণ। যে উন্মার্গচারী, দূর্নীতিপরায়ণ জাতির মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহারা কন্যালাভকে দুর্ভাগ্যের চরমাদর্শ বলিয়া জ্ঞান করিত, এবং এই জন্যই প্রায়ই তাহারা স্ব স্ব ঔরসজাত স্নেহপুত্তলিকা কন্যাগণকে জীবন্ত প্রোথিত করিতেও বিমুখ হইত না। তাহাদের মধ্যে বিবাহ-সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না, এবং কোন ব্যক্তি মরিয়া গেলে, তাহার সহধর্ম্মিণীকে তাহার উত্তরাধিকারিগণ অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইত, এহেন অনাচারাসক্ত, নীতিবিহীন ও অনিয়ম বহু বিবাহের পক্ষপাতীর মধ্যে তিনি আবির্ভূত হইয়া তাহাদের, সেই অদম্য কুপ্রবৃত্তিকে সংযত করিলেন, এবং আল্লার এই বাণী শুনাইলেন যে, "একজন পুরুষ, সে প্রত্যেকের সহিত প্রেম, ভালবাসা, এবং গার্হস্থ্য-জীবনের প্রত্যেক বিষয়ে তুল্য ব্যবহার করিবে, এই নিয়মে বাধ্য হইয়া ঊর্দ্ধসংখ্যক চারিটী বিবাহ করিতে পারে (১) এখন যদি কার্য্যতঃ,

(১) পবিত্র কোরআনের উক্তিটি এই যথা, "তোমরা দুই, তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার, পরন্তু যদি আশঙ্কা কর যে, ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে মাত্র বিবাহ করিবে"। (সুরা নেশা ১রুকু ৩আয়াত)

ব্যবহারতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ প্রতীতি হইবে যে, কোন ব্যক্তিই দুই বা তদধিক স্ত্রীর সহিত প্রেম, ভালবাসা ও গার্হস্থ্য-জীবনের অপরাপর বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং এখন বেশ স্পষ্টত বুঝা যাইতেছে যে, মাত্র এক বিবাহের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করাই এসলামিক বিধির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

এস্লামই নারীজাতিকে দাসীবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিয়া গৃহকর্ত্রী করিয়াছে এবং পরাধীনতার নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে ও স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির প্রথম উত্তরাধিকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে।

হজরত মোহাম্মদের (সঃ) প্রতি এই মিথ্যা দোষারোপ করা হইয়া থাকে যে, "তিনি নিজেই একাধিক বিবাহ করিয়া—(نعوذ بالله) বিলাসিতার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন," পাঠক, আইস, আমরা এই অযথা উক্তির সত্য মিথ্যা নির্ণয় করি। সৌভাগ্যবশতঃ আমি কোন কাল্পনিক কেচ্ছা-কাহিনী সম্বলিত "হিরো" (নায়কের) সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই, বরং আমি এমন একজন ঐতিহাসিক মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনায় লিপ্ত হইয়াছি, যাঁহার জীবনের, প্রতি দিনের, প্রতি মুহূর্ত্তের প্রত্যেক কার্য্য ও বাক্যের এমন কি পানাহারের উঠা বসা, ইত্যাদি খুটিনাটি সমূহেও তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য বিবরণী, তথা হাদিস শাস্ত্রে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত রহিয়াছে। সেই "হাদিস" আবার কি? হাদিসকে মুসলমানগণ নিতান্তই দক্ষতা ও সুনিপুণতার সহিত নিয়ন্ত্রিত করতঃ এস্লামের অঙ্গীভূত বিধি ব্যবস্থা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ মাত্র কোরআনের নিম্নে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাঁহার সহচর ও অনুগামী ভক্তবৃন্দ, হাদিস সংগ্রহ ব্যাপারে যেরূপ সুদক্ষতা ও সুনিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাহার সত্যতা নির্ণয় ও সন্দেহ ভঞ্জনার্থ যে সকল কঠোর নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অনন্য সাধারণ। হজরতের ঘনিষ্ঠতম প্রধান প্রধান সহচর বৃন্দ কর্ত্তৃক যে হাদিস বর্ণিত হয় নাই তাহাকে তাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই? এখন ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সত্যের অনুরোধে আমাদিকে ইহা বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, "আমাদিগের "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের" বাক্য ও কার্য্যাবলী এবং জীবনের অপরাপর ঘটনা সমূহ কখনই এইরূপ সুশৃঙ্খলা ও দক্ষতার সহিত সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয় নাই। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এ হেন উদার ও পবিত্র চরিত্র সৎ-গুণ ভূষিত হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে বিলাসী সাব্যস্ত করিতে যাহারা তৎপর, তাহাদের নিকট তাহার অনুকূলে সত্য অথবা সন্দিগ্ধ, কিম্বা দুর্ব্বলতাজনিত কোন যুক্তি প্রমাণও আছে কি? যদি থাকে তবে তাহা উপস্থিত করা হউক। আমি বলি তাহাদের পক্ষে তাহা একেবারেই অসম্ভব, একান্তই যদি তাহারা কোনও প্রমাণ উপস্থিত করিতে সক্ষম হয়, তবে সামান্য অনুসন্ধানের পরেই যে তাহা ভিত্তিহীন ও ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইবে, এ কথা আমি নিসন্দেহে বলিতে পারি। তুমি যেদিক দিয়াই দেখ না কেন, বাস্তবিকই হজরত মোহাম্মদ (সঃ) সর্ব্ব প্রকারেই ভক্তি ও প্রশংসার পাত্র। যে দুর্নীতিপরায়ণ সমাজে তিনি জন্মলাভ করিয়া, তিনি তাঁহার

প্রকৃতিগত পবিত্রতাকে, বিলাসিতা এবং সর্ব্ব প্রকার মালিন্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অন্যের পক্ষে সম্ভবপর হইত কি না সন্দেহ। মূর্খ, বিলাসময়, এবং সর্ব্ববিধ পাপের আদর্শ-মূর্ত্তিস্বরূপ—আরব সমাজে, তিনি শৈশব হইতে ২৫ পঁচিশ বৎসর বয়সাবধি, অতি উজ্জ্বল আদর্শের সংযমনীতি এবং সচ্চরিত্রতা ও বিশুদ্ধতার সহিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এবং এই পঁচিশ বৎসর বয়ক্রমকালে যখন তিনি বিবাহ করিলেন, তখন তিনি কোন সুন্দরী যুবতী নারীর অনুসন্ধান করেন নাই, বরং তাঁহার সত্যতা ও প্রেরিতত্বের প্রতি সর্ব্ব প্রথম বিশ্বাসী (পরে যখন তিনি খোদা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সত্য ধর্ম্মের প্রচার করেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী খাদিজাই প্রথমে তাঁহার প্রচারিত সত্যে বিশ্বাস আনয়ন করিয়াছিলেন) ৪০ চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা নারী সাধ্বী খাদিজাকেই তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যত দিন এই সাধ্বী নারী জীবিতা ছিলেন, তত দিন তিনি তাঁহার সহিত আদর্শ দাম্পত্য-প্রণয়ের সহিত সদ্ভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, অন্য দার পরিগ্রহও করেন নাই, এবং খাদিজার মৃত্যুর পরে আজীবন তিনি তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। খাদিজার মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরে তাঁহার অন্যতমা সহধর্ম্মিণী সাধ্বী আয়েশা একদা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "আমি কি খাদিজার ন্যায় নহি" ? উত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন "না, কখনই তুমি তাঁহার ন্যায় নও, সেই ঘোর অবিশ্বাসের যুগে যে সময় কেহই আমার প্রতি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিল না, তিনি সেই সময় আমার প্রতি প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন. এবং যখন আমি সহায়হীন অবস্থায়, নানাবিধ বিপদজালে জড়ীভূত, তখন তিনি (খাদিজা) সহধর্ম্মিণীরূপে আমাকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য দান করিয়াছিলেন"।

এ কথা সত্য যে, ৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের পরে, তিনি একের পর অন্য, এইরূপে কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে মহাত্মা এতদবধি একশেষ কঠোর সাধনা ও আত্মসংযম নীতির পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই সকল বিবাহ লইয়া খৃষ্টানগণ যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছে, সেই সকল মিথ্যাপবাদ কেবলই যে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উপেক্ষা করিলেই শোধ যাইবে তাহা নয়, বরং নিশ্চয়ই খৃষ্টানদিগের ঐ সকল ধারণার বিপরীত একটা কিছু আছেই, যে জন্য তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে এই সকল বিবাহ কার্য্যে বাধ্য হইতে হইয়াছিল সেই সকল কারণ যে কি হইতে পারে তাহা অবশ্যই দ্রষ্টব্য।

আমার বিশ্বাস এই যে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার এই সকল বিবাহ করার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহার, অত্যাচারিত, উৎপীড়িত ও ধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত সহচরদিগের সহায়হীনা বিধবা নারীগণের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহাদের অমূল্য স্ত্রীধন সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা করা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাঁহার অনুগামিগণ সংখ্যায় অতি অল্পই ছিল, এবং শত্রুগণ সংখ্যায় ও শক্তিতে প্রবল ছিল, এই জন্য মুসলমানদিগকে তাহাদের দ্বারা নানারূপে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল। এবং এমন কি অনেক সময় ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী অন্নাভাবে তাঁহারা অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইতেন। এই ধর্ম্মদ্রোহীদিগের অত্যাচারের জন্যই হজরতের বহু সহচর

মর্য্যাদাশী গরিয়সী, প্রিয়তমা জননী জন্মভূমির মায়ায় জলাঞ্জলী দিয়া, আফ্রিকার খৃষ্টান নরপতি "নাজ্জাসির" আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা বহুদিন যাবত তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তথায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এবম্বিধ উৎপীড়িত, স্বদেশবিতাড়িত সহচরদিগের সহায়হীনা বিধবা নারীদিগের প্রাণ ও সম্মান রক্ষার্থ, এবং সেই দুঃখিনীদিগকে সমাজে সম্মানিতা করিয়া তাহাদের দুঃখের অপনোদন করতঃ শান্ত্বনাপ্রদানার্থ তিনি তাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন(১) তিনি যে অন্যরূপ ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এই সকল বিবাহ করিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা করা আমূল ভ্রমাত্মক ও ভিত্তিশূন্য। এরূপ ধারণা মনে স্থান দিলেও পাপ হয়, বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতে পাই যে, যৌবনে সংযম নীতির একশেষ কঠোরতম পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তখন এরূপ ধারণা আমাদের মনে আদৌ স্থান পায় না।

সাধ্বী জয়নবের সহিত তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও, বিরুদ্ধবাদিগণ উল্টা বুঝিয়া বসিয়াছে, "জয়নব" হজরতের মুক্তদাস ও পালিতপুত্র জায়েদের ত্যক্ত ভার্য্যা বলিয়াই তাহাদের এইরূপ ধারণা। মূর্খ আরবগণ, একদিকে ত পিতার মৃত্যুান্তে তাহার ভার্য্যাদিগকে (বিমাতাদিগকে) অবাধে বিবাহ করিত, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু পালিত পুত্রের ত্যক্ত নারীকে বিবাহ করা তাহারা একেবারেই অবৈধ বলিয়া জানিত। মহাপুরুষ মোহাম্মদ (সঃ) মূর্খ আরবদিগের এই অজ্ঞতামূলক ভ্রমকে এইরূপ ঘোষণার দ্বারা দূর করিলেন যে, "ঔরসজাত পুত্র ও পালিতপুত্র কখনই তুল্য নয়। সুতরাং পালিত পুত্রের ত্যক্ত নারীকে বিবাহ করাও অবৈধ নয়"। ফল কথা তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, সে কেবল মাত্র খোদার নির্দ্দেশিত নিয়মের সত্যতা সম্পাদনার্থ ও তাঁহার পূর্ণতার সাক্ষ্য প্রদানোদ্দেশ্যেই করিয়াছিলেন, নতুবা তিনি শুধু বিবাহ করনোদ্দেশ্যে এরূপ করেন নাই। এতদুপলক্ষে পবিত্র কোরআনে যে উক্তি বিদ্যমান আছে, বিরুদ্ধবাদিগণ তাহার উল্টা অর্থ বুঝিয়া অবৈধকে বৈধ করা হইয়াছে বলিয়া রটনা করিয়াছে, কিন্তু তাহারা যাহা কিছুই বলুক না কেন, তাহারা যে মূলোদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হয় নাই, বরং উল্টা অর্থ বুঝিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

এই সকল ভুল ধারণার কারণ এই যে, অধিকাংশ লোক, কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেই ধর্ম্মের মূল পুস্তকাদি পাঠ না করিয়া, মাত্র তাহার বিরুদ্ধবাদিগণের লিখিত মিথ্যা অপবাদপূর্ণ পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, এজন্যই এইরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

---

(১) এই সহায়হীনা, শোক-তাপ-দগ্ধা, বেদনা নিপীড়িতা নারীদিগকে শান্তনা দিবার জন্য তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য তিনি সমাজের মাননীয়া করিয়াছিলেন, তাই আজও সেই দুঃখিনী-দিগকে মুসলমানগণ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। বরং অতি সম্মানের সহিত জগতের চল্লিশ কোটী নর নারী কর্ত্তৃক আজ তাঁহারা মাতৃ সম্বোধনে, সম্বোধিতা হইতেছেন। (অনুবাদক)

চির কৌমার জীবনের দৃষ্টান্ত মুসলমান সমাজে পরিলক্ষিত হয় না। বিবাহের বয়সে উপনীত হইয়াছে অথচ তাহার বিবাহ হয় নাই, এরূপ নারী মুসলমান সমাজে কচিৎ কদাচিত পরিলক্ষিত হয়। ব্যভিচারের শাস্তি, নারী, পুরুষ উভয়ের জন্যই তুল্য। ব্যভিচারলিপ্ত নারী পুরুষ প্রত্যেকের প্রতি প্রকাশ্য স্থানে এক শত করিয়া বেত্রাঘাত শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

এস্‌লাম ক্রীত দাসী রক্ষা করা বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এজন্য তাহাদের গর্ভজাত সন্তানের স্বত্ব ও অধিকার বিবাহিতা নারীর গর্ভজাত সন্তানের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে।

মুসলমানদিগের দেশে (অবশ্য মুসলমান শাসনাধীন দেশে) মাদক দ্রব্যের দোকান, অথবা জুয়া খেলিবার আড্ডা আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং তথায় বেশ্যাবৃত্তির জন্য কখনও কোন নিয়ম গঠনের আবশ্যকও হয় না। (যে হেতু ব্যভিচার এস্‌লামে হারাম বা ঘোর অবৈধ) সুতরাং অবৈধ বিষয়ে কোনরূপে ব্যবস্থা দেওয়া বিধেয় নহে।

কেব ' কি তাহাই? যদি মুসলমানদিগের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাবার্ত্তার প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ প্রতীতি হইবে যে, তাহারা ইউরোপীয়দিগের তুলনায় অনেক গুণে অধিক সুসভ্য ও সংযত। আমি স্কুল, কলেজের মুসলমান যুবকবৃন্দের প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—তাহারা শিষ্টচারিতা, শান্তবৃত্তি, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে, খৃষ্টান যুবকদিগের তুলনায় অনেক গুণে অধিক সংযত ও সুসভ্য। বরং যদি সত্যভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় তবে আমি বলিতে বাধ্য হইব যে, অধিকাংশ খৃষ্টানগণ যে প্রকার অসভ্য ও অভদ্র-জনোচিত, অশ্লীল এবং লজ্জাস্কর কথাবার্ত্তায় লিপ্ত হইয়া থাকে, সে সকল ব্যাপার এস্‌লাম-শাসিত দেশে হইলে তাহারা নিশ্চয়ই যে, "সভ্যতা শিক্ষার আইনের" ব্যবস্থানুসারে দণ্ডিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

একজন মুসলমান বিবাহিতা নারীর অবস্থা ও অধিকার বর্ত্তমান কালের ইংরেজ বিবাহিতা নারীর অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক ও উন্নত। প্রথমা স্ত্রীর পক্ষে (আদালতে) জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার অধিকার আছে, কিন্তু দ্বিতীয়ার তাহা নাই। এমন যে সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্স সেও আজ পর্য্যন্ত নারীদিগকে এই অধিকারটুকু দিতে সমর্থ হয় নাই।

এস্‌লামিক বিধি ব্যবস্থা লইয়া প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির উপর বিনা বাধা বিঘ্নে অবাধে শাসনদণ্ড প্রচলন করা যাইতে পারে, তাহারা (মুসলমানরা) পবিত্র কোরআনের ব্যবস্থা বুঝে এবং তদানুসারে কার্য্য করিতে তৎপর হয়। গাঢ়ভাবে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া ব্যস্তভাবে পবিত্র কোরআনের বিধি ব্যবস্থা বুঝিতে যাওয়া সঙ্গত নয়। ব্যস্ততায় অনেক ভুলের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সম্ভাবনা কি? কার্য্যতঃ তাহাই হইয়া থাকে। উদাহরণস্থলে আমরা দেখাইতেছি, যথা—কোরআনের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে, (واقتلوا المشركين) অর্থাৎ "ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে হত্যা কর"। কিন্তু অন্যত্র পরিষ্কাররূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে

যে, "কাফেরগণ যদি তোমাদিগকে হত্যা করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর, এবং যদি তাহারা তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদিগের সহিত যুদ্ধ কর"। এখন যে ব্যক্তি মাত্র প্রথম উক্তিটী দেখিয়া বলিবেন যে, "এস্লাম নরহত্যার শিক্ষা প্রদান করিয়াছে" তিনি কি অত্যন্ত ভ্রমান্ধ প্রতিপন্ন হইবেন না? জেহাদ একটী প্রতিদ্বন্দী যুদ্ধ। এই যুদ্ধ মাত্র আত্মরক্ষার জন্য। যাহারা মুসলমানদিগকে ধর্ম্মগতবিদ্বেষের বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়, অথবা তাহাদিগকে অযথা কষ্ট প্রদান করে, তাহাদেরই বিরুদ্ধে আত্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করার নাম জেহাদ।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে খৃষ্টান রাজ্য অপেক্ষা মুসলমান রাজ্যে জন সাধারণ অনেক গুণে অধিক শান্তি ও স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিয়া থাকে, এবং এই জন্যই বহু গ্রীক, আর্ম্মাণী ও ইহুদী এস্লাম শাসিত দেশে বাস করা অধিকতম নিরাপদ ও প্রীতিকর বলিয়া জ্ঞান করে। ইউরোপ ও ইউরোপবাসীর পক্ষে এস্লাম রাজ্যের নিকট, দয়া, ধর্ম্ম, উদারতা, স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতা ও আত্ম বিশ্বাস শিক্ষা করা উচিত। পবিত্র কোরআনে সুরা হজ্বে, স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, জেহাদের উদ্দেশ্য মাত্র মস্জিদ সকল ও তাহাদের ধর্ম্ম মন্দির সকলের যথায় তাহারা আল্লার উপাসনা করিয়া থাকে তাহারই রক্ষণাবেক্ষণ করা ও আত্মরক্ষা করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মুসলমানগণ খৃষ্টান অপেক্ষা অধিকতর উদার। আমি এমন অনেক মুসলমানের বিষয় অবগত আছি, যাহারা খৃষ্টানের গীর্জ্জা ইত্যাদি নির্ম্মাণে অর্থ সাহায্য করিতে বিমুখ নহেন, কিন্তু কৈ, কোন খৃষ্টান বলিতে পারিবেন কি, যে তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও মুসলমানের মস্জিদাদি নির্ম্মাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন? বস্তুত মুসলমানগণের মস্জিদে সত্যভাবে পবিত্র খোদাতাআলার নাম স্মরণ করা হইয়া থাকে।

কথিত হয় যে, "মুসলমানগণ, খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছে" কিন্তু ইহা বলিবার সময়, এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে খৃষ্টানগণ, মুসলমানদিগের প্রতি অনেকানেক স্থলে নিরতিশয় নির্দ্দয়ভাবে যে সকল অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়াছে, এবং তাহাদিগকে নিতান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত সর্ব্ব সাধারণ নির্ব্বিশেষে হত্যা করিয়া যে নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা কি তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন? অন্যদিকে দেখ, "খলিফা হজরত ওমর" "জেরুজালেম" অধিকার করার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, (অবশ্য খৃষ্টানদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া) নগর অধিকার করিয়া তাহার সমস্ত রক্ষকবৃন্দকে হত্যা করা হইবে"। কিন্তু নগর অধিকার করার পর, তিনি তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা বর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য পাপই হয় হউক, আমি তাহা বহন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাই বলিয়া, আমার প্রতিজ্ঞার অনুরোধে, অথবা তাহা লঙ্ঘনজনিত পাপের ভয়ে, খোদার সৃষ্ট একটি প্রাণীকেও আমি হত্যা করিতে দিব না"।

উপসংহারে আমি ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, এস্লাম ও ইহুদী এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম, একই প্রস্রবণের বিভিন্ন শাখা মাত্র। এবং আমি আন্তরিক ইচ্ছা ও আকাঙ্খার

সহিত এমন দিনের অপেক্ষা করিতেছি, যে দিন খৃষ্টানগণ, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে যথার্থরূপে হজরত ঈসার ন্যায় সম্মান করিতে শিক্ষা করিবে। এরূপ দিন খোদাতাআলা সত্বরই উপস্থিত করুন, ইহাই আমার হৃদ্‌গত কামনা।

অনেক বিষয়ে খৃষ্টানধর্ম্ম ও এস্‌লামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বাস্তবিকপক্ষে যে ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে এবং তাঁহার নীতি ও নিয়মকে ও সর্ব্বোপরি তাঁহার উজ্জ্বলতম সত্যকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকে, সেই লোকই যথার্থ খৃষ্টান।

আহমদ আলী।

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব।

(Doctrine of Atonement.)

(৬)

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বন—প্রায়শ্চিত্তবাদ বাইবেলের পুরাতন বা নূতন নিয়মের উক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। এখন কথা হইতেছে, তবে ইহার উদ্ভাবক কে? এবং কাহার দ্বারা এই মত প্রচারিত হইল? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আমরা যীশুখৃষ্টের এবং তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের প্রদত্ত শিক্ষা নীতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহার এই মত সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গ কিছু বলা ত দূরে থাকুক, তাহা বা তৎসম্বন্ধে জানিতেনও না। যীশুর ক্রুসারোহণের—বহুদিন পরে পৌল নামে একজন 'পর জাতীয়' লোক জনৈকা ইহুদী নারীর প্রেমে পড়িয়া ইহুদী ধর্ম্মগ্রহণ এবং সঙ্গে সঙ্গে নবীন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়ান। খ্রীষ্টীয়ানদের মুণ্ডপাত করিবার জন্য তাঁহার মাথায় যতগুলি "ফান্দ" চাগিয়াছিল তাহা প্রায় সমস্তই তিনি প্রয়োগ করেন। কিন্তু কালক্রমে যখন তাঁহার সাধের 'প্রিয়তমা'কে তিনি পাইতে পারিলেন না, বা পাইলেও সেই প্রথম দর্শনের স্বরূপ রূপ লাবণ্য তাহাতে বিদ্যমান পাইলেন না, তখন তিনি আবার নিজের প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। একদা তিনি রাস্তা চলিতে চলিতে হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে, তাঁহার উপর "পবিত্র আত্মার" আবির্ভাব হইয়াছে! খ্রীষ্টীয়ানগণ ইহাতেও বোধ হয় তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই বা করে নাই। সেই জন্য তিনি সাধারণ ভাবে খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা বাড়াইয়া মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত একজন প্রধানরূপে গণ্য হইবার আশায় 'শুধু বিশ্বাস' দ্বারাই লোকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে বলিয়া এক মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, ব্যবস্থা অনুযায়ী কেহ কার্য্য করিলে উদ্ধার পাইবে না, বরং যীশু যে সকলের পাপ নিয়া নিজে শাপগ্রস্ত এবং ক্রুশা-রোপিত হইয়াছিলেন, শুধু তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে এবং ইহাতেই মুক্তি রহিয়াছে। পৌলের পত্রাবলীতে এ কথা স্পষ্টতঃ লিখিত আছে।

যাহা হউক, পৌলের এই প্রকার সহজ বিধিপূর্ণ বক্তৃতা এবং পত্রাবলী অল্প বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বেশ মনঃপূত হইল—তাহারা দলে দলে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলিভুক্ত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কোন নিয়ম কানুনের বাধ্য না হইয়া শুধু বিশ্বাস পোষণে যদি মুক্তির লাইসেন্স পাওয়া যায়, তবে এমন সুলভ-ধর্ম্ম কাহার না ভাল লাগে? ফলে পৌল এক গুলিতে দুই পাখী মারিয়া বসিলেন। একদিকে খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্ম্মের মাথা খাওয়া হইল এবং অপরদিকে নিজের ক্ষমতা প্রতিপত্তির সীমাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইল।

হায়, যেই খৃষ্ট এই অসম্ভাবিত মৃত্যুর আভাষ পাইয়া আত্মরক্ষার জন্য পরম শক্তিধর সদাপ্রভুর নিকট কতই না কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেহ ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছিল এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা? যদিই বা তিনি এইভাবে মরিয়া থাকেন, তবে তাঁহার প্রার্থনা এবং মিনতিগুলি খোদার দরবারে নামঞ্জুর হইল বলিয়া কোথায় খৃষ্টীয় জগত দুঃখ প্রকাশ করিবে, না আজ পৌলের প্রচার ফলে তাহারা ইহাকে বিপরীত বুঝিয়া আনন্দে মাতোয়ারা! হায়রে বিচিত্র সংসারের বিচিত্র গতি!

বাইবেলের যিশু মরিলেন—এলি এলি লামা সবক্তানী বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে, নিতান্ত অনাথ বিপদাতুরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। কাহারও মতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার দুই চারিজন গুপ্ত শিষ্য তাঁহার মূর্চ্ছাক্রান্ত দেহখানিতে মলম ইত্যাদি মাখাইয়া এমন একটা গহ্বরে প্রোথিত করিলেন, যাহা হইতে তিনি মূর্চ্ছাভঙ্গের পর উত্থিত হইয়া দূরদেশে গমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। গমনকালে একবার শিষ্যবর্গকে অতি সংগোপনে দর্শন দিয়া দুই চারিটী অতি আবশ্যকীয় কথা বলিয়া যান। আমেরিকার Anglo-Indian Book Company কর্ত্তৃক প্রকাশিত The Story of Crusifixion by an Eye-witness নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে স্বয়ং খৃষ্টীয়ান লেখকই সাক্ষ্য দিতেছেন। লেখক বলেন, যিশু ত ক্রুশারোপিত হইয়াও আবার উদ্ধার পাইলেন, কিন্তু তাঁহার এই উদ্ধার বার্ত্তা প্রকাশ করা তাঁহার শিষ্যগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল—কারণ ভবিষ্যতে আরও ইহা অপেক্ষা কঠোরতর কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল। পক্ষান্তরে ইহুদী সম্প্রদায় সুযোগ বুঝিয়া দ্বিতীয় বিবরণের ২১ অধ্যায় ২৩ পদ উদ্ধার করিয়া প্রচার করিয়াছিল যে, যিশুর ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নহেন। যে হেতু লিখিত আছে, "যে ব্যক্তিকে বৃক্ষে টাঙ্গান যায়, সে পরমেশ্বরের অভিসম্পাতগ্রস্থ।" ফলে খ্রীষ্টীয়ানগণ ভারী সমস্যায় পতিত হইল। শিষ্যগণ ত ভবিষ্যৎ আশঙ্কার ভয়ে যিশুর জীবন আছে বলিয়া প্রচার করিতে অক্ষম, অথচ তাঁহারা জানেন যে তিনি যদি মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করা হয়, তবে সব কুল যাইবে। এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় তাঁহাদের নিকট পৌলের এই চাতুরীপূর্ণ কথা বড়ই ভাল লাগিল, তাই সকলেই এ কথা আন্তরিক ভাবে না হউক বাহ্যতঃ স্বীকার করিয়া লইলেন। পরিণামে ইহা দ্বারা যদিও ضل ضلالا بعيدا হইয়া পড়িল, তথাপি আপাততঃ ইহুদীকুলের মুখ বন্ধ করিবার পক্ষে একটা সুবিধা হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় এই ত্রুর্ব্বোধ্য যুক্তি যে উদ্দেশ্যেই খাটান হইয়া থাকুক না কেন, এখন কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান

পাদ্রী সম্প্রদায় চক্ষু বুজিয়া এই মত প্রচার করতঃ তথাকথিত ধর্ম্মান্বেষীর নিকট বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন।

মোট কথা এই যে, প্রায়শ্চিত্ত বাদ যিশু বা তাঁহার কোন শিষ্যের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই। পৌল ইহার উদ্ভাবক এবং প্রচার কর্ত্তা। এই জন্যই তাঁহার সহচর সাধুবর্গ স্বস্ব প্রণীত সুসমাচারের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, "কার্য্যকারণ পরম্পরায় আমি বড়ই দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, পৌল পর্য্যন্ত সয়তানের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছেন।" কিছু দিন হইল জুরিচ বিশ্ব বিদ্যালয়ের Dr. Arno'd Mayor নামক একজন জর্ম্মান ঐশীতত্ত্বাধ্যাপক Jesu or Paul (যিশু না পৌল) নামে একখানা পুস্তক প্রণয়ন এবং প্রচার করিয়াছেন। উহাতে তিনি নানাবিধ যুক্তি তর্কের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, যিশুর ঈশ্বরত্ব এবং তাঁহার আত্মত্যাগ মূলক যে মত আজ কাল খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, উহার সম্বন্ধে যিশু কিছুই জানিতেন না, সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। ইহা পৌলের উর্ব্বর মতিষ্ক প্রসূত একটা অভিনব মত।

যাহা হউক পৌল প্রায়শ্চিত্ত বাদ প্রচার করিয়া একজন প্রধান শিষ্য বলিয়া গণ্য হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা নিরক্ষর খৃষ্টীয়ান ব্যতীত অনেকেই (প্রতিবাদ করিতে সাহস না করিলেও) গ্রহণ করিতে পারেন নাই। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম এবং চার্চ্চের ইতিহাস (History of the Christian Religion and Church) প্রণেতা বলেন, এই মত (প্রায়শ্চিত্ত বাদ) দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিয়মিত এবং গৃহীত হয় নাই। যখনই নিয়মিত হউক না কেন, আজ কাল পাদ্রী সাহেবগণ ইহারই বলে ভারতেও দল বাড়াইয়া লইবার সুবিধা পাইয়াছেন। সকলেই জানেন যে নিজে না খাইলে ক্ষুধায় মরিতে হয় নিজকেই, ধর্ম্মের বেলায় কেন তাহারা "নিজে যাহা করি যিশুর রক্তে উদ্ধার পাইব" এই নীতিতে বিশ্বাস করেন, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে তাহা কুলাইয়া উঠে না। অন্যের কথা বলি না, কোরআন এই বিশ্বাসের খণ্ডনকল্পে কেমন যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতেছে, অদ্য তাহাই আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া আপাততঃ আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

প্রায়শ্চিত্ত বাদরূপ অযৌক্তিক মত খণ্ডনকল্পে পবিত্রতম গ্রন্থ কোরআন বলে,—

و لا تكسب كل نفس الا عليها و لا تزر وازرة وزر اخرى

অর্থ—কেহই নিজের জন্য ব্যতীত উপার্জ্জন করিবে না এবং এক ভারবাহী অপরের বোঝা বহন করিবেনা।" অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে একজনের উপার্জ্জনে বা এক জনের পূণ্য ফলে সকলে উদ্ধার পাইতে প্রত্যাশা কর, মনে রাখিও যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিবে—কেহই অপরের কর্ম্মফলজনিত ভোগের লাঘব করিতে পারিবে না। সেই মহা বিচারের দিনে, খোদাতাআলা বলেন,—

اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون

অর্থ—অদ্য আমি তাহাদের (মানব সম্প্রদায়ের) মুখের উপর ছাপ লাগাইয়া দিব (মুখ বন্ধ

করিয়া দিব—তাহাদের মুখে কিছু বলিতে দিব না) তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা তাহাদের হাত এবং পা'ই বলিয়া দিবে। তখন لاتجزی نفس عن نفس شیا و لا یقبل منها شفاعة

অর্থ—একজন অপর দ্বারা কোন ফল পাইবে না এবং তাহার সোপারিশও গ্রহণ করা হইবে না। যদি ত্রাণ পাইতে চাও—যদি অনন্ত জীবনের কামনা কর, তবে নিজে সাধু হও—অপরের মুখ চাহিয়া সংসার জীবনতরীর হাইল ছাড়িয়া দিয়া শান্তিময় খোদাতাআলার শান্তিময় রাজ্য পৃথিবীকে বাস্তবিক শান্তির আগার করিয়া তোল, পরকালেও শান্তি পাইবে—তখন বুঝিতে পারিবে,

من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحاً فلا نفسهم یمهدون لیجزی الذین آمنو و عملوا الصلحت من فضله انه لا یحب الکفرین

অর্থ—যে ব্যক্তি (খোদার নিকট) কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহার সেই কৃতঘ্নতার ফল তাহারই উপরে বর্ত্তিবে—নিজের পরকালের সম্বল করিয়া লইয়াছে। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে এবং সৎ কার্য্য সাধন করিয়াছে তাঁহার অনুগ্রহ হইতে তিনি তাহাদিগকে সুফল দান করিবেন। নিশ্চয়ই খোদাতাআলা অকৃতজ্ঞদিগকে ভাল বাসেন না।

নিজের সম্বল না থাকিলে অপরের দ্বারা যে কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না, একথা ত বাইবেলও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে, আমরা পূর্ব্বে মথির সুসমাচার হইতে এক পদ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়া দিয়াছি যে সামান্য তথাকথিত পুঁজিও পরকালে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু পবিত্র কোরআন বলে,—

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

অর্থ—যে ব্যক্তি একটী পুণ্য লইয়া আল্লার নিকট উপস্থিত হইবে, সে তাহার দশ গুণ ফল পাইবে। বল খৃষ্টীয়ান এখন তোমার বিবেকে প্রায়শ্চিত্ত বাদরূপ অশ্বডিম্বই ভাল লাগে, না এস্লামের বিবেকানুমোদিত বিধান সকল পালন করিয়া অনন্ত স্বর্গ পাইলে সুখী হও ?

মোহাম্মদ মোজফফরুদ্দীন।

কবিবর খোস্‌রো।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্য দেশের ইস্পাহান নগরে মহাকবি খোস্‌রো জন্মগ্রহণ করেন। কবির নাম 'হাকিম আমির নাসের খোস্‌রো; (حکیم امیر ناصر خسرو); তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে সুধী সমাজে নানা মুনির নানা মত; অনেকে তাঁহাকে মহা ধার্ম্মিক ও তাপসশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবার কেহ কেহ তাঁহাকে নাস্তিক ও পুনর্জ্জন্ম (تناسخ) স্বীকারকারী বলিয়া তাঁহার দোষকীর্ত্তনও করিয়াছেন। কবির ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে এইরূপ মত-দ্বৈধ থাকিলেও তাঁহার অসাধারণ মনীষা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসীম কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে কাহারও অন্য মত নাই। সকলেই তাঁহাকে মহা কবি ও মহা পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাকে যেরূপ কবিত্ব-শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ অসাধারণ তর্কশক্তিও দিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে পারিয়া উঠিতেন না; তাঁহার বিচারশক্তি (طرز مناظرہ) এরূপ সূক্ষ্ম ও তর্কের পদ্ধতি এরূপ অভিনব ছিল যে, প্রতিপক্ষ তাঁহার তর্কের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ-রূপে পরাস্ত হইয়া পড়িত। জীবনে তিনি কখনও কাহারও নিকট কোনও বিষয়ের বিচারে পরাজিত হয়েন নাই। এজন্য তৎসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "হোজ্জাৎ" (মূর্ত্ত প্রমাণ) নামে অভিহিত করিতেন। কবি অনেক স্থলে আপন কবিতা সমূহের ভণিতাতেও এই 'হোজ্জাৎ, (حجت) নাম ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কবিতা সমূহে সাধারণতঃ "খোসরো" নামই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কবি ইস্পাহান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গীলান প্রদেশে আসিয়া অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া তৎ প্রদেশস্থ পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত নানা বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, বলা বাহুল্য যে, সকলকেই তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই অভিমানে সাধারণ পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই তাঁহার শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া কবি সেখান হইতে খোরাসান অভিমুখে পলায়ন করিলেন, মধ্যপথে তাপসশ্রেষ্ঠ মহাত্মা আবুল হাসান খারকানীর (ابوالحسن خرقانی) পবিত্র ভজনালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন; পূর্ব্ব হইতেই সাধকপ্রবর, কবির আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎপূর্ব্ব দিবস আপন অনুচরগণকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এইরূপ আকারের একজন মহা নৈয়ায়িক তর্ক-সর্ব্বস্ব পণ্ডিত এখানে আগমন করিবেন, তাঁহার সম্মান, যত্ন ও অভ্যর্থনা সম্বন্ধে যেন কোন ত্রুটী না হয়। তিনি বিচারোদ্দেশ্যে কোন বিষয় উপস্থাপিত করিলে, তোমরা তাঁহাকে বলিবে যে, আমাদের গুরু আবুল হাসান একজন অশিক্ষিত ও গ্রাম্য প্রকৃতির লোক; শাস্ত্রালোচনার সহিত তাঁহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। এই বলিয়া তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। মহাকবি 'খোস্‌রো' যখন সেখানে উপস্থিত হইলেন, অনুচর-বর্গ পূর্ব্বাদেশানুযায়ী তাঁহাকে মহাত্মা আবুল হাসানের ভজনাগারে লইয়া গেলেন। তাপসশ্রেষ্ঠ

তখন ভগবদারাধনায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন; তাঁহার সেই যোগ-নিরত প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া মহাকবি 'খোসরো' এক প্রকার অমানুষিক ভাবাবেশে ভক্তি গদগদ-হৃদয়ে মহাপুরুষের পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন। কবিবর বলিয়াছেন যে, এই মহাপুরুষকে দেখিবা মাত্র আমার মনে যে, কি এক অভিনব ভাবের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত; ন্যায় দর্শন প্রভৃতি তর্ক-বহুল শাস্ত্রের আলোচনাতেই আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। ন্যায়ের কূট-জাল ছিন্ন করিয়া, দর্শনের গভীর গবেষণাপূর্ণ জটিল বিষয়ের সমাধান করিয়া সময় সময় কতই না আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি, হৃদয়ে কতই না গৌরব ও আনন্দানুভব করিয়াছি; কিন্তু আজ এই মহাপুরুষের পবিত্র চরণ দর্শনে আমার তাপদগ্ধ হৃদয়ে এরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল ও আমার মরু-সদৃশ অন্তঃকরণে এপ্রকার হৃদয়োন্মাদকারী শান্তি রসের সঞ্চার হইল যে, আমার ন্যায়-দর্শনের বাঁধ সমূহ ও তৎসম্বন্ধীয় বিচার বিতর্কের জঞ্জালরাশি তৃণবৎ কোন দিকে ভাসিয়া গেল; আমি আত্মহারা ও জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলাম। যখন জ্ঞান সঞ্চার হইল তখন চাহিয়া দেখিলাম, মহাপুরুষের যোগ ভঙ্গ হইয়াছে। তিনি আমার প্রতি করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাস্যে এই কবিতাটী আবৃত্তি করিলেন—

چند چند از حکمت یونانیان * حکمت ایمانیان را هم بخوان

"কত দিন, গ্রীসের দর্শন লইয়া আর কত দিন? আধ্যাত্মিকগণের দর্শনও একবার আলোচনা কর"

মহাকবি খোসরো বলিতেন যে, এত কাল ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় সংশয়ের যে সমস্ত আবর্জ্জনারাশি আমার মস্তিষ্কে স্তূপীকৃত হইয়াছিল; মহাপুরুষের পবিত্রমুখ নিঃসৃত এই সামান্য একটা কবিতা শুনিয়াই আমার মস্তিষ্ক হইতে তাহার অধিকাংশ দূরীভূত হইল। আমার হৃদয়ের সংশয়ান্ধকার অন্তর্হিত হইল। বিশ্বাসের পবিত্র জ্যোতি উষার নির্ম্মল আলোকের ন্যায় দেখা দিল। আমি ধন্য হইলাম। তখন করযোড়ে বিনীত ভাবে কিছুদিন আমাকে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দান করিবার জন্য নিবেদন করিলাম। মহাপুরুষ মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন, নির্ব্বোধ, তুমি চিরদিন অসম্পূর্ণ জ্ঞানরূপ মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ; পক্ষান্তরে আমার প্রথম জ্ঞান সঞ্চারেই আমি তোমাদের এই সকল অহমিকাপূর্ণ আত্মকলহ-বর্দ্ধক ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রকে চিরদিনের জন্য পরিবর্জ্জন করিয়াছি; সুতরাং আমার এই বিচার বিতর্কহীন ও দ্বন্দ্ব কলহ পরিশূন্য সংস্রব তোমার ভাল লাগিবে কেন? কবিবর খোসরো বলিলেন, হে মহাপুরুষ! আপনি বারম্বার ন্যায় ও দর্শন সম্ভূত জ্ঞান সমূহকে অসম্পূর্ণ জ্ঞান নামে অভিহিত করিতেছেন, اول ما خلق الله العقل সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সর্ব্বময়কর্ত্তা তাঁহার সৃজনক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞানবৃক্ষকেই রোপণ করিয়াছেন, ইহা কি আপনি অবগত নহেন; এরূপ অবস্থায় জ্ঞানালোচনা ব্যতীত মানবের মুক্তির উপায় কি? তাপস প্রবর মহাত্মা আবল হাসান হাঁসিয়া বলিলেন, সে জ্ঞান তোমাদের এ দ্বন্দ্ব

শাস্ত্রের জ্ঞান নহে, প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, তোমাদের এই সকল দ্বন্দ্ব-কলহ পূর্ণ শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানের প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া অজ্ঞানান্ধকার বাড়াইয়া দেয়। (عرفان الہی) বা আল্লাহ সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। যে জ্ঞান প্রভাবে (প্রেরিত মহা পুরুষগণ) পয়গম্বরগণ একটীমাত্র বর্ণ শিক্ষা না করিয়াও জ্ঞানের অবতার; এবং তোমাদের ন্যায় দর্শনের একটী সূত্রও না আওড়াইয়া মহা ন্যায়ের অবতার ও সর্ব্বদর্শী হইয়া গিয়াছেন। হে নির্ব্বোধ, গত রাত্রিতে তুমি প্রকৃত জ্ঞানকে উদ্দেশ করিয়া যে কয়টী কবিতা লিখিয়াছ, তোমার সেই উদ্দিষ্ট জ্ঞান কখনই প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই বলিয়া মহাপুরুষ সেই কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম দুই তিনটী পদ আবৃত্তি করিলেন। মহাকবি 'খোসরো' মহাত্মা আবুল হাসানের এই কথা শুনিয়া যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কারণ পূর্ব্ব রাত্রির রচিত কবিতাগুলির বিষয় এ পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও কিছু বলেন নাই; এবং তন্মধ্যে একটী কবিতাও তিনি কাহাকেও পড়িয়া শুনান নাই। মহাপুরুষের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া অনেক সাধ্য সাধনায়, মহাত্মা আবুল হাসানকে সম্মত করিয়া কিছুদিন কবি তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিলেন; এই সময় তিনি পার্থিব সকল চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া দিবারাত্রি আল্লার আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। কিছুকাল এইরূপে গত হইলে মহাপুরুষ আবুল হাসান তাঁহাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু উপদেশ দিয়া তীর্থ পর্য্যটনের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। কবি সেখান হইতে পূর্ব্বসঙ্কল্প মত খোরাসান প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন; এক্ষণে কবির আর পূর্ব্ব প্রবৃত্তি ছিল না। অনর্থক কাহারও সহিত কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তর্কের স্রোত প্রবাহিত করিতে তাঁহার আর ভাল লাগিত না; কিন্তু তৎপ্রদেশস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী মহামতি খোসরোর পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের বিচার করিতে উপস্থিত হইলেন। অগত্যা কবিকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হইল। অবশেষে শেষফল যাহা হইবার তাহাই হইল। তাঁহার বিচার শক্তিতে সকলেই পরাস্ত হইলেন; বিচারে পরাস্ত হইয়া সকলেই তাঁহার শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। খোরাসান প্রদেশের তৎসাময়িক প্রধান বিচারক (اقضی القضاة) নিশাপুরের অধিবাসী মহাত্মা 'আবু সোহেল,' কবিবর খোসরোকে বলিলেন যে, আপনি একজন সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত কুলরত্ন; কিন্তু হইলে কি হয়,

از من بگیر عبرت و کسب هنر مکن
با بخت خود عداوت هفت آسمان مخواه

(ক্রমশঃ)

কাজী নওয়াজ খোদা।

এই দূরতা দূর হবে।

এই দূরতা দূর হবে গো দূর হবে
তোমার মাঝে "আমি" আমার চুর হবে।

তোমার প্রেমে পরাণ আমার ভরবে গো
সকল আড়াল সমুখ হ'তে সরবে গো
তোমার ভাবে মানস আমার ভুর হবে।

রক্তে আমার তোমার ছবি রাজ্‌বে যে
শিরায় শিরায় তোমার বীণা বাজ্‌বে যে
তোমার আবাস মম হৃদয় পূর হবে।

প্রাণের আমার সকল দুয়ার খুল্‌বে গো
তোমার কোলে মধুর দোলে দুল্‌বে গো
তোমার নূরে সবি আমার নূর হবে।

সেখ হবিবর রহমান।
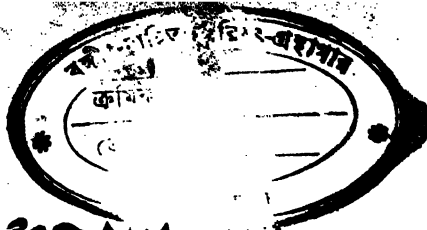
১ম ভাগ | অগ্রহায়ণ, ১৩২২ | ৮ম সংখ্যা

কবিবর খোস্‌রো।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আপনার গুণরাশিই আপনার দুঃখের ও কষ্টের কারণ হইয়াছে। আপনার গুণপনা, আপনার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া এ প্রদেশের সকলের হৃদয়েই ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। এখানকার সকলে মিলিয়া আপনার শত্রুতা সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। সুতরাং যথাসম্ভব শীঘ্র আপনি স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। কবিবর 'খোসরো' অগত্যা খোরাসান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছুদিন সকলের অজ্ঞাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে 'বলখে' অবস্থিতি করিলেন। তদন্তর শেষ অবস্থায় কবি বাদাখশানের পার্ব্বত্য অঞ্চলে পার্থিব সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া আল্লার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এই সময় তিনি খোরাসান প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি লিখিয়াছেন :—

بنالم بتو ات قدیم و قدیر * ز اهل خراسان صغیر و کبیر
چه کردم که از من رمیده شدند * همه خویش بیگانه برنا و پیر
مقرم بفرمان پیغمبرست * نه انباز گفتم ترانه نظیر
بامت رسانید پیغام تو * محمد رسولت بشیر و نذیر
قرآن را به پیغمبرت ناورید * مگر جبرئیل آن مبارک سفیر
مقدم بحشر و بمرگ و حساب * کتابت ز بر دارم اندر ضمیر

এই প্রকারে এস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে কবি আপন বিশ্বাস সমূহ বর্ণনা করিয়া অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন ; ইহার পর মহাকবি খোসরো আপন সমসাময়িক মুসলমানদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিয়া কতকগুলি কবিতা লিখেন ; পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে তন্মধ্য হইতে এই কয়টী উদ্ধৃত হইল :—

گوئي مرا كه گوهر ديوان ز آتش است * ديوان اين زمان همه از گل مخمرند
جز آدمي نژاد ز آدم درين جهان * اينها ز آدمند چرا جملگي خرند
دعوي كنند آنكه براهيم زاده ايم * چون نيک بنگري همه شاگرد آزرند
در بزم گاه مالک وطوف زبانے اند * اين ابلهان كه در طلب حوض كوثرند
خويشي كجا بود كه درانجا برادران * از بهر لقمهٔ همه خصم برادرند
آن سفيان كه سيرت شان بغض حيدرست * حقا كه دشمنان خدا و پيمبر اند
و آنانكه هست شان با بوبكر دوستي * چون دوستند چون همگي خصم حيدر اند
و آنانكه نيستند محبان اهل بيت * مومن مخوان شان كه بكافر برابر اند
گر عاقلي ز هر دو جماعت سخن مگوے * بگزار شان بهم كه افام نه قابرند
هان تو ازان گروه نباشي كه در جهان * چون گاؤ ميخورند و چون گرگان همي درند
نے كافرے بقاعده نه مومنے بشرط * همسائگان من نه مسلمان نه كافرند

কবির বক্তব্যের সার শেষোক্ত কবিতাটীর অর্থ এই যে, আমার প্রতিবাসিগণ ধর্ম্মের অনুশাসন হিসাবে, না মুসলমান, না কাফের ; তাঁহাদিগকে মুসলমান বলিতেও ইচ্ছা হয় না, কাফের বলিতেও মন চায়না।

কবির রচিত গ্রন্থাবলী ও তৎসমূহের প্রসিদ্ধি।

মহাকবি 'খোসরো' রচিত অনেকগুলি গ্রন্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে "দিওয়ান খোসরো" (ديوان خسرو), "রৌশনাম্নী নামা" (روشنائي نامه) ও "কানজুল হাকায়েক" (كنز الحقائق) সাহিত্য জগতে বিশেষরূপে পরিচিত ; তাঁহার সকল রচনাই হিতোপদেশ পূর্ণ। কবিরচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে "দিওয়ান খোসরো" নামক ত্রিশ হাজার কবিতায় পূর্ণ বিরাট গ্রন্থখানি পারস্য সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার জীবনকালেই এই গ্রন্থখানি সুধী সমাজে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল। কবিরচিত এই মহাপ্রসিদ্ধ 'দিওয়ান খোসরো' গ্রন্থখানি কবির বহুদিনের বহু আয়াসের ফল, অথবা সামান্য আয়াসে অল্পদিনে রচিত হইয়াছে, এই বিষয়টী লইয়া ঐতিহাসিক সমাজে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা প্রথমোক্ত মতেরই পক্ষপাতী ; কারণ ইতিহাস জগত আলোড়ন করিলে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে গ্রন্থ রচনা করিতে গ্রন্থকার যত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ সাধারণে ততই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিখ্যাত ইংরাজ লেখক 'লর্ড মেকলে' সাহেবকে উপস্থিত করা যাইতে পারে, তাঁহার রচিত একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 'খসড়া' লণ্ডন মিউজিয়মে রক্ষিত রহিয়াছে। সেটীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এক একটী জায়গা কতবার লিখিয়াছেন, কতবার কাটিয়াছেন, আবার লিখিয়াছেন, অধিকন্তু যে স্থানটীতে তিনি অধিক 'কাট ছাঁট' করিয়া অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, গ্রন্থের মধ্যে সেই স্থানটীই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কবিত্বশক্তি ও কবিতা সমালোচনা।

মহাকবি খোসরোর কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাহিত্যাকাশের পূর্ণ শশধর মহাকবি সেখ সাদীকে বাদ দিলে পারস্য কবিদের মধ্যে সরল ভাষায় উচ্চদরের কবিতা লেখক তাঁহার ন্যায় আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার কবিতা সমস্ত যেমন প্রাঞ্জল তেমনি হৃদয়গ্রাহী; পারস্য কবিতায় যে সমস্ত গুণের আবশ্যক, তাঁহার রচিত কবিতা সমূহে সে সমুদয় প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার লিখিত কবিতা সমূহের ভাবরাজ্যে প্রবেশলাভ করিতে কাহাকেও শব্দ-প্রাকারে মাথা কুটিতে হয় না। তিনি হাফেজের ন্যায় সুফী ভাবাপন্ন ও সাদীর ন্যায় সরল লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক কবিতা সাধারণ সমাজে কথাবার্ত্তার মধ্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় মহাকবি খোসরো জীবিতকালে কখনও সুখ ও শান্তির মুখ দেখিতে পান নাই। সমসাময়িক পণ্ডিত মণ্ডলীর ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে প্রবাসগমনে ও তীর্থ পর্য্যটনেই তাঁহার পবিত্র জীবন শেষ হইয়াছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় বিরত ছিলেন না।

মৃত্যু ও সমাধি।

৪৩১ হিজরীতে প্রায় অশীতবর্ষ বয়সে কবি মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাংসারিক সকল অশান্তি, সকল দুঃখ-কষ্ট বিশেষতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের প্রবল ঈর্ষা ও দ্বেষের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। 'বাদাখ্‌শানের' অন্তর্গত 'দারায় এম্‌কান্' নামক স্থানে কবির সমাধি প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপ্রদেশস্থ সকলেই তাঁহার পবিত্র সমাধির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।*

হায়! আজি মহাকবি 'খোসরো' কোথায়, তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তিই বা কোথায়!! আর

---

* কবি আছেন, কারণ, তাঁহার কাব্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনার শত্রুদিগকেও 'অমর' করিয়া গিয়াছেন। জ্যোৎস্না রজনীর পূর্ণ সুষমা অনুভূত করিতে হইলে তাহার এক পার্শ্বে অন্ধকারকেও স্থাপন করিতে হয়। ঐতিহাসিকগণ এই হিসাবে সেই ক্ষমতা ও প্রতিভা হীন ঈর্ষানল-দগ্ধ কবির চির শত্রুদিগকেও তাহার স্থান দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের কোন কারণই নাই, কারণ ইহা জগতের চিরন্তন প্রথা। কোন জাতির ইতিহাসে এমন একজন লোকের সন্ধান পাওয়া যায় না, যিনি স্ব সমাজের ঈর্ষানল-দগ্ধ স্বার্থপর ও অন্ধবিশ্বাসী লোকদিগের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে নিগৃহীত ও নির্য্যাতিত না হইয়া মহত্বের সিংহাসনে আরোহণ করিতে বা স্ব সমাজের কোন প্রকার মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হায়—

خون دل پینیکو اور لخت جگر کھانیکو

یہ غذا ملتی ہیں جانان تیرے دیوانیکو

—সম্পাদক।

তাঁহার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ও তাহাদের সেই দারুণ ঈর্ষানলই বা কোথায়। কালস্রোতে সমস্তই কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। অহো কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন :—

گرت رنجے رسد مخراش و مخروش * توکل کن بفضل بے نیازی

وگرنه چند روزے صبر فرما * نه او ماند نه تو نه فخر رازی

কাজী নওয়াজ খোদা।

মোস্তফা চরিতালোচনা।

(৬)

বিদ্রোহ দমন।

(১) বনি কায়নোকা। হজরত মোহাম্মদ মদিনায় যাওয়ার পর, মদিনা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহের ইহুদী ও অন্য অধিবাসীগণের সহিত তাঁহার যে সন্ধি হইয়াছিল, তৎসূত্রে সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসিগণ সুখশান্তির সহিত অবস্থিতি করিতেছিল। ঐ সন্ধির আভাষ পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। উহাতে অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে ইহাও উল্লেখ ছিল যে, "কোন শত্রু মদিনা আক্রমণ করিলে ইহুদিগণ মুসলমানগণের সহযোগী হইবে ও উভয় জাতি একত্রে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শত্রুকে তাড়াইয়া দিবে। ইহুদী ও মুসলমান স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম্ম পদ্ধতি পালন করিবে, তাহাতে কেহ কাহারও প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। ইহুদী বা মুসলমান, যে কেহ অপরাধের কার্য্য করিবে, তাহাকেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে—কেহ অপরাধীর সহায়তা করিবে না। উভয় জাতি সখ্য সদ্ভাবে কালযাপন করিবে। মুসলমানেরা ইহুদিগণের উপর কোন অত্যাচার করিবে না।"

কিন্তু, ইহুদিগণ সেই সন্ধি সর্ত্তের বিপরীত মুসলমানগণের দুর্ণাম জনক সঙ্গীত রচনা করিয়া দুয়ারে দুয়ারে গান করাইত। মুসলমানদিগকে অপমানজনক কবিতা শুনাইত। ইহুদী আবাল বৃদ্ধ বনিতা, মুসলমান দেখিলেই হাততালি দিয়া বিদ্রূপ করিত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিত। এইরূপে তাহারা মুসলমানদিগকে উত্যক্ত করিয়াছিল। তাহার উপর দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ জন্য মুসলমানেরা মদিনার বাহিরে গেলে বনি কায়নোকা সম্প্রদায়ের ইহুদীগণ সুযোগ পাইয়া এক রকম সন্ধি সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই বদর ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুসলমানদিগকে তদ্বিষয়ের প্রতিকার করিতে হয়।

হজরত মোহাম্মদ যখন বদর যুদ্ধে নিয়োজিত, তখন বনি কায়নোকা সম্প্রদায়ের এক দুষ্ট ইহুদী দিনদুপরে প্রকাশ্য বাজারে এক মুসলমান মহিলার লজ্জাশীলতায় হস্তক্ষেপ করিল। মুসলমানেরা তখন মদিনার রাজ জাতি বলিয়া প্রতিভান্বিত। ঐ রাজ জাতীয় রমণীর প্রতি অত্যাচারে এক বীর হৃদয় মুসলমান অতিশয় কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ পাপাচার ইহুদীর পাপ দেহ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার পাপের সমুচিত শাস্তি দিলেন। সন্ধিতে সর্ত্ত ছিল;—অপরাধী শাস্তি পাইবে, কেহ তাহার সহায়তা করিবে না। কিন্তু বনি কায়নোকা সম্প্রদায় উক্ত সর্ত্ত অবহেলা করিয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া ঐ দণ্ড দাতা মুসলমানকে ঘিরিয়া মারিয়া ফেলিল।

হজরত মোহাম্মদ সন্ধিসর্ত্ত পালনে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন—ন্যায় বিচার করিতেন, বিচার ক্ষেত্রে মুসলমানের পক্ষাবলম্বন করিতেন না। একদা এক ইহুদী ও এক মুসলমানে কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে, উভয়ে হজরত মোহাম্মদকে সালেস্ মান্য করে। বিচারে ইহুদীর জয়লাভ হয়। বিচার প্রার্থী মুসলমান বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ হজরত ওমরবেন খাত্তাব তাহার মাথা উড়াইয়া দেন।

এ ক্ষেত্রে ইহুদীরা ঐ বিচারের ঠিক বিপরীত কার্য্য করিল। অপরাধী শাস্তি পাইল—তার জন্য ইহুদীরা শাস্তি দাতাদিগকে বধ করিল। ঐ বিচার প্রার্থী মুসলমান হজরত মোহাম্মদের বিচারে অসন্তুষ্ট হওয়ায় যেমন মুসলমানের হস্তেই শাস্তি পাইয়াছিল, এখানে ইহুদীরা সেইরূপ ভাবে অপরাধী ইহুদীর শাস্তি বিধান করিলেই ঠিক হইত।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ গিবন ইহুদীদের সহিত যুদ্ধ ঘটনাটা খ্যাতনামা আরব ঐতিহাসিক আবুল ফেদার ইতিহাসে উক্ত হওয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে আবুল ফেদা ও অন্যান্য আরব ঐতিহাসিকেরা কি বলিয়াছেন, মিঃ গিবন তাহার কিছুমাত্র আভাষ না দিয়া হজরত মোহাম্মদ বদর যুদ্ধে জয়লাভ করার পরই বনি কায়নোকাকে আক্রমণ করার কথা লিখিয়াছেন। সার উইলিয়াম মুর সাহেবের সুর কিছু অধিক চড়িয়াছে, তিনি নারীনিগ্রহের ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর না থাকা ও বনি কায়নোকার ইহুদীগণ সম্পূর্ণ নিরপরাধ থাকা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

মুর সাহেবের নিকট নারীনিগ্রহ ব্যাপারটা অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে—কিন্তু ধর্ম্ম প্রাণ মুসলমান জাতির (যাহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র কোরআন শরীফ জগতে নারী সম্মানের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইয়াছে, সেই জাতির) নিকট অতীব ভয়ঙ্কর অপরাধ। নারী নিগ্রহ অপরাধের নিদারুণ প্রতিকার করা চিরন্তন প্রথা। সীতা নিগ্রহের অপরাধে রাবণ কে স্ববংশে ধ্বংস হইতে হইয়াছিল। কীচক দ্রৌপদীর নারী ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করায় মহাবল ভীম তাহার প্রাণ সংহারে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট ভ্যালেন্টিনিয়ান, রোম নগরের সেনেট হাউসের সম্মানিত সভা ম্যাক্সিমসের (maximus) পতিব্রতা পত্নীর সতীধর্ম্ম কলুষিত করিয়াছিলেন, এই অপরাধে গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা ভ্যালেন্টিনিয়ানের প্রাণ হনন করা হইয়াছিল।*

* গিবন তৃঃ ভঃ ৪৭৮—৪৭৯ পৃঃ।

সুতরাং নারী নিগ্রহের অপরাধে ইহুদীর প্রাণ বধ করায় ঐ মুসলমান কোনরূপে দোষী হইতে পারেন না।

যাহা হউক, হজরত মোহাম্মদ বদর যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বনি কায়নোকার ঐ অন্যায় কার্য্যের কৈফিয়াত চাহিলে, ঐ সম্প্রদায়ের ইহুদীগণ উদ্ধতভাবে উত্তর করিল "যাও আমরা বদর যুদ্ধের কোরেশের মত কাপুরুষ নহি। ক্ষমতা থাকে ত আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" এই বলিয়া তাহারা তাহাদের নিকটস্থিত সন্ধিপত্র ফিরাইয়া দিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিল।* সন্ধি ভঙ্গকারী বনি কায়নোকার তাদৃশ অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য এবং দাম্ভিকতা হজরত মোহাম্মদের সহ্য হইল না, তিনি দ্বিতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে ঐ ইহুদীগণের পল্লী অবরোধ করিলেন। ঐ অবরোধে বনি কায়নোকা বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইল, বুঝিল—মুসলমানদিগের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হওয়া ও অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা—এই ভয়ে তাহারা তাড়াতাড়ি সন্ধি প্রস্তাব উত্থাপন করিল। কিন্তু তাহারা মদিনার সীমার মধ্যে থাকিলে, মুসলমানদিগকে বারংবার বিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবে, এই দূরদর্শিতা বশতঃ হজরত মোহাম্মদ তাহাদের প্রস্তাবিত সন্ধিতে সম্মত হইলেন না। তাহাদের মদিনা ত্যাগ করা স্থির হইল এবং শেষে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া ও আপনাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি লইয়া মদিনা হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

(২) কায়াবের পরিণাম। কায়াব বেন আশরফ্ নামে এক প্রসিদ্ধ ইহুদী কবি ছিল। ঐ কবি গা ঢাকা দিয়া মুসলমানের দলে থাকিত, কিন্তু মুসলমানগণের সমস্ত গুপ্ত মন্ত্রণা কোরেশদিগকে জানাইয়া দিত। তদনন্তর মুসলমানেরা বদরযুদ্ধে জয়লাভ করার পরই ঐ কবিপুঙ্গব সন্ধিসর্ত্ত ভাঙ্গিয়া মক্কায় গিয়া কোরেশদলে মিশিয়া পড়িল। বদরযুদ্ধে কোরেশদিগের শোচনীয় পরিণাম—ঐ কবির কল্পনা প্রভাবে ও কাব্যালঙ্কারে শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া মক্কার ঘরে ঘরে শোকতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া সমস্ত নর নারীকে ক্ষেপাইয়া তাহাদের নিকটে মুসলমান মাত্রকেই ঘৃণিত করিয়া তুলিল এবং তাহাদিগকে মদিনা আক্রমণে উত্তেজিত করিয়াছিল। কায়াবের কবিতার তেজস্বিনী ও মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষাই, ওহদ যুদ্ধে কোরেশ কুলাঙ্গনাগণের বীরাঙ্গনাবেশ ধারণের প্রধান কারণ।

তৃতীয় হিজরীর রবিওল আউওল মাস—৬২৪ খৃষ্টাব্দ—হজরত মোহাম্মদ বিপক্ষের আক্রমণ রোধ জন্য নজদ প্রদেশে গিয়াছেন, সেই সময়ে কায়াব, মক্কা হইতে মদিনায় ফিরিয়া গিয়াছে। কায়াবের শাস্তি দিবার ঐ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আনসারদলের মোহাম্মদ বেন্ মোসায়লেমা নামক এক বীর পুরুষ অপর চারিজন সঙ্গী লইয়া রজনীর অন্ধকারে তাহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিত বধের ন্যায়,—

" আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু,
ছাড়েরে কিরাত তারে—?"—ঘটনার অনুসরণে তাহাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন।

---

* তারিখ এবনে আসির ২য় খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা।

স্যার উইলিয়ম মুর প্রমুখ লাইফ লেখকেরা কায়াবের ঐ গুরুতর অপরাধগুলি চাপা দিয়া, তাহার হত্যার জন্য হজরত মোহাম্মদকে দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ ত ঐ ঘটনার সময় মদিনাতেই ছিলেন না; আর এ কালেও যাঁহারা রাজগণের বিরুদ্ধে উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা দান করেন, তাঁহাদের দুর্দ্দশা ভাবিয়া দেখিলে কায়াবের অপরাধ যে অমার্জ্জনীয় তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এমত অবস্থার তর্কস্থলে তাহার হত্যাটা হজরত মোহাম্মদের জ্ঞাতসারে হওয়া ধরিলেও, তাঁহার ঘাড়ে দোষ চাপাইতে পারা যায় না।

(২) [ক] **আসামার হত্যা।** এ ব্যাপারও ৬২৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা; এ ঘটনাতে হজরত মোহাম্মদের কোন সম্বন্ধ না থাকা সত্বেও, কোন কোন ইউরোপীয় লেখক, তাঁহাকে তজ্জন্য দায়ী করিয়াছেন। ব্যাপার এই যে—আসামা নাম্নী ইহুদী রমণীর স্বামী ওমর, মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করায়, তাহাদের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিশেষ অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল। আসামা গায়িকা—গান বাঁধা ও গান করা তাহার এক রকম ব্যবসায় ছিল। স্বামী এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর এসলাম ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া সে স্বামীর কুৎসামূলক গান করিয়া বেড়াইত। পরিত্যক্ত-পত্নীর বিদ্বেষ-বিষ-বিমিশ্রিত সঙ্গীতে কুপিত হইয়া ওমর, গভীর রজনীতে তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিল। আসামার হত্যার পূর্ব্বে, হজরত মোহাম্মদ তদ্বিষয় বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন না; পরে উহা তাঁহার শ্রবণ গোচরীভূত হইয়াছিল।

এখনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য বশতঃ কত স্ত্রী, স্বামীর হাতে মারা পড়িতেছে, কত স্বামী প্রিয়তমা পত্নীর কর কমলের সাদরোপহার স্বরূপ হলাহল ভক্ষণ করিয়া ভব নদী পার হইতেছে। এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াও যাঁহারা আসামার হত্যা জন্য হজরত মোহাম্মদের নিন্দাবাদ করেন, তাঁহাদের ছিদ্রান্বেষণকে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত!

(২) [খ] **আবু আফাকার হত্যা।** ইহাও ৬২৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। আবু আফাকা নামক এক বৃদ্ধ ইহুদীও মুসলমানদিগকে বিদ্রূপ ও নিন্দা করিত এবং কবিতা রচনা দ্বারা আরবজাতিকে মুসলমানের সহিত যুদ্ধে উত্তেজিত করিত। তাহার সেই অপরাধে সালেম (সালেম বেন্ আমির) নামক জনৈক মুসলমান তাহার প্রাণ বিনাশ করেন। এ ঘটনার বিষয়েও হজরত মোহাম্মদ কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। কিন্তু এ অপরাধের জন্যও কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের বিচার বিবর্জ্জিত অতি রঞ্জিত বর্ণবিলিপ্ত কর তুলিকা, হজরত মোহাম্মদের কুৎসিত চিত্র সাধারণ সমক্ষে আঁকিয়া দিয়াছে। আজিও বিবাদবশে দলাদলি মূলে ঐরূপ কত শত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে; সেজন্য কি সমাজের নেতৃগণ দায়ী?

(৩) **বনি নোজায়রের নির্ব্বাসন।** আমর পলায়মানাবস্থায় প্রতিহিংসা বশে পথি-মধ্যে বনি-আমের বংশীয় দুই নিদ্রিত ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলার কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু, তাহারা সন্ধির নিয়মানুসারে মুসলমানের অবধ্য ছিল। বনি আমের সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্ম্ম প্রচারকদিগের হত্যাকাণ্ডে একেবারে নির্লিপ্ত ছিল। আমর ভুল ধারণার বশে তাহাদের

উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। আমর মদিনায় ফিরিয়া গেলে, ঐ নির্দ্দোষ ব্যক্তিদ্বয়ের অকারণ হত্যার জন্য হজরত মোহাম্মদ অতিশয় দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইলেন।

মদিনার বনি নোজায়েরের সম্প্রদায়ের ইহুদিগণ, বনি আমের সম্প্রদায়ের ও মুসলমানের সন্ধির মধ্যস্থ ছিল। কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে ভুলক্রমে বধ করা হইলে, তাহার বিনিময়ে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদিগকে অর্থদানের ব্যবস্থা কোরআন শরীফে আছে। ঐ ব্যবস্থানুযায়ী নিহত বনি-আমেরদ্বয়ের ওয়ারিছদিগকে অর্থদানের জন্য হজরত মোহাম্মদ স্বয়ং বনি নোজায়ের সম্প্রদায়ের পল্লিতে গিয়া বনি আমের দ্বয়ের হত্যা ঘটিত ব্যাপার সমস্ত খুলিয়া বলিয়া তাহাদের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিলেন ও ব্যবস্থা মত অর্থদানেও স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু, দুষ্টমতি ইহুদীগণ সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিল না। পূর্ব্ব হইতেই বিদ্রোহ বাধাইবার জন্য তাহারা ষড়যন্ত্র করিতেছিল—বনি আমেরদ্বয়ের হত্যা ব্যাপারে তাহারা আবার একটা নূতন সুযোগ পাইয়া বসিল। হজরত মোহাম্মদ এক দেওয়ালের নীচে বসিয়াছিলেন, এক দুষ্ট ইহুদী একখানা বড় পাথর লইয়া চুপে চুপে ঐ দেওয়ালের উপরে উঠিল। হজরত মোহাম্মদ দৈবযোগে ইহুদীর ঐ দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িলেন; নচেৎ তখনই পাথর চাপা পড়িয়া তাঁহাকে নরধাম পরিত্যাগ করিতে হইত। বনি নজায়ের সম্প্রদায়ের ইহুদীগণের ঐ গুপ্ত ষড়যন্ত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল, আরও ওহদ যুদ্ধের পর মুসলমানগণের উচ্ছেদ সাধনে, তাহারা কোরেশ দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করার ব্যাপার প্রকাশ পাইল।*

উপরি বর্ণিত ঘটনানুসারে বনি নোজায়েরগণ মুসলমানের প্রধান শত্রু মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং হজরত মোহাম্মদ তাহাদিগকে অবিলম্বে মদিনার বাস ত্যাগ করিবার আদেশ করিলেন। ঐ আদেশ পালন করিতে তাহারা প্রথমত প্রস্তুত ছিল; কিন্তু কুট বুদ্ধি আবদুল্লা মোনাফেকের কুপরামর্শে ও উত্তেজনায় তাহারা মদিনার বাস ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে উদ্যত হইল। অতএব হজরত মোহাম্মদ সদল বলে চতুর্থ হিজরীর রবিয়ল আউওল মাসে (৬২৫ খৃঃ অঃ) তাহাদের পল্লী অবরোধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহাদের দর্প চূর্ণ ও আস্ফালন দূর হইল—তাহারা হজরত মোহাম্মদের প্রথমাদেশ পালনে স্বীকৃত হইল। বনি কায়নোকাদিগের ন্যায় তাহারাও অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া এবং পরিবার ও দ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদি লইয়া মদিনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(৪) বনি কোরায়জার নিপাত সাধন। খন্দক যুদ্ধের বর্ণনা স্থলে, বনি কোরায়জা সম্প্রদায়ের ইহুদীগণের বিদ্রোহের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সার উইলিয়াম মেওর (মুর নহেন) ঐ বিদ্রোহ ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।† বদর সময়েও ঐ ইহুদীগণ ভিতরে ভিতরে কোরেশদিগকে সহায়তা করারও প্রমাণ পাওয়া যায়। খন্দকের

* বনি নোজায়েরদিগের কোরেশের সহিত ঐ ষড়যন্ত্রের বিষয় "মাদারজন নবুওৎ" নামক প্রসিদ্ধ পারস্য পুস্তকে উক্ত হইয়াছে।

† Life of Mahammad Vol VI page 259.

অবরোধ ত্যাগ করিয়া আরবেরা চলিয়া গেলেও, ঐ ইহুদীগণ মুসলমানের অনিষ্ট সাধনোদ্দেশে তাহাদের এক প্রধান শত্রু ইহুদীকে আপনাদের দুর্গ মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।* ঐ সকল কারণেই হজরত মোহাম্মদ খন্দকের অবরোধ অবসানে বনি কোরায়জাদিগের দুর্গাবরোধ করেন। (পঞ্চম হিজরীর জিকায়দা মাস—৬২৭ খৃষ্টাব্দ)

বনি কোরায়জা—২৫ দিন পর্য্যন্ত দুর্গবদ্ধ থাকিয়া ও অবরোধ মোচনের জন্য বলক্ষয় করিয়া আপনাদিগকে হতবল করিয়া ফেলিল। শেষে গত্যন্তর না দেখিয়া বনি নোজায়ের দিগের ন্যায় নির্ব্বাসন দণ্ডের প্রার্থনা করিল। হজরত মোহাম্মদ সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে আত্ম সমর্পণের আদেশ দিলেন—কিন্তু তাহাতে তাহারা সম্মত হইল না। অবশেষে—বনি কোরায়জা দিগের প্রাচীন বন্ধু, আউস্ সম্প্রদায়ের সাদ বেন্ মায়াজ নামক এক সম্মানিত মহা পুরুষকে উভয় পক্ষ বিচারক নির্ব্বাচন ও মনোনীত করিলেন। তিনি যে বিচার করিবেন, তাহাতে উভয় পক্ষ বাধ্য হইবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় উভয় পক্ষ আবদ্ধ হইলেন।

বনি কোরায়জা ও বনি আউস, এই উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বরাবর বন্ধুত্ব ও সখ্য সদ্ভাব চলিয়া আসিতেছিল। বনি আউসদিগের সরদার সাদ, এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, তাঁহার সহিত বনি কোরায়জা গণের কোন রূপ অসদ্ভাব ঘটে নাই; তাহা হইলে তাহারা কখনও তাঁহাকে বিচারপতি মনোনীত করিত না। সাদ বিচারাসনে বসিয়া প্রমাণাদি গ্রহণে বনি কোরায়জা দিগকে বিদ্রোহের ও মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড় যন্ত্রের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ভাবিলেন বিদ্রোহীবর্গের মধ্যে বনি কোরায়জাই এসলামের প্রধান শত্রু। বনি কায়নোকা ও বনি নোজায়ের যেমন মদিনা ত্যাগ করিয়া গিয়াই নীরব হইয়াছে, ইহারা ঐ ভাবে মদিনা ত্যাগ করিয়া গেলে, নীরব থাকিবে না, এবং মুসলমানগণকে ত্রস্ত ব্যস্ত করিতে ছাড়িবে না। ইহারা পূর্ব্ব নির্ব্বাসিত ইহুদী সম্প্রদায় ও অপর আরব সম্প্রদায় দিগকে লইয়া একটী প্রবল দল গঠিত করিয়া সর্ব্বদা মুসলমানগণের উপর খড়্গ হস্ত হইয়া থাকিবে। ইহাদের দমন জন্য সর্ব্বদা মুসলমানদিগকে সশস্ত্র ও সতর্ক থাকিতে হইবে, জাতীয় উন্নতি বিষয়ক কোন কাজ হইতে পারিবে না। অতএব তিনি প্রমাণাভাবে ৩ জনকে মুক্তি দিয়া অপর ২৫০ শত অপরাধী বনি কোরায়জার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। দণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীলোকগণকে মুসলমানের দাস দাসী করিয়া লইবারও আদেশ হইল।

মিঃ গিবন, সার উইলিয়ম মুর ও সেল সাহেব প্রমুখ ঐতিহাসিক ও লেখকগণ দণ্ডিত বনিকোরায়জার সংখ্যা ৭০০ শত পর্য্যন্ত বাড়াইয়াছেন।† শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় মুর ও সেল সাহেবের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন—

* মাদারজন্ নবুওৎ, ২য় খণ্ড—২৩৭ পৃঃ।

† গিবনের রোমান এম্পায়ারের ইতিহাস ৫ম খণ্ড—৩৬৫ পৃষ্ঠা, মুর সাহেবের মোহাম্মদ এবং এসলাম নূতন সংস্করণ ২২শ অধ্যায় এবং সেল সাহেবের ইংরাজি অনুবাদিত কোরআনের ৩৩শ সুরার পাদ টীকা।

সাদ খন্দক যুদ্ধে বনি কোরায়জাদিগের হস্তে সাংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এজন্য বিচারে তাহাদের প্রতি নৃশংস দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।* উত্তরে আমরা বলিতেছি, যাহাদের নৃশংসতা সম্বন্ধে ঐ লেখক মহাশয়েরা যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাদ আহত হইয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু সেই জন্য দণ্ড প্রদানে তিনি নির্দ্দয়তা বা কঠোরতা অবলম্বন করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তেমন প্রকৃতির লোক হইলে বা তাঁহার প্রতি বিচার বিভ্রাটের কোনরূপ আশঙ্কা থাকিলে, বনি কোরায়জা কখনও তাঁহাকে বিচারভার অর্পণ করিত না। রজ্জু ভ্রমে সর্পকে আলিঙ্গন করিত না, সুধা ভ্রমে গরল খাইয়া জর্জ্জরিত হইত না। তাহারা নিরেট বোকা ছিল না, বিচার-বিভ্রাটের আশঙ্কাতেই তাহারা হজরত মোহাম্মদের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে পারে নাই। আর যদি আমরা সাদের প্রদত্ত দণ্ডের গুরুত্ব সম্বন্ধে ঐ লেখকগণের উল্লেখিত কারণই মানিয়া লই, তাহা হইলে বলিব, বনি কোরায়জা সাদকে বিচারক পদে বরিত করিয়া, আপনাদের পায়ে আপনারাই কুঠারাঘাত করিয়াছিল। তাহারা আত্মসমর্পণ করিলে করুণহৃদয় হজরত মোহাম্মদ কখনও তাহাদের প্রাণ বধ করিতে পারিতেন না; বধ করেন নাই এবং দয়া প্রভাবে বধ করিতে পারেন নাই, এ রকম প্রমাণের অভাব নাই; তৎসমুদয় পাঠককে ক্রমান্বয়ে দেখাইয়া যাইব।

বনি কোরায়জা যে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধী ছিল, তাহা উক্ত লেখকগণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই এবং অস্বীকারের উপায়ও নাই। এমতাবস্থায় যাঁহারা সাদের দণ্ডাজ্ঞাকে নৃশংসাচরণ বলিয়া মনে করিয়া, তাঁহার দিকে রোষ রুষায়িত দৃষ্টিপাত করিতে চান, আমরা তাঁহাদিগকে এ কালের সত্যযুগের বিচারপতিদিগের ষড় যন্ত্র সম্বন্ধীয় অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা গুলি সমালোচনা করিতে সবিনয়ে অনুরোধ করি। যাঁহারা বনি কোরায়জাদিগের সহানুভূতি জন্য অশ্রুপাত করিতে ও সাদকে ধিক্কার দিতে চান, ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া এই সত্য যুগের বিদ্রোহী দিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহদের দ্বিধা ঘুচিয়া যাইবে।

বনি কোরায়জা শুধুই ষড় যন্ত্র কারী ও নাম মাত্র বিদ্রোহী ছিল না—তাহারা খন্দক যুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। (এ ঘটনা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কেননা, মিঃ সেল ও মুর প্রমুখ লেখকগণ, এই যুদ্ধে বনি কোরায়জার হাতে সাদ আহত হওয়া হেতুবাদে, তাঁহাকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত করিয়াছেন।) এ কালের ভারত বর্ষের দণ্ডবিধিতে ঐ শ্রেণীর অপরাধে প্রাণদণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে। দুঃখের বিষয়—বিজাতীয় লেখকগণ সকল দিক্ না দেখিয়া ও পর্য্যালোচনা না করিয়া "যত দোষ নন্দঘোষ" প্রবাদের অনুকরণে হজরত মোহাম্মদের উপর কেবল দোষের বোঝাই চড়াইয়া দেন।

কেবলা পরিবর্ত্তনের আপত্তি খণ্ডন। গিবন ও মুর সাহেব বলেন—হজরত মোহাম্মদ মদিনায় গিয়া প্রথম প্রথম যীরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া নামাজ করিতেন। মুসলমানেরা

* এস্‌লাম কাহিনী—৪০ পৃষ্ঠা।

যে দিকে মুখ করিয়া নামাজ করেন, ঐ দিক্ কে "কেবলা" বলেন। মদিনা ও তৎ সন্নিকটস্থ ইহুদীগণ মনে করিয়াছিল, যখন মোহাম্মদ যীরুজালেম কে কেবলা বাজায় রাখিয়াছেন, তখন তিনি কোন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহেন, বরং মুসায়ী ধর্ম্মেরই সংস্কারক মাত্র। এই ধারণায় তাহারা হজরত মোহাম্মদের সহিত সখ্য সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিল ও সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন পরে তিনি যীরুজালেমের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া, মক্কার কাবা গৃহাভিমুখে মুখ করিয়া নামাজ করিতে থাকায়, ঐ কেবলা পরিবর্ত্তন জন্য ইহুদীগণ মুসলমানের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিল। পরন্তু ঐ ঐতিহাসিক দ্বয়ের মত কে তর্কস্থলে নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও কেবলা পরিবর্ত্তন জন্য সন্ধি পত্রানুসারে ইহুদীগণের বিদ্রোহ বাধাইবার অধিকার ছিল না। সন্ধিপত্রে সর্ত্ত ছিল—ইহুদী, মুসলমানের কিম্বা মুসলমান, ইহুদীর, ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা দিতে পারিবে না। এক্ষেত্রে মুসলমানেরাই নামাজে মক্কার দিকে মুখ করিয়াছিলেন, ইহুদীগণকে ত ঐ রূপ করিতে বলেন নাই। মুসলমান "আপনার ছাগল লেজে দিয়া কাটিল" তাহাতে ইহুদীর মাথা ব্যথা হইল কেন? অতএব, ইহুদীগণ—ব্যবহারে মুসলমানের কোন ত্রুটি দেখিতে না পাইয়াও কেবল অকারণে বিদ্রোহী হওয়ায় ও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করায়, তাহারা ন্যায়তঃ নির্ব্বাসিত ও প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

কাবা শরীফ ও বয়তুল মোকাদ্দসের প্রাচীনত্ব। প্রাচীনত্বের সমালোচনায় কাবাশরীফ, যীরুজালেমের ধর্ম্মমন্দির "বয়তুলমোকাদ্দস" হইতে প্রথম শ্রেণীতে দাড়ায়। হজরত আদম, আল্লার উপাসনা জন্য জগতে সর্ব্বপ্রথমে কাবাশরীফ নামক উপাসনালয় প্রস্তুত করেন। উহা বহুকাল যাবৎ একভাবে থাকিয়া হজরত নুহের সময়ের জল প্লাবনে ভূমিস্যাত হয়। পরে হজরত এব্রাহিম, আপন পুত্র হজরত এসমাইল কে লইয়া পিতা পুত্র উভয়ে সাবেক ভিত্তির উপর কাবাশরীফ নামক পবিত্র ধর্ম্ম মন্দিরের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। হজরত এবরাহিমের সময় কে খৃষ্ট পূর্ব্ব দুই হাজার বৎসর ধরা হইয়া থাকে। যীরুজালেমের ধর্ম্ম মন্দির "বয়তুল মোকাদ্দস্" হজরত সোলেমানের সময়ে, খৃষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। সে হিসাবে কাবা শরীফ বহু প্রাচীন। কোরান শরীফে কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িবার স্পষ্ট আদেশ আছে; কিন্তু উপাসনা কালে যীরুজালেমের দিকে মুখ করিবার স্পষ্ট বিধান বাইবেলে নাই। এমত অবস্থায় উপাসনা কালে মুসলমানেরা মক্কারদিকে মুখ করায় ইহুদি ভজনালয় যীরুজালেমের গৌরব হানি জনক কোন কাজই করা হয় নাই।

কেবলা পরিবর্ত্তনের কারণ। দ্বিতীয় হিজরীর পূর্ব্বে কোন্ দিকে মুখ করিয়া নামাজ করিতে হইবে তাহার কোন বিধান ছিল না; এজন্য হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণ যীরুজালেমের দিকেই মুখ করিয়া নামাজ করিতেন। দ্বিতীয় হিজরীতে হজরত মোহাম্মদ এক মসজেদে যীরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া নমাজ করিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাদেশ হইল, "তোমার মুখ পবিত্র কাবা মন্দিরের দিকে ফিরাইয়া লও— এবং তুমি যেখানেই থাক না কেন,

নামাজের সময় ঐ কাবা মন্দিরের দিকে মুখ কর।"* এই আদেশ হইবা মাত্র, হজরত মোহাম্মদ তৎক্ষণাৎ কাবা মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া আরব্ধ নামাজ শেষ করেন। যে মস্জেদে ঐ কেবলা পরিবর্ত্তনের আদেশ হয়, তাহাকে "মস্জেদুল কেবলাতায়েন" (দুই কেবলার মস্জেদ) বলা হয়। ঐ মস্জেদ অদ্যাপি মদিনায় বিদ্যমান আছে এবং তাহার উত্তর দিকে (যীরুজালেমের দিকে) একটী মেহরাব ও দক্ষিন দিকে (মক্কার দিকে) একটি মেহরাব আজিও অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকিয়া কেবলা পরিবর্ত্তনের আদেশের প্রমাণের পোষকতা করিতেছে।

ইহুদী বিদ্রোহের মূলতত্ব। প্যালেষ্টাইন—বনি এসরাইল দিগের পৈতৃক বাস ভূমি. বনি এসরাইলেরা হজরত ইয়াকুবের বংশধর। হজরত দাউদের সময় যীরুজালেম শহর সমগ্র দাউদ রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল। পরে য়ীহুদীয়ায় একটী স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হওয়ায় য়ীহুদীয়া প্রদেশ বাসিগণ বনি এসরাইল দিগের সম ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও দেশের নামানুসারে যীহুদী বা ইহুদী নামে অভিহিত হয়। ইহুদী ও বনি এসরাইল জাতি মাখা মাখি ভাবে সমগ্র প্যালেষ্টাইন জুড়িয়া বাস করিতে থাকে। পরে বাবিলন রাজ বক্ত নসরের (নেবুকাত নেজারের) সময়ে (খৃঃ পূঃ ৫৯৯) ইহুদী রাজ্যের পতন ও তাহাদের পিতৃভূমি বাবিলনরাজের কুক্ষিগত হয়। অন্যূন ৭০ হাজার ইহুদী ও তাহাদের ধর্ম্ম প্রচারক হজরত আজিজ, বন্দী হইয়া বাবিলনে যান। তদন্তর পারস্যরাজ সিরসের উত্থানে বন্দী ইহুদী জাতির মুক্তি এবং প্যালেষ্টাইনের মধ্যে পারস্য রাজগণের বিজয় বৈজয়ন্তি উড্ডীন হয়। (খৃঃ পূঃ ৫৩৮।) তৎপর গ্রীক রাজ আলেকজাণ্ডারের অভ্যুত্থানে প্যালেষ্টাইন গ্রীসের পদানত হয় (খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দ)। তাহার পর রোমক রাজগণের পালা। বন্দী ইহুদীগণ বাবিলন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আসার পর হইতে তৃতীয় খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মের বা সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সময়ের খৃষ্টান রোমক রাজগণের ক্রমাগত অত্যাচারে ও তাড়নায় এবং করভারে প্রপীড়িত হইয়া অনেক ইহুদী জন্মভূমির মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া চির স্বাধীন মরুময় আরব দেশে বাস করিয়াছিল ও করিয়া আসিতেছিল।

সে কালে ইহুদীগণই প্রাচীন সভ্য জাতি বলিয়া গৌরবান্বিত ছিল—বাস্তবিকই তৎকালিন অসভ্য আরব জাতির তুলনায় আরবের ইহুদী জাতি সর্ব্ব প্রকারে উন্নত ও সুসভ্য ছিল এবং বিস্তর ইহুদীর সমাগম ও বসবাস দ্বারা তাহারা বেশ শক্তি শালী হইয়াছিল। আরব তাহাদের পৈতৃক দেশ না থাকিলেও, পৈতৃক দেশের মত হইয়া গিয়াছিল। মদিনায় ও তাহার আশে পাশে এবং নিকটে ও দূরে অনেক ইহুদী সম্প্রদায়ের বাস ছিল। তাহারা প্যালেষ্টাইনের সীমা ত্যাগ করার পর হইতে সুদীর্ঘকাল যাবৎ আরবে স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করিয়া আসিতেছিল।

কতিপয় অজ্ঞাত নামা মুসলমান কোরেশের ভয়ে মক্কা হইতে পলাইয়া মদিনায় যাওয়ায়, প্রথমতঃ ইহুদীগণ মনে করিয়াছিল, তাহারা অল্প দিনেই কোরেশের বলে কোন্ দিকে বিলীন হইয়া যাইবে—তাহাদের অস্তিত্বই থাকিবে না; সুতরাং তাহাদের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ বা যুদ্ধ

* কোরান শরীফ, সুরাবকর—পারা সায়াকুলের প্রথমাংশ।

বিগ্রহ করা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। এজন্য তাহারা প্রথমতঃ মুসলমানের সহিত সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা যখন দেখিল, মুসলমানেরা দিন দিন বলশালী হইতেছে কোরেশদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিতেছে ও শিক্ষা সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তখনই তাহাদের ভ্রম ভঙ্গ হইল, ঈর্ষানলে তাহাদের সর্ব্বশরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। মুসলমানেরা পরাক্রান্ত হইলে আরবে তাহাদের রাজ্য গঠিত হইবে এবং ইহুদীদের স্বাধীনতার ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও তাহাদের মনে উদিত হইল; কাজেই মুসলমানের উচ্ছেদে তাহাদিগকে নানা উপায়, কৌশল ও ষড়যন্ত্র অবলম্বন করিতে হইল। ইহুদী বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের ইহাই হইল প্রকৃত কারণ।

এই ভারতবর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যদিগের বাস ভূমি ছিল না। আদিম অধিবাসী কোল ভিল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া আর্য্যেরা এদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াফেলেন। তখন এদেশে তাঁহাদের পৈতৃকের মত স্বাধীনতার কেন্দ্র হইয়া যায়— হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পর পারে, তাঁহাদের যে কোন সময়ে বাস ছিল, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া এদেশের উন্নতির দিকে আকৃষ্ট হন। পরে যখন মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করিলেন, তখন কোথা হইতে মুসলমানেরা উড়িয়া আসিয়া ভারতবর্ষে জুড়িয়া বসিল বলিয়া, তাঁহাদিগকে বলে খেদাইতে না পারিলেও হিন্দুগণ তাঁহাদের দিকে বিদ্বেষ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। বেদ পুরাণে মুসলমানের নাম গন্ধ নাই, তথাপি মুসলমানেরা হিন্দুগণের নিকট "যবন, ম্লেচ্ছ, নেড়ে" ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যাত হইতে লাগিলেন। মুসলমান হিন্দুর অস্পৃশ্য হইলেন—মুসলমানে যে খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিল—সে দ্রব্য হিন্দুর নিকট অপবিত্র ও অব্যবহার্য্য হইল।

এখন ত অনেক দিন হইল, মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই এখন সুসভ্য বৃটিশ রাজের প্রজা, পরস্পর ভাই ভাই সম্বন্ধ; তথাপি পূর্ব্ব বিদ্বেষ এখনও সাধারণ হিন্দুর মন হইতে সম্যক্ অপসারিত হয় নাই। হিন্দু ঔপন্যাসিক দিগের হস্তে মুসলমান বাদশা, নবাব বেগম, ও নবাব নন্দিনী দিগকে নিতান্ত কুৎসিত মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছে। মেহদী পাতার বর্ণ ও উহার আভ্যন্তরীণ বর্ণ লইয়া গল্প লেখাচ্ছলে একটা পারসী কবিতা আওড়াইয়া প্রবাসীর চারু বাবুর মত লোকেরও সম্রাট নন্দিনী জেয়বুন্নেসা বেগমের প্রতি বিদ্রূপ করিতে মন চায়। সভ্যতার খাতিরে এবং শিক্ষার সম্মান রক্ষা হেতু হিন্দুগণ সভা সমিতিতে ও কাগজ কলমে মুসলমান দিগকে ভাই ভাই বলিয়া আপ্যায়িত করেন, কিন্তু ব্যবহারে ও কার্য্যে তাঁহারা স্বতন্ত্র ভাব ও স্বতন্ত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

এই সকল বিষয় ধীর ভাবে সমালোচনা করিলে, ভারতের হিন্দুগণের যে কারণে মুসলমান বিদ্বেষ, আরব ইহুদীগণেরও সেই কারণে এসলাম বিদ্বেষ জানা বলিয়া ধরিয়া লইতে পাঠক কে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না।

(ক্রমশঃ)

আবদুল লতিফ।

বাঙ্গালীর মাতৃভাষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোন ভাষা হইতে শব্দ লইলে আমাদের ভাষার উদ্দেশ্য অধিক সফল হয়।

বর্ত্তমানের শব্দ সকল প্রায় সংস্কৃত হইতেই লওয়া এবং প্রস্তুত করা হইতেছে। পূর্ব্বের আরব্য শব্দ সকলকে দূর করিয়া দিয়া অনেক স্থলে নূতন গড়া শব্দ বসাইবার যোগাড় এবং চেষ্টা হইতেছে। এখন আমাদের দেখা উচিত যে, সংস্কৃত শব্দ লইলে আমাদের লাভ, না আরবী শব্দ লইলে। মুসলমানদের হয়ত আরবীর দিকে একটু ঝোঁক থাকিতে পারে। এই জন্য হিন্দু ভ্রাতৃগণকে একটু চিন্তা ও নিরপক্ষতার সহিত বিবেচনা করিতে বলা হইতেছে। সংস্কৃত ভাষা একটী মৃত ভাষা, এই ভাষাতে কোন দেশের লোক এখন কথা বলে না, ভারতের ভাষা সকলের মধ্যে তাহার কতক শব্দ স্থান পাইতে পারে, কিন্তু ভারতের বাহিরে কোথাও তাহার বড় স্থান নাই। অতএব এই ভাষা হইতে শব্দাদি লইলে বুঝিতে হইবে যে, আমরা ভারতের বাহিরের লোকের ভাষা শিখিবার বা তাহাদিগকে আমাদের ভাষা শিখাইবার সুযোগ করিতেছি না বরং তাহার বিপরীত বাধা বিঘ্ন উৎপত্তি করিতেছি। আরবী ভাষা এশিয়া আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে লোকের মুখে বর্ত্তমান আছে, এবং বাকী সকল দেশেই অল্পাধিক এই ভাষা জানে, এমন লোক আছে। ভারতের মুসলমানগণ প্রায় সকলেই তাহার কিছু না কিছু পড়িয়া থাকে; এবং ভারতের প্রচলিত সকল ভাষাতেই তাহার অনেক শব্দ স্থান পাইয়াছে। ইউরোপে ও আমেরিকার প্রায় সকল ভাষাতেও অনেক আরবী শব্দ ও অঙ্কের ব্যবহার আছে। কারণ Dark Age র সময় আরবগণ হইতেই ইউরোপের লোক বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখিতেন। যদি এমন ভাষা হইতে আমরা দরকারী শব্দ গুলি লই. তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের ভাষা অধিকতর লোকে, ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বুঝিবার বা শিখিবার সুযোগ পাইবে। এবং আমাদেরও অধিকতর লোকের ভাষা বুঝিবার ও শিখিবার সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ভারতের হিন্দু মুসলমানে ঘনিষ্টতা বাড়িবে এবং ভারতের বাহিরেও অপর এশিয়া আফ্রিকা বাসীদের সহিত কতক সম্বন্ধ ও প্রণয় বাড়িবে। এক ভাষা কিংবা তাহার কাছা কাছি হইলে মানবের সম্বন্ধ ও প্রণয় না বাড়িয়া পারেনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুবিধাও আছে। যেমন "আরজ" ও "দাখিল" শব্দ আমাদের ভাষায় আছে। যথা "আমার আরজ এই" "আমার আরজী খানা দাখিল করিয়াছি"। যদি আমরা ভারতের উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষা পড়ি বা শুনি এই "আরজ" "আরজী" ও "দাখিল" শব্দ পাইলেই তাহাদের মানি বুঝিব। সেইরূপ আমরা ভারতের বাহিরে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পারস্য, আরব, তুর্কি, মিশর, যাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে গেলেও আমাদের এই সব শব্দ ("আরজ" "আরজী" "দাখিল" "মানি" "গং") ঐ সব দেশের লোকে বুঝিবে, কারণ তাহাদের দেশীয় ভাষাতেও এই সব শব্দ স্থান পাইয়াছে।

এবং তাহারা এই সব শব্দ মিশাইয়া কথা বলিলে তাহাও আমরা কতক বুঝিতে পারিব। এবং পরস্পর একে অন্যের ভাষা শিখিতেও অল্প সময় লাগিবে, এবং অনেক সুবিধা হইবে। এইরূপ আরও হাজার হাজার শব্দের বিষয় বলা যাইতে পারে। যেমন আকল কলম দোয়াত কেতাব, দোকান, ময়দান, ইত্যাদি। আকল শব্দের স্থলে বিবেক, কলমের স্থলে লিখনী, দোয়াতের স্থলে মস্যাধার, আরজ স্থলে প্রার্থনা, ইত্যাদি আমরা অবলম্বন করিলে একেত নূতন শব্দের আবিষ্কার ও শিক্ষার মেহনত, দ্বিতীয়তঃ পড়সী জাতিদের হইতে এক-ঘরে হওয়ার বন্দোবস্ত। (১)

আরবী শব্দ বহাল রাখিলে এবং আবশ্যক মতে গ্রহণ করিলে কি সুবিধা হয় তাহা পরে পরিস্কার মতে দেখাইতেছি।

(১) সংস্কৃত ছাড়িয়া পারসী ভাষা হইতে শব্দ লইলেও কতক জাতিদের সহিত মিলা যায়, যদিচ আরবীর মত নহে।

বাঙ্গালা	উর্দ্দু	ফারসী	আরবী
(১) কলম দোয়াত আন	কলম দোয়াত লাও	কলম দোয়াত বিয়ার	আতে আল কলম ওাদ্দোয়াতা
(২) এক আরজী দাখিল কর	এক আরজী দাখেল করো	এক আরজী দাখেল বকুন	আদ্‌খেল আরজিয়ান্
(৩) তোমার আকল নাই	তোমহারী আকল নেহি	তোরা আকল নিস্ত	মা ইন্দাকা আকল
(৪) সাবানের সিন্দুক দোকানে আছে	সাবুন কি সিন্দুক দোকানমেঁ হ্যায়	সিন্দুকে সাবুন দর দোকান আস্ত	সন্দুকস্ সাবুনে ফিদ্দোকানে
(৫) বন্দুক কেল্লাতে আছে	বন্দুক কেল্লামেঁ হ্যায়	বন্দুক দর কেলা আস্ত	আল্ বন্দক ফিল্ কেলআতে
(৬) কাগজ কেতাবে আছে	কাগজ কেতাব মেঁ হ্যায়	কাগজ দর কেতাব হাস্ত	আল্ কেরতাসো ফিল্ কেতাবে
(৭) নারিকেল, লেমু, সালগম খাও	নারিয়াল লেমু সালগম খাও	নারগিল, লেমু, সালগম বখোর	কোল আল নারজীল ওয়াল লেমুন ওাল সালজম

উপরের উদাহরণ সব দেখিয়া কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, আরবী ভাষা নিজদেশী ও প্রতিবাসী জাতিদের মধ্যে চল থাকায় তাহা হইতে শব্দ ইত্যাদি লইলে এবং পূর্ব্ব লওয়া সব শব্দ বহাল রাখিলে আমাদের অনেক সুবিধা; এবং প্রতিবাসী জাতিদের ভাষার মাত্র ব্যাকরণ ও অল্প কয়েকটি শব্দ লিখিলেই আমরা পূর্ব্ব নিজ ভাষার জ্ঞান দ্বারাই তাহাদের নিকট নিজ ভাব ব্যক্ত করিতে পারিব। এবং তাহারাও তদ্রূপে আমাদের ভাষা শিখিতে পারিবে এবং আমাদের নিকট নিজ ভাব ব্যক্ত করিতে পারিবে। আর আরবী ভাষা কোন মূর্খের ভাষা নহে। এই ভাষা প্রায় ১০০০ হাজার বৎসর যাবত পৃথিবীতে লোকদিগকে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, অঙ্ক, জ্যোতিষ গং সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছে। ইউরোপের জাতিগণ ইহার অনেক শব্দ (১) গ্রহণ করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহার করিতেছেন। আমাদের বাঙ্গালীদের কেন অন্য মতি হইবে? ভবিষ্যতে এশিয়া বাসীদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ও প্রণয় ভাবের অতি আবশ্যক। ভাষার ঐক্যতা ইহার এক প্রধান উপায়। এশিয়াবাসিগণ এক সময় সমস্ত পৃথিবীকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন।

(১) ৪৬৫ পৃষ্ঠার নোট দেখুন।

ভবিষ্যতে জগতে এশিয়ার ভাষা যেন প্রাধান্য লাভ করে, এবং তাহার শব্দ সব যদি পৃথিবীর অপর ভাষাতে স্থান পায়, তবে আমাদের এশিয়া বাসীদেরই গৌরবের এবং ভবিষ্যতে আমাদের শিক্ষা ও উন্নতির অধিকতর সুবিধা হওয়ার কথা। এই বিষয় আপনারা সকলে বিশেষ মতে চিন্তা করেন, ইহাই আমার বিনীত আরজ।

উর্দ্দু ও ফারসীর ন্যায় এই ভাষা অতি সহজে আরবী অক্ষরে ও লেখা যাইতে পারে, উর্দ্দু, ফারসী ভাষা আরবী অক্ষরে লেখা বলিয়াই মুসলমান সমাজে এত আদর পায়। এমনকি অনেক বাঙ্গালী মুসলমান তাহাদিগকে মাতৃভাষা বলিতে চাহেন। এই ভাষা আরবী অক্ষরে লেখার উদাহরণ নীচে দিতেছি।

প্রথম উদাহরণ।

বাঙ্গলা।

দয়ার সাগর আল্লা পরওয়ার দেগার।
মুনিব মালেক তিনি মাবুদ সবার॥
আসমান জমিন আর ফেরেস্তা ইনসান।
সুরুজ সেতারা চান্দ দরখ্‌ত হায়ওান॥
সমস্ত করেছেন পয়দা আল্লাহ আকবর।
সমস্ত তারিফ তাঁর মহিমা তাঁহার॥
আমাদেরে দিয়াছেন এলম ও ইমান।
ফেরেস্তা করেছে তাঁরে সজদা ও সম্মান॥
করেছেন হেদায়ত দিয়া পয়গম্বর।
হাজার শোকর তাঁর হাজার শোকর॥

আরবী অক্ষরে—

دیار ساگر اللہ پرورد گار
منیب مالک تینی معبود سبار
آسمان زمین آر فرشتہ انسان
سورج ستارا چاند درخت حیوان
شمست کریسے پیدا اللہ اکبر
شمست تعریف تار مہیما تانہار
امادیرے دیا چھین علم و ایمان

فرشتہ کریسے تانری سجدہ و سنمان

کری چھین ہدایت دیا پیغمبر

ہزار شکر تانر ہزار شکر

দ্বিতীয় উদাহরণ।

বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহিম

আমরা মোমেন, আমাদের পাঁচ অক্ত নামাজ পড়িতে হয়। অজু গোসল করিয়া হামেসা পাক ছাফ থাকিতে হয়। গুনাহ ও বদ্‌কাম হইতে পরহেজ করিতে হয়। এন্‌সাফ ও অমানত ঠিক রাখিতে হয়। দুনিয়ার সব লোক হইতে আমাদিগকে অধিক ভাল হওয়া উচিত। কারণ আমাদের নবী সকল নবীর সরদার, আমরা সকল উম্মতের চেয়ে ভাল না হইলে আমাদের হজরতের সম্মান থাকে না। এয়া আল্লাহ তুমি মেহেরবাণী করিয়া আমাদিগকে নেক বান্দা হইবার তাওফিক দেও।

بسم الله الرحمن الرحيم

امرا مؤمن امادر پانچ وقت نماز پڑیتے ھے وضو غسل کریا ھمیشا

پاک صاف تھاکیتے ھے گناہ و بد کام ھیتے پرھیز کریتے ھے

انصاف و امانت ٹھیک راکھیتے ھے دنیار سب لوک ھیتے

اماديگکے ادھیک بھال ھوا اچیت کارن امادر نبي سکل نبیر

سردار - امرا سکل امتر چے بھال نا ھیلے امادر حضرتیر سنمان

تھاکینا - یا الله تمی مہربانی کریا اماديگکے تمار نیک بندا ھوار

توفیق دو -

জের জবর না দিয়া উর্দ্দুর ন্যায় লেখা ও পড়া যেন অধিক সুবিধা লাগে। কারণ আরবীতে স্বরে অ নাই, ফারসী ও উর্দ্দুতে তাহারা আলেফ কে স্থান বিশেষে অ, আ, ই, উ এবং এ পড়িয়া থাকেন। যেমন امرات এখানে কাফের উপর আরবী জবর বা পেশ না পড়িয়া স্বরে অ পড়ে ادم, ابراهيم, استاد, انصاف শব্দে আলেফ কে আ, ই, উ, এ পড়া হয়। এই সব পরের ব্যবস্থা, মুল কার্য্য ঠিক হইলে শাখা সব ঠিক করিতে বড় কষ্ট লাগে না।

এইরূপে উর্দ্দুর ন্যায় আমাদের ভাষা আরবী অক্ষরে কায়দা মতে লেখা হইলে আরব ও পারস্যের লোক অতি সহজে আমাদের ভাষা পড়িতে ও শিখিতে পারিবে এবং আমরাও তাহাদের ভাষা পড়িতে ও শিখিতে পারিব। আমাদের মাতৃ ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি সাধারণের ভক্তি অতি বেশী হইবে; এবং কাজে কাজেই অল্পদিন মধ্যে উর্দ্দু ফারসীর ন্যায় তাহার কায়দা কানুন ঠিক হইবে এবং আবশ্যকীয় সব কেতাব তাহাতে লেখা যাইবে, ভবিষ্যতে ইস্‌লামের সহিত এশিয়া দেশে আরবী ভাষা ও আরবী অক্ষর প্রবল হওয়ার খুব সম্ভবনা। মুসলমানদের উচিত এই বিষয় যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কারণ এক বর্ণ পরিচয় দ্বারা তাঁহারা তাহাদের সমস্ত দেশের ভাষা সকল পড়িতে পারিবেন, এবং এশিয়াবাসীগণের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্টতা বাড়িবে। এখনই ভারতে উর্দ্দু গংর দরুন, মধ্য এশিয়ায় ফারসী ও তুর্কি গংর দরুন আরবী ভাষার শব্দও আরবী অক্ষর প্রবল আছে। পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় আরবী স্বয়ংই প্রবল, এবং তাহার আশ্রিত আরও ভাষা আছে। পূর্ব্ব এশিয়ায়, মোগল ও চীন দেশে ক্রমশ: ইস্‌লামের সহিত আরবীর অধিকার বাড়িতেছে। মালয়দেশে এবং সুমাত্রা যাভা বর্ণিও গয়রুহু দেশে আরবী ভাষা ও আরবী অক্ষর বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। (ভারতের মালেবর প্রদেশেও আরবী অক্ষর গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়)। অতএব এই বিষয় আমি আমাদের বড় লোক দিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। ইউরোপ রোমান ছাড়িয়া আরবী (১) অঙ্ক ব্যবহার করেন এবং অনেক আরবী শব্দ যেমন Lemon, Algebra. Alcone, Alcohol, Alchemy Chemist, Admiral, Algoris, Almanac, Al-mocan ar, Almogist তাহাদের ভাষাতে গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমান জগত কি তাহাদের ভাষার জন্য এক আরবী অক্ষর ও অঙ্ক অবলম্বন করিতে পারেন না?

অবশ্য পারেন, তবেকি বহুকালের দুর্ভোগে মনের বল কমিয়া যাওয়ায় কোন ভাল এবং উন্নতির কঠিন কাযে অগ্রসর হইতে তাঁহারা সাহস পান না। আমি আমার ভাই সকল কে খোদার নাম লইয়া সাহস করিতে বলিতেছি। আমাদের বড় কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগকে বড় বড় কায করিতে হইবে। আমাদের রাজ্য নাই, অস্ত্র নাই, বল নাই বটে। কিন্তু রাজ্য অস্ত্র এবং বল দ্বারা যাহা অসম্ভব, তাহা আমাদিগকে কলম, কথা ও কৌশল দ্বারা করিতে হইবে। এই সবের উপর এখন আমাদের নিজ সমাজের সংস্কার উহাতে নির্ভর করে। এই সব দ্বারা এখন আমাদিগকে ইউরোপ জাপান ও আমেরিকাকে ইসলাম ভুক্ত করিতে হইবে। নতুবা আমাদের প্রাণধন ইস্‌লামের সম্মান জগতে কমিয়া যাইবে। ভাইগণ আল্লার জন্য, হজরতের জন্য, ইস্‌লামের জন্য একবার জাগ্রত হউন এবং উদ্যোগ করুন। পাঞ্জাব হিন্দুস্থানে মুসলমানের সংখ্যা হারা হারি মতে বাঙ্গালার চেয়ে অনেক কম। হিন্দুদের অনেক বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্বেও মুসলমানগণ দেশীয় ভাষায় আরবী অক্ষর ও আরবী ফারসী শব্দ

(১) ইংরেজী 1. 2, 3, 4, এই সব আরবী অঙ্ক, পূর্ব্বে তাহারা I, II, III, IV, এইরূপ অঙ্ক ব্যবহার করিত।

সব বহাল রাখিয়া দিন দিন উর্দ্দু ভাষার উন্নতি করিতেছেন। আর এখানে আমরা অনেক জেলাতে শতকরা ৮০ জন মুসলমান হইয়া এবং ইস্লামাবাদ, শ্রীহট্ট, ঢাকা, মুর্শিদাবাদের ন্যায় মুসলমান প্রসিদ্ধ স্থান সব রাখিয়া নিজ মাতৃভাষায় আরবী (১) অক্ষর প্রচলিত করিতে এবং সাবেক শব্দ সব বহাল রাখিতে পারিব না এমন হইতে পারে না, কখনও হইতে পারে না। এদেশের ন্যায় হিন্দুস্থানেও হিন্দুগণ উর্দ্দু স্থলে কায়থী ভাষা ও কায়থী অক্ষর প্রচলন করিতে অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুসলমানগণ সচেষ্ট ও সজাগ থাকায় পারিয়া উঠিতেছেন না। কায়থী ও উর্দ্দুতে যে পার্থক্য, সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় এবং সাবেক বাঙ্গলায় প্রায় ঠিক সেই পার্থক্য; মূলে দুই এক ভাষা, কেবল কায়থীতে নাগরী অক্ষর ও সংস্কৃত শব্দের আধিক্য এবং উর্দ্দুতে আরবী অক্ষর এবং আরবী ফারসী শব্দের আধিক্য। সংস্কৃত বাঙ্গলা ও সাবেক বাঙ্গলার শব্দ বিষয় ঠিক সেইরূপ প্রভেদ, কেবল অক্ষর বিষয় আমাদের দোষে সাবেক বাঙ্গলাতে আরবী অক্ষর প্রচলন করা হয় নাই। ভাইগণ এখনও সময় আছে, একবার আল্লার ওয়াস্তে চেষ্টা করিয়া দেখুন।

কার্য্য প্রণালী।

আমার বিশ্বাস যে যদি আমরা বাঙ্গালার সকল বিভাগের কয়েকজন আলেম ও ভাল লেখক দ্বারা এক কমিটী গঠন করিয়া তাহাদের দ্বারা প্রচলিত শুদ্ধ সহজ সাবেক বাঙ্গলায় কোরাণের তরজুমা করাইতে কিংবা পূর্ব্ব তরজুমার সংশোধন করিয়া লইতে পারি এবং তাহা সাধারণের হাতে দিতে পারি, তাহা হইলে যেমন আরবদের ভাষার মূল ভিত্তি কোরআন তেমনি আমাদের ভাষার মূল ও ভিত্তি বাঙ্গলা কোরআন হইয়া দাঁড়াইবে এবং আমাদের শিক্ষা, উন্নতি ও প্রচার কার্য্যের অত্যন্ত সুবিধা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান এবং আবশ্যকীয় বিষয় কেতাব ও খবরের কাগজ লিখিতে আরম্ভ করা একান্ত দরকার। এইরূপে ভাষা ঠিক হইয়া গেলে ক্রমশঃ অক্ষরের বিষয় সংস্কার করার ভাবনা ও চেষ্টা চলিবে।

খাদেমোল্ এন্সান।

(১) আরবী অক্ষর দ্বারা প্রচলিত ফারসী ও উর্দ্দুর অক্ষর বুঝিবেন তাহাতে আরবীর অভাব ও পূরণ করা আছে।

মুসলমানআমলে হিন্দুর অধিকার

এ সকল বিবরণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আওরঙ্গজেব বা অন্য কোন মুসলমান নরপতি, কখনও শান্তির সময়, কেবল জাতিগত বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া, কোন হিন্দু কিম্বা অন্য জাতির ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করেন নাই। বলা বাহুল্য যে এস্‌লাম ধর্ম্মবিধান মতে, কোন বিজিত জাতির ধর্ম্মমন্দিরে হস্তক্ষেপ করার অধিকার মুসলমানের নাই। আওরঙ্গজেব যে নিতান্ত ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদী স্বীকার্য্য। তিনি যে এস্‌লাম ধর্ম্ম বিধানের কোনরূপ অবমাননা বা ব্যতিক্রম করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। তাহার একটী প্রমাণ গ্রহণ করুন। তিনি দাক্ষিণাত্যে ২৫ বৎসর সুবাদারী করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও যে তিনি কোন হিন্দুর ধর্ম্মমন্দিরের একখানি ইষ্টকও বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। আলোরের সন্নিকটেই আওরঙ্গজেব সমাহিত। তিনি জীবনের শেষ দশায় তদঞ্চলে অবস্থান করিয়াছিলেন। হিন্দুদের বহু দেবমন্দির এবং প্রকাশ্য স্থানে বহু দেবমূর্ত্তি বিরাজমান, তন্মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ের বহু দেবমন্দির এখনও অক্ষুণ্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। ইহা ছাড়া তাঁহার রাজধানী দিল্লী ও আগ্রায় এবং তাঁহার স্থাপিত আওরঙ্গাবাদ শহরে তাঁহার জীবদ্দশায় বহু হিন্দু ধর্ম্মমন্দির বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তিনি কোন একটী ধর্ম্মমন্দিরেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাজধানীর দূরবর্ত্তী স্থানে যেখানে বিদ্রোহ ও রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, কেবল সেখানকারই যে দেবমন্দির নষ্ট করা হইয়াছিল, এ কথাটী কি উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় না? সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালে দিল্লী, আগ্রা ও তৎপ্রতিষ্ঠিত আওরঙ্গাবাদে যে বহুসংখ্যক হিন্দু দেবমন্দির বিদ্যমান ছিল তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? বিদ্রোহ ও রাষ্ট্র বিপ্লব দমন পূর্ব্বক তাঁহার পৈত্রিক সিংহাসন ও জাতীয় গৌরব রক্ষা এবং মোগল প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখা কি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল না? হিন্দুদের হস্তে মোগল রাজত্ব সমর্পণ করিলেই কি আওরঙ্গজেব, ইতিহাসে প্রশংসার পাত্র হইতেন? তদবস্থায় তিনি কি মীর জাফরের ন্যায় হিন্দু মুসলমান সকলের নিকট বিশ্বাসঘাতক স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহী নরপিশাচ নামে অভিহিত হইতেন না? যাহা ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ বিশেষতঃ রাজনীতিক ধর্ম্ম মতে কর্ত্তব্য ছিল, আওরঙ্গজেব তাহাই করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বীরত্ব, সৎসাহস, দৃঢ়তা, স্বদেশভক্তি ও স্বজাতি প্রীতির জন্য তিনি শত্রু মিত্র সকলের নিকট প্রশংসার পাত্র। আওরঙ্গজেবের প্রতি হিন্দু সমাজের দোষারোপ যে সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক ও ভিত্তিহীন, বর্ণিত ঘটনাবলির দ্বারা তাহা কি সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় না? সম্রাট আওরঙ্গজেব যে হিন্দু জাতির সহিত বিদ্বেষপরবশ হইয়া হিন্দুদের কোন ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস

করেন নাই, তাহার আর একটী উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, তিনি সারাটা জীবনের মধ্যে একজন হিন্দুকেও বল প্রয়োগে বা ছলে বলে এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই। তাঁহার সময়ে, হিন্দু ব্রাহ্মণগণ, মুসলমান বালকদিগকে, যথেচ্ছাভাবে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দির সংশ্লিষ্ট যে সকল পাঠশালা ছিল, তাহাতে বহু মুসলমান বালককে তাঁহারা বলপূর্ব্বক হিন্দুয়ানী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে প্রয়াসী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের পক্ষ হইতে তৎসম্বন্ধে বিশেষ কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হওয়া সত্বেও, ব্রাহ্মণগণ আকবরের সময় হইতে ক্রমে ক্ষমতা প্রতিপত্তি লাভ করিতে করিতে তাঁহার সময় এতটা গর্ব্বিত ও ভীতিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, রাজাজ্ঞার বাধা বিঘ্নের প্রতি তাঁহারা কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁহারাই দেশটাকে অরাজকতার পূর্ণ লীলাক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব নিরুপায় হইয়া মুসলমান বালকদিগকে—যেখানে মহাভারতের কল্পিত কাহিনী ও নৈতিক শিক্ষার প্রতিকূল দেব বৃত্তান্ত শিক্ষাদানপূর্ব্বক তাঁহারা পথভ্রষ্ট করিতেছিলেন—সে সকল পাঠশালা বন্ধ করিতে আদেশ করেন। ব্রাহ্মণগণ ইহাতে উত্তেজিত হইয়া স্থানে স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে বিরত হন না। এই প্রসঙ্গে যে সকল স্থানে বিদ্রোহ দমনকারী রাজকীয় সৈন্যের সহিত হিন্দুগণের সংঘর্ষ হইয়াছিল, যে সকল ধর্ম্মমন্দিরে ব্রাহ্মণগণ পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক রাজদ্রোহিতার শিক্ষাদানে তৎপর ছিলেন এবং যুদ্ধের সময় যেগুলিকে আশ্রয় স্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যুদ্ধ চালাইতে-ছিলেন, সে সকল মন্দিরের মধ্যে অনেকটাই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ সকল বৃত্তান্ত মৎপ্রণীত আওরঙ্গজেবের জীবনী গ্রন্থে প্রমাণসহ সবিস্তার লিখিত হইয়াছে।

কাশ্মির রাজের একটী দৃষ্টান্ত।

মুসলমান বাদশাহগণ হিন্দু প্রজা সাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষার প্রতি কতটা লক্ষ্য রাখিতেন, ইতিহাস পৃষ্ঠা হইতে তাহার একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। কাশ্মির অধিপতি সোল্-তান সেকান্দরের রাজত্বকালে, "কাল প্রতিমা" নামক একজন ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় এস্লাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ সরকারে প্রবেশ করেন। তিনি রাজ দরবারে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া কাশ্মির রাজ্যের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি হিন্দুদের দেবমূর্ত্তির প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। সেকান্দরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জয়নলআবেদীন রাজসিংহা-সনে অধিষ্ঠিত হইলে, তিনি মুসলমান পণ্ডিত মণ্ডলীর মতানুযায়ী কাল প্রতিমার হিন্দুবিদ্বেষমূলক যাবতীয় আদেশ রহিত করিয়া দেন। তিনি মন্ত্রীর অত্যাচারে দেশত্যাগী সমুদয় ব্রাহ্মণদিগকে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার জন্য ঘোষণাপত্র জারী করেন, এবং রাজকোষ হইতে তাহাদের পাথেয় প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় বৃত্তি নির্দ্ধারণ এবং মন্দিরের নিমিত্ত জায়গির বা নিষ্কর ভূসম্পত্তির সুব্যবস্থা করেন। মন্ত্রীর উৎপীড়নে যাহারা মুসলমান হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যথেচ্ছা ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করার অধিকার দেওয়া হয়। ইহাতে অনেকেই নিজদের পূর্ব্বধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বাদশাহ, তাঁহার পিতার আমলের অত্যাচার মূলক সমুদয় বিধান রহিত করিয়া দেন। মন্ত্রী কাল-প্রতিমা হিন্দুদের প্রতি যে জিজিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন

তাহাও তিনি উঠাইয়া দেন। এমনকি তিনি হিন্দু প্রজা সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য কাশ্মিরের সর্ব্বাংশ হইতে গো-জবেহ প্রথা রহিত করিয়া দেন। (১)

বিষয় সম্পত্তি ও আইনগত অধিকার।

মুসলমান আমলে, যেমন হিন্দুদিগকে ধর্ম্মগত স্বাধীনতা ও অন্যান্য অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে বিষয় সম্পত্তি ও আইনগত স্বার্থ সম্বন্ধেও তুল্যাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল।

মালওয়া-অধিপতি সোলতান মাহমুদ খিলজী আহমদাবাদ জয় করিয়া সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। রাজকীয় পান্থশালার জন্য তরি তরকারী উৎপন্ন করার মত একখণ্ড জমিও তিনি লাভ করিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া তিনি মৌলানা শামসুদ্দীন নামক একজন সাধু পুরুষের প্রতি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু কৃষক প্রজাদের নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্যে ঐরূপ একখণ্ড জমি সংগ্রহ করার ভার অর্পণ করেন। (২)

সম্রাট শাহজাহান দিল্লীর জামে মসজেদ ও তাজ মহলের এমারত নির্ম্মাণ জন্য দশগুণ অধিক মূল্য প্রদান পূর্ব্বক জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। কোন হিন্দুপ্রজার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক এক কাঠা স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করিতেও রাজ পুরুষগণ সাহস করেন নাই। উচিত মূল্যে না পাওয়ায় তাঁহাদিগকে তাহার দশগুণ অধিক মূল্যে জমি ক্রয় করিতে হইয়াছিল। (৩)

আইন ঘটিত অধিকার।

হিন্দু আমলে যেমন কোন ব্রাহ্মণ কোন নিম্নজাতীয় হিন্দুকে হত্যা করিলে তজ্জন্য নামমাত্র সামান্য দণ্ডের ব্যবস্থাই যথেষ্ট ছিল, মুসলমান আমলে আইন ঘটিত ব্যাপারে তেমন কোনই ইতর বিশেষ ছিল না, আইনের নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্র, ছোট বড়, হিন্দু মুসলমান ও জেতা বিজেতা সকলেই তুল্যাধিকারভোগী ছিলেন। তাহার দু'একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন:—

সোল্‌তান গয়াসুদ্দীন বলবনের শাসনকালে, বদায়ুনের জায়গিরদার চারিহাজারী আমির মালেক তাইফ এব্‌নে জামদার, একজন দরিদ্র হিন্দুকে বেত্রাঘাতে বধ করিয়া ফেলেন। তাহার স্ত্রী রাজ দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বিচার প্রার্থিনী হইলে বাদশাহের আদেশে আমির তাইফকে সেইরূপে বেত্রাঘাতে হত্যা করিয়া, মুসলমান রাজপুরুষদিগকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে উক্ত আমিরের শবদেহ বদায়ুনের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলাইয়া রাখা হয়। (৪) বলা আবশ্যক যে চারী হাজারী আমিরের পদ, বর্ত্তমানে বিভাগীয় কমিশনর অথবা লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণরের পদের সমতুল্য ছিল। ইহার উপর পঞ্চ হাজারী আর একটীমাত্র পদ ছিল, যাহাকে

---

(১) "তারিখে ফেরেশতা" ও "তারিখে হেন্দ" মৌলবী জকাউল্লা।

(২) "তারিখে ফেরেশতা ১ম খণ্ড" "হুমায়ুন" শাহ বাহমনীর জীবনী অংশে লিখিত।

(৩) "বাদশাহ নামা" ১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ।

(৪) "তারিখে ফেরেশতা," প্রাচীন ইতিহাস।

বর্ত্তমানে গবর্ণরের পদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, ইহার পর সপ্ত হাজারী পদ কচিৎ যুবরাজ কিম্বা কোন শাহজাদা অথবা মানসিংহের ন্যায় সৌভাগ্যবান হিন্দুর অদৃষ্টে ঘটিত, তাহা বর্ত্তমান বড় লাটের সমান বা প্রধান মন্ত্রীর অনুরূপ সম্মানিত পদ বলিয়া বিবেচনা করা হইত।

সম্রাট জাহাঁগীরের সময় প্রসিদ্ধ দরবারীআলেম আমীর খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হোশঙ্গ, একজন দরিদ্র ব্যক্তির হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হন। সম্রাট স্বয়ং বিচার করিয়া তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের বিধান করেন। সম্রাট এই বিচারবৃত্তান্ত স্বরচিত "তোজকে জাহাঁগিরী" গ্রন্থে (৩৩৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে আমির সৈয়দ কবির নামে একজন ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ একজন রাজপুতকে হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। আমীর ওমরাদের পদ বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের সেক্রেটারীগণের সমতুল্য পদ ছিল, বরং ক্ষমতার হিসাবে তদপেক্ষা উচ্চতর। কিন্তু বিচার ক্ষেত্রে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন বলিয়া কখনও সেদিকে লক্ষ্য করা হইত না।

বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য সাধন।

আজ শিক্ষা ও সভ্যতার এই চরম উন্নতির যুগে, দেশের রাজনীতিকদল বিচার ও শাসন বিভাগেরপার্থক্য সাধন জন্য দেশটাকে আন্দোলন আলোচনা দ্বারা তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছেন। সুসভ্য বৃটিশরাজ আজও তাহার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু মুসলমান আমলে এই অত্যাবশ্যকীয় অধিকারের জন্য প্রজা সাধারণকে কোনরূপ আন্দোলন আলোচনা করিতে হয় নাই, বরং রাজা স্বয়ং ইহার আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারিয়া রাজাদেশে উভয় বিভাগের পার্থক্য সাধন করিয়াছিলেন। ভারতের মুসলমান বাদশাহগণের মধ্যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের চক্ষে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচারী ও হিন্দু বিদ্বেষী, তিনিই সর্ব্বাগ্রে বিচার বিভাগকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করিয়া দেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে কাজী আবদুল অহাবের অধীনে স্থাপন করেন। তিনি কাজি উল কোজ্জাত বা চিফজষ্টিস অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক গবর্ণর ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসন বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীবৃন্দ এই রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন করেন এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের ক্ষমতা সঙ্কোচিত হইল দেখিয়া রাজ দরবারে আপত্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কিন্তু কর্ত্তব্য পরায়ণ দৃঢ়চিত্ত আওরঙ্গজেব কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই। (১)

১০৮২ হিজরীতে আওরঙ্গজেব আর একটী নূতন আদেশ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা :— রাজ সরকারের বিরুদ্ধে কাহারো কোনরূপ দাবী দাওয়া থাকিলে তিনি অনায়াসে স্থানীয় বিচারালয়ে রাজকীয় উকিলকে আসামী করতঃ নালিশ উপস্থিত করিয়া প্রতীকার প্রার্থী হইতে পারেন। বর্ত্তমান সময় ষ্টেট সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজুর অধিকারের সহিত

(১) "মস্তাখবল লোবাব"—২য় খণ্ড ২১৫।২১৬ পৃঃ।

ইহাকে তুলনা করিতে পারা যায়। তবে পার্থক্যের মধ্যে, এই যুগে ঐরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার জন্ম অনেক হাঙ্গামায় পড়িতে হয়, বহু অর্থের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়, কিন্তু শাহী আমলে তজ্জন্য কোন বেগ পাইতে হইত না। একটী কপর্দ্দক খরচও করিতে হইত না। কাজী সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজ সরকারের উকিলের বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেই, সাক্ষী প্রমাণ লইয়া কয়েক দিনের মধ্যে, অবস্থা বিশেষে সেই দিবস চূড়ান্ত বিচারকার্য্য শেষ হইয়া যাইত। সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রি হওয়া মাত্রই স্থানীয় রাজকোষ হইতে টাকা দেওয়া হইত। কালেক্টারী হইতে টাকা উসুল করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হইত না। (১)

সম্রাটের বিচারকার্য্য।

মুসলমান আমলদারীতে, সম্রাট স্বয়ং বিচার ও শাসন বিভাগের চূড়ান্ত আপীল শুনিতেন। প্রত্যহ বাদশাহকে বিচারাসনে উপবেশন করিতে হইত। সম্রাট জাহাঁগীর আগ্রা দুর্গে তাঁহার বৈঠকখানা হইতে যমুনা তীরবর্ত্তী একটী স্তম্ভের সহিত একখানি শিকল ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। যে সকল দীন দরিদ্র লোকজনের পক্ষে, রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া নিজদের কোন গুরুতর অভাব জানাইবার সুযোগ না ঘটিত, তাহারা সেই রজ্জুর নদী তীরবর্ত্তী ভাগ ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেই সম্রাট ঘণ্টাধ্বনিতে স্বয়ং সে সংবাদ অবগত হইতেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রহরীকে পাঠাইয়া সেই সকল লোককে দরবারে উপস্থিত করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের সুব্যবস্থা করিতেন।

সম্রাট শাহজাহান দিল্লীর লাল কেল্লাতে তাঁহার দরবারে খাসের এক পার্শ্বে "মিজানে-আদল" বা "বিচারের তুলাদণ্ড" নামে একটী স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাতে স্বর্ণ রেখাতে তরাজু বা নিক্তি অর্থাৎ পাল্লার চিত্র অঙ্কিত আছে। সম্রাট এই তরাজুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার বিচারকার্য্য যেন তুলা দণ্ডের দ্রব্য তৌল করার ন্যায় ঠিক সমান ও সমুচিত হয়, তদ্বিষয় সতত অন্তরে জাগরিত রাখিবার জন্যই তিনি বিচারাসনের সম্মুখে তরাজুর সুশোভনচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আরও একটী আধ্যাত্মিক ভাব লুক্কায়িত ছিল, অর্থাৎ মুসলমানগণের বিশ্বাস, পরকালের পাপপুণ্যের বিচারকালে, বিশ্বনিয়ন্তা খোদাতাআলা লোকের পাপপুণ্য তৌল করিবেন। পৃথিবীতে বিচারকার্য্যে বা অন্যরূপ ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতার পরিচয় দিলে, ঠিক উচিত মতে বিচার করিতে না পারিলে,—পরকালে পাপপুণ্য পরিমাণকালে দণ্ড হইতে হইবে, সেই আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক চিন্তা ও ভীতি যাহাতে সম্রাটের হৃদয়ফলকে সর্ব্বদা প্রতিবিম্বিত হয়, তজ্জন্যই তিনি প্রাসাদের প্রাচীরগাত্রে কারুকার্য্য বিখচিত স্বর্ণরেখাতে মিজানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইহারই অনতিদূরে একটী সুশোভিত বুরুজে একটী প্রাণস্পর্শী

(১) "মন্তু খবল লোবাব"—২য় খণ্ড ২৫২ পৃষ্ঠা।

আধ্যাত্মিক ভাবোদ্দীপক পার্সী কবিতা লিখিত আছে। তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব। মৎ প্রণীত "ভারতে মুসলমান সভ্যতায়" লাল কেল্লার বিবরণ দ্রষ্টব্য। ইহা ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সওকীন ও বিলাসী সম্রাট শাহজাহানের বিচার নীতির সামান্য আভাষ মাত্র। আওরঙ্গজেব প্রমুখ তাঁহার তুলনায় শতগুণ অধিক ধার্ম্মিক ও সুবিচারক ছিলেন।

সাম্যনীতি।

মুসলমান আমলে রাজা প্রজা ও জেতা বিজেতার যে কোনই পার্থক্য ছিল না, তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। শের শাহ আদৌ শান্তির সহিত রাজত্ব করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার রাজত্বকাল অতি অল্পদিনই স্থায়ী ছিল, কিন্তু তিনি নানারূপ যুদ্ধ বিগ্রহ ও আপদ বিপদে জড়ীভূত থাকা কালীন, দেশের শাসন ও বিচার সৌকর্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি তাঁহার ৪ বৎসরকাল রাজত্বের মধ্যে, দ্বিসহস্রাধিক মাইল রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজপথের দুই ধারে ঘন ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী রোপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক এক ক্রোশ অন্তর এক একটী পান্থ-নিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, সর্ব্বসমেত তিনি ১৭০০ পান্থশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পান্থশালা দুইভাগে বিভক্ত ছিল, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির আহার ও বাসস্থানের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহার পুত্র সলিম শাহ শূর প্রত্যেক এক মাইল অন্তরে আর একটী করিয়া পান্থশালা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ ' ভারতের মুসলমান সভ্যতার ' প্রথম ভাগে দ্রষ্টব্য। শের শাহের বিচারনীতির একটী ঘটনা শ্রবণ করুন। শের শাহের রাজত্বকালে, একদা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আদেল খাঁ হস্তী-পৃষ্ঠে রাজপথে ভ্রমণকালীন দেখিলেন, একজন মুদীর যুবতী স্ত্রী উলঙ্গ হইয়া তাহার ঘরের সম্মুখে স্নান করিতেছে, রাজকুমার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী পানের খিলি নিক্ষেপ করেন। মুদী রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিলে, বাদশাহ আদেশ করিলেন মুদীকে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া আদেল খাঁর স্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত করা হউক এবং শাহজাদার কার্য্যের অনুকরণে প্রতিশোধ লওয়া হউক। (১)

রাজদরবারে ব্রাহ্মণের অধিকার।

মুসলমান আমলে যেখানে রাজদরবারে মুসলমান ধর্ম্মপণ্ডিতের সমাদর ছিল, সেখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীরও যথেষ্ট অধিকার-প্রতিপত্তি ছিল। বিজাপুরের অধিপতি মোহাম্মদ আদেলশাহ ব্রাহ্মণগণের দুরবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের জন্য বিশেষ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। (২) সোলতান সেকান্দর লুদী হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া কথিত, কিন্তু তিনি বহু হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। (৩) সম্রাট আওরঙ্গজেবের

(১) তারিখে হেন্দ—জকাউল্লা।
(২) তারিখে দাক্ষিণ।
(৩) তারিখে হেন্দ, মৌঃ জকাউল্লা।

দরবারে সুন্দর নামক ব্রাহ্মণ, 'কবি রায়' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যোধপুরে ব্রাহ্মণদিগকে তিনি যে সকল জায়গির প্রদান করিয়াছিলেন এখনও তাহা তাঁহাদের বংশধরগণের অধিকারে বিদ্যমান আছে। (১)

সম্রাট আকবরের দরবারে মহাদেব, ভীমনাথ, বাবা বিলাসনারায়ণ, শীবজী, মধু, রামভদ্র, শ্রীভট্ট, মধু সরস্বতী, যদরূপ, বিষ্ণুনাথ, মধুসূদন, রামকৃষ্ণ, নারায়ণ আশ্রম, বলভদ্র মিশ্র, চজজী সুর, বাসুদেব মিশ্র, ভানুদয় হট্ট, বাহণ ভট্ট, রামতীর্থ, বুদ্ধ মুয়াস, নরসিংহ, গৌরীনাথ, রমেন্দ্র গোপনী নাথ, বিজয় সেন সুর, কিষণ পণ্ডিত, নেহালচন্দ্র চাঁদ, ভট্টচার্য্য, কাশীনাথ প্রভৃতি হিন্দু পণ্ডিতগণ সভাসদরূপে বিরাজ করিতেন। তাঁহারা সকলেই রাজদরবার হইতে মোটা বৃত্তি ও স্থায়ী জায়গির প্রাপ্ত হইতেন।

সম্রাট জাহাঁগীরের দরবারে বেণারসের ফণাচার্য্য, ফতান মিশ্র, যদুপ সন্ন্যাসী, যতুক রায় জ্যোতিষী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

সম্রাট শাহজাহানের দরবারে হরনাথ নামে একজন হিন্দু পণ্ডিত মহাপাত্র উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১০৪৯ হিজরী অব্দে বহুমূল্যের খেলাত, ঘোড়া ও হস্তীসহ এক লক্ষ দেরেম মুদ্রা পুরস্কার লাভ করেন। এরূপে তাঁহার দরবারে জগন্নাথ নামক পণ্ডিত মহাকবি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি বাদশাহ এতই সুপ্রসন্ন ও ভক্তিপরবশ ছিলেন যে, একবার সম্রাট তাঁহাকে তুলা দান করেন অর্থাৎ—তাঁহাকে স্বর্ণরৌপ্যের দ্বারা তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তাঁহার শরীরের সম ওজন অর্থদানে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কাশীর একজন পণ্ডিতের জন্য বার্ষিক দুই হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক অধিকার।

মুসলমান আমলে রাজনীতিক অধিকার ও রাজ আলোচনায় জেতা-বিজেতা ও জাতিধর্ম্ম বা বর্ণ বিচারের কোনই গুরুত্ব ছিল না। যোগ্যতানুসারে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী সকলেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পদলাভের অধিকারী ছিলেন। মুসলমান-আমলে মুসলমানগণ তাঁহাদের হিন্দু প্রজাবর্গের প্রতি রাজনীতিক অধিকারক্ষেত্রে যে উদারতা ও বিদ্বেষহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বর্ত্তমান শিক্ষা-সভ্যতার চরম উন্নতির যুগেও কোন দেশে তাদৃশ উদারতার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না। প্রাদেশিক গবর্ণর, সমর বিভাগের উচ্চতম পদ, প্রধান সেনাপতির সম্মান লাভ হইতে রাজমন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রীর পদ পর্য্যন্ত হিন্দুগণ সমস্তটাই অধিকার করিয়াছিলেন। ইতিহাসেও মুসলমান আমলের শাসন বিবরণীতে ইহার এত দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছে যে, তাহার সমস্তের সমালোচনার জন্য একটী বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। আমি এখানে একটুকু আভাষ দিতেছি মাত্র।

---

(১) উমরায়ে হনুদ।

হিন্দুগণের পার্সীশিক্ষা।

মুসলমান আমলদারীর প্রারম্ভে, হিন্দুগণ রাজভাষা পার্সীর প্রতি তাহা ম্লেচ্ছভাষা বলিয়া নিতান্তই ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, কেহ তাহা শিক্ষা করিতে চাহিতেন না, তাঁহারা পার্সী শিক্ষা করাকে স্বধর্ম্মের ও জাতীয়গৌরবের হানীজনক কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। ইংরেজ আমলদারীর প্রারম্ভে ইংরেজী শিক্ষার বেলায়ও মুসলমানগণের এরূপ দুর্ম্মতি হইয়াছিল। সেই উদাসীনতার ফল তাঁহারা এখনও ভোগ করিতেছেন। দাস বংশ, খিলিজী বংশ, তোগলক বংশ ও লোদী বংশীয় বাদশাহগণের রাজত্বকাল গৃহবিবাদ ও পূর্ণ অশান্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল; তদুপরি হিন্দুগণ পার্সী শিক্ষায় উদাসীন এবং রাজপদ লাভে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই তাঁহারা পাঠান-আমলে রাজস্ববিভাগ ব্যতীত অন্যান্য বিভাগে বিশেষ কোনই উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন না।

পাঠান-আমলে, সর্ব্বাগ্রে সেকান্দর লোদী হিন্দুদিগকে পার্সীভাষা শিক্ষা দিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেহই পার্সীশিক্ষা করিতে সম্মত না হওয়ায়, শেষে তিনি শূদ্রদিগকে পার্সীশিক্ষা দিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। অতঃপর রাজ সরকারে শূদ্রদের সম্মান প্রতিপত্তি দেখিয়া অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুরাও ক্রমে পার্সী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সম্রাট আকবরের সময় রাজা টোডর মল্লের যত্নে রাজ্যের সর্ব্বত্রে রাজভাষা পারস্যের প্রচলন হওয়ায় হিন্দুগণ সাধারণ ভাবে পার্সী শিক্ষা করিতে অগ্রসর হন এবং তখন হইতে তাঁহারা শাসন ও সামরিক বিভাগের উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হন।

আকবরের রাজদরবারে হিন্দুর অধিকার।

সম্রাট আকবরের সময়, সপ্ত হাজারী পদ সর্ব্বোচ্চ ছিল; বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুরের পদের সহিত তাহার তুলনা করা যায়। এই পদে একজন হিন্দু নিযুক্ত ছিলেন, কোন মুসলমান ছিলেন না। পঞ্চ হাজারী পদে ৪জন হিন্দু, চারি হাজারী পদে ৪জন, তিন হাজারী পদে ১জন, দুই হাজারী পদে ৭জন, হাজারী ও পঞ্চশতী পদে ২০জন হিন্দু ছিলেন। ইঁহারা দরবারের মন্ত্রীশ্রেণীর লোক।

যোধপুরের রাজা উদয় সিং আকবরের দরবারে হাজারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রূপবতী ও গুণবতী কন্যা মানমতী জগৎগোসাই প্রকাশ যধোবাই যুবরাজ সলিম অর্থাৎ জাহাঁগীরের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। যধোবাই মুসলমান রাজান্তপুরে থাকিয়াও নিজ হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্ম স্বাধীনভাবে সম্পাদন করিবার অধিকারিণী ছিলেন। ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রা দুর্গে যধোবাই মহল নামে যে প্রাসাদ-অংশ বিদ্যমান আছে তাহার নির্ম্মাণ কৌশলে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের ও হিন্দু ধর্ম্মমন্দিরের পূর্ণ সাদৃশ্য রক্ষা করা হইয়াছে।

রাজা আস্করণ কবচ হাজারীপদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি আকবরাবাদের প্রাদেশিক গবর্ণরের পদে বরিত হন। রাজা অনুপ সিং ও তৎপুত্র রাজা বীরনারায়ণ আকবরের দরবারে সম্মানিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা মানসিংহের পিতামহ রাজা ভাড়ামল কবচ সর্ব্বাগ্রে

আকবরের দরবারে সম্মান লাভ করেন। মানসিংহের পিতা রাজা ভগবান দাস সমরনিপুণ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি আকবরের দক্ষিণ বাহু ও প্রধান সেনাপতিরূপে চিত্তরের যুদ্ধে রাণা উদয়সিংহের সহিত ভীষণযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব ও সমরকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। গুজরাট অভিযানেও তিনি সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পরে তিনি পঞ্জাবের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হন। ৯৯৩ হিজরীতে শাহজাদা সলিমের সহিত ভগবান দাসের কন্যার বিবাহ হয়। বেগম মহলে তিনি শাহ বেগম উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভেই শাহজাদা খসরু ও শাহজাদী সোল্‌তানন্‌ নেসা জন্মগ্রহণ করেন। রাজা মহেষ দাস প্রকাশ বীরবর প্রথম অবস্থায় একজন ভাটরূপে রাজ দরবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি স্বীয় প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে কবিরায় ও রাজাবীরবর উপাধি প্রাপ্ত হন। কাঙ্গরা নামক স্থান তাঁহাকে জায়গির স্বরূপ দেওয়া হয়। রায় ভুজ হাড়া আকবরের সময় মানসিংহের সহিত উড়িষ্যা আক্রমণে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে হাজারী পদে উন্নীত হন। তদীয় বীরপুত্র হরম রায় ও লালা দরবারের অভ্যর্থনা বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজা ভাওসিং রাজা মানসিংহের পুত্র। তিনি হাজারী পদে নিযুক্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর চারি হাজারী পদাতিক ও তিন হাজারী অশ্বারোহীপদে উন্নীত হন। তিনি মির্জ্জারাজা উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। পিতাম্বর দাস আকবরের সরকারে প্রথমতঃ চিত্তোর যুদ্ধে হোসেনখাঁর সহকারী সেনা-পতিরূপে কাজ করেন। পরে তিনি ক্রমোন্নতি করিয়া সম্রাটের চতুর্বিংশতিবর্ষ রাজত্বকালে বাঙ্গালার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি বিহারের দেওয়ান হন। ক্রমে তিনি হাজারী পদে উন্নতিলাভ করিয়া রায়রায়ান রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা টোডর মল্লের নাম সকলেই জানেন। তিনি আকবরের দরবারে ক্রমোন্নতি করিয়া চারি হাজারী পদ লাভ করেন। তিনি সামান্য একজন কেরাণীর পদ হইতে নিজ প্রতিভা বলে প্রধান মন্ত্রীর পদ পর্য্যন্ত লাভ করেন। লোকের নিকট তিনি শুধু রাজস্ব বিভাগের সংস্কারক বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু তাঁহার সামরিক যোগ্যতা এবং শৌর্য্যবীর্য্য ও রণকৌশলের প্রশংসা তদপেক্ষাও অধিক ছিল। তিনি এই বঙ্গদেশেও বিদ্রোহদমনকল্পে সেনাপতিরূপে আসিয়া-ছিলেন। বহুযুদ্ধে তিনি সেনাপতির কাজ করিয়া বিশেষ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজা জগন্নাথ কবচ রাজা টোডর মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি রাণাপ্রতাপের সহিত ভীষণযুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেওয়াতে আকবর তাঁহাকে পঞ্জাবের গবর্ণরপদে নিযুক্ত করেন। তিনি সর্ব্ব-শেষে পঞ্চ হাজারীর অতি উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। কচ্ছ প্রদেশের জগমল কচুয়া হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এই বঙ্গদেশেই অত্যাধিক তীব্রগতিতে অশ্বচালনায় পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

জগৎসিংহ রাজা মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি রাজদরবারে নয়শতী পদে নিযুক্ত হন। তিনি পরে বঙ্গদেশের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আগ্রাতে বঙ্গদেশে আসিবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন ইতঃমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপুত্র মহানসিং বঙ্গের শাসন-কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। সম্রাট জাহাঁগীর জগৎসিংহের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রায় দুর্গাদাস আকবরের দরবারে চার হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। মালবের ও দাক্ষি-ণাত্যের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দেলেপ সিং প্রথমত পাঁচশতী পদে নিযুক্ত হন।

রাজা রূপসী কচ্ছ হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গুজরাট অভিযানে বাদশাহের সঙ্গে ছিলেন।

বদনসিং মালওয়া প্রদেশে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে কামানের গোলাতে নিহত হন।

রাজা রামচন্দ্র উড়িষ্যার গবর্ণর ছিলেন। কতলু খাঁর সহিত ভীষণ যুদ্ধে তিনি রাজা মান-সিংহের সহকারিতা করিয়াছিলেন। রাজা রামচন্দ্র ভগিলা শের শাহের সময় কালিঞ্জরের যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজারাম দাসের ও রায় রায়সিং উল্লেখযোগ্য শেষোক্ত চারি হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

রাজা সঙ্গরাম বিহারের সুবাদার ছিলেন।

রায় কলিয়ন মল্ল, তিনি বিকানিয়ারের অধিবাসী ছিলেন, দুই হাজার পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিকারী ছিলেন।

রাজা মানসিংহের নাম পাঠকগণ সকলেই জানেন। তিনি সম্রাটের প্রধান সেনাপতি বা কমাণ্ডর-ইন-চিফ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিহার, কাবুল ও বঙ্গদেশের গবর্ণরপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সপ্ত হাজারী পদে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। ঈদৃশ উচ্চপদ অন্য কোন মুসলমানের ভাগ্যেও ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহাকে একাধারে প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী বলিলেও অত্যুক্ত হয় না। তিনি বহু যুদ্ধে বীরত্ব ও সমরকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইতিহাসে চিরকাল তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত উভাও ২০০, বলভদ্র ৩০০, বাঁকা কচ্ছ ৪০০, বাহাদুর ঘোলভট্ট ৩০০, ভারতী চাঁদ, রায় ভগবান দাস, বহু পুত্র রায়, ভাগার রাঠোর, পরমানন্দ ক্ষত্রিয়, ৫০০, প্রতাপসিং ২০০ রায় প্রসুতম, পিরাক দাস, তুলসী দাস ৩০০, তারাচাঁদ, জগমল পাল ভাড় ৫০০, চুণি ২০০, চিতাবড় গুজর, রাজা বজ্রভুজ, রাজা দেলের চাঁদ প্রভৃতি বহু উচ্চপদ বিশিষ্ট হিন্দু রাজকর্ম্ম-চারী আকবরের রাজ সরকারে নিযুক্ত ছিলেন। সামরিক ও রাজস্ব বিভাগে তাহাদের একাধিপত্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এসলামাবাদী।

আমিরুল মোমেনিন ওমর বিন আবদুল আজিজ।

এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের নাম ওমর, কুনিয়াৎ আবু হফস ও আবু খালেদ, উপাধি, "আল-মা'সূম বিল্লাহ" এবং (تخلص) তখল্লছ শেখ'ল ওমাইয়া। ইঁহার পিতার নাম আবদল আজিজ। মাতা, দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল্ মোমেনিন হজরত ওমরের (রাঃ) পৌত্রী, মহাত্মা আসেমের কন্যা পূণ্যবতী অম্মে আসেম!

বংশ তালিক।
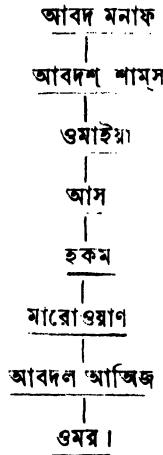
জন্ম।—প্রবল প্রতাপান্বিত খলিফা আবদোল মালেক যে সময় দামস্কের রত্ন-সিংহাসনে সমারূঢ়, মহাত্মা ওমরের পিতা সম্রাট-সহোদর প্রাতঃস্মরণীয় আবদল আজিজ যৎকালে প্রাচীন সভ্যতার সূতিকাক্ষেত্র, ঈশ্বরদ্রোহিতার খ্যাতিবান ফেরৌণের লীলাভূমি মিসরের শাসনকর্ত্তার পদে সমাসীন থাকিয়া, এসলামের ন্যায়বিচারে দেশকে শান্তি নিকেতনে পরিণত করিয়াছিলেন,—এহেন সুখ-শান্তি পূর্ণ সময়ে, হিজরীয় ৬১ অব্দে, মিসরের অন্তঃপাতী 'হাল্ওয়াণ' নগরে এই মহাযশস্বী পুরুষ জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

শিক্ষা।—মহাত্মা ওমরের সপ্তমবর্ষ বয়ক্রমে, তদীয় পিতা তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পূণ্যবাম আবদল আজিজ একজন মহা বিজ্ঞ ও সুধী পুরুষ ছিলেন। আরবীয় সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, পবিত্র হাদিস শাস্ত্রেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; ফলতঃ মারোওয়াণবংশে তাঁহার সমকক্ষ বিদ্বাণ, ন্যায়শীল ও ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ তৎকালে আর কেহই ছিলেন না।

পিতৃবিয়োগ ও মদিনাশরীফে আগমন।

মহামান্য খলিফা আবদুল মালেক, তদীয় সহোদরের অসাধারণ গুণবত্তা হেতু তাঁহার প্রতি যারপর নাই সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং স্বীয় অবর্ত্তমানে তাঁহাকেই 'খেলাফতের' ভাবী উত্তরাধিকারী-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু খোদাতাআলার অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল, পবিত্র খেলাফতের দণ্ড পরিচালন মহাত্মা আবদুল আজিজের ভাগ্যে ছিল না ; হিজরী ৮৫ অব্দে. জমাদিয়স্সানী মাসে, খলিফার জীবদ্দশায়, এই ধর্ম্মচেতা খোদা ভক্ত পুরুষ পরলোকগামী হইলেন।

পিতৃবিয়োগের সময়, মহাত্মা ওমরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বিবি অম্মে আসেম প্রাণাধিক কুমারের শিক্ষাদান বিষয়ে কখনও অমনযোগী ছিলেন না। প্রাণপ্রিয় স্বামীর বিয়োগ যন্ত্রণায় সদা মর্ম্মাহত, কিন্তু তথাপি স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্যে ক্ষণকালের জন্যও ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি কুমারকে আপনার কাছে রাখিয়া তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করা ও শিক্ষার ব্যাঘাত উৎপাদন অযৌক্তিক বুঝিয়া সত্বরে তাঁহাকে মদিনায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

বালক ওমর মদিনাশরীফে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মহা পণ্ডিত ওবেদুল্যা [বিণ আবদোল্যা, বিণ আতাবা, বিণ মস্উদ (রহঃ)] মহোদয়ের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অত্যল্প কালমধ্যে কোরআন মজিদ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন।

অতঃপর হজরত আবদুল্যা বিণ জা'ফর ও আনাস বিণ মালেক (রাজিঃ) সাহাবাদ্বয়ের পবিত্র খেদমতে হাদিস শিক্ষা আরম্ভ করিলেন।

তদ্ভিন্ন আবদুররহমান বিণ আবুবকর, সঈদ বিণ মোস্এব, য়ুসফ বিণ আবদুল্যা বিণ সালাম (রাজিঃ) প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক সাহাবী ও তাবেয়ীণগণের নিকটেও হাদিস অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ওমর বাল্যকাল হইতে মেধাবী ও অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন, তজ্জন্য অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অধ্যয়ন সমাধা হইয়াছিল। তাঁহার সহধ্যায়ী কিংবা সম সাময়িকগণের কেহই তাঁহার ন্যায় হাদিসজ্ঞ হইতে সক্ষম হন নাই।

বিবাহ।—খলিফা আবদুল মালেক আপন সহোদর আবদুল আজিজকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। নরপতি এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ভ্রাতার অকালমৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যল্পকালমধ্যে প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্রকে পিতৃ-গুণাবলীর সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে সক্ষম দেখিয়া, তাঁহার ভ্রাতৃ-শোকের শান্তি হইয়াছিল। তরুণ বয়স্ক ওমরের গুণে তিনি এতাদৃশ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্বইচ্ছায় আপন দুহিতা বিবি ফাতেমার সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

সম্রাট কন্যা ফাতেমার ধর্ম্মশীলতা ও পতিভক্তি অসাধারণ শ্রেণীর ছিল। বস্তুতঃ তিনি যে সর্ব্বাংশে তাঁহার স্বামীর উপযুক্ত পত্নী ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটি দ্বারা যথেষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

পুণ্যাত্মা ওমর খেলাফত লাভের পর তাঁহার নিজ তাবত সম্পত্তি সাধারণ ধন-ভাণ্ডারে (بيت المال) দান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গলাভের পর তদীয় শ্যালক সোলায়মান, আপন সহোদরীকে তৎসমুদয় প্রত্যার্পণ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণা ফাতেমা উহা প্রত্যাখান করিয়া বলিলেন—"আমার স্বর্গগত স্বামীর বর্ত্তমানে আমি যেরূপ তাঁহার অনুগত ছিলাম, এখনও তাহার বিন্দুমাত্র অন্যথা হইবে না। যদ্যপি অভাব প্রযুক্ত, আমার ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাতেও আমি দুঃখিত হইব না; কিন্তু তাঁহার দত্ত সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব!"

খলিফার পরলোকগমন, অলিদের সিংহাসন লাভ, পুণ্যাত্মা ওমরের মদিনাশরিফের গভর্ণরী প্রাপ্তি।

হিজরীর ষষ্ঠ-অশীতিতম অব্দে, জগদ্বিখ্যাত খলিফা আবদুল মালেক ২১ বৎসর একমাসকাল শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া এই শোকতাপ পূর্ণ অনিত্য জগত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরলোকে প্রস্থান করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল।

অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অলিদ পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

বহুদিন যাবত মক্কা ও মদিনাধামের সম্মানীয় অধিবাসীগণ তত্রত্য অযোগ্য শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার ও অবিচারে জর্জ্জরিত হইতেছিলেন। ক্রমে এই উৎপীড়নের মাত্রা এত অধিক হইয়া উঠিল যে, স্বয়ং সম্রাট অলিদকেও বিচলিত হইতে হইয়াছিল। বহু চিন্তা ও বিবেচনায় খলিফা আপন পিতৃব্য-পুত্র মহাত্মা ওমরকেই এই সম্মানীয় পদের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন।

পুণ্যবান ওমর দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় আদর্শ স্থানীয়, সম্মানী ও গুণীজনের সম্মান রক্ষায় সদা তৎপর, আর্ত্তের দুঃখে কাতর; এক কথায় তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুরুষ শুধু হেজাষ বা সিরিয়া প্রদেশে কেন?—তৎকালে সমস্ত পৃথিবী মধ্যেও দ্বিতীয় কেহ ছিলেন কিনা, সন্দেহ।

মহা সম্মানীয় খলিফা তাঁহাকে এই পবিত্র স্থানদ্বয়ের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া যথাসময়ে কার্য্যস্থলে প্রেরণ করিলেন।

মহাত্মা ওমর বিন আবদুল আজিজ মক্কা ও মদিনাশরিফের জন সাধারণের সবিশেষ পরিচিত ছিলেন, তাঁহার গভর্ণরীপদ লাভের সম্বাদ প্রচারিত হইবা মাত্র তত্রত্য আবাল বৃদ্ধ অবনত শিরে খোদাওন্দ করিমের নিকট শোকরগোজারী করিতে লাগিলেন। কি ধনী কি নির্ধন পবিত্র মক্কা ও মদিনার সকল গৃহে প্রবল আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। মহাত্মা ওমর যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য জননায়কবৃন্দ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত ও সাদরে পরিগৃহীত হইলেন।

মন্ত্রণা-সভা সংগঠন।

তৃণলতা পরিশূন্য ভীষণ মরীচিকাময় মরু-বিহারী, মৃতকল্প পথিক, হরিতলতা-গুল্ম-সুশোভিত সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা প্রদেশের মনোরম দৃশ্য সন্দর্শনে যেরূপ নবজীবন লাভ করিয়া থাকে ; অত্যাচার-জর্জ্জরিত হেজায বাসিগণ নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণ এই আদর্শ ধার্ম্মিক পুরুষকে আপনাদের শাসনকর্ত্তারূপে প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের বিগত অত্যাচার জনিত ক্লেশ ও দুঃখ সমূহ বিস্মৃত হইল।

মহাত্মা ওমর সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার অধীনস্থ সর্ব্বসাধারণের অভাব ও অভিযোগাদির যথাসাধ্য প্রতিকার এবং তাহাদের সুখ-শান্তি সংরক্ষণ কার্য্যে সদা যত্নবান থাকিবেন বলিয়া এক প্রতিশ্রুতি সর্ব্বসাধারণ মধ্যে বিঘোষিত করিলেন।

অতঃপর তিনি রাজনীতিক ও সামাজিক তাবত কার্য্যাদির নিষ্পত্তিকল্পে, ধর্ম্মপ্রাণ জ্ঞানবৃদ্ধ অভিজাত সম্প্রদায় ও পবিত্রচেতা আলেমগণের সমবায়ে একটী মন্ত্রণা সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সভ্যগণের সহিত যুক্তি করিয়া সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

প্রেরিত মহাপুরুষের (দঃ) মসজেদের পরিবর্দ্ধন।

মহামান্য খলিফা অলিদের শাসনকালে তদীয় সাম্রাজ্য মধ্যে অসংখ্য হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইমারতাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। শাসনকর্ত্তা ওমর পবিত্র মদিনাধামের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি মানসে পবিত্র মসজেদের সংস্কার ও কতিপয় অট্টালিকা নির্ম্মাণের অনুমতি খলিফা সকাশে প্রার্থনা করিলেন। মহামতি খলিফা সানন্দচিত্তে তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন ও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় মঞ্জুর করিলেন। পুণ্যবান ওমর সর্ব্বাগ্রে এই মসজেদ সন্নিহিত অধিবাসীগণকে প্রচুর পরিমিত অর্থ প্রদান করিয়া স্থানান্তরে তাঁহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণের আয়োজন করিয়া দিলেন এবং দূর দূরন্তর হইতে বহু মুসলমান স্থাপত্যবিদ আনয়ন পূর্ব্বক প্রভূত অর্থব্যয়ে কিয়দ্দিবস মধ্যে মসজেদের সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। মসজেদের আয়তন বহু পরিমাণে সম্প্রসারিত হইল এবং স্থাপত্যবিদগণের কার্য্য কুশলতায় হর্ম্ম্য সৌন্দর্য্য যথেষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইয়া পবিত্রধামের শোভা অতুলনীয় হইয়া উঠিল। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কর্ত্তৃক মসজেদের 'মেহরাব' সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

মসজেদ প্রাঙ্গণে কতিপয় কূপ খনন করাইয়া তদুপরি জলোত্তলক যন্ত্র সংস্থাপনদ্বারা কয়েকটি কৃত্রিম উৎস নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা মসজেদ প্রাঙ্গণ অতীব মনোহররূপ ধারণ করিয়াছিল।

তীর্থযাত্রীগণের অবস্থান জন্য কতিপয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া প্রবাসীগণের অসুবিধা বিদূরিত করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত মদিনার বহুসংখ্যক রাজপথ আজিও মহাত্মা ওমরের পুণ্যময় কীর্ত্তির স্মৃতি দর্শকের মনে জাগরুক করিয়া দিতেছে।

মহাত্মা ওমরের পদচ্যুতি।

মহাত্মা ওমরের যশঃ সৌরভ অত্যল্পকাল মধ্যে দিগদিগন্তে পরিব্যপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সময় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অত্যাচারী হোজ্জাজ বিন য়ুসফ এরাক প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিল। ইহার অবিচার ও অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া এরাকবাসিগণ প্রিয়তম জন্মভূমির মায়া মমতায় জলাঞ্জলী দিয়া শান্তিলাভ কামনায় দলে দলে ন্যায়বান ওমরের শাসনাধীন হেজাষ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল।

অত্যাচার প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ কোটীকণ্ঠে হোজ্জাজের অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী দয়াল হৃদয় ওমরের কর্ণগোচর করিতে লাগিল, ফলে তাঁহার পবিত্র হৃদয় সাধারণের দুঃখে যারপরনাই ব্যথিত হইয়া উঠিল! তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া নরাধমের অত্যাচার ও অবিচার বৃত্তান্ত খলিফা সমীপে উপস্থিত করিলেন। অন্যদিকে কুটীলমতি হোজ্জাজ মহাপ্রাণ ওমরের আরোপিত অভিযোগ সমূহের প্রতিবাদ করিল এবং এই ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিকের বিরুদ্ধে নানাবিধ কৃত্রিম অভিযোগ আনয়ন পূর্ব্বক, তাঁহাকে স্বদেশদ্রোহীগণের আশ্রয়দাতা ও মহামান্য খলিফার বিরুদ্ধবাদীরূপ সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইল। বলা বাহুল্য যে, এ ক্ষেত্রে সেই নরধামেরই জয়লাভ হইল, সাধক কবির সত্যই বলিয়াছেন :—

"স্যাচ্ কহো তো মারে লাঠা, ঝুঠা জগত ভুলায়"।

আপাত-মধুর মিথ্যা বহুস্থলে অবিবেকীদিগের মনঃস্তুষ্টি সাধনে সক্ষম হইয়া থাকে। এ স্থলেও সত্যের পরাজয় ও অসত্যের জয়লাভ ঘটিল। মহামান্য খলিফা দুর্দ্দান্ত হোজ্জাজের ছলনায় বিমুগ্ধ হইয়া এহেন সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ব্যক্তিকে পবিত্রস্থানের শাসনকর্ত্তার পদ হইতে অপসারিত করিলেন। গুণবান ওমর স্বীয় পদচ্যুতির জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই পুণ্যস্থানের জননায়কগণের শোকগাথা বিদায়ী অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়া ও আবাল বৃদ্ধের শোকধ্বনি শ্রবণ করিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি সাশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহামান্য খলিফা অলিদের পরলোক গমন।

শ্রদ্ধাস্পদ খলিফা হিজরীর ৯৬ অব্দে ১৫ই জমাদিয়সসানি বৃহস্পতিবার দিবস, ৪৫ বৎসর বয়সে, নয় বৎসরকাল খেলাফতদণ্ড পরিচালন করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন। তাঁহার শাসনকালে এস্লামের বিজয় বৈজয়ন্তী বহুদূর দূরন্তরে প্রোথিত হইয়াছিল। আরব ও এস্লামের ঔপনিবেশ সমূহে অসংখ্য হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার ১৯টি পুত্র সন্তান বিদ্যমান ছিল এবং তন্মধ্যে আবদররহমানকে আপনার স্থলাভিষিক্তরূপে খেলাফত গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত হোজ্জাজ বিন য়ুসফ ও কতিবা এবুনে মোস্লেম ব্যতীত অন্ত কেহই তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন নাই। অবশেষে ন্যায়বাদী ওমরের যুক্তি ও তর্ক শুনিয়া তিনি স্বীয় অযথা প্রস্তাবের প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সোলায়মানের খেলাফত লাভ।

মাননীয় খলিফা অলিদের পরলোকগমনের পর তদীয় সহোদর সোলায়মান তদানীন্তন প্রধান প্রধান জননায়কগণের অনুমোদনক্রমে খেলাফতের রত্ন-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। গুণী ওমর সোলায়মানের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। খলিফা সোলায়মান খেলাফত-লাভ অবধি সর্ব্ববিধ কার্য্যে মহাত্মা ওমরের যুক্তি গ্রহণ করিতেন। এক কথায় ওমর বিন আবদুল আজিজ মাননীয় খলিফা সোলায়মানের অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রেষ্ঠতম পারিষদ ও সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী ছিলেন;—তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কি অতি ক্ষুদ্রতম কার্য্য কিংবা জটিল রাজনীতিক চক্রান্তপূর্ণ কর্ম্ম কদাচই সম্পন্ন করিতেন না।

জনৈক খারেজির দুর্ব্ব্যবহার ও মহাত্মা ওমরের স্বাধীন মত।

মহামান্য খলিফা সোলায়মান একদা একজন খারেজির সহিত কোনও বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, খারেজি * কথা প্রসঙ্গে অবিমৃষ্যকারিতার বশে মান্যনীয় খলিফার প্রতি কতকগুলি অন্যায় ও অসম্মানজনক বাক্য প্রয়োগ করিল। তজ্জন্য খলিফা মহাত্মা ওমরকে এই খারেজির দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় প্রকাশ করিয়া ইহার বিচার ব্যাপারে মত জিজ্ঞাসা করিলেন। ধার্ম্মিক ওমর অপরাধীকে ক্ষমা করিবার পরামর্শ দিলেন এবং সেই হতভাগার নিকট উপস্থিত হইয়া এতাদৃশ অকথ্য ভাষা প্রয়োগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সেই খারেজি ইহার কোনও উত্তর না দিয়া তাঁহাকেও গালি প্রয়োগ করিল। তদ্দর্শনে খলিফা আরও দুঃখিত হইলেন, এবং মাননীয় ওমরকে কহিলেন,—"আপনি অনর্থক এই দুর্বৃত্তের প্রাণদণ্ড রহিত করিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিতেছিলেন।" ইহা শুনিয়া ওমর কহিলেন,—"এ ব্যক্তি আপনাকে যেরূপ অকথ্য ভাষা কহিয়াছে আপনিও সেই সকল ভাষা ইহার প্রতি প্রয়োগ করিতে পারেন।" কিন্তু খলিফা তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ বা ধৈর্য্যশীল ছিলেন না, তিনি অবিলম্বে তাহার শিরচ্ছেদন করাইলেন।

খলিফার এইরূপ অন্যায় ব্যবহারে ধর্ম্মপ্রাণ ওমর যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। অতঃপর তিনি বিমর্ষচিত্তে গৃহে প্রত্যাবৃত হইতেছেন, পথিমধ্যে দামস্কের (دمشق) শান্তিরক্ষক খালেদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; খালেদ কহিলেন,—"মহাশয়! আপনার বিচার দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি, এক নিচাশয় ব্যক্তি মহামাননীয় খলিফাকে অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিল, আপনি খলিফাকেও তদ্রূপ গালি প্রদান করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের যুক্তি প্রদান করিলেন!" তাঁহার পদোচিত সম্মানের সীমা কি এই পর্য্যন্ত??"

ইহা শুনিয়া মহাত্মা ওমর ধীরভাবে কহিলেন,—কেন ভাই! তুমি কি সেই মহামহিমান্বিত আল্লার পবিত্র আদেশে বিস্মৃত হইয়াছ;—خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين

* যাহারা হজরত ওসমান, ওমর, বা আলিকে (রাজিঃ) অমান্য করে।

"ক্ষমাশীল হও, ন্যায় কথা বল এবং মূর্খদের (নির্ব্বুদ্ধিতামূলক তর্কে) ভয় করিও না।" আর যদি ক্ষমা করিবার শক্তির অভাব হয় ; তাহা হইলে,—

جزاء سيئة سيئة مثلها

সমতুল্য ব্যবহার দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বান বিচারক আল্লাহতাআলার আজ্ঞা ; সুতরাং আমি জ্ঞানকৃত কোনরূপ অন্যায় যুক্তির কথা ত বলি নাই।" অহো! এই সকল পুণ্যবান প্রাতঃস্মরণীয় মহামনিষীবৃন্দই 'আল্লার দাস ও রসুলের (দঃ) ওম্মত' নামে অভিহিত হইবার প্রকৃত অধিকারী। এই মহাত্মাগণের পুণ্যফলেই এই পাপ তাপ জর্জ্জরিত সসাগরা ধরিত্রী এখনও মানবমণ্ডলীকে বক্ষে ধারণ করিয়া মহাসৃষ্টির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ রহিয়াছে!! মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে এই পুণ্যশীল খোদাভক্ত পুরুষগণের পদাঙ্কানুসরণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

یار مردان خدا باش که در کشتي نوح
هست خاکي که بآبے نخرد طوفانرا

মাননীয় খলিফা সোলায়মানের পরলোক প্রাপ্তি ও মহাত্মা ওমরের খেলাফত লাভ।

দুই বৎসর আট মাসকাল খেলাফতদণ্ড পরিচালন করিয়া হিজরীর ৯৯ অব্দে ২৩শে সফর তারিখে মাননীয় খলিফা ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি স্বীয় আসন্নকালে তৎপুত্র দায়ুদকে আপন স্থলাভিষিক্তরূপে খেলাফত দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; কিন্তু তদানীন্তন ধর্ম্মাচার্য্য মহাত্মা এমাম রেজা এব্নে হায়াত, তাহার প্রস্তাবে আপত্য উথাপন করিলেন, তখন তিনি মহাত্মা ওমরকে ভাবী খেলাফতের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া 'অসিয়ৎ-নামা' লিপিবদ্ধ করিলেন এবং উহা স্বহস্তে লেফাফাবদ্ধ করিয়া আপন শীলমোহর সংযুক্ত করিলেন। অনন্তর তাঁহার মৃত্যুর পর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনায়কগণ কর্ত্তৃক খলিফার অসিয়ৎ-নামার লেফাফা উন্মুক্ত হইল এবং মহাত্মা ওমরকে খেলাফতের পবিত্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি।

যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, যতদিন ধরিত্রীপৃষ্ঠে মোস্‌লেমগণের অস্তিত্ব রহিবে ততদিন উমাইয়াবংশীয় নবম খলিফা পুণ্যবান ওমর বিন আবদুল আজিজের নাম প্রত্যেক ইতিহাসজ্ঞ মুসলমানের মনে জাগরুক থাকিবে। উমাইয়া কুলে তাঁহার ন্যায় কোনও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ধার্ম্মিক পুরুষ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন নাই।

এস্‌লাম জগতের অত্যুত্তম গৌরবস্তম্ভ মহামাননীয় খোলাফায়ে-রাশেদিনগণের তৃতীয় স্থানীয় খোদা ও রসুলের (দঃ) পরমভক্ত সৈয়দানা হজরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদত ব্যাপারে, কতকগুলি কুচক্রী লোকের ষড়যন্ত্রে, নূর নবীর (দঃ) প্রাণাধিক হজরত আলি এব্নে আবিতালেবের (রাঃ) সহিত (তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও) আমির মাভিয়ার সহিত একটি যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

এস্লাম ইতিহাসে ইহা (جنگ جمل) 'জঙ্গে জমল' বা 'উষ্ট্র ঘটিত সংগ্রাম' নামে অভিহিত।

এই যুদ্ধ সংঘটনের পর হইতে আমির মাভিয়ার আদেশানুসারে খোদাতাআলার আদর্শভক্ত ও রসুলের প্রাণাধিক, বীরশ্রেষ্ঠ হজরত আলির (কঃ) প্রতি বিদ্বেষ ও অসম্মানজনক কতিপয় বাক্য খোতবার মধ্যে সংযোজিত হইয়াছিল। মাভিয়ার সময় হইতে এতাবতকাল এই ধর্ম্মনীতি বিগর্হিত কার্য্য নিরাপত্যে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল।

মহাপ্রাণ ওমর যখন বালক, যৎকালে তিনি পবিত্র মদিনাধামে থাকিয়া মহাত্মা ওবেদুল্যার (রাঃ) নিকট বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময় তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষক একদা উপদেশচ্ছলে এই অনৈস্লামিক পাপাচারজনক কার্য্যের বিষয় তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন মহাত্মা ওবেদুল্যার (রঃ) অমূল্য উপদেশ তিনি একদিনের জন্যও ভুলিয়া যান নাই। খোৎবা শ্রবণকালে এই পাপ বাক্যগুলি তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে শেলবৎ যন্ত্রণা প্রদান করিত। কিন্তু ইহার প্রতিকারের কোনও ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, তজ্জন্য তিনি নীরবে সহ্য করিতেন।

আজ সর্ব্বশক্তিমান খোদাতাআলার ইচ্ছায় তিনি খেলাফতের অধিকারী। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া এই পাপ প্রথার মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইলেন। অতঃপর তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে এই উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশে জনৈক খ্যাতনামা ইহুদীভিষক দরবারে উপস্থিত হইল।

ভিষক রাজের দরবার প্রবেশের পর প্রধান মন্ত্রী মহোদয় তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহা শুনিয়া ভিষকবর কহিলেন,—"আমি কোনও বিশেষ আবশ্যক হেতু দরবারে উপস্থিত হইয়াছি; আমার মন্তব্য স্বয়ং খলিফা মহোদয় ভিন্ন অন্য কেহ শ্রবণ করিবার অধিকারী বলিয়া আমার বোধ হয় না, সুতরাং আমার বক্তব্য আমি অন্য কোনও মহাত্মার নিকট প্রকাশ করিতে অক্ষম।" ইহুদীর বাক্য শুনিয়া মহামান্য খলিফা কহিলেন—"তোমার কি মন্তব্য তাহা বল, আমি শুনিতেছি।"

ভিষক। জাঁহাপানাহ, আমি নিজের গোপনীয় প্রার্থনা প্রকাশ্যভাবে নিবেদন করিব, তাহাতে জাঁহাপানার কোনওরূপ আপত্য হইবে না ত?

খলিফা। না, তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার তাহাতে নিষেধ নাই।

ভিষক। প্রভো! অধীনের নিবেদন শ্রবণ করিলে বোধ করি দরবারের সভা মহোদয়গণ, এমন কি স্বয়ং আমিরুল মোমেনিনও অভাজনের প্রতি কোপাবিষ্ট হইবেন। তদ্ব্যতীত এ অভাজনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হওয়াও অসম্ভব নহে।"

খলিফা। "না, তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া গেল, তুমি নির্ভীকচিত্তে নিজের মনোভাব ব্যক্ত কর।"

ভিষক। "অভাজন খলিফা-দুহিতার পাণি-গ্রহণের অভিলাষী।"

ইহুদীর এতাদৃশ অন্যায় প্রস্তাব শুনিয়া সভাসদ মাত্রেই যুগপৎ বিস্মিত ও ক্রোধান্বিত হইলেন, এমন কি কেহ কেহ ভিষকবরকে যমালয়ে প্রেরণ জন্য স্ব স্ব তরবারি কোষ-মুক্ত করিলেন। কিন্তু মহামান্য আমিরুল মোমেনিন তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া ভিষককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেন এতাদৃশ নীতি-বিগর্হিত ও অন্যায় প্রস্তাব উত্থাপন করিতে তোমার কি লজ্জা বা ভয়ের উদ্রেক হয় নাই? তোমার কি আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে?

ভিষক। জাঁহাপানাহ! আপনার ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা আজীবন শুনিয়া আসিতেছি এবং তাহারই প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমি এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, আমি কোনওরূপ অন্যায় প্রস্তাব করি নাই।"

খলিফা। "না, তোমার এ প্রস্তাব কখনও ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না।"

ভিষক। কেন জাঁহাপানাহ! আমার প্রস্তাব অন্যায় কিরূপে?

খলিফা। (ক্রোধভরে) "হতভাগা! তুই নিশ্চয়ই অন্যায় কথা বলিয়াছিস! তুই কি জানিস না,—আমি আমিরুল মোমেনিন,—আমি পবিত্র এসলাম ধর্ম্মাবলম্বী! আমার ধর্ম্মানুসারে মোসলেম-মহিলার সহিত কাফেরের পরিণয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ!!"

ভিষক। জাঁহাপানাহ! তবে আপনি এস্‌লাম ধর্ম্মনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ!

খলিফা। কি নরাধম! আমি এস্‌লাম ধর্ম্মনীতি জানি না?"

ভিষক। জাঁহাপানাহ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনি ধর্ম্মনীতি অবগত নহেন। ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমি সপ্রমাণ করিতেছি।

ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) অপেক্ষাও কি আপনি অধিক সম্মানার্হ?

খলিফা। নউজো-বিল্লাহে। আমি তাঁহার দাসানুদাসগণের পাদুকা বহনেরও উপযুক্ত নহি।"

ভিষক। কেন? আপনার ভক্তিভাজন প্রেরিত পুরুষ (দঃ) কি তাঁহার একটি কন্যার বিবাহ কাফেরের সহিত সম্পন্ন করেন নাই?"

ইহুদীর কথা শুনিয়া সভাজনমাত্রেই ক্রোধে আবার আত্মহারা হইলেন। কিন্তু আমিরুল মোমেনিন পুনরায় তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া ইহুদীকে কহিলেন—"নরাধম তুই মিথ্যাবাদী!"

ভিষক। নরনাথ! আমি মিথ্যাবাদী কিরূপে? এস্‌লাম শাস্ত্রে কাফের ব্যতীত অন্য কাহাকেও লা'নৎ (অভিসম্পাত) প্রয়োগ করা কি ধর্ম্মানুমোদিত?"

খলিফা। "কখনই নয়!"

ভিষক। "আপনার শাস্ত্রানুসারে কি লা'নতের উপযুক্ত ব্যক্তি কাফের নহে?"

খলিফা। হাঁ, অত্যাচারী ও কাফেরগণ কেবল লা'নতের উপযোগী।"

তিষক। জাঁহাপানাহ! তবে আপনার ধর্ম্মগুরুর (দঃ) প্রাণ-প্রতিমা জামাতা আলি এব্নে আবিতালেবের (কঃ) প্রতি বহুকাল যাবত কেন লা'নত প্রদান করা হইতেছে?—বলুন আমার কথা কোন্ সূত্রে অসঙ্গত?"

খলিফা। "আস্তাগ্ ফেরোল্লাহ! আস্তাগ্ ফেরোল্লাহ!!"

তখন সভাষদগণ লজ্জা ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন আলেম ফাজেলগণ ক্ষোভে অধোমুখী হইয়া নীরবভাবে বসিয়া রহিলেন। আমিরুল মোমেনিনের নেত্রদ্বয় হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সভাস্থ জনসাধারণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"হায়! আমাদের পিতৃ পুরুষগণ, পার্থিব ধন-ঐশ্বর্য্যের মোহে বিমুগ্ধ হইয়া, অসার ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থের সহিত অমূল্য ইমানের বিনিময় করিয়া গিয়াছেন," এবং তদমুহূর্ত্তেই তিনি 'খোৎবা' হইতে হজরত আলির (কঃ) প্রতি বিদ্বেষ ও অসম্মানজনক বাক্যাবলীর উচ্ছেদ পূর্ব্বক তৎস্থলে নিম্নলিখিত আয়েতটি সংযোজনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যথা :—

ان الله يأمر بالعدل والاحسان و ايتاء ذى القربى واليتعى و ينهى عن الفحشاء

والمنكر والبغى*

(ক্রমশঃ)

মোহাম্মদ এব্রার আনসারী।

* নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচার, পরোপকার আত্মীয় ও এতিম (পিতৃহীন বালক) গণকে দান করিবার আজ্ঞা করিতেছেন এবং অশ্লীলকার্য্য কুকথা (উচ্চারণ) ও অবাধ্যাচারণে নিষেধাজ্ঞা করিতেছেন।

কোর্‌আনের বিশুদ্ধতা আলোচনা।

১ কোরানের মূল সংরক্ষণ সম্বন্ধে ঐশী অঙ্গীকার।

"নিশ্চয়ই আমি 'জেকের' (উপদেশ-অর্থাৎ কোরআন) অবতারণ করিয়াছি ও নিশ্চয়ই আমি ইহার রক্ষক হইব।" (-অল্ কোরআন-সুরত-অল-হেজর, আঃ ৯)।

কোরআনের ইতিহাসে, উপরোক্ত আয়তভুক্ত অঙ্গীকার পালন এরূপ একটি প্রমাণিত ব্যাপার যে, সার উইলিয়ম মূরের ন্যায় ব্যক্তিও (যিনি খৃষ্টান মিশনারীদিগকে মুসলমানগণের মধ্যে প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে 'লাইফ অব মহোমেট' [মোহাম্মাদের জীবনী] নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন) স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "সম্ভবতঃ জগতে আর কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ নাই, যাহা এরূপ সমূলে দ্বাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে।" এবং তিনি ভনহামার নামে আর একজন খৃষ্টান লেখকেরও এই বাক্য—"মুসলমানেরা যেরূপ কোরআনকে আল্লার বাণী বলিয়া স্বীকার করে, তদ্রূপ আমরা ইহাকে নিশ্চিতই মোহাম্মদের (সঃ) বাক্য বলিয়া স্বীকার করি"—সমর্থন করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। স্বভাবতঃ লোকের মনে এই প্রশ্নই উত্থাপিত হয় যে,এমন কি অবস্থা ঘটিয়াছিল যাহাতে কোরআন যে ভাবে প্রেরিত পুরুষের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই যে তাহা আমাদিগের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে তদ্বিষয় বিশ্বাস করা যাইতে পারে। এসলামের ইতিহাসে ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা হয়। তাহার একটি এই যে,এসলাম-সংস্থাপক ঐশীপ্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বীয় জীবদ্দশাতে কোরআন সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। আর একটি, তাঁহার প্রাথমিক স্থলাভিষিক্তগণের সময়, যাহারা অতি বিশ্বস্ততার সহিত প্রেরিত পুরুষের মৃত্যুর সময় তাঁহা কর্ত্তৃক কোরআন যে ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবে ইহাকে বংশানুক্রমে রক্ষিত ও হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন। যাহাহউক, এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত আয়তোপরী কোন এক বেনামী খৃষ্টান লেখক-কর্ত্তৃক * ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে লিখিত কতকগুলি আপত্তির উত্তর স্বরূপ কিছু মন্তব্য প্রকাশ করাও আবশ্যক। এই লেখক বৃথা তর্ক করিয়াছেন যে, এই আয়তে 'আজ্জিক্‌র' শব্দে কোরআন অর্থ না বুঝাইয়া বরং যে কোন সময়ে যে কোন প্রেরিত পুরুষের নিকটে অবতীর্ণ প্রত্যেক প্রত্যাদেশ অর্থই বুঝায়।

---

* 'তাবিল-অল-কোরন' বা কোরান প্রসঙ্গ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইহা একখানি উর্দ্দু লেখা গ্রন্থ। লাহোরের পাঞ্জাব রিলিজসবুক সোসাইটী হইতে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত।

সম্পর্কান্বিত বিষয় না জানা হেতুই ঐ বাক্যের এইরূপ ভুল অর্থ করা হইয়াছে। 'জেকর' শব্দ যে প্রেরিত পুরুষগণের যে কোন গ্রন্থ' অর্থে বুঝায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে ইহা বিশেষতঃ কোরআনকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বুঝাইতেছে অর্থাৎ কোরআন অর্থেই এখানে জেকের শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, আলোচ্য আয়তে 'আজ্-জেকর' শব্দ শেষোক্ত অর্থকেই সমর্থন করে। ইহা পঞ্চদশ অধ্যায়ের (সুরার) ৯ম প্রবচন আয়ত, যে সুরার প্রারম্ভেই এইরূপ লিখিত হইয়াছে! "এই প্রবচন সকল এই গ্রন্থের ও উজ্জ্বল কোরআণের' (বা মৌলভি আব্বাস আলি সাহেবের অনুবাদ 'কেতাব ও বর্ণনাকারী কোরানের এই আয়ত সকল')। ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম আয়ত পর্য্যন্ত ঐ সুরা নিম্নলিখিতভাবে পাঠ করা হয়:—"এবং তাহারা বলে যে 'ওহে তুমি সেই ব্যক্তি যাহার উপর 'জেকের' (উপদেশ কোরান) অবতীর্ণ হইয়াছে, নিশ্চয় তুমি পাগল। যদি তুমি সত্যবাদীদিগের একজন হও তবে কেন আমাদিগের নিকটে স্বর্গীয় দূত (ফেরেশ্‌তা) গণকে আনিতেছে না'! (আল্লাহ বলিলেন) আমি ফেরেশ্‌তাগণকে প্রকৃত কারণ (বা ন্যায়ানুসারে) ব্যতীত অবতারণ করি না এবং তখন তাহারা (ধর্ম্ম-দ্রোহিগণ) অবকাশপ্রাপ্ত হইবে না। নিশ্চয় আমি জেকর অবতারণ করিয়াছি এবং আমিই ইহার রক্ষক হইব।" এক্ষণে শেষ বাক্যাংশে সংরক্ষণের অঙ্গীকার স্পষ্টতঃ সেই একই 'জেকর' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যাহা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকটে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া প্রথম বাক্যাংশে উল্লিখিত হইয়াছে। এবং এইরূপে আলোচ্য আয়তে 'জেকর' বলিতে যে কোরআনশরীফকেই বুঝায় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোরান শরীফের অন্যান্য অনেক আয়তেও পবিত্র গ্রন্থ সম্বন্ধে এইরূপ অঙ্গীকার পূর্ণ বাক্য সকল দৃষ্ট হয় ও তদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করাও যায়। আমরা কোরআন শরীফের 'হামিম্ অস্‌সেজদা' নামক এক চত্বারিংশ সুরায় এইরূপ পাঠ করি; "নিশ্চয় যাহারা উপদেশকে (কোরাণকে), যখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, অগ্রাহ্য করিয়াছে তাহা গুপ্ত নহে, এবং নিশ্চয় উহা সম্মানিত গ্রন্থ। তাহাতে কোন অসত্য তাহার সম্মুখ ও তাহার পশ্চাৎ হইতে উপস্থিত হয় না, প্রশংসিত ও বিজ্ঞানময় (ঈশ্বর) হইতে তাহা অবতারিত হইয়াছে।" (আঃ ৫১—৪২)। এইরূপ অন্যান্য অনেক আয়ত হইতে স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে কোরআন শরীফ সর্ব্বাগ্রেই সর্ব্ববিধ বিনাশ, অপবিত্রতা (বিকৃতি) ও পরিবর্ত্তন হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার ঐশ্বরিক অঙ্গীকার প্রচারিত করিয়াছিল। এই হেতু অতি পূর্ব্বতন সময় হইতেই মুসলমানেরা কোরআন শরীফকে বিনষ্ট বা ইহার মূল পরিবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে সকল রকম আক্রমণ (বা ব্যাঘাত) হইতে ইহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে এরূপ অঙ্গীকার এই সকল আয়তের অন্তর্ভুক্ত আছে বলিয়া এই আয়ত গুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কোরাণের ভাষ্য সম্বন্ধে অতি পূর্ব্বতন বিশেষজ্ঞ মোজাহিদ ও কতাদা উভয়েই এইরূপে এই দুই আয়তের এই ব্যাখ্যায় ঐক্যমত হইয়া বিবৃত করিয়াছেন যে, পঞ্চদশ সুরার

নবম আয়তে কোরআনকে রক্ষা করিতে বলিতে ও এক চত্বারিংশ সুরার ৪২ আয়তে অগ্র বা পশ্চাৎ হইতে কোন অসত্যকে পবিত্র গ্রন্থের নিকটবর্ত্তী হইতে না দেওয়া বলিতে এরূপ বুঝায় যে এমন কোনও বাক্য ইহাতে সংযোজিত হইবে না যাহা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্ত্তৃক গৃহিত ঐশী প্রত্যাদেশের অংশ বিশেষ নহে বা এরূপ কোন কথা ইহা হইতে পরিত্যক্ত হইবে না যাহা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকট অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ বাণীর অংশভুক্ত বলিয়া গণ্য। কোরআন ভাষা সম্বন্ধে এই দুই জন বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য সকল বিশেষজ্ঞেরাও একমত হইয়া বলিয়াছেন যে এই দুই আয়তস্থ 'আজ্‌জেকর' কথার দ্বারা পবিত্র কোরআন অর্থেই স্থিরীকৃত হয়।—এবেন্‌-জরীরের ভাষ্য দ্রষ্টব্য—১ম খণ্ড ৬ পৃঃ, ২৪ খঃ ৭১—৭২ পৃঃ)।

অতএব এ স্থলে আমাদের প্রমাণ এই যে, আজিকাল মুসলমানেরা এই সকল আয়তকে যে ভাবে বোধগম্য করিয়া থাকেন, অতি পূর্ব্বতন বিশেষজ্ঞেরাও—যাঁহাদের অভিমত আমরা সহজেই পাইতে পারি তাঁহারাও—সেই একই ভাবে বুঝিয়াছিলেন, এবং ঐ অর্থের উপর অবিশ্বাস স্থাপন বা উপরোদ্ধৃত আয়ত গুলির বাক্যে অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করিবার যে কোন চেষ্টাই নিষ্ফল। তাবিলুল অল কোরআণের প্রণেতা তর্ক করিয়াছেন যে, কোনরূপ অঙ্গীকারের বিদ্যমানতা ইহার পালন করাকে প্রমাণিত করে না। অর্থাৎ কোনরূপ অঙ্গীকার করা হইল বলিয়াই যে ইহা পালন করা হইল তাহা প্রমাণিত হয় না ইহা নিঃসন্দেহ সত্য কিন্তু এরূপ বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে যাহাতে নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারা যায় যে এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে। যদি অঙ্গীকার পালন করা না হইত এবং যদি কোরআন শরীফের মূলে কোন পরিবর্ত্তন ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহা হইলে ইহাতে দুইটি ঘটনার একটি না একটি অবশ্যই ঘটিত; অর্থাৎ যাহারা এই সকল পরিবর্ত্তন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, হয় তাঁহারা কোরআন শরীফকে ঈশ্বরবাণী (কালামোল্লা) বলিতে সম্মত হইতেন না, না হয় পূর্ব্বোক্ত আয়তের প্রকাশ্য যে অর্থ হয়, সেই অর্থ ছাড়া অন্য কোন রকম অর্থ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি যে; এইরূপ ঘটনার কোনটাই ঘটে নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মোজাহিদ ও কতাদার ন্যায় প্রাচীনতম পণ্ডিতেরা কোরআনের মূল কখনই নষ্ট হইবে না এরূপ অঙ্গীকার এই সকল আয়তে আছে বলিয়া বুঝিয়া গিয়াছেন ও পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই অন্য কোন অর্থ প্রকাশ বা উল্লেখ করেন নাই। অতএব আমরা স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাই যে, হজরত রসুলের পারিষদগণ কর্ত্তৃক এই সকল বাক্যে অন্য কোন ভাব (অর্থ) কখনই সংযোজিত হয় নাই। কারণ যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে এই মর্ম্মে কোনরূপ সংবাদ প্রচারিত থাকিত। এসলামের পূর্ব্বতন ইতিহাস হইতে ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে হদিস শাস্ত্রভুক্ত একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিব। এই মর্ম্মে একটি হাদিস আছে যে, হজরত রসুল তাঁহার ভার্য্যাগণকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদিগের মধ্যে যাহার হস্ত অতি দীর্ঘ হইবে, সেইই (আমার মৃত্যুর পরে) আমার সহিত অতি সত্বর মিলিতে হইবে। এই ভাবেই প্রেরিত পুরুষের ভার্য্যাগণ এই কথা গুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ তৎক্ষণাৎ

তাঁহারা তাঁহাদের হস্তের দীর্ঘতা তুলনা করিবার জন্য তাঁহাদের হাত মাপিতে লাগিলেন। কিন্তু হাদিস বাক্য হইতেই আমরা অবগত হইয়াছি যে, তাঁহারা এই বাক্যের এই অর্থ স্থির করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। কারণ ঐ সকল কথার অর্থ অতঃপর এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল :—তোমাদিগের মধ্যে যিনি দানে অতি বড় (বা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দানশীলা ;) সেইই অতি সত্বর আমার সহিত মিলিত হইবে। * এই ভবিষ্যদ্বাণী শেষোক্ত ভাবানুযায়ী পূর্ণ হইয়াছিল এবং হদিসের এইরূপ টীকা প্রদত্ত হইয়াছে :—"এই হদিস বাক্যের অর্থ এইরূপ :—হজরত রসুলের ভার্য্যাগণ ভাবিয়াছিলেন যে ভবিষ্যদ্বাণীস্থ হস্তের দীর্ঘতা ভাবেই ধরিতে হইবে, তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাদের হাতের দীর্ঘতা মাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কথানুযায়ী "সোদার" হাতই দীর্ঘ ছিল ; পক্ষান্তরে দান করিতে ও দাতব্য কার্য্যে জয়নবের হাতই অতি দীর্ঘ ছিল ও জয়নবই প্রথমে হজরত রসুলের পরে মৃত্যুলাভ করেন। অতঃপর তাঁহারা হাতের দীর্ঘতা বলিতে দান খয়রাতে প্রসারত্ব অর্থই বুঝিয়াছিলেন। ....।"

বোখারী ও ইহার সুপরিচিত ভাষ্য ফাত্হ অল্ বারিও স্বীকার করেন যে ভবিষদ্বাণীটিকে প্রথমে আক্ষরিক ভাবে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছিল যে, কথাগুলিতে একটি ভিন্ন অর্থ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

যদিও ভবিষ্যদ্বাণীটি কোরআনের কোনও অংশ নহে, তত্রাচ হদিসও আমাদিগকে প্রকৃত প্রসঙ্গ প্রদান করিতে অসমর্থ নহে। অতএব আমরা যথার্থ ভাবে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, যদি কোরআনের সংরক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল আয়তে ঐ ভবিষদ্বাণী আছে, সেই সকল আয়তের দৃশ্যমান (প্রত্যক্ষ) অর্থানুসারে (ভাবে) পালন করা হইত না, তাহা হইলে বিষয়টি এরূপ ভয়ানক 'গুরুতর' হইত যে আসহাব গণের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ, এই সকল কথার ভিন্ন অর্থ সংযোগ করিতেন ও বংশ পরম্পরা জানাইতেন যে, কথা গুলি দৃশ্যমান অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু বড় বড় হাদিস সংগ্রহে আমরা এই মর্ম্মে একটিও প্রচার উক্তি দেখিতে পাই না। ইহাও অসম্ভব যে যদি ভবিষদ্বাণী বাক্যের আক্ষরিক অর্থানুসারে পূর্ণ না হইত, তাহা হইলে যে কেবল সহস্র সহস্র আসহাব (পারিষদ) ঘটনাটিকে চুপে চুপে ছাড়িয়া দিতেন, তাহা নহে, বরং অতি পূর্ব্বতন বিশেষজ্ঞেরা যাঁহারা স্বয়ং পারিষদগণের নিকট হইতে কোরআন শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিশ্চিত বলিতেন, আলোচ্য আয়ত গুলির অর্থ এই পবিত্র গ্রন্থ মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

---

* 'মোস্লেমের বিবৃতিতে—আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের হস্তের প্রশারতানুযায় আমার সঙ্গে তোমাদের দ্রুততর সম্মিলন ঘটিবে।" অপিচ তাঁহাদের মধ্যে কাহার হস্ত অধিকতর দীর্ঘ এ বিষয়ে বাদানুবাদ হইতেছিল। তিনি (আয়শা) বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে জয়নবের হস্ত অধিকতর দীর্ঘ ছিল। যে হেতু তিনি স্বহস্তে কাজ করিতেন ও সদকা দান করিতেন।'—মেস্কাত-অল-মসাবিহ জকাত প্রকরণ—গিরীশ বাবুর অনুবাদ।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে হজরত রসুলের (দঃ) আসহাবগণ কোরআণের সংরক্ষণ সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ কথাগুলিকে প্রকাশ্য অর্থে বুঝিয়াছিলেন। অতএব কোরাণ শরীফের মূল যদি তাঁহাদের চক্ষের উপর সংশোধিত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা ভবিষ্যদ্বাণীতে বা যে বাক্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে, সেই বাক্য ঈশ্বরবাণী বলিয়াও বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু এরূপ ঘটনা যে কখন ঘটিয়াছিল বা প্রেরিত পুরুষের আসহাবগণের কোনও দল (বা পক্ষ) বা কোনও একজন ঐ কারণে হজরত রসুলের সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে দেখা যায় না। এসলামের ইতিহাস বিষয়ে এমন কোন গোলযোগ নাই যাহা হইতে আমরা যথার্থভাবে বিবেচনা করিতে পারি না। এরূপ একটি বিশেষ ঘটনা যদি ঘটিত তাহা হইলে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল বা বংশ পরম্পরার অবগতি হইতে প্রচ্ছিন্ন (বা গোপন) রাখা হইয়াছিল অথবা পারিষদগণেরা ভবিষদ্বাণীর এরূপ একটি স্পষ্ট নিস্ফলতা প্রত্যক্ষ করিয়া চুপ করিয়াছিলেন এরূপ কোন ঘটনা সম্ভবপর নহে, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহারা এমন কি প্রেরিত পুরুষের সম্মুখে স্বাধীন ভাবেই তাঁহাদের সন্দেহ (জনক ব্যাপার) প্রকাশ করিয়াছেন। হোদায় বিয়ার বিখ্যাত সন্ধির ঘটনা হইতে এই কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরত রসুল একদা স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি ও তাঁহার আসহাবেরা হজ-ব্রত সম্পাদন করিতেছেন। তিনি সকল সময়েই তাঁহার স্বপ্ন ও প্রত্যাদেশ সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিতেন এবং উপস্থিত স্বপ্ন ঈশ্বর হইতেই ঘটিয়াছে এরূপ জানিয়া তিনি চতুর্দ্দশ শতাধিক আসহাবসহ হজক্রিয়া সম্পাদনার্থে মক্কা যাত্রা করিতে বাহির হইলেন এবং হোদায়বিয়ায় পৌঁছিলেই কোরেশগণ তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়া প্রেরিত পুরুষকে বলিল যে তাহারা হজ যাত্রীকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিবে না। এখানে দুই দলের মধ্যে একটি সন্ধির ব্যবস্থা হইল, যদ্দ্বারা হজরত রসুল যে কেবল হজক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া মদিনায় ফিরিতে স্বীকার হইয়াছিলেন, তাহা নহে বরং অন্যান্য সর্ত্ত গুলিও মুসলমান-দিগের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। এই সকল সর্ত্ত স্বীকার করায় হজরত রসুলের আসহাবগণের মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হইল, কারণ সেই সকল সর্ত্তানুসারে তাঁহাদিগকে কোনরূপ হজক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া ফিরিতে হইয়াছিল। ওমর তাঁহাদিগের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন ও হজরত রসুলের সম্মুখে আসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিরূপ হইল যে আপনি হজক্রিয়া সমাধা না করিয়াই ফিরিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু ওদিকে আপনি স্বপ্নের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগের নিকটে এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, হজব্রত পালন করিতেই হইবে। যখন হজরত রসুল তাঁহাকে জানাইলেন যে স্বপ্ন ঠিক ঐ বৎসরের ভিতর হজ করিবার অঙ্গীকার না করিয়া বরং কেবল একটি হজের অঙ্গীকার দিয়াছে ও উক্ত ঘটনা প্রযুক্ত হজব্রত পালন করিতে তাঁহাদের অক্ষমতা হেতু, স্বপ্ন মিথ্যা হইতে পারে না তখন তাঁহাদের সে বিষয় সংশয় দূর হইল। এবং এরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়াই প্রেরিত পুরুষের আসহাবগণ সন্তুষ্টও হইয়াছিলেন। এই হদিস বাক্য হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, প্রেরিত

পুরুষের আসহাবগণ যখন কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইতেন তখন মুক্তকণ্ঠে তাঁহারা তাঁহাদের সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। অতএব ইহা নিশ্চিত যে যদি কোরআন শরীফে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহা হইলে ভবিষদ্বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ পোষণ করা হইত এবং এই সকল সন্দেহ জনক ব্যাপার সংক্রান্ত সংবাদ সকল বংশানুক্রমে চলিয়া আসিত। কিন্তু এরূপ সংবাদের সম্পূর্ণ অভাব হেতু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে এতদ্বিষয়ে কখনই কোন সন্দেহ পোষণ করা হয় নাই ও তদ্ধেতু পবিত্র কোরআনের মূলে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যে হেতু স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্ত্তৃক তাহার জীবিত সময়ে ইহা (কোরান) আসহাবদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ।

মোস্লেম বীরাঙ্গনা।

আরব মহিলাগণ শত্রু সৈন্যদিগকে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহ বিক্রমে শত্রু সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের প্রবল পরাক্রম দর্শনে, রোমীয়বাহিনীর অগ্রগতি স্থগিত হইল। প্রবল বন্যার স্রোত যেন পর্ব্বত-গাত্র-স্খলিত প্রকাণ্ড পর্ব্বত চূড়া-সমতুল শিলা খণ্ড দ্বারা প্রতিহত হইয়া গেল। পলায়নমান মুসলমান পুরুষগণ আরব মহিলাবৃন্দের ধিক্কার জনিত প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন পুনঃ সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলেন। আরব নারীগণ কালবিলম্ব না করিয়া কোষমুক্ত তরবারি হস্তে বিপুল বিক্রমের সহিত রোমীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। আরব মহিলাগণের অতুল সাহস, অসাধারণ ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের সমর কৌশল তরবারি সঞ্চালন, বর্শা ব্যবহার ও বাণ বর্ষণনাদি দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইলেন। আরব মহিলারা এরূপ রণোন্মাদনায় উন্মত্তা হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে,তাঁহারা ক্রমে শত্রু ব্যূহভেদ করিয়া তাঁহাদের পুরুষ শ্রেণীদলকে পশ্চাতে রাখিয়া বহু দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মহাত্মা মাআবিয়ার ভগিনী 'এরবা' এক দল আরব নারী সৈন্য লইয়া সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইলেন এবং অতুল বীরত্বের সহিত ভীম বিক্রমে যুদ্ধ করার পর আহত হইয়া পড়িলেন। হজরত মাআবিয়ার মাতা ও তবার কন্যা "হেন্দ" পুরুষদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন,

يا معاشر العرب عضدوا القلفان بسيوفكم —

হে আরবগণ! তোমাদের তরবারি সাহায্যে তোমরা, তোমাদের পৌরুষ-চিহ্ন ছিন্ন করিয়াও ফেল, অর্থাৎ তোমরা বীর্য্যহীন কাপুরুষ হইয়া যাও। জররার এবনে আজওরের ভগিনী প্রসিদ্ধা বীরাঙ্গনা খাওলা নিম্নলিখিত আরবী কবিতা পাঠ করিয়া মুসলমানদিগকে ধিক্কার দিতেছিলেন (১) যথা—

ياهاربا عن اسوة تقيات – رميت بالسهم المنيات

অর্থাৎ—হে পবিত্র চরিত্র সতী সাধ্বী নারীদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়মান পুরুষগণ! সাবধান, তোমরা মৃত্যু ও তীরের লক্ষ্যস্থল হইওনা। অর্থাৎ পলায়ন পূর্ব্বক মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় নাই। পলায়ণ করিলে তোমাদিগকে বাণ বর্ষণে যমালয়ে প্রেরণ করা হইবে, ইহা নিশ্চিত, সুতরাং পলাইয়া রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

ঐতিহাসিক 'তবরী' এই যুদ্ধে বীরাঙ্গনা উম্মে হাকিমএর ام حكيم নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এব্নে আছির জজরী লিখিয়াছেন, হজরত মাআজ এব্নে জবলের পিস্তেত ভগিনী আছমা বেন্তে এজিদ اسماء بنت يزيد একাকিনী ৯জন রোমীয় যোদ্ধ্ পুরুষকে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত করিয়া ছিলেন (২)।

এরমুক যুদ্ধে যে সকল আরব বীরাঙ্গনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহস বিক্রমের পরিচয় দিয়া ছিলেন তন্মধ্যে ঐতিহাসিক এবনে ওমর ওয়াকেদী ابن عمر واقدي নিম্ন লিখিত বীর নারী-গনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—(১) আছমা বেন্তে আবু বকর সিদ্দিক (২) ওববাদা এব্নে ছামেতর সহধর্ম্মিনী (৩) ছালেবর কন্যা খওলা (৪) মালেক কন্যা কউব كعوب (৫) হাশেম কন্যা সল্লমা هاشم بنت سلمي (৬) কল্নাছ কন্যা নাআম (৭) গাফ্ফারার কন্যা গোফফায়রা غفير بنت غفارء

উম্মে হাকিমের বীরত্ব।

এরমুক যুদ্ধের পর, মুসলমান বাহিনী রোমীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান করে। একদা তাহারা দামস্কসের অনতি দূরবর্ত্তী মরজসসফর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল এবং খালেদ এবনে সইদ নামক জনৈক সৈনিক পুরুষ। ইহার কতিপয় দিবস পূর্ব্বে, উম্মে হাকিম নাম্নী এক আরবীয় নারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত দিবস মুসলমান সৈন্যদিগকে 'দাওয়াত ওলিমা' অর্থাৎ বিবাহোৎসবের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই বিবাহোৎসব কার্য্য একটা সেতুর সন্নিকটে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া নব বিবাহিতা পাত্রী উম্মে হাকিমের নামে উক্ত সেতু আজও জন সমাজে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ তখনও আহারাদি কার্য্য

(১) "ওসদলগাবা" ৫ খণ্ড ৩৯৮ পৃষ্ঠা।
(২) "ওসদালগাবা" ৫ম খণ্ড ৫৭৭ পৃষ্ঠা।

সমাগন করেন নাই ইতঃমধ্যে, রোমীয় সৈন্যদল প্রবল বেগে আরব সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। মুসলমান সৈন্যগণ অনতি বিলম্বে রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সমর সাগরে ঝাপ দিলেন। দুই দলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধারম্ভ হইল। দুই পক্ষে শত শত লোক পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে ভূতলে লুন্ঠিত হইয়া পড়িতে লাগিল। মুসলমানগণ অটল পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া নিতান্ত ধৈর্য্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রোমীয়গণ আর অধিক কাল তাহাদের ভীম পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। এই যুদ্ধে নবদম্পতী বিশেষতঃ উম্মে হাকিম বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি মুক্ত অসি হস্তে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। শত্রুপক্ষীয় সপ্ত জন সৈনিক পুরুষ তাহার হস্তে নিহত হইয়াছিল।

বিবি আয়শার অভিযান।

মুসলমান পাঠকগণ অবগত আছেন, হজরত রসুলে করিমের শ্রেষ্ঠতমা সহধর্ম্মিণী বিবি আয়শা (র) "জঙ্গে জোমল" বা উষ্ট্র যুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধের সেনা নায়িকার পদবরিতা হইয়া হজরত আলীর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উষ্ট্র ও উষ্ট্র পৃষ্ঠের 'এমারী' (হাওদা বিশেষ) বিপক্ষগণের বাণ বৃষ্টিতে ক্ষত বিক্ষত ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল স্বয়ং বিবি আয়শাও কিঞ্চিৎ আহত হইয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও বীরোচিত সাহসের সহিত রণ ভূমির কেন্দ্রস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধ চালনা করিতেছিলেন। এ সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা আরব নারী সমাজের সাহস বিক্রমের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক "ওয়াকেদী"র উল্লেখ অনুসারে, সিরিয়া বিজয়ের ইতিহাসে যে সকল আরব বীরাঙ্গনার নাম দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে উম্মে হাকিম হেন্দ উম্মে কাছির আহমাদ, উম্মে আব্বান, উম্মে আমারা, খওলা, লোব্না, ওফায়রা, প্রভৃতি বীরাঙ্গনা শ্রেষ্ঠ নারীগণের নাম শীর্ষস্থানীয়।

হারেছ কন্যা উজ্দা।

ঐতিহাসিক বেলাজরী লিখিয়াছেন, গজ ওয়াল পুত্র ওতবা, খলিফা হজরত ওমরের পক্ষে, সেনাপতি পদে বরিত ছিলেন। হারেস কন্যা উজাদা তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সেনাপতি ওতবা যখন "মামিতুল কোরাত" নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে প্রলিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবি 'উজ্দা' সৈন্যদলের মধ্যে উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা প্রদান ও জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়া তাহাদের মধ্যে নূতন প্রাণ এবং নব উদ্দীপনার সঞ্চার করিতেছিলেন। যে জাতির নারী সমাজে এরূপ জীবন্ত ভাব ও স্বদেশ প্রেম এবং স্বজাতি বাৎসল্যের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান সে জাতির যে অভ্যুত্থান হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি। আরব জাতির অভ্যুত্থানের ইতিহাসের ইহাই বোধ হয় নিগূঢ় রহস্য। (ক্রমশঃ)

ইসলামাবাদী।

এস্‌লামে নারী জাতির স্বত্বাধিকার

মানব জাতির অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ নারীজাতির স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শত শত নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবধি কোন জাতিই তাহাদিগের ন্যায্য স্বত্বাধিকার প্রদান করিতে সক্ষম হয় নাই। পূর্ব্বে পৃথিবীতে নিয়ম বলিতে যাহা বুঝাইত, তাহাই রোমকদিগের আইন। যেমন "গ্রীসের" জ্ঞান বিজ্ঞান, "ইতালীর" চিত্র বিদ্যা ও শিল্পকলা, এবং পারসিক জাতির বিলাসপ্রিয়তা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ রোমকদিগের আইনও সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল, এবং সেই রোমক আইনের উপরেই বর্ত্তমান ইউরোপের আইনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রেষ্ঠতম নিয়ম (রোমক আইন) নারী জাতিকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছিল, তাহা এই—রোমকদিগের নীতি অনুসারে, বিবাহের পর, নারী তাহার স্বামীর নগদ মূল্যে ক্রীতসম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া যাইত। তাহার ধন সম্পত্তি স্বামীর নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইত। নারী নিজে পরিশ্রম করিয়া কিছু সম্পত্তি অর্জ্জন করিলে তাহাও স্বামীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। তাহারা কোন পদের অধিকারী বা কাহারও প্রতিভূ হইতে পারিত না। বিচারালয়ে তাহাদিগের প্রমাণ অগ্রাহ্য ছিল। তাহারা কাহারও নিকট কোন বিষয় অঙ্গীকার করিতে পারিতনা, এমন কি মৃত্যুকালে অন্তিম-উপদেশ দিবার ক্ষমতাও তাহাদিগের ছিল না। রোমক-রাজ খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তাহাদের নিয়মের কিছু সংস্কার হইয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পদিন পরে তাহা আবার পুরাতন নিয়মে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। "নারী জাতির আত্মা আছে কিনা" এই বিষয়ের মীমাংসা করনার্থে ৫৮৬খৃঃ অব্দে, ইউরোপে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভা অনেক আলোচনা ও গবেষণার পর, নিতান্ত উদারতার সহিত এতটুকু স্বীকার করেন যে, "নারী জাতি মনুষ্য জাতির মধ্যে গণ্য, সুতরাং তাহাদের আত্মা আছে, কিন্তু কেবল মাত্র পুরুষের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্যই তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে। (১)

ইংলণ্ডেও বহুকাল যাবৎ এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, বিবাহের পর নারীর শরীর স্বামীর যথেচ্ছা ব্যবহার ও ভোগ্য জিনিষের মধ্যে পরিগণিত হইত। স্ত্রী কাহাকেও কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারিত না, তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি স্বামীর নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত এবং স্বামী তাহাতে যথেচ্ছা ভোগ দখল করিতে পারিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল ইংলণ্ডে "Woman Act" বা নারীজাতি সম্পর্কীয় আইন প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বতন নিয়মের অনেকটা সংস্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও এখনও তাহাতে অনেক ত্রুটি বিদ্যমান রহিয়াছে।

(১) এন্‌সাইক্লোপিডিয়া_বৃটানিকা Encyolopedia Britanica.

"য়িহুদি"দিগের বিবাহকে একরূপ ক্রয়-বিক্রয় বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, আর কন্যার পিতা সেই মূল্য গ্রহণ করিয়া কন্যাকে বরের হস্তে সমর্পণ করেন।

হিন্দুদিগের নিয়ম প্রায় রোমক আইনের অনুরূপ। স্ত্রীর, ধন-সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই, এবং স্ত্রী, স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে বা কাহারও সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারে না। স্ত্রী, কন্যা, মাতা ভগিনী ইত্যাদি নারীগণ তাহাদের স্বামী, পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতির ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না।

যে আরব দেশ এস্লামের লীলাভূমি, সেই আরবের অবস্থা আবার ইহা অপেক্ষাও ঘৃণিত ছিল। তথাকার নারীগণ, ত্যক্ত সম্পত্তির আদৌ কোনরূপ অংশ প্রাপ্ত হইত না, পিতার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীদিগকে (বিমাতাদিগকে) তাহার পুত্রগণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইত, এবং তাহাদিগকে তাহারা নিজের স্ত্রী করিয়া লইত। আরবে বিবাহের চতুর্ব্বিধ নিয়ম প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে তিনটী নিয়ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা :—

১। দুই ব্যক্তি স্ব স্ব স্ত্রীকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পরের মধ্যে বদলাইয়া লইত।

২। কএকজন পুরুষ এক সময় একজন নারীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইত। তৎপর উক্ত স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইলে সেই নারী ঐ সকল পুরুষের মধ্যে একজনকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া সংবাদ দিত যে "তোমার দ্বারা আমার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে", তদনুযায়ী ঐ সন্তান তাহার সন্তান বলিয়া গণ্য হইত।

৩। কএকজন পুরুষ একজন নারীর নিকট গমন করিত, এবং সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে একাধিক পরীক্ষক (কেয়াফা শনাস্) পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিত যে, "এ সন্তান অমুকের ঔরসজাত" তৎপর সে, সেই ব্যক্তির সন্তান বলিয়া গণ্য হইত। *

এখন দেখা যাউক, পবিত্র কোরআনে নারীজাতির স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে, অন্য আর একটি বিষয় জ্ঞাপন করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহা এই যে, অধিকাংশ ইউরোপীয় লেখক দাবী করিয়া থাকেন যে, "এসলামে যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা অন্য ধর্ম্ম হইতে নকল করা হইয়াছে, এসলাম-প্রবর্ত্তক নিজে তেমন কিছু করেন নাই।" এখন দেখা যাউক, এই আত্মজাতি-গৌরবান্ধদিগের কথা কতটুকু সত্য। নারীজাতি সম্বন্ধে খৃষ্টান, য়িহুদী, এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্মে যে ব্যবস্থা আছে তাহা পাঠক এই মাত্র দেখিলেন, এখন এসলামের বিধিব্যবস্থা যাহা তাহা একবার অবগত হউন, তৎপর বিবেচনা করুন যে, এসলাম অন্য ধর্ম্মের নকল করিয়াছে, না নিজেই এইরূপ অভিনব জ্ঞানগর্ভ উদার নিয়মের প্রচার করিয়াছে।

---

* সহী বোখারী।

সর্ব্ব প্রথমে পবিত্র কোরআণ ইহা শিক্ষা দিয়াছে যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে,:এবং নারীজাতি মনুষ্য জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ ও পুরুষের শান্তি ও সুখের সহায়। যথা :—

وخلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (روم)

"এবং আল্লাহতাআলা তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের জাতি হইতে ভার্য্যা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহাদিগেতে সুখী হও, এবং তোমাদিগের উভয়ের (স্ত্রীপুরুষের) মধ্যে স্নেহ ও প্রণয় সৃষ্টি করিয়াছেন।" (সুরা রূম, ৩ রূকু।)

তৎপর বিভিন্নাবস্থায় এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্ত্রী পুরুষ উভয় উভয়ের তুল্য মর্য্যাদা বিশিষ্ট সঙ্গী ও সহচর। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের আবশ্যক, উভয়ের সম্বন্ধ উভয়ের অবস্থা উভয়ের স্বত্ব ও অধিকার তুল্য।—

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

"তাহারা (নারীগণ) তোমাদিগের ভূষণ এবং তোমরা তাহাদিগের ভূষণ" (সুরা বাকার ২৩ রূকু।)

لهن مثل الذي عليهن بالمعروف

অর্থাৎ "নারীগণের উপর পুরুষদিগের যেরূপ বৈধাচারে স্বত্ব আছে, পুরুষদিগের উপরও নারীগণের তদ্রূপ অধিকার আছে।" সুরা বাক্‌রা, ২৮ রূকু।

আত্মীয়তা সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে মর্য্যাদার কোনরূপ তারতম্য নাই, সকলেই তুল্য পদ বিশিষ্ট, যথা—পিতামাতার একপদ (এস্থলে মাতা নারী বলিয়া তাঁহার মর্য্যাদা লঘু হয় নাই) ভ্রাতা, ভগিনীর একই স্থান, পিতৃব্য এবং পিতৃ স্বসার একই পদ। পবিত্র কোরআণে যে স্থলেই পিতা মাতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সেই স্থলেই তাঁহারা তুল্য পদে অভিহিত হইয়াছেন।

وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما وقل لهما قولا كريما ۞ — واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ۞

"এবং পিতামাতার সহিত সদাচরণ করিবে, যদি তাঁহারা উভয়েই বা তাঁহাদের একজন তোমার নিকটে বার্দ্ধক্যে উপনীত হন, তবে তুমি তাঁহাদের প্রতি ধিক (উফ) বলিও না ও তাঁহাদিগকে ধমক দিও না, এবং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া কথা বলিও। এবং তাঁহাদিগের সম্মুখে দয়ার (ভক্তির) সহিত স্বীয় বিনয়ের বাহুকে নত করিও, এবং বলিও, (প্রার্থনা করিও) হে আমার প্রতিপালক, তাঁহারা (পিতামাতারা) যেমন দয়ার সহিত শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও তাঁহাদিগের প্রতি দয়া কর"। সুরা বনি এস্রায়েল, ৩ রূকু।

মাতার স্বত্ব আরও দৃঢ়তার সহিত বর্ণিত হইতেছে :—

حملته امه كرها ووضعته كرها —

"তাহাকে তাহার মাতা কষ্টে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন ও কষ্টের সহিত তাহাকে প্রসব করিয়াছেন", (সুরা আহকাফ, ২ রুকু ।)

রোমক এবং হিন্দুদিগের নিয়মানুসারে নারীর সমস্ত ধন সম্পত্তি, স্বামীর হইয়া যাইত। এস্থলে পবিত্র কোরাণ কি আদেশ করিয়াছে দেখুন,—

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن —

"পুরুষদিগের জন্য তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের স্বত্ব, এবং নারীগণ যাহা উপার্জ্জন করিযাছে তাহাতে তাহাদেরইস্বত্ব"। (সুরা:নেসা, ৫ রুকু ।)

হিন্দু দিগের বিধান মতে:নারীগণ উত্তরাধিকারিত্ব হইতে:চির দিনের জন্য বঞ্চিত, এসলাম প্রচারের পূর্ব্বে আরবেরও এই অবস্থাছিল, নারীগণ উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই পাইত না, এ স্থলে পবিত্র কোরাণের বিধান যথা,—

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون —

"পিতামাতা, ও আত্মীয় স্বগণের ত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ দিগের অংশ আছে, এবং (এইরূপ) পিতা মাতা আত্মীয় স্বগণের ত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীগণের (ও) অংশ আছে"। (সুরা নেসা,:১ রুকু ।)

নিম্নোক্ত আদেশের দ্বারা এস্‌লাম কন্যাবধপ্রথার গতিরোধ করিয়াছে, বলিতে কি এ রূপ ভাবে তাহার প্রতিরোধ করিয়াছে যে তেরশত বৎসরের মধ্যে একবারও মোসলমানদিগের মধ্যে এই ঘৃণিত ঘটনার পুনরাভিনয় হয় নাই।

و اذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت —

"এবং" "মাউওদাত" অর্থাৎ জীবিত প্রোথিত কন্যাদিগের বিষয় কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে কোন্ অপরাধে তাহারা হত হইয়াছে"। (সুরা তক্‌ওয়ির ৭ আয়াত।)

মূর্খতার যুগে (এস্‌লামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে) আরবে এই নিয়ম ছিল যে, কোন লোক মরিয়া গেলে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে বল পূর্ব্বক বিবাহ করিত বা তাহাকে অন্য পতি গ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিয়া গৃহে বন্ধ করিয়া রাখিত, এবং সেই নারী কিছু অর্থ দিলে পরে তাহাকে পত্যন্তর গ্রহণের অনুমতি দিত। পবিত্র কোরআণ আদেশের দ্বারা সেই জঘন্য নীতির মূলোৎপাটন করিয়াছে।

لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن —

তোমাদিগের জন্য ইহা বৈধ নহে যে, বল্ পূর্ব্বক নারীগণকে স্বভোগে আনয়ন কর, এবং ইহাও বৈধ নহে যে তাহারা যাহা কিছু পাইয়াছে তাহা গ্রহণোদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে"। (সুরা নেসা ৩ রুকু ।)

কন্যার মোহর (যৌতুক) কন্যার পিতা গ্রহণ করিত, এবং এই মোহরের পরিবর্ত্তে একরূপ কন্যাকে বিক্রয় করিত। আল্লাহ তাআলা এই আদেশের দ্বারা ইহার মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন :—

واتوالنساء صدقاتهن نحلة —

"এবং তোমরা স্ত্রী দিগকে সহর্ষে তাহাদিগের মোহর (যৌতুক) দান কর"। (সুরা নেসা, ১ রুকু।)

দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রীর সহিত, প্রেম, ভালবাসা, ও ঘনিষ্টতা যোগে যে রূপ মধ্যবিৎ ব্যবহার করিতে হইবে এই আয়াতে তাহার স্থূল শিক্ষা আছে।

و عاشروهن بالمعروف —

"এবং সুন্দর নিয়ম সহকারে নারীগণের সহিত গার্হস্থ্য জীবনযাপন কর"। (সুরা নেসা।)

স্বামী ও স্ত্রী সংস্পৃষ্ট ব্যাপারসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় এবং গুরুতর ব্যাপার "তালাক", এই তালাক ব্যাপারটি এতদূর সূক্ষ্ম ও গুরুতর ছিল যে, পৃথিবীর জাতি সকল এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াও, কেহই সত্য এবং স্বাভাবিক পথ পাইতে পারেন নাই। এবং এখনও, পৃথিবী এতদূর উন্নতি লাভ করা সত্ত্বেও, তাঁহারা সেই বিষম ভ্রমের গভীরতম অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে খৃষ্টান দিগের নিয়ম এত কঠোর যে, ব্যভিচার ব্যতীত কোন অবস্থাতেই "তালাক" হইতে পারে না। এই নিয়মের ত্রুটীর জন্য বর্ত্তমান কালের শিক্ষা, সভ্যতা, ও উন্নতির লীলা নিকেতন ইউরোপে নিত্যই কত ঘৃণিত ও অমানুষিক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মানব সমাজে এমন শত সহস্র নরনারী রহিয়াছে, যাহাদিগের মধ্যে অপ্রীতিকর ভাব ও মনোমালিন্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, এবং এই মনোমালিন্যের জন্য উভয়ের জীবনের সুখ-শান্তি হলাহলে পরিণত হইয়াছে। মিলন আলাপন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে উদ্দেশ্যে এবং উপকারার্থে স্ত্রী গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। সহধর্ম্মিনী বা অর্দ্ধাঙ্গিনী জীবনের পক্ষে বিষবৎ বোধ হইতেছে। তত্রাচ এই ঘোরতর অশান্তিতে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিতে হইতেছে, প্রতিকারের উপায় নাই। এমন জ্ঞানগর্ব্বী ইউরোপের নীতি ও নিয়ম এই বিপদ হইতে সহজে মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। ইউরোপের প্রচলিত নিয়ম মুক্তির যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা আরও দুসাধ্য ও দুর্নীতির পরিচায়ক অর্থাৎ ব্যাভিচার অপরাধ সাব্যস্ত করিতে না পারিলে, এই পারিবারিক রোগ মুক্তির আর কোন উপায় নাই। সমাজ নীতির এরূপ অপ্রীতিকর বিধান জন্য কত গণ্য মান্য ব্যক্তি এমন কি রাজ পারিষদ পর্য্যন্ত বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া নিজের সহধর্ম্মিনীকে ব্যাভিচারিণী বলিয়া জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হন। এবং শত সহস্র মানুষের সম্মুখে এই ঘৃণিত ব্যাপারের প্রমাণ উপস্থিত করিয়া থাকেন। দীর্ঘ দিন যাবত এরূপ মোকদ্দমা চলিত হওয়ার পর, পরিশেষে এতৎসংস্পৃষ্ট বিচার ফল যাহা সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ

পাইয়া থাকে তাহা এতদূর দুর্ণাম জনক, নির্লজ্জতা মূলক ও বেহায়ামির নিদর্শন যে বর্ব্বর শ্রেণীর লোক শুনিলেও কাণে আঙ্গুল দিয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। বাঙ্গালার জনৈক ভূতপূর্ব্ব উচ্চ রাজকর্ম্মচারী বিলাতের কোন এক পাদ্রীর সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনো মালিন্যের সৃষ্টি হয়, শেষে তাহারা সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এইরূপ।—মেম সাহেবা—আদালতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমি ব্যাভিচার করিয়াছি" আদালত তাহার কথার সত্যতার প্রমাণ চাহিলে, মেম সাহেবা তাঁহার ব্যভিচার কার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াছে এমন প্রমাণ উপস্থিত করিলেন। (১) প্রমাণ লওয়া শেষ হইলে, পাদ্রী সাহেবকে আদালতে উপস্থিত করা হয়। তিনি উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমার স্ত্রী যাহা বলিতেছে সে সকলই সত্য" অর্থাৎ সে ব্যভিচারিণী। (২) কি ঘৃণা ও লজ্জার কথা! এই ইউরোপের নিয়ম সম্বন্ধে লোকের ধারণা যে তাহা সভ্য ও স্বাধীনতার পরিচায়ক। ইউরোপবাসীরা এইরূপ নিয়মকে সভ্য ও স্বাধীনতার পরিপোষক বলেন বলুন, কিন্তু আমরা, কেবল আমরা কেন! মনুষ্যত্বের দিক দিয়া যিনি দেখিবেন, তিনিই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের পক্ষে এইরূপ নিয়ম আদৌ ব্যবহার্য্য হইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের নিয়ম খৃষ্টান নীতির অপেক্ষা আরও কঠোর। হিন্দু বিধান মতে যদি কোন জাতনপুংসকের সহিতও কোন রমণীর বিবাহ হয় তবুও তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার নহে।

ইহুদী সম্প্রদায়ের নিয়ম আবার ইহার ঘোর বিপরীত, তাহাদিগের বিধান মতে কথায় কথায় তালাক বৈধ এবং উত্তম কার্য্য বলিয়া গণ্য। অন্ন ব্যঞ্জনে একটু লবণ বেশী হইলে, স্বীয় সহধর্ম্মিণী অপেক্ষা সুন্দরী নারী মিলিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারে।

এখন দেখুন, এসলাম এই গুরুতর বিষয়ের কিরূপ সূক্ষ্ম মীমাংসা করিয়াছে।

পবিত্র কোরআন বিভিন্নাবস্থায় এই শিক্ষা দিয়াছে যে, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ কেবল প্রবৃত্তি চরিতার্থ বা কাম লিপ্সা মিটাইবার জন্য নহে। বরং নিৰ্ম্মল দাম্পত্য প্রণয়ের দ্বারা সম্বন্ধটিকে চিরস্থায়ী করিয়া গার্হস্থ্য জীবনকে সুন্দর করিবার জন্যই বিবাহ পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে, অপিচ

---

(১) সাক্ষী কোন হোটেলের ম্যানেজার, মেম সাহেবা নিরূপায় হইয়া, প্রমাণ যোগাড় উদ্দেশ্যে এই হোটেলের ম্যানেজারের সম্মুখে পর-পুরুষ সহগামিনী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(২) এ স্থলে পাদ্রী সাহেব ও মেম সাহেব যদি মোসলমান হইতেন, তাহা হইলে, তাহাদিগকে শত শত মানুষের মধ্যে এইরূপ পিশাচ মূর্ত্তি প্রকট করিতে হইত না। কেননা মনোমালিন্য যদি পাদ্রী সাহেবের দিক হইতে হইত, তবে যথা ইচ্ছা তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারিতেন, শাস্ত্রের যুক্তিতে ইহাকে "তালাক" বলে। আর মনোমালিন্য মেম্ সাহেবের দিক হইতে হইলে, তিনি কোন রূপে স্বামীকে রাজি করিয়া না হয়—তিনি ধনী লোকের কন্যা ছিলেন, পাদ্রী সাহেবকে কিছু অর্থ দিয়া সেই লোভে ত্যাগ স্বীকার করাইয়া লইতে পারিতেন। শাস্ত্রের যুক্তিতে ইহাকে "খোলা" বলে।

ইহাদের সম্বন্ধ এমন যে এই জড় জগৎ ত্যাগ করিলেও তাহাদের সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। প্রকৃত স্বামী স্ত্রীতে আধ্যাত্মজগতেও সম্মিলন হইবে।

محصنين غير مسافحين

"কাম লিপ্সা মিটাইবার জন্য নয় বা আবদ্ধ রাখিবার জন্যও নয়।"

وخلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و رحمة —

"এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের জাতি হইতে ভার্য্যা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহাদিগেতে সুখী হও, এবং তোমাদিগের উভয়ের (স্ত্রী পুরুষের) মধ্যে স্নেহ ও প্রণয় সৃজন করিয়াছেন" সুরা রুম, ৩ রুকু।

এখন যদি কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় এবং তাহাকে "তালাক" দিতে সঙ্কল্প করে, তবে এমতাবস্থায় "এসলাম" পুরুষকে বিশেষ বিবেচনা করিতে ও সহিষ্ণু হইতে উপদেশ দিয়াছে।

فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا —

"পরন্তু যদি তোমরা তাহাদিগকে (স্ত্রীদিগকে) অমনোনীত কর, তবে (মনে রাখিও) আশ্চর্য্য নয় যে, হয়তো তোমরা এমন এক বস্তুকে অবজ্ঞা করিলে, যাহাতে আল্লাহতালা প্রচুর পরিমাণে কল্যাণ রাখিয়াছেন"। সুরা নেসা, ৩ রুকু।

নারীকেও এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।—

وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا - فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا — والصلح خير —

"এবং যদি কোন নারী আপন স্বামী হইতে অবাধ্যতা ও অবজ্ঞার আশঙ্কা করে তবে ইহাতে উভয়ের পক্ষে দোষ নয় যে, তাহারা কোন সম্মিলনে (সোলেহ দ্বারা) আপনাদের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করে ; এবং সম্মিলন কল্যাণকর"! সুরা নেসা, ১৯ রুকু।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরআনে নারীর মন্দ স্বভাব ও কঠোর ব্যবহার দূরীকরণেরও শিক্ষা আছে, কেন না সর্ব্বদা কঠিন ব্যবহার সহ্য করা দুষ্কর :—

والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا —

"এবং তোমরা যে সকল নারীর অবাধ্যতা আশঙ্কা কর তাহাদিগকে উপদেশ দান কর তৎপর (উপদেশে ফল না দর্শিলে) পৃথক গৃহে শয়ন করাও, এবং (তাহাতেও ফল না হইলে) পরিশেষে তাহাদিগকে প্রহার কর, তাহাতে যদি তাহারা তোমাদিগের অনুগত হয় তবে তাহাদের জন্য কোন পথ অন্বেষণ করিও না" (অর্থাৎ অন্য কোন ব্যবস্থা করিও না) সুরা নেসা, ৬ রুকু।

ইহার পরেও যদি তাহাদের মধ্যে প্রণয় ও সদ্ভাব স্থাপন না হয়, তবে এমতাবস্থায় তাহারা কোন অন্যায় কার্য্য করিবার পূর্ব্বে সমাজের প্রতি এরূপ আদেশ আছে যে, স্বজাতিগণ এই বিবাদ মীমাংসা করিবে, কেননা এরূপ স্থলে সভ্যতা ও গার্হস্থ্য জীবনের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাতে প্রত্যেকেই তাহার স্বজাতিরূপ দেহের অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং অন্যায় কার্য্যের দোষ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই উপর বর্ত্তিবে। এই জন্য এমত স্থলে সম্প্রদায়কে হস্তক্ষেপের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

وان خفتم شقاق بينهما فابعثو احكما من اهله وحكما من اهلها –

"এবং যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে (স্বামী স্ত্রীর মধ্যে) বিরুদ্ধ ভাবের আশঙ্কা কর তবে পুরুষের স্বগণ হইতে একজন মীমাংসা কারী ও স্ত্রীর স্বগণ হইতে একজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত করিবে"। সূরা নেসা, ৮ রূকু।

এরূপ চেষ্টাতেও যদি কোন ফল না দর্শে এবং পুরুষ "তালাক" দেওয়াই স্থির করে, তবে এমন শঙ্কটাবস্থায়, "এসলাম" তালাক দিবার ব্যবস্থা দিয়াছে, কিন্তু ব্যস্ততার সহিত নয়, অনেক প্রকরণের পর।

সর্ব্ব প্রথমে তালাকের এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, ক্রমান্বয়ে তিন মাসে "তালাক" পূর্ণ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে এক এক তালাক দিয়া তিন মাসে তিন তালাক পূর্ণ করিবে, শাস্ত্রের যুক্তিতে এই সময়ের ক্রমকে "এদ্দত" বলে। এই নিয়ম নির্দ্দেশের হেতু এই যে, খুব সম্ভব এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বুঝিয়া সুজিয়া পুরুষ মত পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

যথা পবিত্র কোরআণে আদেশ করা হইয়াছে।

وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

"এবং যদি ইতঃমধ্যে (তালাক পূরণের শেষ সময়ের মধ্যে) তাহাদিগের স্বামিগণ হিতাকাঙ্খা (অর্থাৎ প্রণয়ের সহিত প্রতি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে) করে, তবে তাহাদের অধিকার আছে, তাহারা তাহাদিগকে প্রতি-গ্রহণ করিতে পারে।" সূরা বাকরা, ২৮ রূকু।

তৎপর এই নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"যদি কোন পুরুষ স্ত্রীকে তৃতীয় বার বর্জ্জন করে (তিন তালাক পূর্ণ করে) তবে তাহার পর যে পর্য্যন্ত সে কোন) পুরুষের সহিত বিবাহিতা না হয় (এবং সে বিবাহ করিয়া ত্যাগ না করে) সে পর্য্যন্ত (পূর্ব্বোক্ত) পুরুষের জন্য সেই নারী কখনই বৈধ হইবে না।" সূরা বাকরা ; ২৯ রূকু।

এই রূপ নিয়ম সংযোগ করিবার হেতু এই যে, পুরুষ পূর্ব্বেই চিন্তা করিবে যে, যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়, এবং পরে তাহার প্রতি তাহার যে আক্রোশ আছে তাহা অপনোদিত হইয়া যায়, এবং তাহার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়ে, তবে অন্যে বিবাহ করিয়া ত্যাগ না করিলে সে আর তাহার জন্য বৈধ হইবে না, বিশেষ এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, একজন ভোগ করিলে আর তাহাকে গ্রহণে প্রবৃত্তি আসে না।

১ম ভাগ | পৌষ, ১৩২২ | ৯ম সংখ্যা

মোস্‌লেম বীরাঙ্গনা।

(৪)
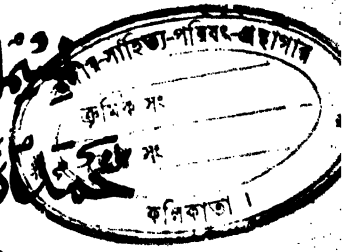
উম্মে আবানের অপূর্ব্ব বীরত্ব।

দামস্কসের যুদ্ধে সইদপুত্র আরবার নামক জনৈক আবান সৈনিক পুরুষ রোমীয় সেনানায়ক তুমার হস্তে নিহত হন। তাঁহার স্ত্রী ওতবা কন্যা উম্মে আবান স্বীয় নিহত স্বামীর প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তাঁহার ব্যবহারীয় যাবতীয় সামরিক পোষাক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা হইয়া রণরঙ্গিনীবেশে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। অনেক্ষণ ব্যাপিয়া শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ সময় রোমকগণ দুর্গাবরুদ্ধ হইয়া তীর ধনুর সাহায্যে মোসলমানগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিতেছিল। তাহারা দুর্গ প্রাচীরের বুরুজ সমূহে আরোহণ করিয়া মোসলমান সৈন্যদলের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতেছিল। তাহাদের সর্ব্বসম্মুখে ক্রুশহস্তে একজন ধর্ম্মগুরু পাদ্রী সাহেব বিজয় কামনা করিয়া সৈন্যদলের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করিতেছিলেন। উম্মে আবান ধনুর্ব্বিদ্যায় নিতান্ত নিপুণা ছিলেন। তিনি সেই ধর্ম্মগুরু মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার সেই অব্যর্থ লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। বীরাঙ্গনার বাণ নিক্ষেপে ক্রুশটী পাদ্রী সাহেবের হস্তচ্যুত হইয়া প্রাচীরের বহির্দ্দেশে পড়িয়া গেল। মোসলমানগণ দ্রুতগতিতে ছুটিয়া গিয়া ক্রুশটী হস্তগত করিলেন। খৃষ্টানগণ তাহাদের পবিত্র ক্রুশের অবমাননা দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেনাপতি 'তুমা' ক্রোধপরবশ হইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া সবলে বহির্গত হইলেন; এবং ভীম বিক্রম ও প্রবল প্রতাপের সহিত মোসলমান সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। মোসলমানগণ তাহাদের বিপুল উদ্যম ও অতুল বিক্রম দর্শনে

ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। খৃষ্টানগণ তাঁহাদের ক্রুশটী পুনরাধিকার করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রোমীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অসীম সাহসে ভর দিয়া অগ্রসর হইতেছিল উম্মে আবানের অব্যর্থ লক্ষ্য তীরের আঘাতে তাহারই জীবনলীলা সাঙ্গ হইতে লাগিল। খৃষ্টান সেনাপতি তুমা পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ক্রমেই মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উম্মে আবান সর্ব্বদা তাহার স্বামীর হত্যাকারী সেই সেনাপতিকে লক্ষ্য করিয়াই যুদ্ধ করিতেছিলেন। তুমা কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন দেখিয়া উম্মে আবান আর কালবিলম্ব না করিয়া এরূপ সুকৌশলে সেনানীর নয়নতারা লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই তীরের গুরুতর আঘাতে ভীতি বিহ্বল হইয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন রণোন্মাদিনী বীরাঙ্গনা উম্মে আবান উৎসাহভরে নিম্নলিখিত বীররসের আরবী সঙ্গীতটী গান করিতেছিলেন যথা :—

ام ابان فاطلبی بثارک * صولی علیهم صولة المتدارک
قد ضج جمع القوم من نداک -

অর্থাৎ—হে উম্মে আবান তুমি স্বকীয় প্রতিশোধ গ্রহণ কর, এবং শত্রুকুলের প্রতি উপর্য্যুপরি আক্রমণ করিতে থাক। রোমীয়গণ তোমার বাণ বর্ষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

এরমুক যুদ্ধের একটী স্মৃতি।

এরমুকক্ষেত্রে যে কয়দিন যুদ্ধ হইয়াছিল, তন্মধ্যে এউমৎতাবির (یوم التعویر) নামক যুদ্ধদিবস সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও ভীষণতর বলিয়া পরিগণিত। সেই দিবস মোসলমান নারীগণ যেরূপ সাহস বিক্রম ও অশেষ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। মোসলমানগণ শত্রুপক্ষের প্রবল পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শনে উদ্যত হইয়াছেন, ইত্যবসরে আরব নারীগণ স্বহস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক প্রচণ্ডতেজে শত্রুকুলকে আক্রমণ করিলেন। হেন্দ, খওলা ও উম্মে হাকিম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। খলিফা হজরত আবুবকরের কন্যা মহাত্মা জোবেরের সহধর্ম্মিনী বিবী আছমা অশ্বারোহণে সর্ব্বদা স্বীয় স্বামীর সমবাহু হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। (১)

"ছিফ্‌ফিন-যুদ্ধে" ও বহু মোসলমান বীরাঙ্গনা হজরত আলীর (রঃ) পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়া এবং উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা যোদ্ধৃ-পুরুষগণের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিতেছিলেন। জরকা (زرقاء), আকরশা (عکرشه) উম্মল খায়ের (ام الخیر) রণক্ষেত্রে এরূপ জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে তাহাতে যেন আরব সৈন্যগণের মধ্যে বিদ্যুৎ লহরী প্রবাহিত হইয়া পড়িয়াছিল।

---

(১) "ফতুহশ্‌শাম"।

বোখারা বিজয়ে আরবনারীর কৃতিত্ব।

হিজরী ৯০ অব্দে, খলিফা ওলিদ এব্নে আবদুল মালেকের রাজত্বকালে সেনাপতি কোতায়বার (قتيبه) নেতৃত্বে মোসলমানগণ বোখারা নগর আক্রমণ করেন। আরবের 'উজদ' নামক সম্প্রদায় শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। আরবজাতির দিগ্বিজয় ব্যাপারে তাহাদের কৃতিত্ব উজ্জ্বলবর্ণে লিখিত। উজদ সম্প্রদায়ের বীর যোদ্ধৃগণ একাকী বোখারার তুর্কীজাতির সহিত সর্ব্বাগ্রে রণক্ষেত্রে বল পরীক্ষায় যাইবার জন্য সেনাপতির নিকট অনুমতি প্রার্থী হইলেন। সেনাপতি অনুমতি প্রদান করিলেন। উজদবংশীয় লোক প্রবল পরাক্রমের সহিত রণাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু স্বাভাবিক যুদ্ধপ্রিয় বীর্য্যবান্ তুর্কীজাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা সহজ ব্যাপার ছিল না। অজেয় তুর্কীরা ভীম বিক্রমে অগ্রসর হইয়া আরব সৈন্যদিগকে তাড়া করিয়া পশ্চাৎপদ করিতে করিতে আরবমহিলাগণের শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। আরব মহিলাগণ তাঁহাদের পুরুষগণের পশ্চাদ্গমন দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদের পুরুষদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং পলায়নপর সৈন্যগণের অশ্বের বল্গা ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পুনঃ শত্রুকুলের সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিলেন। যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছিল তাহাদিগকে যষ্টি আঘাতের ভয় দেখাইয়া তাড়া করিয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। আরব যোদ্ধৃগণ বুঝিলেন, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করা অসম্ভব। সম্মুখে প্রবল শত্রু, পশ্চাতে বীরাঙ্গনা আরব নারীগণের ভীষণ প্রতিবন্ধকতা, সুতরাং সম্মুখসমরে বীরত্বের সহিত মৃত্যুশয্যায় শায়িত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই ভাবিয়া তাহারা জীবন মরণ পণ করিয়া আর একবার তুর্কীদিগকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন। এবার তুর্কীরা আর আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। বোখারা আরবগণের অধিকারভুক্ত হইল। মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই যুদ্ধে স্ত্রীলোকেরা অস্ত্রধারণ করেন নাই সত্য, কিন্তু এই যুদ্ধ বিজয় ব্যাপার যে সম্পূর্ণরূপে, আরব নারীগণের ধৈর্য্য, বীরত্ব ও সৎসাহসের ফলে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

খারেজা বিদ্রোহ ও বীরাঙ্গনা গেজালা ও জোহায়জা।

হিজরী ৭৭ অব্দে, খলিফা আবদুল মলেকের রাজত্বে, হজ্জাজ সাকাফী এরাকের গবর্ণর ছিলেন। শবিব খারেজী নামক এক ব্যক্তি এ সময় মুছেল নগরে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। শবিবের সহধর্ম্মিনী গেজালা ও তাহার মাতা জোহায়জাও এই বিদ্রোহ ব্যাপারে বিশেষভাবে অংশ লইয়াছিলেন। হজ্জাজ, শবিবের বিদ্রোহ দমনকল্পে উপর্য্যুপরি ৫জন সরদার প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেহই শবিবের কবল হইতে উদ্ধার হইয়া প্রত্যাবর্ত্ত হইতে পারিল না। নিরুপায় হইয়া খলিফা সিরিয়া হইতে একদল রণদক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং এরাকের গবর্ণর হাজ্জাজ স্বয়ং এই সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। শবিব স্বীয় দলবলসহ মুসাল হইতে কুফা গমন করিয়াছিলেন। হজ্জাজ তাঁহার পূর্ব্বেই কুফা নগরে উপস্থিত হইয়া "কস্‌রুল্ এমারত" নামক প্রাসাদে অবতরণ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহী শবিবের স্ত্রী গেজালা

মানত করিয়াছিলেন যে, তিনি কুফার জামে মস্‌জেদে দুই রক্‌আৎ নফল নমাজ পড়িবেন। কিঞ্চিৎ বেলা হইলে গেজালা তাঁহার সেই মানত পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বামী সমভিব্যহারে কেবলমাত্র ৭০জন দেহরক্ষী লোক লইয়া মস্‌জেদে উপস্থিত হইলেন। শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ তখন সমগ্র কুফা নগরে বিস্তৃতভাবে অবস্থান করিতেছিল। শবিব কোষমুক্ত তরবারিহস্তে মস্‌জেদের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিলেন, তাহার পত্নী গেজালা নমাজ পড়িবার জন্য মস্‌জেদ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সম্পূর্ণ শান্তভাবে তিনি দুই রক্‌আত নমাজ সমাপন করিলেন। নমাজের প্রথম রক্‌আতে সুরা বকর এবং দ্বিতীয় রক্‌আতে সুরা 'আলে এমরাণ' পাঠ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই দুই সুরা অপেক্ষা দীর্ঘ কোরআন শরিফে অন্য কোন সুরা নাই। গেজেলা নমাজ সমাপনান্তে স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। হজ্জাজ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন।

যুদ্ধারম্ভ হইলে হজ্জাজ কুফা, বছরা ও সিরিয়ার মিলিত প্রবল বাহিনী লইয়া রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। শবিবের জনবল তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হইলেও তিনি অসমসাহস ও প্রবল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ পরিচালনায় বিরত হইলেন না। হজ্জাজ তাঁহার সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে অবিরত উৎসাহিত ও উদ্বোধিত করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। এমনকি হজ্জাজ খারেজীদিগের কেন্দ্রস্থানের মস্‌জেদটী অধিকার করিতেও সমর্থ হইলেন। গেজালা ও জোহায়জা এই ভীষণ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব, অতুল সাহস বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহারা তরবারি, নেজা ও তীর ধনু ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রাবলম্বনে যুদ্ধে অংশ লইয়াছিলেন। হজ্জাজ দেখিলেন, উক্ত বীরাঙ্গনাদ্বয়কে কোন কৌশলে ধরাশায়ী করিতে না পারিলে যুদ্ধ করা অসম্ভব। এজন্য তিনি কয়েকজন সুচতুর সৈন্যকে গুপ্তভাবে গেজালার পশ্চাৎভাগ দিয়া তাহাকে আক্রমণ করার জন্য নিযুক্ত করিলেন। সেনাপতির সেই কৌশলে গেজালা রণক্ষেত্রে নিহত হইলেন। শবিব উপায়ন্তর না দেখিয়া আহওয়াজ অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

ঐতিহাসিক এব্‌নে খল্‌কানের উক্তি অনুসারে দেখা যায়, জোহায়জাও উপরোক্ত যুদ্ধে মারা গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, উল্লিখিত যুদ্ধের কিছুকাল পর যখন শবিবের ঘোড়া পদস্খলিত হইয়া সেতু হইতে টাইগ্রীস নদীগর্ভে পতিত হয় এবং শবিব লৌহজাত বর্ম্মাদির ভারাক্রান্ত হইয়া নদীগর্ভে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন কেহ শবিব মাতা জোহায়জার নিকট তাঁহার পুত্রের অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করিলে, তিনি প্রথমাবস্থায় তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, জোহায়জার পুত্রের অপঘাত মৃত্যু! বীরাঙ্গনার সন্তানের মৃত্যু কি কখনও এরূপ কাপুরুষোচিত উপায়ে সংঘটিত হইতে পারে? বীরাঙ্গনার সন্তান বীরোচিত কার্য্যে প্রাণত্যাগ করিবে ইহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু জোহায়জা যখন একাধিক লোকের প্রমুখাৎ তাঁহার পুত্রের অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ শুনিলেন, তখন সে সংবাদ বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন, এবং

দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া আর একবার তাঁহার স্নেহাস্পদ পুত্রের নাম উচ্চারণ করিয়া শোকাকুল হইলেন। ইহাতে বুঝা যায়, জোহায়রা কুফার যুদ্ধের পরও জীবিত ছিলেন।

উল্লিখিত যুদ্ধে খলিফা আবদুল মলেকের প্রধান সেনাপতি হজ্জাজের সহিত শবিব-পত্নী বীরাঙ্গনা 'গেজালার' একাধিকবার সম্মুখ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু হজ্জাজ তাহার সহিত যুদ্ধাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইতে আদৌ সাহসী হন নাই। তিনি প্রত্যেকবারেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জনৈক আরব কবি এই ঘটনা প্রসঙ্গে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার নমুনা যথা :—

اسد علی و فی الحروب نعامة * فتخاء تصفر من صفیر الصافر

هلا برزت الی غزالة فی الوغی * بل کان قلبک فی جناح الطائر

অর্থ—হে হজ্জাজ! তুমি আমার জন্য ব্যাঘ্র স্বরূপ, কিন্তু রণক্ষেত্রে নিস্তেজ ভীত উষ্ট্রপাখীর ন্যায় নিতান্তই কাপুরুষতার পরিচায়ক। হে হজ্জাজ! তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে গেজালার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন অগ্রসর হও নাই? তুমি কিরূপেই বা তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিতে, তোমার হৃদয় যে তখন ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল! (১)

উম্মে ঈসা ও লোবাবার বীরত্ব।

হিজরী ১৩৯ অব্দে, আব্বাসবংশীয় খলিফা মনসুরের রাজত্বকালে, রোম-সম্রাট কয়সর, মলতিয়া (ملطیه) নামক নগরে সৈন্য চালনা করিয়া তাহার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেন। খলিফা মনসুর ছালেহ ও আব্বাস নামক দুই সেনাপতির নেতৃত্বে একদল সৈন্য কয়সারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই মোসলেম বাহিনী রোমীয় সৈন্যদিগকে মলতিয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া রোমরাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল আক্রমণ উদ্দেশ্যে ধাবিত হইল। কয়সারের অনেক নগর ও জনপদ মোসলমানগণের হস্তগত হইল। এই অভিযানে আলী কন্যা উম্মে ঈসা (ام عیسی بنت علی) ও লোবাবা (لبابه بنت علی) ছালেহের ভগিনীগণ এবং খলিফার পিতৃস্বসাগণ সকলেই সৈন্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ঐ বীরাঙ্গনা কুল মানত করিয়াছিলেন যে, বনি উমাইয়া বংশের রাজত্ব লয়প্রাপ্ত হইয়া আব্বাসবংশীয়দের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিবেন। তাঁহারা সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্যই রোম-অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। (২)

বীরাঙ্গনা 'ফারেআর' অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ।

হিজরী ২৭৮ অব্দে, সম্রাট হারুণর্‌রশিদের রাজত্বকালে, তরিফপুত্র ওলিদ নামক জনৈক খারেজী সম্প্রদায়ের দলপতি 'আবুর' ও 'নছিবিন' নামক স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করেন। রাজদরবারের প্রসিদ্ধ সরদার এজিদ শয়বানী এই বিদ্রোহ দমনের ভার প্রাপ্ত হন। কয়েকটী

---

(১) এব্‌নে খলকান ১ম খণ্ড ২২৩ পৃষ্ঠা, বিস্তৃত বিবরণ অন্যান্য ইতিহাস হইতে গৃহীত।

(২) এব্‌নে আছির ابن اثیر ৫ম খণ্ড—১৯৭ পৃষ্ঠা।

যুদ্ধের পর খারেজীগণ পরাজিত হয়। দলপতি ওলিদ যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহারা বীরাঙ্গনা ভগিনী এই সংবাদ প্রাপ্তে ক্রোধে অধীরা হইয়া সামরিক পোষাকে ভূষিতা এবং অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিতা হইয়া ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভীম-বিক্রমে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অসি সঞ্চালন এবং বর্শাঘাতে বহু শত্রুসৈন্যের প্রাণসংহার করিলেন। তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশল দর্শনে সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতঃমধ্যে খলিফা পক্ষের সেনাপতি এজিদ অন্যান্য সৈন্যদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দিয়া স্বয়ং অশ্ব ধাবিত করিয়া ফারেআর (فارعة) সম্মুখীন হইলেন এবং বিশেষ সাবধানতা ও সুকৌশলে ফারেআর অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা চালনা করিলেন। বর্শাঘাতে ফারেআর অশ্ব আহত হইল। তৎপর সেনাপতি ফারেআকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি অনর্থক কেন নিজ বংশের কলঙ্ক রটনা করার জন্য লালায়ীত হইয়াছ? তুমি অবিলম্বে রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান কর। ফারেআ দেখিলেন, রণক্ষেত্রে তাঁহার সম্বল আর কিছুই নাই। যুদ্ধে জয়লাভের আর কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া রণভূমি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে স্বরচিত নিম্নের কবিতা পাঠ করিতে করিতে শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন, যথা :—

(১) فياشجر الخابور مالك مورقا * كأنك لم تجزع على ابن طريف

(২) فتى لا يحب الزاد الا من التقى * ولا المال الا من قنا و سيوف

(৩) فقدناك فقدان الشباب وليتنا * فديناك من فتياننا بالوف

(৪) عليه سلام الله وقفا فانني * ارى الموت وقاعا بكل شريف

অনুবাদ—(১) হে খাবুর তীরবর্ত্তী বিটপীশ্রেণি! তোমরা কেন সজীব ও শ্যামল? তোমরা যেন ওলিদের মৃত্যুতে শোকাকুল হও নাই! (২) ওলিদ এরূপ যুবক ছিলেন যিনি অপবিত্রতা ও পাপতাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকা ব্যতীত আর কিছুই ভাল বাসিতেন না, তিনি অসি ও বর্শা ব্যতীত অন্য কোন ধনরত্নের লালসা করিতেন না। (৩) হে ওলিদ! আমরা তোমাকে চির-কালের জন্য হারাইলাম, যেমন লোকে চিরতরের নিমিত্ত যৌবন-ধন হারায়। হায়! যদি আমাদের হাজার যুবককে উৎসর্গ করিয়াও তোমাকে লাভ করিতে পারিতাম। (৪) ওলিদের প্রতি খোদাতাআলার অনুগ্রহ বারি বর্ষিত হউক। মৃত্যু প্রত্যেক লোকের জন্যই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

আরবী সাহিত্যে ‘ফারেআর’ শোকগাথা অতি প্রসিদ্ধ। মহাত্মা আবু আলী কালী তাঁহার “আমালী” গ্রন্থে এবং ঐতিহাসিক “এব্‌নে খলকান” স্বকীয় গ্রন্থে ‘ফারেআর’ শোক-গীতির অতি উচ্চ সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

ক্রুসেড যুদ্ধের সময় যেমন বহু খৃষ্টান রণরঙ্গিণী যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন তদ্রূপ বহু মুসলমান বীরাঙ্গনাকুলের নামও ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রুসেড যুদ্ধে

অন্যতম সেনাপতি ওসামা যখন রণক্ষেত্রে গমন করিতেন তখন তাঁহার মাতা ও ভগিনী তাঁহারাও সামরিক পোষাকে ভূষিতাবস্থায় সর্ব্বদা ওসামার সঙ্গে যুদ্ধাভিনয়ে যোগদান করিতেন। তাঁহারা কখনও ওসামাকে ছাড়িয়া পশ্চাতে থাকিতেন না। সিরিয়া বিজয়, পারস্য অভিযান, মিসর অধিকার ইত্যাদি এস্লাম জগতের যুদ্ধের ইতিহাসের এমন একটী পৃষ্ঠাও দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে মুসলমান বীরাঙ্গনাগণ তাঁহাদের যোদ্ধৃ পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সহযোগিতার জন্য রণক্ষেত্রে গমন করিতেন না।

ভারতের মোসলেম বীরাঙ্গনাগণের পরিচয়।

১। রাজিয়া বেগম। رضیه بیگم

বাদশাহ আলতমশ কন্যা রাজিয়া বেগম স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনিই ভারতের প্রথমা মুসলমান রাজ্ঞী। তাঁহার রাজত্বকাল অতি অল্পকাল স্থায়ী হইলেও তিনি বিশেষ সুখ্যাতি ও অত্যন্ত প্রবল প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সামরিক পোষাকে ভূষিতা এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। ভারতের মোসলমান বাদশাহগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা মৃগয়ার্থে গমনকালে সচরাচর তাঁহাদের সহধর্ম্মিনীদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বাদশাহগণের ন্যায় বেগমেরাও মৃগয়াকার্য্যে অংশ লইতেন। বাদশাহ আলতমশ একবার শিকার ক্রীড়ায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বেগমগণ কিছুদূর পশ্চাতে ছিলেন। তিনি একাকী কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে হঠাৎ জঙ্গল হইতে একটা ব্যাঘ্র বাহির হইয়া বাদশাহকে আক্রমণ করে। ইতঃমধ্যে রাজিয়া বেগম দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কোষমুক্ত তরবারি হস্তে ব্যাঘ্রের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং এরূপ কৌশলে ও সজোরে আঘাত করিলেন যে ব্যাঘ্রটী তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল। রাজিয়া ঠিক সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হইলে এবং স্বীয় স্বভাবজাত অসীম সাহস ও ক্ষীপ্রকারিতার সহিত ব্যাঘ্রটাকে আক্রমণ না করিলে বাদশাহের যে জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজিয়া সিংহাসন আরোহণ করিয়া অভিজাতবর্গ এবং মন্ত্রীদলের প্রতি যেরূপ আধিপত্য ও প্রবল ক্ষমতা প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে তদীয় বিরুদ্ধাচরণ বা অবাধ্যতা প্রকাশের উপায় ছিল না। পরিণামে কারণ পরম্পরায় নেজামুল মুল্‌ক, রাজস্ব সচিব, মলেক আজাজুদ্দীন, মলেক সয়ফুদ্দীন, মলেক আলাউদ্দীন প্রভৃতি প্রধান আমাত্যগণ রাজিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। তাঁহারা ভীষণ ষড়যন্ত্রের বশীভূত হইয়া সুকৌশলে প্রবল সৈন্যদল লইয়া দিল্লীর বহির্দ্দেশে রাজসৈন্যের আগমন পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজিয়ার সাহার্য্যার্থে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল সৈন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল তাহারা মন্ত্রী সমাজের ষড়যন্ত্রে মধ্যপথেই আটক হইয়া গেল। অধিকাংশ বিদ্রোহীদের দলভুক্ত হইয়া পড়িল। দিল্লী এক প্রকার শত্রুহস্তে অবরুদ্ধ, এমতাবস্থায় নারী রাজ্ঞী কেন একজন অতি

বুদ্ধিমান মহাবীর সম্রাটের পক্ষেও আত্মসমর্পণ ও পরাভব স্বীকার করা ব্যতীত উপায়ন্তর ছিল না, কিন্তু রাজিয়ার প্রকৃতিই স্বতন্ত্র ছিল। তিনি সহজে দমিবার বা কাহারও নিকট মস্তকাবনত করিবার পাত্রী ছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ স্বাভাবিক সাহস বিক্রম তাঁহাকে এই বিপন্নাবস্থাতে ও হতাশ্বাস করিতে পারে নাই। তিনি কৌশলে বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে বিরত হন নাই।

৬৩৭ হিজরীতে যখন লাহোরের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহাচরণ করেন, তখন সোল্‌তানা রাজিয়া স্বয়ং সৈন্য চালনা করিয়া তাহা দমনকল্পে ধাবিত হন; অতঃপর আবার যখন ভাটাণ্ডার গবর্ণর মস্তকোত্তলন করেন তখনও তিনি স্বয়ং সেনানায়িকারূপে অভিযান করেন কিন্তু এই অভিযানে তাঁহার ভৃত্যগণের ষড়যন্ত্রে তিনি মধ্যপথে শত্রুহস্তে বন্দী হন এবং মন্ত্রীদল তৎপরিবর্ত্তে তদীয় ভ্রাতা মযেজুদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসন প্রদান করেন। রাজিয়া বন্দীদশা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুনরায় একদল নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ২।৩বার দিল্লীর সিংহাসনাধিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার অশিক্ষিত নবগঠিত সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। (১) এ সকল ঘটনা দ্বারা আমরা সুন্দররূপে বুঝিতে পারি যে, রাজিয়া বেগম কিরূপ বুদ্ধিমতি, ধৈর্য্যশীলা ও অসীম সাহসিনী বীর নারী ছিলেন। তিনি শত বিপদ-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা ও স্বত্বাধিকার লাভ জন্য যেরূপ দৃঢ়তা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর নরপতিগণের জীবনেও তাহার তুলনা দুষ্প্রাপ্য।

সোলতান আলাউদ্দীন খলিজীর দাসী গোলেবেহেশ্‌তের বীরত্ব কাহিনী।

ভারতের ইতিহাসে সোলতান আলাউদ্দীন খলিজির খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও প্রবল প্রতাপের বিষয় সর্ব্বজন বিদিত। যে মোগল তাতারীদের দিগ্বিজয়ের প্রবল বন্যার স্রোত নিবারণ করা বোগ্দাদের দুর্জ্জয় দুর্গের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, প্রবল প্রতাপশালী তুর্কী সাম্রাজ্য যাহাদের ভীম পরাক্রমে জর্জ্জরিত হইয়াছিল, চীনের জগৎ প্রসিদ্ধ অপূর্ব্ব প্রাচীর যাহাদের গতিরোধ করিতে পারে নাই সেই মোগলজাতির ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সোলতান আলাউদ্দীন খলিজি যে গর্ব্বিত হইবেন তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তিনি মোগল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া মনে মনে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের ন্যায় দিগ্বিজয়ের কল্পনা জল্পনায় প্রমত্ত ছিলেন; ইতঃমধ্যে একদা তিনি দরবারের আমাত্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এখন ভারতবর্ষে এরূপ কোন প্রদেশ বা করদ মিত্ররাজ্য নাই যাহারা আমার বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলন করিতে বা বিদ্রোহাচরণ করিতে সমর্থ হয়। জালোর দুর্গের অধিপতি তখন দরবারে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অত্যন্ত গর্ব্বভরে ও অতিশয় দাম্ভিকতার সহিত বলিলেন, জালোরদুর্গ কখনও কাহারও দ্বারা অধিকৃত হইতে পারিবে না; জালোর দুর্গ দুর্জ্জয়, তাহা জয় করা সম্ভবপর নহে। সোলতান আলাউদ্দীন রাজার এরূপ মুখফুট কথায় মনে মনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি রাজাকে

(১). তারিখে আক্‌বরী, মোল্লা নেজামুদ্দীন কৃত।

কিছুই বলিলেন না। ২।৩ দিন পরে রাজাকে দিল্লী হইতে বিদায় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে মাত্র এতটুকুও অবসর দিলেন না যেন তিনি যতদূর সম্ভব তাঁহার জালোর দুর্গ সুরক্ষিত করেন—যথেচ্ছা দুর্গ রক্ষার সুব্যবস্থা ও সৈন্য সংগ্রহ করেন। ইহার তিন মাস পরে সোলতান আলাউদ্দীন গোলেবেহেশ্‌ত নাম্নী স্বীয় এক দাসীকে সেনানায়িকা পদে বরণ করিয়া জালোর অভিযানে প্রেরণ করিলেন। বীরাঙ্গনা গোলেবেহেশ্‌ত তাঁহার প্রবল বাহিনী লইয়া প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় দ্রুতবেগে জালোর দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে দর্শকগণ তাঁহার রণসজ্জা, সৈন্যশ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষা, এবং সৈন্যদলের পরিচালন কৌশল দর্শনে সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

গোলেবেহেশ্‌ত জালোরে উপস্থিত হইয়াই কালবিলম্ব না করিয়া ভীম বিক্রমে দুর্গরক্ষী সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। রাজার সৈন্য প্রথম আক্রমণেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক দুর্গাবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। গোলেবেহেশ্‌ত রাজাকে অবরোধ করিয়া এরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, রাজা এবং রাজসৈন্য বীরাঙ্গনার প্রবল রণকৌশল ও ভীম প্রতাপ দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাহারা পূর্ব্বে যাহা কল্পনা করিতে পারে নাই, যাহা কখনও জালোর দুর্গের ভাগ্যে ঘটে নাই, সেই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দর্শনে সকলেই হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। দুর্গ জয় এক প্রকার নিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিমধ্যে গোলেবেহেশ্‌ত হঠাৎ স্বাভাবিক রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিলেন না। গোলেবেহেশ্‌ত চিরকালের জন্য অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

এস্‌লামাবাদী।

জাহান্-আরা বেগম।

ইতিহাসের কথা।

আব্বাসীয়া খলিফাদিগের রাজত্বকালে, "বরামকাহ" বংশীয় লোকেরা যে প্রকারে সাম্রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন, ঠিক সেই প্রকারে মির্জ্জা খাজা মোহাম্মাদ তুরাণীর বংশধরেরা ভারতবর্ষের মোগল-সাম্রাজ্য-সৌধের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। সম্রাট জালাল-উদ্দীন মোহাম্মদ আকবরের সময় হইতে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনকাল পর্য্যন্ত,—যে সময় মোগল সম্রাটদিগের গৌরব-সূর্য্য ভারতের মধ্যাহ্ন গগনে বিরাজ করিতেছিল, সেই সময় মির্জ্জা খাজাহ মোহাম্মাদ তুরাণীর বংশধরেরা মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ণধার ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কি রাজ্যশাসন ব্যাপারে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি যুদ্ধ বিদ্যায়—সকল বিষয়েই তাঁহারা অগ্রণী ছি লেন

মির্জ্জা খাজা মোহাম্মদ।

পারশ্য দেশের অন্তর্গত খোরাসান প্রদেশের তুরাণ বা তিহারাণ শহরে, মির্জ্জা খাজা মোহাম্মদ বেগ নামক সৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক বাস করিতেন।* তিনি সদ্বংশজাত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া, পারশ্য সম্রাট শাহতমাস্প তাঁহাকে খোরাসানের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল রাজনীতি বিশারদ ছিলেন, তাহা নহে, বিখ্যাত রণনিপুণ বীরপুরুষ বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ন্যায়পরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু, পরিশ্রমী, সদালাপী মিষ্টভাষী, প্রভুভক্ত প্রভৃতিরূপেও তিনি সকলের সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। এই মির্জ্জা খাজা মোহাম্মদ বেগ তুরাণীর একমাত্র বংশধরই ইতিহাস বিখ্যাত মির্জ্জা মোহাম্মদ গয়োস বেগ।†

মির্জ্জা মোহাম্মদ তুরাণীর ঈদৃশ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া, তাঁহার জ্ঞাতি-বর্গ মনে মনে তাঁহার প্রতি অসন্তোষের ভাব পোষণ করিত। কিন্তু অতি বুদ্ধিমান মোহাম্মদ তুরাণীর হস্তে রাজক্ষমতা থাকায়, তাহাদের হৃদয়-স্থিত হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত না। তন্নিবন্ধন তাহারা সর্ব্বদাই নিজদের হৃদয়-পোষিত গরল-উদ্গারণের জন্য সময় ও

---

* মির্জ্জা খাজা মোহাম্মদ বেগ, কোন্ সালের কোন্ তারিখে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তুরাণ তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া, তিনি তুরাণী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† মোহাম্মদ গয়োস-উদ্দীন বেগ।

সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিত। মির্জ্জা গয়োস বেগ যে সময় অতি শিশু, অর্থাৎ যখন তাঁহার বয়ক্রম মাত্র দেড় বৎসর, সেই অসময়ে তাঁহার গর্ভধারিনী স্নেহময়ী জননী স্বর্গারোহণ করেন। কিন্তু মির্জ্জা মোহাম্মাদ তুরাণী একমাত্র বংশধর গায়াসের মুখ চাহিয়া, পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন নাই। উপযুক্ত ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া পুত্র লালন-পালনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। মির্জ্জা গয়োসের বয়স যখন ৩০ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে, সেই সময় তাঁহার পরম স্নেহময় পিতৃদেব ইহধাম ত্যাগ করিয়া চির অমর ধামে চলিয়া গিয়াছিলেন। পুত্রের অল্প বয়সের সময় তাহার গর্ভধারিণীর মৃত্যু হওয়ায় পুত্র কোন অন্যায় গর্হিত কার্য্য করিলেও স্নেহময় পিতা পুত্রকে শাসন করিতে বিরত থাকিতেন।

মির্জ্জা মোহাম্মদ বেগ তুরাণীর জীবদ্দশাতেই, মির্জ্জা গয়োস-উদ্দীন বেগ এক পরম রূপ-লাবণ্য-বতী মহিলার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠ মহিলা, বংশ-গৌরবে তাঁহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন ছিলেন। এই ওজুহাতে তৎসমাজের লোকেরা হিংসুক শত্রুদিগের প্ররোচনায় পিতা-পুত্রকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে মস্তকোত্তলোন করিলেন। কিন্তু মোহাম্মাদ বেগের বুদ্ধিকৌশলে তাহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইতে পারে নাই। পিতা পুত্রের সেই পূর্ব্ব প্রভাবই বজায় রহিল।

যদিও গায়াস-পত্নী বংশ গৌরবে স্বামী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন ছিলেন, কিন্তু গায়াসের স্নেহময় পিতা মোহাম্মদ বেগ পুত্রবধুর অসামান্য গুণে মুগ্ধ হইয়া, এবং বাৎসল্য বশবর্ত্তীতায় এই নব দম্পতির প্রতি স্নেহ বিতরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায়, গয়োসের ভাগ্যে পিতার স্নেহ-ভালবাসা ভোগ করিবার আর অধিক দিন অবসর ঘটিল না। যখন গয়োসের পত্নী দুইটী মাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, * সেই সময় গয়োসের পিতার মৃত্যু হয়।

মির্জ্জা গয়োস বেগ।

মির্জ্জা মোহাম্মদ বেগের মৃত্যু হইলে শত্রুদল সুযোগ পাইয়া মস্তকোত্তলন এবং প্রাণপণ চেষ্টায় গয়োসের বিরুদ্ধাচারণ করিতে আরম্ভ করিল। যদিও গয়োস পারশ্য সম্রাটের অনুগ্রহে পিতৃপদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি পিতার ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং শত্রুদিগের চক্রান্তে স্বদেশে তিষ্ঠিতে না পারিয়া স্ত্রী ও পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশ ত্যাগ করাই সমীচীণ বোধ করিলেন।

শীঘ্রই তাঁহার এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। খোরাসান হইতে একদল বণিক বাণিজ্য ব্যাপদেশে ভারতবর্ষেরদিকে আসিতেছিলেন ; গয়োস স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া সেই বণিকদলে যোগদান করিলেন। এই সময় তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন।

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এই সময় গায়াস-পত্নী দুই পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন।

কান্দাহারের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি এক কন্যা রত্ন প্রসব করেন। এই কন্যা রত্নই ইতিহাস বিখ্যাত মেহেরউন্নেসা বা নূর-উন্নেসা—প্রকাশ নূরজাহান বেগম।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মির্জ্জা গয়োস, "শাহ তহমাস্পের" অবনতি আরম্ভ হওয়ার পর, আত্মীয় স্বজনদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, চিরদিনের তরে জননী জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া, সম্রাট আকবরের দরবারে পরিচিত এবং গৃহীত হন।

সম্রাট আকবর সর্ব্বপ্রথম গয়োস বেগকে রাজস্বসচিবের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন, তখন ক্রমে সম্রাট তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত করিলেন। মির্জ্জা গয়োসবেগ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, এই গৌরবময় পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বিধাতার কৃপায় মির্জ্জা গয়োস বেগ দ্বাদশটী সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাস বিখ্যাত মির্জ্জা আবুল হাসান আমিন্-উদ্দোলা মোহাম্মদ আসফ খান, মির্জ্জা গয়োসের অন্যতম সন্তান। ইনি রাজ মহিষী নূরজাহান বেগমের কনিষ্ঠ ছিলেন। গয়োস বেগ আগরার আলেম মণ্ডলীর-প্রধান নেতা মোল্লা গয়োস উদ্দিনের কন্যার সহিত প্রিয় পুত্র আসফ খানের বিবাহ দিয়াছিলেন। মোল্লা গয়োস উদ্দীন প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)এর জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দর্ রহমানের (রাঃ) বংশধর। মির্জ্জা গায়াস বেগ ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে আগরা নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

গায়াস বেগের প্রকাণ্ড সমাধি মন্দির আজিও মস্তকোত্তলন করিয়া অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। রাজ মহিষী নূরজাহান তাঁহার সমাধি ভবন রৌপ্য মণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু আলেম মণ্ডলীর নিষেধ ক্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

নূরজাহান বেগম।

মির্জ্জা গয়োস বেগের সন্তান সন্ততি দিগের মধ্যে নূরজাহান বেগম ও আসফ খান বিশেষ খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যে নূরজাহানের নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রায় সকলেই অবগত আছে, যাঁহার সুযশের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়া, আজিও ইউরোপের ললনাকুল ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকেন, এবং যিনি সোল্তানা রিজিয়ার পর সর্ব্বপ্রথম ভারত সাম্রাজ্যের মহিলা কর্ণধার হইয়াছিলেন, ইনি সেই নূরজাহান বেগম। যাঁহার গভীর রাজনীতি জ্ঞানের নিকট প্রধান রাজনীতি বিশারদ পণ্ডিত বীরবর মোহাবত খাঁকেও হার মানিতে হইয়াছিল, ইনি সেই নূরজাহান বেগম।

সম্রাট আকবরের ইচ্ছায়, মেহেরুন্নেসা ওরফে নূরজাহানের বিবাহ, প্রথমে বীর শ্রেষ্ঠ আলিকুলি খাঁ ওরফে শের আফ্গানের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। শের আফ্গানের

ঔরসে মেহেরুন্নেসার গর্ভে একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এই কন্যাই ইতিহাস বিখ্যাত লাড়্‌লি বেগম। কিন্তু সলিম ওরফে জাহাঁগীর প্রথম হইতেই মেহেরুন্নেসার প্রতি আসক্ত ছিলেন, তাই আকবরের মৃত্যুর পর, ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়া কৌশলে শেরকে হত্যা করিয়া মেহেরুন্নেসাকে লাভ করিবার চেষ্টা করেন। মেহেরুন্নেসা প্রথম প্রথম কিছুদিন এই প্রস্তাবে স্বীকৃতা হয়েন নাই; পরে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তিনি জাহাঁগীরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, "নূর-জাহান" এই গৌরব জনক উপাধি লাভ করেন।

রাজ্ঞী নূরজাহান, সম্রাট জাহাঁগীরের উপর স্বীয় সদ্‌গুণাবলীর প্রভাবে যে কি পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইতিহাসপাঠক মাত্রেই তাহা বিশদরূপে অবগত আছেন। তিনি প্রায় বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত সম্রাট এবং সাম্রাজ্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিশাল ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। জাহাঁগীরের সহিত নূরজাহানের বিবাহ হওয়ার পর যে, তাঁহার আর কোন সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই; বরং কোন কোন ঐতিহাসিক স্পষ্টাক্ষরে একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার প্রথম স্বামী শের-আফ্‌গানের ঔরসজাত কন্যা লাড়্‌লি বেগম ব্যতীত তাঁহার গর্ভে অপর কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই। এই লাড়্‌লি বেগমের সহিত ১৬২১ খৃষ্টাব্দে শাহজাদা শাহরেইয়ারের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

সম্রাট জাহাঁগীর নূরজাহানের কার্য্যকুশলতা ও গম্ভীর রাজনীতি জ্ঞানের প্রতি এত অধিক পরিমাণে আস্থাবান হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সম্রাজ্যের সমস্ত কার্য্যভার নূরজাহানের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এমন কি প্রচলিত মুদ্রায় তাঁহার নামের সহিত, নূরজাহানের নামও লিখিত হইয়াছিল। মুদ্রাসকলের উপর এই পার্শী কবিতাটী লিখিত হইত। যথা—

"ব-হোকুমে শাহ জাহাঁগীর ইয়াফৎ সদ্‌ জেওয়ার।
ব-নামে নূর-জাহান্‌ শাহ বেগম জর্‌॥"

ইহা ব্যতীত শাহী-পতাকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল। যথা—

"হোকুমে আলিয়াতল আলিয়া নূরজাহান বেগম বাদ্‌শাহ।"

সম্রাট জাহাঁগীর প্রায়ই দরবারে একথা প্রকাশ করিতে বিরত হইতেন না যে, তিনি রাজ্য-ভার নূরজাহান বেগমকে অর্পণ করিয়াছেন।"* (ক্রমশঃ)

ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

* তোজাকে জাহাঁগিরী দ্রষ্টব্য।

কোর্‌আনই উন্নতির সোপান।

কোর্‌আন শরিফ কলামে-এলাহী বা ঐশী-বাণী; ইহা মুসলমানগণের দৃঢ় বিশ্বাস। এই পবিত্র স্বর্গীয় গ্রন্থই ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। হাদিছ, তফ্‌সীর ও ফেকা শাস্ত্রাদি সমস্তই ইহার ভাষ্য স্বরূপ। ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগে, কোর্‌আন ব্যতীত মুসলমানগণের হস্তে অন্য কোন অবলম্বনীয় ধর্ম্মপুস্তক বা সামাজিক ও রাজনীতিক গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল না। তৎকালীন মুসলমানগণ এই কোর্‌আন ও রসুলের উপদেশ অবলম্বনেই রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে আব্বাসবংশীয় স্বনামখ্যাত খলিফা হারুণররশিদের শাসনকালেই তাহার ব্যবহার বিধির প্রবর্ত্তন হয়। হাদিছ তফ্‌সীর সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনার অনুষ্ঠান ইহার ও পরবর্ত্তী সময়ের বা হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর ঘটনা। ঐতিহাসিক সত্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচারক্ষেত্রে উপনীত হইলে, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ পবিত্র স্বর্গীয় গ্রন্থ কোর্‌আনের আমলদারীর দুইশত বর্ষের মধ্যেই উন্নতীর চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা এশিয়া মহাদেশ, আরব, সিরিয়া, ক্ষুদ্র এশিয়া, এরাক, পারস্য, তুর্কিস্থান, খোরাসান, বেলুচিস্থান, আফ্‌গানিস্থান ও সিন্ধুদেশ জয় করিয়াছিলেন। আফ্রিকা মহাদেশে মিসর, সুডান, আবিসীনিয়া, সুমালি, ত্রিপলি, আলজিরিয়া, টিউনিস, মরক্কো, বরবরা, ছাহারা মরুভূমি ইত্যাদি স্থান মুসলমানগণের বিজয় বৈজয়ন্তী তলে আশ্রয় লইয়াছিল। ইউরোপখণ্ডে স্পেন ও পর্তুগাল রাজ্য সম্পূর্ণরূপে মূরগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ, ইটালির অধিকাংশ জনপদ ও জর্ম্মণীর কিয়দংশ স্পেনীয় সোল্‌তানগণের প্রবল প্রতাপে প্রকম্পিত এবং পরিশেষে তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ের মধ্যেই মুসলমানগণের দিগ্বিজয়ের প্রবল প্রবাহ রোমসাম্রাজ্যের পূর্ব্বভাগের রাজধানী অতুল ঐশ্বর্য্যবৈভবশালিনী মহাসমৃদ্ধিসম্পন্না নগরী কুলরাণী কনষ্টান্টিনোপলের দুর্ভেদ্য নগর প্রাচীরের পাদমূল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন মুসলমানগণের উন্নতিবিভাগ কেবল যে রাজনৈতিক গগনের মধ্যাহ্নপ্রভাকরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে স্বীয় প্রখর কিরণ বিস্তার করিতেছিল, তাহা নহে, বরং তাহারা শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সভ্যতার নানা বিভাগেও উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই স্পেনের মধ্যস্থতায় মুসলমানগণের শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রখর জ্যোতি ইটালি, অষ্ট্রীয়া, জর্ম্মণী ও ফ্রান্স ইত্যাদি ইউ-রোপের প্রধান রাজ্য সমূহে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

উপরোক্ত উক্তি নিচয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে সততই অন্তরে এই স্বাভাবিক ও বিস্ময়কর প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে যে, যে আরবজাতি কিছুকাল পূর্ব্বে ঘোর মূর্খতা ও অসভ্যতার পঙ্কিল কূপগহ্বরে নিপতিত ছিল; কলহ-বিবাদ, ঝগড়া-ফসাদ ও আত্মবিরোধ যাহাদের অলঙ্কার

ছিল; অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন, লাম্পট্য, চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি যাহাদের চির সহচর ছিল; বালিকা হত্যা, নরবলি, জড়পূজা ও জাল জুয়াচুরি যাহাদের নিত্যকর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল; তাহারা কিরূপে ও কি উপায়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, তৎকালীন পৃথিবীর প্রবল প্রতাপান্বিত রোমক, পারসীক ও গ্রীকজাতিকে পদানত করিয়া জগতের সুখসৌভাগ্যের চরম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন ? ইহার প্রত্যুত্তর এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মুসলমানগণ একমাত্র পবিত্র কোর্‌আন অবলম্বনে এবং কোর্‌আনের শিক্ষা ও উহার আদেশ উপদেশের অনুসরণ করিয়াই তাদৃশ অভাবনীয় ও চিন্তাতীত উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন। কোর্‌আন ব্যতীত তখন তাহাদের নিকট অন্য কোন অবলম্বনীয় পুস্তক ছিল না। আছহাবগণ ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী যুগের মুসলমানগণ পরস্পর দেখিয়া শুনিয়া যে সকল হাদিছ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন ধর্ম্মনীতি পালন ও বিচার মীমাংসাক্ষেত্রে তাঁহারা যে তদ্দ্বারা সময় সময় সাহায্য গ্রহণ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনও জনসাধারণের জন্য একমাত্র কোর্‌আন ব্যতাত অন্য কোন আদর্শ গ্রন্থ যে তাঁহাদের নিকট ছিল না তাহা নিশ্চিত। এমাম মালেকের সংক্ষিপ্ত হাদিছ গ্রন্থ "মওত্তা" তখনও জনসমাজে সাদরে গৃহীত হয় নাই।

উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, কোর্‌আন আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধানতম সোপান, কোর্‌আন আমাদের সর্ব্ববিধ সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক রোগবিয়োগের নিদান। এ সম্বন্ধে কোর্‌আন স্বয়ং কি সাক্ষ্য দান করিতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করুন :—

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ۝

১। আমি কোর্‌আনকে বিশ্বাসী (মুসলমান) গণের জন্য রোগ-মুক্তি ও করুণার নিদর্শন স্বরূপ অবতারণ করিয়াছি। (সুরা বনি এস্রাইল, ৯ম রুকু, ১৫ পারা)।

يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور
و هدى و رحمة للمؤمنين ط

২। হে মানবগণ! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট (কোর্‌আন শরিফ) উপদেশ স্বরূপ এবং তোমাদের আন্তরিক রোগের প্রতিষেধকরূপে আনীত হইয়াছে এবং তাহা বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ। (৯ম পারা, সুরা ইউনস, ৬ রুকু)

و نزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شي و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين ط

৩। (হে মোহাম্মদ!) আমি তোমার প্রতি যে স্বর্গীয় কেতাব অবতারণ করিয়াছি, তাহাতে প্রত্যেক বস্তুরই বর্ণনা সন্নিহিত আছে এবং তাহা মুসলমানদিগের জন্য পথ প্রদর্শন, অনুগ্রহ ও শুভসংবাদের নিদর্শন স্বরূপ। (১৪ পারা, সুরা নহল ১৩ রুকু)

و انه هدى و رحمة للمؤمنين ط

৪। এই কোর্‌আন বিশ্বাসী মুসলমানগণের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ। (১৯ পারা, সুরা নমল, ৬ রুকু)

উপরোক্ত আয়াত সমূহ এবং এরূপ বহুসংখ্যক অপর উক্তি দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, পবিত্র স্বর্গীয় গ্রন্থ কোর্‌আন শরিফকে খোদাতাআলা মুসলমানগণের সর্ব্ববিধ রোগবিয়োগের অবলম্বন এবং তাহাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শনের উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ ইহলোকে প্রেরণ করিয়াছেন। কোর্‌আন শরিফ তাহাদের জাতীয় উন্নতি ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রধানতম সম্বল। কোর্‌আন এ কথা যেমন ভাষায় ব্যক্ত ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রেও তাহার সত্যতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের অচিন্তনীয় অভ্যুত্থান কি কোর্‌আনের সত্যতা ও ভবিষ্যৎ বাণী সফলতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে? কোর্‌আন কি এস্‌লামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের অধঃপতন-রোগ বিয়োগের নিদান ও জাতীয় উন্নতির জন্য করুণার সুধাসিন্ধু স্বরূপ প্রমাণিত হয় নাই? সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, নিশ্চয় হইয়াছে। কোর্‌আনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া পরিণত হইয়াছে। কোর্‌আন যে ঈশ্বর-বাণী, কোর্‌আনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতাই তাহার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোর্‌আন শরিফ বাস্তবিকই যদি মুসলমানগণের জাতীয় অবনতির প্রতিষেধক এবং উন্নতির অবলম্বন হয়, তাহা হইলে এখনও সেই কোর্‌আন আমাদের মধ্যে বিরাজমান আছে, এখনও চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রমালা পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব কক্ষপথে স্বকীয় কর্ত্তব্য পালনে নিয়োজিত আছে, এখনও দিবারাত্রি, মাস বর্ষ ও ঋতু নিচয় যথানিয়মে প্রাকৃতিক বিধানের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক জগতের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে; কিন্তু বর্ত্তমানে সেই কোর্‌আন মুসলমানগণের অধোগতি নিবারণে অক্ষম এবং তাহাদের জাতীয় উন্নতিসাধনে অসমর্থ কেন? তবে কোর্‌আনে কোনরূপ বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি? ঐরূপ হওয়া কি সম্ভবপর? না, কখনও না। এতদ্বিষয় স্বয়ং কোর্‌আনের সাক্ষ্য দেখুন,

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحفظون ط

অর্থ—(খোদাতাআলার উক্তি) আমিই (এই কোর্‌আনকে) উপদেশ স্বরূপ অবতারণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই তাহার রক্ষক। * এই আয়ত দ্বারা এবং প্রত্যক্ষভাবে আমরা দেখিতে ও বুঝিতেছি যে, কোর্‌আন যেরূপ ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে অবিকৃতাবস্থায় এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। আমাদের অধঃপতন ব্যাপারে কোর্‌আনের বা খোদাতাআলার কোন দোষ ত্রুটী নাই, বরং আমাদের অবনতির জন্য আমরাই দায়ী; আমাদের চরিত্র দোষেই আমরা উন্নতির উচ্চ সোপান হইতে অবনতির নিম্নতম গহ্বরে পতিত হইয়াছি। এতদ্বিষয় কোর্‌আনের উক্তি যথা :—

ان الله لا يغير ما بقوم حتى ما يغيروا ما بانفسهم ط

---

* (১৪ পারা, সুরা আল হাজর, ১ম রুকু)।

অর্থ—আল্লাহ কোন জাতির সুখ সম্পদের পরিবর্ত্তন সাধন করেন না, যে পর্য্যন্ত তাহারা নিজদের সদ্‌গুণের পরিবর্ত্তন না করিয়াছে। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কোন জাতি নিজ যোগ্যতা ও চরিত্রবলকে জলাঞ্জলি না দিয়াছে তাবৎ খোদাতাআলা সেই জাতির অধঃপতন সাধন করেন না।

فان الله ليس بظلام للعبيد

আল্লাহতাআলা কোন লোকের প্রতি কোনরূপ অবিচার করেন না। পারস্য ভাষায় এতদর্থে একটী প্রবাদ আছে :—

از ماست که بر ماست

অর্থাৎ "আমাদের প্রতি যাহা বিপদ পতিত হইয়াছে আমরাই তাহার মূলীভূত কারণ"। ফলতঃ আমাদের অবনতির জন্য আমরাই দায়ী, কারণ আমাদের শৈথিল্য, আমাদের ত্রুটী ও অবহেলাতেই আমরা অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইয়াছি। কোর্‌আন পাঠ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যদিও পাঠ করি, কিন্তু অনেকেই তাহা বুঝি না এবং বুঝিতে চেষ্টাও করি না, যাহারা বুঝে তাহারা—কোর্‌আনের আদেশ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলে না। কোর্‌আনের বিধি ব্যবস্থার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ অনেকাংশেই উদাসীন! মনে করুন, কোন একটী জনপূর্ণ পরিবারে বহুলোক রোগাক্রান্ত, এবং সেই বাড়ীতে নানাবিধ রোগের এক বাক্স অব্যর্থ ফলোদায়ক ও পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট ঔষধ বিদ্যমান আছে কিন্তু কেহ তাহা ব্যবহার করে না, যে দু'একজন রোগী সময় সময় সেই বাক্সের ঔষধ ব্যবহার করে তাহারা কেহই ঔষধ ব্যবহারের যথাযোগ্য নিয়ম পদ্ধতি পালন করে না, পথ্যাপথ্যের প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখে না। ঔষধের সহিত যে ব্যবস্থাপত্র আছে তৎপ্রতি তাহাদের আদৌ লক্ষ্য নাই। এমত-অবস্থায় ঐরূপ ভাবে অনিয়মিত ঔষধ ব্যবহার দ্বারা কখনও রোগীর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে কি? মুসলমান সমাজরূপ রোগাক্রান্ত পরিবারে অব্যর্থ ফলোদায়ক মহৌষধের বাক্স স্বরূপ পবিত্র কোর্‌আন শরিফ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু কোর্‌আনের বিধি ব্যবস্থার প্রতি কয়জন লোকের লক্ষ্য আছে? কয়জন লোক কোর্‌আনের আদেশ উপদেশ মানিয়া চলে? সমাজের কয়জন লোক নিয়মিতরূপে কোর্‌আন পাঠ করে এবং যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন লোক কোর্‌আন বুঝেন বা বুঝিতে চেষ্টা করেন, যাঁহারা বুঝেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন লোক কোর্‌আনের আদেশ উপদেশ মতে চালিত হন? সুতরাং এরূপ অবস্থায় কোর্‌আন আমাদের সামাজিক রোগের কিরূপে প্রতীকার সাধন করিবে, কিরূপে আমরা তদবলম্বনে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিব? যাহা স্বভাবের বিপরীত, প্রাকৃতিক বিধানের প্রতিকূল তাহা যদি আমরা কামনা করি তাহা হইতে অরণ্যে রোদন মাত্র সার হইবে।

এখন হয়ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, কোর্‌আন আমাদের সামাজিক রোগ বিয়োগের নিদান ও উন্নতির সোপান বলিয়া পরিগণিত হইবার উপায় কি? কোর্‌আনরূপ মহৌষধের

ব্যবহার বিধি ও নিয়ম পদ্ধতি কি ? এতদুত্তরে আমরা কোর্‌আন শরিফ হইতেই ব্যবস্থাপত্র প্রদর্শন করিতেছি যথা :—

و رتل القران ترتيلا

১। "ঈষৎ স্থগিতভাবে কোর্‌আন পাঠ কর।" অর্থাৎ ধীর স্থিরভাবে কোর্‌আন পাঠ করা উচিত যাহাতে কোর্‌আনের অর্থোদ্‌ঘাটনের পক্ষে কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত না হয়। আজকাল অনেকেই এরূপ দ্রুতগতিতে কোর্‌আন পাঠ করে যে তদ্দ্বারা অর্থোদ্‌ঘাটন দূরের কথা, শব্দ সমূহের পার্থক্য নির্ণয় করাও মহা দায়। আমাদের ভক্তিভাজন হাফেজ সাহেবগণ তারাবির সময়ে বিশেষতঃ শবিনা খতমে যেরূপ দ্রুতবেগে কোর্‌আন পাঠ করেন তাহাকে প্রবল ঝটিকা কিম্বা ডাকগাড়ীর গতির সহিত তুলনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পক্ষান্তরে হজরত রসুলে করিম কিরূপভাবে কোর্‌আন পাঠ করিতেন তাহা আমাদের লক্ষ্যস্থল হওয়া আবশ্যক। এমাম এব্‌নে কইয়েম امام ابن قيم তৎপ্রণীত "জাদল-মাআদ" (زادالمعاد) গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হজরত রসুলে করিম এক একটী ক্ষুদ্র আয়ত এতই ধীর স্থিরভাবে চিন্তানিবেশ পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ পাঠ করিতেন যে তাহাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। হজরত এব্‌নে মস্‌উদ ও এব্‌নে আব্বাসের (র) মতে ধীরভাবে চিন্তানিবেশ পূর্ব্বক অল্প পরিমাণে কোর্‌আন পাঠ, অধিক পড়া অপেক্ষা পুণ্যার্হ।

الذين اتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به و من يكفر به
فاولئك هم الخسرون ط

২। আমি যাহাদিগকে স্বর্গীয় গ্রন্থ দান করিয়াছি তাহারা যথাযোগ্যরূপে তাহা পাঠ করিয়া থাকে, তাহারাই তৎপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। যাহারা তৎপ্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণীর লোক"।

এই আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যথাযোগ্যভাবে বিশেষ চিন্তানিবেশ পূর্ব্বক কোর্‌আন পাঠ করাই মোমেনের কার্য্য। হজরত রসুলে করিম (সঃ) বলিয়াছেন যে ভণ্ড ব্যক্তি (মুনাফেক) কোর্‌আন পাঠ করে, কিন্তু তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে না অথবা তদনুযায়ী আমল করে না তাহার দৃষ্টান্ত যথা তুলশী ফুল, তাহার গন্ধ ত বেশ সুমিষ্ট, কিন্তু তাহার আস্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। আবু হামজা একদা হজরত এব্‌নে আব্বাসকে বলিয়াছিলেন, আমি কোন কোন রাত্রি একবার কিম্বা একাধিকবার কোর্‌আন পাঠ শেষ করিয়া থাকি। হজরত আব্বাস প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, ঐরূপ কোর্‌আন পাঠ অপেক্ষা আমি একটী সুরা পাঠ করাই অধিক পুণ্যার্হ মনে করি।

فا قصص القصص لعلهم يتفكرون ط

৩। "তাহাদিগকে উপাখ্যানমালা শ্রবণ করাও, হয়ত তাহারা চিন্তা করিতে পারে"। অর্থাৎ কোর্‌আন শরিফে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের তিরস্কার স্বরূপ যে সকল উপাখ্যান মালা

বর্ণিত হইয়াছে, তাহা লোকদিগকে সাদরে শ্রবণ করাণ আবশ্যক। হয়ত জনসাধারণ সে সকল উপদেশ পূর্ণ উপাখ্যান শ্রবণে উপকৃত হইতে পারে। তাহারা সত্যানুসন্ধানের প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারে। বর্ত্তমান যুগে আমরা কোর্‌আন পাঠকালে যে সকল উপাখ্যান মালা শ্রবণ করিয়া থাকি তদ্দ্বারা কোনরূপ শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করিয়া থাকি কি ?

و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزيلا

৪। আমি কোর্‌আনকে অল্প অল্প পরিমাণে অবতারণ করিয়াছি, যাহাতে তুমি লোকদিগকে ঈষৎ স্থগিতভাবে তাহা পড়িয়া শুনাইতে পার। এজন্য ক্রমে ক্রমে তাহা অবতারণ করিয়াছি "। অর্থাৎ কোর্‌আন বুঝিবার জন্য ও জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্যই অবতারণ করা হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ না কোর্‌আন বুঝিতে চেষ্টা করেন, না বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন ! সুতরাং অধঃপতন অনিবার্য্য।

و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

" আমি অবশ্যই কোর্‌আনকে উপদেশ লাভ হেতু সহজ করিয়াই অবতারণ করিয়াছি, অতএব কোন উপদেশ গ্রহিতা আছে কি ? " যাহাতে জনসাধারণ কোর্‌আন দ্বারা সহজেই উপদেশ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য খোদাতাআলা কোর্‌আন শরিফকে অতি সহজ ভাবেই অবতারণ করিয়াছেন। সুতরাং কোর্‌আনের মর্ম্মোদ্ঘাটনে কাহারও বিশেষ কিছুই বেগ পাইতে হইবে না। দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান সময় আরবী ভাষা অনভিজ্ঞ লোকেরা ত বৎসর ছয় মাসে এক আধবার উর্দ্দু, বাঙ্গালা ও ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে কতকটা কোর্‌আনের অর্থউদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু আরবী শিক্ষাপ্রাপ্ত মৌলবী সাহেবদের অধিকাংশ লোকের ধারণা কোর্‌আনের অর্থোদ্ঘটন দুঃসাধ্য ব্যাপার হেকমৎ, ফলসফা, মন্তেক, বলাগৎ ও কলাম ইত্যাদি চৌদ্দ গণ্ডা বিদ্যা-বিশারদ না হইলে কোর্‌আন বুঝা মহা দায়। আরবী সাহিত্যে বেশ পারদর্শী অনেক মৌলবীর পক্ষেই নমাজে নিত্যপাঠ্য অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সুরাগুলির অর্থোদ্ঘাটন করাও বিষম সমস্যার বিষয়। খোদাতাআলা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন, তোমরা যাহাতে কোর্‌আন সহজে বুঝিতে পার তজ্জন্যই আমি অতি সহজভাবেই তাহা অবতারণ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মৌলবী সমাজ পরামর্শ করিয়াই যেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তাঁহারা কিছুতেই কোর্‌আনের অর্থ বুঝিবেন না। আঞ্জমনে হেমায়তল ইস্‌লামের বালিকা-বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্কা ছাত্রীরা ত উর্দ্দু অনুবাদের সাহায্যে কোর্‌আনের অর্থ বুঝিতে পারে, কিন্তু আমাদের মৌলবী সমাজ জমাত উলা পাশ করিয়াও কোর্‌আন বুঝিতে পারেন না এ সমস্যার সমাধান করা মহা দায়। জগতে সর্ব্ববিধ রোগের ঔষধ আছে, কিন্তু কল্পিত আতঙ্ক রোগের কোন ঔষধ নাই। বঙ্গদেশে অনেক বালিকা বিদ্যালয়েও উর্দ্দু ও বাঙ্গালা অনুবাদ সাহায্যে কোর্‌আনের অর্থ শিক্ষা প্রদানক্ষেত্রে সফলতা লাভ ঘটিয়াছে, কিন্তু মৌলবী সমাজের অবস্থা এখনও পূর্ব্ববৎ, তাহাদের কোর্‌আন বুঝিবার কোন [illegible] খোদাতাআলা আবিষ্কার করিলেন না !

افلم يدبروا القران ط

৬। তাহারা কি কোর্‌আন পাঠকালীন বিশেষরূপে চিন্তানিবেশ করেন না? অর্থাৎ বিশেষ মনোযোগ সহকারে কোর্‌আন পাঠ করা আবশ্যক।

ফল কথা কোর্‌আন শরিফে খোদাতাআলা যে ভাবে কোর্‌আন পাঠ করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়াছেন আমরা কি তদনুযায়ী কাজ করিতেছি? তদনুযায়ী কাজ করিতেছি না বলিয়াই ত আমাদের এই অধঃপতন।

কোর্‌আন শরিফ মানবজাতির জন্য কিরূপ উচ্চ আদর্শ ও উদার শিক্ষা বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক আমাদের মধ্যে বিরাজমান তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে এখানে একটীমাত্র আয়ত উদ্ধৃত করিয়াই আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব, যথা :—

واعبدوا الله و لا تشركوا به شيأ و بالوالدين احسانا و بذى القربى واليتامى والمسكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل و ما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا - الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل و يكتمون ما اتهم الله من فضله و اعتدنا للكفرين عذابا مهينا -

অর্থ—তোমরা খোদাতাআলার উপাসনা কর এবং তাঁহার সহিত অন্য কোন বস্তুকে অংশী করিও না। পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, অনাথ, দীন দরিদ্র, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবাসী, বন্ধু বান্ধব, প্রবাসী এবং দাস দাসী সকলের সহিত সদ্ব্যবহার কর। খোদাতাআলা অহঙ্কারী ও স্পর্দ্ধাকারী লোকদিগকে ভাল বাসেন না। যাহারা কৃপণতা করে, এবং লোকদিগকে কার্পণ্য অবলম্বন জন্য আদেশ করে ও তাহাদিগকে খোদাতাআলা যাহা (ধনরত্ন) নিজ করুণা দ্বারা দান করিয়াছেন তাহা লুক্কায়িত করিয়া রাখে, এরূপ অকৃতজ্ঞদিগের জন্য আমি (পরকালে) কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।

উপরোক্ত আয়ত দ্বারা খোদাতাআলা আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ শিক্ষা দান করিয়াছেন, যথা :—

১। একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা পরম করুণাময় সর্ব্বশক্তিমান খোদাতাআলা ব্যতীত তোমরা অন্য কাহারও উপাসনা করিও না, তিনি ব্যতীত তোমরা অন্য কাহারও নিকট করুণার ভিখারী ও সাহায্যের প্রত্যাশী হইও না। তিনিই একমাত্র বিশ্বজগতের সহায়-সম্বল, অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল। সুতরাং কোন পীর পয়গম্বর, ওলি দরবেশ, পার্থিব রাজা, নবাব কাহাকেও তোমরা প্রকৃত সহকারী বলিয়া বিশ্বাস করিও না, কারণ একমাত্র সেই খোদাতাআলাই যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতার কেন্দ্রস্থান। তাঁহার নিকট মানুষ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে মানুষের আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। হজরত বেলাল, আম্মারএয়াসর, বিবী সামিয়া, আবু ফকিহ, দাসী বোহায়না, জোনেরা, নেহ্‌দিয়া, উম্মে আবিন, হজরত

খোবায়ব, সোহায়েব, প্রভৃতি ছাহাবাগণ ভীষণ বিপদে নিপেষিত হইয়াও খোদাতাআলার প্রতি কিরূপ নির্ভর করিয়াছিলেন এবং কিরূপ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করুন, খোদাতাআলার প্রতি নির্ভর করা কাহাকে বলে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে হইলে প্রাথমিক যুগের মুসলমান নরনারী এবং মহাজের ছাহাবাগণের জীবনীর প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

২। আমরা যে পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে জন্মধারণ করিয়াছি, যাহাদের ক্রোড়ে পরম যত্নে লালিত পালিত হইয়াছি তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করা এবং তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করার জন্য তাকিদ করা হইয়াছে।

৩। পিতামাতা ছাড়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী, পথিক প্রবাসী, অনাথ ও দাসদাসী ইহাদের সকলের দুঃখ মোচন, তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকার সাধন একান্ত কর্ত্তব্য। জকাৎ, ছদকা, দান দক্ষিণা দ্বারা এবং শারীরিক ও মৌখিক যাহার সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব পর হয় তাহাই করিতে হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে তাদৃশ পরোপকার ব্রত, স্বদেশ প্রেম, স্বজাতিবাৎসল্য, প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও সাম্যবাদ নীতি বিদ্যমান আছে কি? কোর্‌আন যে উদার ও আদর্শ শিক্ষা আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছে, ছাহাবাগন, আনছারগণ জাতীয় সহানুভূতি, ভ্রাতৃভাব ও স্বজাতিবাৎসল্য এবং পরোপকারের যে সকল জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত কি আমাদের মধ্যে বিরাজমান আছে? নাই, নাই বলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা!

৪। অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধা যে নিতান্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কার্য্য তদ্বিষয় এই আয়তে আমাদিগকে সাবধান করা হইয়াছে। অহঙ্কারী গর্ব্বিত স্বভাবের লোক যে খোদাতাআলার শত্রু তাহা ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা এই শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারিব।

৫। ধনরত্ন থাকা সত্ত্বেও যাহারা কৃপণতা প্রকাশ করে, অপরকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয়, যাহারা খোদাপ্রদত্ত ধনরত্ন লুক্কায়িত করিয়া রাখে, পরদুঃখে কাতর হয় না, দীনদুঃখীদিগকে দান দক্ষিণা করে না, তাহারা নিশ্চয় পাপী। পরকালে নিশ্চয় তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

কোরআনের বহু মূল্যবান শিক্ষার মধ্যে উল্লিখিত আয়াতের কয়েকটী আদর্শ শিক্ষাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিতে পারিলে যে আমরা পুনরায় উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারিব তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাই বলি "কোরআনই উন্নতির সোপান"।

এসলামাবাদী।

মোস্তফা চরিতালোচনা।

সন্ধিভঙ্গ ও মক্কাভিযান।

(৭)

হোদায়বিয়ার সন্ধি। হজরত মোহাম্মদ যে অবধি মদিনায় গিয়াছিলেন, সে অবধি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র কাবা মন্দিরের মধ্যে গিয়া পুণ্যকর্ম্ম সমাপন করা, তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই; এমন কি মক্কা নগরের সীমা মধ্যেও তিনি পদার্পণ করিতে পান নাই। কাবাগৃহে পুণ্যকার্য্য করা ও হজ্জক্রিয়া সম্পন্ন করা, কোরআন শরিফের আদেশ। হজরত মোহাম্মদ মক্কারদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িয়া আসিতেছিলেন, অথচ সেখানে যাইতে পারিতেছিলেন না। কোরেশদিগের অত্যাচারের ভয়ই, তাহার একমাত্র কারণ। আরবদিগের এক প্রাচীন পদ্ধতি ছিল যে, বৎসরের মধ্যে রজব মাসে কিম্বা জিকায়দা, জিলহেজ্জা ও মহাররম, এই তিন মাসের মধ্যে, তাহাদের শত্রু মিত্র সকলেই বিনা বাধায় মক্কায় গিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিতে পাইত; ঐ চারি মাস যুদ্ধ করা, তাহাদের নিষিদ্ধ ছিল। অতএব হজরত মোহাম্মদ ঐরূপ সুযোগের সময়ে, কাবাশরিফের "জেয়ারৎ" করিবার মানসে ১৪০০ শত মুসলমানসহ ষষ্ঠ হিজরীর ৬ই জিকায়দা তারিখে মদিনা হইতে বাহির হইলেন। কাবাগৃহের জিয়ারৎ ও হজ্জকরণ ব্যতীত মুসলমানগণের অপর কোনই উদ্দেশ্য ছিল না এবং তখনকার প্রথা মত আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকের নিকটে এক একটী তরবারি ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র বা যুদ্ধোপকরণ অথবা যান বাহনাদি ছিল না।

কোরেশেরা মুসলমানগণের ঐ মক্কাগমনের সংবাদ পাইয়া ঈর্ষ্যা ও শত্রুতাবশে পূর্ব্ব-পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধনিষিদ্ধ সময়েও তাঁহাদের পুণ্যভূমি দর্শনে বাধা দিবার নিমিত্ত অস্ত্রধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিল। তাঁহারা যাহাতে মক্কার সীমার মধ্যে না যাইতে পারেন, তজ্জন্য কোরেশপক্ষ হইতে বীর কেশরী খালেদ (খালেদ বেন্ অলিদ) ও আবু জেহেলের পুত্র আকরমা সসৈন্যে তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে বাধা দিবার নিমিত্ত মদিনাভিমুখে দ্রুতপদে যাত্রা করিলেন। কিন্তু, মুসলমানেরা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিলেন; তাঁহারা অন্য এক দুর্গম পথে গমন করিয়া, বিনা বাধায় মক্কার অনতিদূরস্থিত "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে গিয়া পহুঁছিলেন। তথা হইতে একদিনে অনায়াসে মক্কা যাওয়া যাইতে পারিত।

হোদায়বিয়ায় উপস্থিত হইয়াই হজরত মোহাম্মদ, কোরেশদিগকে অবগত করিলেন যে, মুসলমানেরা, তাহাদের সহিত যুদ্ধ কামনায় মক্কা যাত্রা করেন নাই; কেবলমাত্র পুণ্যভূমি দর্শনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। অতএব, তাঁহাদের ঐ পুণ্যকার্য্যে কোরেশেরা যেন প্রতিবন্ধকতা না করে। কিন্তু কোপনস্বভাব কোরেশগণ সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং মুসলমানেরা

হোদায়বিয়া হইতে মক্কার দিকে একপদ অগ্রসর হইলেই, যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিল। হজরত মোহাম্মদ উভয় শঙ্কটে পড়িলেন। নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়, আর এতদূর আসিয়া পুণ্যকর্ম্ম না করিয়া কোরেশদের ভয়ে ফিরিয়া যাওয়াও অপমানজনক কার্য্য। এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়া তিনি, কোরেশদিগকে বুঝাইবার ও মানাইবার জন্য আপন জামাতা হজরত ওসমানকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। কেননা, মক্কায় তাঁহার অনেক সম্ভ্রান্ত আত্মীয় ছিল, তাঁহাদের সহায়তায় তিনি কোরেশদিগকে সহজে বুঝাইতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহাকে উক্ত দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। কিন্তু, ফল বিপরীত হইল—কোরেশেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইল। যুদ্ধের জন্য মক্কায় "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গেল—কোরেশ-দিগের রণদামামা বাজিয়া উঠিল—মুসলমানদিগের শোণিত পানের নিমিত্ত রাক্ষসপ্রকৃতি কোরেশকুলের রণ-পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল—ঘরে ঘরে দেব দেবীর পূজার ঘনঘটা—তাহার উপর কোরেশকুলবধূগণের মধুর কণ্ঠের উত্তেজনাদায়িনী সঙ্গীত-ধ্বনি, বীরপুরুষদিগকে মাত-ওয়ারা করিয়া তুলিল।

মুসলমানগণ বিপদাপন্ন হইলেও ভগ্ন-সাহস হইলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব সম্বল এক একটী তরবারি হস্তে তাঁহাদের নেতা, ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র কর স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "কোরেশ, মুসলমানের এক প্রাণীকে স্পর্শ করিলেই এই ১৪শত তরবারি একেবারে কৃপাণমুক্ত হইবে—একেবারে কোরেশকুলের উপরে পড়িবে। ধর্ম্মবলই এস্‌লামের সহায়—এই ধর্ম্মবলের নিকটে কাপুরুষ কোরেশকুলের বাহুবল—অবিলম্বে হতবল হইবে। কোরেশকুল আজ এস্‌লামের তরবার-তেজে নির্ম্মূল হইবে। আজই এস্‌-লামের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা, মক্কার তোরণদ্বারে সগর্ব্বে উড্ডীন হইবে।" মোসলেম বীরবৃন্দের ঐরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞায় হজরত মোহাম্মদ অতিশয় আনন্দিত ও বর্দ্ধিত-সাহস হইলেন। তখনই ১৪শত বীরের ঐকতানিক "আল্লাহো-আকবর" নিনাদে হোদায়বিয়া প্রান্তর কাঁপিয়া উঠিল।

মুসলমানগণের ঐ অটল প্রতিজ্ঞার সংবাদ বায়ুবেগে মক্কার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। কোরেশেরা বুঝিল, মুসলমানেরা নিরস্ত্রতার ভান করিয়া তাহাদের মন বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে, বাস্তবিক তাঁহারা সশস্ত্র ও সসজ্জ। নচেৎ কোন্ সাহসে তাঁহারা ঐরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল? কোরেশদলনায়ক আবু সুফিয়ান, বারংবার মদিনা আক্রমণ করিতে গিয়া মুসলমান বীরের রণ-প্রতাপের পরিচয় পাইয়াছিলেন; সেই মুসলমান আজ মক্কা আক্রমণে বা অবরোধে উদ্যত; ব্যাপার অতিশয় গুরুতর। তিনি তাড়াতাড়ি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

সন্ধির প্রস্তাবে কোরেশদিগের সমস্ত সুবিধা ও মুসলমানদিগের সমস্তই অসুবিধা ছিল। অনেক বাদ প্রতিবাদের পর অন্যান্য সর্ত্তসহ নিম্নলিখিতরূপ সর্ত্ত সকল ও উভয় পক্ষের মনোনীত ও স্বীকৃত এবং সাক্ষরিত হইল। সন্ধির সর্ত্ত, যথা:—

(১) এ বৎসর মুসলমানেরা মক্কায় প্রবেশ করিতে পাইবেন না।

(২) মুসলমানেরা আগামী বর্ষে কেবল কাবাশরিফে পুণ্যকর্ম্ম জন্য মক্কায় আসিবেন। কিন্তু, প্রত্যেকে আত্মরক্ষার জন্য একটীমাত্র তরবারি ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র বা যুদ্ধোপকরণ আনিতে পাইবেন না এবং তিন দিবসের অধিককাল মক্কায় থাকিতে পাইবেন না।

(৩) এ বৎসর হইতে দশ বৎসরকাল উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইবে না।

(৪) কোন আরব সম্প্রদায়, কোরেশদিগের দলভুক্ত হইতে চাহিলে, মুসলমানেরা তাহাতে বাধা দিবেন না এবং আরবের কোন সম্প্রদায় মুসলমানদিগের দলভুক্ত হইতে গেলে, কোরেশরাও তাহাতে বাধা দিবেন না।

(৫) কোরেশদিগের কোন লোক, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে মদিনায় পলাইয়া গিয়া মুসলমান হইলেও, হজরত মোহাম্মদ তাহাকে কোরেশদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন।

(৬) কিন্তু, কোন মুসলমান কোরেশদিগের সহিত মিলিলে, তাঁহারা তাঁহাকে মুসলমান দিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন না।

(সন্ধির সন ৬ষ্ঠ হিজরী—৬২৮ খৃঃ অঃ।)

সন্ধির ঐ সর্ত্তগুলি সাধারণতঃ মুসলমানগণের অসুবিধাজনক বোধ হওয়ায় হজরত ওমর ও হজরত আলি প্রমুখ বীরপুরুষগণ প্রথমতঃ সন্ধিতে সম্মত ছিলেন না। হজরত আলি ঐ সন্ধিপত্রের লেখক ছিলেন; আপত্তিজনক সর্ত্তগুলি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে লিখিতে হইয়াছিল। সন্ধিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পর, হজরত মোহাম্মদ উহার ভাবী শুভফল সকল, মুসলমানদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ায় সকলেই বিপুলানন্দ লাভ করিলেন।

সন্ধিসর্ত্ত সমালোচনা। (১) প্রথম সর্ত্তে মুসলমানেরা মক্কা প্রবেশ করিতে পাইলেন না; ইহাতে হজরত মোহাম্মদের শান্তিপ্রিয়তার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করা হইল। (২) দ্বিতীয় সর্ত্তে পুণ্য কার্য্য করাই যখন মুসলমানগণের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন প্রত্যেকের একাধিক তরবারি বা অন্য অস্ত্রশস্ত্র আনিবার কিম্বা তিন দিবসের অধিককাল মক্কায় অবস্থিতি করিবার কোন দরকার ছিল না। (৩) তৃতীয় সর্ত্তে দশ বৎসরকাল কোরেশে ও মুসলমানে যুদ্ধ স্থগিত থাকিলে, কোরেশদল এস্লামের মহত্ব ও নীতি শিখিতে অবসর পাইবে—(মুসলমানেরা বৎসরে যে তিন দিবসকাল মক্কায় থাকিতে পাইবেন, তৎকালের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারে বক্তৃতা করিতে বাধা হইবার সর্ত্ত সন্ধিপত্রে ছিল না;) তদ্দ্বারা তাহাদের অনেকে এস্লাম গ্রহণ করিবে। যদি তাহাও না হয়, তাহা হইলে যেরূপ তীব্রগতিতে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া যাইতেছিল, তাহাতে ১০ বৎসরের মধ্যে বিপুল বল সঞ্চয়ের সম্পূর্ণ আশা ছিল এবং শান্তির সহিত অবস্থিতি করিয়া জাতীয় ও সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী বিবিধ চেষ্টা করিবারও সুযোগ সুবিধা ছিল। (৪) চতুর্থ সর্ত্তের প্রথমাংশে পৌত্তলিক আরবমাত্রই

মুসলমানদিগের শত্রু ; তাহারা একত্র হওয়া না হওয়া একই কথা ; বরং শেষাংশ কোরেশ-দিগের ক্ষতিজনক ও মুসলমান বলবৃদ্ধির পক্ষে সুবিধাজনক। (৫) পঞ্চম সর্ত্তে যদি কোন কোরেশ, মুসলমান ধর্ম্মের বিমল আলোক মালায় উদ্ভাসিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কোরেশদিগের মধ্যে অতি সহজে এস্লামধর্ম্ম প্রসার লাভ করিবে—কত কোরেশ আপনা হইতে এস্লামধর্ম্মে-প্রাণ-মন সমর্পণ করিবে। (৬) ষষ্ঠ সর্ত্তের উল্লেখ মত যদি কোন মুসলমান কোরেশগণের সহিত মিশিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে এস্লামের পরম শত্রু ; তেমন অবস্থায় সেই শত্রুকে টানিয়া আনা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য ; বরং তেমন শত্রু মুসলমানের মধ্যে না থাকাই ভাল।

ঐ সন্ধি সর্ত্তগুলির দ্বারা হজরত মোহাম্মদের এক দিকে যেমন শান্তিপ্রিয়তা, অন্যদিকে তেমনি দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু, এখনকার মুসলমান জননায়ক বা মণ্ডল মাতব্বরদিগের অনেকেই দ্বন্দ্বপ্রিয় এবং নিজের খামখেয়ালী জেদ বজায় রাখিবার জন্য সামাজিক বা বৈষয়িক বিবাদের সন্ধিতে নারাজ হইয়া গোস্বাভরে গরজাইয়া হোঁকাই (?) ছুঁড়িয়া ফেনায়মান মুখে অপর পক্ষের মাথায় লাঠি মারিয়া ফৌজদারীতে আসামী হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হন এবং শেষে শ্রীমন্দিরে বাস করেন। তাঁহারা মুসলমান বলিয়া দাবী করেন ; অথচ মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও পথপ্রদর্শক হজরত মোহাম্মদ যেরূপভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, ও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেরূপভাবে চলিতে চাহেন না। মুসলমান যদি আপন পয়গম্বরের মতে ও তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিত, তাহা হইলে এত অধঃপাতে যাইত না।

যাহা হউক, উভয় পক্ষে সন্ধিপত্র স্বীকৃত হইলে, হজরত ওসমান বন্ধনমুক্ত হইলেন। হজরত মোহাম্মদ সখা ও শিষ্যবর্গকে লইয়া সানন্দে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন।

মুসলমানের মক্কা যাত্রা। (সপ্তম হিজরার জি কায়াদামাস—৬২৯) হোদায়বিয়ার সন্ধির পর বৎসর, হজরত মোহাম্মদ দুই হাজার সুহৃদ ও শিষ্য সমভিব্যাহারে মক্কা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সন্ধিসর্ত্ত-অনুসারে প্রত্যেকে এক একটী তরবারি লইলেন ; আর কোনই অস্ত্র তাঁহাদের সঙ্গে থাকিল না। যথা সময়ে তাঁহারা মক্কা প্রবেশ করিলেন ; কোরেশগণের কেহই তাহাতে আপত্তি করিল না। মুসলমানেরা তিন দিবসের অধিককাল, তথায় অবস্থিতি করিলেন না। কিন্তু, এই তিন দিবসের মধ্যেই, অধিবাসিগণের অনেকেই মুসলমানগণের সদাচার, সদ্ব্যবহার, বিনয়, নম্রতা, ধর্ম্মে-একাগ্রতা, পরদুঃখ কাতরতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহ-সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। মুসলমানগণ মদিনায় ফিরিয়া গেলে, মক্কার অনেকেই তথায় গিয়া ধর্ম্মগুরুর নিকটে এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। যিনি কোরেশকুলের বীরেন্দ্র কেশরী, যাঁহার রণকৌশলে ও বাহুবলে ওহদযুদ্ধে মুসলমানদিগকে ভয়ঙ্করভাবে পরাজিত হইতে হইয়াছিল, সেই খালেদবেন্ ওলিদ এবং যে ওস্মান বেন্ তালহার নিকট কাবাশরীফের দ্বারের কুঞ্জিকা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত হইত তিনি, বীরকুল চূড়ামণি আমর্ বিন্ আস্, এই তিন জনে এই সময়ে এক

সঙ্গে মদিনায় গিয়া হজরত মোহাম্মদের পবিত্র চরণতলে দেহ মন সমর্পণ করিয়া স্বেচ্ছায় এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

কোরেশদের সন্ধিভঙ্গ ও মক্কাভিযান। (৮ম হিজরীর রমজান মাস—৬৩০ খৃঃ অঃ।) হোদায়বিয়ার সন্ধির পর আরবের বণিখোজায়া সম্প্রদায় এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানগণের সহিত প্রতিজ্ঞা সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল এবং বনু বকর সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা সূত্রে কোরেশকুলে মিলিত হইয়াছিল। ঐ বনি খোজায়া ও বনু বকর, এই উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বহুকাল হইতে বিবাদ, বিসম্বাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার উপর বনিখোজায়া হালে এস্‌লাম গ্রহণ করায় তাহারা অপর সকল সম্প্রদায়েরই চক্ষুঃশূল হইয়াছিল।—নিকটে তাহাদের সহায়তা করিবার কোন লোকই ছিল না। এই সুযোগে পূর্ব্ব মনোমালিন্য সূত্রে বনুবকর সম্প্রদায়, তাহাদের উপর চড়াও করিয়া যুদ্ধ বাধাইল। কোরেশেরা ভিতরে ভিতরে বনুবকরকে অস্ত্র সাহায্য করিল এবং অনেকে মুখ ঢাকা দিয়া বনুবকরের দলে মিশিয়া বনিখোজায়াদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। ঐ উভয় দলের সম্মিলিত বলের নিকট বনিখোজায়া হতবল হইয়া, অনেকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। অবশিষ্টেরা পলায়ন করিয়া কাবাশরিফের ভিতরে আশ্রয় লইল। ঐ পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরের ভিতরে যুদ্ধ করা আরবের সকল সম্প্রদায়েরই চিরকাল নিষিদ্ধ থাকা স্বত্বেও, বনুবকর ক্রোধবশে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বনিখোজায়ার অনেককে মারিয়া ফেলিল? অতএব, তাহাদের প্রধানবর্গ নিরুপায় হইয়া মদিনায় সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল।

প্রতিজ্ঞাপত্র অনুসারে হজরত মোহাম্মদ বিপন্ন মুসলমানের সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। তিনি বনিখোজায়ার দুরবস্থার ও লাঞ্ছনার বিষয় অবগত হইবামাত্র, তাহাদের উদ্ধার ও সন্ধি-সর্ত্তভঙ্গকারী কোরেশদিগের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। মদিনার মুসলমান-মহলে মক্কাভিযানের ধূম পড়িয়া গেল—বার হাজার মোসলেম বীর রণবেশে সাজিয়া হজরত মোহাম্মদের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইলেন।

বনিখোজায়া মদিনার সাহায্যভিখারী হইয়াছে শুনিয়া, কোরেশকুলপতি আবুসুফিয়ান, তাড়াতাড়ি মদিনায় গিয়া পুনরায় নূতন সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু, কেবল ছল করিয়া মুসলমানদিগকে মক্কাভিযানে ক্ষান্ত রাখাই ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল, এজন্য হজরত মোহাম্মদ তাহাতে সম্মত হইলেন না—বনিখোজায়াকে বিধর্ম্মীদিগের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকিলেন। চাল খাটিল না দেখিয়া আবুসুফিয়ান মক্কাপানে ফিরিয়া গেলেন।

১০ই রমজান—হজরত মোহাম্মাদ ১২ হাজার মোসলেম বীর লইয়া মদিনা হইতে "কুচ" করিলেন? মারেরাজ্জ্‌হরান নামক ময়দান, মক্কার চারিক্রোশ দূরে অবস্থিত; মুসলমান বীরবৃন্দ ঐ ময়দানে গিয়া "খিমা ঝাণ্ডা" খাড়া করিলেন। বহুদূর পর্য্যন্ত সেই খিমা বা ইদ্দিরি শ্রেণী

বিস্তৃতভাবে বিন্যস্ত হইল; ১২ হাজার শিবিরে—প্রান্তর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাত্রি-কালে সে শোভা আরও বর্দ্ধিত হইল। প্রত্যেক শিবিরের সম্মুখভাগে হজরত মহম্মদের আদেশে এক একটী বৃহদালোক প্রজ্বলিত হইল; সেই আলোকমালায়—মরুময় প্রান্তর আলোকিত হইল—বিঘোরা তামশী-নিশী, সে আলোক প্রভাবে সৌন্দর্য্যশালিনী হইল।

এ দিকে কোরেশেরা মুসলমানগণের গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। তাঁহারা নিকটাগত শুনিয়া কতিপয় কোরেশনেতা, গভীর রজনীতে মক্কার বাহির হইয়া, এক পর্ব্বতের উপর হইতে মারের্রাজ্‌জাহরান প্রান্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, কালানলের ন্যায় মহানলে ময়দান ধূধূ করিতেছে—সে অনল তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া কখনও উপর দিকে উঠিতেছে—কখনও বা বায়ুবেগে ময়দানের সীমা পার হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভয়ে পর্ব্বতস্থিত কোরেশকুল কাঁপিয়া উঠিল—মুখে ধূলি উড়িল—জিব শুখাইয়া গেল—হাত অবশ হইল—পা আর চলে না—"কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এ ভীষণ কালানলে মক্কা ছারখার হইবে—কোরেশকুল নির্ম্মূল হইবে—লোহিত সাগর, আরব সাগর, এবং পারশ্যসাগরের জল-রাশি একত্র হইলেও, এ অনল নির্ব্বাপিত হইবে না! কেন সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিলাম—না বুঝিয়া কেন কাল সর্প স্পর্শ করিলাম!" আবুসুফিয়ান এইরূপ অনুতাপ ও আক্ষেপ করিতে-ছেন, এমন সময়ে সেই নিশীথ নিস্তব্ধ পর্ব্বতবক্ষ ভেদ করিয়া ধ্বনি হইল, "কাপুরুষ কুলাঙ্গার কোরেশ! মুসলমান, সমরে কালানল—সন্ধিতে শীতল জল।" আবুসুফিয়ান চিনিলেন, উহা হজরত আব্বাসের কণ্ঠধ্বনি। এই হজরত আব্বাস, ধর্ম্মগুরু মহাত্মার খুল্লতাত। কোরেশদিগকে আত্ম সমর্পণের উপদেশ দিবার জন্য ইনি মুসলমান শিবির হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবার কোরেশদের আর তেমন বল ছিল না যে, যেমন ভাবে তাহারা হজরত ওসমানকে বন্দী করিয়াছিল, হজরত আব্বাসের প্রতি তেমন ব্যবহার করিবে। বরং তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া কোরেশ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

আবুসুফিয়ান তৎক্ষণাৎ হজরত আব্বাসকে সহায় করিয়া, মুসলমান-শিবিরাভিমুখ হইলেন এবং প্রভাতে হজরত মোহাম্মদের নিকটে গিয়া বিনীতভাবে এস্‌লাম গ্রহণ করিলেন। এত-দিনে কোরেশদিগের বিষ দাঁত ভাঙ্গিল। এই মহাপ্রভুই, মুসলমান-কোরেশে যুদ্ধ বাধিবার আদি কারণ। কোরেশকুলপতি প্রকৃত শিষ্যের ন্যায় অবনত মস্তকে গুরু সমীপে দণ্ডায়মান; যে সিংহের ভীষণ গর্জ্জনে মুসলমানকুল ভয়াকুল ও সর্ব্বদা সসব্যস্ত থাকিতেন, তিনি আজ নিরীহ মেষ শাবকের মত মুসলমান শিবিরে দণ্ডায়মান। হজরত মোহাম্মদ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বীর কেশরী! মুসলমান একদিন অতি দীনবেশে রাত্রের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া, স্বর্গসদৃশী গরীয়সী জন্মভূমি হইতে চোরের মত পলাইয়া গিয়াছিল, আজ তাহারা সর্ব্বসমক্ষে দিবালোকে বীরবেশে সেই জন্মভূমি প্রবেশ করিবে! অতএব, আপনি নগরে গিয়া প্রচার করুন, মক্কা মুসলমানের দখলে আসিয়াছে—মুসলমান আজ নগর প্রবেশ করিবে—মুসলমান, জন্মভূমি এবং পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র, অকারণে নরশোণিতে কলঙ্কিত

করিতে চায় না। যাহারা আপনার আলয়ে আশ্রয় লইবে, বা নিজ নিজ বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিবে, অথবা কাবামন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিবে কিংবা মুসলমানদিগকে দেখিবা-অস্ত্র ত্যাগ করিবে, মুসলমানেরা তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না। কিন্তু, যাহারা নগর প্রবেশে বাধা দিবে, মুসলমানেরা তাহাদের এক প্রাণীকেও জীবিত ছাড়িবে না।" আবু-সুফিয়ান মক্কায় গিয়া অবিলম্বে ধর্ম্মগুরুর ঐ আদেশ প্রচার করিলেন।

এদিকে মুসলমানেরা হজরতের আদেশে দলে দলে বিভক্ত হইয়া মক্কাকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে নগর প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা হজরত মোহাম্মদের তখন সেদিন মনে হইল, যে দিন রাত্রে কোরেশকুল-কলঙ্ক পাষণ্ডেরা তাঁহার প্রাণবধের উদ্যোগ করায়, তিনি নিভৃত নিশীথে প্রাণ প্রতিম খুল্লতাত ভ্রাতা হজরত আলিকে নিজের বিছানায় নিজের চাদর ঢাকা দিয়া রাখিয়া গুপ্তপথে গৃহ বহির্গত হইয়া চুপে চুপে হজরত আবুবকরকে লইয়া মক্কা হইতে বাহির হইয়াছিলেন—নিঃসম্বল, সঙ্গে একটী কপর্দ্দকও ছিল না! মক্কার বাহির হইয়া অনুসন্ধানী কোরেশকুলাঙ্গারদিগের ভয়ে তিন দিবস সাওর পর্ব্বতের গহ্বর মধ্যে লুকাইয়া থাকাও মনে হইল! সাধারণ গম্যপথে না গিয়া ভয়ে ভয়ে দুর্গমপথে অনাহারে, শুষ্কমুখে মলিনবেশে মদিনার দিকে পলায়ন, তাহার উপর কোরেশ অনুসন্ধানীর তদবস্থায় আক্রমণ, সকলই মনে পড়িল! আট বৎসর পূর্ব্বের সেইভাবের মক্কা ত্যাগ, আর অদ্যকার এইভাবের মক্কা প্রবেশ—মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মহাপুরুষের দুইচক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া ক্রমে গণ্ড বাহিয়া চলিল! তখনই ভক্তিগদ্গদচিত্তে, "হে আল্লাহতায়ালা! আজ তোমারই কৃপায়—তোমার এ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দীনহীন দাসের—এ সৌভাগ্য; তোমার দাস—তোমারই গৌরবে আজ গৌরবান্বিত;" এই বলিতে বলিতে মস্তকাবনত করিয়া সেই অনন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উদ্দেশে 'সেজদা' করিলেন। "তুমি সত্য, তুমি সত্যপথ প্রদর্শক—সত্যের সহায়! সত্যধর্ম্ম আজ সহস্র সূর্য্যকিরণের ন্যায় প্রকটিত; 'ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়,' এই মহতীবাণীর সার্থকতা আজ সম্পাদিত হইল। তোমার এই অধীন দাসকে শত সহস্র বিপদ হইতে নিজ কৃপাবলে উদ্ধার করিয়া, তাহার জন্মভূমিতে আনিলে—তুমি সর্ব্ব শক্তিমান—সর্ব্বশক্তিদাতা, তুমি দুর্ব্বলের বল—অসহায়ের সহায়! সামান্য কীটানুকীট দাস আমি—তোমার অশেষ গুণকীর্ত্তণ করি কি রূপে?" ইত্যাদি বলিয়া বিনীতভাবে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

এদিকে একমাত্র খালেদ ব্যতীত অপর দলপতিগণ সদলবলে শান্তির সহিত নগর প্রবেশ করিলেন; তাঁহাদের প্রবেশপথ-পার্শ্ববর্ত্তী নাগরিকগণ দ্বাররুদ্ধ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিল। কিন্তু, সহস্র সৈন্যের সেনাপতি হইয়া মহাবীর খালেদ দক্ষিণভাগ দিয়া নগর প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই ভাগেই প্রধান মোসলেম শত্রুর বসতি ছিল; পাতকী আবুজেহেলের পুত্র দুষ্টমতি আকরমা, কয়েক সম্প্রদায় দুর্দ্ধর্ষ আরব লইয়া তাঁহার পথ রোধ করিল। খালেদ তখন ভীষণ গর্জ্জনে নগর কম্পিত করিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপর পতিত হইলেন।

উভয়পক্ষে অল্পক্ষণ যুদ্ধ হইল—মুসলমানপক্ষে দুইজন শহিদ (ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত) হইলেন, শত্রুপক্ষের ২৮শ জনের প্রাণবায়ু, মুসলমানের-অসি প্রহরণে কোন্‌দিকে উড়িয়া গেল। আকরমা ভীতি বিহ্বলচিত্তে পলায়ন করিল—তৎক্ষণাৎ তাহার দল ছত্রভঙ্গ হইয়া কে কোন্‌দিকে ছুটিয়া গেল। পথ মুক্ত হইল। খালেদ সেই মুক্তপথে অবলীলাক্রমে নগর প্রবেশ করিয়া হজরত মোহাম্মদের পদতলে উপস্থিত হইলেন। মক্কা শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল—কোনদিকে একটীমাত্রও শব্দ নাই—অধিবাসিবর্গ নীরব নিস্তব্ধ; মক্কার সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে মুসলমানের "আল্লাহো-আকবর" এই মহান্ ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া নগরের চতুর্দ্দিকে একেশ্বরবাদের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। এস্‌লামের বিজয় বৈজয়ন্তী পত-পত নাদে মক্কার তোরণদ্বারে উড়িতে লাগিল।

বনি খোজায়া বিপন্ন ও হতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল, তাহাদের উদ্ধার হইল। এই বনি খোজায়ার উদ্ধারের জন্যই হজরত মোহাম্মদ কোরেশদিগের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান অভিযান করিয়াছিলেন। তাহাদের উদ্ধার করিয়া তিনি স্বজাতিপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন এবং যাত্রার শুভফল স্বরূপে মক্কা তাঁহার অধিকৃত হইল। মক্কার পূর্ব্বাবস্থা তিরোহিত হইল—পাপরাশির পরিবর্ত্তে পুণ্যস্রোত তরতর বেগে প্রবাহিত হইল। সেই পবিত্র পুণ্যস্রোতে অবগাহন ও সন্তরণ দ্বারা পাপাচারীদিগের পাপরাশি পরিধৌত হইয়া গেল।

মক্কার অধিবাসিগণের ধন, প্রাণ, সম্মান, সম্ভ্রম সমস্তই অক্ষুণ্ণ থাকিল। মুসলমানেরা কাহারও বাড়ী প্রবেশ বা লুণ্ঠন কিম্বা কাহারও প্রতি বল অথবা কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিলেন না। অধিবাসিবর্গ দলে দলে নতমস্তকে হজরত মোহাম্মদের নিকট সমবেত হইতে লাগিল; তিনি তাহাদের সকলের প্রতি সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের হস্তে পূর্ব্বে তাঁহার যে লাঞ্ছনা হইয়াছিল, তাহা উত্থাপন করিয়া তাহাদিগকে লজ্জিত করিলেন না। আবুসুফিয়ানের পত্নী হেন্দ—হজরত হামজার মৃতদেহের উপর অত্যাচার করায়, হজরত মোহাম্মদ তাহার উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন—সে বিনম্রভাবে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল—অপর ৬জন পুরুষ ও তিনটী স্ত্রীলোকের প্রতি তিনি মক্কা প্রবেশের পূর্ব্বে, প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। ঐ পুরুষগণের মধ্যে তিন জন ও স্ত্রীলোকগণের মধ্যে দুইটী, উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায়, তাহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী থাকিলেও, তিনি দয়া পরবশ হইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। যে তিনটী অপরাধী পুরুষ ও একটী অপরাধিনী স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল না বা ক্ষমা প্রার্থনা করিল না, মুসলমানেরা অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাদের প্রাণবধ করিলেন। হজরত মোহাম্মদের বিধান ছিল যে, স্ত্রীলোক, হত্যাপরাধে অপরাধিনী সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতা হইবে; অন্যকোন অপরাধে বা কারণে স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ড হইবে না। এজন্য ঐ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতা স্ত্রীলোকটী হত্যাপরাধে অপরাধিনী বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করিয়াছেন। দণ্ডিত পুরুষত্রয়ের মধ্যে দুইজন হত্যাপরাধে ও অপর একজন অন্যদণ্ডে প্রাণদণ্ডার্হ থাকা, ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে সাব্যস্ত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

আবদুল লতিফ্।

ইস্‌লামের ধারা।

এই যে বিশ্বভুবন জীব ও উদ্ভিদের নানা বর্ণচ্ছন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অসীম সুষমায় প্রকাশ পাইয়াছে—এই অনন্ত পশু, পতঙ্গ, তরু, বিহঙ্গ, এই শত ধর্ম্ম শত ভাষার মানুষ, এই অসীম বৈচিত্র্য মূলে এক চরম ঐক্য সূত্রের নিদর্শন আছে। জড় প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ শুধু সহানুভূতি নহে, জড় ও জীবের জীবনধারাও একই ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে। এই চেতনাহীন বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের রস-রক্তের সম্বন্ধ আছে। কি এক গভীর সুমহান ঐক্যসূত্র যেন এই বিশাল ধরণীর মূলে অন্তঃসলিল ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত হইয়া তাহাকে অন্তহীন বিচিত্র সুষমায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

এই যে মহাকাল দিন রাত্রির পদক্ষেপ করিয়া তালে তালে গমন করিতেছে, এই যে নিয়মিত ঋতু পর্য্যায়ও ফুল ফসলের প্রবাহ, এই সকলের মধ্যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য-পিপাসার পরিচয় আছে। বিশ্বব্যাপী জলধারা নানা পথ বহিয়া সাগরে পড়িতেছে; নির্ঝরিণী তরঙ্গিনীতে অঙ্গ মিশাইতেছে, তটিনীমালা তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে সাগরে ছুটিতেছে; জীব তরু ও গিরি মরুর বিপুল বৈচিত্র্য বক্ষে লইয়া এই বিশাল ধরা ও নানা কক্ষচারী গ্রহরাজি নানা পথে একমাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; শত শত সূর্য্য লক্ষ লক্ষ গ্রহ লইয়া মহা সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতেছে; অনন্ত অম্বরে অনন্ত জ্যোতিষ্ক ঐক্যতানে নৃত্য করিতে করিতে অনন্তের বন্দনা করিতেছে ;—, কোথায়ও কোন বিরোধ নাই, বৈষম্য নাই; সমস্ত একই আকর্ষণে আকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশের মধ্যে ঐক্যসূত্র পরিষ্কাররূপে প্রকাশমান।

এই ঐক্যপিপাসা মানব প্রকৃতিতেও সমভাবে বিদ্যমান আছে। সুতীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ মানুষের অন্তরের ধর্ম্ম, রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনকে অন্তহীন বৈচিত্রে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আপনাকে অন্যের মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে মানুষ কিছুতেই প্রস্তুত নহে। মানুষ বুঝিতে চায়, দেখিতে চায়, দেখাইতে চায়, সে স্বতন্ত্র, সে কিছু, তাহার আসনে সে গরীয়ান্ সম্রাট। তথাপি মানুষ ইহা করিতেছে—স্বীয় সুখ-স্বার্থ সংহত করিয়া পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে; স্বাতন্ত্র্য মুখী আত্মবোধ অতিক্রম করিয়া সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র সৃজন করিতেছে; গিরি নদীর গণ্ডি কাটিয়া ধর্ম্মের মণ্ডলী গড়িতেছে। সাহিত্যের স্বাদ, জ্ঞানের প্রসার, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও মনিষীর চিন্তা, দিন দিন মানুষ হইতে মানুষের দূরত্ব হ্রাস করিয়া আনিতেছে। নানা দেশে ও নানা ভাষার মানুষ নানা সংঘর্ষের মধ্যে দিয়া একমাত্র বিশ্বমানবতারদিকে পদক্ষেপ করিতেছে। মানুষের মধ্যকার সমস্ত ভেদ ও বিসম্বাদ নষ্ট করিয়া এক মহা রাজচ্ছত্র তলে মহামানব মণ্ডলী গড়িবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের

অন্তরে চিরকাল জাগ্রত রহিয়াছে। এমন একদিন আসিবে যখন সমস্ত স্বার্থদ্বন্দ্ব ও ধর্ম্মবিদ্বেষ ঘুচিয়া যাইবে, পাপতাপের অবসান হইবে, এবং এক ধর্ম্মের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়া মানুষ পৃথিবীতে প্রেমের শান্তিময় স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিবে। মানুষ চিরকাল ধরিয়া এই চরম ঐক্যের আশায় তাকাইয়া আছে।

গ্রহচক্রের আবর্ত্তন ও ধরণীর সর্ব্বত্র সলিল সঞ্চরণের সহিত মানবদেহের রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমন্তের জড়ত্ব ভাব ও বসন্তের যৌবনানন্দ জীব ও বিশ্বদেহে একই প্রকারে প্রকাশিত হয়। তরুলতার প্রাণ আছে ইহাই মাত্র সত্য নয়, তাহাদেরও সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে, পরিশ্রমের পর বিশ্রামের চিরন্তন নিয়মে মানুষের ন্যায় তাহারাও নিদ্রা যায়। অরুণের নবালোকে কেবলমাত্র জীব সকলই নবোল্লাসে জাগিয়া উঠে না, বৃক্ষের পত্রে পত্রে; ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নবজীবনের হিল্লোল উঠে। নিশাগমে যে বিরাম আসে তাহা কেবল জীবের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে না, তাহার মায়াস্পর্শে সমীরণ মন্দ হইয়া আসে এবং বৃক্ষের পত্রে পত্রে ঢুলিতে ঢুলিতে একেবারে নীরব হইয়া পড়ে; সমস্ত জগত সুপ্তি মোহে অসাড় বলিয়া অনুমিত হয়। মেঘাচ্ছন্নদিনে প্রকৃতির বিষন্নতা মানবমনেও ছায়া বিস্তার করে—সজল মেঘেরতলে মানুষের মনও কিসের ব্যথায় উদাস হইয়া উঠে। যে কারণে ভূমি-কম্প ও ঝঞ্ঝা দুর্য্যোগে বিশ্ববক্ষে বিপ্লব বাধে, সেই একই কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবে মানব জগতেও বিপর্য্যয় ঘটে, একই রুদ্ধশক্তির সংক্ষোভে জড় প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি আলোড়িত হয়।

মূলে বহিঃ প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির নিগূঢ় ঐক্য আছে—রস-রক্তের সম্বন্ধ আছে। এক সুমহান ঐক্যসূত্র বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির মূলে বিদ্যমান আছে। জীব ও জড়, চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থের মধ্যে ঐক্যের সনাতন মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে। যাহা ভাবুকের অনুভূতির বস্তু ছিল, তাহা বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে। এই বিশ্ব চরম ও পরম একের বিকাশ ও বিলাস; তাহাকে লাভ করিবার জন্য বিচিত্রবিশ্ব মূলে মূলে ঐক্যের সাধনা করিতেছে।

প্রকৃতির মূলীভূত এই চরম ঐক্যসূত্রের সহিত ইস্‌লামধর্ম্মের মূল ধারার চমৎকার মিলন আছে। প্রকৃতির প্রাণের মূলে যে মন্ত্রের রাগিনী বাজিতেছে, ইস্‌লামধর্ম্মে সেই ঐক্যের সুমহান ঝঙ্কার উঠিয়াছে। প্রকৃতির প্রাণগত এই চরম ঐক্যসূত্রই ইস্‌লামধর্ম্মের মূল ধারা, ইস্‌লামধর্ম্মের প্রাণ ও সাধনা, তাহার সর্ব্বাবয়বে এই ঐক্যেরই অনুপ্রাণনা। যে চরম ও পরম এক জীব ও জড়, মূক ও মুখরকে একসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই বিরাট একত্বের সাধনাই ইস্‌লামধর্ম্মের চরম লক্ষ্য।

কিন্তু মানুষের মধ্যে যেমন ঐক্য লিপ্সা আছে, তেমনি স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিরও ক্রিয়া আছে। ঐক্য যেমন প্রকৃতির ধর্ম্ম, বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যও তেমনি স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রকৃতিতে এই উভয়েরই সত্বা ও বিকাশ আছে। কিন্তু বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা ঐক্য গভীর ও বৃহত্তর; স্বাতন্ত্র্যে

বিকাশ ও ব্যাপ্তি, কিন্তু ঐক্যে শক্তি ; ঐক্য উৎসের মত বিচিত্রভাবে উৎসারিত হয়, নানাবর্ণে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। ঐক্যের বিকাশের জন্যই বৈচিত্র্য, ঐক্যের রস-সৃষ্টির জন্যই স্বাতন্ত্র্য। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা পত্র পল্লব বহু, কিন্তু তাহাদের জীবন রস মূলে। পুষ্পের পাঁপড়ি পৃথক পৃথক ফুটিয়া উঠে কেবল সমস্ত পুষ্পকে বিকশিত করিবার জন্য। পৃথিবী আহ্নিক গতিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে কেবল একমাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত। ইস্‌লামধর্ম্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে, স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধির সত্তা আছে। বিধি-ব্যাখ্যানের বৈষম্যে ইস্‌লামধর্ম্মের মধ্যে সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। মুসলমানের মধ্যে শিয়া সুন্নির সংঘর্ষ আছে, মজ্‌হাবের বিভেদ আছে। নমাজে কেহ নাভির উপরে হাত বাঁধে, কেহ বুকের উপরে রক্ষা করে। কেহ স্বর্গকে শরীর বলে, কেহ অবস্থার অনুভূতি জ্ঞানে ধ্যানের মধ্যে মগ্ন হয়।

কিন্তু এই সমস্তই ইস্‌লামের বহির্বিকাশের বুদ্বুদ মাত্র। ইস্‌লামের মূল মন্ত্র ঐক্য ; হৃদয় মন্ত্র ও প্রাণের মন্ত্র ঐক্য ; বিশাল অখণ্ড একত্বের সাধনা ইস্‌লামধর্ম্মের পরম ও চরম লক্ষ্য। "একমাত্র আল্লা ভিন্ন অন্যকোন উপাস্য নাই" বলিয়া হজরত ঐক্যের যে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, ইস্‌লামধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গে তাহারই অনুপ্রাণনা ; সেই অদ্বিতীয় এককে লাভ করিবার জন্য ইস্‌লামধর্ম্মের সর্ব্বত্রই ঐক্যের যোগ-সাধনা ; মুসলমানের রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানে ধর্ম্মে কর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে সেই মহা ঐক্যের পরিবেদনা ; মুসলমানের সকল ঘিরিয়া সকল ভেদিয়া সেই চরম ঐক্যপিপাসা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ মানা। আমরা মুসলমান সবাই সমান, আমাদের মধ্যে ভেদ নাই, বৈষম্য নাই, বিভিন্নতা নাই ;—আমরা লক্ষ্য-মোক্ষ, জীবন-মরণ, সাধ-সাধনায় সমান ;—আমরা এক, নিবিড় অখণ্ড এক, অটুট অক্ষয় এক, বিশালবিপুল এক, ঐক্যের আহ্নিক গতিতে আমরা অদ্বিতীয় একক প্রদক্ষিণ করি, ইহাই মুসলমানের বাণী, ইহাই ইস্‌লামের সাধনা।

মুসলমানের উপাস্য একমাত্র আল্লা। দেব নয়, দেবী নয় ; পিতা নয়, পুত্র নয় ; পীর নয়, পয়গম্বর নয় ;—একমাত্র আল্লা, সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে সকল মুসলমানের উপাস্য একমাত্র আল্লা, অসীম অরূপ অতুলন আল্লা—চিন্ময় অব্যয় অদ্বিতীয় আল্লা। সে আল্লার অংশ নাই, অংশী নাই ; সমান নাই, সন্তান নাই ; বর্ণ নাই, বৈচিত্র নাই ; তাহার কোন প্রতিনিধি নাই। সে একাই পরম, একাই চরম। সেই এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সেই অদ্বিতীয় এক ভিন্ন কোন মুসলমানের আর কোন উপাস্য নাই। তাহার চিন্তা-কল্পনা, বাক্য ব্যবহারে কোনরূপে আর কাহারও অস্তিত্ব নাই।

(ক্রমশঃ)

এসলামে নারী জাতির স্বত্বাধিকার।

(২)

তৎসঙ্গে এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে "তালাক" প্রদান করা কোন গৃহকর্ম্ম নহে, বরং তালাক দিতে হইলে, স্বজাতীয় কতিপয় লোকের সম্মুখে তালাক দিতে হইবে, এবং কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে সাক্ষী নিযুক্ত করিতে হইবে।

فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف اوفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهادة لله —

"অনন্তর যখন তাহারা স্বীয় নির্দ্ধারিত কালে উপস্থিত হয়, (অর্থাৎ দুই মাসে দুই তালাক দেওয়া হইয়াছে এবং তিন তালাক দেওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে) তখন হয় তাহাদিগকে তোমরা বৈধ রূপে গ্রহণ করিও, অথবা বৈধ রূপে তাহাদিগকে ত্যাগ করিও, এবং তোমাদের মধ্যে দুই জন ন্যায় পরায়ণ লোককে সাক্ষী নিযুক্ত করিও, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য ঠিক রাখিও।" সুরা তালাক, ১ রূকু।

সাধারণের সমক্ষে "তালাক" দেওয়ার ব্যবস্থা এইজন্য হইয়াছে যে, লজ্জাশীল ব্যক্তি এইরূপ সাধারণ সমক্ষে "তালাক" দিতে ও সাক্ষী নিযুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইবে, সুতরাং যথা সাধ্য "তালাক" দিতে বিরত থাকিবে।

আর যদি এই সকল বিষয় সহ্য করিয়া পুরুষ তালাক দিতে প্রস্তুত হয়, তবে এমতাবস্থায় তাহাকে নিম্ন প্রদর্শিত বিধান অবশ্য পালন করিতে হইবে।

لا تخرجوهن من بيوتهن

"এদ্দতের মধ্যে তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিও না" (তালাকের পর তিন মাস সময়কে এদ্দতবলে, এই সময়ের মধ্যে সেই নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে না) সুরা তালাক ১ রূকু।

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن — وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بالمعروف —

"তোমারা তোমাদের যে সকল গৃহে বাস কর তাহাদিগকেও (বর্জ্জিতা ভার্য্যাদিগকে) তথায় থাকিতে দিও, এবং তাহাদিগের কোন ক্ষতি করিও না বা যন্ত্রণা দিওনা, আর যদি তাহারা (পরিত্যক্তানারী) গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসবকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ভরণ পোষণ দিতে থাকিবে, অনন্তর যদি তাহারা তোমাদের অনুরোধে সন্তানকে স্তন্য দান করে; তবে তাহাদিগকে তাহাদের পারশ্রমিক প্রদান করিবে, এবং সদ্ব্যবহারের সহিত তাহাদের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে" সুরা তালাক ১ রূকু।

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين

"এবং বর্জ্জিত নারীগণকে যথাবিধি আহার বস্ত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য, যাহারা ধর্ম্মভীরু তাহারাই এই কর্ত্তব্যপালন করে" সুরা বকর ৩১ রুকু।

এসলাম প্রচারের পূর্ব্বে আরবের অধিকাংশ লোক স্ত্রী দিগকে "তালাক" দিয়া তাহাদিগকে পত্যন্তর গ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিয়া গৃহে আবদ্ধ রাখিত, এরূপ করার তাহাদের কএকটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম নারীর উপর অনর্থক অত্যাচার করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া এবং যন্ত্রণা প্রদান করিয়া তাহাদের প্রাপ্য মোহর (যৌতুক) মাফ করিয়া লওয়া, অথবা তাহাদের সম্পত্তি অপহরণ করা। আবার কখনও বা তাহাদের ত্যক্তা স্ত্রীকে অন্যে বিবাহ করিবে ইহাতে লজ্জা বোধ করিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত।

এসলাম এই আদেশের দ্বারা সেই অন্যায় ব্যবহারের নিরাকরণ করিয়াছে :—

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذالك فقد ظلم نفسه

"এবং তাহাদিগকে (পরিত্যক্ত নারীদিগকে) ক্লেশ দিবার জন্য আবদ্ধ রাখিও না, তাহা করিলে সীমা লঙ্ঘন করিবে, যে ব্যক্তি এরূপ করে নিশ্চয়, সে নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে" সুরা বাকরা ২৯ রুকু।

فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن —

"অতঃপর যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক দিলে, (বর্জ্জন করিলে) এবং তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কাল (এদ্দত) পূর্ণ হইয়া গেল, তখন প্রকৃষ্ট রীতি অনুসারে তাহারা অন্য পতির সহিত উদ্বাহ বন্ধনে প্রস্তুত হইলে, তাহাতে তোমরা তাহাদিগকে বারণ করিও না বা তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিও না।" সুরা বাক্‌রা ৩০ রুকু।

তৎপর বলা হইয়াছে যে, পরিত্যক্ত নারী যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসবের পরও দুই বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষ তাহার আহার বাসস্থান দিতে বাধ্য থাকিবে।

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"এবং পূর্ণ দুই বৎসর কোন সন্তানকে স্তন্য দান করা মাতার কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি (মাতার দ্বারা) পূর্ণ দুই বৎসর দুগ্ধ পান করাইতে ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি এই বিধি যে, সে (পুরুষ) নারীকে নিয়মিত রূপে ভরণ পোষণ করিবে" সুরা বাক্‌রা ৩০ রুকু।

অধিকাংশ লোক বিবাহের সময় অতি মাত্রায় "মোহর" (যৌতুক) নির্দ্ধারিত করিত, কিন্তু স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার সময় (তালাক দিবার সময়*) দেয় মোহরকে অতিরিক্ত বিবেচনায় নারীর উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক মোহরের পরিমাণ হ্রাস করিয়া লইত, এই অত্যাচার দূরীকরণার্থে আল্লাহতালা আদেশ করিয়াছেন।

---

* এই ব্যবস্থা সকল প্রসূতির প্রতি সাধারণ ভাবে প্রযুজ্য।

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شيئا — اتا خذونه
بهتا نا واثما مبينا وكيف تا خذونه وقد افضي بعضكم الي بعض

"এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথম স্ত্রীকে যত অর্থই (কেন্তার) দিয়া থাক না কেন, তাহার কিছুই ফিরাইয়া লইবে না। তোমরা সত্য অপলাপ ও অপরাধ করিয়া কি যাহা দিয়াছ তাহাই ফিরাইয়া লইবে? অথচ যখন তোমরা পরস্পর সহবাস করিয়াছ, তখন কি প্রকারে তাহা গ্রহণ করিবে?" সুরা নেসা ৩ রুকু।

এই সকল বিধি ব্যবস্থার সমষ্টিতে এই হইতেছে যে, পুরুষ যদি বিশেষ অপারগ অবস্থায় অগত্যা নারীকে ত্যাগ করে, তবে তিন মাসে ক্রমান্বয়ে তিন তালাক দিয়া, তালাক পূর্ণ করিবে। তালাকের পর এদ্দতের (ত্যাগ করিবার পর যে তিন মাস কাল নারী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে না, এই সময়কে এদ্দত বলে,) তিন মাস কালের ভরণ পোষণের ভার স্বামী বহন করিবেন। অন্য পতির সন্ধান করিয়া তাহার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ঐ সময়ই নারীর পক্ষে যথেষ্ট। আর যদি নারী গর্ভবতী হয়, তবে প্রসব কাল পর্য্যন্ত এবং প্রসবের পরও স্তন্য দানের দুই বৎসর সময়ের ভরণ পোষণ ঐ স্বামীই যোগাইবে, ইহা ব্যতীত বিবাহের সময় যে মোহর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণ বুঝিয়া পাইবে, সুতরাং নারীর বিপদে পতিত হইবার কোনই আশঙ্কা নাই।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, নারীজাতির জন্য ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও পূর্ণ নিয়ম কি হইতে পারে? এবং এসলাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মে এইরূপ উদার ব্যবস্থা আছে কি?

আহমদ আলী।

সাহিত্য ও ইতিহাস।

সাহিত্য ও ইতিহাসের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সুধীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র স্বীকৃত। ইতিহাস বলিতে কেবল মাত্র জন্ম তারিখের তালিকা বুঝিলে, ইহা স্বীকার্য্য যে সাহিত্য ও ইতিহাসে তাদৃশ কোন একটা ঘনিষ্টতা নাই। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস ইহার বিপরীত। যে ইতিহাস শিক্ষা ও জ্ঞানের সাহায্য করে, যাহাদ্বারা আমরা ভূত বিষয় সম্বন্ধে যথাসম্ভব কার্য্যোপযোগী প্রকৃত জ্ঞান লাভে উপকৃত হইতে পারি; যাহাতে অতীত জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয় ও অতীত কালের কার্য্য প্রণালী ও যাহা অবলম্বনে প্রাচীনগণ বহু গুরুতর বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বা কোথায় কোন ভুল বশতঃ সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই, এবম্বিধ আবশ্যকীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস নামের উপযুক্ত। শুধু তাহা নহে। প্রকৃত ইতিহাস কোন সময়ে, কোন রীতিনীতি, আচারব্যবহার, রঙ্গরহস্য, আইন কানুন প্রচলিত থাকে, তাহারও বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে। কারণ ইহা ব্যতীত কোন জাতির কার্য্য কলাপ বা তাহাদের প্রকৃত স্বভাব বিশেষরূপে বুঝা কঠিন।

যাহাকে আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, তাহা যেমন একদিকে জাতীয় জীবন লইয়া ব্যস্ত-সমস্ত, তেমনি অপর দিকে ব্যক্তিগত চরিত্র জ্ঞাপনে ও ব্যক্তিগত হৃদয়ের কার কারবারে লিপ্ত। হৃদয়ের ভাবগুলি বেশ বিন্যাস্ত না করিলে প্রকৃত চরিত্রস্ফুটন হয় না। ইংরাজি সাহিত্যে কথিত আছে, Feelings are the three fourths of men"— আমাদের হৃদয়ের ভাবগুলি আমাদের জীবনের ¾ অংশ! মনুষ্য কেবল ইষ্টক নির্ম্মিত নহে; সে কেবল বাহ্যিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত নহে। তাহার এক অন্তঃশক্তি আছে, যাহা অন্য কোন শক্তি হইতে প্রবলতর ও যাহাদ্বারা সে অধিকাংশ সময়ে চালিত হয়,এই শক্তির নামই মনোভাব।

প্রকৃত ইতিহাস মনুষ্যের মনোভাব গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে ও যে কার্য্যাবলীতে তাহা প্রস্ফুটিত হয়, তাহা সযতনে পোষণ করে। তাহা যেমন ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান, জাতীয় চরিত্র ও তাহাতে তেমনই কিছু কিছু বিকশিত হয়। মানব মাত্রই সমাজ ও দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। তাহাদের মনোগত ভাব গুলি যদিচ বেশীর ভাগে স্বীয় ধন তথাপি তাহা সামাজিক অবস্থার ও সমাজোন্নতির সাপেক্ষ। এমারসন বলেন, ইতিহাস কেবল বড়লোকদিগের জীবনী। তাঁহারাই স্বীয় সমসাময়িক দেশ বা জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ। তাঁহাদের জীবনীতেই জাতীয় জীবন প্রকটিত হয়। সুতরাং ইতিহাস স্বীয় কার্য্য সাধনার্থে ব্যক্তিগত হৃদয়ের ভাবগুলি সম্যক সমালোচনা করিয়া থাকে। এমন কি খাম খেওয়ালি গুলিও পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে। Evry man is in his humers প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ খেয়ালাধীন।

পুরোহিতের ন্যায় কতকগুলি কারণ বিহীন বা অপ্রমানিক বাক্য বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, প্রকৃত পক্ষে কতকগুলি প্রসিদ্ধ ইতিহাসের বিবরণী হইতে এই বাক্যগুলির কার্য্য ও অর্থ প্রমাণের প্রয়াসই আমাদের লক্ষ্য হইবে। Elphinstone's History of India যাহা বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য 'ভারতের ইতিহাস' সমূহ হইতে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে, এই বিষয়ের প্রবল সমর্থক। দৃঢ় চিত্ত বাবর সাহের হৃদয় কি কোমল ছিল! হৃদয়ের ও মনের যে গুণবলে তিনি সকলের বেদনা সমভাবে অনুভব করিতে পারিতেন, সকলের দুঃখে বিগলিত হইতেন—যে গুণ বলে তিনি বিষম-বিপন্ন, সহায় সম্বল-হীনাবস্থা হইতে নিজকে ভারতেশ্বর করিয়া তুলিয়াছিলেন, প্রসিদ্ধ ইতিহাস রচক তাহা অতি বিশদরূপে বাবরের জীবনের একটী ঘটনা দ্বারা দেখাইয়াছেন। শৈশব-সুখের আফগানিস্থান, যথায় সুখে স্বচ্ছন্দে রাজকীয় আসনে বসিয়া জীবনাতিপাত করিবেন বলিয়া আশা ছিল, প্রতিকুল ঘটনা যখন সহায়হীন বালককে সে সুখময় প্রদেশ হইতে হিমালয়ের শাখা প্রশাখা ভেদ করিয়া ভারতে টানিয়া আনিল, এবং যখন তথায় বহু বৎসর সুখে দুঃখে এক রকমে চলিয়া গেল, তখন একদিন সেই শৈশবের লীলাভূমি হইতে একটী খরমুজ তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল, খরমুজ দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে সেই শৈশবস্মৃতি পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠিল। তিনি যে তখনি জন্মভূমিতে গিয়া তাহা দর্শনে হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন না, সে আক্ষেপ মনোমধ্যে যুগপৎ জাগরিত হইয়া সেই অটল অচল হৃদয়কে মুহূর্ত্তের জন্য বিহ্বল করিয়া তুলিল। অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ড বাহিয়া চলিল।

ঐতিহাসিক পুনরায় বাবর সাহের জীবনীতে দেখাইয়াছেন যে, বাবর সাহ কি রূপে ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে ঘোর বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়া শপথ করিয়াছিলেন যে তিনি আর কখনও শত্রু কর্ত্তন করিবেন না। ঐতিহাসিকের পাণিপথের যুদ্ধ বর্ণনটী কি হৃদয়াকর্ষক! যুদ্ধের পূর্ব্বে আহমদ সাহ হিন্দুস্থানের নৃপতিবর্গকে বলিতেছেন, "তোমরা যাও, আমি দেখিব কোন বিপদ তোমাদের উপর পতিত না হয়।" অবরুদ্ধ সৈন্য ও সেনাপতিগণ দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বংশীরায়ের নিকট লিখিতেছেন, "পাত্র পরিপুর্ণ হইয়াছে, আর এক বিন্দুও ধরিবে না, এর পর আর লিখিবার বা বলিবার সময় থাকিবে না।" নিমিষের মধ্যে মহারাষ্ট্র-গণ যেন ইন্দ্রজালে পতিত হইয়া যথাসাধ্য প্রবল বেগে পশ্চাদধাবন করিল। রণ প্রাঙ্গনে ভূরি ভূরি শবদেহ পড়িয়া রহিল। চাঁদ সুলতানার বীরত্ব ও সাহসিকতা চিত্রন কি সুন্দর, আকবরের ঔর্দ্ধাত্ব প্রদর্শন আর একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুরাট অবরোধ কালে সম্রাট আকবর কেবল মাত্র ১২৬ জন সৈন্য নিয়া বিপক্ষের ১০০০ হাজার সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। এরূপ নানাবিধ ঘটনা যাহা বাহ্য দৃষ্টে সামান্য বলিয়া মনে হয় ঐতিহাসিক কত যত্নে তাহা অঙ্কিত করিয়াছেন। ফলতঃ এই জন্যই তাহার লিখিত ভারত ইতিহাস এত সম্মান লাভ করিয়াছে।

চিত্রাঙ্কন ও জীবনের ঘটনা গুলি বর্ণনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হেতুই মুসলমানেরা ইতিহাস ক্ষেত্রে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বর্ণিত ঘটনাবলী পাঠে মনে

হয় যে, আমরা তদানীন্তন কালে বাস করিয়া সমসাময়িক লোকদিগের সহিত কার্য্য কলাপ, রঙ্গ রহস্ত ইত্যাদি করিতেছি। তাহাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে যেন একটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, যাহার বলে আমরা তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ জানিতে ও চিনিতে পারিতেছি। যতই পাঠ করি ততই আনন্দ প্রাপ্ত হই। ইতিহাসের রূঢ়তা বলিয়া যে একটী দোষ আছে তাহা যেন অপসৃত হইয়া যায়। কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে; তাহাদের হৃদয়ের ভাবগুলি, আচারব্যবহার প্রভৃতি এমত ভাবে বর্ণিত যে আমরা উহা পাঠে তাহাদিগকে জীবন্ত দেখিতেছি ও তাহাদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি বলিয়া মনে হয়। তারিখে ফেরেস্তার ছামেরীর ও কালিখাঁর এবং সিয়ারোল মোতা খারিনের জাহান্দার সাহ ও লাল কোঁয়ার গল্প দৃষ্টান্ত স্থল।

ফলতঃ অন্যান্ত ইংরেজী, বাংলা বা যে কোন ভাষার ইতিহাস হউক না কেন, যাহা মানবের আদরের জিনিষ হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাব বিন্যাসের বেশ একটা আয়োজন আছে। মেকলে সাহেব তাঁহার ইংলণ্ডের ইতিহাসে যে সমস্ত ঘটনা দ্বারা মনুষ্যের হৃদয় ভাবগুলি সম্যক রূপে বুঝা যায়, তাহা বর্ণনে কত যত্ন নিয়াছেন। তিনি সে সময়ের যত দলিল, পত্রের অনুলিপি, সংবাদ পত্র, ইতিহাস, সাহিত্য, যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহাই এত পরিশ্রমের সহিত পাঠ করিয়াছেন, যে তাহা হইতে এমন কোন বিষয় জানা যায় কিনা, যাহা ঐ সময়ের লোকদিগকে ও কার্য্যাবলী বুঝিতে হইলে বিশেষ কাজে লাগে। ফলতঃ তাঁহার গভীর গবেষণার ফলে তিনি এইরূপ অনেক বিষয় জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি, দ্বিতীয় চার্লস তাহার মিসট্রেস্পের বা উপপত্নীর সহিত কি কি কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন বা তাহার পুরোহিতের সহিত মৃত্যু সময়ে কি কি দোষ গুণ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন প্রভৃতি প্রত্যেকটী ঘটনা প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভাবে লিখিত হওয়াতেই ইতিহাস খানা সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছে ও তাহা পাঠে আমরা আনন্দ লাভ করিতেছি ও বিস্তর জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি, এবং ইতিহাস খানা নিরস বলিয়া মনে হয় না। গিবন সাহেব তাঁহার "Declinde and fall of the Roman Empire" "রুমীয় সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন" পুস্তকে, যে রাত্রে তিনি পুস্তকটী শেষ করিয়াছিলেন, সে রাত্রের সে সময়ের নিজের মন ও স্বভাবের বিষয় কি মনোহর ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

যদি কাহাকেও জানিতে চাও, তাহার মনোমধ্যে প্রবেশ কর—কল্পনা শক্তিকে একটু প্রসারিত কর। যে পর্য্যন্ত নিজমনে সমবেদনা বা সহানুভূতি না হইবে, যে পর্য্যন্ত অপরের ভাবগুলি নিজে উপলব্ধি করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত অপরকে চিনিতে পারিবে না। যেখানে অনুভূতি নাই সেখানে জ্ঞানও নাই। অনুভবে জানা যায়। অপরের ভাবগুলি তাহাদের কার্য্যকলাপে দৃষ্ট হয়; যদি তোমার সে ভাবগুলির প্রতি দৃষ্টি থাকে, তবে সে কার্য্য কলাপগুলির প্রতি আপনিই মন আকর্ষিত হইবে; তুমিও সে কার্য্য কলাপ গুলি আনন্দের সহিত আলোচনা করিয়া মন ও স্বভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবে ও অন্যান্ত বিষয় যাহা তোমার

কল্পনা শক্তি বলিয়া দিবে যে ঐ বিষয় গুলির সহিত সামঞ্জস্য আছে, তাহাও তুমি নিজের ভাবমত সংবদ্ধ করিতে পারিবে। এইরূপে সময়, কাল ও চরিত্র বুঝিতে পারিবে ও এইরূপে উপযুক্ত কার্য্যকরী ইতিহাস প্রণয়ণ করিতে পারিবে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় ইতিহাস ও সাহিত্যের আত্মীয়তা বা ইহাদের একতা, কল্পনা ও ভাব, যাহা নিয়া এত কথা বলা হইয়াছে—ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে সাহিত্যের সম্পত্তি। সাহিত্য কেবল বর্ণ বিন্যাস করিয়া থাকে না, সাহিত্যের কতকগুলি কাজ আছে। সাহিত্য যাহা বলে, তাহা বিশেষ ভাবে বলে; এমন ভাবে বলে যে, তাহাতে মানব মন নিজ হইতেই আকৃষ্ট হয়। বাস্তবের সহিত কল্পনার একরূপ সম্মিলন করিয়া দেয় যে, বাস্তব তাহা হইতে মনোজ্ঞরূপ ধারণ করিয়া থাকে ও তাহার বলে হৃদয়ের কেন্দ্রস্থানে প্রবেশ করে; একটী বিষয় বলিতে গিয়া দশটী বিষয় তাহার সাহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেয়; এমন দশটী বিষয়ের সংস্থাপন করে, যাহা আমরা জ্ঞাত আছি বা যাহা আপনা হইতেই মনোহর ও যাহার সহিত একরূপ অদৃষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার সাহিত্য দশটী বিষয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটী নূতন পদার্থ তৈয়ার করিয়া তুলে; এবং সেই দশটী পদার্থের মধ্যে স্বাভাবিক শৃঙ্খল স্থাপন করিয়া এক রমনীয় হৰ্ম্মোত্তোলন করে; প্রত্যেকটীকে নিজ নিজ উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করে; যে স্থানে স্থাপন করিলে সে নিৰ্ম্মানোৎকর্ষ সাধিত হয়, সে স্থানেই তাহাকে স্থাপিত করে। এইরূপে সে স্বীয় কার্য্য সাধন করিয়া থাকে।

ইতিহাসে যেমন ভাবের আবশ্যক আছে ও সময়ে সময়ে কল্পনারও কিঞ্চিৎ প্রয়োগ হইয়া থাকে, সাহিত্যেও তেমন ভাবের ও কল্পনার প্রভূত কর্ম্ম বিদ্যমান। ইতিহাসে ভাব বুঝিতে ভাবাত্মক ঘটনাগুলির আলোচনা দরকার; সেই আলোচনায় লেখকের স্বীয়ভাব প্রসারিত করা আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং সময় সময় কল্পনার সাহায্যে বক্তব্য বিষয়টী প্রাঞ্জল করিবার জন্য দুই একটী সম্বন্ধযুক্ত বিষয়েরও জোড়া তালী লাগাইতে হয়; কিন্তু সাহিত্যে এই ভাব ও কল্পনার বিষয়গুলি নিয়া বিস্তর খেলা মেলা করিতে হয়। সাহিত্যে নিৰ্ম্মান কাজ করিতে হয়, ইতিহাসে তাহা হয় না, সাহিত্যে ভাব, কল্পনা, বাস্তব বিষয় সকলই তুল্য উপদান; ইতিহাসে বাস্তব বিষয়টীই উপাদান, ভাব সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে রং বিশেষ—কল্পনা দু এক জায়গায় পরিশোভন অলঙ্কার স্বরূপ।

যে জাতির সাহিত্য আছে সেই জাতির ইতিহাসও আছে। কতকগুলি অবাস্তবিক পুস্তক, যাহাতে বাস্তবের কোন নাম গন্ধও নাই; যাহা আধুনিক বটতলার উপাখ্যান বা পুথির ন্যায় কতকগুলি গল্প মাত্র; তাহা সাহিত্য শ্রেণীর বহির্ভূত করিয়া দিলে, সাহিত্যে আমরা ইতিহাসের বিস্তর উপাদান প্রাপ্ত হই। সাহিত্যগুলি সাময়িক, ব্যক্তিগত, ধৰ্ম্মগত ব্যবহার ও ভাবগুলি উন্মেষ করিয়া থাকে; তাহাই ঐতিহাসিকের বিশেষ কাজে লাগিয়া বসে। মুসলমানেরা বিশেষতঃ আরবেরা বিশেষ কাল্পনিক ও ভাবুক ছিলেন; তাহাতেই তাঁহারা ইতিহাস ক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভারত ইতিহাসে লিখিত আছে মুসলমানেরা প্রসিদ্ধ

লেখক ছিলেন; তাহাদের আগমন কাল হইতেই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয়। এক্ষেত্রে হিন্দুগণ পশ্চাদবর্ত্তী ছিলেন। বঙ্গ ভাষায় এতদিন সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল না; কিন্তু এখন যেরূপ বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি দেখা যায়, তাহাতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বাঙ্গালার ইতিহাসের কলেবর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে, বাঙ্গালীদিগকে আর প্রকৃত ইতিহাসাভাবে অন্য জাতির নিকট সভ্যতার নিম্নস্তরের লোক বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে না।

নির্ব্বাচন শক্তি ভিন্ন যেমন সাহিত্য লেখা সুকঠিন, তেমন ইতিহাসেও এই শক্তির প্রয়োগ বহুল পরিমাণে প্রয়োজনীয়। দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতশত কার্য্য লোকে করিয়া বসে, বা কত শত ঘটনা ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগের প্রত্যেটীর ফটোগ্রাফ চিত্র করা ইতিহাসের কার্য্য নহে। ইহা কেবল ডায়েরী বা দৈনিক বিবরণীতেই শোভা পায়। এমন কাজ বা ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহা দ্বারা যাহারা সময়ের বা সমাজের চিত্র স্বরূপ তাহাদের বিষয় কিছু জ্ঞাপিত হয়; ও যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত লেখনী প্রকৃতিকে অনুকরণ করে; কিন্তু তাহাকে অঙ্গে প্রতিফলিত করে না; সেইরূপ প্রতিফলন যে সে করিতে পারে। পরন্তু সাহিত্যিক প্রকৃতির এমন এমন ঘটনাগুলি বাছিয়া নেয়, এমন এমন বস্তুগুলি প্রকৃতি হইতে সংগ্রহ করে, যে তাহাদের একত্র সমাবেশে একটী সজীব চিত্র অঙ্কিত হয়। তাহা হইতে প্রকৃতির ভাব, বিজ্ঞান, সৌন্দর্য্য মহাত্ম, সকলেই অনুভব করা যায় ও তাহা দ্বারা মন প্রকৃতির দিকে ধাবিত হইয়া এক বিমলানন্দ প্রাপ্ত হয়—এক আভা পাইয়া বসে। তাহাতে নীচতা, ক্ষুদ্রতা, সমস্ত অপসৃত হইয়া হৃদয় আলোকিত ও উন্নত হইয়া পড়ে।

দূরদর্শী ঐতিহাসিক শক্তি সঞ্চালনে যে যে ঘটনা বা কার্য্যাবলী আপন মনে থাটে, সেগুলি সুন্দররূপে সাজাইয়া দেশ, সমাজ, সময় বা মানব জীবনের একটী চিত্র অঙ্কিত করে, যাহা অধ্যয়নে সে বিষয়গুলি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সাহিত্যিকের ন্যায় ঐতিহাসিকও বিফল মনোরথ হয় যদি সে ইহা করিতে অশক্ত বা অপারগ হয়। কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকের নামের ইতিহাস বাহির হইতেছে যে তাহাতে একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা স্তরে স্তরে রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে এমন কিছু নাই যাহাতে মানব জীবন, জাতীয় জীবন বা সাময়িক বস্তবাবস্থার ভিতর প্রবেশ করা যায়; সুতরাং সেগুলি রূঢ় ও বিরক্তি জনক বলিয়াই বোধ হয়। কেহ তাহাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না।

তাই বলিয়া রহস্য বা আমোদোক্তি ইতিহাসের জিনিষ নহে। যাহা সাহিত্যে বিস্তর শোভা পায়, যাহার খেলা মেলা সাহিত্য রাজ্যে এথা সেথা দেখা যায়, তাহা যেন ইতিহাস জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এজগতে তোমার কিছু হাসি রঙ্গ করিবার নাই, চিত্র দর্শনে তোমার মনে যে ভাব উদয় হয়, সে ভাব জ্ঞাপক সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি, তোমার বক্তব্য ঘটনাগুলির সহিত জোড়া দিতে পার; কিন্তু এখানে কমলাকান্তের দপ্তর, ফলষ্টাফের ক্রীড়া বা কাঞ্চনজঙ্ঘা চূড়া নাই। বলিতে পার আওরঙ্গজেব মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, বিদ্রোহানল

জ্বলিয়া উঠিল; মোগল-রবি মধ্যাহ্ন-কিরণ বিস্তার করিয়া অস্তগমন্মুখ হইল; মোগল সিংহ চিরতরে বিবরে শয়ন করিল, কোথাকার পাহাড় জঙ্গল হইতে ভেউ ভেউ বরে শৃগাল গৃধুনি জাগরিত হইয়া উঠিল; কিন্তু এস্থলে বলা বিধেয় নহে আওরঙ্গজেব ধরাশায়ী হইল, একটী অশ্ব লাফাইয়াছিল, সতেজে সর্ব্বভূমি বিচরণ করিয়া গেল; অবশেষে অতি পরিশ্রান্তে নিজের জীবন হারাইল।

কল্পনা দেবীর ক্রোড়ে ইতিহাস বড় আশ্রয় নেয় না। সাহিত্যের সে ধন ইতিহাস প্রয়োগ করিতে পারে না; করিলে পথ ভ্রষ্ট হইতে হয়। যে কলার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিণত করিয়া ফেলে; সে হেলেনার বা লায়লীর রূপ মিশরের কপোল দেশে দেখিতে পায়। কখনও বা পানিপথকে এক সহায় সম্পদ ভ্রষ্ট মৃত্যুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হতভাগ্য ব্যক্তির ন্যায় প্রদর্শন করে।

"হায় পানিপথ দারুণ প্রান্তর,
কেন ভাগ্য সনে হইলিনি অন্তর।"

অবশ্য কল্পনা কেবল বাহুল্য বাক্য প্রয়োগ করে না; যাহা খাটে, যাহার সঙ্গে লুক্কায়িত সম্বন্ধ আছে বা মনুষ্যাচারে, প্রয়োগে লুক্কায়িত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, তেমনি একটি মূর্ত্তি ঘটন করে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, এখানে কোন রূপান্তর নাই; যাহা আছে ঠিক আছে। তাহার সঙ্গে অপর একটি আনিতে পার যে, তাহা সেটিকে আপনার বাস্তস্য বজায় রাখিয়া মনোগ্রাহি করিয়া তুলে। ইহার বাহিরে যাইবার সত্ত্ব ঐতিহাসিকের নাই।

ইতিহাস কল্পনা দেবীর সাহায্য গ্রহণ করিল না, সাহিত্য তাহাকে অর্ঘ্য, পুষ্প চন্দন প্রদান করিল। ইতিহাস হাস্য রহস্যে মন দিল না, সাহিত্য তাহাকে নিজের সম্পত্তি করিয়া লইল। সাহিত্য ভাবে মুগ্ধ হইল, ইতিহাস আপনার বিষয়গুলি সজীব করিবার জন্য ভাবের কিছু আশ্রয় গ্রহণ করিল; তাহাতে সেও কল্পনা ও রহস্য দেবীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী আসিয়া পড়িল; কারণ ভাবের সহিত কল্পনা ও রহস্যের কিছু কিছু আত্মীয়তা আছে। তাহা বিহনে যেন সে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। তবে যাহার উপদান যেখানে বেশী, সেখানে তাহাকে সে নামে অভিহিত করা হয়। তাই যদিচ একটি সঙ্গে অপরটি আসিয়া পড়ে, তথাপি যেখানে যাহার প্রভাব, সেখানে তাহার নামই বলা হয় ও অপরকে উপেক্ষা করা হয়। সাহিত্য ও ইতিহাসের একতা ও পার্থক্য এরূপেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

আবদুল মান্নান এম, এ,

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার।

সম্রাট জাহাঁগীরের দরবারে হিন্দু আমীর।

উদাজী রাম।—দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ বংশীয় বিশেষ সুদক্ষ কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন, তিনি সর্ব্বাগ্রে স্বীয় অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যোগ্যতা প্রভাবে দাক্ষিণাত্যের অধিপতি মালেক আম্বরের দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন; পরে সম্রাট জাহাঁগীরের দরবারে চারি হাজার পদাতিক ও চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সম্মানিত পদে উন্নীত হন। তিনি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব কালে পঞ্চহাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজা বাসু।—তিন হাজার পাঁচ শতী পদে নিযুক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের অভিযানে যোগদান করিয়া ছিলেন। ১০৩৩ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বসন্তরাও—মরাঠী বংশীয় একজন কর্ম্মী হিন্দু, রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি দুই হাজার অশ্বারোহীর পদে নিযুক্ত ছিলেন পরে স্বেচ্ছায় এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি সম্রাট শাহজাহানের আমোলে তিন হাজারী নিযুক্ত ছিলেন। ১০৬৮ হিজরীতে সম্রাট আওরঙ্গজেব ও যশোবন্ত সিংহের উজ্জয়নীয় যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

রায় বেহারী দাস বখ্‌শী।—ক্রমন্নোতি করিয়া পরিশেষে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রায় বনমালী।—জাহাঁগীরের পীলখানার দারোগা ছিলেন। পরে ছয়শত পদাতিক ও ১২০ অশ্বারোহী অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। সম্রাট শাহজাহানের আমলে তিনি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া হাজারী পদে নিযুক্ত হন।

রাজা ভারত বোন্দিলা।—রামচন্দ্রের পৌত্র। রামচন্দ্রের কন্যা আকবরের অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াছিলেন। রাজা ভারত প্রথমতঃ ছয়শত পদাতিক ও চারিশত অশ্বারোহী পদে দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হন। পরে দুই হাজার পাঁচ শত পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বরোহী পদ প্রাপ্ত হন। শাহাজাহানের সময় তিনি তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে সাড়ে তিন হাজারী পদে উন্নীত হইয়া ছিলেন।

যাদুন রাও।—ইনি শিবাজী মারাঠীর মাতামহ, তাঁহার মূল নাম লক্ষজী। তিনি পূর্ব্বে আহমাদ নগরের নেজাম শাহী বংশের স্বনামখ্যাত আমির মালেক আম্বরের সামরিক বিভাগে ক্রমোন্নতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন।

সম্রাট জাহাঁগীররের সহিত মালেক আম্বরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যাদুন রাও যুবরাজ সেনাপতি শাহজাহানের সহিত :যোগদান করেন। জাহাঁগীরের দরবারে তিনি পঞ্চ হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পবিবার ভূক্ত লোক জনের বৃত্তি সহ তিনি ২৪ হাজারী পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় হইতে মরাঠীগণ মোগল বংশের সামরিক বিভাগে প্রবেশ লাভ করে। যাদুন রাও জাহাঁগীরের দরবার হইতে কোন কারণে পলায়ন পূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্ব প্রভু নেজাম শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিজাম শাহ তাঁহার পূর্ব্ব বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধন কৌশলে তাঁহাকে তাঁহার দুই পুত্র ও এক পৌত্র সহ হত্যা করেন। তাঁহার স্ত্রী গিরিজাবাই নিতান্ত বুদ্ধিমতী ও বীরাঙ্গনা ছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা মতে শাহজাহান তাহাদের বংশের অপরাধ ক্ষমা করেন। এবং যাদুন রাওয়ের পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তি ভাস্তজীকে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার প্রদান করেন। তদীয় ভ্রাতা জগদেব রায়কে চারি হাজারী পদ দেওয়া হয়, যাদুনের পৌত্র তেলঙ্গ রাও তিন হাজারী পদে এবং বিথুজিকে দুই হাজারী পদে নিযুক্ত করা হয়। সম্রাট শাহজাহানের সময়ে যাদুন রাওয়ের পুত্র বাহাদুরকে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার এবং পঞ্চ হাজারীর উচ্চপদ দেওয়া হয়। তাঁহার পুত্র দয়াজী তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হন। রাজ বিদ্রোহী পরিবারের সহিত বংশানুক্রমে এরূপ উদারতার পরিচয় দেওয়ার দৃষ্টান্ত কেবল মুসলমান নরপতিগণের ইতিহাসই শোভাপায়।

রাজা ঝাঝার সিং বোন্দেলা।—তিনি রাজা নরসিংদেব বোন্দেলার পুত্র। জাহাঁগীরের রাজত্বের শেষভাগে ইনি চারি হাজারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের আমলে তিনি আবার সপ্ত হাজারী পদের সম্মান লাভ করেন। এরূপ উচ্চ পদ লাভ মুসলমানের মধ্যেও ক্বচিৎ কাহারও ভাগ্যে সংঘটিত হইত। শাহজাদাগণ ব্যতীত সচরাচর অন্য কোন রাজপুরুষ এত উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু মুসলমানগণের উদারতা ও হিন্দুগণের সৌভাগ্য দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়। আজ বাঙ্গালা মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের গবর্ণরের যে ক্ষমতা, সপ্ত হাজারী পদের ক্ষমতা তদপেক্ষা অধিক ছিল। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গবর্ণরগণের হাতে সামরিক ক্ষমতা কিছুই নাই, কিন্তু মুসলমান আমলদারীর গবর্ণরগণ শাসন ও সমর বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা ছিলেন। রাজাদেশ ব্যতীত তাঁহারা কোন বিষয়ে আর কাহারও অধীন ছিলেন না। হিন্দু ভ্রাতৃগণের নিকট জিজ্ঞাস্য, তাঁহারা উপন্যাসে, নভেলে, নাটকে এই কারণে মুসলমানগণের নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা করাই কি বর্ত্তমানে আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন?

রাজা জগৎ সিংহ।—তিনি রাজা বাসুর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি তিন হাজারী পদে সম্মানিত হইয়া ছিলেন। শাহজাহানের সময় কাবুলের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

রাজা রাজ সিং কচচ।—জাহাঁগীর স্বীয় রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে তাঁহাকে চারি হাজারী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার

মৃত্যুর পর তদীয় এক পুত্র এসলাম গ্রহণ করে। অন্য পুত্র রামদাস শেষে দুই হাজারী পদে উন্নীত হন।

রাজা রায়সেন।—জাহাঁগীরের সময় তাঁহাকে দুই হাজারী পদ হইতে উন্নতি দিয়া দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত করা হয়।

রাও রতন।—পাঁচ হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযানের অধিনায়করূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শাহজাহানের আমলেও তিনি স্বীয় পূর্ব্বপদে বহাল ছিলেন।

রূপচাঁদ।—তিনি গোয়ালিয়রের আমীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কঙ্গাড়া অভিযানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ছিলেন।

রাজা রামদাস।—দুই হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। শাহজাহানের সময় ঝাঝার সিংহের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন।

সূর্য্য সিংহ।—পাঁচ হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি বহু যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের অভিযানে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজা সূর্য্যমল।—১০২২ হিজরীতে দুই হাজারী পদে সম্মানিত হন। তিনি কাঙ্গিড়া ও দক্ষিণাত্যের অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মেও দুর্গাদি তাঁহারই হস্তে বিজিত হয়।

রায় সূর্য্য সিং।—ইনি হাজারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি দেলেপ সিংহের বিদ্রোহ দমনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শাহজাহান সিংহাসনারোহণ করার পর তাঁহাকে চারি হাজারী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার দুই পুত্র সওয়ারসেন ও রাওকর্ণ সপ্তশতী ও ষষ্ঠশতী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

রায় রায়ান রাজা বিক্রমাদিত্য সুন্দর দাস।—বীরত্বের জন্য ইঁহার নাম বিশেষ খ্যাত। অমর সিংহের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরিত হয়, তাহাতে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বিজাপুরের অধিপতি ইব্রাহিম আদেল শাহের দরবারে রাজদূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। দৌত্য কার্য্য বিশেষ সফলতার সহিত সম্পাদন করায়, সম্রাট তাঁহার পদোন্নতি সাধন করেন। কাঙ্গড়ার দুর্গ জয়েও তিনি বিশেষ কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জাহাঁগীরের দরবারে তিনি 'রায় রায়ান রাজা বিক্রমাদিত্য' উপাধি লাভ করেন।

রাজা রঙ্গদেব।—১ হাজার পাঁচশতী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

রাজা সঙ্গরাম।—জম্বল পরগণার জায়গীর পাইয়াছিলেন। দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন

সওয়ার সাল কচ্চ।—জাহাঁগীরের শেষ সময়ে দরবারে প্রবেশ করেন—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। শাহজাহানের সময় নেজাম শাহী সৈন্যের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরিত হয়, তাহাতে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র সকলেই সম্মানিত ছিলেন।

রাণাশঙ্কর।—আকবরের সময় দরবারে প্রবেশ করিয়া দুইশতী পদে বরিত হন। জাঁহাগীরের অভিষেক কালে তিনি এককালীন বার হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। রাজা প্রভাবের বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শেষে তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হন। বেহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজা শ্যাম সিং।—আকবরের সময় রাজ সরকারে প্রবেশ করেন। জাঁহাগীরের সময় আড়াই হাজারী পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অভিযানে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজা কিষণ দাস।—আকবরের সময় পিলখানা এবং আস্তাবলের দারোগা ছিলেন। জাঁহাগীরের সময় দুই হাজারী পদে উন্নতি লাভ করেন।

রাজা রাউল কলিয়ান।—আকবরের সময় পাঁচশতী পদে নিযুক্ত ছিলেন। জাঁহাগীর তাঁহার কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই রাণী রাজান্তপুরে "মলেকায়ে জাহান" উপাধিতে ভূষিত হন, তাঁহার ভ্রাতাকে দুই হাজারী পদ দেওয়া হয়।

রাজা কিষণ সিং রাঠোর।—রাণার বিরুদ্ধে অভিযানে মোহাবত খাঁর সমভিব্যাহারী ছিলেন। ইনি তিন হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

রাজা কল্যান।—বাঙ্গালার সুবাদার ইস্‌লাম খাঁর অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে তিনি উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।

কিশোর দাস।—আকবরের সময় তিন শতী পদে ছিলেন। জাঁহাগীরের সময় দুই হাজারী পদে নিযুক্ত হন।

করমসী রঠোর।—হাজারী পদের কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের সময় দেড় হাজারী পদে উন্নতিলাভ করেন। ইনি খানেজাহান লোদীর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

রাণা কর্ণ।—উদয়পুরের রাজবংশজ, উচ্চ রাজ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ পাঁচ হাজারী পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। অনেক যুদ্ধে তাঁহাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা গিরিধর কচ্চ।—দুই হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। সৈয়দ কবির নামে একজন সৈয়দ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত রাজা গিরিধরের ঝগড়া হয় এবং এই ঝগড়া শেষে ছোটখাট যুদ্ধে পরিণত হয়। দুই পক্ষে অনেক লোক মারা যায়। রাজা গিরিধরও এই যুদ্ধে নিহত হন। সেনাপতি মহাবত খাঁ ইহা অবগত হইয়া সৈয়দকে বন্দী করিয়া গিরিধরের হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। বিজিত লোকের প্রাণের বিনিময়ে একজন বিজয়ী সম্ভ্রান্ত মুসলমান আমীরের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা কেবল মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

রাজা রাজসিংহ।—পঞ্চ হাজারীর উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের পশ্চাদ্ধাবন জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট শাহজাহান স্বীয় রাজত্ব-কালে তাঁহার পূর্ব্ব পদ স্থায়ী রাখেন। যে ব্যক্তি শাহজাহানের জীবন সংহার করার জন্য পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহাকে উচ্চ সম্মানিত পদে নিযুক্ত করার দৃষ্টান্ত মোগলবংশেরই স্বভাব সুলভ কাজ। এরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে অতি দুর্লভ।

মনোহর দাস।—আক্‌বরের সময়ে দরবারে প্রবেশ করেন। আক্‌বর মনোহরপুর নামক একটী পল্লী তাঁহার নামে নামধেয় করিয়া তাঁহার জায়গির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করেন। জাহাঁগীরের সময় ইনি দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত হন। মনোহর দাস, ফার্সী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। জাহাঁগীর স্বপ্রণীত জীবনীতে তাহার সাহিত্য জ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। রাণা অমর সিংহের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহজাদা পরবেজের সহিত গিয়াছিলেন।

রায় মনি দাস।—জাহাঁগীরের প্রাসাদের দারোগা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাটের রাজত্বের চতুর্দ্দশ বর্ষে রায় উপাধি ও ছয় শতী পদে নিযুক্ত হন। তিনি শাহজাহানের আমলে 'দেওয়ানেতন' অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর বেতন বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। প্রধান মন্ত্রীর দুইজন সেক্রেটারী থাকিতেন এই পদটী অতি সম্মানিত ও উন্নত ছিল।

রাজা মানসিংহ।—হাজারী পদে নিযুক্ত হন। কাঙ্গড়া দুর্গাধিকারে সেনাপতি শেখ ফরিদের সহকারীরূপে ইনিই গিয়াছিলেন। সেনাপতির মৃত্যুর পর তিনি বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত অভিযানের কার্য্য সম্পাদন করেন এবং তৎপর তিনি দেড় হাজারী পদ লাভ করেন। তিনি দ্বিতীয় বার সেনাপতি রূপে কাঙ্গড়া দুর্গাধিকার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মহারাজা নরসিংহ দেব।—শাহজাদা জাহাঁগীরের ইঙ্গিতে নরসিংহদেব সম্রাট আক্‌বরের প্রিয়তম মন্ত্রী শেখ আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে উজ্জয়িনীর নিকট আক্রমণ করেন, একটী খণ্ড যুদ্ধের পর বর্শাঘাতে আবুলফজল নিহত হন। জাহাঁগীর সিংহাসনারোহণ করিলে, নরসিংহদেবকে প্রথমতঃ তিন হাজারী পদে নিযুক্ত করেন। তিনি অনেক যুদ্ধে যোগদান করিয়া ছিলেন। নরসিংহদেব বৈধ অবৈধ উভয় প্রণালী অবলম্বনে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছিলেন। তিনি আবুলফজলের নিকট প্রাপ্ত ধনরত্ন হইতে ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মথুরা নগরীতে একটী অতুলনীয় দেব মন্দির স্থাপন করেন। তাঁহার জায়গীর বিন্ধ্যাচলে, বহু দালান, ধর্ম্ম মন্দির এবং শিবসাগর নামে একটী বৃহৎ সরোবর এবং মথুরা পরগণাতে 'সমন্দর সাগর' নামে দীঘি প্রস্তুত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তিনশত ছোট বড় সরোবর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি শেষে চারি হাজারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

রাজা ভীম নারায়ণ।—গড় পরগণার জমিদার ছিলেন—হাজারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ভরজু।—বকাশব জমিদার, চারি শতী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

দেবী চাঁদ।—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

হাকিম রঘুনাথ।—আটশতী পদে ছিলেন।

রায়ঘণেস্বর।—বেহার প্রদেশের দেওয়ান ছিলেন, পরে গুজরাটের দেওয়ান হন।

মোহনদাস।—পাঁচ শতী পদে ছিলেন। পরে গুজরাট প্রদেশে দেওয়ানের পদ লাভ করিয়াছিলেন।

রায় সঙ্গত ভগ্নোবির।—বঙ্গের অভিযানে রাজা শ্যাম সিংহের সঙ্গী ছিলেন।

রায় মানসিংহ।—রাজকীয় সৈন্যের সরদার ছিলেন।

রাজা নথমল।—দুই হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি রাজ দরবার হইতে বহু টাকার খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হর ভান।—চন্দ্রকোটার জমিদার, এবং আড়াই হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

হর নারায়ণ হাড়া।—তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত কাঙ্গড়া অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন—নয়শতী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

সম্রাট শাহজাহানের দরবারের হিন্দু আমীরগণের নাম।

১। রাজা অর্ণর্ভদা গৌড়।—তিনি গৌড়ের বিথলদাস গৌড়ের জ্যেষ্ঠপুত্র—প্রথমতঃ আজমিরের ফৌজদার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সম্রাটের রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত হন। কান্দাহার অভিযানে দুইবার তিনি শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও দারা শেকোর সহিত উপস্থিত ছিলেন।

২। উদাজীরাম।—সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব কালে তিনি পাঁচ হাজারী বা প্রাদেশিক গবর্ণরের উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেওলতাবাদের দুর্গাবরোধ কালীন তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র যোগজীবন তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৩। অর্ণর্ব্বদা গৌড়।—সাড়ে তিন হাজারী পদে অধিষ্ঠিত এবং আশম্বুরের দুর্গ রক্ষার পদে নিযুক্ত ছিলেন। কান্দাহার অভিযান এবং শাহজাদাগণের সঙ্গে অনেক যুদ্ধেই তিনি সহযোগিতা করিয়াছিলেন। শাহজাদা শাহ সুজার বিরুদ্ধে অভিযান কালীন পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৪। রাজা অমরসিংহ।—দেড় হাজারী পদে ছিলেন। আওরঙ্গজেব ও মোরাদ বখ্‌শের সহিত বদোখশান অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। দারা শেকোর সহিত কান্দহার অভিযানেও সহযোগী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের আমলে আসাম অভিযানে এবং পাঠান বিদ্রোহ দমনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

৫। রাও অমরসিং রাঠোর।—তিন হাজারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাহজাহানের রাজত্বের নবমবর্ষে দাক্ষিণাত্যের অভিযানে প্রেরিত হন—শাহজাদা সুজার সহিত কাবুলেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোবন্ত সিংহ তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হন। শাহজাদা মোরাদ বখ্‌শের সহিত কাবুলে বদলি হইয়াছিলেন। কালে চারি হাজারী পদে নিযুক্ত হন।

৬। রাও অমরসিংহ চন্দ্রাবত।—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। কান্দাহার অভিযানে দুইবার শাহজাদাগণের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, রামপুর পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাজত্বের অষ্টবিংশতি বর্ষে দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৭। ইন্দ্রসাল।—ঝাঝার সিংএর বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্বপদ লাভ করেন। বিজাপুরের রাজা আদেল শাহের বিরুদ্ধেও তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন—আটশতী পদে নিযুক্ত ছিলেন। শাহাজাদা মোরাদ বখ্শের সহিত কাবুলেও কিছুকাল ছিলেন।

৮। ভূর্জী।—তিন হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাঁহার বিশাল জমিদারী ছিল। তিনি কন্যকুব্জের রাজবংশধর বলিয়া পরিচিত। সোলতানপুর পরগণা জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন। ভূর্জীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রেমজী স্বেচ্ছায় এস্লাম গ্রহণ পূর্ব্বক দৌলতমন্দ খাঁ উপাধি ধারণ করেন এবং হাজারী পদে নিযুক্ত হন। যাঁহারা মনে করে মুসলমানগণ যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জাতীয়তার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন, তাঁহারা এখানে একটু চিন্তা করিবেন। ভূর্জী হিন্দু হইয়া তিন হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানের তুলনায় উহা বিভাগীয় কমিশনারের পদের প্রায় সমতুল্য ছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র প্রেমজী মুসলমান হইলেন বটে, তথাপি পাইলেন হাজারী পদ। হাজারী পদ বর্ত্তমান সবডিপুটীর পদের সমান। মুসলমান হইলে যে উচ্চপদ পাওয়া যাইত, এরূপ ধারণার বশীভূত হইয়া হিন্দুগণ মুসলমান হইতেন, যাঁহারা এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারা যে সত্যের অপলাপ করেন, কি না? তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

৯। যুবরাজ বিক্রমাদিত্য।—দুই হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের অভিযানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। দৌলতাবাদের দুর্গাবরোধ কার্য্যে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

১০। রাজা বাদলসিং।—হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। একবার পদাঘাতে একটী উন্মত্ত হস্তীকে বিতাড়িত করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেওয়াতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বার্ষিক দেয় দুইলক্ষ টাকা নজরানার মধ্যে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা চিরকালের জন্যে রেহাই দিয়াছিলেন। তিনি ২।৩ বার কান্দাহার অভিযানে বিশেষ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

১১। রাজা বিঠলদাস গৌড়।—তিনি ক্রমোন্নতি করিয়া পাঁচ হাজারী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আজমির প্রদেশের সুবাদর বা গবর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে আকবরাবাদের গবর্ণর নিযুক্ত হন—কাবুলের সুবাদারী পদেও নিযুক্ত ছিলেন। ইতিহাসে তাঁহার অনেক সুকীর্ত্তি ও কৃতিত্বের উল্লেখ আছে। তাঁহার কয়েক পুত্র হাজারী ও দুই হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১২। বলভদ্র।—হাজারী পদে ছিলেন, নেজাম শাহের অভিযানে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৩। বেহারীদাস।—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। কাবুলে তুই হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়া তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সম্পাদন করেন।

১৪। রাজা ভীম রাঠোর।—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কয়েকটী যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন; বোরহানপুরের কালেক্টরের পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন; বিদ্রোহী জমিদারগণের নিকট হইতে সুকৌশলে তুইলক্ষ টাকা, ৬০টী হস্তী এবং চন্দোর জমিদারের নিকট হইতে একলক্ষ টাকা, ৩০টী হাতী আদায় করিয়া রাজ দরবারে প্রেরণ করেন।

১৫। রায় বলভী।—উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। বহু যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া রাজ দরবার হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

১৬। রায় বেহারীমল।—ক্রমোন্নতি করিয়া লাহোরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পরে সোল্‌তানের দেওয়ানী পদে বদলি হন। তৎপর প্রধান মন্ত্রীর দ্বিতীয় সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন। আবার শেষে পঞ্জাবের দেওয়ানী পদও লাভ করেন। সম্রাটের রাজত্বের বিংশতি বর্ষে হাজারী পদে নিযুক্ত হন।

১৭। রাজা পাহাড়সিং।—ক্রমোন্নতি করিয়া চারি হাজারী পদে উন্নীত হন। ইহা অতি সম্মানিত পদ। এই পদের লোকেরাই সুবাদার বা প্রাদেশিক গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইতেন। সেই কালে গবর্ণরের ক্ষমতা বিস্তর ছিল। তাঁহারা যেমন শাসন বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, তেমনই সামরিক বিভাগেরও সেনাপতির পদ রাখিতেন। ফলতঃ শাসন ও সমর উভয় বিভাগের তাঁহারা প্রাদেশিক হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বলখ বাদোখশান ও কান্দাহার অভিযানে শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও দারা শেকোর সহিত উপস্থিত ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রাজা ইন্দ্রমল পাঁচশতী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮। পৃথ্বীরাজ। তুই হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন—রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে খানেজাহান লোদীর পশ্চাদ্ধাবন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিই খানেজাহানের সহিত ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়া রাজ দরবার হইতে হস্তী, ঘোড়া ও প্রচুর অর্থ পুরস্কার লাভ করেন। নাসিক ও দওলতাবাদের তুর্গাবরোধেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে আকবরাবাদের তুর্গাধ্যক্ষের পদে বরিত হন। কাবুল বদোখশান অভিযানেও তাঁহার কার্য্য কুশলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

১৯। প্রসুজী।—খেলোজীর পুত্র। খেলোজী পাঁচ হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রসুজী তিন হাজারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভিযানে যশোবন্ত সিংহের সমভিব্যাহারী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বহুকাল শাসনকর্ত্তার সহকারী পদে বরিত থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রসুজী ও মানুজী উভয়ই আওরঙ্গজেবের

অধীনে দাক্ষিণাত্যে কাজ করিতেন। কিন্তু দারা শেকোর ইঙ্গিতে পলাইয়া আসিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। আওরঙ্গজেব যুদ্ধে জয়লাভ করার পর, তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তাঁহাদিগকে পেন্‌সন দিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর দান করেন। মায়ুজী বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা এবং প্রসুজী ২০ হাজার টাকা পেন্‌সেন প্রাপ্ত হইতেন। জগতের ইতিহাসে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শক্রর প্রতি এরূপ উদার ব্যবহারের পরিচয় তথাকথিত 'হিন্দু বিদ্বেষী' আওরঙ্গজেবের জীবনী ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। প্রসুজী পেন্‌সনে এত অধিক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, তিনি আশী হাজার টাকা দ্বারা জলগাঁওরে জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব প্রতিষ্ঠিত আওরঙ্গবাদের বক্ষে তিনি একটি মহল্লা নিজ নামে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা এখনও নগর প্রাচীরের অভ্যন্তর ভাগে 'প্রসুজী পুরা নামে খ্যাত আছে।

২০। রাজা প্রতাপচাঁদ।—বেহার ভূজপুরের অধিবাসী। দেড় হাজারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রার্থানুযায়ী তাঁহাকে স্থানীয় শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ভূজপুরের দুর্গকে দুর্ভেদ্য করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বেহারের সুবাদার আব্দুল্লাহ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান পূর্ব্বক তাহাকে বন্দী ও হত্যা করেন।

এস্‌লামাবাদী।

নীরব দান।

মান্ দিয়ে না আমায় তুমি
চাই নে আমি মান্‌কে—
ব'রে নেব আমি তোমার
নিবিড় নীরব দান্ কে
গভীর রে'তের অন্ধকারে
গ্রহ চন্দ্র তারকারে
যে তান দিয়ে হাসাইয়ে
হাসাও বিশ্ব প্রাণ কে—
প্রাণে আমার জাগাইয়ে
তোল গো সেই তান্ কে—

আড়ম্বরে মত্ত যারা হৃদয়েতে অন্ধ
বুঝিবে না তারা আমার নিরিবিলির আনন্দ।
শুয়ে ধুলায় পথের পরে
তাকা'য়ে ঐ নীলাম্বরে
গাহিতে চাই আমি আমার
জগত জোড়া গান কে—
মান দিয়ে না আমায় তুমি
চাইনে আমি মানকে।

শেখ হবিবর রহমান।

কোরআন।

লিখন এবং সম্পাদন।

ঐশী অঙ্গীকার—সর্ব্বপ্রকার দোষ শূন্য ও অসম্পূর্ণতা বর্জ্জিত সর্ব্বশক্তিমান খোদা তায়ালার অঙ্গীকার গুলির প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি এবং সেগুলি যেরূপ বর্ণে বর্ণে প্রতি-পালিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করি তখন তাঁহার অসীমশক্তি ও অপ্রতিহত প্রতাপের নিকট আমাদের মস্তক আপনি প্রণত হইয়া পড়ে, ভক্তি ও বিশ্বাসে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার অঙ্গিকার গুলি এরূপ পরিস্কার ও স্পষ্টরূপে পূর্ণ হয় যে কেবল বিশ্বাসীগণ নহে, অবিশ্বাসীরাও তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

খোদা তায়ালা পবিত্র কোরআণ মজিদ সম্বন্ধে ওয়াদা করিয়াছিলেন :—

انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحفظون

"আমি এই কোরআণ অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং আমিই তাহা রক্ষা করিব।" এই ঐ অঙ্গীকার এরূপ সম্পষ্ট ও অবিসম্বাদিত রূপে পালিত হইয়াছে যে কোরআনের ঘোর বিরোধীগণও তাহার সত্যতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা এ স্থানে একজন স্বনামখ্যাত এসলাম বিদ্বেষীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। সার উইলিয়াম মিওর আজীবন এসলামের যেরূপ শত্রুতা সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠক-বর্গের অবিদিত নহে। মোসলমানদিগের মধ্যে ক্রুশ পূজার প্রচার এবং প্রচলনের জন্য লাইফ অফ মোহাম্মাদ (Life of Mohammad) নামে তিনি যে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কোরআন মজিদ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, :—আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, পৃথিবীতে কোরআনের ন্যায় পরিবর্ত্তন শূন্য গ্রন্থ আর একটীও নাই। * ইহার পর তিনি অপর একজন খৃষ্টীয়ানের (Von Hammer) উক্তি নকল করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—"আমরা সেইরূপ বিশ্বাসের সহিতই এই কোরআনকে মোহাম্মাদের (দঃ) মুখনিসৃত উক্তি মনে করি, যেরূপ বিশ্বাসের সহিত মোসলমানগণ তাহাকে খোদার বাণী মনে করিয়া থাকেন।" +

এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মোসলমানদিগের হস্তে এখন যে কোরআন মজিদ রহিয়াছে তাহাই রাসুলেকরিমের প্রদত্ত কোরআন। তাহার ভাষা এবং শব্দের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম অথবা পরিবর্ত্তন হয় নাই।

---

* Life of Mohammad new Edition (1877) Page 562. + Ibid

এই সকল সাক্ষ্য মূল্যবান হইলেও মোসলমানগণ কোরআনের সত্যতা সপ্রমাণ করিতে মিউর ও হেমার সাহেবের মুখাপেক্ষী নহেন। মোসলমানের ইতিহাস আছে। এবং তাঁহারা ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণিত করিবেন যে কোরআন মজিদের কোন অংশ,—একটী মাত্র শব্দও পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে আমরা আর একটী গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিতেছি।

কোরআন মজিদের সংরক্ষণ বিষয়ক ঐশি বাণী সমন্বিত যে উক্তি আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে কোরআণ মজিদকে الذکر আজজেকর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কোরআন মজিদ তওরাৎ ইত্যাদি অন্যান্য স্বর্গীয় গ্রন্থ সম্বন্ধেও আজ্‌জেকর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কেহ বলিতে পারেন যে, উক্ত আয়েতে যেরূপ কোরআন মজিদের রক্ষা সম্বন্ধে অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তদ্রূপ উহাতে অন্যান্য স্বর্গীয় গ্রন্থ সম্বন্ধেও অঙ্গীকার হইয়াছে। কিন্তু তওরাৎ ও ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থের পরিবর্ত্তন এবং বিকৃতি প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অন্ততঃ তওরাৎ এবং ইঞ্জিল সম্বন্ধে খোদাতায়ালা তাঁহার অঙ্গীকার রক্ষা করেন নাই।

কোন খ্রীষ্টান লিখক এই আয়াতের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মোসলমানগণ কোরআনের এই উক্তি অনুসারে তওরাৎ এবং ইঞ্জিলের অবিকৃত ও অপরিবর্ত্তিত হওয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে কোরআন মজিদের কোন কোন স্থানে তওরাৎ এবং ইঞ্জিল আজ্‌জেক্‌র্‌ শব্দে অভিহিত হইলেও এই আয়াতে যে কেবল কোরআন মজিদকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সকলই চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

এই আয়াৎটি সুরাহ হেযরের নবম আয়াৎ। ঐ সুরাহ যে আয়াত দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে তাহা এইরূপ ;—

الر — تلک ایات الکتاب و قران مبین

"ইহা বর্ণনা কারী গ্রন্থ কোরআনের শ্লোকা"। তৎপর ৬ষ্ঠ আয়াৎ হইতে বলা হইয়াছে যে,—

وقالوا یا یہا الذي نزل علیه الذکر انک لمجنون لوما تاتینا بالملئکة ان کنت من الصادقین — ماننزل الملئکة الا بالحق وماکانو اذاً منظرین و انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون —

"এবং অবিশ্বাসীগণ বলিল :—হে (সেই ব্যক্তি) যাহার নিকট আজজেক্‌র অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি নিশ্চই উন্মাদ। তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে ফেরেস্তাগণকে কেন আমাদের নিকট আনায়ন কর না ? কিন্তু আমি ফেরেস্তাদিগকে কেবল (চরম) মীমাংসার জন্যই

প্রেরণ করিয়া থাকি (সুতরাং যখন ফেরেস্তাগণ আসিবে, তখন) আর তাহারা (অবিশ্বাসীরা) অবসর প্রাপ্ত হইবে না। নিশ্চয় আমিই আজ্‌জেক্‌র্ অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই তাহাকে রক্ষা করিব।”

এই আয়াতগুলির মধ্যে ‘আজজেক্‌র্’ শব্দ দুই বার ব্যবহৃত হইয়াছে। সমুদয় আয়াতের অর্থের প্রতি দৃষ্টীপাত করিলে সকলই বলিতে বাধ্য হইবেন যে ৬ষ্ঠ আয়াতে “আজ্‌জেক্‌র শব্দ” যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, নবম আয়াতেও তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ আয়াতটীতে যে ‘আজজেকর’ শব্দের অর্থ কোরআন মজিদ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই। রাসুলুল্লাহর সমসাময়িক ঈশ্বরদ্রোহী কাফেরগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিত উক্ত আয়াতটীতে তাহাই বলা হইয়াছে। রাসুলে করিমের উপর যে তওরাৎ ও ইঞ্জিল প্রভৃতি অবতীর্ণ হয় নাই তাহা আমাদের সহযোগী খৃষ্টান ভ্রাতাগণ যেরূপ অবগত আছেন, তদানীন্তন কাফেরগণও ঠিক তদ্রুপ জ্ঞাত ছিল।

আমরা আমাদের উক্তির সমর্থনের জন্য কোরআন মজিদের অপর সুরাহ হইতে কএটি আয়াত উদ্ধৃত করিতেছি :—

ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد

“যাহারা আজ্‌জেক্‌রকে অবিশ্বাস করিয়াছে (তাহারা স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিবে) অথচ ইহা মহিমান্বিত গ্রন্থ। পূর্ব্বে অথবা পশ্চাতে ইহার কোনরূপ বিকৃতি ঘটিতে পারে না।” *

এইরূপ আরও অনেকগুলি আয়াত আছে, যাহাদ্বারা স্পষ্টতঃ সপ্রমান হইতেছে যে, এই-রূপ স্থানে আজ্‌জেকর শব্দের অর্থ কোরআন ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। এবং একমাত্র কোরআন মজিদ সম্বন্ধেই খোদাতায়ালা বলিয়াছেন যে,কোন যুগে ও কোন অবস্থাতেই তাহার কোনপ্রকার বিকার, পরিবর্ত্তন বা ক্ষতি হইবে না।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, কোরআন মজিদ সম্বন্ধে খোদাতায়ালা যে অঙ্গিকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালিত হইয়াছে কি না ?

যদি খোদাতায়ালার এই অঙ্গীকার পূর্ণ না হইত এবং কোরআন মজিদের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইত, তাহা হইলে, যাহাদের সম্মুখে এই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সেই লক্ষ লক্ষ সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ নিশ্চয়ই তাহা দেখিতে পাইতেন। এরূপ অবস্থায় হয় তাঁহারা কোরআন মজিদের ঐশীবাণী হওয়া অস্বীকার করিতেন অথবা উপরোক্ত কোরআনের শ্লোকগুলির অন্য কোনরূপ অর্থ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইতেন। কিন্তু সকলই জ্ঞাত আছেন যে, অগণিত সাহাবী এবং লক্ষ লক্ষ তাবেয়ীগণের মধ্যে কেহই কোরআনের কালামে-এলাহী হওয়া অস্বীকার করেন নাই। এবং শ্লোকগুলির আমরা যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই সকলে

* পারা ২৪, রুকু ১৯।

একমত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যদ্যপি তাঁহাদের মধ্যে কেহ অন্য কোন অর্থ করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা আমরা জানিতে পারিতাম। এবং হাদিস, তফসীর, সাহাবা—জবনী ও ইতিহাস ইত্যাদির লক্ষ লক্ষ গ্রন্থের মধ্যে কোনওটীতে অবশ্য তাহার উল্লেখ থাকিত।

হয়ত কেহ বলিবেন যে, ইহাদ্বারা কোরআন মজিদের দোষ প্রমাণিত হয় বলিয়া কোন মোসলমান তাহা লিখিয়া যান নাই। কিন্তু যে মোসলমানগণ তাঁহাদের মকুটমণি রাসুলে করিমকে নিরক্ষর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার ত্রয়োদশ বা সপ্তদশ সহধর্ম্মিণীর জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাঁহারা হজরাৎ জয়নাবের ঘটনা লিখিতে ভুলেন নাই, যাঁহারা মগাফীর কাহিনীর উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই, যাঁহারা বদরযুদ্ধের বন্দিদিগের গল্প এবং আবদুল্লাহ এব্‌নে ওম্মে মাখতুমের উপাখ্যান লিখিতে বিস্মৃত হন নাই। যাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ এব্‌নে মাসউদ ও ওবাই এব্‌নে কায়াবের ন্যায় সরল প্রাণ মহাত্মাগণও বিদ্যমানছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে ওহাব এব্‌নে মোমাব্বাহ, ওয়াকেদী এবং আবদুল্লাহ এব্‌নে লোহাইয়া প্রমুখ লিখকগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা দুর্‌রে মানস্থর ও এৎকানের ন্যায় গ্রন্থ লিখিতেও কুণ্ঠীত হন নাই, সেই মোসলমানদিগের উপর সত্য গোপেনের দোষারোপ করা কতদূর অন্যায় ও অসঙ্গত তাহা মোসলমানের অভ্রান্ত ইতিহাস ও মোসলমানের অতুলনীয় সত্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই বুঝিতে পারেন।

মোসলমান ইতিহাস বিহীন জাতি নহেন। এবং ইতিহাসকে তাঁহারা ইতিহাসরূপেই আলোচনা করিয়াছিলেন। স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি অনুরাগ, সম্প্রদায়িক স্বার্থ, কিছুই তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা দোষ ও কলঙ্ককে বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা গুণে ও যশে পরিণত করিতে জানিতেন না, পরাজয় এবং অকৃত কার্য্যতাকে লিপিচাতুর্য্যের সাহার্য্য জয় ও সফলতার আকারে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। পাঠক, তুমি সে যুগের মোসলমান-কর্ত্তৃক লিখিত যে কোন ইতিহাস খোল, দেখিতে পাইবে যে, লিখক যেরূপ মিত্রপক্ষের কথাগুলি লিখিয়াছেন শত্রুপক্ষের উক্তি গুলিও সেইরূপ যত্নের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার গ্রন্থ অনেক স্থানে পরস্পর বিরোধী উক্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। কারণ তিনি ইতিহাস লিখিয়াছেন—জাতীয় গাথা লিখেন নাই।

পক্ষান্তরে যদি কোন বিষয়ের সত্যতার বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি যত বড় মহাপুরুষের উক্তিই হউক না কেন; তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেন। এমন কি রাসুলে করিমের কোন উক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের হৃদয়ে সন্দেহের উদয় হইলে তাহার প্রতিবাদ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠীত হইতেন না। এতদ্‌-সম্বন্ধে আমরা একটী উদাহরণের উল্লেখ করিতেছি, পাঠক তাহা পাঠ করিলে আমাদের উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

রাসুলুল্লাহ স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন :—যেন তিনি সহচরগণ সহ বয়তুল্লাহ প্রদক্ষিন করিতে ছেন" ইহাতে তিনি মনে করিলেন যে খোদাতায়ালা তাঁহাকে সহচরগণ সহ হজ্ব করিতে আদেশ করিতেছেন! সুতরাং তিনি ১৪০০ শতের অধিক সাহাবী সমভিব্যাহারে মক্কা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন তিনি হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপনিত হইলেন, মক্কার কোরায়শগণ,এই সংবাদ অবগত হইয়া সদলবলে বহির্গত হইল এবং তাঁহার অগ্রগমণে বাধা দিল অনেক বাদ প্রতিবাদের পর উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহাই মোসলেম ইতিহাসে "সোল্হে হোদায়বিয়া" বা হোদায়বিয়া সন্ধি নামে অভিহিত। এই সন্ধি অনুসারে রাসুলুল্লাহ কে সেববারের মত মদিনা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। মোস্লমানগণ এই সন্ধিতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এবং রাসুলে করিমের স্বপ্ন অনুসারে হজ্জব্রত সমপান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে আশ্বাস্ত হইয়াও যখন তাঁহারা তাহাতে বঞ্চিত হইলেন, তখন রাসুলে করিমের উক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। এমন কি রাসুলগত প্রাণ হজরাৎ ওমরের হৃদয়ও সংশয়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি রাসুলে করিমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—

فقال عمر بن الخطاب فاتيت النبي صلعم' فقلت الست نبي الله حقا ? قال – بلي. قلت السنا علي الحق وعدونا علي الباطل ? قال بلي. قلت فلم نعطي الدنية في ديننا اذا ? قال – اني رسول الله' ولست اعصيه وهو ناصري قلت او ليس كنت تحدثنا انا سنأتي البيت فنطوف به ? قال بلي. افا خبرتك انا نأتيه العام ? قلت لا. قال فانك اتيه ومطوف به.

আপনি কি খোদার সত্য রাসুল নহেন? তিনি বলিলেন, নিশ্চই হই। আমি বলিলাম আমরা সত্যের পক্ষে এবং আমাদের শত্রুগণ মিথ্যার পক্ষে নহে? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই তাহাই। আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা আমাদের ধর্ম্মের এই অবমাননা সহ্য করিতেছি? তিনি বলিলেন, আমি খোদার প্রেরিত এবং আমি তাঁহার অবাধ্য হইতে পারি না। আমি বলিলাম, আপনি কি আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন নাই যে, আমরা অল্প দিনের মধ্যে বয়তুল্লাহে উপস্থিত হইয়া তাহা প্রদক্ষিণ করিব? তিনি বলিলেন, নিশ্চই করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি কি তোমাকে ইহাও জানাইয়াছিলাম যে, আমরা বর্ত্তমান বর্ষেই তথায় উপস্থিত হইব। আমি বলিলাম 'না'। তিনি বলিলেন, তোমরা নিশ্চই তথায় পৌছিবে এবং প্রদক্ষিণ করিবে। রাসুলে করিমের প্রতি হজরাৎ ওমারের ভক্তি যেরূপ গভীর ছিল তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। তিনি কায়মনবাক্যে রাসুলে করিমকে বিশ্বাস করিতেন এবং নিশ্চয় রূপে জানিতেন যে রাসুল যাহা করেন তাহা খোদার অভিপ্রায় অনুসারেই করেন। কিন্তু সেই দৃঢ়-চেতা, ভক্তকুল-শ্রেষ্ঠ রাসুলগত প্রাণ ওমার রাসুলে-করিমের উক্তিতে সামান্য-মাত্র সন্দেহ হওয়ায় স্পষ্ট অথচ দৃঢ়রূপে তাহা ব্যক্ত করিলেন। এই একটি ঘটনা হইতেই,

আমরা বুঝিতে পারি যে সে যুগের মোসলমানগণ সত্য প্রচারে কিরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন, এবং মিথ্যার সামান্য সন্দেহও তাঁহারা কতদূর বিচলিত হইয়া উঠিতেন। ঘটনা কত সামান্য! রাসুলুল্লাহ হজ্ব ব্রত পালনের ইচ্ছা করিলেন কিন্তু মক্কাবাসীগণের সহিত সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী এক বৎসরের জন্য তাঁহাকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সামান্য বিষয়েই তদানীন্তন মোসলমানগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন, এবং প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে আলোচনায় ক্ষান্ত হইলেন না।

মোসলমানগণ মনে করিয়াছিলেন যে মক্কা শরিফ সম্বন্ধে খোদাতায়ালা যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, হোদায়বিয়া সন্ধিদ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। রাসুলুল্লাহ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন:—আমাদের পবিত্র মক্কা প্রবেশ সম্বন্ধে খোদাতায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন। কিন্তু কবে আমরা তথায় প্রবেশ করিব, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই, এ বৎসর আমরা প্রবেশ করিতে পারিলাম না সত্য, কিন্তু ইহাতে এলাহী ওয়াদার কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই। খোদাতায়ালার অঙ্গীকার অবশ্য পূর্ণ হইবে, এবং আগামী বৎসর আমরা তথায় নিশ্চয় প্রবেশ করিব। মোসলমানগণ যখন এই সত্য অবগত হইলেন, তাঁহাদের সমুদয় সংশয় ও সন্দেহ বিদূরীত হইয়া গেল এবং তাঁহাদের হৃদয় বিশ্বাস ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পাঠক, এই হাদিস দ্বারা আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন। যে সাহাবীগণ সর্ব্বদা সত্যানুসন্ধানে তৎপর থাকিতেন এবং কোন বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত তাহার সমালোচনা করিতেন, এমন কি রসুলে করিমের সম্মুখেও তাঁহারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কোরআন মজিদ সম্বন্ধে খোদাতায়ালা যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক সাহাবীই অবগত ছিলেন। এরূপ অবস্থায় কোরআন মজিদের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্জ্জন, পরিবর্দ্ধন অথবা পরিবর্ত্তন হইলে নিশ্চয় তাঁহাদিগের মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইত এবং তাঁহারা প্রকাশ্য রূপে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যে আলোচনা-স্রোত তাঁহাদের বংশধরদিগের নিকটও আসিয়া পৌঁছিত। এবং ইতিহাস, হাদিস ও তফ্‌সীর গ্রন্থে আমরা তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু মোসলমান কর্ত্তৃক লিখিত কোন গ্রন্থে আজ পর্য্যন্ত এতৎ সম্বন্ধে আমরা কোনই উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি—কোরআন মজিদের কোনরূপ বিকার ও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এবং বলিতে বাধ্য হইতেছি—পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে খোদাতায়ালা যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হইয়াছে। ক্রমশঃ।

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেলবাকী।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي علی رسوله الكريم

আল্-এস্‌লাম।

১ম ভাগ { মাঘ, ১৩২২ } ১০ম সংখ্যা

এস্‌লাম সভ্যতা ও উন্নতির পরিপন্থী নয়, বরং সহায় ও উৎসাহদাতা।

কোন ধর্ম্মের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে হইবে যে, সে ধর্ম্ম সভ্যতা ও উন্নতির প্রতিরোধক না সহায়, বস্তুতঃ ইহাই ধর্ম্মের পূর্ণতা প্রমাণের শ্রেষ্ঠতম উপায়। কিন্তু এই সত্য মিথ্যা ও পূর্ণতা নির্ণয়ের সন্ধিক্ষণে [illegible] অপর সকল ধর্ম্মই বিষম গোলে পড়িয়া থাকে; এবং যে জিনিষ জড়বাদিগণকে ধর্ম্মের শত্রু করিয়া তুলিয়াছে, তাহাও ইহাই—অর্থাৎ তাহাদের দৃষ্টিতে ধর্ম্ম সকলই পার্থিব সভ্যতা ও উন্নতির পরিপন্থী। এ সম্বন্ধে জড়বাদিগণের যুক্তি এইরূপ:—

১। "ধর্ম্ম কেবল বিশ্বাস পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আমাদের কথাবার্ত্তা, চলাফেরা, ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কার্য্য কলাপের প্রতি স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। উঠা বসা, বিশ্রাম নিদ্রা, পানাহার প্রভৃতি একটি বিষয় ও তাহার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, এরূপ ঘোর নিপ্পেষণ যন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া মানুষ কিরূপে উন্নতি সাধন করিতে পারে? এইজন্য যখনই যে জাতি উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তখনই তাহারা পূর্ব্বে ধর্ম্মের অত্যাচার হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া তবে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

২। ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপাদি এতই অধিক ও কঠোর যে, তাহা পালন করিতে গেলে গার্হস্থ্য জীবন ও সভ্যতার উন্নতি বিধানের আদৌ সুযোগ পাওয়া যায় না।

৩। প্রত্যেক ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহারই ফলে কখনও কোন জাতি ন্যায় বিচারের সহিত, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর উপর শাসন দণ্ড প্রচলন করিতে পারে নাই, এবং এই জন্যই মানবজাতির অধিক সংখ্যক লোক চিরদিনই লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ঘৃণীত থাকিয়া সভ্যতা এবং উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইয়া, অসভ্যতা ও অবনতির গভীর পঙ্কে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।"

জড়বাদিগণের ঐ সকল যুক্তির হস্ত হইতে অপর সকল ধর্ম্ম অব্যাহতি পাইতে পারে না সত্য, কিন্তু এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি আদৌ ঐ সকল দোষারোপ করা যাইতে পারে না। আমরা এসলামের বিধান পবিত্র কোরআন হইতে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব। পৃথিবীর অপর সকল ধর্ম্মই মানব জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যাপার সমূহকে ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে স্থান দিয়া মানবের বিবেক ও স্বাধীনতাকে যে, অচ্ছেদ্য বেড়ী দিয়া আবদ্ধ করিয়া মানবকে সত্য হইতে মিথ্যার অন্ধকারময় গভীরতম কূপে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মানবকে সেই বন্ধন মুক্ত ও মিথ্যার অন্ধ কূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই এসলামের আবির্ভাব হইয়াছিল। এসলাম আবির্ভূত হইয়াই, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে উদারতার, বন্ধনের বিরুদ্ধে মুক্তির ও অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে স্বাভাবিকতার তূর্য্যনাদে দিক দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। এবং তাহারই প্রসাদে মানব স্বীয় মানবত্বকে উপলব্ধি করিয়া, মনুষ্যত্বের জয়ডঙ্কা হাতে লইয়া পাগলের মতন দিক দিগন্তরে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইয়াছিল। মানবের মস্তিষ্ক যুগ যুগান্তের সংকীর্ণতা ও অধীনতার বন্ধন মুক্ত হইয়া, উদারতা ও স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে আসিয়া যে সুখ পাইয়াছিল, তাহার অপর মানব ভ্রাতাদিগকে তাহার ভাগী করিবার জন্য জগতের যাবতীয় বিপদরাশিকে সে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। জগত আজ যে স্বাধীনতা কি? তাহা বুঝিয়া তাহার নামে জয় গান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে, ইহার একমাত্র পথ প্রদর্শক তাহারাই। অর্থাৎ এসলাম সন্তান, সেকালের আরব।

এস্‌লাম ধর্ম্মে এই সকল বিষয় আদৌ পরিদৃষ্ট হয় না।

জড়বাদিগণের উপরোক্ত প্রশ্ন গুলি লইয়া অপরাপর ধর্ম্মের নিকট উপস্থিত হইলে আমরা কি দেখিতে পাইব? দেখিতে পাইব যে, তাহাদের কথা বাস্তবিকই সত্য। জগতের অতি পুরাতন ইহুদী ধর্ম্ম মতে—মনুষ্য জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারই ধর্ম্মের অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত। কেবল ইহুদী কেন, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মেরই এই একই দশা। আল্লাহতা'লা মানব জাতিকে এই সকল অস্বাভাবিকতার হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য, সত্য সনাতন এসলামকে প্রেরণ করিয়া তাহার দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে,—

الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورة والانجيل يامرهم بالمعروف و ينههم عن المنكر و يحل لهم الطيبت و يحرم عليهم الخبئث و يضع عنهم اصرهم والاغلل التي كانت عليهم ۞

"যাহারা সুসংবাদ দাতা নিরক্ষর (উম্মি) পয়গম্বরের অনুসরণ করে, তাহারা আপনাদের নিকটে তওরাত ও ইঞ্জিলে যাহা (তাঁহার আগমন সম্বন্ধে যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী) আছে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। সে (পয়গম্বর) তাহাদিগকে সৎকার্য্য করিতে আদেশ করে ও মন্দ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করে ও তাহাদের জন্য শুদ্ধ ব স্তবৈধ এবং তাহাদের সম্বন্ধে অশুদ্ধ বস্তু অবৈধ করে। অপিচ ভার ওগলবন্ধন যাহা তাহাদের উপরে আছে, তাহাদিগ হইতে তাহা দূর করে"। (কোরাণ, সুরাএরাফ ১৯ রুকু ১৫৮ আয়াত)

এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে, ইহুদী ও অপর সকলের উপর এমন কি গুরুভার ছিল যাহা তাহাদিগ হইতে শেষ পয়গম্বর দূর করিলেন, এবং তাহাদের গলায়ই বা কি বন্ধনই ছিল, যাহা হইতে তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন।

পবিত্র কোরআনে বিভিন্নস্থলে খৃষ্টান ও ইহুদীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে— لا تغلو فى دينكم অর্থাৎ "ধর্ম্মে সীমা অতিক্রম করিওনা" ধর্ম্মে غلو বা সীমা অতিক্রম দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথম :—প্রত্যেক বিষয় ও কার্য্যকে ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে গণ্য করা, মানবের প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রতি পদক্ষেপে বাধা প্রদান করা। যেমন, অমুক জাতি অস্পৃশ্য তাহার সহিত উঠা বসা করিওনা করিলে জাতি যাইবে। সমুদ্র গমন নিষিদ্ধ। প্রত্যেক কার্য্যের শুভাশুভ সময় নির্ণয় এবং ইহুদী পাদ্রীদের প্রায় সমস্ত ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় :—ধর্ম্মের সরল বিধি ব্যবস্থাকে কঠোর করিয়া তাহা মানুষের পক্ষে অপালনীয় করিয়া তোলা। এসলাম এ দুয়েরই মূলোৎপাটন করিয়াছে। অপর ধর্ম্মাবলম্বী-লোকেরা ধর্ম্মের পরিসরকে বিস্তৃত করিয়া তাহাকে এতই জটিল করিয়া তুলিয়াছিল যে, সুস্বাদু দ্রব্য আহার করা, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করা, মনোহর স্থান দর্শন করা, ইত্যাদি জীবনের সকল প্রকার সুখ শান্তিকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত এবং নিষিদ্ধ বিষয় বলিয়া স্থির করতঃ তাহারা ঐ সকল বিষয়কে অবৈধ সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল। এ সম্বন্ধে এসলাম ঘোষণা করিল :—

قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده من الطيبت من الرزق

"হে (পয়গম্বর) তুমি তাহাদিগকে বল যে, খোদাতালার সেই শোভা (জিনত) ও পবিত্র উপজীবিকা যাহা তিনি আপন দাসদিগের জন্য সৃজন করিয়াছেন, সে সকলকে কে অবৈধ (হারাম) করিল?" (সুরা এরাফ, ৪ রুকু।)

আল্লাহতালার এই আদেশানুযায়ী প্রেরিত মহাপুরুষ মানব জীবনের অপরাপর পার্থিব ক্রিয়া কলাপাদিকে ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে স্থান দান করিয়া বলিয়াছেন যে,

انتم اعلم بامور دنياكم

অর্থাৎ পার্থিব ক্রিয়াকলাপাদির বিষয়ে তোমরা অপেক্ষাকৃত অধিক অবগত আছ।

জড়বাদিগণের দ্বিতীয় প্রশ্নটির সহিত এসলামের কোন সম্পর্কই নাই। এসলাম দম্ভের সহিত দাবী করিয়াছে যে, তাহার ধর্ম্মবিধি বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপাদি সরল ও সহজ ;—

و ما جعل عليكم فى الدين من حرج

এবং তিনি (আল্লাহ) ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদের প্রতি কোনরূপ ক্লেশ প্রদান করেন নাই। (সুরাহজ্জ ১০ রুকু ৭৮ আয়াত)

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم

"আল্লাহতালা তোমাদের উপর ক্লেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না, বরং তিনি তোমাদিগকে শুদ্ধ করিতে ও তোমাদের প্রতি আপন দান পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন।" (সুরা মায়দা ২ রুকু)

يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر

"আল্লাহতালা তোমাদের কার্য্য (নিয়ম) সহজ করিতে চাহেন, এবং তিনি তোমাদিগকে কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না।" (সুরাবকর ২৩ রুকু ১৮৫ আয়াত)

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

আল্লাহতালা কাহাকেও তাহার শক্তির অতিরিক্ত ক্লেশ দান করেন না। (সুরা—বকর ৪০ রুকু ১৮৬ আয়াত)

يريد الله ان يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفا

"আল্লাহতালা তোমাদিগের ভার লঘু করিতে চাহেন, যেহেতু, মনুষ্য দুর্ব্বল সৃষ্ট হইয়াছে।" (সুরা—নেসা ৫ রুকু ২৮ আয়াত)

এই সকল কেবল কথা মাত্র নয়, বরং এস্লামের বিধি ও প্রাথমিক মোসলমানগণের ব্যবহারিক জীবন ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দিতে সদাই প্রস্তুত। কয়েক প্রকারে ধর্ম্মবিধি কঠোর ও অপালনীয় হইতে পারে।

১। ফরজের (অবশ্য কর্ত্তব্যের) সংখ্যা অধিক হওয়া এবং তাহার নিয়মাদি এত কঠিন হওয়া যে, তাহা পালন করা দুষ্কর অথবা তাহা পালন করিতে গেলে অধিক সময় লাগে।

এসলাম ধর্ম্মে মাত্র, নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ্জ ও জেহাদ এই পাঁচটি মূল ফরজ। হজ্জ ও জাকাত ধনী লোকদের জন্য পালনীয়, জেহাদ আত্মরক্ষার আবশ্যক হইলে ফরজ হয়। নামাজ ও রোজা মাত্র এই দুইটী ফরজ অনুষ্ঠান নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল মোসলমানই পালন করিতে বাধ্য। রোজা বৎসরের মধ্যে এক মাস, তাহাও প্রবাসী, পীড়িত, এবং নিতান্ত দুর্ব্বল মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়।* নামাজ অবশ্য কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করা যাইতে পারে না, কিন্তু তাহাতেও অবস্থা ভেদে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটান যাইতে পারে। যেমন, পীড়িতের জন্য অজু (হস্ত পদাদি ধৌত) করিবার আবশ্যক নাই, অশ্ব বা নৌকা ইত্যাদি যানাদিতে গমনাগমনকালে নামাজ পড়িবার সময় ঠিক পশ্চিমাভিমুখিন হইবার আবশ্যক নাই।

* কাজা ও দারিদ্র ভোজন দ্বারা—সম্পাদক।

আবশ্যক হইলে অবস্থাভেদে, দাঁড়াইয়া বসিয়া, শুইয়া, যানোপরি আরোহণ করিয়া সর্ব্বাবস্থাতেই নামাজ পড়া যাইতে পারে। বিদেশ ভ্রমণকালে ফরজ চারি রেকাতের স্থলে মাত্র দুই রেকাত পড়িতে হয়। নামাজ পূর্ণ করিতে যে সকল নিয়ম পালন করা আবশ্যক, তন্মধ্যে অল্প সংখ্যক নিয়মকে বিশেষত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, অপর সকল সম্বন্ধে তেমন বাধ্য বাধকতা নাই। যেমন হস্ত ছাড়িয়া দিয়াও নামাজ পড়িতে পারা যায়, এবং হস্তের দ্বারা হস্ত ধারণ করিয়াও নামাজ পড়া চলে, আবার হস্তদ্বয় বক্ষোপরি ধারণ করিয়াও নামাজ পড়া চলে, এবং নাভির উপরে বা নিম্নে হস্ত ধারণ করিয়াও নামাজ পড়া সিদ্ধ। সুরা ফাতেহা পাঠানান্তে "আমিন" চেচাইয়া বা আস্তে দুই প্রকারেই বলিতে পারা যায়। ফল কথা,—কয়েকটি বিষয় ব্যতীত অবশিষ্ট গুলিতে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালনের বাধ্য বাধকতা নাই। এই জন্য বিভিন্ন এমাম বিভিন্ন পন্থাবলম্বন করিয়াছেন।

২। ফরজ (অবশ্য কর্ত্তব্য) কর্ম্ম গুলিন পালন করিবার জন্য, বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে তাহার সহিত সংযোগ করতঃ সে গুলিন ও ঐ ফরজের সহিত অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা। অন্যান্য ধর্ম্মে এবম্বিধ যত প্রকার কঠোর নিয়ম ছিল বা আছে, তাহা সেই সেই ধর্ম্মের, ধর্ম্ম পুস্তক দেখিলে জানিতে পারা যায়, উদাহরণস্থলে দেখান যাইতে পারে যে, কোরবাণী— যাহা এসলাম ধর্ম্মের ব্যবস্থা মতে নিতান্ত সহজ ও সরল নিয়মে সমাধা করা যাইতে পারে, ইহুদী ধর্ম্ম পুস্তক তওরাতে সেই কোরবাণী সমাধার জন্য যে সকল সর্ত্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সামান্য দৃষ্টান্ত এ।

"হারোণ পাপার্থে এক গো বৎস ও হোমার্থে এক মেষ সঙ্গে লইয়া, এইরূপে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে। সে পবিত্র শুক্ল অঙ্গ রক্ষক বস্ত্র পরিধান করিবে ও শুক্ল জাঙ্গিয়া পরিধান করিবে, ও শুক্ল কটিবন্ধন পরিবে, ও শুক্ল উষ্ণীষেতে বিভূষিত হইবে; এ সকল পবিত্র বস্ত্র, অতএব সে জলে আপন শরীর ধৌত করিয়া এই সকল পরিধান করিবে। পরে সে এস্রায়েলের সন্তানগণের মণ্ডলীর নিকটে পাপার্থে দুই ছাগ ও হোমার্থে এক মেষ লইবে। এবং হারোণ আপনার কারণ পাপার্থকবলি যে গোবৎস তাহাকে আনয়ন করিয়া আপনার ও নিজকুলের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পরে সেই দুই ছাগ লইয়া সমাগমের তাম্বুর দ্বার সমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে আসিবে। পরে হারোণ ঐ দুই ছাগের বিষয়ে গুলিবাঁট করিবে, তাহার একটি সদাপ্রভুর নিমিত্ত ও অন্যটী ত্যাগের নিমিত্তে হইবে। পরে যে ছাগগুলি বাঁটের দ্বারা সদাপ্রভুর নিমিত্তে হইবে, হারোণ তাহাকে লইয়া পাপার্থে বলিদান করিবে।"

"এবং সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ বেদি হইতে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারেতে পূর্ণ অঙ্গার ধানী ও একমুষ্টি চূর্ণীকৃত সুগন্ধি ধূপ লইয়া তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে যাইবে। এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে অগ্নিতে ঐ সুগন্ধি ধূপ দিবে; তাহাতে সাক্ষ্য সিন্দুকের উপরিস্থ পাপাবরণ ধূপের ধূম মেঘে আচ্ছন্ন হইলে সে মরিবে না। পরে সে ঐ গো-বৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া পাপাবরণের পূর্ব্বপার্শ্বে

অঙ্গুলি দ্বারা প্রক্ষেপ করিবে, এবং অঙ্গুলি দ্বারা পাপাবরণের সম্মুখে ঐ রক্ত সাতবার প্রক্ষেপ করিবে"। (লেবীয় পুস্তক ১৬ অধ্যায়)

হিন্দু এবং অপর সকল ধর্ম্মেই এবম্বিধ বহুতর হাস্যোদ্দীপক নিয়ম ও সর্ত্ত দৃষ্টিগোচর হয়। এমন কি, ধর্ম্ম যাজকের উপস্থিতি ও বহু আড়ম্বর অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই স্বাধীন ভাবে আল্লার উপাসনা আরাধনাও করিতে পারে না। হিন্দুদিগের ব্রাহ্মন পণ্ডিতের (পুরুতের) আবশ্যক, খ্রীষ্টানদিগের পাদ্রীর এবং ইহুদীদিগের আহবারের আবশ্যক হয়। কিন্তু মুসলমানদিগের উপাসনা আরাধনায় অপর কোন ব্যক্তির সাহায্যের আবশ্যক করে না, প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে খোদাতাআলার উপাসনা আরাধনা করিতে পারে। তাহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পাদ্রী প্রত্যেকেই প্রত্যেকের "পুরুত," এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আহবার।

যদিও এস্লাম আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির আদর্শের জন্য এরূপ কোন কোন নিয়ম অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছে যে, মূলে ইহার কোন আবশ্যকতা নাই। নামাজ পড়িবার জন্য যেমনই "কেব্‌লা" (১) অভিমুখিন হইতে আদেশ করিয়াছে, তেমনই তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছে যে,

اینما تولوا فثم وجه الله

অর্থাৎ "যেদিকে তোমরা মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই আল্লার আনন আছে" সুরা বাকরা ১৪ রুকু। (২)

এস্লাম যেমনি কোরবাণী করিতে আদেশ করিয়াছে, অমনি বলিয়া দিয়াছে :—

لن ينال الله لحومها و لا دماؤها و لكن يناله التقوى

'খোদাতাআলার নিকটে তাহার মাংস ও তাহার রক্ত কখনও পঁহুছিবে না, কিন্তু তাঁহার নিকটে তোমাদিগের সততা উপস্থিত হইবে, (সুরা 'হজ্ব' ৫ রুকু)।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে পরে বর্ণিত হইবে। আমরা কেবল এরূপ দাবী করিতেছি না যে, "এস্লাম" সভ্যতার সঙ্গ দিতে সক্ষম। বরং আমাদিগের দাবী এই যে, এস্লাম অধিকতর উন্নতি বিধান করিয়া তাহাকে উন্নতির শেষমার্গে উপনীত করিতে সক্ষম।

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আজ ইউরোপ পার্থিব সভ্যতায় যত দূর উন্নতিলাভ করিয়াছে, পূর্ব্বে কখনও সেরূপ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এইজন্য আধুনিক সভ্যতার উন্নতির ভিত্তি কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয় লইয়া আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

(১) যেদিক মুখ করিয়া নামাজ পড়া হয় সেইদিককে কেবলা বলে, পবিত্র কাবা গৃহাভিমুখে মুখ করিয়া আমরা নামাজ পড়ি, কাবাগৃহকেই কেবলা বলে।

(২) অর্থাৎ কাবারদিকে মুখ করার আদেশ কেবল উপাসনার সমতা ও জাতির একতা রক্ষার জন্য, উহাই মূল লক্ষ্য নহে। বলা আবশ্যক যে, নামাজ ব্যতীত অপর কোন প্রার্থনা ও এবাদতে এইরূপ সর্ত্ত নাই। —সম্পাদক।

ইউরোপীয় সভ্যতার মূল নীতিগুলি নিম্ন-প্রদর্শিত কয়েকটি বিশেষ নিয়মে গণনা করা যাইতে পারে। এবং পৃথিবীতে যখন যে জাতি সভ্যতায় উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে করিবে, তাহারাও সেই নীতির অনুসরণ করিয়াছে এবং করিতে বাধ্য হইবে।

সভ্যতার উন্নতিবিধানের অবলম্বন স্বরূপ সকল মূল নীতিই এস্‌লামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১। মানুষের পক্ষে, সর্ব্ববিধ উন্নতির উচ্চমার্গে আরোহণের প্রথম সোপান এই যে, তাহারা বুঝিবে যে, সৃষ্টির মধ্যে তাহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। এবং সমগ্র জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান রহিয়াছে সে সকলই তাহাদেরই উপকারার্থে সৃষ্ট হইয়াছে। (১)

সর্ব্বপ্রথমে পবিত্র কোরআনই এই বিষয়টির শিক্ষা দিয়াছে, যথা:—

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم

"সত্য সত্যই আমি মনুষ্যকে অত্যুত্তম সঙ্গঠনে সৃষ্টি করিয়াছি" সুরা তিন ৩ আয়াত।

و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعا

"স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আল্লাহতাআলা সে সমুদয়কেই তোমাদের অধিকৃত (আজ্ঞাবাহী) করিয়াছেন"। সুরা লোকমান ৩ রুকু।

পবিত্র কোরআনে এবম্বিধ বহু উক্তি আছে, সে সকল ক্রমান্বয়ে পরে বর্ণিত হইবে।

মানুষের সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীতি এই যে, তাহাদিগের এরূপ ধারণা হইবে যে, তাহাদের জীবনের মঙ্গলামঙ্গল, উন্নতি, অবনতি, উত্থান, পতন ইত্যাদি সকল বিষয়ই তাহাদের চেষ্টা চরিত্রের উপর নির্ভর করে, এবং পার্থিব পারলৌকিক সর্ব্ববিধ সাফল্য মাত্র তাহাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, এই নীতিকে পবিত্র কোরআন বিশেষ দৃঢ়তার সহিত পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়াছে।

لیس للانسان الا ما سعی

"যাহা চেষ্টা করে তদ্ভিন্ন মানুষের জন্য অন্য ফল নাই। সুরা নজম ৩ রুকু। অর্থাৎ যে যতটুকু পরিশ্রম বা চেষ্টা করিবে সে ততটুকু ফল লাভ করিবে।

لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت

১। † রসায়ন, ভৈষজ্য তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব অর্থাৎ বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারের মূলে, মানবের যে অনুসন্ধিৎসা,—'সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুই মানবের উপকারের জন্য" এই তত্ত্বজ্ঞানই সে সকলের মূলীভূত কারণ। কারণ সৃষ্টির অন্যান্য বস্তু হইতে উপকার লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত না হইলে, ঐ সকল আবিষ্কার কখনই সম্ভবপর হইত না। তাই বলা হইয়াছে—

و خلق لکم ما فی الارض جمیعا

অর্থাৎ পার্থিব সমস্ত পদার্থই তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্ট হইয়াছে। —সম্পাদক।

"সে (মানুষ) যে (ক্ষতির) কার্য্য করিয়াছে তাহা—(তাহার ফল) তাহার জন্ত, এবং সে (মানুষ যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহার ফল তাহার প্রতি হয়" (সুরা বাকরা ৪০ রুকু।)
অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারাই মনুষ্য লাভবান হয় এবং কর্ম্মে অবহেলা বশতঃ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে।

و لا تكسب كل نفس الا عليها (انعام)

"এবং প্রত্যেকেরই কার্য্যের ফল তাহারই জীবনের প্রতি বই বর্ত্তে না।" (সুরা আনআম ২০ ১৬৫ আয়াত)

اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند انفسكم
(آل عمران)

"যখন এক বিপদের উপর দ্বিতীয় বিপদ তোমাদের উপর আপতিত হইল, তখন তোমর বলিলে যে, ইহা (এই বিপদ) কোথা হইতে আসিল। বল হে (মোহাম্মদ সঃ) ইহা তোমাদিগে নিজ হইতে হইয়াছে।" (সুরা আলে এমরাণ ১৭ রুকু ১৬৫ আয়াত)

ذلك بان الله لم يك مغيراً نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم

"ইহা এইজন্ত যে, খোদাতালা কখনও কোন জাতিকে সম্পদ প্রদান করিয়া তাহার পরিবর্ত্তঃ করেন না, যে পর্য্যন্ত তাহারা আপনাদের জীবনে যে (ভাব) আছে, তাহার পরিবর্ত্তন না করে।" (সুরা আন্‌ফাল ৭ রুকু)

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس

"মানুষের কৃত কর্ম্মের ফলে জল ও স্থলে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। (সুরা রুম ৫ রুকু)

ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم

"এবং তোমাদিগকে যে কোন দুঃখ আশ্রয় করে, তাহা তোমাদের স্বকৃত কর্ম্মের ফলে। (সুরা শুরা ৪ রুকু।)

এস্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত শিক্ষা দিয়াছে, এবং পবিত্র কোরআনে অনেক স্থলে পরিষ্কাররূপে জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, মানুষ যখন কোন কার্য্য করে তখন খোদাতালা তাহার জন্ত তাহার কার্য্যের অনুরূপ ফল প্রদান করেন।

ان الذين امنوا و عملوا الصلحت يهديهم ربهم بايمانهم

নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে, তাহাদের বিশ্বাসের নিমিত্ত তাহাদে প্রতিপালক তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন। (সুরা ইয়ুনুস ১ রুকু)

ان الذين لا يؤمنون بايت الله لا يهديهم الله

"যাহারা আল্লার নিদর্শনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহতালা তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না।"

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

এবং যাহারা আমার উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি।" (সুরা আন্‌কবুত, ৭ রুকু ৬৯ আয়াত)

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم

"হে মোসলমানগণ, তোমরা খোদাতালাকে ভয় করিতে থাক, এবং (দৃঢ়) সত্য কথা বলিও। (তাহা হইলে) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্য সকলকে শুভ করিবেন।" (সুরা আহজাব, ৯ রুকু)　　　　(ক্রমশঃ)

আহমদ আলী।

এস্‌লামের ধারা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

এসলামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এক। ইহা প্রচার করিবার জন্য জনের পরে যীশু ও যীশুর পরে পলের আবির্ভাব হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারক উত্থিত হইয়া এসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। সমস্ত মুসলমান অখণ্ডভাবে একমাত্র হজরতের বাণীকেই বরণ করিয়া লইয়াছে; তাঁহাকেই একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে; সমস্ত মুসলমান একমাত্র তাঁহারই পতাকা-মূলে সমবেত হইয়া একের বন্দনা করিয়াছে।

এসলামের ধর্ম্ম-পুস্তক একমাত্র কোরআন। তাহাতে নূতন পুরাতনের বিভিন্নতা নাই। তাহাতে যুগে যুগে তাহা নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয় নাই। এসলামের ভিন্ন ভিন্ন মজ্‌হাব বা সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-বিধির বিধান নাই। অতীত ও অনাগত পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমস্ত মুসলমানের জীবনের অবলম্বন একমাত্র কোরআন। জঙ্গলের নিগ্রো যে ভাষায় কোরআন পড়ে,—যে বাক্যে যে ছন্দে আল্লার বন্দনা করে, সুসভ্য ইংরেজ, আরবী, চীন ও বোর্ণী সেই একই ভাষায় কোরআন পড়ে, সেই একই প্রকারে আল্লার বন্দনা করে। বিভিন্ন জল-বায়ুতে পুষ্প যেমন একই প্রকারে ফুটিয়া উঠে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় মুসলমানের প্রাণ-কমল প্রভুর পানে তেমনই একই প্রকারে বিকশিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শীতাতপের তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু যেখানেই যাও দেখিবে সর্ব্বত্র একই ভাবে দিনের আলো জ্বলে, জ্যোৎস্নার হাসি খেলে, সমীর-সলিলের প্রবাহ চলে। আল্লা নবী ও কোরআন পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রত্যেক মুসলমানের অখণ্ড বন্দনা, সম্মান ও শিক্ষার ধন। প্রত্যেকই একমাত্র আল্লার দাস, একমাত্র নবীর শিষ্য ও একমাত্র কোরআনের বিধি নিষেধের অধীন। কলেমা, নমাজ, রোজা, হজ, জকাৎ, ধর্ম্মের এই পঞ্চাঙ্গ দেশ, কাল ও ভাষা নির্ব্বিশেষে সমগ্র মুসলমানের অবশ্য পালনীয়। সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান বন-জনপদে, মরু-পর্ব্বতে, হিম-ভূমে, দূরদ্বীপে পৃথিবীর যেখানেই যখন যে মুসলমান অবস্থান করুক না কেন সকলেই ধর্ম্মের এই সমস্ত বন্ধনে আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। সকলে একই প্রকারে আল্লার বন্দনা ধর্ম্মানুষ্ঠান পালন করে, একই ঐক্য শক্তির ক্রিয়ায় জীবন পথে অগ্রসর হয়।

এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান—কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষে পালন করে না। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ঐক্যের প্রেরণা ও প্রবাহ আছে।

মুসলমানের কলেমা ঐক্য সাধনার বীজ মন্ত্র। একমাত্র আল্লা ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই, এই মহা সত্য যে ধর্ম্মে মর্ম্মে পোষণ করে, তাহার চক্ষু হইতে দ্বিত্বের যবনিকা খসিয়া পড়ে; সে সকল ভেদিয়া সকল ঘিরিয়া একের দ্যুতি দেখিতে পায়। সে এক ভিন্ন দুই দেখে না, একের রসে ডুবিয়া মজিয়া একের মধ্যে বিলীন হয়।

মুসলমানেরা এক সঙ্গে রমজানের উপবাস করে, এক সময় আরম্ভ করিয়া এক সময়ে ভঙ্গ করে। রোজার সময় মুসলমানেরা প্রতিরাত্রে একত্র হইয়া একমাত্র আল্লার বন্দনা করে।

জাকাৎ সাম্যের সাক্ষাৎ সাধনা, মানুষের সহিত মানুষের একাত্ম বোধের মাধুরীবৃষ্টি। জাকাৎ ধনীর ধনে নির্দ্ধনের অধিকার দিয়া, ধনীগণের পুঞ্জীভূত ধনরাশি সমাজে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া সমাজে অখণ্ড সাম্যের সৃষ্টি করিয়াছে; সঞ্চয়ের তৃষ্ণা ও দারিদ্র্যের হাহাকার মিটাইয়া, ধন ও শ্রমের কলহ ঘুচাইয়া এক মহা মানবতার ভিত্তি গড়িয়াছে। মানুষ মানুষের আত্মীয়, মানুষ মানুষের ভাই, জাকাতে এই মহা সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া এসলাম মানুষের ঐক্য-বোধকে চমৎকাররূপে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

মুসলমানের উপাসনা, মণ্ডলীর উপাসনা ঐক্যের মহা সাধনা। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া এক হইয়া নামাজ পড়ে, ছোট বড় এক হইয়া—অঙ্গে অঙ্গে এক হইয়া আত্মায় আত্মায় এক হইয়া—একমাত্র আল্লার বন্দনা করে,—এক হইয়া একত্বের সাধনা করে। প্রতি সপ্তাহে জুমআর দিনে গ্রামে গ্রামে মস্জিদে আসিয়া সকল মুসলমান একত্র হয়; প্রতি বৎসরে দুইবারে প্রান্তরে প্রান্তরে মুসলমানেরা হাজারে হাজারে সমবেত হইয়া আল্লার মহিমা গায়।

জীবনে হজ-সাধনে সারাভুবনে মুসলমানে মুসলমানে মিলন হয়; একের আহ্বানে একদিনে এককেন্দ্রে বিশ্ব-মুসলমান একত্র হয়; মুর, মিশরী, তুর্কি, তাতারী, ইরানি, তুরানি, কাবুলি, বাঙ্গালী সকল মুসলমান গিরিদরির বাধা ভাঙ্গিয়া, মরুনদীর গণ্ডি কাটিয়া মহা পারাবার পার

হইয়া ছুটিয়া আসে, উদার আকাশতলে মক্কার মহা প্রান্তরে একত্রে মিশিয়া অকাজ হইয়া একের বন্দনা করে। তাহারা বলে, "লাব্বা এক,' 'লাব্বা এক," হে এক! অদ্বিতীয় এক! আমরা আছি, তোমার সকাশে উপস্থিত আছি; মিথ্যা করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, ভেদের রেখা গোপন করিয়া তোমার কাছে আসি নাই;—বহুত্বের অশুদ্ধি লইয়া আমরা তোমার পুণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হই নাই;—বিভিন্নরূপে আমরা তোমাকে লাভ করিতে আসি নাই। হে এক! আমরা একত্র হইয়া, একাঙ্গ হইয়া, এক সাজে সজ্জিত ও এক রবে মুখর হইয়া একত্বের শুদ্ধি লইয়া তোমার সকাশে উপস্থিত হইয়াছি। হে প্রভু! তুমি এক, তাই তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমরা নিঃশেষে এক হইয়া আসিয়াছি। আমরা এক, নিবিড় অখণ্ড এক, বিশাল বিপুল এক, আত্মায় আত্মায় এক,—আমরা ঐক্যের আহ্নিক গতিতে একমাত্র তোমাকে প্রদক্ষিণ করি।

প্রকৃতির মূলীভূত ঐক্য শক্তির ন্যায় এসলামের এই ঐক্যধারা দেশ কাল গিরি মরু ও শাসনের বাধা অতিক্রম করিয়া সমগ্র মুসলমানের জীবনের মধ্যে অবিচ্ছেদে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। শত শত বৎসরের আবর্ত্তন, সভ্যতার পরিবর্ত্তন, চিন্তার বিকাশ ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার এসলামের বিধি ব্যবস্থা অণুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। পাথরের অচল দেওয়ালের মত নহে, প্রকৃতির নিত্য-নিয়মের মত এসলামের বিধান চিরকাল ধরিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান আছে।

বস্তুতঃ এসলাম ধর্ম্মাবলম্বীর চিত্ত-বদনে একত্বের নিদর্শন আছে। মুসলমানের আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদে, তাহার গৃহ-সমাজ রাষ্ট্র-জীবনে ঐক্যের পরিষ্কার পরিচয় আছে। এস্‌লামের ঐক্য চিহ্ন ফ্রিম্যাসনের চিহ্ন অপেক্ষা পরিষ্কার, এসলামের ঐক্যধ্বনি তটিনীর কুলুধ্বনির মত চিরন্তন। 'আল্লাহো-আকবর' রবে সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত সমস্ত মুসলমান কম্পিত হয়। 'আস্‌সালামো আলায়কুম' বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে মুসলমানের সহিত, মুসলমানের আত্মীয়তার সাক্ষ্য দেয়; এক মুহূর্ত্তে জুলু-মুসলমান তুর্কী মুসলমানকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার অধিকারী হয়।

এইরূপে ধর্ম্মগত ঐক্য হইতে মুসলমানের বিশ্বজনীন বিরাট জাতীয়তার উদ্ভব হইয়াছে, পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান এক মহাজাতি—এক বৃহৎ পরিবার—এক বিশাল দেহ; তাহার একাঙ্গের বেদনা সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের প্রাণে প্রাণে এই জাতীয়তার অনুভূতি আছে; তাহার চিন্তা-প্রার্থনায়, আশা-কামনায় এই জাতীয়তার প্রকাশ আছে। কোরআন শরিফে আল্লাতাআলা ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুসলমানদিগকে ভিন্ন নামে সম্বোধন করেন নাই; তাঁহার আহ্বানে ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ ও সভ্য-অসভ্যের বৈষম্য রাখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "হে সৎকর্ম্মশীল বিশ্বাসিগণ!" একজন নহে, দশজন নহে, আরব বা ইরাণী নহে, ইংরাজ বা বাঙ্গালী নহে, প্রাচীন বা নবীন নহে,—যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে ও সৎ হইয়াছে, তাহারা সকলেই। কোরআন শরিফে কোথায়ও ব্যক্তিগত আহ্বান নাই; যেখানে

আল্লার আহ্বান আছে, সেখানেই তিনি সমস্ত মুসলমানকে অবিচ্ছেদে এক করিয়া ডাক দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মুসলমানের প্রার্থনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে। তাহা মণ্ডলীর প্রার্থনা—সমগ্রের প্রার্থনা। প্রত্যেক মুসলমান একই মহামণ্ডলীর অঙ্গরূপে আরাধনা করে। 'আমি তোমাকে বন্দনা করি,' এসলামের ধর্ম্মানুষ্ঠানে এমন ব্যক্তিগত বন্দনার বিধান নাই। মুসলমানেরা বলে, "হে আল্লা! আমরা তোমারই আরাধনা করি; আমরা তোমারই নিকটে সাহায্য চাই।" শুধু বন্দনা বা প্রার্থনা নহে, মুসলমানের কামনা ও জাতীয় কামনা,—মহা জাতীয়তার অগ্নিশিখা—"আমাদিগকে ক্ষমা কর, 'আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর,' তার পর হে আমাদের প্রভু, অবিশ্বাসী (বিদ্রোহী) জাতিদের উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত কর।" পতনে প্রার্থনায় উত্থানে জিগীষায় মুসলমান এক—নিবিড়রূপে এক—মহাজাতীয়তার তাড়িত প্রবাহে বিদ্ধ ও জীবন্ত এক। সমস্ত পৃথিবীর মুসলমান অবিচ্ছেদে একাত্ম ও এক জাতি।

দেশ ভাষা ও শাসনের বৈষম্য মুসলমানদিগকে পৃথক করিতে সমর্থ নহে; নদী, মরু ও পর্ব্বত মুসলমানদিগের মধ্যে ভেদ বৈষম্যের রেখা টানিতে সক্ষম নহে। ইথারের সর্ব্বত্র যেমন আলোক তরঙ্গের কম্পন হয়, পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের প্রাণ তেমনই একই প্রেরণা ও আকর্ষণে স্পন্দিত হয়। মুসলমানগণের মধ্যে পৃথক পৃথক দেশাত্মবোধের স্ফূর্ত্তি নাই, তাহারা দেশাভেদে অবিচ্ছেদে এক। তাহারা তুরস্কে, পারস্যে, আরবে, ভারতে যেখানেই বাস করুক না কেন, সর্ব্বত্রে সর্ব্বাগ্রে মুসলমান এক রক্তের রক্ত, এক অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, এক এক জাতির অংশ মুসলমান। সর্ব্বত্র 'আল্লাহো-আক্‌বর' তাহার বাণী, চন্দ্র তাহার কেতু, কাবা তাহার কেন্দ্র। পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে সমস্ত মুসলমানের প্রাণ-কম্পাস একমাত্র কাবার প্রতি কম্পিত হয়।

এই জন্যই পৃথিবীর যখন যে জাতি এসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই জাতিই সর্ব্বপ্রকারে মুসলমান হইয়াছে; তাহার পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হালাকু খাঁর অধীনে মোগলজাতীয় মোস্‌লেম ও মোস্‌লেম-সভ্যতার ধ্বংস সাধন করিতে করিতে টাইগ্রিস নদীর তীরে দাঁড়াইয়া যখন বলিয়া ফেলিল "লা এলাহা-ইল্লাল্লা—মোহাম্মাদর্ রছুলোল্লা," তখন হইতে তাহাদের রং চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল; আরবদিগের সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া এক হইয়া গেল যে তাহাদের পূর্ব্বতন সভ্যতার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিল না।

এই মূলীভূত ঐক্য ক্রিয়ার ফলে মুসলমানের অসামান্য সাম্যের উৎপত্তি। যে কারণে মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই, সেই কারণেই মুসলমানের মধ্যে বৈষম্য নাই। জাতীয়তার প্রসারেই মানবত্বার উৎপত্তি। ঐক্যের ক্রিয়ায়—একত্বের সাধনায় এসলামের দৃষ্টি শুধু এক জাতীয়তাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই, তাহা আরও বৃহত্তর হইয়া এক মানবতার সৃষ্টি করি-

য়াছে ; জাতীয়তার স্রোতোধারা মানবতার সাগর বেলা চুম্বন করিয়া অসীমের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। একত্বের সে সমুচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া মুসলমান উচ্চারণ করিয়াছে, "নাই নাই আল্লা ছাড়া আর উপাস্য নাই," সেই উচ্চগ্রামে দাঁড়াইয়া মুসলমানের বাণী,—"নিশ্চয় সমস্ত মুসলমান ভাই-ভাই"—তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই—ভেদ নাই। তাহারা শুধু একই জাতি নহে, একই মানুষ,—একই প্রাণের ভাই। "আল মোস্‌লেমো আখোল মোস্‌লেমে" এস্‌লামে রক্ত অর্থ পদ বর্ণের অণুমাত্র বৈষম্য নাই। এস্‌লামে ক্রীতদাস মহামান্য সম্রাট তনয়ার পাণি গ্রহণ করে ও সিংহাসনের অধিকারী হয়। সম্রাটের সিংহাসন নহে, সম্রাটের সম্ভ্রম ও তাহার চরণ মূলে অঞ্জলি হয়। ক্রীতদাস জায়েদ পয়গম্বরের আত্মীয়, আর বেলাল তাঁহার প্রেমাস্পদ সহচর। তপ্ত বালুকা শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া দুর্ভাগ্য ক্রীতদাস নিখিল মুসলমানের প্রেম-সম্মানের স্বর্ণাসনে সমাসীন সম্রাট। মহামান্য খলিফা ও অধম ক্রীতদাস একই মানবতার উদার সমতলে সমসূত্রে দণ্ডায়মান। উভয়েই তাহারা মানুষ ;—উষ্ট্রারোহণের অধিকার উভয়েরই তাহাদের সমান। সেবাই দাসের সর্ব্বস্ব নহে, সেবা গ্রহণেরও তাহার অধিকার আছে। এসলামধর্ম্মে পথের মজুর ক্রোড়পতির সহিত একপাত্রে ভোজন করে ; কড়ির কাঙ্গাল জীর্ণবস্ত্র স্কন্ধে জড়াইয়া মণিমণ্ডিত সম্রাটের সহিত অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া আল্লার বন্দনা করে। আল্লার আকাশ-বাতাসে, ভূমি-বৃষ্টি রৌদ্র-জলে যেমন প্রতি মানুষের অধিকার আছে, এসলামের সমুদায় আচার ও অধিকারেও তেমন প্রত্যেক মুসলমানের অবিচল অধিকার আছে।

এইরূপে এসলাম ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গে এক চরম ঐক্যস্রোত প্রবাহিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব জীবনরসে পরিপূর্ণ করিয়াছে। প্রকৃতি নির্ব্বাকভাবে যে মন্ত্রের সাধনা করিতেছে, যে সঙ্গীত সয়ম্বর নিখিল ভুবনের মূলে বিদ্যমান থাকিয়া এই বিপুল বিচিত্র জগত-যন্ত্র অনায়াসে চালনা করিতেছে, সেই পরম ঐক্য এসলামধর্ম্মে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

ইয়াকুব আলী চৌধুরী।

আমাদের সাহিত্য।

পৃথিবীতে সাহিত্য অনেক। যাঁহারা যে ভাষায় কথা কহেন, সেই ভাষার সাহিত্যই তাঁহাদের সাহিত্য। সুতরাং বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা সাহিত্যই আমাদের সাহিত্য। তবে অনেক মহাত্মা আছেন,—যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে হেয় মনে করেন, জাতীয় সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এখনও কি তাঁহাদের অন্ধচক্ষু ফোটে নাই?

এখন দেখা যাউক, সাহিত্য আমাদের কি উপকার সাধন করে। একটু সূক্ষ্মভাবে ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, সেই অনাদি ও অনন্ত খোদাতালা ও তাঁহার সমস্ত সৃষ্টিই আকর্ষণময়। কারণ সর্ব্বত্রই আমরা আকর্ষণ বিকর্ষণের প্রবল প্রভাব অনুভব করিতে পারিতেছি। ঐ কুলু-কুলু রবে প্রবহমান স্রোতস্বরী ও স্থির-গম্ভীর ফেন-পুঞ্জ-শোভিত বিশাল জলধির প্রতি লক্ষ্য কর, মানবজাতির দিকে চাহিয়া দেখ, সূর্য্য-চন্দ্র-পৃথিবী প্রভৃতির গতির প্রতি লক্ষ্য কর, দেখিবে, স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে পরস্পরের প্রতি পরস্পর কি একটা অপূর্ব্ব কৌশলময় আকর্ষণে আকৃষ্ট ও সমস্ত সৃষ্টি-জগত যেন কি একটা অদৃষ্টচর শক্তির আকর্ষণে প্রতিনিয়তই আবর্ত্তন করিতেছে। আমাদের কথার প্রতি বিশ্বাস না হয়, প্রবীণ বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

'একটা অদৃষ্টচর শক্তি সমস্ত সৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছে' ইহাতে এই বুঝিতে পারা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতালা তাঁহার আকর্ষণময় অদৃষ্টচর শক্তি দ্বারা প্রতিনিয়তই আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন অর্থাৎ আমরা তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার উপাসনা করি এই তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর 'তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে' ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার সৃষ্ট আমরা যেন সকলেই পরস্পরকে ভালবাসি পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হই। এই যে তাঁহার উদ্দেশ্য 'সমস্ত সৃষ্টির পরস্পরকে ভালবাসা' ইহারই নাম বিশ্বপ্রেম। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি আমাদিগকে পরস্পরকে ভালবাসিয়া বিশ্ব-প্রেমিকরূপে অনন্ত-প্রেমিক হইতে বলিয়াছেন; কারণ অনন্ত প্রেম সাধনার বস্তু, সোজাসোজি অনন্তপ্রেম লাভ করা যায় না। ক্ষুদ্রত্বের ক্রমাগতঃ বৃদ্ধিই বৃহত্বের অস্তিত্ব। যেমন বৈজ্ঞানিকদের মতে পরমাণুর বৃদ্ধিই জগতের অবস্থিতি, সেইরূপ প্রেম-পুঞ্জীভূত হইয়া এক প্রেমের প্রাবল্যেই অনন্ত প্রেমের সৃষ্টি। সুতরাং অনন্ত প্রেমে পৌছিতে হইলে অনেকগুলি প্রেমের স্তর অতিক্রম করিতে হয়, যথা, পত্নি-প্রেম, বংশ-প্রেম, বন্ধু-বান্ধব-প্রেম, সমাজ-প্রেম, স্বজাতি-প্রেম, স্বদেশ-প্রেম, বিশ্ব-প্রেম, তাহার পর অনন্ত-প্রেম। সাহিত্যই এই প্রেমস্তর বজায় রাখিবার একমাত্র উপায়। এই সাহিত্যের দ্বারাই আমরা সমগ্র বিশ্বের সহিত পরিচিত হইতে পারি। এত বড়, এত মহৎ উদ্দেশ্য যে সাহিত্য বহন করে, সে বাস্তবিকই আদরনীয়, আমাদের হৃদয়ের ধন। বিশ্বপ্রেম

বিশ্বপ্রেম।

যেরূপ স্তরে স্তরে বিকশিত হয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও সেইরূপ নানা স্তর আছে। যথা, বাঙ্গালা সহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, উর্দ্দু সাহিত্য ইত্যাদি। আমরা বাঙ্গালী, আমরা যেমন বাঙ্গালী প্রীতির ভিত্তিতে গঠিত হইয়া বিশ্বপ্রেম লাভে অগ্রসর হইব, সেইরূপ আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যও আমাদের বাঙ্গালিত্ব ফুটাইয়া বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে অগ্রসর হইবে।

যাহা হউক এখন আমরা আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বাঙ্গালা অতি প্রাচীন সভ্যদেশ। পরলোকগত রিস্‌লি সাহেব ও পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী * প্রমুখ কতিপয় প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেন যে, "আর্য্যগণ যখন এশিয়া হইতে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন ও তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় জন পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য-জন-পদ ছিল; এমনকি আর্য্যগণ যখন রাজ্যবিস্তার করিয়া এলাহাবাদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন, তখন তাঁহারা বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" কিন্তু ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ্র মহাশয় ঐতরেয় আরণ্যক প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ হইতে শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ কখনও সভ্যজন-পদ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই †। সে যাহা হউক, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দিতে বাঙ্গালা সভ্যজন-পদ বাচ্য হইলেও ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে, ইহাতে অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, যে বাঙ্গালা প্রাচীন সভ্যদেশ এবং বাঙ্গালী প্রাচীন সভ্য জাতি। যাহা হউক, এখন বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বাঙ্গালীর সভ্যতার প্রাচীনতা।

ইতিহাসে আছে অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে আদিম অসভ্য জাতির বাস ছিল। আর্য্যগণ এই সমস্ত অসভ্য জাতিকে পরাজিত করিয়া ভারত ভূমির অধিপতি হইলেন। ইহারা সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন। এই সংস্কৃত সর্ব্বদা একরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, ক্রমশঃ ইহার ভূরিভূরি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন হওয়ার কারণ—ইহার উচ্চারণের সৌকর্য্য সাধন। প্রাচীন সংস্কৃত অতিশয় দুরুচ্চার ও কঠিন। এইজন্য বেদের সংহিতা ভাগের সংস্কৃত অপেক্ষা মনুসংহিতা ও বাল্মিকী-রামায়ণের সংস্কৃত কিঞ্চিত পরিবর্ত্তিত ও কোমল। তৎপরে কালিদাসের সংস্কৃত তদপেক্ষা পরিবর্ত্তিত, মৃদু ও কোমল। তৎপরে বুদ্ধদেবের সমকালে অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সংস্কৃত হইতে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া 'গাথা' নামক এক ভাষার সৃষ্টি হইল। খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক রাজার সমকালে এই ভাষা আরও অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া 'পালি ভাষা' নামে খ্যাত হয়। বর্ত্তমানে লর্ডলের

* মানসী, ১৩২০ সন, ফাল্গুন সংখ্যা।

† সাহিত, ১৩২১ সন, অগ্রহায়ণ সংখ্যা

ভাষা পালি ভাষারই অপভ্রংশ মাত্র *। তৎপর খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই পালি ভাষা আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি করে। কতিপয় পণ্ডিতের মতে আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষা উপরোক্ত প্রাকৃত ভাষা হইতে প্রধানতর উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এখন দেখা যাউক, কোন সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। জনৈক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত † বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলেন, "এক্ষণ হইতে ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ত্রিপুরা রাজাবলী নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক " এসিয়াটীক সোসাইটী " নামক সমাজে আছে, উহা ত্রিপুরা রাজবংশীয়দিগের বিবরণে পরিপূর্ণ এবং ৯০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া কথিত। অতএব এক প্রকার স্থির করা যাইতেছে যে, প্রায় সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে বঙ্গ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।" বোধ হয়, এক সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্ব হইতেই লোকে বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, তবে তখন উক্ত ভাষায় পুস্তকাদি রচিত হয় নাই; কারণ প্রাকৃত অথবা বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইলেও লোকে তখন সংস্কৃত ভাষা ছাড়িয়া উক্ত ভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন অগৌরবের বিষয় মনে করিত। সে যাহা হউক, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালায় পুস্তকাদি প্রণয়ন আরম্ভ হইয়াছিল।

বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি

বাঙ্গালা ভাষা প্রধানতঃ প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপত্তিলাভ করিলেও ইহা নানা ভাষা হইতেই শব্দ গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তন্মধ্যে তিনটী ভাষাই প্রধান যথা—দেশ্য, হিন্দী ও ব্রজভাষা। তৎপরে মুসলমান শাসন সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সম্প্রসারিত হইতে থাকিলে ইহাতে আরবি, পারসী, উর্দ্দু, তুর্কী প্রভৃতি ভাষার বহুল শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করে। তৎপর চণ্ডিদাস, কাশীরামদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রতিভাশালী বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালাকে নিজেদের প্রতিভা স্পর্শে যথেষ্ট উন্নত ও সম্পদশালী করেন। তারপর স্বনাম খ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের ভিত্তিতে গঠিত করিয়া ভাষার এক অপূর্ব্ব সম্পদ দান ও ভাষাকে এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া ভাষাকে এক অপূর্ব্ব গৌরবময় পথে লইয়া যান। পক্ষান্তরে প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের গণ্ডি হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত এক সোজা পথে সুন্দরভাবে পরিচালিত করিলেন। অবশেষে প্রসিদ্ধনামা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত উভয়বিধ ভাষার এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সাধন করেন এবং ভাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা সমূহের শ্রেণীতে গৌরবের সহিত

বঙ্গ ভাষার গতি

---

* ইহা হইতে জনৈক পণ্ডিত অনুমান করেন যে, লতিকার পূর্ব্বে পালিভাষা প্রচলিত ছিল। বোধহয় অশোক রাজার পুত্রের সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের সময় পালিভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল।

† মহামহোপাধ্যায় ৺প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন—সাহিত্য-প্রবেশ ব্যাকরণ।

উন্নীত করেন। বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা ভাষা তাঁহারই ভাষার আদর্শে অগ্রসর হইতেছে।

বঙ্গভাষার পরিণতি। বঙ্কিমের ভাষা প্রাঞ্জল, সহজ বোধ্য, অথচ স্থান বিশেষে সংস্কৃত-শব্দ ঝঙ্কারে গম্ভীর এবং গ্রাম্যতা দোষহীন।

বর্ত্তমান সময়ে এই ভাষায় নানারূপ বিপ্লবের সৃষ্টি হইতেছে। এই বঙ্গে অর্দ্ধাধিক মুসলমান, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, বঙ্গভাষার উপর মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার বিদ্যমান। কিন্তু এ যাবত বঙ্গীয় মুসলমান নানা কারণে বঙ্গভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে খুব কম লোকেই ইহার সেবা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বঙ্গীয় হিন্দুগণ এই ভাষার প্রতি আন্তরিক আসক্তি প্রকাশ করিয়া ইহাকে অনেক উচ্চে উন্নীত করিয়াছেন। ফলতঃ আধুনিক বঙ্গভাষার গৌরব প্রতিপত্তি সমস্তই প্রায়ই হিন্দুগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু এখন বঙ্গীয় মুসলমানগণ বঙ্গভাষাকে খুব ভালমতেই চিনিয়াছেন, এই সাহিত্যের প্রতি অনাসক্তি প্রদর্শন যে জাতীয় উন্নতির পক্ষে প্রধান অন্তরায়, তাহা তাঁহারা খুব ভালই বুঝিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক বঙ্গভাষায় প্রবেশ করা তাঁহাদের পক্ষে বিষম দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে, কারণ, হিন্দু লেখকগণ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ-ব্যবহারে ভাষাকে মুসলমানদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এজন্য গত বৎসর বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-গতি আলোচনা করিয়া মাননীয় নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সাহেব ভাষাকে সংস্কৃতের হাত হইতে মুক্ত করিয়া সোজাপথে চালাইতে বলিয়াছেন এবং যাহা চলিয়া গিয়াছে, এইরূপ আরবী, পারসি, সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি শব্দ ভাষায় অবস্থান করিতে দিতে বলিয়াছেন * অনেক হিন্দু মহাত্মা ইহাতে নাক সিট্‌কাইতেছেন; বলিতেছেন যে, ইহাতে ভাষা রসাতলে যাইবে, কারণ তাঁহাদের মতে ভাষাতে সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষার শব্দের প্রবেশাধিকার নাই। প্রবেশাধিকার দিলে ভাষার বিশুদ্ধতা নষ্ট হইবে।

গত বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন "সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালা ভাষার অতি-অতি-অতি-অতি অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী। * * * * ভাষায় যে সমস্ত শব্দ চলিয়া গিয়াছে, তাহা আরবী হোক, পারসি হোক, ইংরেজী হোক, সংস্কৃত হোক, চালাও; ভাষাকে সোজা কর, মিষ্ট কর, ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইবে"। † আমরাও শাস্ত্রী মহাশয়ের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছি যে বাঙ্গালা ভাষা যখন মিশ্র ভাষা, তখন ইহাতে অন্য ভাষার চলিত শব্দ গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? যাহা চলিয়া গিয়াছে, সে শব্দ আরবী হোক, পারসি হোক, সংস্কৃত হোক, ইংরেজী হোক সাহিত্যে চালাও; সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। তাই বলিয়া যাহা অপ্রচলিত, যাহা সর্ব্বসাধারণের অবোধ্য তাহা চালাইতে গেলে ভাষা অচল হইবে। ইহা

* প্রতিভা, ১৩২১ সন।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২২ সন।

অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শুধুশুধি ভাষার অনাবশ্যক শব্দ বাড়ানো গর্হিত। চলিত মিষ্ট প্রতিশব্দ থাকিতে অন্য ভাষার অপ্রচলিত শব্দ লওয়া কেবল ভাষাকে বিড়ম্বনা ও অধঃপতনের পথে অগ্রসর করানো ব্যতীত আর কিছুই নয়। *

আজকাল স্কুল ও কলেজ সমূহে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, রসায়ন, চিকিৎসা-বিদ্যা, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষাদানের প্রস্তাব হইতেছে; † কাজেই উক্ত বিষয়ক পাশ্চাত্য পুস্তকগুলি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিতেই হইবে। ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য পুস্তকগুলি অনুবাদ করিতে গেলেই এমন কতকগুলি পাশ্চাত্য-শব্দের সহিত সাক্ষাৎ হইবে যে সেগুলির বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই অথবা থাকিলেও সেগুলি দুরুচ্চার, কর্কশ, ঠিক অর্থ-রক্ষক নয়। মুসলমানগণ যখন তাঁহাদের জাতীয় ও ধর্ম্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন, তখন এমন কতক-গুলি শব্দের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় যেগুলির বঙ্গানুবাদ নাই অথবা বঙ্গানুবাদ করিতে গেলে অর্থের ঠিক মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। হিন্দু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদক পণ্ডিতগণকেও এইরূপ গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। এরূপ সমস্যায় সেই সমস্ত প্রতিশব্দ-দুষ্প্রাপ্য-শব্দগুলির বঙ্গানুবাদ না করিয়া ঠিক সেই সমস্ত শব্দ রাখাই সঙ্গত ও ভাষার শব্দ-সম্পদ-বৃদ্ধিকর। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই বাঙ্গালা ভাষা ঠিক বাঙ্গালা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। অন্য ভাষার অনর্থক শব্দ আনিয়া খিচুড়ী বানানো মহাপাপ। কারণ সব ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। তাহাকে সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেই হইবে।

ভাষাকে কখনও জমকাল পোষাক পরাণো উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে ভাষা পোষাকের গুরুভারে উঠা বসা করিতেই পারিবে না, চলা ফেরা করা ত দূরের কথা। ভাষাকে সহজ পথে চালানো, সর্ব্বসাধারণের সহজ বোধ্য করা উচিত, কারণ সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের জন্য, ব্যক্তিবিশেষের জন্য নহে। সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য না হইলে সে সাহিত্যের কোন স্বার্থকতা নাই। আজকাল অনেক মহাত্মাই নিজেদের অসাধারণত্ব কিংবা নিজকে একজন বড় লেখক বা ভাষাতত্ত্ববিদ দেখাইতে গিয়া ভাষাকে বড়ই জটিল করিয়া ফেলিতেছেন। সর্ব্বসাধারণের জন্য ত তাহা সহজবোধ্য নয়ই,

ভাষা-সমালোচনা।

* "ভাষায় যাহা চলিয়া গিয়াছে"—এই কথাটা একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা হিন্দুরা হয়ত ব্যবহার করেন না, কিন্তু তিন কোটী বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে তাহা নিত্য ব্যবহার্য্য, সেগুলিকে "বয়কট" করা চলে না। কিন্তু কেহ কেহ বাঙ্গলা পুস্তকে পাণীর ব্যবহার দেখিতেও নারাজ। আজকাল আরবী পার্সী ইত্যাদি মুসলমান সম্পর্কিত শব্দ-গুলি উঠাইয়া দিবার জন্যও চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অর্দ্ধাধিক বাঙ্গালীকে বাদ দিয়া বাঙ্গলা ভাষা গঠন কখনই সম্ভবপর হইবে না। —সম্পাদক।

† ভারতবর্ষ, ১৩২১—আষাঢ়। বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় অষ্টম সাহিত্য সম্মিলন।

অনেক পণ্ডিতও ইহাতে নিজেদের মাথা বিগ্‌ড়ানোর পরিচয় দিয়া থাকেন, এমনকি সেই অসাধারণ (?) লেখকও তাহা বুঝাইতে অনেক সময়ে মাথা চুলকাইয়া থাকেন! *

এক শ্রেণীর বাবু-লেখক আছেন; তাঁহারা প্রাদেশিক ভাষা অর্থাৎ অসাধুচলিত ভাষা প্রচলনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সমালোচনার তীক্ষ্ণ কষাঘাতে ইঁহাদের রচনা ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, কত সমালোচক ইহাদিগকে 'দু'কান কাটা' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, তথাপি ইহাদের চৈতন্য নাই। ইঁহারা যেন কাহারও সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়া জেদাজেদি করিয়াই ইহার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মিঃ প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল মহাশয়ই ইহার প্রবর্ত্তক। ইঁহারা, আমরা যেখানে 'করিতেছি' ব্যবহার করি, সেখানে 'কর্চ্ছি' অথবা 'কর্‌চি' শব্দ ব্যবহার করেন, যেখানে 'করিয়া' ব্যবহার করি, সেখানে 'করে' ব্যবহার করেন—ইত্যাদি। ইঁহারা কি জানেন না যে, যদি প্রাদেশিক ভাষাই প্রচলিত হয়, তাহা হইলে প্রদেশ বিশেষে 'করিতেছি' স্থানে 'কর্‌তাছি,' 'করিব' স্থানে 'কর্‌বাম,' 'কর্‌মু,' 'করিয়া' স্থানে 'কৈর‍্যা' এবং 'করিয়াছিল' স্থানে 'কর্‌ছ্যাল' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইবে? এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, এ সমস্ত কি সকল স্থানের বোধগম্য হইবে? আমরা দৃঢ়চিত্তে বলিতে পারি, ভাষা এইরূপ আকার ধারণ করিলে কলিকাতার চলিত ভাষা চট্টগ্রামের বোধগম্য হইবে না; শ্রীহট্টের চলিত ভাষা কলিকাতা বাসীরা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। এ সম্বন্ধে জনৈক শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলেন "প্রাদেশিকতা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সহজ বোধ্য নয়। বিদ্যাসাগরের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বর্ণ পরিচয় ও কথামালা, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা প্রভৃতির ভাষা সহজ চলিত ভাষায় লিখিত; কিন্তু তাহাতে প্রাদেশিকতার উৎপাত নাই। "করিয়া" গারু পাহাড় হইতে মালদহের প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র চলিতে পারে, কিন্তু "কৈর‍্যা" প্রদেশ বিশেষে উদ্ভূত ও প্রচলিত রূপান্তর, সকল প্রদেশের সুবোধ্য নয়। বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার রূপান্তরিত চলিত ভাষায় যদি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে এক প্রদেশের সাহিত্য অন্য প্রদেশের অনধিগম্য হইয়া উঠিবে। তাহা কোন মতেই প্রার্থনীয় নয়। ভাষা উদ্ভটতা-শূন্য, প্রাদেশিকতা বর্জ্জিত ও সকল প্রদেশের সুবোধ্য না হইলে সার্ব্বভৌমিক হইতে পারে না † এই বিষয়ে একজন শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য রথীর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিব। তিনি বলেন "বাঙ্গালার লিখনপঠন ছুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত নহে। তাহা কখনই হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা ও কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

* আমাদের মতে, স্থান, কাল ও পাত্রভেদে, লিখিত বিষয়ের এবং যাহাদের উদ্দেশ্যে লিখিত, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ভাষার মান নির্দ্ধারণ করা উচিত। সময় সময় ফিরফিরে ফুরফুরে সেজো বাতাস আর নদীর কুলুকুলু ত্যাগ করিয়া বজ্রনির্ঘোষ ও উত্তাল তরঙ্গ মালারও আবশ্যক হয়। দুই দিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। —সম্পাদক।

† শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি. সাহিত্য, ১৩২১—শ্রাবণ সংখ্যা, ৩৬৯ পৃঃ।

কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না।" * সুতরাং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে আমরা প্রাদেশিক চলিত ভাষা প্রচলনের বিরোধী। আর যদি ইহারা বলেন যে কলিকাতার ভাষা সর্ব্বত্র আদর্শ হউক, কারণ এ ভাষায় একটা বেশ তেজ আছে, ইত্যাদি। ইহাও আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই এবং সমগ্র বাঙ্গালা কখনই বিনা প্রতিবাদে এ প্রস্তাব মানিয়া লইবে না ইহা আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি। কারণ কলিকাতার ভাষা সর্ব্বত্র সুবোধ্য নয়, ইহা অনেকস্থলেই গ্রাম্যতা দোষ-দুষ্ট। আর দ্বিতীয়তঃ সাধুভাষা লিখিতে যত সোজা, অসাধু চলিত ভাষা লেখা ততই কঠিন। কারণ সাধুভাষা আমাদের কলমের † মুখে আপনিই আসিয়া পড়ে, আর অসাধু চলিত ভাষা জোর করিয়া সাধু ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া লিখিতে হয়। ফলতঃ ইহাতে প্রাদেশিক জঞ্জাল জড়িয়া যাইবে, ভাষা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে পদার্পণ করিবে মাত্র। আমরা বলি, অসাধু চলিত ভাষা অথবা প্রাদেশিক জঞ্জাল না প্রচলিত করিয়া চলিত ভাষার খুব কাছাকাছি সহজবোধ্য বিশুদ্ধ ভাষা সাহিত্যে চালাও। আমাদের সাহিত্য এখন সেই ভাষাই চায়। শুধুশুধি ভাষায় এ সব জঞ্জাল বাড়াইয়া লাভ কি?
এ বিষয়ে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের মত অনুমোদন করি। ইচ্ছা করিলে তাঁহার মত তাঁহার প্রবন্ধে "বাঙ্গালা ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পারেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বঙ্কিমের ভাষা উপরোক্তরূপ নহে, সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। আমরাও তাহা স্বীকার করি, কিন্তু "বঙ্গদর্শন" ও "প্রচার" প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত তাঁহার শেষ বয়সের প্রবন্ধাবলী ও পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি যেমন আনন্দ-মঠ, সীতারাম, বিশেষতঃ দেবী চৌধুরাণী পাঠ করিয়া দেখিলেই সকলে আমাদের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এখন আধুনিক সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব। অধিক আলোচনা বৃথা, কারণ এ সম্বন্ধে মাননীয় সিরাজী সাহেব যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।‡ সিরাজী সাহেবের মন্তব্যের সহিত আমরা সম্পূর্ণই একমত। সাহিত্য কিরূপভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি আমাদের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা এতদিন বলি বলি করিয়া যাহা বলিতে পারিতেছিলাম না, অথচ মনে তাহার অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতাম, সেইগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। বাস্তবিকই তাঁহার প্রদর্শিত পথে যদি আমাদের সাহিত্য পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সাহিত্য যে অচিরেই উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়া যথেষ্ট উন্নত করিতে পারিবে,

* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালা ভাষা।

† "লেখনী" শব্দ অশুদ্ধ—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বর্দ্ধমানের অভিভাষণ দ্রষ্টব্য।

‡ আল্-এস্‌লাম ১৩২২ সন, বৈশাখ সংখ্যা। "সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমরা আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ আর কিছু বলিতে গেলেই সিরাজী সাহেবের পুনরুক্তি করিতে হয়। তবে ইতিহাস সম্বন্ধে সিরাজী সাহেবের মন্তব্যের উপর জোর দিয়া আমরা বলিতেছি—ইতিহাস রচিত হউক, কারণ বাঙ্গালা ভাষায় আমাদের ইতিহাস নাই। ইতিহাস আদর্শ না করিলে আমাদের উন্নতি অসম্ভব। কল্পনার উপর গড়া উপন্যাস হইতে সত্যের উপর গড়া ইতিহাসে অধিক আদর্শ পাইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস অপেক্ষা ইতিহাসের ফল আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে অধিকতর প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের উন্নতির ক্রমবিকাশ ঘটাইতে পারিবে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এ বিষয়ে বঙ্গীয় হিন্দুগণ বঙ্গীয় মুসলমানগণ অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা বীরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, রাজ-অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতি স্থাপন ও শিলা লিপির পাঠ উদ্ভাবন করিয়া নানা ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারে বাঙ্গালা সাহিত্যের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। বঙ্গীয় মুসলমানগণকে এদিকে যথেষ্ট আসক্তি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পরিশেষে অমর কবি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "বাঙ্গালার নব্য লেখকগণের প্রতি" * উপদেশ সমূহ উদ্ধৃত করতঃ তাহা পালন করিতে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণকে অনুরোধ করিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে, যশ আপনি আসিবে।

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন টাকার জন্যই লেখে এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সেদিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লিখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীর সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন † বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল

* বিবিধ প্রবন্ধ।

† ঠিক কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিই মুসলমানদিগকে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। —সম্পাদক।

প্রবন্ধ কথনও হিতকারী হইতে পারে না ; সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে কলমধারণ মহাপাপ।

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কাজে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম-রক্ষাটী ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্ত্তব্য। এটী সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যে এ নিয়মটী রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না, বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরেজী, সংস্কৃত, ফারসী, জর্ম্মণ কোটেশন বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে, লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজনমতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার-প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।

৯। যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটী কাটিয়া দিবে, এটী প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটী বন্ধুবর্গকে পুনঃপুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারিবার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা হইবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায়, আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরেজী বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমি এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিবে না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।”

শামসুদ্দিন আহমাদ।
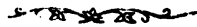
মোসলেম-বীরাঙ্গনা।

(৪)

গোলেবেহেশ্‌তের মৃত্যুর পর জালোর রাজ পুনঃ সিংহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, ভীম বিক্রমে রাজকীয় সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদিগকে তাড়া করিয়া বহুদূর পশ্চাতে হটাইয়া দিলেন। এই যুদ্ধে বীরাঙ্গনা গোলেবেহেশ্‌তের সুযোগ্য পুত্র শাহীন, জালোর রাজ হস্তে নিহিত হয়। অতঃপর দিল্লীতে গোলেবেহেশ্‌তের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পৌছিলে সম্রাট সাতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া সেনাপতি কমালউদ্দীনের অধিনায়কতায় একদল প্রবল বাহিনী প্রেরণ পূর্ব্বক জালোর রাজকে পরাজিত এবং জালোর দুর্গ অধিকার করেন *।

সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে, এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে, পৃথিবীতে একটা আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। আমীর তৈমুরের নাম নাজানে এবং তাঁহার ভয়াবহ যুদ্ধ বিগ্রহ এবং দিগ্বিজয়-কাহিনীর বিষয় অবগত নহে এরূপ শিক্ষিত লোক কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। আমীর তৈমুরকে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত বা প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের সহিত তুলনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ভীষণ আক্রমণে প্রবল তুর্কীজাতির সুদৃঢ় রাজভিত্তি উৎপাটিত প্রায় এবং তোগলক বংশীয়গণের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য এই যে, মোগল রাজত্বের ঈদৃশ প্রবল প্রতাপের ও তাহাদের দিগ্বিজয়ের মূলীভূত কারণ কি? এবং এই গৌরবজনিত কারণ সমষ্টির মধ্যে তৎকালীন মোস্‌লেমবীরাঙ্গনাকুলের

* তারিখে ফেরেস্তা

বিশেষ কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল কিনা ? এই প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তৈমুর শাহের দিগ্বিজয়ব্যাপার এবং মোগল রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ও তাহার দৃঢ়তা সংস্থাপন কার্য্যে মোসলেম বীরাঙ্গনাকুলের কৃতিত্ব যে এক অসাধারণ ও স্মরণীয় অনুষ্ঠান তদ্বিষয় ইতিহাসজ্ঞব্যক্তিবর্গের নিকট কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। তৈমুর শাহ তাঁহার সহকারী বীরাঙ্গনাকুলের সামরিক সাহায্যলাভ করিতে না পারিলে, তিনি আজ জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় দিগ্বিজয়ী সম্রাটের গৌরব-মুকুট স্বীয় মস্তকেধারণ করার সুযোগ পাইতেন কিনা সন্দেহ।

আমরা বক্ষ্যমান সন্দর্ভে সম্রাট তৈমুরের সহকারিনী বীরাঙ্গনাকুলের মধ্যে একটী বীর নারীর উল্লেখ করিব মাত্র।

আমতলহাবিব।

প্রকাশ—হামিদাবানু বেগম।

امة الحبيب یا حمیدہ بانو بیگم

আমতল্হাবিব, ওস্মানীয় সোল্তান বায়জিদ এল্দেরেমের সেনাপতি সোল্তান এজ্দানীর یزدانی প্রিয়তমা কন্যা। এজ্দানীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি তাঁহার কন্যাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তাঁহার কন্যাকে তিনি সর্ব্বদা সামরিক পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত করিতেন এবং সামরিক কৌশল, রণনীতি, অশ্বধাবন, অস্ত্রব্যবহারপ্রণালী ইত্যাদি বিবিধ সামরিক বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। পক্ষান্তরে হামিদাবানু রাজান্তপুরে অবস্থান নিবন্ধন রাজপরিবারের ছেলে মেয়েদের সংস্রবে থাকিয়া তিনি লিখা পড়াতেও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। হামিদাবানু যৌবনের প্রারম্ভে তাহার স্নেহশীল পিতার সাহায্যে সোলতান বায়জিদের সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করেন। সোলতান বায়জিদ প্রথমাবস্থায় তাহাকে পুরুষের পোষাক পরিধানে এবং সামরিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণে সম্মতিদান করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে হামিদাবানুর গুণগরিমা তাহার অসাধারণ যোগ্যতা, বাকচাতুর্য্য, কর্ম্মনিপুণতা ও সাহস বিক্রম দর্শনে সোল্তান নিতান্ত আগ্রহ ও কৌতুহলের সহিত তাঁহাকে সমর বিভাগে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

হামিদাবানু অত্যল্পকাল মধ্যে, স্বীয় প্রতিভা এবং সামরিক যোগ্যতার প্রভাবে ক্রমোন্নতি করিয়া লেপ্টেন্যান্ট পদে নিযুক্ত হন। হামিদাবানু বিভিন্ন যুদ্ধে এবং সামরিকপ্রদর্শনী ক্ষেত্রে যেরূপ কর্ম্ম-কৌশলতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-মত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে সোলতান বায়জিদ তাহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট এবং সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া পড়েন। হামিদাবানু তাঁহার সামরিক কর্ম্মনিপুণতা ও যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ সময় সময় রাজকীয় পুরস্কার লাভে সম্মানিত হইতেন। তিনি ২৪ বৎসর যাবৎ কৌমার অবস্থায় সোলতানের সামরিক বিভাগে অত্যন্ত

দক্ষতার সহিত সৈন্য চালনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক দেশময় খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন।

ইত্যবসরে আমীর তৈমুরের সহিত তুরস্কের সোলতান বায়জিদএলদরেমের মহাসংগ্রাম আরম্ভ হয়। হামিদাবানু এই মহাযুদ্ধে স্বীয় পিতার সহিত শৌর্য্যবীর্য্য ও রণপ্রতাপের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বলা বাহুল্য যে, পরিণামে বায়জিদ এই ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত এবং রণক্ষেত্রে ধৃত হন। তৎসঙ্গে হামিদাবানু তাঁহার সেনাদলের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণসহ আমীর তৈমুরের হস্তে বন্দী হন। পরদিবস আমীর তাঁহার চিরস্বভাবসিদ্ধ নিয়মানুযায়ী বন্দীদিগকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। আমীরের আদেশ পালনে বিলম্ব করার উপায় ছিল না। ঘাতক বন্দীদিগকে হত্যা করার জন্য শৃঙ্খলিত করিতে লাগিল, ইতঃমধ্যে হামিদাবানু সাহসে বুক বাঁধিয়া পূর্ণ নির্ভীকতার সহিত আমীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ জন্য অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। আমীর তৈমুর বধ্যভূমির এক হতভাগ্য ব্যক্তির ঈদৃশ নির্ভীক ভাবগতিক এবং তাহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর বাকচাতুর্য্য দর্শনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে তদীয় বক্তব্য প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিলেন। হামিদাবানু ভয়ভীতির পাশ কাটিয়া নিঃসংস্কোচভাবে আমীর তৈমুরের অত্যাচার উৎপীড়ন এবং নিরীহ বন্দীদলের সহিত তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও তৎপ্রতি কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ করিয়া তাঁহাকে পরকালের পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বিশ্বনিয়ন্তা পরম কারুণিক খোদাতাআলা যে পরকালে অত্যাচারীর নিকট দুর্ব্বলের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন তদ্বিষয়, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি উল্লেখ করিয়া আমীরের চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, নিরীহ নিঃসহায় দুর্ব্বল বন্দীদিগকে নৃশংসতার সহিত হত্যা করা কোন্ বীরোচিত কার্য্য? ইহাকি কাপুরুষতা ও চরম নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে? এরূপ ঘৃণিত কার্য্য দ্বারা কি মোগলবংশের যশোগৌরবের মস্তকে কলঙ্ক-কালিমা লেপিত হইবে না? তোমার দিগ্বিজয়ের ইতিহাস কি চিরকাল নির্দ্দোষ জনসমূহের হত্যাজনিত শোণিতধারায় রঞ্জিত হইয়া থাকিবে না? ঈশ্বরভীতি কি তোমার অন্তরে আদৌ স্থান পায় না? এই বলিতে বলিতে হামিদাবানু স্বীয় মস্তক হইতে পুরুষোচিত সামরিক মস্তকাবরণ খুলিয়া ফেলিলেন এবং শরীরের সামরিক বহিরাবরণ খুলিয়া তাঁহার স্বাভাবিক নারীবেশ ধারণ করিলেন এবং তিনি যে একজন তুর্কীনারী তাহার পরিচয় প্রদানান্তে পুনরায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন, আমীর প্রবর! মাদৃশ যে জাতির শত শত বীরাঙ্গনা স্বদেশের সম্মান রক্ষা এবং স্বাধীনতা ও জাতীয়গৌরব বজায় রাখিবার নিমিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে রণক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিবাৎসল্য ও জাতীয়গৌরব সংরক্ষণ এবং আত্মসম্মান জ্ঞান যে জাতির ভূষণ স্বরূপ, সেই জাতির রাজ্যাধিকার করা এবং সে জাতির পতন কখনও সম্ভবপর নহে তাহা আপনি স্থির নিশ্চিত বলিয়া বিশ্বাস করুন। তাহারা স্বদেশের সম্মান ও স্বাধীনতা সংরক্ষণকল্পে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একে একে

প্রাণদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না, অতএব তুরস্ক জয়ের কল্পনা আপনার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। আপনি তুর্কীজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাতে যে কেবল তুর্কীজাতির অনিষ্ট সাধিত হইবে তাহা নহে, বরং তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে এস্লামের ও মুসলমান জাতির মহা অধঃপতন সংঘটিত হইবে তাহা নিশ্চিত। আমীর বাহাদুর! আপনি চিন্তা করিয়া দেখিবেন, সমগ্র ইউরোপে একমাত্র তুর্কীরাই ইউরোপের প্রবল খৃষ্টান শক্তি সমূহের সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইয়া এস্লাম সাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষা করিতেছে। ইউরোপে যে একমাত্র তুর্কীজাতি দ্বারা এস্লাম ধর্ম্ম ও মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। তুর্কীজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে ইউরোপ ভূমি হইতে চিরকালের নিমিত্ত এস্লাম প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা, আপনি মোসলেম জাতি ও পবিত্র এস্লাম ধর্ম্মের প্রতি সদয় হইয়া তুর্কীজাতি এবং যুদ্ধের নিরীহ বন্দীগণের সম্বন্ধে সুবিচার করুন। বন্দীদিগকে বধ করার প্রথা জগতের কোন জাতির সমর্থনীয় নহে। কোন সুসভ্য জাতি বা জ্ঞানীলোক যে নিরীহ বন্দীগণের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতে পারে তাহা কল্পনায় আসে না। আশ্রিতজনের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন কাপুরুষতার চরম নিদর্শন, অতএব মনুষ্যত্ব, সভ্যতা ও ধর্ম্মভয়ের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে আপনার যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় হতভাগ্য বন্দীদের সহিত সেরূপ ব্যবহার করুন ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।

আমীর তৈমুরের দরবারে মুখ ফুটিয়া কখনও কেহ কোন কথা উচ্চারণ করিতে সাহস পাইত না, তাঁহার দরবারের মন্ত্রীবর্গের পক্ষেও কোন বিষয় মন্তব্য প্রকাশ করার উপায় ছিল না, তাঁহার সংহারমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার সদনে কাহারও বাক্য স্ফুট হইত না। পৃথিবীর স্বাধীন নরপতিগণ তৈমুরের নাম শ্রবণে এবং তাঁহার কঠোর ব্যবহার ও নৃশংস অত্যাচার কাহিনী শ্রবণে থরথরি কম্পিত হইতেন, এমতাবস্থায় একটী বন্দিনী নারীকে প্রবল প্রতাপশালী আমির তৈমুরের প্রতিকূলে তীব্র সমালোচনা ও তীব্র ভাষায় তাহার নিন্দাবাদ করিতে দেখিয়া তৈমুর ও তাঁহার সভাসদগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। আমির বহুক্ষণ ব্যাপিয়া নারীর সাহস ও মনের বল দর্শনে স্তম্ভিত ও নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া থাকিলেন এবং পরিণামে বীরাঙ্গনার ন্যায়সঙ্গত সত্য মন্তব্যজনিত প্রার্থনানুযায়ী সমুদয় বন্দীগণের প্রাণদান করিলেন। অতঃপর আমীর হামিদাবানুর রূপ লাবণ্য ও তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ সাহস ও বাকনিপুণতা ইত্যাদি গুণ গরিমায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। হামিদাবানু প্রথমতঃ তাঁহার সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু পরিণামে উপায়ন্তর না দেখিয়া আমির তৈমুরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

হামিদাবানু আরবী, ফার্সী, তুর্কী ও জরদস্তী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। তাঁহার মধ্যে কবিত্বশক্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি নীতিজ্ঞান ও বীররসের কবিতা লিখিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

হামিদাবানুর অভিযান।

সম্রাট তৈমুরের আস্তথর দুর্গের শাসনকর্ত্তা শরিফ হাসন বিদ্রোহাচরণ করিলে, আমীরের অনুমতিক্রমে, হামিদা বেগম দ্বাদশ সহস্র সৈন্যের অধিনায়িকারূপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি প্রবল ঝটিকাবৎ দ্রুতগতিতে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া আস্তথর দুর্গ অবরোধ করিলেন এবং বিদ্রোহী গবর্ণরের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে বীরধর্ম্মানুযায়ী তাহাকে বশ্যতা স্বীকার ও আত্ম সমর্পণের জন্য পত্র লিখিলেন। শরিফ হাসন প্রত্যুত্তরে নিতান্ত বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থী হইয়া বশ্যতা স্বীকারের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সরলা বেগম তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক নিশাযোগে নিশ্চিন্তমনে সসৈন্য নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন, ইতাবসরে কপট ও ধূর্ত্ত শরিফ হাসন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ কূটনীতির পরিচয় দিতে বিরত হইলেন না। তিনি গভীর রাত্রিতে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক একদল প্রবল রণনিপুণ বাহিনী লইয়া হামিদাবানুর নিদ্রিত সৈন্যদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করেন। হাসনের সৈন্যদল হামিদাবানুর সৈন্যশিবির অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিজ শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছে, ইতঃমধ্যে সৈন্যগণের কোলাহল পরম্পরায় এবং অস্ত্রশস্ত্রের সংঘর্ষ ঝঙ্কারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি অতিকষ্টে তাঁহার সামরিক পোষাক পরিধানের সুযোগ পাইলেন। তিনি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বুক বাঁধিয়া রণবাদ্য বাজাইয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে জাগ্রত করিলেন এবং অবিলম্বে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক, শত্রুসংহারে ধাবিত হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে রণসাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুই দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। হাসনের সৈন্যগণ বেগমকে চতুর্দ্দিক হইতে অবরোধ করিয়া ফেলিয়াছিল। হাসন তাঁহার সৈন্যদিগকে পুনঃপুনঃ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, সাবধান, হামিদা বেগম যাহাতে জীবিতাবস্থায় ধৃত হয় তাহার ব্যবস্থা কর, অস্ত্রাঘাতে যাহাতে সে নিহিত না হয় তৎপ্রতি সকলেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। বেগম অশ্বারোহণে নিতান্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অস্ত্র চালাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল। তিনি একাকিনী সকলের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন, ইত্যবসরে শরিফ হাসনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত বেগমের সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধ সংঘটিত হইল। হামিদাবানুর নিক্ষিপ্ত এক অব্যর্থলক্ষ্য তীরের আঘাতে হাসন পুত্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলশায়ী হইয়া পড়িলেন। হাসন এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শনে শোকে ও ক্রোধে অধীর হইয়া ঘোধরাব করিয়া বেগমের সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিয়া বেগমকে গ্রেফতার করিতে পুনঃপুনঃ আদেশ জারী করিতে লাগিলেন। বেগম বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে অস্ত্র চালনা করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেছিলেন। ইতঃ মধ্যে তাঁহার নিদ্রিত ও ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ প্রকৃতিস্থ হইয়া যথা নিয়মে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বেগম অগ্র পশ্চাৎ বামে দক্ষিণে, চতুর্দ্দিকে অশ্বধাবিত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি সৈন্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকমতে

বাণবর্ষণ, তরবারি সঞ্চালন, বর্শা চালনা ইত্যাদি নানা সামরিক কৌশলে আত্মরক্ষা ও শত্রুসংহারে তৎপরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সারারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তীর, বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্রাঘাতে বেগমের শরীরের নানাস্থান ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে যুদ্ধের অবসান হইল। শরীফ হাসনের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। বেগম যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে যেমন তিনি স্বয়ং আহত হইয়াছিলেন তদ্রূপ তাঁহার বহু সৈন্য হতাহত হওয়ায় তিনি নিতান্তই চিন্তাতুর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিহিত সৈন্যসংখ্যা তিন সহস্রে পরিণত হইয়াছিল। তিনি নানা অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অস্থায়ীভাবে দুর্গাবরোধ উঠাইয়া লইলেন। সেখান হইতে ৩০ মাইল ব্যবধানে সরিয়া গিয়া তিনি তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে লইয়া বিশ্রাম এবং আহত সৈন্যদলের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পর তিনি পুনরায় আস্তখর দুর্গ অধিকার করা আবশ্যক মনে করিয়া সেদিকে অভিযান করিলেন। ধূর্ত্ত হাসন সর্ব্বদা বেগমের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। তিনি বেগমের অভিযান সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া দুর্গ হইতে ৭ মাইল অগ্রসর হইয়া বেগমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। হামিদা বেগমের রণকৌশল, অদম্য উৎসাহ এবং অসীম সাহসের কল্যাণে শত্রুসৈন্য সম্মুখসমরে পরাজিত হইল। শত্রুদলপতি হাসন শরিফ রণক্ষেত্রে নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্র কন্যা সকলেই বন্দী হইল। হামিদা বেগম তাহাদের সহিত নিতান্তই উদার ও ভদ্র ব্যবহার করিলেন। আস্তখর দুর্গ একজন বিশ্বাসী সামরিক পুরুষের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক হামিদা বেগম বিজয়োল্লাসে মহা সমারোহের সহিত তৈমুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

তৈমুরবংশীয় মোগল সম্রাট ও সম্রাট-পুত্রগণ শৌর্য্যবীর্য্যে ও সাহস বিক্রমে অতুলনীয় ছিলেন ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, কিন্তু মোগল রাজপরিবারের নারীগণও যে সাহস বিক্রমে ও রণকৌশলে তাঁহাদের স্বামী ও ভ্রাতৃগণের তুলনায় পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "বাবর নামা" بابرنامه "হুমায়ুন নামা" همایون نامه "তজোকেজাহাঁগিরী" تزک جہانگیری ইত্যাদি মোগল রাজত্বের ইতিহাস পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৈমুরবংশীয় মহিলাগণ পুরুষগণের অনুকরণে সর্ব্বদা যুদ্ধের পোষাকে নিজদের অঙ্গ ভূষিত করিতেন, সামরিক অস্ত্রচালনায় অভ্যাস করিতেন, অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, শিকার কার্য্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন, ব্যাঘ্রহত্যায় আমোদ উপভোগ করিতেন, ধনুর্ব্বিদ্যায় এবং বলক্রীড়ায় তাঁহারা বেশ পারদর্শিতা লাভ করিতেন। ফলতঃ সামরিকজীবনের অনেক গৌরবজনক কার্য্যই মোগলমহিলাগণের দ্বারা সম্পাদিত হইত।

এস্‌লামাবাদী।

লর্ড হেডলীর এসলাম গ্রহণ।

বিলাতের নব দীক্ষিত মোসলেম ভ্রাতা মহাত্মা লর্ড হেড্‌লীর এসলাম গ্রহণ ব্যাপারটী লইয়া বিলাতের সংবাদপত্র মহলে বেশ একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার এসলাম গ্রহণের কারণ অবগত হইবার জন্য বিলাতের বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রত্যেককে যে কথা বলিয়াছিলেন আমরা সকলের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া দিলাম। প্রথমে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কিন্তু তাঁহার জীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত আমরা এখনও সম্যকরূপে জানিতে পারি নাই। তবে যতটুক জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই এইস্থলে দেওয়া গেল :—তিনি আয়র্লণ্ডের অধিবাসী। গত ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি তাঁহাদের বংশানুক্রমিক লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন। আয়র্লণ্ডে ও ইউর্কশায়ারে তাঁহাদের ১৬০০০ বর্গ মাইলের অধিক ভূসম্পত্তি আছে। তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এক সময়ে ইউঘেলের ও বে হারবরের উপকূল-রক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধান তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি এক সময়ে ভারতবর্ষে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। জামো ও লেহের শাসনকর্ত্তা মিষ্টার জনসনের কন্যার সহিত তিনি বিবাহিত। তাঁহার কতকগুলি সন্তান আছে। তিনি একজন সুলেখক ;—তাঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তকও আছে। সংবাদপত্র সম্পাদনেও তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন ; তিনি কয়েক বৎসর "সালিসবরী জার্ণাল" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকও ছিলেন। লর্ড হেডলী শারীরিক হিসাবে বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং দেখিতে সুন্দর, তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান এবং প্রখর বুদ্ধি। মাননীয় খাজা কামালউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে "এসলামিক সোসাইটীর" সভা প্রাঙ্গনে লর্ড হেডলী প্রকাশ্যে এসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে তাঁহার এস্‌লাম গ্রহণ বিষয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার যথা :—

"আমি বহুকাল হইতে গ্রন্থ পাঠ পরম্পরায় এসলামী শিক্ষার অনুরাগী। এবং আমি আশা করি ক্রমে সমুদয় প্রাচ্য জগৎ এই পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এসলাম গোঁড়ামী ও অনুদারতার ঘোর বিরোধী। বলা বাহুল্য যে, ইহাতেই মানবের শান্তি ও তৃপ্তি। আমার মতে ইহাই কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস ও প্রেমের ধর্ম্ম। "এসলামিক রিভিউ" পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। আল্লাহতাআলার প্রশংসা করাই এসলাম ধর্ম্মের মূল শিক্ষা ; এবং মানবের প্রতি সহানুভূতিশীলতা, পরোপকার, ত্যাগস্বীকার, সম্যক এবং সর্ব্ব বিষয় খোদাতাআলার প্রতি নির্ভরতা এস্‌লামের অঙ্গীভূত। যদিও আমি বাল্যকাল হইতেই জগদীশ্বরের অসীম দয়া ও অপার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলাম, তথাপি আমি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যখন হইতে আমি এই পবিত্র ও বিশ্বাসজনক এসলামধর্ম্মকে

সত্যরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, তখন হইতে আমি আমার হৃদয়ে যেরূপ অনাবিল শান্তি, তৃপ্তি ও নিরাপদতা অনুভব করিয়াছি, সেরূপ আমি পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টান থাকা কালীন, কখনও অনুভব করিতে পারি নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মের বহু শাখা প্রশাখার ভিন্ন ভিন্ন জটিল দুর্ব্বোধ্য ব্যবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া আমি যেন সমুদ্রের নির্ম্মল বায়ু গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, এবং এসলামের সরল ও উদার শিক্ষার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতঃ ইহার জ্যোতির্ম্ময়ী উজ্জ্বল আলো দেখিতে পাইয়া আমি যেন খৃষ্টান ধর্ম্মের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ হইতে উদ্ধার পাইয়া অপার আনন্দ ও শান্তিলাভ করিয়াছি।

গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাস খৃষ্টান ধর্ম্ম গুলির সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কিন্তু এসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে এ কথা আদৌ প্রযোজিত হইতে পারে না। সামান্য ২।১টী বিষয়ে মতভেদ ব্যতীত এসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই মূল বিষয়ে এক মতাবলম্বী। এক্ষণে আমরা (ইউরোপবাসিগণ) যদি প্রচলিত জটিল খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সত্য সনাতন এসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করি তাহা হইলে তাহা যে কত আনন্দের বিষয় হইবে তাহা আর কি বলিব। এসলামই একমাত্র সরলতাপূর্ণ ধর্ম্ম; এবং মানবের আকাজ্ক্ষাকে একমাত্র এসলামই পরিতৃপ্ত করিতে পারে; একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এসলামের শিক্ষা (হজরত মুসা ও (হজরত) ঈসার শিক্ষার বিরোধী নহে।

প্রাচ্যেই খৃষ্টানধর্ম্মের উৎপত্তি, হজরত ঈসা অবশ্যই এসিয়াবাসী। তাঁহার মাতা হজরত কুমারী মরিয়মও এসিয়ার লোক। আর হজরত মুসা ও অন্যান্য পয়গম্বরগণও এসিয়ার অধিবাসী। হজরত মোহাম্মদও অন্যান্য পয়গম্বরগণের ন্যায় এসিয়াবাসী। তিনি স্বর্গীয় প্রেরিত তত্ত্ববাহক। পবিত্র পুস্তক কোরআন বাইবেল ও অন্যান্য প্রেরিত ধর্ম্ম পুস্তকের মত স্বর্গীয় বাণীতে পূর্ণ। এবং ইহা বাইবেল ও অন্যান্য প্রেরিত ধর্ম্ম পুস্তককে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে না, বরং ঐ সকল পুস্তক যে এক কালে ঈশ্বর কর্ত্তৃক পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল কোরআন তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম পুস্তকের শিক্ষা ব্যতীত বর্ত্তমানকালের উপযোগী এরূপ বহু অতিরিক্ত শিক্ষা কোরআন প্রদান করিতেছে; এবং ইহা সকল প্রকার মূর্ত্তি পূজা ও জড়বাদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। সেই পরম করুণাময় পরম পিতা পরম বিজ্ঞ, পরম দয়ালু আল্লাহতাআলার নামের সহিত কাহারও নাম সংযুক্ত হইতে পারে না। সামান্য দ্বেষ হিংসা ও পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদের অনেক উচ্চে এসলামের আসন। যদি হজরত ঈসা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত খৃষ্টান ধর্ম্ম সেকালে মানবের উপকারের জন্য অতটা কাজ করিতে পারে, তবে কেন হজরত মোহাম্মদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অতি উদার সরল প্রাকৃতিক বিধানের অনুকূল, জ্ঞান বিজ্ঞান অনুমোদিত এসলাম-ধর্ম্ম মানবের উপকারের জন্য অধিকতর কার্য্যকরী হইবে না? পূর্ব্বগামী পয়গম্বরগণের চরিত্রের সহিত হজরত মোহাম্মদের চরিত্রের তুলনা করিলে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর কোরআনের আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কোরআন পূর্ব্বকালের ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম্ম পুস্তকের বিরোধী নহে—কোরআন বাইবেলের প্রকৃত উপদেশ সংরক্ষণ করতঃ

বর্ত্তমানকাল উপযোগী আরো বহু অতিরিক্ত উপদেশ প্রদান করিতেছে। অনেকের ধারণা আমার দুইটী ধর্ম্ম মত আছে। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভুল ধারণা। আমার ধর্ম্ম মত একই মাত্র, সেই মত যথা :—

সেই পরম করুণাময় আল্লার উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ও তাঁহার সমুদয় সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া বিতরণ আর ইহারই অপর নাম এসলাম।

মুইনদ্দীন হোসেন।

জীবন-দায়িনী শক্তি।

খৃষ্টীয়ান-পাদ্রি সাহেবগণ বাইবেল হইতে গোটা কয়েক কথা তুলিয়া সাধারণকে এই বলিয়া ভ্রমে ফেলিতে চেষ্টা করেন যে, আমাদের যিশু—মরা (জীব) মানুষ জীবিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ঈশ্বর! কিন্তু মোজেস (মুছা) নির্জ্জীবকে জীবন দান করিয়াছিলেন তাহলে তিনি বড় ঈশ্বর আমরা আপাততঃ এ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত রাখিয়া শুধু এইমাত্র বলিতে চাই যে, যিশু মরা জীবিত করিতেন, তা' বেশ; কিন্তু জিয়ন্তে মরাদিগকে আধ্যাত্মিক জীবনদানের জন্য তিনি কিছু করিয়াছিলেন কি? বিশ্বাসের অল্পতা এবং শিক্ষার অভাবে যে মানুষ বাহ্যতঃ মানবাকৃতি থাকিলেও আভ্যন্তরিক হিসাবে কোন নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষা উন্নত বলিয়া প্রমাণিকৃত হইতে পারে না, যিশুর নিকট ইহার কি প্রতীকার ছিল?

বাইবেলে উক্ত আছে, যিশুর প্রধানতম সহায় পিতর জানিয়া শুনিয়াও শুধু প্রাণের ভয়ে প্রাণের প্রাণ যিশুকে একই রাত্রির মধ্যে তিন তিন বার 'চিন না' বলিয়া একটা জলন্ত মিথ্যাকথা বলিয়া স্বীয় নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে মিথ্যাবাদের কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত করেন। ইস্কারতীয় যিহুদা যিশু কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ সতর্কীকৃত হইয়াও স্বীয় প্রভু যিশুকে শুধু ত্রিশটা টাকার লোভে চিরতরে শত্রুহস্তে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। মার্ক নামক অপর এক সহচর স্বীয় ধর্ম্মভাইদিগকে শত্রুদেশে ফেলিয়া পালাইয়া আপন প্রাণরক্ষা করেন। সর্ব্বশেষে বলিতে হইতেছে, যিশু যখন শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন, তখন যাবতীয় শিষ্য—যেই শিষ্যগণের জন্য তিনি প্রাণ উৎসর্গ করিতে যাইতেছেন—তাঁহারা সকলে নিজ নিজ প্রাণ লইয়া দূর দূরন্তরে পালাইয়া গেলেন! তাঁহাদের এই যে ভীরু ব্যবহার, এই যে প্রাণের দুর্ব্বলতা—যিশু কি তাহা দেখিতেন না? যদি এসব তাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তবে হয় তিনি কোন প্রতীকার করিতে চেষ্টা করেন

নাই, অথবা যদি করিয়া থাকেন তবে তাহা ফলবতী হয় নাই। পরন্তু এই উভয় প্রকারেই তাঁহার ঈশ্বরত্ব দূর হইয়া যায়। বরং তেমন মানুষ হইতে হইলেও তাঁহাতে একটু অভাব দেখা যায়।

পাঠক, শেষনবী হজরত রসুলে করিম মোহাম্মাদ মোস্তফার জীবনী আলোচনা করুন, সত্যের জন্য নিজের প্রাণ কেমন করিয়া উৎসর্গ করিতে হয় হজরত আলী, হজরত আবুবকর, হজরত খোবায়ব প্রভৃতি অসংখ্য ছাহাবা বা সহচরের জীবনে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কাফের-গণ হজরতকে হত্যা করিবে বলিয়া তাঁহার আবাস ঘেরাও করিল, খোদার আদেশে তিনি দেশত্যাগ করিলেন—বিছানায় বসইয়া গেলেন আল্লার সাদ্দুল আলীকে—প্রাণাধিক ভাবী জামাতা এবং পিতৃব্য পুত্র আলীকে! হজরত আলী জাগ্রত অথচ অচঞ্চলভাবে সারাটী রজনী সেই বিছানায় সুখে অতিবাহিত করিলেন। হজরত আবুবকর হজরতের জন্য বাড়ীতে যাহা ছিল সব এবং হজরতকে কাঁধে লইয়া সুর নাম পর্ব্বতের গুহায় গিয়া আত্মগোপন করিলেন। এদিকে হজরত ক্লান্তদেহে হজরত আবুবকরের কোলে শয়ন করিলেন। আবুবকর বসিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, প্রকাণ্ড বিষধর আসিয়া ভক্তের পদে দংশন করিল। কিন্তু সাবাস ভক্ত! বিষের জ্বালায় প্রাণ যায় তথাপি একটুকু নড়াচড়া বা উঃ আঃ পর্য্যন্ত বলিলেন না—শুধু রসুল জাগিয়া উঠিলে আরামের ব্যঘাত হইবে ভাবিয়া! আর হজরত খোবায়ব কি করিয়াছিলেন, আল্-এসলামের পাঠক তাহা বেশ অবগত আছেন।

এখন অনুরোধ এই, পাদ্রীসাহেবগণ ন্যায়ের চশমা জোড়াটী অন্তশ্চক্ষে লাগাইয়া দেখুন জীবন দায়িনী শক্তি, বাস্তবিক জীবন দায়িনী শক্তি কাহার ছিল? যিশুর না মোহাম্মদের? যিশুর প্রার্থনায় মরা মানুষ বাঁচিত সত্য, কিন্তু কেহই মৃত্যুর হাত হইতে চিরতরে রক্ষা পায় নাই। আর হজরত মোহাম্মদ এমন জীবন দিয়া গিয়াছেন, যাহার ফলে ইহ পরকালে কখনই কাহারও মৃত্যু ভয় ছিল না এবং নাই।

মোহাম্মদ মুজাফফর উদ্দীন।

মহাকবি শেখ সাদী। *

মহাত্মা শেখ 'সাদী'কে পারস্য সাহিত্যাকাশের পূর্ণ শশধর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু ভারত-ভূমি বলিয়া নয়, পৃথিবীস্থ যাবতীয় শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের মধ্যে, শেখ 'সাদী'র নাম ও পারস্য সাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা শুনেন নাই এরূপ লোক অতি বিরল। পারস্য সাহিত্য অতি বিস্তৃত ও তাহার সাহিত্যসেবিগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; এহেন সাহিত্যক্ষেত্রে অসংখ্য সাহিত্য-রথিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করা ও স্বীয় যশোবিভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। ঐশী শক্তির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র মানবীয় শক্তিরদ্বারা এরূপ পদের অধিকারী হওয়া অসম্ভব; সুতরাং শেখ সাদী যখন এই পদের অধিকারী হইয়া মহা মহা সাহিত্য-রথিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়মাল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার অসাধারণ সাহিত্য অলৌকিক জ্ঞান ও ক্ষমতার কথা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

কবির জন্মবৃত্তান্ত, বংশ পরিচয় ও তাঁহার শিক্ষা।

কবির প্রকৃত নাম 'শরফুদ্দীন', তিনি 'মোস্লেহ' (সংস্কারক) উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সাহিত্যজগতে তাঁহার নাম 'সাদী' বলিয়াই বিখ্যাত। তাঁহার রচিত কবিতা সমূহের ভণিতায় এই 'সাদী' নামই দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্য রাজ মহাত্মা 'সাদে'র রাজত্বকালে তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, অধিকন্তু তাঁহার পিতা শেখ আবদুল্লা রাজ সংসারে কার্য্য করিতেন, সম্ভবতঃ এই সকল কারণ বশতই আপন নামের সহিত রাজার নামও অমর অক্ষয় করিবার উদ্দেশ্যে সাহিত্য জগতে তিনি আপনাকে 'সাদী' বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পারস্য রাজ 'সাদে'র ভ্রাতা সম্রাট 'মোজফ্ফর উদ্দিনে'র রাজত্বকালে পারস্যরাজের রাজধানী 'শিরাজ" নগরীতে কবির জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের সন লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মহা মতানৈক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, 'সারওয়েস্লী' সাহেব কবির জন্ম ১৩৩৩খৃঃ লিখিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে, মৃত্যুকালীন কবির বয়স ও অন্যান্য বিষয় ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উল্লিখিত সনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কবির জন্ম হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার

* Rose Jardu of Pershia, মৌলানা আলতাফ্ হোসেন হালী রচিত 'হায়াত সাদী' ও অন্যান্য কবিগণের টীকা টিপ্পনি অবলম্বনে লিখিত। (লেখক)

করিতে হইবে। তাঁহার পিতা 'শেখ আবদুল্লা একজন ন্যায় পরায়ণ, ধীশক্তিসম্পন্ন লোকছিলেন, ইহা ব্যতীত তদীয় বংশ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না।

কবির শৈশব-জীবন সম্বন্ধে এইমাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, তিনি অতি অল্প বয়সে 'এসলাম' ধর্ম্মানুমোদিত উপাসনাদির নিয়মাবলী শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। তদীয় পিতা এই সময় তাঁহাকে সর্ব্বদা আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতেন, মুহূর্ত্তের জন্য স্বাধীনভাবে যথেচ্ছাচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দিতেন না, তাঁহার রচিত গ্রন্থে তিনি আপন মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মূলীভূত কারণ তদীয় পিতৃ মাতৃ প্রদত্ত শৈশব শিক্ষাকেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় কৈশোরের প্রারম্ভেই শিক্ষাদীক্ষা সকল বিষয়ের অসম্পূর্ণাবস্থাতেই কবির পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর জ্ঞান সঞ্চারের পূর্ব্বে কিছুদিন তিনি স্বীয় জননীর শিক্ষাধীন ছিলেন, জ্ঞান সঞ্চারের পরই তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, যদিও তাঁহার বাসস্থান 'শিরাজ' নগরীতে সে সময় বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাজপ্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মাদ্রাসা বর্ত্তমানছিল এবং উপযুক্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর দ্বারা উক্ত বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা বিতরণ করা হইতেছিল; তথাপি সে সময় 'সিরাজ-নগরীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল, সম্রাট 'সাদ' একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ন্যায়বান বিচারকছিলেন বটে; কিন্তু তদীয় অসমসাহস ও দুর্দ্দান্ত বীরত্বাভিমান-বশতঃ তিনি সর্ব্বদা রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক 'এরাক্' প্রদেশে যুদ্ধাভিযানে রত থাকিতেন, এদিকে রাজধানী শিরাজ নগরী দস্যু তস্কর ও বহিশত্রুদিগের লীলা ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। এই অবস্থায় শিরাজ নগরীতে অবস্থান করিয়া শান্তির সহিত বিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনায় কবি স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মমতা বিসর্জ্জন দিয়া বোগদাদ নগরীস্থ "মাদ্রাসায় নেজামিয়া"য় শিক্ষা লাভ করিবার কামনায় বোগদাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে সময় উল্লিখিত মাদ্রাসাটি পৃথিবীর মধ্যে এরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল যে 'নেজামিয়া' মাদ্রাসায় কোন ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করিয়াছে জানিতে পারিলেই সাধারণে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের বিষয় সহজেই অনুমান করিতে পারিত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কুলচূড়ামণি প্রসিদ্ধ দার্শনিক "এমাম গাজ্জালী," পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা 'আবদুল কাহের' প্রমুখ পণ্ডিত কুল-ধুরন্ধরগণ ঐ মাদ্রাসা হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

কবি বোগদাদে উপস্থিত হইয়া উল্লিখিত মাদ্রাসায় শিক্ষা আরম্ভ করিলেন, তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষগণ তদীয় গুণগরিমা ও বুদ্ধি বৃত্তির প্রশংসা-গীতি শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কবি যে সকল পণ্ডিতগণের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর "আবুল ফারাজ" তাঁহাদের সকলের মধ্যে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ছিলেন। এই শিক্ষার সময় হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং এই সময় হইতেই তাঁহার যশোবিভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার বিদ্যাভ্যাস কালে তদীয়

সহপাঠিবৃন্দ ও অন্যান্য ২১৪ জন পণ্ডিত নামধারী মহাত্মা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও বাগ্মিতায় হিংসা প্রকাশ করিতে বিমুখ হন নাই। *

এই সময় 'বোগদাদে'ই আব্বাসীয় বংশের শেষ "খলিফা"র "তাতারী"দের হস্তে নৃশংসরূপে হত হওয়া" সম্বন্ধে কবি শোকোদ্দীপক ও হৃদয়বিদারক কতকগুলি কবিতা লেখেন, ঐ কবিতা-গুলি সুধী সমাজে যারপর নাই প্রসিদ্ধিলাভ করে। তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্যের দিকেই তাঁহার অধিক অনুরাগ দৃষ্ট হইত, তিনি নানাদেশে ভ্রমণ করায়, এবং সুদীর্ঘ সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থানের ফলে নানাবিধ বিদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

'সার ওয়েসলী' সাহেবের বর্ণনায় জানা গিয়াছে যে, কবি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ১৮টী ভাষা জানিতেন, কবির রচিত একখানি কবিতা পুস্তক দেখিয়াই 'ওয়েস্‌লী' সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। উল্লিখিত ভাষা সমূহের মধ্যে, বিদেশীয় অনেক ভাষা তাঁহার মাতৃ ভাষার ন্যায় হইয়া গিয়াছিল, সেই সকল ভাষায় তিনি অনর্গল কথা কহিতে, বক্তৃতা করিতে এবং রচনা লিখিতে পারিতেন। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত 'গার্সন' সাহেব তাঁহার 'জার্ণেলে' লিখিয়া ছিলেন যে, বিদেশীয় ভাষায় কবিতা লিখিতে 'শেখ সাদী'ই প্রথম অগ্রসর হন।

এই সমস্ত তত্ত্ব হইতে বেশ প্রতীতি জন্মে যে তিনি একজন সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সমীপে পণ্ডিত নামের অপেক্ষা 'কবি' নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

যেমন ইংরাজ কবিদের মধ্যে, অনেকেই দেশ ভ্রমণে রত হইয়াছিলেন 'বোগদাদে'র মাদ্রাসা হইতে বহির্গত হইবার পরেই শেখ সাদীও সেইরূপ দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। 'ওয়েস্‌লী' সাহেবের মতে প্রাচ্য পরিব্রাজকদের মধ্যে 'এব্‌নেবতুতা'কে বাদ দিলে 'শেখ সাদীই' প্রধান পরিব্রাজক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার বহুদেশ ভ্রমণ করেন। "চেম্বার্স্

* হিংসুকের দল চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে এবং সমাজ-হিতৈষী কর্ম্মবীর মহাত্মাদের শুভানুষ্ঠানের পথ চিরকাল কণ্টকাকীর্ণ করিতে চেষ্টা পাইবে; আমরা হিংসুক ও হিংসাদগ্ধ (حاسد و محسود) উভয় সম্প্রদায়কেই পবিত্র আদেশ الحق يعلو ولا يعلى স্মরণ করিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে বলি; অধিকন্তু হিংসা দগ্ধ (محسود) সম্প্রাদায়কে আমাদের ইহ পরকালের আশা ভরসার স্থল শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ রসুলমকবুল (روحي فداه) (দঃ) এর পবিত্র প্রার্থনা اللهم اجعلني محسودا ولا تجعلني حاسدا স্মরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতে ও ক্ষণভঙ্গুর মানব জীবনকে ধন্য মনে করিতে অনুরোধ করি। মহাকবি মহাত্মা 'সাদীর' ন্যায় মহাপুরুষকেও এক সময় হিংসাদগ্ধ হইয়া

توانم انکه نیازارم اندرون کسے　　　حسود را چه کنم کوز خود برنج درست

বলিয়া ক্ষোভ করিতে হইয়াছিল।　　　(লেখক)

ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া”:পাঠে জানাযায় যে, কবি ইউরোপের অনেকস্থানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থেই তিনি আপন ভ্রমণ বৃত্তান্ত কতক কতক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবি জল পথেও অনেক দেশে গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ বিশেষে তিনি ভারতবর্ষস্থ সোমনাথ দেবের বিখ্যাত মন্দির দর্শন সম্বন্ধে একটী ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। তাহা হইতে তাঁহার স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও জ্ঞান গরিমার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি পুস্তকের সৃষ্টি করিতে হয়।

কবি রচিত গ্রন্থাবলী ও তাঁহার জীবদ্দশায় সে সমূহের প্রসিদ্ধি লাভ।

কবি রচিত অনেক গ্রন্থেরই নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে ১২।১৪ খানিই প্রচলিত, এই সমস্ত গ্রন্থ গদ্য ও পদ্যে লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ প্রভৃতি মানব মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া স্বভাবের ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া, সরল ভাষায় হাঁসি, ঠাট্টা, গল্প গুজবের ছলে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, স্বভাবের বিপরীত ঘটনা বর্ণনে প্রায় তাঁহার লেখনী পরিচালিত হয় নাই। এই সমস্ত কারণ পরম্পরায় অনেকে: ‘সেখ সাদী’ ও প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি ‘সেকসপিয়র্’কে এক ধর্ম্ম বিশিষ্ট কবি বলিয়াছেন এবং শেখ সাদীকে প্রাচ্য ‘সেকস পিয়র নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সুখের বিষয় এ হেন কবিকে পাশ্চাত্য কবি মিলটন, ওয়ার্ডস্ ওয়ার্স প্রভৃতির ন্যায় নিজ জীবনে যশোলাভে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। তাঁহার সময়ে অনেক বড় বড় কবি বর্ত্তমান থাকা সত্বেও তিনি সুধী মণ্ডলীর নিকট যশোলাভে অকৃতকার্য্য হন নাই; বরং আর সকলকে বঞ্চিত করিয়া তিনিই জয়মাল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কালেই দেশ দেশান্তরে তদীয় যশোবিভা বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কবির ভাগ্যে জীবদ্দশায় এরূপ যশোলাভ প্রায় ঘটিয়া উঠে না।

কবিতাশক্তি ও কবিতার সমালোচনা।

‘শেখ সাদীর’ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে প্রাচ্য কবিদের মধ্যে এযাবৎ তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার কবিতা সমূহ যেমন সরল, তেমনি হৃদয়গ্রাহী, কবিতা সমূহ মহিমান্বিত পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ছাত্রের দলপর্য্যন্ত সকলের মুখে সমভাবে আবৃত্ত হইতে শুনা যায়। সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যেও তাঁহার রচিত অনেক কবিতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এযাবৎ অন্য কোন কবির কবিতা সাধারণের মধ্যে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

কবির কোন কোন গ্রন্থ অধিক প্রসিদ্ধ। তদীয় গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ‘গোলেস্তা’ গ্রন্থটী সাহিত্য জগতে অধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। ল্যাটিন, ইংরাজী, জার্ম্মাণী, ফরাসী, উচ্চতর অন্যান্য নানাভাষায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ‘গোলেস্তাঁ’র অনুবাদ পরিগৃহীত হইয়াছে, অনেকে বলিতে

চাহেন যে, পারস্য ভাষায় সরল অথচ হৃদয়গ্রাহী পুস্তক 'গোলেস্তা'র মত আর দ্বিতীয় রচিত হয় নাই। বড় বড় গ্রন্থকারদের মধ্যে আরও অনেকের গ্রন্থ পারস্য সাহিত্যে প্রচলিত আছে বটে; কিন্তু সে সমুদয়ে ভাবের লালিত্য অপেক্ষা ভাষার লালিত্যই কিছু বেশী।

কবির দাম্পত্য জীবন ও সাংসারিক অবস্থা।

কবির সাংসারিক অবস্থা ভালছিল না; তিনি চিরদিন দারিদ্র্যের সহচর হইয়া জীবন কাটাইয়াছেন, নিয়মিতরূপে গৃহস্থালী পাতিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, অথবা তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহা করেন নাই। সে সময় উচ্চপদস্থ অনেক ধনী লোক তাঁহার ভক্তছিলেন, কিন্তু কবি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাহারও দান গ্রহণ করিতেন না, কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে ও ভাল বাসিতেন না, তবে ঘটনাচক্রে পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে ২।১টী ঘটনায় ইহার বিপরীতাচরণ করিতে দেখা গিয়াছে।

কবি আপন জীবনের প্রথমাংশ শিক্ষালাভে, দ্বিতীয় বৃহদংশ 'ভূপ্র দক্ষিণে' এবং শেষ অংশ নির্জ্জনবাসে ঈশ্বরারাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রণয়ন ও কবিতা রচনার কার্য্য তাঁহার শিক্ষার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজীবনকালই চলিয়াছিল। তাঁহাকে স্বেচ্ছায় দার পরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে দেখা যায় না। শৈশবাবস্থায় পিতৃ মাতৃ প্রদত্ত উপদেশাবলী দ্বারা সংসারের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা-ভাব জন্মিয়াছিল, আজীবন তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া একবার তাঁহাকে দাম্পত্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র দাম্পত্য-সুখ উপভোগ করিতে পারেন নাই; বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাই ঘটিয়াছিল।

মৃত্যু ও সমাধি।

পারস্য-রাজ্য তাতারের 'খানবংশীয়'দের হস্তগত হওয়ার পর তাঁহাদের রাজত্বকালে ৬৯১ হিঃ জন্মভূমি 'শিরাজনগরীতে' ১২০ বৎসর বয়সে কবি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন বয়স লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু আমাদের উল্লিখিত মতটী নানা কারণে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। 'সার ওয়েসলী' সাহেব বলেন যে শিরাজ-নগরীস্থ 'দেলকোশা' নামক স্থান হইতে একমাইল পূর্ব্বে একটা পর্ব্বতের নিম্নদেশে কবির সমাধি বিরাজমান। তাঁহার সমাধি স্থানটী বিশেষ 'জাকজমক্' বিশিষ্ট। সমাধিটী প্রস্তর নির্ম্মিত। সমাধির চতুষ্পার্শ্বে কবির রচিত অনেকগুলি কবিতা লিখিত হইয়াছে। স্থানটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই এজগতের নশ্বরতার ছবি উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্ব্বক হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। অহো জগতের নশ্বরতা বর্ণনে একজন আরব্য কবি কি সুন্দর গাহিয়া গিয়াছেন।

ألا يا ساكن القصر المعلي ستدفن عنقريب في التراب
له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب

কাজী নওয়াজ খোদা।

নাছের খসরু।

১। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনীর রাজবংশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সুবিধা বুঝিয়া খোরাসানের সেলজুকগণ সুলতান মাহমুদের পুত্র মসউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল। মসউদ পরাস্ত হইলেন। সেলজুকগণ খোরাসানে এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করতঃ বিখ্যাত তোগরাল বেগকে স্বীয় সম্প্রদায়ের নেতা মনোনীত করিল। তোগরাল বেগ অল্পকাল মধ্যেই সমুদয় পারস্য প্রদেশ অধিকার করিয়া নিশাপুরে রাজধানী স্থাপন করতঃ স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই সেলজুক রাজগণের সময়েই পারস্য সাহিত্য সর্ব্বোতোভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

২। সুলতান মাহমুদের সময় কেবল পারস্য কাব্যেরই চর্চ্চা হইত। মহাকবি ফেরদৌসী এক শাহানামায় ৩০ বৎসর কাল কাটাইলেন, কবিগুরু আন্‌সারী ৪০০ কবিগণ সহ এক কবিমণ্ডলী স্থাপন করিয়া কেবল কাব্যেরই চর্চ্চা করিতেন, কিন্তু সেলজুক রাজত্ব কালে মনীষিগণের ভাবের মধুর ধ্বনি কেবল মাত্র কাব্য ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল না, বরং দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস উপখ্যান ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেই বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময় একদিকে আনওারী ও উমার খাইয়ামের মন মাতান মধুর সঙ্গীত পারস্যের মলয় বায়ুর সহিত মিশিয়া দিগদিগন্তর মুখরিত করিতেছিল, অন্যদিকে এমাম গাজ্জালির দার্শনিক প্রমাণ সকল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহুকালের সন্দেহাদি বিদূরিত করতঃ মুসলমান ধর্ম্মকে আরও দৃঢ়তর করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাকিম সানাই তত্ত্বজ্ঞানের উৎস খুলিয়া দিয়া সমুদয় পারস্যকে এক মহা ধর্ম্মভাবে উদ্ভাসিত করিতে ছিলেন।

৩। এইরূপে মুসলমান জগতে যখন এক নব জীবনীশক্তি দেখা দিতেছিল, সেই সময় মহাকবি মইনুদ্দিন নাছের খসরু সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। নাছের খসরু ১০০৪ খৃঃ অব্দে (৩৯৪ হিঃ) ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি এমাম আলি রেজার (রাঃ) বংশীয় ছিলেন। খসরু ৪৪ বৎসর কাল পঠদ্দশায় অতিবাহিত করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃ সমভিব্যাহারে মিশরে ভ্রমণ করিতে যান ও তথায় অনতিকাল মধ্যে বিদ্বান সমাজে পরিচিত হন এবং তাঁহার যশঃরাশি চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হওয়ায় সে সংবাদ মিশরের খেদিবের শ্রুতিগোচর হয়। খেদিব গুণীর আদর করিতে জানিতেন, খসরুকে মন্ত্রীরূপে সন্নিকটে রাখিলেন। কিন্তু সঙ্গে জগতের সাধারণ নিয়মানুসারে খসরুর শত্রু বৃদ্ধি হইল। যে সকল লোকেরা তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহারাই তখন প্রকাশ্য ভাবে শত্রুতা করিতে লাগিল। বিদ্বানগণ তাঁহাকে ধর্ম্মের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও তাহার প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা দিলেন।

৪। খসরু প্রাণভয়ে মিসর হইতে পলায়ন করিয়া একেবারে বাগদাদে আসিলেন, সে সময় আবদুল কাদের বিল্লাহ বোগদাদের খলিফা, তিনি খসরুকে বিশেষ সম্মান প্রদানে স্বীয় সভায় রাখিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইবার পর, খলিফা খসরু ও তাঁহার ভ্রাতাকে গিলান রাজের নিকট কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রেরণ করেন। গিলান রাজ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিল না। নাছের প্রথমতঃ স্বীয় নাম গোপন করিয়া অন্য নাম বলিলেন, কিন্তু গিলান রাজের সভার একজন শিষ্য তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। গিলানরাজ তাঁহার নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, সুতরাং এখন তাঁহাকে সন্নিকটে পাইয়া অত্যন্ত আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে গিলানেই থাকিতে অনুরোধ করিলেন। খসরু ও অনুরোধ রক্ষা করিয়া গিলানেই রহিয়া গেলেন। এদিকে খলিফা খাসরুর বিলম্ব দেখিয়া অন্য একজন লোককে তাঁহার সন্ধানে পাঠাইলেন, কিন্তু খসরু আর বোগদাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না।

৫। এক দিন গিলান রাজ দার্শনিক মতানুসারে কোরাণের একটা টীকা লিখিবার জন্য খসরুকে অনুরোধ করিলে, তিনি রাজার অনুগ্রহ ভাজন হইবার জন্য ঐরূপ একটা টীকা লিখিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্ম মতানুসারে ঐ টীকার একটী ব্যাখ্যাও লিখিয়াছিলেন। গিলানরাজ ব্যাখ্যাটী গুপ্ত রাখিয়া টীকাটি প্রচার করিলেন। বিদ্বান মণ্ডলী টীকার ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে 'কাফের' নামে আখ্যায়িত করিতে লাগিলেন। খসরু বিপদ বুঝিয়া গিলান হইতে পলায়নের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। গিলানী রাজ তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পলায়ন পথে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। খসরুর আর যাওয়া হইল না, এদিকে শত্রুসংখ্যাও এত বৃদ্ধি হইল যে, তিনি নিজ গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিতেন না।

৬। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া খসরু গৃহে বসিয়া কেবল হা হুতাশ করিতেন। একদিন তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে শত্রুর উচাটনের জন্য সাধনা করিবার উপদেশ দান করেন। খসরুও ভ্রাতার উপদেশানুসারে সাধনা আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই রাজা কঠিনরূপে ব্যাধিগ্রস্থ হইলেন। হাকিম, বৈদ্য কেহই সে ব্যাধি নির্ণয় করিতে পারিলেন না। রাজার শেষ সময় উপস্থিত, খসরুকে নিকটে আহ্বান করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "খসরু! আমি বুঝিতে পারিতেছি যে এ ব্যাধি তোমরাই দত্ত, আজীবন বিদ্যাই আমার প্রিয় বস্তু ছিল, তাই তোমাকে আমার সন্নিকটে রাখিয়াছিলাম, আমি আর বাঁচিব না এবং আমার মৃত্যুর পর তোমারও এখানে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। চিরকাল তোমার মঙ্গলকামনা করিয়া আসিয়াছি, এখনও করিতেছি, এই লও আমার নাম স্বাক্ষরিত ফরমান এবং অদ্যই গিলান হইতে বাহির হইয়া যাও"। খসরু আর কালবিলম্ব করিলেন না, স্বীয় ভ্রাতৃ সহ সেই রাত্রেই বহির্গত হইলেন, এবং একেবারে নিশাপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

৭। নিশাপুরে আসিয়া খসরু এক মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখানে খসরুকে কেহ চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু খসরুর নাম পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক

মসজিদ্ ও মাদ্রাসার দরওজায় ইহা লিখিত ছিল যে, নাছের খসরু ধর্ম্মের শত্রু কাফের, তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা”। খসরু অতি সাবধানে নিজ পরিচয় গোপন করিয়া নিশাপুরে থাকিতে লাগিলেন। একদিন বাজারে বেড়াইতে গিয়াছেন হঠাৎ একব্যক্তি তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনারই নাম নাছের খসরু নয় কি! খসরু কাঁপিতে লাগিলেন ও তাহাকে খোষামোদ করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করতঃ বলিলেন “ভাই! এই লও ৩০০০ দেরেম, তুমি যাহা জান প্রকাশ ক’র না”এ যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন। আর একদিন খসরু জুতার দোকানে জুতা মেরামত করাইতেছেন এমন সময় নগরে এক গোলমাল শুনিতে পাইলেন। জুতা মেরামতকারী গোল মালের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য ছুটিয়া গেল, কিছু কাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, নাছের খসরুর একজন শিষ্য ধরা পড়িয়াছে, একজন লোকের সহিত তর্ক করিবার সময় খসরুর দর্শনশাস্ত্র হইতে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মত সমর্থন করিতেছিল তাহাতেই তাহাকে খসরুর শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারা যায় এবং ধৃত হওয়ায় ধর্ম্ম যাজকের আজ্ঞানুসারে তাহার প্রাণ দণ্ড হয়। খসরু এই কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সেই দিনই নিশাপুর হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন? লোকালয়ে তাঁহার স্থান নাই, পৃথিবী তাঁহার শত্রু; অবশেষে বদখ্‌শানের পর্ব্বত গুহায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গুহায় বসিয়া আর পৃথিবীর চিন্তা ভাল লাগিল না, খোদার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে জীবনের অবশিষ্ট কাল এই গুহায় কাটাইয়া ১৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাহার ভ্রাতা আবু. সইদ বরাবর তাঁহারই সঙ্গে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে আমার ভ্রাতার মৃত্যুর পর দুটী আশ্চয্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ তাহার মৃত্যুর পর ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি একলা কি করিয়া তাঁহার কবর খনন করিব, এমন সময়ে দেখিলাম যে দুইজন জ্যোতিম্ময় পুরুষ ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়া এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ যখন আমার ভ্রাতাকে কবরস্থ করিয়া গুহায় ফিরিয়া গেলাম, দেখিলাম, যে গুহার আর চিহ্ন মাত্র নাই। পর্ব্বতের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

নাছের খসরুর ধর্ম্মমত লইয়া অনেক মতদ্বৈধতা আছে। কেহ বলেন, তিনি আজীবন শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, কাহারও মতে তিনি শেষ অবস্থায় সুন্নি মতাবলম্বী হইয়াছিলেন ও আবুল হোসেন খর্‌কানীর নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তবে তিনি যে এক সময় গোঁড়া শিয়া ছিলেন এবং সুন্নি মতকে ঘৃণা করিতেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার ‘দেওয়ান’ হইতে পাওয়া যায়, যথা—

از بیم سپاه بوحنیفه ٭ بچارہ وماندہ درحصارم

অর্থাৎ আবুহানিফার (সৈন্যগণের) মতাবলম্বীগণের ভয়ে এই গুহায় অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতেছি। সুন্নি মতাবলম্বীগণের বিরুদ্ধাচরণ মিশরে তাঁহার শত্রু বৃদ্ধি হইবার ও তথা হইতে পলায়ন করিবার অন্যতম কারণ বলিয়া অনেক গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন।

খসরু অনেক গুলি গ্রন্থ লিখিয়া যান, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তন্মধ্যে তাঁহার 'দেওয়ান' ও 'সফর নামা' ভিন্ন আর সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

খসরু, ওমার খাইয়ামের সমসাময়িক কবি ছিলেন ও অনেক বিষয়ে তাঁহার স্থান ওমার খাইয়াম অপেক্ষা অনেক উন্নত, কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহার গ্রন্থ প্রায় পঠিত হয় না, তাহার কারণ সম্ভবতঃ তিনি শিয়া ছিলেন বলিয়া সুন্নিগণ তাঁহার গ্রন্থ ঘৃণার চক্ষে দেখেন ও পদ্যাবলীর ভিতর দার্শনিক সমস্যা মিশ্রিত আছে বলিয়া সাধারণের তাহা বোধগম্য হয় না, যথা—

بالای هفت چرخ مدور دو گوهر اند　　　　کز نور هر دو عالم و آدم منور اند

اندر مشیمهٔ عدم از نطفهٔ وجود　　　　هر دو مصور اند و لے نامصور اند

অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান সপ্ত আকাশের উপর দুটী মুক্তা রহিয়াছে এবং ঐ মুক্তা দ্বয়ের জ্যোতিতে সমস্ত জগত ও মনুষ্য আলোকিত হইয়াছে।

অনস্তিত্বের গর্ভে অস্তিত্বের ঔরসে ঐ দুইটী মুক্তা সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহারা নিরাকার।

এখানে ঘূর্ণায়মান সপ্ত আকাশ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বলা হইতেছে ও দুটী মুক্তা বিশ্বব্যাপি জ্ঞান (আকলে কুল্লি) ও বিশ্বব্যাপি আত্মার (নকলে কুল্লি) প্রতি উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে ও অস্তিত্ব স্বয়ং খোদাতালার উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার 'সফর নামায়'। তৎকালীন পারস্য, আরব, সিরিয়া, জেরুজেলাম, মিশরের অবস্থার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

খসরু অধিকাংশ গ্রন্থ বদখ্শানের গুহায় বসিয়া স্বীয় দুঃখভারাক্রান্ত মনকে শান্তি দান করিবার জন্য লিখিয়াছেন তাই তাঁহার পদ্যের প্রত্যেক ছন্দে মর্ম্মভেদী করুণ রসের অভাব পাওয়া যায়।

از زهره کرد کژدم غربت جگر مرا　　　　گوئی زبون نیافت زگیتی مگر مرا

در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم　　　　صفرا همی برآید زند بسر مرا

অর্থাৎ পথ ভ্রমণের কষ্টরূপ বৃশ্চিক আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল, বোধ হয় আমার মতন হতভাগা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না এখন নিজের অবস্থার প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি, শোকে সমস্ত পিত্তরস আমার মস্তকে ধাবিত হয়।

খসরুর ভিতর ভাবের গভীরতা ছিল, কিন্তু আজীবন দুঃখ কষ্টে পড়িয়া সে ভাব মধুর ফল প্রসব করিতে পারে নাই। কেবল হায় হুতাশেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সহানুভূতি পাইলে বোধ হয় তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে হাফেজের সমকক্ষ হইতে পারিতেন।

মহম্মদ খলিলোল্লা।

ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিগত।

মনুষ্য এবং পশুতে তুলনা করিলে দেখিতে পাই, মানুষ প্রকৃতির নিকটে যাবতীয় বিষয়েই অভাবগ্রস্ত। কিন্তু পশুগণ তাহা নয়, তাহারা তাহাদিগের নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহ সঙ্গে লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ তাহাদিগের সঙ্গেই থাকে, এবং তাহা ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য নখ,বাহু ও শৃঙ্গ ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই সৃষ্টি হইতে থাকে। যে সকল খাদ্যে ইহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে, জন্মের সহিতই তাহারা তাহা অরণ্যে বা পর্ব্বতে, পতিত কিম্বা উর্ব্বরা ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রোগ ব্যাধি ইহাদের নাই বলিলেই হয়। আর যাহা আছে তাহাও চিকিৎসার্থে বৈদ্যের আবশ্যক হয় না, স্বভাবতই নিরাময় হইয়া থাকে। এমন অনেক ব্যাধি আছে যাহা তাহারা রসনা দ্বারা চাটিয়াই দূরীভূত করিয়া ফেলে। যদিও আমরা অনেক স্থলে পশু চিকিৎসালয় দেখিতে পাই, কিন্তু মানুষ সহানুভূতি সম্পন্ন বলিয়া এবং উক্ত গুণের বশবর্তী হইয়া, কিম্বা নিজেদের ন্যায় পশুদিগকেও দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়া যে তাহাদিগের জন্য এইরূপ চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছে এ বিষয়ের মীমাংসা করা নিষ্প্রয়োজন। (১) এখন একবার মানুষের অবস্থা দেখা যাউক। মানবগণ যাবতীয় বিষয়েই প্রকৃতির নিকট অভাব গ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা যখন ভূমিষ্ট হয়, তখন ইহাদের আবশ্যকীয় জিনিষ সমূহের মধ্যে একটিও সঙ্গে থাকে না, প্রথমে ইহাদিগের চর্ম্ম অত্যন্ত কোমল ও হস্ত পদ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় দুর্ব্বল থাকে। শরীরে প্রকৃতিগত কোনরূপ পরিচ্ছদ থাকে না, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য শৃঙ্গ কিম্বা নখের ন্যায় কোনরূপ অস্ত্রও ইহাদিগের সঙ্গে থাকে না। বরং ইহারা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবা মাত্রই প্রাকৃতিক জগতের যে সকল পদার্থ ইহাদিগের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান থাকে, সে সকলই ইহাদিগের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপ, মেঘের গর্জ্জন, তুষারস্তুপ, এবং বাতাসের শৈত্য সকলেই যেন ইহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। রোগ ব্যাধিত ইহারা মাতৃগর্ভ হইতেই সঙ্গে লইয়াই আসে, এবং ভূমিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদিগের জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে হয়। এখন এই দুর্ব্বল মানুষ যদি নিজকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে তাহাতে প্রকৃতির কি হাসি পায় না? না! কখনই নহে, এই সকল বাধা বিপত্তি

---

(১) মানুষের অধীনতাপাশে বহু পশুদিগের জন্মগত প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। উহারা এ আলোচনার বিষয়ীভূতই নহে। সম্পাদক।

হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতি ইহাদিগকে কোনরূপ দৈহিক অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করে নাই। অসংখ্য এবং বলবান শত্রুর সহিত ইহাদিগকে সম্মুখ যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং তাহাতে সামান্য কয়েকখানি দৈহিক অস্ত্র শস্ত্রে সঙ্কুলান হইতে পারে না। এই জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাদিগকে এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্ত্তে, এমন একটি সাধারণ শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, তাহার সাহায্যে ইহারা প্রত্যেক শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহারা নানারূপ পোষাক পরিচ্ছদ এবং গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াছে, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তরবারি, বর্শা, তীর, বন্দুক, গুলি, গোলা ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। লৌহের ন্যায় কঠিন পদার্থকেও দ্রব করিয়াছে, গমনাগমনের সুবিধার জন্য নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে, পর্ব্বতকে ভেদ করিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে, বিদ্যুৎকে আয়ত্ত রাখিয়াছে। বায়ুর গতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াই সমস্ত জগৎটাকে করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সাধারণ শক্তির নামই স্বর্গীয়শক্তি বা মানুষের বিবেক বুদ্ধি। এই শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠজীব। বলাবাহুল্য সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছাই এইরূপ যে, মানুষ ক্রমশঃ অধিকতর উন্নতি লাভ করুক। এই জন্য তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মানুষকে বিশ্রাম লাভের অবসর প্রদান করেন নাই। তিনি ইহাদিগের জন্য নিত্যই নূতন নূতন শত্রুর সৃষ্টি করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যগণ নব নব প্রণালীতে আক্রান্ত হইতেছে। যে সকল ব্যাধির ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার পর আবার নূতন ব্যাধির আবির্ভাব হইতেছে। পৃথিবীর ভূতত্ত্ব যতটা অবগত হওয়া গিয়াছিল তদ্ব্যতীত নূতন নূতন দেশের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, এবং তথায় নূতন নূতন বিষয়ের আবশ্যক হইতেছে। সুখ শান্তি ও বিলাস ব্যসনের যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, বিলাস স্পৃহা বর্দ্ধিত হইয়া সে সকলকেই অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে। কাজেই বাধ্য হইয়া মানুষ এই সকল নূতন নূতন প্রণালীর সহিত নূতন ভাবে চালিত হইবার জন্য নূতনরূপে প্রস্তুত হইতেছে। এবং উন্নতির যে সীমায় পঁহুছিয়াছিল, সে সীমাকে অতি-ক্রম করিয়া আরও উর্দ্ধে গমন করিতেছে।

এই সকল নূতন নূতন উদ্ভাবন এবং মানুষের নূতন উদ্যমই তাহাদের সর্ব্ববিধ পার্থিব উন্নতির মূল কারণ। এবং এই জন্যই আজ শত সহস্র নবাবিষ্কার বিদ্যমান রহিয়াছে ও দিন দিন তাহার উন্নতি হইতেছে। কিন্তু মানবের এই সকল বহির্শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে আরও অধিক বলবান ও ধ্বংসকারী (ভয়াবহ) এক শ্রেণীর শত্রু তাহাদের আছে। তাহারা সততই মানুষের অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া শত্রুতা সাধন করিতেছে। এবং তাহাদের আক্র-মণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিয়তই মানুষকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি রিপুগণই মানুষের সেই আভ্যন্তরীণ শত্রু। লোভ বলিতেছে, স্বজন পরোজন, শত্রু মিত্র, ভূতভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয় বৈভবই করায়ত্ত করিতে হইবে। ক্রোধের এরূপ ইচ্ছা যে, এজগৎ হইতে শত্রুর অস্তিত্ব একেবারেই লোপ করিতে

হইবে। মাৎসর্য্য বলিতেছে সমস্ত জগজ্জন সম্ভ্রম ও সম্মান না করিলে পরিতৃপ্ত হইব না। কাম আকাঙ্খা করিতেছে, পৃথিবীতে কাহাকেও সতীত্ব রক্ষা করিতে দিবনা। এই সকল অন্তর্শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে বিবেক কতকটা সহায়তা করিতেছে। বিবেক বলিতেছে যে, তুমি যদি কাহারও সর্ব্বনাশ সাধনে সচেষ্ট হও তবে সেও তোমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবে। তুমি যদি অন্যকে সম্মান না কর তবে অপর কেহই তোমাকে সম্মান করিবে না, কি স্তুপ্রথমতঃ এইরূপ চিন্তা মাত্র বিশেষ বিশেষ লোকের মধ্যেই হওয়া সম্ভব।

এমন অনেক স্থান পরিদৃষ্ট হয় যে, তথায় এইরূপ চিন্তা আদৌ স্থান পায় না। রাষ্ট্রীয় শাসনের ভয়, দুর্ণামের ভয়, প্রতিশোধের ভয়, কোনটিই তথায় স্থান পায় না। এই স্থলে বিবেক ঐ সকল পরাক্রান্ত শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে না। বরং অন্য আর একটি শক্তি আছে যে শক্তি মানুষের জীবন বা মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগকে এই সকল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এই শক্তির নামই "নুরে ইমান" نور ایمان বা বিশ্বাসের জ্যোতি। এই শক্তিই মানবের মূলজ্ঞান, এবং তাহাদের চরিত্র শিক্ষার গুরু। অপিচ এই শক্তিই ধর্ম্মের ভিত্তি।

মানুষের প্রকৃত প্রকৃতিই এই শক্তি, পণ্ডিত মূর্খ, ইতর ভদ্র রাজা, ভিক্ষুক আফ্রিকার বর্ব্বর, এবং ইউরোপের সভ্যজাতি সকল, সকলেই ইহাকে তুল্যাংশে প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং পবিত্র কোরাণের নিম্নের উক্তির অর্থও ইহাই।

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله
ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس — لا يعلمون —

"স্বীয় আনন সকল দিক হইতে প্রবর্ত্তন করিয়া, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখ, খোদার ধর্ম্মের অনুসরণ কর, ইহা সেই প্রকৃতি যে প্রকৃতির উপর তিনি লোকদিগকে সৃজন করিয়াছেন, খোদাতা'লার সৃষ্টিতে পরিবর্ত্তন হয় না, ইহাই সত্য (প্রকৃত) ধর্ম্ম, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য তাহা বুঝিতেছেন না।" (সুরা রূম, ৪ রূকু।)

"গাস্‌লার" নামক জনৈক জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম চিরস্থায়ী জিনিষ, কেন না, ধর্ম্ম যে জিনিষের শেষ ফল, তাহার ধ্বংস হওয়া কোন সময়েই সম্ভাবনা নাই।"

ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত প্রোফেসার "লিবান" ইনি ধর্ম্ম মানিতেন না, কিন্তু ইনি স্বীয় ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"যে সকল জিনিষকে আমরা ভালবাসি তাহা, এবং যে সকল জিনিষ আমাদের জীবনের সুখ সম্পদের সহায় সে সকলই ধ্বংস হওয়া সম্ভব। কিন্তু পৃথিবী হইতে ধর্ম্মের ধ্বংস সাধন হওয়া বা তাহার শক্তির হ্রাস হওয়া কখনই সম্ভব পর নহে। সে (ধর্ম্ম) চিরদিনই দম্ভের সহিত এ বিষয়ের চাক্ষুশ প্রমাণ দিতে থাকিবে যে, যাহারা এরূপ বলে যে, মানুষের দুর্ম্মূল্য ধর্ম্ম বুদ্ধি, এই জড় জীবন অবধিই সীমাবদ্ধ থাকে, সেই জড়বাদী দিগের মত নিতান্তই ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ।"

"প্রোফেসার স্যাবেটার" (১) তাঁহার ধর্ম্ম তত্ত্ব পুস্তকে লিখিয়াছেন "আমি ধর্ম্ম নিষ্ঠ কেন? ধর্ম্মের বিপরিত হইতে পারে না বলিয়াই আমি ধর্ম্মের নিয়ম পালন করি। কেননা ধর্ম্ম আমার জীবনের সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত, কাজেই তৎবিধি পালন করিতে আমি বাধ্য। লোকে বলিবে যে, ইহা শিক্ষা, ধারণা, এবং পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসের প্রভাব মাত্র। আমি নিজেই নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এইরূপ তর্ক করিয়াছি, কিন্তু শেষে দেখিয়াছি, পুনরায় তর্ক উত্থাপিত হয় এবং তাহার শেষ মীমাংসা হয় না, আমার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য ধর্ম্মের যতটা আবশ্যক, সাধারণ সমাজের জন্য তাহার অনেক গুণ অধিক আবশ্যক, সহস্র বার ধর্ম্মের শাখা পল্লব কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মূল চিরদিনই একইরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তাহা হইতে নূতন নূতন শাখা পল্লবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল কারণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে ধর্ম্ম চিরস্থায়ী জিনিষ, এবং কখনই তাহা ধ্বংস হইবার নহে, ধর্ম্মের পবিত্র প্রস্রবণ দিন দিনই প্রশস্ত হইতেছে, এবং দার্শনিক চিন্তা ও দার্শনিক জীবনের ভয়াবহ পরীক্ষা সে প্রস্রবণকে অধিক গভীর হইতে গভীরতম করিয়া তুলিতেছে, ধর্ম্ম লইয়াই মানুষের জীবন গঠিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মতেই তাহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট হইবে।" (২)

ফল কথা পৃথিবীতে ধর্ম্মই মানুষের নীতি ও চরিত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছে, নতুবা শিক্ষা ও সভ্যতা যদি তাহার রক্ষক হইত, তবে আজ ইউরোপ শিক্ষা ও সভ্যতায় যেমন জগতের অগ্রণী নীতিও চরিত্রেও তদ্রূপ অগ্রণী হইতে পারিত।

যদি পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ মনুষ্য জাতির বিশেষ বিশেষ বিশেষত্ব কে (যথা ভাষা সম্প্রদায়িকতা, দেশ, আকৃতি, বর্ণ ইত্যাদি) একে একে ছাড়িয়া দাও, তবে দেখিবে যে, এই সকলের মধ্যে যাহা কিছু সামান্য অংশ অবশিষ্ট থাকিবে, ধর্ম্ম, তন্মধ্যে অন্যতম। এবং ইহাই একটি শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ যে ধর্ম্ম "স্বাভাবিক" জিনিষ। যে সকল জিনিষকে আমরা

(১) এই প্রবন্ধে আমরা কতিপয় পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহাদের মতামত সম্বন্ধে মূল পুস্তক দর্শনের সুযোগ আমাদের ঘটে নাই, সুতরাং অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, মিশরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত "ফরিদ অজদি বে," এতৎ সংসৃষ্ট "তাতবিকদ্দিয়ানাতুল এস্‌লামিয়া" ও "আল হাদিকাতুল ফেকৃরিয়া" নামক আরবী ভাষায় দুইখানি সুন্দর ও সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার পুস্তকে বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতামত সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে আলীগড় কলেজের পরলোক গত প্রধান আরবী অধ্যাপক বিখ্যাত ইতিহাসাভিজ্ঞ দার্শনিক, শামসুউল উলামা আল্লামা শিবলী, তাঁহার আলকালাম নামক পুস্তকে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এই 'আল্‌কালাম' হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছি। পণ্ডিতগণের মধ্যে অধিকাংশই ফ্রাঙ্ক ও জর্ম্মাণ দেশীয়, আশা করি, আমাদের ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণ, ইংরেজ ভ্রমে তাঁহাদের নাম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবেন না।

(২) "আল্ হাইউ"ত প্রথম বর্ষ ১৫৫ পৃঃ

মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি বলিয়া বিবেচনা করি যথা, সন্তানের প্রতি স্নেহ, জিঘাংসা বৃত্তি, দয়া, ক্ষমা ক্রোধ, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি বৃত্তি গুলিকে স্বাভাবিক হইবার অনুকূলে প্রমাণ স্থলে আমরা এইরূপ যুক্তি দিয়া থাকি যে, "সমগ্র জগতের মানব হৃদয়েই এই সকল গুণের অল্পবিস্তর অংশ পরিদৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে এই নীতি অনুযায়ী যখন আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এবং প্রত্যেক পরিবারের বেশীর ভাগ লোকের ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন ইহা সুনিশ্চিত যে, "ধর্ম্ম স্বাভাবিক জিনিষ।" ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর প্রমাণ এই যে, ধর্ম্মের যাহা মূল পদার্থ তাহা সকল ধর্ম্মেই সমান পাওয়া যায়। এবং প্রত্যেকেরই জীবনের কোনও এক শুভ মুহূর্ত্তে তাহা তাহাদের হৃদয়ে জাগরূক হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তাঁহার উপাসনা করা, মৃত্যুর পর জীবনের কার্য্যের শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করা সততা, সহানুভূতি সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি বৃত্তির প্রীতি অনুরাগ, মিথ্যা, ব্যভিচার, চৌর্য্য প্রভৃতি বৃত্তির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের মূল নীতি।

প্রকৃতি মনুষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অসীম বিভিন্নতা ও অসামানজস্য সৃষ্টি করিয়াছে। বিষয় বৈভব, পদগৌরব বীরত্ব, ধীরত্ব, মেধা, পাণ্ডিত্ব এবং কবিত্ব ইত্যাদি দানে, এক দিকে এতই দানশীলতা প্রদর্শন করিয়াছে যে, তাহার অতিরিক্ত হইতেই পারে না। "সেকন্দর" (আলেজ জাণ্ডার) "তৈমুর," "য্যারিষ্টট্ল" "প্লেটো" "হোমার্" "ফের দৌসী" তাহার দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে এতৎসম্বন্ধে এতই অধিক কার্পণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, যে, মানুষ এবং বানরে এতই অল্প প্রভেদ থাকে যে, "ডারউইনের" দৃষ্টিও সে প্রভেদকে ভেদ করিতে সমর্থ হয়না। এ সকল সত্বেও যে সকল বিষয় জীবন যাপন ও জীবন ধারণের অবলম্বন স্বরূপ, তাহা সকল মনুষ্যকেই তুল্যাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রীকের শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যে ভাবে নিজের জীবনের দৈনন্দিন আবশ্যকীয় জিনিষ সমূহ পুরণ করেন আফ্রিকার মূর্খ হইতে মূর্খতর বর্ব্বরগণও আপনাদের জীবন ধারণের আবশ্যক দ্রব্য সমূহ ঠিক সেই ভাবে সঙ্কুলন করিয়া থাকে।

ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য জাতির মধ্যে ধর্ম্ম মতের যে অল্প বিস্তর অংশ পরিদৃষ্ট হয় তাহা মানুষের জন্য আবশ্যকীয় জিনিষ। এবং এই জনাই সৃষ্টি কর্ত্তা সকল জাতিকেই তাহা সমানভাবে প্রদান করিয়াছেন। "য্যারিষ্টট্ল" এবং "বেণথাম" বহু আলোচনা ও গবেষণার পর এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সত্যবাদিত্ব, সচ্চরিত্রতা, সহিষ্ণুতা, স্বদেশ প্রেম, গচ্ছিত সংরক্ষণ ইত্যাদি উত্তম জিনিষ। কিন্তু আফ্রিকার কোন এক বর্ব্বর কোন প্রকার শিক্ষা ও প্রমাণ ব্যতিরেকে স্বভাবতই এই সকল বিষয়কে উত্তম বলিয়া জানে।

এস্লাম ধর্ম্ম।

ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ধর্ম্ম স্বাভাবিক জিনিষ, অর্থাৎ যেমন সমবেদনা, সহানুভূতি, দয়া, ক্ষমা, উত্তম প্রতিশোধের ইচ্ছা, প্রভৃতি স্বাভাবিক জিনিষগুলি মানব সমাজে আংশিক-

রূপে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি ধর্ম্মানুরাগ ও তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাহা স্বাভাবিক জিনিষ, এবং যেমন অন্যান্য স্বাভাবিক জিনিষ সকল কাহারও মধ্যে অধিক কাহাতে অল্প, কাহাতেও অপূর্ণ, কাহাতে পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হই, ধর্ম্মেরও ঠিক সেই অবস্থা, কিন্তু যেমন আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে; এই জন্যই মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে যে; তদ্ব্যতীত তাহাদিগের প্রতিষ্ঠান কোনরূপেই সম্ভবপর ছিল না; অতএব ধর্ম্মের যতটা অংশ সকল মানুষে তুল্যরূপে বণ্টন করা হইয়াছে; তাহা নিতান্তই সরল; সহজ ও অপূর্ণ ছিল এবং এইরূপ হওয়াই উচিত ছিল। ইহার পরিস্কার দৃষ্টান্ত এইরূপ; যেমন মানুষের পক্ষে জীবন ধারণের জন্য পানাহারও বিশ্রাম করা এবং শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা হইতে স্বাস্থ্যরক্ষা করা আবশ্যক; এবং প্রকৃতি এই আবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিকেও যোগাইয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতি এগুলিন যোগান বলিয়া ইহা তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নয় যে, সকলেরই জন্য এই সকল জিনিষ অতি উৎকৃষ্ট হউক; খাদ্যের জন্য ফল মূল, বাসের জন্য পর্ণকুটীর, পরিধানের জন্য বস্ত্র বা বৃক্ষের ছাল, যোগাইতে পারিলেও প্রকৃতি স্বীয় কর্ত্তব্যের হাত এড়াইতে পারেন; ইহার অতিরিক্ত বিভিন্ন রকমের চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানারূপ সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য; সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা; নানাবিধ বসন ভূষণ ইত্যাদি সকলের জন্য আবশ্যক নাই। কেননা আল্লাহ নিজেই বলিয়াছেন "আমি একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি"।

(কোরআন)

ধর্ম্মেরও এই অবস্থা, আল্লাহতালায় বিশ্বাস, উপাসনায় অনুরাগ, পরকালের চিন্তা, শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস, এবং ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষগণের প্রেরিতত্ব স্বীকার করা; এগুলিন মানুষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এইজন্য ইহা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহাতে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষত্ব নাই। কিন্তু আল্লার গুণাবলী কি? কিরূপ উপাসনা (নামাজ) অবশ্য কর্ত্তব্য (ফরজ); কেন তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে; পরকালের সত্যতা কি? শাস্তি ও পুরস্কারের আবশ্যকতা কি? প্রেরিতত্বের অর্থ কি? মানব কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায় যাইবে ইত্যাদি প্রশ্ন সকলের উত্তর সকল ধর্ম্মে সমান পাওয়া যায়না; ইহাতে অনেক মতভেদ ও পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং যে ধর্ম্ম যতটা এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে সক্ষম হইয়াছে; সেই ধর্ম্ম ততটা সত্য ও পূর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ইউরোপে যে ধর্ম্ম অস্বীকারকারী নাস্তিক দলের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং দিন দিন যাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধিও হইতেছে; তাহাদিগের ধর্ম্মে অনাস্থার কারণ এই যে; তাহাদের সম্মুখে যে ধর্ম্ম বিরাজমান তাহাতে তাহারা উপরোক্ত প্রশ্ন সমূহের যথার্থ এবং সম্যক উত্তর প্রাপ্ত হয় না।

ক্রমশঃ

আহমদ আলী।

নাত।

জয় মোহাম্মদ নবি ; বরম্ সুরা সুর বন্দিত পুণ্যাকরম।
বাল ভানু বিনিন্দিত কান্তিধরম্, জগ-জন অজ্ঞান-ভ্রান্তি হরম্।
শশী-খণ্ড বিখণ্ডিত ভালতটম্ প্রেম-ভাস্ প্রপূরীত নেত্র পটম্।
লোহিতাব্জ বিলাঞ্ছিত করযুগম্ কোটি শশী বিগঞ্জিত চারু-মুখম্।
জগ-জন বন্দিত পরমেশ বন্ধু, কৃপা কুরু দীনে হে কৃপা-সিন্ধু।
ভীম-ভবার্ণব কাণ্ডারী তুহি, পদ পল্লব মুদারম্ দীনজনে দেহি।
সুপুত তৌহিদ পতাকা ধারী, তব গুণ গানে যাই বলিহারি।
তুহি জগত শুভ মূল কারণ হাশরে অধমে দিও শরণ।

সিরাজী।

যাত্রা।

আজ দিয়েছি পাল তুলে
তরীখানি কেমন আমার
চল্‌ছে দুলে দুলে।
সমুখে ঐ অসীম অপার
না জানি সে কেমন ব্যাপার
চল্‌ছি আজি কোন্ সে দেশে
কোন্ সে মোহে ভুলে
সকল বাধা আজ টুটেছে
কাহার পানে মন ছুটেছে
সে যেন গো বাজায় বীণা
ও:পারের ঐ কুলে
আজ, দিয়েছি পাল তুলে।
নেচে নেচে ঢেউ গুলি ঐ
উঠ্‌ছে গগন পানে
কল্ কলিয়ে সকল আকাশ
পূর্‌ছে গানে গানে।
তারি সাথে তরীটি মোর
চল্‌ছে দুলে দুলে
আজ, দিয়েছি পাল তুলে।

শেখ হবিবর রহমান

মোস্তফা চরিতালোচনা।

(৮)

শক্রর আক্রমণ নিবারণ।

(১) জি আম্মরের অভিযান।—বদরের প্রথম সমরের পরে মুসলমানদিগকে এই সমরাভিযান করিতে হয়।—আরবের নজদ প্রদেশাঞ্চলে "বনিতগলব" নামে এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু সম্প্রদায়ের বাস ছিল। জিঅম্মর গ্রামে তাহাদের প্রধান নেতা বাস করিত। তাহারা দাসুর (দাসুর বেন্ হারেষ) নামক প্রসিদ্ধ বীরের অধিনায়কতায় মুসলমান ধর্ম্মের উচ্ছেদ কামনায় এবং মদিনা আক্রমন ও লুণ্ঠন লালসায় বিপুল বল সঞ্চয় করিতেছিল।

মুসলমান ধর্ম্মের তখন শৈশবাবস্থা; সমগ্র আরব উহার বিরোধী—বনিতগলব সম্প্রদায় একবার প্রকাশ্যভাবে দাঁড়াইতে পারিলেই অপরাপর অনেক আরব ও ইহুদী-সম্প্রদায় বিশেষতঃ মক্কার কোরেশেরা তাহাদের সহযোগী হইবে। মুসলমানের বিরুদ্ধে, এক প্রবল সমবেত শক্তি দণ্ডায়মান হইবে। কিন্তু প্রথমেই বনিতগলবকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে পারিলে, মুসলমানেরা একরূপ নিরাপদ হইতে পারিবেন। এই ভাবিয়া তৃতীয় হিজরীর ১২ই রবিয়ল আউল (৬২৪ খৃঃ অঃ) হজরত মোহম্মদ ৪৫০জন মুসলমান বীরপুরুষ সহযোগে মদিনা হইতে নজদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জিঅম্মর গ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। মুসলমানেরা তথায় উপনীত হইলে, বনিতগলবেরা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে না পারিয়া প্রাণভয়ে পর্ব্বতাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের বাসস্থান জনশূন্য দেখিয়া তাহাদিগকে পলায়িত মনে করিয়া মুসলমানেরা সেখানে সেখানে পড়িয়া বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, দস্যু প্রকৃতি বনিতগলবেরা নিরাপদে নিভৃত পর্ব্বত গুহায় থাকিয়া সময় ও সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং পথশ্রান্ত ক্লান্ত মুসলমানদিগকে নিশ্চিন্তমনা বা নিদ্রানিমগ্নাবস্থায় আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

হজরত মোহম্মদ একাকী এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন—সখা-সহচর ও সেনা সামন্তগণ তাঁহার অনেক দূরে এবং অন্তরালে শুইয়া বসিয়া গল্প করিয়া সময়ক্ষেপ করিতেছেন। দস্যু-দল-পতি দাসুর, পর্ব্বতের এক নিভৃত প্রদেশ হইতে তাহা দেখিয়া নর-পিপাসু ব্যাঘ্রের মত নিঃশব্দে বায়ুবেগে নিমেষের মধ্যে সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। দৈবানু-গ্রহে হজরত মোহাম্মদ তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া সশস্ত্র শক্রকে সম্মুখে দেখিয়া চকিত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।—দাসুর হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ তরবারি উদ্যত করিয়া গর্ব্বভরে বলিল, "এখন তোমার রক্ষা করে কে?" হজরত মোহাম্মদ নিরস্ত্র থাকিলেও নির্ভয়ে বীরত্বব্যঞ্জক গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—

"ঈশ্বরই আমার রক্ষা কর্ত্তা।"—তাঁহার ঐ বীরত্ব গর্ব্বিত উত্তরে দাসুরের বক্ষস্থল দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহার হস্ত নিশ্চল এবং তরবারী স্থির হইয়া রহিল। হজরত মোহাম্মদ শত্রুকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া বিদ্যুদ্বেগে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার তরবারি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহা উর্দ্ধোত্থিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এবারে তোর রক্ষা কর্ত্তা কে ?" দাসুর তখন ভয় কম্পিত কলেবরে শুষ্কমুখে উত্তর করিল, "কেহ না। তাহার কাতর কণ্ঠের ভীতি সমন্বিত "কেহ না" উত্তরে হজরত মোহাম্মদের বীর হৃদয় করুণ রসে অভিষিক্ত হইল।—উদ্যত অসি পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমায় ক্ষমা করিলাম, যথেচ্ছা চলিয়া যাও।" বিপন্ন দাসুর এসলাম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের প্রথমে তাদৃশ বীরত্ব এবং পরে ঈদৃশ মহত্ব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ক্ষণেক নিস্পন্দ ভাবে স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মহিমা মণ্ডিত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে বিনম্র বচনে বলিল, "মোহাম্মদ ! মক্কার পাষাণে এমন কোমল কুসুমের উদ্ভব হওয়া কোনরূপে সম্ভাবিত ছিল না ; বুঝিলাম আপনার ধর্ম্মের প্রভাব, অসম্ভাবিতকে সম্ভাবিত বরং প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দিয়াছে। যে এই মহদ্ধর্ম্মের আশ্রায়াবলম্বন করে, তাহার জীবন সার্থক হয়, প্রকৃত মানবত্ব লাভ হয়। আসুন, ঐ পুণ্যময় ধর্ম্মে আমাকে দীক্ষিত করুন।" এই বলিয়া তিনি তদ্দণ্ডেই এসলাম গ্রহণ করিলেন। দস্যুকে শিষ্য করিয়া মহাপুরুষ সেনা সামন্ত লইয়া সানন্দে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন। এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদের ঐ বীরত্ব ও ক্ষমাশীলতা, সার উইলিয়ম মুর সাহেবের চ'খে পড়ে নাই—বড়ই আশ্চয্য ও কৌতূহলের বিষয়।

(২) বনি মোস্তালিক অভিযান।—মক্কার অনতি দূরে মরু প্রান্তরে বনি মোস্তালিক নামে এক দুর্দ্ধর্ষ ইহুদি সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। তাহাদের প্রধান নেতা হারেষ (হারেষ বিন্ আবিজারার) এক বিপুল বাহিনী সমবেত করিয়া মদিনা আক্রমণোদ্যোগ করিতেছিল। হজরত মোহাম্মদ ইহুদীগণের ঐ দুরুদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য পঞ্চম হিজরীর সাবান মাসে (৬২৬ খৃষ্টাব্দে) তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন এবং সেনাসামন্ত লইয়া লোহিত সাগরের পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী "মোয়ায়নী" নামক স্থানে, বনি মোস্তালিকদিগের বসতির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেস্থান মুসলমানের পক্ষে তত নিরাপদ ছিল না—তথা হইতে মক্কা অধিক দূর ছিল না—কোরেশেরা ইহুদীদিগের সহিত যোগ দেওয়া এবং ঐ দুই সম্মিলত শক্তির এক দল মুসলমানগণের সম্মুখ ও অপর দল পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করার আশঙ্কা প্রবল ছিল। মুসলমানেরা তাহা জানিতেন। কিন্তু আশঙ্কা অপেক্ষা তাঁহাদের সাহস অধিকতর থাকায়, তাঁহারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া সেই স্থানে শিবির নিবেশিত করিলেন। মুষ্টীমেয় মুসলমান—এক ফুৎকারে কোন্ দিকে উড়িয়া যাইবে, এই কল্পনার আশ্রিত বনি মোস্তালিকেরা রণবেশ ধারণ করিয়া প্রান্তরে বাহির হইয়া পড়িল। ইহুদীগণকে এসলামে দীক্ষিত করিবার যত আগ্রহ, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার তত আগ্রহ হজরত মোহাম্মদের ছিল না। সুতরাং তিনি প্রথমেই

তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু, দম্ভভরে তাহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। মুসলমানেরা প্রস্তুতই ছিলেন। য়িহুদীদিগকে আক্রমণ করিতে লম্ফ দিয়া তাহাদের উপর পতিত হইল। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল—কিছুক্ষণ অস্ত্র বর্ষণের ঝন্ ঝন্ শব্দ-শ্রোত বায়ুপ্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইল। পরে মুসলমানেরা মত্ত মাতঙ্গ-শ্রেণীর ন্যায় ধাবমান হইয়া ইহুদী ব্যূহে প্রবিষ্ট হইলেন—অমনি ব্যূহ ভাঙ্গিল। বাঁধ ভাঙ্গিলে নদীস্রোত যেমন ভগ্ন পথে প্রবল বেগে ছুটিতে থাকে, তেমতি ভগ্নব্যূহ, ভগ্নোৎসাহ ইহুদিগণ, ছুটিয়া পলায়ন করিল। পলায়ণ সময়ে অনেকে মুসলমানের বন্দী হইল। পলায়িতগণের পুত্র পরিবার দ্রব্য সম্ভার, সমস্ত পড়িয়া রহিল; সে দিকে ফিরিয়া চাহিবার তাহাদের সাহস হইল না—বেদম ছুটিয়া কোন দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। যেমন—শুষ্ক সরসীর মৎস্যরাশি দেখিয়া, তাহা একটী একটী করিয়া উঠাইয়া লয়; মুসলমানেরা তেমনিভাবে ইহুদীগণের পুত্র পরিবার ও দ্রব্য সম্ভার এক একটী করিয়া তুলিয়া হস্তগত করিয়া বসিলেন।

ইহুদী দলপতি হারিষের কন্যা বরা, রূপবতী এবং যুবতী, তিনি এখন মুসলমানের বন্দিনী; মুসলমান বীর সাবেত বেন্ কয়েস; তাঁহাকে গেরেপ্তার করিয়াছিলেন। সেই সর্দ্দার নন্দিনী হজরত মোহাম্মদের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বিনীত বদনে নিবেদন করিলেন, "মোসলেম কুল, গুরো! বনিমোস্তালিক সম্প্রদায়ের নেতৃনন্দিনী এখন মুসলমানের বন্দিনী। তাহার এমন কিছুই নাই যে, তাহা দিয়া সে মুক্তিক্রয় করে। তাই সে আজ আপনার নিকট মুক্তি ভিক্ষা করিতেছে; তাহার ক্ষুদ্র অন্ধকারাবৃত হৃদয়কুটীর এস্লামের দিগন্ত বিচ্ছুরিত জ্যোতিষ্কণা স্পর্শে আলোকিত হইয়াছে। সে স্বেচ্ছায় এস্লাম গ্রহণ করিয়াছে।" হজরত মোহাম্মদ বরার বিনম্র বচনে দয়া পরবশ হইয়া নিজে বন্দীকারী সাবেতকে বন্দিনীর প্রতিমূল্য প্রদানে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়াইলেন। বরা—বিজয়ী বীরের ঐ দানশীলতার একান্ত পক্ষবাতিনী ও অনুরাগিণী হইয়া তখনই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। এই ইহুদী সুন্দরী বরা—পরে "জওয়েরিয়া" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বরা ধর্ম্মগুরুর পত্নীপদে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। এখন বনি মোস্তালিক দলপতি হারেস তাঁহার শ্বশুর, সুতরাং ঐ সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার শ্যালক সম্বন্ধ-স্থাপিত হইল; আর তাহা-দিগকে বন্দী করিয়া রাখা অনুচিত। এই বিবেচনায় বশবর্ত্তী হইয়া, মুসলমান সর্দ্দারগণ বনি-মোস্তালিকের সমস্ত বন্দী ছাড়িয়া দিলেন। মোসলেম সর্দ্দারগণের ঐ মহানুভবতার নিকট চিরবিক্রীত হইয়া বনি মোস্তালিকের অনেকেই অল্পদিনে স্ব স্ব ইচ্ছায় এস্লাম গ্রহণ করেন। দলপতি হারেসও মুসলমানের সদাচার সদ্ব্যবহার ও এস্লাম ধর্ম্মের সদগুণ রাজিতে প্রীত হইয়া কিছুদিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় এস্লাম ধর্ম্মের পবিত্র রসাস্বাদন করিয়াছিলেন।

(৩) আবুরাফার শিরচ্ছেদ।—পঞ্চম হিজরীতে খন্দক যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে, যখন মুসলমানেরা মদিনায় পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন, তখন খয়বর নগরের আবুরাফা নামক

একজন ইহুদী হজরৎকে নিহত কয়ার জন্য কা'বকে সাহায্য করিত। আবু রাফায় ঐ চেষ্টা বিফল করিবার জন্য, মুসলমান পক্ষে আনসারদলের আবদুল্লা বেন্ আতিক, তিনজন মাত্র সঙ্গী লইয়া মদিনা হইতে খয়বরে গেলেন। তথায় তাঁহারা সুযোগক্রমে নিশীথ সময়ে আবু রাফার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শিরচ্ছেদ করিলেন। মদিনা, খয়বরের ইহুদীর বিড়ম্বনা হইতে তখনকার মত একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

(৪) দস্যুদলনে সেনা-নিয়োগ।—আরবে বদ্দু নামক এক জাতি আছে; তাহারা এ দেশের হাঘরিয়া ভ্রমণকারীদের মত বাসস্থান বিহীন জাতি। ক্বচিত মরুপ্রান্তরে বা পর্ব্বতোপত্যকায় কোন কোন বদ্দু-সম্প্রদায়ের বাসস্থান থাকা শুনিতে পাওয়া যায়। সে কালে বদ্দু জাতির লুণ্ঠনই এক রকম এক চেটিয়া ব্যবসায় ছিল। শহর নিরুপদ্রব শান্তিময়, হর্ষ কল্লোলিত, সুখ নিমগ্ন; অথচ কোথা হইতে সহসা বদ্দু দল জমায়েত হইয়া শহরে পড়িয়া লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিত। দুই দশজন অধিবাসী মিলিয়া হল্লা করিলে, দস্যুবেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহারা যোদ্ধৃ বেশ ধারণ করিত; তাহারা যুদ্ধপটুও ছিল। মুসলমানেরা তাহাদের বিড়ম্বনায় বিব্রত হইয়াছিলেন। তাহাদের উপদ্রব নিবারণ জন্য হজরত মোহাম্মদ অল্প সংখ্যক অস্ত্রধারী বীরপুরুষ দ্বারা এক একটী দল গঠিত করিয়া, মদিনার তিনদিকে তিন দল সৈন্য, দস্যুদমনে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা অত্যল্পকাল মধ্যেই লুণ্ঠন লোলুপ বদ্দু জাতির যথেষ্ট শাস্তি দিয়া তাহাদিগকে মদিনার ত্রিসীমা হইতে দূর করিয়া দেন। মদিনা উপদ্রব শূন্য হইয়াতৎসঙ্গে পথিক, পরিব্রাজক ও বণিকদিগেরও পথের কণ্টক প্রায় দূর হইয়া যায়।

(৫) কোরেশের রসদাপহরণ।—যখন কোন দুই প্রতিদ্বন্দীর মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিয়া যায়, তখন একে অপরের ক্ষতি করণে বদ্ধপরিকর হন এবং তৎসম্বন্ধে বিচার শূন্য হইয়া পড়েন। "যে কোন প্রকারেই হউক, শত্রুর ক্ষতি করিতেই হইবে; ইহাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়। আজকালকার সভ্যতার উন্নত যুগেও ইউরোপীয় মহাসমর সমস্যায়, ঐ রকম কত কাণ্ড-বর্ণনায় সংবাদ পত্রেরস্তম্ভ পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

কোরশের বীরপুরুষেরা মুসলমানের সহিত সমরলিপ্ত থাকিত এবং সমরাক্ষম লোকেরা বণিকবেশে দেশ বিদেশ হইতে রসদ আমদানি করিয়া সামরিক বিভাগের রসদাভাব দূর করিয়া দিত। তাহাদের রসদ যাতায়াত বন্ধ করিতে পারিলে, তাহারা ক্রমে হীনবল হইবে ও মুসলমানগণের প্রতি তাহাদের আক্রমণ-চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, এই উদ্দেশ্যে দৃঢ় বিশ্বাসী জয়েদ (জয়েদ বেন্ হারেস)একদল সৈন্য ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিয়ল আউওয়াল মাসে (৬২৭ খৃষ্টাব্দে) মদিনা হইতে বাহির হইলেন। পথি মধ্যে দেখিতে পাইলেন, বণিক বেশী মক্কাবাসিগণ সিরিয়া হইতে বিস্তর বাণিজ্য সম্ভার লইয়া মক্কাভিমুখে যাইতেছে। দেখিবা মাত্র তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সমস্ত বাণিজ্য সামগ্রী কাড়িয়া লইলেন ও কতিপয় বণিককে বন্দী করিয়া মদিনায় গেলেন।

উপদ্রব নিবারণে সেনা প্রেরণ।—আরব জাতির সকল সম্প্রদায়ই এস্‌লামের ঘোর শত্রু; সকলেই এস্‌লামের মূলোচ্ছেদে খড়্গ হস্ত। সেনা নাই—সেনাপতি নাই—অথচ ঝাঁকে ঝাঁকে আরবজাতি একত্র হইয়া মধ্যে মধ্যে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিত। মুসলমানেরা গুপ্তচর নিয়োগদ্বারা ঐ সকল গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের সন্ধান লইতেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিয়স্ সানি মাসে, হজরত মোহাম্মদ, তিনদল আরব ষড়যন্ত্রকারীর সন্ধান পাইয়া তাহাদের উপদ্রব নিবারণ জন্য তিনদিকে তিন দল মুসলমান সৈন্য প্রেরণ করিলেন।—তাঁহারা দক্ষতার সহিত আরবজাতির ষড়যন্ত্র বিফল করিলেও শেষ যুদ্ধে সেননায়ক জয়েদ (জয়েদ বেন্ হারেস) আহত এবং কতিপয় সৈনিকপুরুষ নিহত হন।

(৭) দমতল জন্দলে এস্‌লাম প্রচার।—আরবের উত্তর সীমার শেষাংশে দমতল-জন্দল নামক গ্রামে ও তাহার নিকটে অনেকগুলি খৃষ্টানের বাসস্থান ছিল। ঐ খৃষ্টানেরা মদিনা আক্রমণ ও এস্‌লামের উচ্ছেদ সাধনে বহুদিন হইতে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। হজরত মোহম্মদ ঐ খৃষ্টভক্তগণকে বিফল প্রযত্ন ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে মুসলমান সেনাপতি আবদুর রহমানকে (আবদুর রহমান বেন আউফকে) নিয়োজিত করিলেন।—বলিয়া দিলেন—"সর্ব্বাগ্রে এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিও; আবশ্যক হইলে এস্‌লামকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিও; কাহাকেও প্রলোভন প্রদান করিও না; কাহারও সহিত প্রবঞ্চনা করিও না; কোন নাবালক-না বালিকার উপরে অস্ত্র প্রয়োগ করিও না" ইত্যাদি।

সেনাপতি ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কতকগুলি সেনা সমভিব্যাহারে ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে (৬২৭ খৃষ্টাব্দ) দমতল জন্দলে গিয়া পঁহুছিলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক তথাকার অধি-বাসী খৃষ্টানমণ্ডলীকে একত্র প্রচার কামনায় বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সেনাপতির বক্তৃতায় এস্‌লামের সদ্‌গুণ রাশি ও মহাত্ম্যাবলী শ্রবণ করিয়া তথাকার খৃষ্টান শাসনকর্ত্তা আস্‌বগ (আস্‌বগ বেন্ আমরু অল কলবি) স্বেচ্ছায় এস্‌লাম গ্রহণ করিলেন। তৎপর তাঁহার অনু-করণে অধিবাসীবর্গের অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। যাঁহারা স্ব ধর্ম্মে থাকিলেন, তাঁহারা কর প্রদানে মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিলেন।—ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত সেনাপতি বা সৈনিকপুরুষগণ কোন খৃষ্টানের প্রতি জোর জবরদস্তি করিলেন না।—তাঁহারা বিনা রক্তপাতে ঐ মহৎ কার্য্য সমাধা করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(৮) বনুসাদের বিতাড়ন।—৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাস—আরবের বনুসাদ সম্প্রদায় মুসলমানের ধর্ম্মোচ্ছেদে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিল। মদিনা হইতে বিতাড়িত ইহুদীগণ তাহাদের দলে যোগ দিল। কিন্তু, তাহারা মদিনারদিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, তাহাদের দল ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য, হজরত মোহাম্মদ, জামাতা হজরত আলিকে শত সৈন্য সমর্পণ করিলেন। ফেদক নামক ময়দানে বনুসাদের জনতা জমায়েত হইতেছিল। হজরত আলি ঐ শত সৈন্য সহযোগে তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র, শত্রুপক্ষ ভয়ে প্রান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক

দিগ্দিগন্তে প্রস্থান করিল। তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্য সামগ্রী মুসলমানগণের কর কবলিত হইল। হজরত আলি বিনা যুদ্ধে শত্রুদল বিতাড়িত করিয়া আনন্দে মদিনায় প্রতিগমন করিলেন।

(৯) উসেরের পরিণাম।—খয়বর নগরে উসের বেন্ রজম নামে এক ইহুদীনেতা ছিল। তাহার পক্ষে মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ হইতেছিল এবং অৎকাল নামক স্থানের ইহুদীগণও ঐ আক্রমণে যোগ দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে (৬২৭খৃষ্টাব্দ); কোনরূপে ইহুদী নেতাকে মদিনা আক্রমণে ক্ষান্ত রাখার জন্য, হজরত মোহাম্মদ, আবদুল্লা বেন্ রওয়াহা নামক এক সুদক্ষ সেনাপতির সঙ্গে ৩০জন মাত্র সৈন্যদিয়া খয়বরের দিকে প্রেরণ করিলেন। ঘটনা ক্রমে ইহুদী ও মুসলমানে যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেই মুসলমান সেনাপতির সহিত ইহুদী নেতার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে সন্ধির কথোপকথন হইল সর্ত্ত স্থিরীকৃত হইল—খয়বরে মুসলমানাধিকার স্থাপিত হইবে, উসের উহার শাসন কর্তৃপদ প্রাপ্ত হইবে। খয়বরের শাসন কর্ত্তৃত্ব লোভে উসের মদিনায় গিয়া সর্ত্ত পাকা করিবার প্রস্তাব করিল— মুসলমান সেনাপতি সম্মত হইলেন।

উসের ৩০জন সঙ্গী লইয়া উষ্ট্রারোহণে মদিনাভিমুখে চলিল, মুসলমান সেনাপতি ও সৈন্য ৩০ জনত উষ্ট্রারোহণে তাহাদের পশ্চাতে চলিলেন। কিন্তু উভয় দল "কোর কোরা" নামক স্থানে পঁহুছিলে, বিনা কারণে সহসা উসেরের মনে মুসলমানগণের উপর সন্দেহ জন্মিল এবং সেনাপতি আব্দুল্লার দিকে ফিরিয়া তাঁহার তরবারিতে হস্তার্পণ করিল। সে কালে দুইপক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ কাহারও তরবারি স্পর্শ করিলে, শত্রুতার পরিচয় দেওয়া হইত। সুতরাং মুসলমান সেনাপতি উহুদী নেতার আচরণে চকিতের ন্যায় হইয়া ঝটিতি উষ্ট্র হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং তরবারি উর্দ্ধোত্থিত করিয়া উষ্ট্রারোহী ইহুদী নেতার পদে আঘাত করিলেন। ইহুদী নেতা তখন লম্ফদিয়া উষ্ট্র হইতে অবতরণপূর্ব্বক আব্দুল্লার মুখে কশাঘাত করিল—তিনি সেই আঘাতে আহত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গী মোসলেম বীর পুরুষেরা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, সমস্ত ইহুদীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহাদিগকে অস্ত্রাঘাতে জমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মুসলমানেরা বিজয় গৌরবে উন্মত্ত হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন।

(১০) খয়বরাভিযান।—মদিনার পূর্ব্বোত্তর দিকে প্রায় এক শত মাইল দূরে—সিরিয়ার পথে খয়বর নামে প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর—উহা ফল শস্য বিমণ্ডিত উর্ব্বর ক্ষেত্রমালায় পরিবেষ্টিত ছিল। দশটী সুদৃঢ় দুর্গমালায় নগর সুরক্ষিত ছিল। ঐ নগরই তখন আরব-ইহুদীগণের রাজধানী। খয়বরের অধিপতি ইহুদী—ইহুদী জাতিই উহার অধিবাসী। মদিনা হইতে পলায়িত বনি কোরায়জা ও বনি নোজায়ের সম্প্রদায়ের উহুদীগণ, ঐ নগরে গিয়াই আশ্রয় লইয়াছিল।

বণি কোরায়জা ও বণি নোজায়েরদিগের মদিনায় বাসস্থান থাকা কালে, তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কথা, তাহাদের নির্ব্বাসন বর্ণনাস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎকালে তাহারা মুসলমানের নিকট হীনবল ছিল, এজন্য দায়ে পড়িয়া মদিনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানের হাতে যে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। তাহাদেরই কুমন্ত্রণায় ও ষড়যন্ত্রে পড়িয়া খয়বরের অনেকে মুসলমানের শত্রু হইয়াছিল এবং তিনবার মদিনা আক্রমণে উদ্যুক্ত হইয়াছিল ও তিনবারই বিফলোদ্যম হইয়াছিল। সে ঘটনাগুলি উপরে বলিয়া আসা হইয়াছে। তাহারা উপর্য্যুপরি তিনবার ব্যর্থোদ্যম হইয়া অবশেষে খয়বরাধিপতির নিকট আপনাদের মনঃকষ্ট নিবেদন করিল এবং বারংবারে তাঁহার নিকট মুসলমানের কুকীর্ত্তি গাহিয়া তাঁহাকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি নির্ব্বাসিত ও অপমানিত এবং লাঞ্ছিত স্বজাতির ব্যথায় ব্যথিত হইয়া মুসলসানদিগকে প্রতিশোধ প্রদানে দৃঢ়ব্রত হইলেন। তাঁহার অবিরাম চেষ্টায় ফলে খয়বরে দশ হাজার সৈন্য সমবেত হইল এবং ঐ সৈন্য শ্রেণী লইয়া এককালে একেবারে মদিনা আক্রমণের আয়োজন হইতে লাগিল।

মুসলমানেরা অচিরে ঐ ইহুদী-উদ্যোগ অবগত হইলেন এবং যাহাতে খন্দক যুদ্ধের মত মদিনাকে অবরোধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। অতি সত্বর খয়বর আক্রমণ করিতে পারিলে, সে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। অতএব হজরত মোহাম্মদ ২০০ শত অশ্বারোহী ও ১৪০০ শত পদাতিক সৈন্য লইয়া সত্বরে খয়বরের দিকে প্রধাবিত হইলেন। (৭ম হিজরীর জমাদিয়স্-সানি—৬২৮ খৃষ্টাব্দ।)

আবদুল্লা বেন্ আবি।—মুসলমানের পরম শত্রু; সে তাহাকে খাঁটি মুসলমান ও মুসলমানের হিতৈষী বলিয়া প্রকাশ করিত, কিন্তু গোপনে গোপনে মুসলমানের নিপাত সাধনে অপরাপর জাতির সহিত ষড়যন্ত্র করিত। ঐ শ্রেণীর লোকেরা "মোনাফেক" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ আবদুল্লা মুসলমানদিগের অভিযান করিবার পূর্ব্বেই, খয়বরবাসীদিগকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিল। অতএব মুসলমানেরা খয়বরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ইহুদীগণ রণবেশে সজ্জিত হইয়া নগর বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করিল। নগরে পুরুষের নাম গন্ধ থাকিল না। কিন্তু মুসলমানেরা নগর পুরুষ শূন্য পাইয়া অন্য পথে তাহাতে প্রবেশ করিলে, বিনা বাধায় নগর তাহাদের অধিকৃত হইবে এবং ইহুদীগণের স্ত্রী পরিবার প্রভৃতি বন্দী ও নগর লুণ্ঠিত হইবে; এই আশঙ্কা প্রবল হওয়ায় সর্ব্বাগ্রে নগর রক্ষা করা কর্ত্তব্য ভাবিয়া তাহারা নগর বাহিরের সেনা-নিবাস উঠাইয়া লইল ও দুর্গ মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মুসলমানের আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত থাকিল। ইহুদিগণ নগর রক্ষাকল্পে সেনাগণকে দুর্গ মধ্যে লইয়া গিয়া যেমন একদিকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল, তেমনি অন্যদিকে মুসলমানের পথ বাধা শূণ্য হওয়ায় তাহাদের ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইল। সেই সুযোগে নীরব নৈশান্ধকারে মুসলমানেরা বাধাশূন্য বণ্যা প্রবাহের ন্যায় প্রধাবিত হইয়া প্রাতঃকালে একেবারে নগরদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। নগর অবরুদ্ধ হইল।

ইহুদী সৈন্যগণ দুর্গপ্রাচীর হইতে মুসলমান সৈন্যের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর পাথর ছুড়িয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে লাগিল। কিন্তু মুসলমানেরা কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ইহুদী সৈন্যের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অবলীলাক্রমে ব্যর্থ করিয়া দুর্গদিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তাঁহারা অল্পদিন মধ্যেই দুই তিনটী দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। ইহুদীগণ তখন "হস্‌নুল কস্‌স" নামক সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় লইল এবং তথা হইতে মুসলমানের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। ঐ দুর্গের নিকটে যাওয়া মুসলমানগণের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল। এদিকে অবরোধ ও দীর্ঘ হইয়া চলিল—মুসলমানের রসদাভাবের আতঙ্ক হইল। অতএব, যাহাতে অতি শীঘ্র খয়বরে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য হজরত মোহাম্মদ বিশেষ যত্নপর ও চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু বীরকেশরী হজরত আলি ভিন্ন ঐ অসাধ্য কার্য্যকে, সুসাধ্য করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন, অন্য কোন সেনপতি তৎকালে মুসলমান শিবিরে ছিলেন না। অতএব, ইহুদীগণের ঐ দুর্জ্জয় দুর্গ জয় করিবার ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হইল।

মুসলমানের ঐ নব নির্ব্বাচিত বীর সেনাপতি, হজরত মোহাম্মদের আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রেই প্রচণ্ড বিক্রমে ইহুদী দুর্গ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার ঐ আক্রমণ বিফল করিবার জন্য ইহুদীপক্ষ হইতে হারেস ও মরহাব নামক দুইজন খ্যাত নামা বীরপুরুষ বহু সৈন্য সহযোগে দুর্গবাহিরে উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। ইহুদীবীর হারেসের রণ নৈপুণ্যে কতিপয় মোসলেমবীরকে শহিদ হইতে হইল। দূর হইতে হজরত আলি ঐ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া গম্ভীর গর্জ্জনে খয়বর ভূমি কাঁপাইয়া বজ্রপাতের ন্যায় হারেসের উপর পতিত হইলেন। নিমেষের মধ্যে হারেসের ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িল। অপর সেনাপতি মরহাবও তৎক্ষণাৎ যমপুরে প্রেরিত হইল। ঐ দুই বীরপুরুষের পতনে ইহুদীগণ বিব্রত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। এদিকে মহাবীর আলি প্রচণ্ড বেগে শত্রু ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পড়িলেন—মুসলমানে সেনাদলও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।—সেনাপতির তীক্ষ্ণধার তরবার "জুলফেকার" * বিদ্যুত্তেজে শত্রুসৈন্যের উপর পতিত হইয়া তাহাদের তপ্ত শোণিত পান করিতে লাগিল। পলকে পলকে ইহুদী-সৈন্য খণ্ড খণ্ড হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কাহারও হাত গিয়াছে, পা গিয়াছে, মাথা গিয়াছে, তদবস্থায় তাহার বিকৃতাঙ্গ রক্তধারা লিপ্ত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। অপরাপর মোসলেম বীরবৃন্দও অস্ত্র-চালনায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে মুসলমানের প্রচণ্ডবেগ সহ্য করা শত্রুপক্ষের সাধ্যাতীত হইল। যাহারা মরিল তাহাদের মৃতদেহ ও আহত সেনাগণের বিকলাঙ্গ সমূহ প্রান্তরে ফেলিয়া অবশিষ্ট ইহুদী সৈন্য ভীতি বিহ্বলচিত্তে দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিল। মুসলমানেরা তাহাদিগকে তাড়া করিয়া একেবারে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ইহুদীগণের কেহ কেহ দুর্গে প্রবেশ করিতেছে, কেহ কেহ বা পশ্চাদ্ধাবিত মুসলমানগণের দিকে ফিরিয়া তাঁহা-দের আক্রমণের প্রতিশোধ প্রদান করিতেছে, এমন সময়ে দুর্গদ্বারের অতি নিকটে এক ইহুদী-

* হজরত আলির একটী তরবারির নাম জুলফেকার।

বীর হজরত আলির উপর তরবারাঘাত করিল। বীর কেশরী ঢাল দিয়া সে আঘাত ব্যর্থ করিলেন বটে, কিন্তু আঘাতের বলে ঢাল তাঁহার হস্তচ্যুত হইল এবং তন্মুহূর্ত্তেই এক ইহুদী সৈন্য তাহা উঠাইয়া লইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। ঢালই তখন সমরাঙ্গনে শরীর রক্ষার একমাত্র সম্বল; তাহা শত্রু হস্তগত হওয়ায় এবং তিনি অন্য ঢাল হস্তগত করিতে নাপারায় একটু বিব্রত হইয়া উঠিলেন—শত্রু সৈন্য তখন অস্ত্র হস্তে চারিদিক হইতে তাঁহারদিকে ছুটিয়া আসিতেছে। "ঢাল নাই, এখন দুর্গদ্বারের কপাটই ঢালের কাজ করুক", এই ভাবিয়া মহাবল আলি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক দুর্গদ্বারের লৌহ কপাট এমন ভাবে টান দিলেন যে, ঐ কপাট সংযোজিত সুবৃহৎ দুর্গদ্বার স্থানচ্যুত হইয়া তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি তখন গুরু গম্ভীর "আল্লাহো-আকবর" রবে দুর্গভূমি প্রকম্পিত করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দণ্ডেই সেই মুক্তদ্বার দিয়া মুসলমান সৈনিক পুরুষেরা নগর প্রবেশ করিলেন। নগর মুসলমানের অধিকৃত হইল। অধিবাসী ইহুদী জাতি সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিল এবং সন্ধি সূত্রে মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইল।

বিজয়ী মুসলমানেরা মদিনা ফিরিবার সময় পথি মধ্যস্থিত কতিপয় ইহুদী সম্প্রদায় আপনাদিগকে হতবল বোধ করিয়া তাঁহাদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইল। তাহাদের সহিতও সন্ধি হইয়া গেল। হজরত মোহাম্মদ আনন্দে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

আবদুললতিফ্।

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার।

(৫)

২১। রাজা পৃথ্বীচাঁদ।—হাজারী পদে নিযুক্তছিলেন। জমুনের রাজা জগৎ সিংহ বিদ্রোহী হইয়া চম্বার রাজাকে হত্যা করিয়া: তাঁহার রাজ্যাধিকার করিলে, সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরণ করেন পৃথ্বীরাজ তাহাতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়াতে তিনি রাজদরবারে উচ্চ সম্মান লাভ করেন।

২২। প্রেম দেব।—সূর্য্যমলের পুত্র এবং রাণা অমর সিংএর পৌত্র। পূর্ব্বে রাণার দরবারের কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে তিনি সম্রাট শাহজাহানের:দরবারে উপস্থিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া তিন হাজারী পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি একাধিকবার কান্দাহার অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সহিত তিনি দাক্ষিণাত্যেও সামরিক এবং শাসনবিভাগের উচ্চপদে কাজ করিয়াছিলেন। ১০৬৮ হিজরীতে, শম্ভুগড়ের যুদ্ধে দারা-শেকোর সৈন্যদলে অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। শাহসুজাহ ও দারাশেকোর দ্বিতীয় যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের পক্ষে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে তিনি দাক্ষি-ণাত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২৩। রায় তলুক চাঁদ।—রায় মনোহরের পৌত্র। তিনি প্রথমতঃ দৌলতাবাদে নিযুক্তছিলেন। পরে হাজারী পদে উন্নতিলাভ করেন। শাহজীর বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়া-ছিলেন। বলখ বাদোখশানের অভিযানে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

২৪। রাজা রায় টোডর মল্ল।—পূর্ব্বে সম্রাট শাহজাহানের প্রধান মন্ত্রী আল্লামী আফজল খাঁর সরকারে নিযুক্তছিলেন। পরে রাজদরবারে প্রবেশ করেন। সহরন্দের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। লক্ষীজঙ্গলের ফৌজদার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেও বহাল ছিলেন। :দিবালপুর, পরগণা জালেন্দর ও পরগণা সোলতানপুরের দেওয়ানী পদেও নিযুক্তছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় উল্লিখিত পরগণা সমুহের আয় ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। রাজ-দরবার হইতে তিনি পুনঃ পুনঃ খেলাৎ, পুরস্কার ও জায়গির লাভ করিয়াছিলেন।

২৫। রাজা অনুরূপ।—তিনি হাজারীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকবার রাজদরবার হইতে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রাজা জগন্নাথ সম্রাট আকবরের দরবারে পরে হাজারীপদে নিযুক্তছিলেন। রাজা অনুরূপের দুই পুত্রও শাহজাহানের দরবারে আমিরী পদে নিযুক্তছিলেন:।

২৭। মহারাজা যশোবন্ত সিং।—সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে অতি উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমোন্নতি করিয়া ছয় হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদকে বর্ত্তমানের গবর্ণর জেনারল ও প্রধান সেনাপতি উভয়ের মিলিত পদের অধিকারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি কান্দাহার ও আকবরাদের গবর্ণরের পদেও নিযুক্তছিলেন, তাঁহার সামরিক যোগ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তিনি অনেক যুদ্ধে যোগদান পুর্ব্বক বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সম্রাটের পীড়ার সময় শাহজাদা দারাশেকোর ক্ষমতার সময় তিনি সপ্তহাজারী পদে উন্নতি লাভ করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ভীষণযুদ্ধের পর তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার জন্ম-ভূমি ও জায়গির যধোপুরে পলাইয়া যান। পরে তিনি আওরঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ওমরা শ্রেণীতে স্থান লাভ করেন।

২৮। মির্জ্জা রাজা জয়সিংহ।—ক্রমোন্নতি করিয়া চারি হাজারী পদে নিযুক্ত হন। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার খানে জাহানের অধীন ছিলেন। সুবাদার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে, তিনি পলাইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হন। বলখ অভিযানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। বিজাপুর ও আহমদ নগরের যুদ্ধেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ছিলেন। তিনি শেষে পঞ্চ হাজারী পদ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে, এখানে তাহা বর্ণনার স্থানাভাব। তিনি শেষে রাজস্ব সচিবের পদে কাজ করিতেন। আওরঙ্গজেব প্রভৃতির বিদ্রোহের সময় জয় সিং ষষ্ঠ হাজারী এবং শেষে সপ্ত হাজারী পদে উন্নতিলাভ করেন। এত বড় উচ্চপদ কোন শাহজাদার ভাগ্যেও সহজে ঘটেনা। তাহা সামরিক বিভাগের প্রধান কর্ত্তা অথবা বর্ত্তমান সমরসচিবের পদাপেক্ষাও উচ্চতর পদ ছিল। শাহজাদাগণের বিদ্রোহের সময় জয়সিংহ শাহ সুজার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। সুজাকে বাঙ্গালার দিকে তাড়িত করিয়া দিয়া তিনি এলাহাবাদের নিকট উপস্থিত হইলে আওরঙ্গজেবের জয় সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া মাস্তবানগরে আওরঙ্গজেবের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে এক কোটি দাম বার্ষিক আয় সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ দান করেন। অবশিষ্ট ঘটনা আওরঙ্গজেবের আমলের বর্ণনায় লিখিত হইবে।

২৯। ছত্রভুজ।—সপ্তশতী পদে ছিলেন। নানা যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়া রাজার প্রীতিভাজন হন।

৩০। চন্দ্রভান।—সপ্তশতী পদে ছিলেন। দাউলতাবাদ ও বলখঅভিযানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করায় রাজ দরবার হইতে পুরস্কার লাভ করেন।

৩১। মুনশীরাম ভান।—জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথমাবস্থায় রাজমন্ত্রীর সরকারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শী মুনশী ছিলেন। কবিতা রচনায় সিদ্ধ

যুক্ত ছিলেন। বাদশাহ তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ দরবারে স্থান দান করেন। তাঁহার স্থাপিত একটী উদ্যান 'বাগে চন্দ্রভান' নামে এখনও আগ্রা ও সেকন্দ্রার মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিদ্যমান আছে।

২৬। রাজা জয়রাম।—রাজা অম্বল সিংএর জ্যেষ্ঠপুত্র। ক্রমোন্নতি করিয়া দুই হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৩২। চন্দ্র মল।—দেড় হাজারী পদে ছিলেন। দাক্ষিণাত্য ও বদোখশানের অভি-যানে উপস্থিত ছিলেন।

৩৩। রাজা দেবী সিং।—দুই হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কাবুল, বদোখশান, উজ্জয়িনী ইত্যাদি বহু যুদ্ধে যোগদান করিয়া ছিলেন। আড়াই হাজারী পদে উন্নতি লাভ করিয়া ছিলেন।

৩৪। রাজা দুদা।—দুই হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। দাউলতাবাদের যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র হাতী সিং দেড় হাজারী পদ লাভ করিয়াছিলেন।

৩৫। রাজা দোআর্কাদাম।—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার পুত্র নরসিংহ দাস অষ্টশতী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাবুল দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন।

৩৬। রায় রায়ান দেয়ানত রায় গুজরাটী।—জাতিতে ব্রাহ্মণ ও গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। সম্রাটের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে প্রধান মন্ত্রীর দ্বিতীয় সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। দাক্ষিণাত্যের ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন। আল্লামী আফজল খাঁর মৃত্যুর পর প্রধান মন্ত্রীর পদে কেহ নিযুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অস্থায়ী ভাবে প্রধান মন্ত্রীর কাজ করেন। এ সময় রায় রায়ান উপাধি প্রাপ্ত হন। মধ্যে একবার তিনি সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক বেনারসে গঙ্গা তীরে অবস্থান করেন। পরে পুনঃ রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন।

৩৭। রাহুত দয়াল দাস।—বলখঅভিযানে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সাহচর্য্য করিয়া ছিলেন। ১০৬৮ হিজরীতে উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যশোবন্ত সিংএর সহকারী ছিলেন। সপ্তশতী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

৩৮। রাজা রায় সিং।—তিনি ক্রমোন্নতি করিয়া পাঁচ হাজারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। বহু যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কান্দাহার উজ্জয়িনী ও দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পায়।

৩৯। রায় সিং।—হাজারী পদে উন্নতি লাভ করেন। দারা শেকোর সহিত কান্দা-হার অভিযানে ও অন্যান্য অনেক যুদ্ধে তাঁহার নাম দেখা যায়।

৪০। রাজা রূপ সিং।—চারি হাজারী উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কান্দাহার বিজয়ে আওরঙ্গজেবের সহকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। মাণ্ডেলগড় পরগণা তাঁহার জায়গীর ছিল।

৪১। রাওরূপ সিং।—নয়শতী পদে ছিলেন। রামপুর পরগণা তাঁহার জায়গীর ভুক্ত ছিল। বলখ অভিযানে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করায় ক্রমে দুই হাজারী পদে উন্নতি লাভ করেন।

৪২। বওন সিং।—শাহাজাদা আওরঙ্গজেবের সহিত বলখ অভিযানে গিয়াছিলেন। দুই হাজারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনী যুদ্ধেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

৪৩। রাজা রাজরূপ।—ক্রমে সাড়ে তিন হাজারী পদে উন্নতি লাভ করেন। বলখ যুদ্ধে শাহাজাদা মোরাদ বখ্‌শের সহিত অশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের সহিত কান্দাহার অভিযানে এবং সোলেমান শেকোর সহিত কাবুলে গমন করিয়া ছিলেন।

৪৪। রাজ সিং রাঠোর প্রধান।—হাজারী পদে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

৪৫। রায় রায়ান রাজা রঘুনাথ দাস।——অঙ্ক শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নওয়াব সাদুল্লা খাঁর মৃত্যুর পর তিনি রায় রায়ান উপাধি লাভ করিয়া, প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য পরিচালনা করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলেও তিনি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শাহসুজা ও দারাশেকোর যুদ্ধে তিনি বিশেষ রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ১০৭৩ হিজরী পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক রাজা উপাধি লাভ করেন। তিনি ১০৬৮ হিজরীতে শম্ভুগড়ের যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেবের দরবারে প্রবেশ করেন।

যে আওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষ দেখাইবার জন্য, হিন্দু ঔপন্যাসিক, নাটক নভেল রচকগণ অত্যন্ত ব্যাকুল, কল্পিত কাহিনী রচনা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা একবার রাজা রঘুনাথ দাসের পদ মর্য্যাদার কথা স্মরণ করিবেন। তিনি শাহজাহান ও দারা শেকোর পক্ষ হইয়া প্রথম অবস্থায় আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করেন। উজ্জয়িনী ও শম্ভুগড়ের যুদ্ধে রঘুনাথের হস্তে আওরঙ্গজেবের বহুসৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আওরঙ্গজেবের জীবন সংহার করাই রঘুনাথের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেবের ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, তাই তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। পরে রঘুনাথ তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। শত্রুকে কিরূপে ক্ষমা করিতে হয় আওরঙ্গজেব তাহার যেরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন জানিনা জগতে তাহার তুলনা আছে কিনা। তিনি রঘুনাথ দাসের হস্তে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে উক্ত পদে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রধান

মন্ত্রীর পদকে বর্ত্তমান ইউরোপীয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদের সমতুল্য জ্ঞান করিবেন না। তখন এক ব্যক্তির হস্তে একাধারে অনেক ক্ষমতা ছিল। প্রধান মন্ত্রী এক দিকে প্রধান সেনাপতি, সমরসচিব, অন্যদিকে গবর্ণর জেনারল, রাজস্ব সচিব। আবশ্যক মতে অসি ও মশি উভয় ধারণ করিতে হইত। আওরঙ্গজেব একজন হিন্দুকে যতটা উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সভ্যজগতে কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় কি?

৪৬। রাম সিং রাঠোর।—তিন হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

৪৮। রাও মওর সাল।—তিন হাজারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। বহু যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আওরঙ্গজেবের সহিত উজ্জয়িনীতে যে ভীষণ যুদ্ধ হয় তাহাতে রাও মওর সালের নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপের অনুরোধে তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা আলোচনা করিতে পারা গেল না।

৪৯। শিবরাম গৌড়।—আড়াই হাজারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বদোখশান, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

৫০। সোবহান সিং।—দুই হাজারী মনছবদার ছিলেন। বলখ অভিযানে, কান্দাহার বিজয়ে, উজ্জয়িনী যুদ্ধে তাহার বিশেষ প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৫১। রাজা সোবহান সিং।—মালওার প্রদেশে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংএর সঙ্গে উজ্জয়িনী যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন।

৫২। রাও কর্ণ বিকানিয়র।—তিন হাজারীর সম্মানিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় দৌলতাবাদের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন। আওরঙ্গাবাদে তাঁহার নামে এখনও একটী পল্লী অভিহিত হইয়া থাকে।

৫৩। রাজা কিষণ সিং।—হাজারী পদে ছিলেন। বিজাপুর অভিযানে তাঁহার বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পায়।

৫৪। রায় কাশীদাস।—হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গদেশে দেওয়ানী পদে অনেককাল ছিলেন। কাবুলেও বহুদিন বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিয়া ছিলেন।

৫৫। গিরিধর দাস গৌড়।—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন, খানেজাহান লোদীর পশ্চাদ্ধাবন কালে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিলেন।

৫৬। গোকুল দাস।—হাজারী পদের অধিকারীছিলেন। শাহজাদা মোরাদ বখ্‌শের সহিত বলখ বদোখশানের যুদ্ধে ছিলেন।

ক্রমশঃ।

এসলামাবাদী।

আহ্বান।

১

কে যাইবি মোর সাথে
আয় দেখি ছু'টে!
অই মন্দাকিনী তীরে,
সুরভি সুধার নীরে,
সোনার কমল গুলি
আছে যেথা ফু'টে!
সারস মরাল গুলি,
করে কত জল কেলি,
হীরকের ঢেউ গুলি
পড়ে 'লুটে লু'টে!
জীবনের পর পারে
শান্ বান্ধা ঘাটে!

২

অই নদী মনোহরা
গোলাপের গন্ধে ভরা,
ঘুঘু গুলি চরে তার
সুশ্যামল তটে!
বায়ু বহে ঝুর ঝুর,
শ্যামা গায় সুমধুর,
ত্রিদিবের হুর পরী
খেলা করে মাঠে!
জীবনের পর পাড়ে
শান্ বান্ধা ঘাটে!

৩

ও পারে নন্দন বন
এ পারেতে মরু!
মাঝে তার মহানদ
তীরে দেব দারু!
এ পারে অসুর গুলি
করে কত দলাদলি,
ও পারে দেবতা গুলি
রত স্তুতি পাঠে!
জীবনের পর পারে
শান্ বান্ধা ঘাটে!

৪

পুষ্পিত সে কুঞ্জবন
ফুলে ফলে ভরা!
গুচ্ছে গুচ্ছে ফু'টে আছে
পারিজাত-ছড়া
সোনার হরিণ গুলি
করে কত কোলা কুলি
ময়ুর ময়ূরী নাচে
কত মত ঠাটে!
জীবনের পর পারে
শান্ বান্ধা ঘাটে!

৫

জরা মৃত্যু নাই তথা,
নাই ব্যথা ব্যাকুলতা,
সবারি বদনে আছে
হাসি রাশি ফু'টে!
সবি যেন ভাই ভাই,
সে খানে ত:পর নাই,
হীরকের ফুল ফুটে
আকাশের পটে!

জীবনের পর পারে
শান্ বান্ধা ঘাটে !

৬

মুক্তা গুলি ভেসে যায়
নির্ঝরের জলে !
বালক বালিকা গুলি
নেয় তাহা তুলে !
সে দেশের রবি শশী
ঢালে কত সুধা রাশি,
কে কে যাবি সেই দেশে
আয় তোরা ছুটে !
জীবনের পর পারে
শান্ বান্ধা ঘাটে !

৭

সে চারু নন্দন বনে
সেই নদি তটে !
আমার হৃদয় নিধি
আছে এক মঠে !
তারি তরে দিন রাত,
করি আমি অশ্রু পাত,
শুনিলে আমার কথা—
সে আসিবে ছু'টে !
জীবনের পর পারে
শান্ বান্ধা ঘাটে

৮

পাখী গুলি শাখে বসি
তারি গীত গায় !
ফুল গুলি ফু'টে ফু'টে
তারি পানে চায় !
ফুলের সুরভি বাসে
সে মুখের গন্ধ আসে,
অলিগুলি আশে পাশে
চারিদিকে ছুটে।
জীবনের পর পারে
শান বান্ধা ঘাটে !

৯

হেরিলে সে হাসি মুখ
ভুলে যাই সুখ দুঃখ,
জগতে তাহারি রূপ
প্রতি ঘটে ঘটে !
কোরাণে তাহারি কথা,
বেদে আছে তারি গাথা,
আজানে তাহারি প্রেম
প্রতি দিন রটে।
জীবনের পর পারে
শান্ বান্ধা ঘাটে !

কায় কোবাদ।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

আল্-এস্লাম।

১ম ভাগ | ফাল্গুন, ১৩২২ | ১১শ সংখ্যা

এস্‌লাম সভ্যতা ও উন্নতির পরিপন্থী নয় বরং সহায় ও উৎসাহদাতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم

"হে মোসলমানগণ, যদি তোমরা খোদাতাআলাকে (খোদাতাআলার ধর্ম্মকে), সাহায্য দান কর ; (তবে) তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন ও তোমাদের চরণ দৃঢ় করিবেন" সুরা মোহাম্মদ ১ রুকু।

فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم

"অতঃপর যখন তাহারা কুটিলতা করিল, তখন খোদাতাআলাও তাহাদের অন্তঃকরণকে অসরল করিলেন" সুরা সফ্, ১ রুকু।

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

"যে পর্য্যন্ত তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহারা তাহার পরিবর্ত্তন না করে সে পর্য্যন্ত আল্লাহতাআলা কোন সম্প্রদায়ের কিছু পরিবর্ত্তন করেন না" সুরা রঅদ, ২ রুকু।

এই সকল উক্তিতে আল্লাহতাআলা নিজের কার্য্যকে মানুষের কার্য্যের পশ্চাতে রাখিয়াছেন, فلما زاغوا الخ তে বলিয়াছেন যে, এই সকল লোক যখন কুটিলতা করিল, তখন তিনিও তাহাদের অন্তঃকরণকে অসরল করিলেন। يا ايها الذين امنوا আয়াতে, ইহা বলিয়াছেন 'যে, মুসলমানগণ শুদ্ধতা (পরহেজগারী) অবলম্বন কর, এবং সত্য কথা বল, তাহা হইলে আমি (খোদা) তোমাদিগের কার্য্যসকলকে শুভ করিব।" ফলতঃ সৎ ও শুভকর্ম্মের নামই শুদ্ধতা,

এবং যখন কেহ শুদ্ধতা অবলম্বন করিল, তখন পুনরায় আর তাহার কার্য্যকে শুদ্ধ করিবার আবশ্যকই বা কোথায় ?

এস্থলে এ কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি যে, পবিত্র কোর্‌আনে এমন বহু উক্তি আছে যাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সকল বিষয়েতেই মানুষ সম্পূর্ণরূপে ভাগ্যের (অদৃষ্টের) অধীন, এবং নিয়তিতে যাহা কিছু আছে, তাহার অতিরিক্ত এক পদও অগ্রসর হইবার অধিকার তাহাদের নাই।

وهوالقاهر فوق عباده

" এবং তিনি তাঁহার দাসদিগের জন্য সম্পূর্ণ অধ্যক্ষ "

قل كل من عند الله

" বল হে (মোহাম্মদ) সকলই খোদাতাআলা হইতে হয় "

খৃষ্টানগণ প্রায়ই বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, " অদৃষ্ট বাদের " (কাজা ও কদরের) প্রভাবেই মুসলমানগণ, অলস ও উদ্যমহীন হইয়াছে, এবং এইজন্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, 'মুসলমানদিগের ধর্ম্মই তাহাদিগের অবনতির মূল কারণ "।

কিন্তু যদিও আমাদিগের মধ্যের " অদৃষ্টবাদী " আলেম এবং সুফীগণ (১) তাঁহাদের নিজের জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা এই প্রশ্নটিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, তবুও বাস্তবিক পক্ষে এই প্রশ্ন আদৌ ভ্রান্তিমূলক এবং ভিত্তি শূন্য।

এ প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর এই যে, এই অদৃষ্টবাদের প্রভাবেই প্রেরিত মহাপুরুষের সঙ্গী (সাহাবা) গণের মধ্যে এক একজন মহাপুরুষ শত সহস্র মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে ভস্মে পরিণত করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে, নিরাপদে, সুস্থমনে, সুস্থদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইতেন। আজ সেই অমৃত সুধাকে আমাদিগের তথাকথিত সুফী ও আলেমগণ নিজেদের দুর্ব্বলতা ও অলসতার অবলম্বন স্বরূপ ব্যবহার করিলেও এসলাম তজ্জন্য দায়ী নহে।

---

(১) এস্থলে যেন ইহা কেহ মনে না করেন যে, আমি সুফীদিগকে অবজ্ঞা করিলাম, সুফীদিগের স্থান অতি উচ্চে, তবে যাঁহারা সুফী নন তাঁহারা ঈশ-প্রেমিক সুফী-জীবনের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে কখনই সক্ষম নহেন। পার্থিব জগতের মুখে পদাঘাত করিয়া সুফীগণ বিভুতে আত্মোৎসর্গ করতঃ তাঁহারই ধ্যানে সদা নিমগ্ন। সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহারা এমন অনেক কথা বলেন যে, সে সকলের প্রচারে সাধারণ সমাজের উপকার হওয়াত দূরের কথা বরং অত্যন্ত ক্ষতিই হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য প্রকৃত সুফীর কথা, তাঁহাদিগের অস্তিত্ব আজকাল নাই বলিলেই হয়। ইহা ব্যতীত যে সকল ভণ্ড সুফী এবং রুটীর ভুখা আলেমগণ জঠোর জ্বালায় সত্যভ্রষ্ট হইয়া দ্বারে দ্বারে সুফীদিগের ঘোর অদৃষ্টবাদমূলক " বয়াত " আওড়াইয়া দু' পয়সা পকেটস্থ করিয়া সমাজকে দিন দিন অলস ও অবস করিয়া ফেলিতেছেন, এবং সেই দৃষ্টান্তের দ্বারা এসলামের উপর দোষারোপ করিতে শত্রুদিগকে সুযোগ করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা সমাজের নিকট বিশেষরূপে অপরাধী, এবং পরলোকে এজন্য তাঁহাদিগকে জবাব দিহি করিতে হইবে। —লেখক।

খৃষ্টানদিগের উপরোক্ত প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর এই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এসলাম মানুষকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, কিন্তু তৎসঙ্গে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, " এই স্বাধীনতা-বিশ্বাস যেন স্রষ্টার সীমায় যাইয়া না পঁহুছে। মানুষের স্বাধীনতার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে,. প্রথম এই যে, স্রষ্টা বা খোদা বলিতে কেহই নাই. এইজন্য মানুষ সর্ব্ব বিষয়েই সম্পূর্ণ স্বাধীন, যাহা করিতে ইচ্ছা করে তাহাই করে, আর যাহা ইচ্ছা করে না তাহা করে না। দ্বিতীয় এই যে, খোদাতালাই সর্ব্ব শক্তিমান ও সকল বিষয়ের স্রষ্টা, কিন্তু তিনি মানুষকে তাহাদের জীবনের কর্ম্মকর্ত্তা করিয়াছেন, (১) এই জন্য মানুষ যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিয়া থাকে। এসলাম প্রথমটিকে অস্বীকার করিয়াছে, এবং ইহারই সমর্থক সূচক পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে :—

و ماتشاون الا ان يشاء الله

" খোদাতালার ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোন বিষয়ে ইচ্ছা করিবে না।"

ইহার পরিস্কার অর্থ এই যে, মানুষের মধ্যে যে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা শক্তি পরিদৃষ্ট হয় তাহা খোদাতালাই দিয়াছেন, তিনি না দিলে বা ইচ্ছা না করিলে মানুষের মধ্যে এই শক্তি আদৌ স্থান পাইত না।

আল্লাহতালা অপর এক যায়গায় বলিয়াছেন :—

قل كل من عند الله

ইহার ভাবার্থ এই যে, অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহা কিছু সম্পাদিত হয় তাহার কারণের কারণ খোদাতালা।

ফল কথা, এসলাম স্বাধীনতা শিক্ষা বা কর্ম্মে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছে, কিম্বা অদৃষ্ট লিপির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে শিক্ষা দিয়াছে, ইহার স্পষ্ট মীমাংসা করিতে গেলে দেখিতে হইবে যে, যে সকল মহাত্মা, এসলামের আদর্শ স্থল, যাঁহারা এসলামের জলন্ত ছবি, এবং যাঁহারা এসলামের স্বরূপকে যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই প্রাথমিক মুসলমান বা প্রেরিত মহাপুরুষের সাহাবাগণ, এ সম্বন্ধে কি বুঝিয়া ছিলেন, এবং ঐসলামিক শিক্ষার কোন প্রভাব তাঁহাদের জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল? ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, এসলামের শিক্ষা তাঁহাদিগকে ইচ্ছা বা কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন করিয়া, উদ্যম, দৃঢ়তা, সাহস ও বীরত্ব ধীরত্বের শেষ সীমায় উপনীত করিয়াছিল। (২)

---

(১) মানুষ কর্ম্মকর্ত্তা কিন্তু ফল আল্লার হাতে।

(২) অধুনা তকদীরের মসলাটীকে আমরা যতদূর জটিল করিয়া তুলিয়াছি, বস্তুতঃ এসলামের শিক্ষা সেরূপ নহে لا مبلى افعال اختيارية ইহা আকাএদের সিদ্ধান্ত। আমরা মুখে বলি যে, আমরা জাবরিয়া নহি, অথচ কর্ম্ম বিমুখতার সমর্থনের জন্য একেবারে ঐ মতের পোষক হইয়া দাঁড়াইতেছি। এ সম্বন্ধে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল— সম্পাদক।

৩। সভ্যতার উন্নতি বিধানের অনুকূল নীতি সমূহের মধ্যে সাম্যই শ্রেষ্ঠতম। অর্থাৎ সকল মনুষ্যেরই স্বত্ব ও অধিকার তুল্য বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও ইতর বিশেষ নাই—দার্শনিক "গোন্দারসিয়া" বলিয়াছেন যে, "মানুষের স্বত্ব ও অধিকার বুঝিবার প্রথম ভূমিকা সাম্য। এবং এই সাম্যই সমস্ত সচ্চরিত্রতার মূল ভিত্তি।

কিন্তু এসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবধি কোন দেশ ও জাতির মধ্যে এ ধারণা স্থান পায় নাই। দণ্ড বিধি আইন বা রাষ্ট্রীয় শাসন প্রণালী লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সভ্য হইতে সভ্যতর জাতির নিয়মানুসারেও অপরাধীর পদ মর্য্যাদার তারতম্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার উপর তদনুরূপ শাস্তি প্রদত্ত হইত। "লারভেস্" সাহেব স্বীয় এনসাইক্লোপিডিয়াতে লিখিতেছেন যে, "রোমকদিগের শাসন নীতি অনুসারে একই অপরাধীর জন্য বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ অপরাধ একই প্রকারের হইলেও অপরাধীর অবস্থা ও মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাস্তি প্রদত্ত হইত" ইহার পর লেখক এই পক্ষপাতিত্ব ও অত্যাচারের বিষদ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং রোমকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রান্সের ঘটনা সমূহ ও সংগ্রহ করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন যে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবই এই সকল পক্ষপাতিত্ব ও অত্যাচারের নিরাকরণ করিয়াছে"।

দার্শনিক "ফ্রাঙ্ক" সাহেব লিখিয়াছেন যে, পঞ্চাশ বৎসর হইতে ইউরোপের অপরাপর জাতির মধ্যে সাম্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং এখন তাহা বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করিতেছে।"

দার্শনিক প্রবর সাম্যের বয়ঃক্রম মাত্র পঞ্চাশ বৎসর গণনা করিয়াছেন, কিন্তু এসলাম ১৩০০ তের শত বৎসর পূর্ব্বে এই সাম্যের অত্যুজ্জ্বল এবং পূর্ণ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে।

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثى و جعلنكم شعوبا و قبائل لتعارفوا
ان اكرمكم عند الله اتقكم

অর্থাৎ হে লোক সকল, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে বহু সম্প্রদায় ও পরিবারে বিভক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনিয়া লও, নিশ্চয় তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সমধিক নিষ্ঠাবান পরহেজগার সেই তোমাদিগের মধ্যে আল্লার নিকটে সমধিক সম্মানিত" সুরা হোজরাত ২ রূকু।

ইহা কেবল শব্দ বিন্যাস মাত্র ছিল না, বরং এই সর্ব্ববিধ আবর্জ্জনা মুক্ত নির্ম্মল সাম্যের ভিত্তির উপরই এসলাম প্রতিষ্ঠিত ও সুশৃঙ্খলিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এবং যতদিন এসলাম তাহার স্ব-মূর্ত্তিতে ধরাবক্ষে বিরাজমান ছিল, ততদিন সে ঐ পূত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরব দেশে সাম্প্রদায়িক ও বংশ বা কুল-গৌরব পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল। যে বংশ অধিক ভদ্র এবং সম্মানিত হইতেন, সে বংশের

একজন লোককে অপর বংশীয় কতিপয় লোকের সহিত তুলনা করা হইত। অর্থাৎ উচ্চ বংশীয় একজন লোকের হত্যাপরাধে নীচ বংশীয় কয়েকজন লোককে হত্যা করা হইত। (১) এইরূপে দাসের হত্যাপরাধে প্রভুর প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। বলিতে কি, আরব সমাজে যেরূপ পক্ষপাত ও অত্যাচার মূলক ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল, তাহা বোধহয় পৃথিবীর আর কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। (২) সেই অমানুষ ঘটনা সমূহ এসলামের ইতিহাসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত রহিয়াছে। এসলাম আবির্ভূত হইয়াই পুত সাম্যের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতঃ একেবারেই এই অন্যায় ভেদ নীতির মূলোৎপাটন করিয়াছিল। যে অহঙ্কার ও কৌলিন্য গর্ব্বে গর্ব্বিত কোরেশ বংশীয়েরা নিকৃষ্ট বংশীয় লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলাও অপমানজনক বলিয়া বোধ করিতেন, এমন কি বদরের যুদ্ধে নিকৃষ্ট বিবেচনায় মদিনাবাসী আন্‌সারদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেও অসম্মত ছিল, কি জানি পাছে বা নিকৃষ্ট জাতির (মদিনাবাসীর) উপর হস্তোত্তোলন করিলে তাহাদের (কোরেশদের) বংশ গৌরবের লাঘব হয়। সেই কোরেশ জাতিকে আফ্রিকা এবং ইরাণ দেশীয়, কৃতদাসদিগের সহিত তুল্য পদ বিশিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা যে জোর পূর্ব্বক করা হইয়াছিল তাহা নয়, বরং অতি উদার পুত এসলামের মহতী শক্তির প্রভাবে ইহাদের জীবন এমনই অলৌকিক উন্নতিলাভে সক্ষম হইয়াছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই এই সকল দুর্দ্ধর্ষ কঠোর প্রকৃতির লোক, পূর্ব্বে যাহাদিগের সহিত ঘৃণায় কথা বলিত না, তাহাদিগকেই ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া প্রাণে স্বর্গীয় শান্তি উপভোগ করিত। যে আবুসোফিয়ান সমস্ত কোরেশদিগের নেতা ছিলেন, এবং যিনি নিজেকে প্রেরিত মহাপুরুষের প্রবলতম শত্রু মনে করিয়া অহঙ্কার করিতেন (৩)। তিনিই যখন এসলাম গ্রহণ করিলেন, অমনি তাঁহাকে "বেলাল" ও "সোহেবের" সহিত সমভাবে সম-মর্য্যাদায় সমান অবস্থায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল, ফলতঃ বেলাল ও সোহেব উভয়েই আফ্রিকা দেশীয় কৃতদাস ছিলেন।

"জব্‌লা" আরবের বিখ্যাত রাজা ছিলেন, ইনি এসলাম গ্রহণের পর কোন এক ঘটনায় এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জনৈক সাধারণ মানুষের তুলনায় ইঁহার সম্মান ও মর্য্যাদা অধিক বলিয়া স্বীকার করা হউক। কিন্তু এসলামের জলন্ত ছবি দ্বিতীয় খলিফা

(১) নীচবংশীয় এক ব্যক্তি উচ্চ বংশীয় একজন লোককে হত্যা করিলে, প্রমাণাদির পর অপরাধীর সহিত তাহার গোষ্ঠির আরও কয়েকজনকে হত্যা করা হইত।

(২) আমরা এস্থলে লেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। এই বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহিত জাতি গুলির সামাজিক আচার ব্যবহার ও শাসন পদ্ধতি এবং ধর্ম্ম কর্ম্মতেও পদে পদে সাম্যবাদের মস্তকে পদাঘাত করা হইয়া থাকে। হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিধান গুলিও এইরূপ সাম্যভাবের ঘোর পরিপন্থী। দুঃখের বিষয় মুসলমানেরা আজকাল তাহাদের ধর্ম্মের এই মহান্ শিক্ষা বিস্মৃত হইয়াছে।—সম্পাদক।

(৩) এসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে আবুসুফীয়ান স্ব-দল বল সহ বহুবার হজরতের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপর মক্কা বিজয়ের পর তিনি এসলাম গ্রহণ করেন।

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাহা স্বীকার করিলেন না, এই হেতু জেদ পরবশ হইয়া রাজা জব্‌লা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ খৃষ্টানদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

স্বয়ং এসলামের মহা প্রবল প্রতাপান্বিত দ্বিতীয় খলিফা ওমর-ফারুক (রাঃ) জেরুজেলম (বয়তল মোকাদ্দেস্) গমন কালে দাসের সহিত বারি করিয়া উষ্ট্রারোহণে পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। এমন কি যখন তিনি যেরুজেলমের নগর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার দাস তাঁহার উষ্ট্রোপরি উপবেশন করিয়াছিলেন এবং তিন নিজে সেই উষ্ট্রের নাশা রজ্জু (লাগাম) ধারণ করতঃ পদব্রজে গমন করিতেছিলেন। পাঠক একবার চিন্তা কর যে, ইহা কোন সময়কার ঘটনা, যখন খলিফা সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নগরের অধিবাসী ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, নির্ব্বিশেষে নারী পুরুষ সকলই এসলামের খলিফার আড়ম্বর, ঐশ্বর্য্য দর্শনেচ্ছায় নগর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা খলিফার সেই সময়কার দৃশ্য।

এবম্বিধ শত সহস্র ঘটনা এসলামের ইতিহাসে সংগৃহীত রহিয়াছে, যাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। আমরা এসলামের ইতিহাস পাঠ করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, প্রায় সকল ঐতিহাসিকই আক্ষেপের সহিত বলেন যে, এসলামের মধ্যে প্রথম যে পাপ প্রবেশ করিয়াছিল তাহা تنح عن الطريق "পথ হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াও" কথাটির ব্যবহার করাইছিল, অর্থাৎ এসলামের প্রাথমিক যুগে অতি বড় মহাব্যক্তিও তা তিনি জিনিই হউন না কেন, কোন সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিকেও একথা বলিতে পারিতেন না যে, আমার জন্য পথ ছাড়িয়া দাও" দরিদ্রদিগের ভিড়ের মধ্য দিয়া গমনাগমনে কেহই সঙ্কুচিত হইতেন না। এসলামে প্রথম যে অত্যাচার প্রবেশ করিয়াছিল তাহা এই শব্দটী ব্যবহার করাই ছিল।

৪। ধর্ম্মগত বিদ্বেষ ও অত্যাচার সভ্যতার উন্নতি বিধানের সম্পূর্ণ প্রতিকুলাচরণ করিয়া থাকে, ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে কোন মতেই সভ্যতার উন্নতি সম্পাদন করা যায় না, পক্ষান্তরে যে ধর্ম্ম ইহার মূলোৎপাটন করিয়াছে সেই ধর্ম্মই যে উৎকৃষ্টতম, আদর্শ স্থানীয় ও অবলম্বনীয় এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে যতদিন মানুষের সমাগম হইয়াছে, সর্ব্বদায়ই, সকল দেশেই, সকল জাতির মধ্যে, সকল রাষ্ট্রীয় নিয়মানুসারেই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর নানাবিধ অত্যাচার হইয়া আসিতেছিল, তাহাদিগকে কোন প্রকার ধর্ম্মগত স্বাধীনতা প্রদত্ত হইত না, বরং প্রবল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক দুর্ব্বল সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে স্ব-সম্প্রদায়ের লোকদিগকে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। এবং বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার দ্বারা লোকদিগকে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করা হইত। কেবল এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট ছিল না, বরং এসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমস্ত সংসারের লোক সকল এমনই দুর্নীতি পরায়ণ হইয়াছিল যে, ঘটনা বিশেষে দুইজন মানুষের মধ্যে মতদ্বৈধতা উপস্থিত হইলে তাহার প্রভাব গার্হস্থ্য-জীবনের সকল অঙ্গের উপর আসিয়া বর্ত্তিত, অর্থাৎ এই সামান্য মতদ্বৈধতা বশতঃ উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিহীনতা সৃষ্টি হইয়া পরস্পরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন এবং ইহার শেষফল শত্রুতায় উপনীত করিত। ইহা যেন সমস্ত মানুষের প্রকৃতি বিশেষের মধ্যে পরিগ্রথিত হইয়াছিল।

এসলামই সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মগত মতপার্থক্য ও অপরাপর বিষয়ের পৃথক পৃথক সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ এসলাম এই শিক্ষা দিয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বা জাতির সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে মতদ্বৈধতা উপস্থিত হয়, তবে তাহার প্রভাব সাধারণ সাংসারিক জীবনের উপরে বর্ত্তিবার কোন কারণ নাই। পবিত্র কোরআনে যেমনই পিতামাতার স্বত্ব ও অধিকার নির্দ্দেশিত হইয়াছে, অমনি তৎসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, যথা :—

وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما
في الدنيا معروفا

যে বস্তু সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই যদি তাহারা (পিতামাতা) আমার সঙ্গে তাহাকে অংশী করিতে অনুরোধ করে, (অর্থাৎ যদি পিতামাতা অংশীবাদী করিবার জন্য প্রয়াস পায়) তবে তুমি (সে সম্বন্ধে) তাহাদিগের অনুগত হইও না, কিন্তু সংসারে তুমি বিধিমতে তাহাদিগের সঙ্গ কর" সুরা লোকমান ২ রুকু।

তৎপর সাধারণ ভাবে আদেশ করা হইয়াছে :—

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان
تبروهم وتقسطو اليهم ان الله يحب المقسطين (১)

"যাহারা তোমাদিগের সহিত তোমাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই, এবং তোমাদিগকে তোমাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করে নাই, তোমরা যে তাহাদিগের হিতসাধন করিবে ও তাহাদের প্রতি ন্যায়াচরণ করিবে, তাহা হইতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন না, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বানদিগকে প্রেম করেন" সুরা মোম্‌তহনেত ২ রুকু।

---

(১) পবিত্র কোরআনে এমন বহু উক্তি আছে, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, বিধর্ম্মীদিগের সহিত বন্ধুত্ব বা কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিও না, আমাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় বাহ্যদর্শী আলেম আছেন, তাঁহারা প্রত্যেক স্থলেই সেই সকল উক্তির পুনরাবৃত্তি করতঃ মনের গরম বাহির করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে, ঐ সকল উক্তি মাত্র সেই সকল ধর্ম্মদ্রোহী (কাফের) দিগের প্রতি প্রযুজ্য, যাহারা মোসলমানদিগের সহিত তাহাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে বা করিতে প্রস্তুত, যেমন আল্লাহতালা উপরোক্ত উক্তির পরে পরিষ্কাররূপে বলিয়া দিয়াছেন, যথা :—

انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا
و على اخراجكم ان تولوهم

অর্থাৎ যাহারা তোমাদিগের সহিত তোমাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, এবং তোমাদিগকে তোমাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, অথবা তোমাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে (অন্যকে) সাহায্য দান করিয়াছে তাহাদিগের সহিত তোমাদিগকে বন্ধুত্ব বা কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে খোদাতাআলা তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন এতদ্ভিন্ন নহে" সুরা মোম্‌তহনেত ২ রুকু।

কেবল ইহারই উপর নির্ভর করা হয় নাই, বরং ইহার পর এতৎ সংসৃষ্ট মূল তত্ত্ব বিষদ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা এমনই ভাবে মনুষ্য প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহাদিগের আকৃতিতে, বর্ণে, প্রকৃতি ধারণায় এবং ব্যবহারে চিরদিনই অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকিবেই। এজন্য এরূপ আশা বা ধারণা করা যে, হঠাৎ সমস্ত বিশ্ব মানব এক মতাবলম্বী হউক, একেবারই অসম্ভব।

এই গূঢ়তম বিষয়টি পবিত্র কোরআনে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ولوشاء ربك لجعل الناس امة واحدة و لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك و لذالك خلقهم

"এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন, তবে অবশ্য সমুদায় লোককে এক সম্প্রদায় ভুক্ত করিতেন, (কিন্তু) যাহাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত (সকলে) সর্ব্বদা বিরুদ্ধাচারী থাকিবে, ইহারই জন্য তাহাদিগকে তিনি সৃজন করিয়াছেন"। সুরা হুদ্ ১০ রূকু।

ولوشاء ربك لا من من في الارض جميعا

"এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন, তবে অবশ্য পৃথিবীর সকল মানুষই এক যোগে মুসলমান হইত" সুরা ইয়ুনস ১০ রূকু।

ولوشاء الله لجعلكم امة واحدة

"এবং যদি আল্লাহতালা ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদিগকে একই মণ্ডলীভুক্ত করিতেন" সুরা "মাঁয়দা" ৭ রূকু।

ولوشاء الله ما اشركو

"এবং যদি আল্লাহতালা ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা অংশী স্থাপন করিত না" সুরা এনাম।

ولوشاء الله لجمعهم على الهدى

"এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্যই সকলকেই সৎপথে একত্রিত করিতেন" অর্থাৎ সকলকেই সৎপথ প্রদর্শন করিতেন। সুরা এনাম।

(ক্রমশঃ)

আহমদ আলী।

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

৫৭। গুরুপন রাঠোর—অষ্টশতি পদে ছিলেন। গৌড়ে আসিয়া দুর্গের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

৫৮। রাজা মানসিং গোয়ালিয়া—ইনি প্রসিদ্ধ মানসিং নহেন। নয়শতী পদে ছিলেন। যমুন অভিযানে তাঁহার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

৫৯। রায় মুকুন্দ দাস—আটশতী পদে ছিলেন। বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া নিজ জায়গিরে বহু সংখ্যক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৬০। মহেশ দাস রাঠোর—তিন হাজারী উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার বীরত্ব ও রণনীতির যথেষ্ট প্রশংসা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নামীয় আরও একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

৫৪। মধুসিং হাড়া—ক্রমোন্নতি করিয়া চারি হাজারী পদের অধিকারী হন। কাবুলে শাহজাদা সুজার সহিত বহুদিন ছিলেন। বোরহানপুরের সুবাদার পদেও অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বলখের দুর্গাধ্যক্ষের পদেও কিছুদিন ছিলেন।

৫৫। মুকুন্দ সিং—তিন হাজারী পদে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। বেচন্তা-ভের ও উজ্জয়িনীর যুদ্ধে তাঁহার নাম বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

৫৬। মানুজী—পঞ্চ হাজারী অত্যুচ্চ পদে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল।

৫৭। রাজা মহাসিং—তিন হাজারী পদে ছিলেন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘনটা আছে। সংক্ষেপের অনুরোধে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

৫৮। হরিসিং রাঠোর—দেড় হাজারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। বিজাপুর, বলখ ও কাবুল অভিযানে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

৫৯। হরদেরাম—দেড়হাজারী পদে ছিলেন।

৬০। উগর সেন—আটশতী পদের অধিকারী ছিলেন। কান্দাহার, বলখ অভি-যানে উপস্থিত ছিলেন।

৬১। রাজা উদয় সিং—পঞ্চশতী পদে ছিলেন।

৬২। উগর সেন দ্বিতীয়—পাঁচশতী পদাধিকারী।

৬৩। রাজা অমর সিং কচ্ছ—বলখ বাদোখশান অভিযানে নিযুক্ত ছিলেন।

৬৪। ভুজ রাজ—হাজারী পদে ছিলেন। উদয় গিরির দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারের প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারী ও ওমরাগণের নাম।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, সম্রাট শাহজাহানের দরবারে যে সকল ওমরা ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে স্ব স্ব পদে বহাল ছিলেন। অনেকেই পদোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র বিপ্লব ইত্যাদি নানা দুর্ঘটনায় অল্প সংখ্যক উচ্চ কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল মাত্র। আওরঙ্গজেবের পিতৃ-আমলের হিন্দু কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত তাঁহার নিজ আমলে যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অথবা পূর্ব্বে পদচ্যুত হইবার পর যাঁহারা পুনঃ উচ্চ পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। **রাজা অমর সিংহ**—ইঁহার বিবরণ সম্রাট শাহজাহানের আমলে বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি সাধিত হয়। তিনি প্রথমতঃ আসাম অভিযানে এবং দ্বিতীয়বার সীমান্ত দেশের পাঠান অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি উভয় যুদ্ধে যথেষ্ট শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

২। **রাজা ইন্দ্র মন**—রাজপুত বংশধর রাজা ইন্দ্র মন, সম্রাট শাহজাহানের অনুগত রাজা শিবরামকে পরাস্ত করিয়া তাহার পিতৃরাজ্য ধন্দেরা অধিকার করায় সম্রাট তাহার বিরুদ্ধে প্রবল বাহিনী প্রেরণ পূর্ব্বক তাহাকে হালবসির দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। আওরঙ্গজেব ১০৬৮ হিজরী অব্দে দাক্ষিণাত্য হইতে আগ্রা আগমন কালে রাজা ইন্দ্রমনকে কারামুক্ত করিয়া তিন হাজারী উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। প্রথমতাবস্থায় একসার ঈদৃশ উচ্চ পদে নিয়োগ প্রাপ্তির একমাত্র নিদর্শন উদারচেতা নিরপেক্ষ আওরঙ্গজেবের পক্ষেই শোভা পায়। উক্ত রাজা উজ্জয়িনীর ও শম্ভুগড়ের যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শাহ সুজার প্রথম যুদ্ধের পর রাজা ইন্দ্রমন বঙ্গদেশে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং এই বঙ্গদেশেই তিনি পরলোক গমন করেন।

৩। **রাজা অনুপ সিং**—ইনি রাও কর্ণের পুত্র এবং রাও সূর্য্য সিংএর পৌত্র, তিনি বহুকাল দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাটের সপ্তদশবর্ষ রাজত্বকালে, বাহাদুর খাঁ ও আবদুল করিমের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রাজা অনুপ সিং বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে বিশেষ সুনামার্জ্জন করিয়াছিলেন, একবিংশতি বর্ষে তিনি আওরঙ্গবাদের সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এসময় শিবাজী বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, অনুপ সিংহ অসাধারণ বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলের পরিচয় প্রদান করেন। সম্রাটের শাসনকালের ত্রিংশবর্ষে তিনি নছরাবাদ সরকারের দুর্গাধ্যক্ষ ও ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া দুই হাজারী পদে সম্মানিত হন।

৪। **স্বরূপ সিং**—অনুপ সিংএর মৃত্যুর পর সম্রাট তাঁহার পুত্র স্বরূপ সিংহকে তাঁহার পিতৃরাজ্য বিকানিয়ারের গদিতে বসাইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে দেড় হাজারী পদে

আওরঙ্গজেবের সরকারে নিযুক্ত ছিলেন। স্বরূপ সিংএর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইন্দ্র সিং এবং তৎপর আনন্দ সিংএর পুত্র জোর আওর সিং এবং তৎপর তদীয় পালকপুত্র গজয় সিং তাঁহার পিতৃরাজ্যের গদি প্রাপ্ত হন।

৫। **এনিরায়**—জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হিসাব বিভাগের প্রধান দেওয়ান অর্থাৎ একাউণ্টেণ্ট জেনারলের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ পরিবারভুক্ত লোকজন হইতে নিম্নতম পাইক প্যাদাগণের বেতন বিতরণাদি পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্য তাঁহারই ক্ষমতাধীন ছিল। তিনি বিল পাস না করিলে কাহারো এক কপর্দ্দকও বেতন বা বৃত্তি পাইবার উপায় ছিল না। তিনি নিতান্ত নিরপেক্ষ ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন, হিসাব নিকাশের কাজে তিনি কাহারও মনস্তুষ্টি অসন্তুষ্টির বিষয় কিছুমাত্র পরওয়া করিতেন না। আমীর ন্যামত আলী খাঁ রাজ দরবারের প্রধান মুন্শী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। পার্শী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান গবেষণার বিষয় এখনও লোক মুখে প্রচারিত। "ওকায়ে ন্যামত খাঁ" বি, এ, এম, এ শ্রেণীর পাঠ্য তালিকাভুক্ত উচ্চাঙ্গের পুস্তক। ন্যামত আলী খাঁ হিসাব নিকাশে এনিরায়ের কঠোরতা দর্শনে কবিতায় তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

৬। **রাজা ইন্দ্র সিং**—ইনি রাজা রায় সিংএর পুত্র ও রাজা অমর সিংএর পৌত্র। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বাবিংশতিতম বর্ষে মহারাজা যশোবন্ত সিংএর মৃত্যুর পর রাজা উপাধি লাভ করিবার সময় রাজদরবারে ৩৬ লক্ষ টাকার উপঢৌকন উপস্থিত করিয়াছিলেন, এ সময় হইতে তিনি যোধপুরের গদিতে উপবেশন করেন। রাজ দরবার হইতে তরবারি, অশ্ব, হস্তী ও পতাকা ইত্যাদি বহু সম্মানজনক খেলাত লাভ করেন। রাজত্বের চতুর্ব্বিংশতিবর্ষে শাহজাদা মোহাম্মদ মোআজ্জমের সহিত শাহজাদা আকবরের পশ্চাদ্ধাবন কার্য্যে মোতায়েন হইয়াছিলেন। সম্রাটের রাজত্বের ৪৮ তমবর্ষে তিন হাজারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

৭। **রাজা উভদ্দত সিং**—সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের চতুর্বিংশতিবর্ষে চিতোর দুর্গের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তদীয় পিতার মৃত্যুর পর রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। দরজন সিংএর বিরুদ্ধে এবং বিজাপুর অভিযানে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজত্বের ৪৭ তমবর্ষে তিন হাজারী পদে উন্নীত হন।

৮। **মহারাজা অজিত সিং**--মহারাজা যশোবন্ত সিংএর পুত্র। কাবুলে তাঁহার জন্ম হয়। কাবুলে যশোবন্ত সিংএর মৃত্যুর পর রাজানুমতির প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার দুই স্ত্রী কতিপয় রাজপুত্র সহচর সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লাহোরে উপস্থিত হইলে যশোবন্ত সিংএরগর্ভবতী রাণী অজিত সিংহকে প্রসব করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজপুত কর্ম্মচারী ও রাণীদ্বয়ের গর্হিত ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এবং তাঁহাদিগের রাজকীয় সৈন্যের তত্ত্বাবধানে থাকিতে আদেশ প্রদান করেন। এবং তাহাদের গতি বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য পাহারা বসাইয়া দেন। যশোবন্ত সিংএর রাণীদ্বয় অদ্ভুত

কৌশলে পলায়ন পূর্ব্বক যোধপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উদয়পুরের রাণার কন্যার সহিত অজিত সিংএর বিবাহ হয়। রাজপুতগণ সম্রাটের বিরুদ্ধে একাধিকবার বিদ্রোহ উপস্থিত করে, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা প্রদান করেন যে, তাঁহার জীবদ্দশায় কখনও তাহারা মস্তকোত্তলন করিতে সাহস পায় নাই। অজিত সিং আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যোধপুর আক্রমণ করেন এবং বহু মস্‌জেদ ভূমিসাৎ করেন। মস্‌জেদে আজানধ্বনি করা নিবারণ করিয়া দেন, গো-জবেহ নিষেধ করেন। মুসলমানদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করেন। বাহাদুর শাহের আমলে অজিত সিংহ দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। পরে তিনি দিল্লীর রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থী হওয়ায় তাঁহাকে তিন হাজারী পদ প্রদান করা হয়। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ফর্‌রখ সিয়রের রাজত্বকালে অজিত সিংহ তাঁহার কন্যার সহিত সম্রাটের পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক একটী স্থায়ী সন্ধি স্থাপন করেন। রাজপুত বংশের সহিত মোগল বংশের ইহাই সর্ব্বশেষ বৈবাহিক সম্বন্ধ। অতঃপর মোগল রাজত্বের শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হওয়ার পর হইতে তাঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিবারিত হয়। বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের আমলে অজিত সিংএর পুত্র মহারাজ উভয় সিং গুজরাটের সুবাদার বা গবর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সরবোলন্দ খাঁর বিরুদ্ধে ৪০ সহস্র সৈন্য সমভিব্যহারে অভিযান করিয়াছিলেন।

৯। রাওভাও সিং—ইনি রাও সত্তর সালের পুত্র। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণের প্রথমবর্ষে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হন। হিন্দুর পক্ষে হঠাৎ ঈদৃশ পদলাভ করার দৃষ্টান্ত একমাত্র হিন্দু বিদ্বেষী (?) আওরঙ্গজেবের আমলেই দেখিতে পাওয়া যায়। শাহ সুজার সহিত সংগ্রামকালে রাজকীয় কামানবাহী সৈন্য শ্রেণীর অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শাহ সুজাকে বিতাড়ন করার পর দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমির শায়েস্তা খাঁর সহিত তিনি ইসলামাবাদ দুর্গের অবরোধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎপর তিনি মহারাজা যশোবন্ত সিংএর সহিত শিবাজীর বিদ্রোহ দমন কার্য্যে নিযুক্ত হন। রাওভাও সিং নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট তদীয় ভ্রাতা ভগবন্ত সিংএর পৌত্র অনর্দ্দা সিংকে ভাও সিংএর রাজ্যের গদিতে স্থান দান করেন। অনর্দ্দা সিংএর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বুধ সিং সম্রাট বাহাদুর শাহের দরবারে সাড়ে তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়া রামরাজা নামে অভিহিত হন।

১০। রাজা পাহাড় সিং—তিনি সম্রাট শাহজাহানের আমলে চারি হাজারী পদ পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে শাহজাদা দারা শেকোর সহিত কান্দাহার অভিযানে মোতায়েন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ইন্দ্র মন ও সোবহান সিংকে সম্রাট উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ইন্দ্র মন প্রথমতঃ পাঁচশতী পদে নিযুক্ত হন। "মাছরুল ওমরা ماثر الامرا নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আওরঙ্গবাদ নগরের উত্তর পশ্চিম কোণে রাজা পাহাড় সিং বিনির্ম্মিত পল্লী এখনও তৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

১১। ধীরাজ রাজা জয়সিং—১১১১ হিজরী অব্দে—সম্রাট আওরঙ্গজেবের চতুর্বিংশৎবর্ষ রাজত্বকালে হাজারী পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি রাজা জয়সিং উপাধিতে ভূষিত হন। ১১১২ হিজরীতে আসদখাঁর খিলনা দুর্গাধিকার কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্তে সম্রাট তাঁহাকে দুই হাজারী পদে নিযুক্ত করেন।

১২। রাজা রায় সিং—সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে যশোবন্ত সিং রাজকীয় কারখানাদি লুণ্ঠন পূর্ব্বক খাজুয়া হইতে পলায়ন পূর্ব্বক যোধপুরে পৌছিলে আওরঙ্গজেব রায় সিংকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক রাজা উপাধি দান করেন এবং তাঁহাকে চারি হাজারী পদে নিযুক্ত করেন। যশোবন্ত সিংএর বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরিত হয় তাহাতে মোহাম্মাদ আমিন খাঁ মীর বখশীর সহিত তিনিও সেনাপতি পদে বরিত হন। যশোবন্ত সিং বশ্যতা স্বীকার করার পর রায় সিং দরবারে আহূত হন এবং পরে দারাশেকোর দ্বিতীয় যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি বিজাপুর অভিযানে ও শিবাজীর সহিত যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করায় আওরঙ্গজেব তাহাকে পঞ্চ হাজারী পদে নিযুক্ত করেন। তাহাকে প্রচুর ভূসম্পত্তি জায়গির প্রদান করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

এস্‌লামাবাদী।

ধর্ম্মের অধঃপতন।

পতিত পাবন জগৎপাতা, সর্ব্ব মঙ্গল দাতা, বিশ্বনিয়ন্তা, দয়াময় বিভু প্রদত্ত নিঃস্বার্থ, শান্তি পীযূষ বর্ষক, লোক-স্থিতি-রক্ষক-ধর্ম্মের উপর কর্ম্মভূমি সুপ্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মই পাপ তাপ দুঃখ জ্বালা পূর্ণ, ভাস্করতাপে-তাপিত কর্ম্মভূমিতে শান্তি ও কল্যাণের কারণ ধর্ম্ম, নীরদ রহিত নীলাম্বর-তলে উষাকালীনহেম-কিরণ জাল সদৃশ পৃথ্বীবক্ষে শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে অধর্ম্ম মানবমণ্ডলীকে হিংসা-দ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কলুষরাশি দ্বারা উত্তেজিত করিয়া—ধরিত্রী পৃষ্ঠকে দানবের লীলা ভূমিতে পরিণত করতঃ ধ্বংসের আবর্ত্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া থাকে। আবার মানব যে সকল কর্ত্তব্য ভার শিরে ধারণ করিয়া কর্ম্মভূমে পদার্পণ করিয়াছে, সেই সকল কর্ত্তব্যই হইতেছে মূল, তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম সুসম্পন্ন হওয়া সুদূর পরাহত। যে সুশীতল, সুস্নিগ্ধ ধর্ম্মশব্দ উচ্চারিত হইলে এ বিশ্ববাসী সনাতন এসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী নর নারীগণের মানস-সাগরে এক অভূত পূর্ব্ব ভক্তি লহরী উত্থিত হইত, সেই ধর্ম্মভাব আজ প্রবল বায়ু মুখে প্রক্ষিপ্ত বিশুষ্ক পত্র সদৃশ উড়িয়া গিয়াছে। জন-সমাজের হৃদয়-কাননের ফল পুষ্প সুশোভিতফলদল সদৃশ সত্য, সাধুতা ন্যায়পরতা, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, বাৎসল্য, পরোপকার, সহানুভূতি, ভক্তি, সরলতা, পরার্থপরতা, পরিশ্রমশীলতা, আত্মনির্ভর, ভ্রাতৃভাব, বিনয়, সৌজন্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সার্ব্বজনীন

হিতানুষ্ঠান, প্রভৃতি সদগুণ নিচয়, জনসমাজের নিকট হইতে প্রায় চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল সদ্‌গুণাবলীর অভাবে জন-সমাজ এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই, বিকটবদনা, ভীষণ দর্শনা অতৃপ্তি রাক্ষসী করাল মুখ ব্যাদন করিয়া দণ্ডায়মানা! এখন উহার আক্রমণ ফলে, ভীষণ নারকীয় অধঃগতির পথও পরিষ্কৃত হইতেছে।

এই অশান্তি পূর্ণ, মোহান্ধ জীবনের পর, যে একটা পরকাল আছে, এ কথাটা আজকাল যেন আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না.—এই বর্ত্তমানজীবন—এই স্বার্থান্ধ পাপতাপ-জ্বালাপূর্ণ—মর্ত্ত্যলোককেই আমরা চিরস্থায়ী মনে করিয়াছি!—জড় দেহের ভোগ সুখকে সর্ব্বস্ব বলিয়া স্থির করিয়াছি,—তাহা না হইলে যদি সত্য সত্যই দয়াময়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম, তবে পরকাল আছে,—এই জড়পিণ্ড দেহের অবসানে আমার আত্মার শেষ নয়—পাপ করিলেই মৃত্যুর পর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে,—তাহা বেশ বুঝিতাম।

"ধার্ম্মিক হইয়া পুণ্য ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে মৃত্যুর পর এক অবর্ণনীয়, অচিন্ত্য সর্ব্ব সুখ সম্পদ পূর্ণ প্রদেশে ঐ অসীমকাল ধরিয়া অনন্ত তৃপ্তি ভোগ করিব" এবং "এই জীবনে পাপ-পঙ্কিল-ক্রিয়ায় আসক্ত থাকিলে ঐ অনন্তকাল ধরিয়া তীব্রতর যন্ত্রণাদায়ক, নিরয়-বৈশ্বানরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব," তাহা যদি আমরা বিশ্বাস করিতাম—মনে স্থান দিতাম—অনুধাবন করিয়া দেখিতাম—তবে আজ মোস্‌লেম-সমাজ-ভাস্কর অকালে অধর্ম্ম-কাদম্বিনীতে আচ্ছাদিত হইয়া হীন প্রভ হইত না। যে ধর্ম্মবল প্রভাবে একদিন মুসলমানেরা—

"পশ্চিমে হিস্পানী শেষ, পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ,
কাফের যবন বৃন্দে করিয়া দমন"

বিশাল সাম্রাজ্যের ভাগ্য বিধাতা হইতে পারিয়াছিলেন,—অধর্ম্ম পথে চালিত হইয়া অধর্ম্মের দণ্ড স্বরূপ সেই সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব ও উন্নতি হইতে "উল্কা সম অকস্মাৎ হইল পতন।" এখন সর্ব্বত্র শপথ,করিয়া ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেওয়ায়, ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায়—অধর্ম্ম ধর্ম্মকে, মিথ্যা সত্যকে, এবং অন্যায় ন্যায়কে পরাস্ত করিয়া মোস্‌লেম-সমাজকে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিতেছে। মোস্‌লেম সমাজের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া নবতেজে ধর্ম্মতাড়িত বলে পুনরুদ্দীপ্ত করিতে কয়জনের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিতেছে!

যে নমাজ রোজা প্রভৃতি পঞ্চ স্তম্ভের উপর এস্‌লাম মহা মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই নমাজ ও রোজা দ্বারা বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষিত নব্যযুবকগণ কন্দুক ক্রীড়ায় রত! তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন যে, "হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ষষ্ঠ শতাব্দীর অসভ্য আরবদিগের জন্য এই সমস্ত বিধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানী, গুণী শিক্ষিত সভ্যযুবক; আমাদের এই সমস্তের কোনও প্রয়োজন নাই। নমাজ টমাজ কিছুই নহে। বিজ্ঞানের আলোচনা কর—টাকা আন—উন্নতি কর। এই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিলে জীবনে

উন্নতি করা দুরূহ।" তাই দেখি হাইকোর্টের অনেক খ্যাতনামা মুসলমান উকিল ব্যারিষ্টার নমাজ পড়েন না! তাঁহাদের সময়ের অনেক মূল্য! যে "সময়" মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে টাকা প্রসব করে, সেই "সময়"কে নমাজে ব্যয় করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত নহে। অনেক জমিদার, তালুকদার ও জোতদার এবং ধনী ব্যবসায়ী নমাজ রোজার সহিত কোনই সম্বন্ধ রাখেন না, * উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর জন্য যেন নমাজ ব্যবস্থিত হয় নাই। যে সত্যের উপর এ জগত প্রতিষ্ঠিত, সেই সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যা, সংসারের উপর দিয়া অবিরল—অবিরাম ও অবাধ গতিতে বহিয়া যাইতেছে! বর্ত্তমানে মিথ্যা আচরণ ও মিথ্যা ভাষণ, জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর একটি অঙ্গ বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয় না।

এখন জন সমাজ দয়া, মমতা, সহানুভূতি প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বীয় স্বার্থোদ্ধার সাধনে তৎপর।

এইরূপে মানব-সমাজের যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই কেবল অধর্ম্মের পূর্ণ প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়,—ধর্ম্মকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতীতের ন্যায় এখন ত কাহাকেও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কর্ণগোচর হয় না।

এই ধর্ম্মের জন্যই এসলামধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও সামান্য দীনজনের ন্যায় জীবনযাপন করিয়াছিলেন,—জগৎ সমক্ষে ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি মক্কাবাসীদের শত অত্যাচারেও আপনার বিশ্বাস হইতে বিচলিত না হইয়া আপন মহত্ত্ব উজ্জ্বলতর করিয়া জগৎবক্ষে এসলামধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মের জন্য মহাত্মা এমাম হোসেন (রাঃ) বারিবিন্দুহীন, কারবালায়" প্রাণত্যাগ করেন।

আবার এই ধর্ম্মের জন্যই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এব্রাহিম আদ্‌হাম মণিমুক্তা বিখচিত সিংহাসন ও অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ফকিরবেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

হজরত বেলাল প্রথমে নিষ্ঠুর এস্‌লাম বিদ্বেষী জনৈক প্রভুর অধীনে ছিলেন। তিনি মুনিবের আদেশে এস্‌লামধর্ম্ম পরিত্যাগে অস্বীকৃত হইলে পর তাঁহার মুনিব তাঁহাকে যে কত অত্যাচার ও নির্য্যাতন প্রদান করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়, তথাপি তিনি স্বীয় বিশ্বাস হইতে বিচলিত হন নাই!

এখন কেবল স্বীয় সংসারটী বজায় রাখিবার জন্য—পেট পুরিবার জন্য লোকে দিবারাত্রি অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বেড়াইতেছে, মিথ্যাকথা কহিতেছে, চুরি করিতেছে, ডাকাতি করিতেছে, আপাত মধুর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে।

* কেবল বহুসংখ্যক ধনী ও শিক্ষিত লোকই নমাজ পড়েন না, তাহা নহে। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকও নমাজ পড়ে না। তাহাদের জন্যও ধর্ম্ম ও চরিত্র লাভের উপায় নির্দ্ধারণ আবশ্যক। —সম্পাদক।

শিশুর কোমল হৃদয়কে যেদিকে পরিচালনা করা যায়, সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়;—কিন্তু কালে সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে এই কোমল হৃদয় কঠিন হইলে, অভ্যস্থ পথ হইতে নবাভিলাষিত পথে আনিতে পারা যায় না। সুতরাং সংসার কাল ভুজঙ্গিনী দংশন করিতে না করিতেই—হৃদয় কোমল থাকিতে থাকিতেই ধর্ম্মপথে চালিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে প্রত্যেক অভিভাবকের সূক্ষ্মদৃষ্টি নিপতিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ছাত্রজীবনেই ধর্ম্মজীবন গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শেষ জীবনে ধর্ম্মের নামে "মেকি" চালাইতে সাহস হইবে না। বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে, এই অসুবিধা সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। *

যদি স্বকীয় জীবনকে উন্নত করিতে বাসনা থাকে—জগতে কোনও মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিতে অভিলাষ থাকে, তবে দুর্দ্দশা গ্রস্ত, অধর্ম্মপথে চালিত, শোচনীয়, মৃতপ্রায়, অস্থিকঙ্কাল সার মোসলেম সমাজকে ধর্ম্ম-সঞ্জীবনী সুধায় পুনরুদ্দীপ্ত করিতে প্রত্যেক মোসলেম যুবকেরই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। নৈশাকাশে প্রকাশিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল তারকাপুঞ্জের ন্যায় মোস্‌লেম-সমাজোদ্যানে সুরভি প্রসূন ফুটাইতে চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মের সমাজকে ধর্ম্মপথে চালিত করিবার পক্ষে উপদেশ ও বক্তৃতা অপেক্ষা আদর্শ ও উদাহরণ প্রদর্শনই অধিকতর ও স্থায়ীও কার্য্যকরী। সমাজের প্রত্যেক নর নারীকে ধর্ম্মানুশাসন পালন করিতে হইবে—ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে—নিজকে ধার্ম্মিক করিতে হইবে—তবেই সমাজ আপনা হইতেই জাগিবে,—তেজোদ্দীপ্ত হইবে—উন্নতিমার্গে দ্রুত অগ্রসর হইবে। সুতরাং কে কোথায় আছ, আস, আজ ধর্ম্মের নামে—এস্‌লামের নামে সাড়া দেও—জগতকে মাতাইয়া দৃঢ়কটি হইয়া ধর্ম্মানুশাসন পালনে প্রবৃত্ত হও।—সমাজের দুর্দ্দশা ঘুচাও। আস, মুসলমান আমরা প্রত্যেকে প্রকৃত মোসলমান হই। আইস, এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী, আমরা এস্‌লামের নামে অর্পিত অযথা দোষারোপ খণ্ডাইয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক হই। আমাদের জীবন পথের লক্ষ্য ধ্রুবতারা "ধর্ম্ম"।

আবদুল গফুর,
শ্রীহট্ট।

* কেবল বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে সুফল হইবে না। পারিবারিক জীবনই হইতেছে ধর্ম্ম জীবন লাভের প্রশস্ত ভূমি সুতরাং পারিবারিক জীবনকে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মচর্চ্চার ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে। সম্পাদক।

আরবীয় সভ্যতা।

যখন বর্ত্তমান জ্ঞানগর্ব্বিত, সভ্যতা প্রদীপ্ত ইউরোপ, মূর্খতার গভীর কূপে নিমজ্জিত, গ্রীকের বিদ্যার প্রদীপ নিষ্প্রভ ও অস্তিত্ব বিহীন প্রায়, কেবল কতিপয় ভগ্ন বস্তুর নিদর্শনে তাহাদের সভ্যতার চিহ্ন জাগরুক ছিল, সেই সময় আরবগণ শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া ইউরোপে প্রবেশ করেন। তৎকালীন রোমান সম্রাটদিগের অত্যাচারে ইউরোপের প্রজাপুঞ্জ জর্জ্জরিত ছিল। রোম সম্রাট কয়সার এমন সকল উৎকট নিয়ম প্রচলিত করিতেন যে, তদ্দ্বারা রোমীয়দিগের কাহারও রাজেচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ছিল না। এইরূপ অত্যাচারের স্রোত "আগষ্টাস জুলিয়াস সিজারের" সময় হইতে "তিপরি-ট্রুসের" শাসনকাল পর্য্যন্ত সমভাবে প্রবাহিত ছিল।

মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যখন গ্রীস, রোম এবং মিসরদেশে খৃষ্টানদের নাজন সংখ্যা বৃদ্ধি হইত, না তাহাদের আত্মোন্নতির কোন শক্তি ছিল. তখন খৃষ্টীয় অভিজাত সম্প্রদায় নিজদের জন্য এই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন উপাসনাগার এবং তথায় স্থাপিত গ্রীক ও রোমানদিগের অবাধ্য দেবতার প্রতিমা সমূহ ধূলিসাৎ করা হইবে। তাহাদের এই সিদ্ধান্তানুযায়ী অনেক প্রাচীন শিল্পের সৌধ রাজি ভূমিসাৎ করা হইয়াছিল। ৩৯০ খৃষ্টাব্দে কয়সার "তাওদিউস" সরকারী আদেশ দ্বারা কৎকালীন সমস্ত প্রতিমা ও প্রতিমাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। খৃষ্টানদের প্রাচীন বিদ্যালয় সমূহের প্রতিও অত্যাচারের হস্ত প্রসারিত হইল, কারণ প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানের যেখানে যে বহি পুস্তক পাওয়া যাইত তৎক্ষণাৎ তাহা বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। কয়সার "তাওদিউসের" আদেশ ক্রমে ৩৯০ খৃষ্টাব্দে আলেকজেন্দ্রিয়ার বিখ্যাত ও সুবৃহৎ পুস্তকাগার জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্তিনোপলের "ওকতুগুনার" (اوكتوغونر)বৃহৎ পুস্তকাগার খৃষ্টানগণ ভস্মসাৎ করিয়া দেন। এবং দগ্ধাবশিষ্ট পুস্তকাদি ৭৩০ খৃষ্টাব্দে "লাওন লুজিয়ানীর" ধর্ম্ম-বিদ্বেষ বশতঃ পোড়াইয়া ফেলা হয়। রোমে অবস্থিত "আপুলুন পোলালীনের" উপাসনাগারে আগষ্টসের সময়ের প্রতিষ্ঠিত এক অতি মূল্যবান পুস্তকাগার ছিল; তাহা পোপ "গ্রেগারী" ধর্ম্ম বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া জ্বালাইয়া দেন।

ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসের রাজধানী "এথেন্সে" খৃষ্টান পণ্ডিতদের এক অধিবেশন হয়। এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে কয়সার "ইয়স্‌টানিয়াহুস" قيصر) (يوستنيانوس এথেন্সের সমস্ত শিক্ষকদিগের বেতন বন্ধ করিয়া দেন। এবং বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, লোককে শিক্ষিত করা খৃষ্টান ধর্ম্মের পক্ষে বিষম বিপদজনক ব্যাপার।

যাঁহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম ও এস্‌লাম বিধিকে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে সম্পদ সম্পন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক তাহা বলাই বাহুল্য। খৃষ্টানদের

অবস্থাত পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। এখন এস্লাম সম্বন্ধে ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক পণ্ডিত "মুসিউকেসতাফ" কি বলেন তাহা দেখুন। "মধ্যযুগে প্রাচীন বিদ্যার প্রচলন আরবদিগের দ্বারাই হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাগার সমূহে অর্থাৎ ইউরোপের ইউনিভার্সিটি সমূহে পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত শুধু আরবদিগের বহি পুস্তক পড়ান হইত। এবং শুধু ইহারি কল্যাণেই সমস্ত ইউরোপে নৈতিক কিম্বা সাহিত্যিক, সভ্যতার প্রচার হইয়াছে। যিনি আরবী বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন এবং আরবদিগের উদ্ভাবিত বিষয় সমূহ আলোচনা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় এ কথা স্বীকার করিবেন যে, পৃথিবীতে অন্য কোনও জাতি আরবদের মত ঈদৃশ অসাধারণ উন্নতি করিতে পারে নাই।"

বৃটিশ আফ্রিকান কোম্পানীর উকিল ইংরাজ ডাক্তার "ব্লাইডন" "আল-এসলাম ফি সুদানেল মগরবী (الاسلام فى السودان المغربى) বা "পশ্চিম সুদানে এস্লাম" নামক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেনযে, এস্লাম ধর্ম্ম মানব সমাজে ভ্রাতৃভাবের কি এক সুন্দর নিয়ম প্রচলন করিয়াছে। সুদানের হাবশী, ভারতবর্ষের কৃষ্ণকায়, পিকিনের চীনা মুসলমান সমস্তকেই ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। ইউরোপের শ্বেতকায়, আফ্রিকার কৃষ্ণকায় এবং এশিয়ার লোহিতকায়, বিভিন্ন বর্ণের মুসলমানগণ মস্জেদ সমূহে একে অন্যের পার্শ্বে অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া এক সঙ্গে সমবেতভাবে নামাজ পড়িতে কেমন আনন্দ ও প্রীতি অনুভব করে, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। নামাজের সময় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট এবং পথের ভিখারী দীন দরিদ্র ব্যক্তি একসঙ্গে পাশা পাশিভাবে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে কেহই কাহাকে হেয় বলিয়া ভাবিতে পারে না। এমন ভ্রাতৃভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং সভ্যতার সুন্দর আদর্শ অন্য কোনও ধর্ম্মে পরিলক্ষিত হয় না।

এস্লামের শিক্ষা অনুসারে বলিতে গেলে আত্মার উৎকর্ষ ও প্রসন্নতা সম্পাদনের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। হাবশীদিগের দেশে এস্লাম কেমন সুন্দর ভাবে স্বীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা দেখিবার জিনিষ বটে, পূর্ব্ব সুদান হইতে পশ্চিম সুদান পর্য্যন্ত জনসাধারণের জন্য মাদ্রাসা ও পাঠশালা সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সমস্ত মাদ্রাসায় কোরআন শরিফ ও ধর্ম্ম বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। হাবশীদিগের মধ্যে অসংখ্য লোক কোরআন শরিফ পড়িতে পারে এবং ইহারা প্রায় সকলেই আরবী ভাষা জানে। সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃভাবের এই আদর্শ শিক্ষা বিস্তার করেই " আটলান্টিক " মহাসাগর হইতে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত এবং ভূমধ্য সাগর হইতে বিষুব রেখা পর্য্যন্ত, সমস্ত ভূভাগের মুসলমানগণ একই প্রান্তরে সমবেত হয়। একতা ও ভ্রাতৃভাবে প্রণোদিত হইয়া একে অন্যের সহিত প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া থাকে। যখন আমি এই বিষয়ে চিন্তা করি যে, প্রান্তরের বালুকা কণার মত লক্ষ লক্ষ মুসলমান দিবারাত্রি পঞ্চবার একই "মস্জীদল হারামের" (مسجد الحرام) দিকে মস্তক অবনত করিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করে, এবং একই ভাষায় সকলই তাহাদের নামাজ পড়িয়া থাকে, তখন বাস্তবিক বিস্ময়াপন্ন না হইয়া থাকা যায় না। আর একটী ভাবিবার বিষয় এই যে, হাবশী-

দিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ লোক যেমন ঃ—"মান্দিজু" (مانديجو) "ভুলা" (فولا) "জলুফ" (جلوف) "হুছাছ" (حوصاص) এবং "বরবার" (بربار) ইত্যাদি, যাহাদের নাম ইউরোপ কখন শুনে নাই, এবং যাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক ভাষা! কিন্তু তাহারাও নামাজের সময় সকলেই একত্র হইয়া সেই এক উন্নত মহান খোদার নিকট মস্তক নত করিয়া থাকে। সকলেই একই আরবী ভাষায় একই "কলেমা" উচ্চারণ করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এসলামের শক্তি কি মহান!!

মিসরের বিখ্যাত পত্রিকা "আল্‌মেনার" (المنار) "তামাদ্দনে এস্‌লাম" (تمدن الاسلام) নামক এক সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়া আরবদিগের উদ্ভাবিত ভূগোল ও খগোলশাস্ত্র বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এককালে আরবগণ কেমন উর্ব্বর মস্তিষ্ক সম্ভূত লোক ছিলেন। গ্রীকদিগের বিশ্ববিখ্যাত ভৌগলিক পণ্ডিত "বতলিমুসের" (টলেমী) জিওগ্রাফী বা ভূগোল শাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালের লোকের ইহার প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আরবগণ যখন এই শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিলেন, "এল্‌মে হাইয়ত" (علم هيات) ও "ফনুনে রেয়াজি" (فنون رياضي) বা গণিত শাস্ত্রে গ্রীকদিগের ভ্রম সংশোধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মহাত্মা "এরছাদে মজ্‌ছেতি" (ارصاد مجسطي) স্বীয় গবেষণা দ্বারা নূতন নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিয়া ইহার ভ্রম সংশোধন করিতে লাগিলেন। এবং পৃথিবীর মাপ নূতন করিয়া আরম্ভ করিলেন। এই নূতন মাপের মধ্যে আরব দেশ, পারস্য উপসাগর, "দেজলা," (Tigris) ও ফোরাত (Euphrates) নদী, এবং ইরান ও ভূমধ্য সাগর ইত্যাদি ছিল। ইউরোপবাসী যখন এই ভূগোল শাস্ত্রের প্রতি মননিবেশ করিলেন, তখন বহু দিবস পর্য্যন্ত তাঁহারা "বাতলিমুসের" (টলেমী) জিওগ্রাফীর উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ক্রমে আরবদের বহি পুস্তক তাঁহাদের হস্তগত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা "বাতলিমুসের" ভ্রম এবং ইহার সংশোধনের বিষয় পরিজ্ঞাত হইল!!

আরবগণ হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ "মামুন অর রসিদ আব্বাসীর" শাসন কাল হইতে বাতলিমুসের সিদ্ধান্তের সংশোধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও ইহার সম্পূর্ণ সংশোধন হইয়াছিল না। হিজরীর সপ্তম শতাব্দীতে যখন মহাত্মা "ফাজেল বেরুনী" (فاضل بيروني) রুম, মাওউরান্নহর, (ماوراءالنهر) এবং সিন্ধুর পরিসরের হিসাব সংশোধন কালে যে সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলন করেন, তদ্দ্বারাই ইহার একরূপ সম্পূর্ণ সংশোধন হয়!

হিজরীর ৪৬৯ ও ৪৭০ সনে মহাত্মা "ওমর খাইয়াম" (عمر خيام) গ্রহাদির গতিবিধির তত্ত্ব সমন্বিত এক মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া সৌর বর্ষের গণনা আরম্ভ করেন। তাঁহার গণিত অব্দ বর্ত্তমানে জালালী সন নামে অভিহিত।

হিজরীর ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাত্মা "শরিফ এদরিসি" (شريف ادريسي) রৌপ্য ফলকে এক মানচিত্র (Atlas) নির্ম্মাণ করিয়া সিসিলির বাদসাকে তাহা উপহার দেন! তাহাতে

পৃথিবীর সমস্ত সহর, প্রদেশ ও তাহাদের গঠন প্রণালী এবং এই সমস্তের নাম আরবীতে অঙ্কিত ছিল। উক্ত মহাত্মা ভূগোল শাস্ত্র বিষয়ে এক অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করেন, ইউরোপবাসিগণ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত এই পুস্তকের অনুসরণ করেন।

হিজরীর সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচ্যদেশে "আবুল হাসান আলী মারাকাশী" (ابوالحسن علي مراكشي) নামে ভূগোল শাস্ত্রের এক বিখ্যাত পণ্ডিত আবির্ভূত হন। প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক "সেডিলো" (Sedillot) বলিয়াছেন যে, "আবুল হাসানের ভূগোল শাস্ত্রের বই আরবদিগের অসাধারণ প্রতিভার স্মৃতি চিহ্ন সমূহের একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন"।

আরবগণ যে, কেবল স্থল ভাগের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা নহে। বরং তাঁহারা সামুদ্রিক মানচিত্র প্রস্তুত করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না। এইরূপ অনেক গুলি সামুদ্রিক মানচিত্র হিজরীর নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয়দিগের হস্তগত হয়। "ওমর আরবীর" (عمر عربی) প্রস্তুত এক সামুদ্রিক 'এটলাস' ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মতাবেকে ১০৫৮ হিজরী ইউরোপের পণ্ডিতগণের হস্তগত হয়। আরবগণ যেমন সামুদ্রিক বাণিজ্যে দক্ষ ছিলেন, সেইরূপ সামুদ্রিক মানচিত্র প্রণয়নেও সিদ্ধ হস্ত ছিলেন।

ফরাসী ঐতিহাসিক সেডিলোঁ বলিয়াছেন যে, আরবদিগের রাজ্য যখন আটলান্টিক মহাসাগর হইতে চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন তাঁহারা বাণিজ্যের জন্য চারটী খুব বড় রাস্তা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। যদ্দারা "কাদাছা" (قادس) ও "তাজার" (طنجة) মধ্য দিয়া অতি সহজে এশিয়ার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা যাইত।

আরবগণ ভূগোল শাস্ত্রে এমন সকল মূল্যবান পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন যে, যদ্দারা এই শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত কেতাবের মধ্যে কতিপয় পুস্তকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা :—

১। "মারাছেদল এতলায় আলা আস্‌মায়েল আম্‌কেনাতে-অল-বকআ"
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع

২। "মওয়াজ্জেমে ইয়াকুতে হমাবী" (معجم ياقوت حموي)

৩। "কেতাবে মশ্‌তারেক" (كتاب مشترك)

৪। "তক্‌বিম্‌ল বোলদান" (تقويم البلدان) মালেকল্ মইয়েদ (ملک المويد কৃত)

৫। "তক্‌বিমল বোলদান" (বল্‌খী সম্পাদিত)

৬। "আওজাহল্ মাছালেক এলা মারেফাতেল বোলদান অল মামালেক" (اوضح المسالك الى معرفة البلدان والممالك) এই শেষ লিখিত বইখানা তুরস্কের ওছমানীয় সোলতানদের সময়ে লিখিত হয়। ইহার গ্রন্থকারের নাম "মহাম্মাদ বেনে আলী।" (محمد بن علی) ৯৮০ হিজরীতে উক্ত পুস্তকখানা সোলতান তৃতীয় মোরাদকে গ্রন্থকার উপহার প্রদান করেন। শেষে ইহা তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে।

"এল্‌মে কিমিয়া" (علم كيميا Chemistry) বা, রসায়ন বিদ্যা একমাত্র আরবদিগের দ্বারাই উদ্ভাবিত। রসায়নের জন্য ইউরোপ চিরকাল আরবদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। " আল্লামায়ে আবুবকর রাজী" (علامه ابو بكر رازى) "শেখ বুআলিসিনা" (شيخ بو على سينا) "মওয়াল্লেমে সানী :আবু নসর ফারাবী" (معلم ثانى ابو نصر فارابى) এবং স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার বিখ্যাত দার্শনিক হাকিম এবনে রোশদ (حكيم ابن رشد Avenrose) যাহার কিল সাফার পুস্তক খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের পাঠ্য ছিল। ইঁহারা সকলেই রসায়ন শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইউরোপে ইঁহাদের লিখিত অনেক পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে।

" পেটরস " সাহেব বলিয়াছেন যে :—রাসায়নিক যন্ত্র সমূহের অতি সহজ প্রণালীতে প্রস্তুত করিবার নিয়মাদি এবং রাসায়ন শিক্ষার প্রক্রিয়া (Experiment) এবং বিশ্লেষণ আরবগণের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরবগণ অতি সহজ প্রণালীতে খনি হইতে লবণ বাহির করিতেন। রসায়ন শাস্ত্রে আরবদিগের উদ্ভাবিত বিষয় সমূহের মধ্যে দ্রব্য গুণ শাস্ত্র একটী প্রধান বিষয়।

ইউরোপ মনে করিয়া থাকে যে, "এল্‌মে জররাহী (علم جراحى) বা অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যা তাহাদের নিজ আবিষ্কৃত। কিন্তু তাহাদের এ ধারণা ভুল। কারণ ইউরোপকে চিরকাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ভিষক 'আবুল কাসেমের' (ابوالقاسم Albacacis) নিকট ঋণী থাকিতে হইবে। আবুল কাসেম অস্ত্র চিকিৎসায় আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার কিছুদিন পরে জগদ্বিখ্যাত ভিষকাচার্য্য এব্‌নে জহর (ابن ظهر Avenzoor) প্রাদুর্ভূত হন। ইনি অস্ত্র প্রয়োগের অস্ত্রাদি আবিষ্কার করেন। উপরোক্ত মহাত্মা দ্বয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক পুস্তক লিখিয়া যান। ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে ইহাদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

" এল্‌মে নাবাতায়াত" (علم نباتات Botany) বা উদ্ভিদ বিদ্যা আরবদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ " এবনে বতহর" (ابن بطهر) উক্ত শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত মহাত্মা সমস্ত প্রাচ্য জগত ভ্রমণ করিয়া নূতন নূতন উদ্ভিদ এবং তাহার গুণ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তিনি ভৈষজ্য ঔষধি সম্বন্ধীয় এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ঘড়ি এবং দিগ দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রচার আরবদিগেরই চেষ্টার ফল। যদিও " কাররান" সাহেব নিজ ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, দিগদর্শন যন্ত্র চৈনিকদিগের আবিষ্কৃত, কিন্তু আরবগণ দ্বারাই ইহার প্রচলন সাধিত হইয়াছে।

খলিফা আব্দুল মালেকের সময়ে আগ্নেয় অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি যাহা ইউরোপের আবিষ্কৃত বলিয়া মনে হয়, তাহা শত বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার "ছাবেত বেনে নাসের দেমস্কী" (ثابت بن ناصر دمشقى) আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি দ্বিতীয় এজিদের রাজত্বকালের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

"এল্‌মে জবর্‌ও মকাবেলা" (علم جبر و مقابله) বা বীজগণিত পূর্ব্বে যাহা কতিপয় বিভিন্ন সূত্রের নাম ছিল, আরবগণ তাহাকে এক স্বতন্ত্র বিদ্যাতে পরিণত করেন। মহাম্মদ বিন্ মুসা, আবুবকর অল কার্খি, উক্ত শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

"ওয়াটার ওয়ার্কস" (Water Works) বা জল সরবরাহ প্রণালী, বর্ত্তমানে যাহা ইউরোপের আবিষ্কৃত বলিয়া মনে হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে আরবদিগের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত। কারণ ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সারাসান আরবদিগের রাজত্বকালে, স্পেনের অসংখ্য উদ্যানে জল সিঞ্চনের উত্তম বন্দোবস্ত ছিল। অসংখ্য সীসনির্ম্মিত নল সংযোগে পাহাড়ের ঝরণার নির্ম্মল জল সরবরাহ করা হইত। আরবজাতির জল সরবরাহের প্রণালী সর্ব্বত্রই প্রশংসনীয় এবং উত্তম ছিল। আরবগণ মরুবাসী ছিলেন বলিয়া শ্যামল-তরু-কুঞ্জময়-রমনীয়-উদ্যান, কুলুকুল নাদিনী নির্ঝরিণী ও জলের উৎস তাঁহাদের নিকট নিতান্ত প্রীতিপ্রদ এবং চিত্ত বিনোদন বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

"এল্‌মে জরেরছকিল" (علم جر ثقيل) বা মেকানিকল্ ইউরোপের নিজ আবিষ্কৃত বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে, কিন্তু 'এবনে শাকেরের (ابن شاكر) "কেতাবে আলাতেজরেরছ-কিল" (كتاب الات جر ثقيل) বা মেকানিক যন্ত্র সমন্ধীয় পুস্তক এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে যে, আরবগণ এই বিদ্যাকে অসম্পূর্ণ রাখেন নাই।

ফন্নে মাবদ (فن معبد) বা স্থপতি বিদ্যার (Engineering) এবং ভাস্কর বিষয়ে যদি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে, বর্ত্তমান ইউরোপীয়গণ এই বিজ্ঞানোন্নত যুগেও এমন স্থলে উপনীত হইতে পারেন নাই যেমন আরবগণ ছিলেন। ইহার সত্যতার প্রমাণ ইতিহাস পাঠ-কের অবিদিত নহে, কারণ তৎকালের স্থপতি বিদ্যার ও ভাস্করের উজ্জ্বল নিদর্শন গ্রানাডার অত্যাশ্চার্য্য এবং জগৎ বিখ্যাত "আলহোমরা" প্রাসাদ, স্পেনের "মদিনাৎউজজোহরা" (مدينة الزهرا) বা জোহরা নগরীর সৌন্দর্য্যাগার প্রাসাদাবলী, সম্রাজ্ঞী আজ জোহরার প্রিয় নিকেতন জোহরা প্রাসাদ, কর্ডোভার জামে মস্‌জেদ, কিম্বা বাগদাদ ও দামেস্কের অতুলনীয় প্রাসাদাবলী ইহার নিদর্শন !!

বর্ত্তমান ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারী অনুকরণ খোদিত সুইয়েজ খালের সঙ্গে যদি সেই মধ্য যুগের আরবীয় স্থপতি বিদ্যার নিদর্শন, নহরে জোবায়দার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ইহার উৎকৃষ্টতর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। বহুকালের খোদিত নহরে জোবায়দা বিনা সংস্কারে স্বাভাবিক প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছে। আর এই বিজ্ঞানোন্নত যুগের সুয়েজ প্রণালী যদি সপ্তাহ দুই ষ্টিমার দ্বারা মাটি কাটা না হয়, তবে ষ্টিমার চলাচল কঠিন হইয়া দাঁড়ায় !!

পূর্ব্বকালে লোকে বৃক্ষের ছাল এবং পশুর চর্ম্ম দ্বারা কাগজের অভাব পূরণ করিত। আরব-গণ কাগজের কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া বিদ্যার প্রচলন করেন!

বাগ্দাদে মহাত্মা "ফজ্‌লে বরমেকির" (فضل برمكى) অধ্যক্ষতার এক উচ্চাঙ্গের কাগজের কারখানা (Paper Mill) ছিল। ব্যবহারিক শিল্পে আরবগণ অপূর্ব্ব কৃতিত্ব

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে বাগদাদ ও স্পেন, গালিচা, তরবারির বাঁট, চাকু, এবং হস্তীদন্তের খোদাই শিল্পে জগৎ প্রসিদ্ধ ছিল!!

যে সময় মোস্লেম জগতের আলেমমণ্ডলী, (طلب العلم فريضة على كل مسلم) বা "বিদ্যাশিক্ষা করা প্রত্যেক মোসলেমের জন্য অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য" এই মহা মন্ত্রের প্রচার করিতেছিলেন—সেই সময় ইউরোপে পোপ মহোদয়গণ, "মূর্খতাই অর্চ্চনার প্রসূতি" এই মূল মন্ত্রের শিক্ষা দিতেছিলেন। যে সময় মুসলমানগণ দর্শন বিজ্ঞানের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনায় ব্যাপৃত, সেই সময় খৃষ্টানগণ বিজ্ঞান আলোচনা-অপরাধে গ্যালিলিওর কারাবাস, ও "ব্রুনোর" জীবন্ত দাহ ক্রিয়ায় উন্মত্ত।

ফ্রান্সের রাজমন্ত্রী তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, এক সময় ইউরোপীয়গণ মূর্খতাতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তৎকালে হঠাৎ মুসলমান রাজ্য সমূহ হইতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও বিবিধ শিল্প-বিদ্যার কিরণ মালা বিকীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছিল!!

মধ্যযুগে আরবগণ যে, সকল বিদ্যার আবিষ্কার করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন! এবং তৎকালে তাঁহাদের মক্তব, মাদ্রাসায় এবং "দারল উলুম" (دار العلوم) বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে, সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল!! যথা :—

১। এল্মুৎ তফসির (علم التفسير) কোরানি ভাষ্য,
২। এল্মুল্ কেরাত (علم القراءة) কোরআন সমালোচনা,
৩। এল্মুল্ হাদিস (علم الحديث) হাদিস শাস্ত্র,
৪। এল্মে ফেকাহ (علم فقه) ব্যবস্থা শাস্ত্র,
৫। এল্মুল্ কালাম (علم الكلام) যুক্তি শাস্ত্র,
৬। এল্মে নহয়ো (علم نحو) Grammar ব্যাকরণ,
৭। এল্মে বয়ান (علم بيان) Rhetoric অলঙ্কার শাস্ত্র,
৮। এল্মে আদব (علم ادب) Literature সাহিত্য,
৯। এল্মে মউছিকি (علم موسيقى) Music সঙ্গীত শাস্ত্র,
১০। এল্মে নজুম (علم نجوم) জ্যোতিষ (Austrology),
১১। এল্ম অল নাসের (علم الناصر) ভূবিদ্যা (Physical Geography),
১২। এল্ম অল নাবাতাত (علم النباتات) উদ্ভিদ বিদ্যা (Botamy),
১৩। এল্মে রশদ (علم رصد) খগোল শাস্ত্র (Astronomy),
১৪। এল্মে জাগ্রাফিয়া (علم جغرافيه) ভূগোল শাস্ত্র (Geography),
১৫। এল্মে হেন্দেসা (علم هندسه) জ্যামিতি (Geography),
১৬। এল্মে রিয়াজিয়া (علم رياضى) গণিত শাস্ত্র (Mathematics),
১৭। এল্মে জবর ও মোকাবেলা (علم جبر و مقابله) বীজ গণিত (Algebra),

১৮। এলমে ফালাহাত (علم فلاحات) কৃষি বিদ্যা (Agriculture),

১৯। এলম্ অল জামাদাত (علم الجمادات) খনিজ বিদ্যা (Minesology),

২০। এলম্-অল-হায়ওয়ান (علم الحيوان) প্রাণী বিদ্যা (Zoology),

২১। এলম্-অল-কিমিয়া (علم الكيميا) রসায়ন বিদ্যা (Chemistry),

২২। এলমে তওয়ারিখ (علم تواريخ) ইতিহাস (History).

২৩। এলমে তহজিবে আখ্লাক (علم تهذيب اخلاق) চরিত্র গঠন বিদ্যা বা নীতি শাস্ত্র (Ethics),

২৪। এলমে ছিয়া সতই মদনীয়া (علم سياست مدنيا) রাজ্য শাসনতন্ত্র (Politics)

২৫। এলমে তদবির-ই-মঞ্জেল (علم تدبير منزل) গৃহ শাসনপ্রণালী বিদ্যা (Domestic Ecconomy),

২৬। এলমে সানাআৎ (علم صنعت) শিল্প বিদ্যা (Art),

২৭। ফন্নেতেব (فن طب) চিকিৎসা শাস্ত্র (Medicine),

২৮। এলমে তশরিহ (علم تشريح) শরীর তত্ব (Anatomy),

২৯। এলমে তশরিহ-অল-আরজ (علم تشريح الارض) ভূতত্ব (Geology),

৩০। এলমে রসম্-অল-আরজ (علم رسم الارض) গাণীতিক ভূগোল (Mathematical Geography),

৩১। এলমে মন্তেক (علم منطق) ন্যায় শাস্ত্র (Logic),

৩২। এলমে ফালসফা (علم فلسفة) দর্শন শাস্ত্র (Philosophy),

৩৩। হেকমত (حكمت) বিজ্ঞান শাস্ত্র (Science),

৩৪। ফন্নেমাবৃত (فن معبد) স্থপতি বিদ্যা (Engineering),

৩৫। এলমে মসাহাত (علم مساحت) জরিপ বিদ্যা (Surveying ,

৩৬। এলমে ওরুজ (علم عروض) ছন্দঃ শাস্ত্র,

৩৭। এলমে-ই-তাবি-ই (علم طبعى) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physical Science),

৩৮। এলমে সিহর ওয়াল কিমিয়া (علم السحر والكيميا) ইন্দ্রজাল ও রসায়ন (Magic and Alchemy).

এতদ্ব্যতীত তৎকালে আরও যে কত কত বিদ্যার ও ধর্ম্মসংক্রান্ত কত বিষয়ের আলোচনা হইত, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখা অসম্ভব। তৎকালের মুসলমানগণের বিশ্বশোষিকা জ্ঞান-পিপাসার বিষয় ধারণা করিলে এবং বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের অবস্থা আলোচনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে। "হায়! এই বিশ্বশোষিকা জ্ঞান পিপাসার অপূর্ব্ব চিত্র আবার কবে মোস্লেম জগতে প্রতিভাসিত হইবে! হে খোদা! আবার তুমি আমা-দিগকে সেই শুভদিনের দর্শন দেও! আমিন!!

আবুল কয়েজ মহাম্মদ নুর-উদ্দীন রোকনী, সিরাজগঞ্জী।

কোর্‌আনের বিশুদ্ধতা আলোচনা।

১। কোরানের মূল সংরক্ষণ সম্বন্ধে ঐশী অঙ্গীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

'তাবিল-অল-কোরান' প্রণেতা তাঁহার যুক্তি সমর্থনার্থে একটি হাদিস উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পবিত্র কোরান রক্ষা করা বলিতে ইহার মূল বিকৃত হওয়া রক্ষা করা অর্থে বুঝায় না। এই হাদিসটি তিনি হাদিসশাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ এবনে মাজা হইতে লইয়াছেন। এই হাদিসে উক্ত হইয়াছে যে, এমন সময় আসিবে, যখন পবিত্র গ্রন্থ অর্থাৎ কোরান একেবারেই তিরোহিত হইবে ও ইহার একটিও আয়ত বিদ্যমান থাকিবে না। এই হদিস-বাক্য হইতেই তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "নিশ্চিতই আমি কোরান অবতারণ করিয়াছি ও নিশ্চিতই আমি ইহার রক্ষক হইব," এই বাক্যভুক্ত অঙ্গীকারের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া যদি কোরান একেবারেই নীত হয়, তাহা হইলে ঐশী প্রত্যাদেশ-বাণীর যে কোন অংশ নাশের বা ইহার মূলে যে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটার সহিত এই অঙ্গীকারের অসামঞ্জস্য হইতে পারে না। এই যুক্তির অসমর্থতা ইহাতেই (অর্থাৎ এই যুক্তিতেই) এরূপ আছে যে, পবিত্র কোরান তিরোহিত হওয়া বলিতে ইহার বাক্যগুলি তিরোহিত হওয়া না বুঝাইয়া ইহার প্রভাব (উদ্দীপনাশক্তি) বিলুপ্ত হওয়াই বুঝায়। ইহাই যে হাদিস বাক্যগুলির প্রকৃত মর্ম্ম, তাহাও অন্যান্য ও অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হাদিস সকল হইতে প্রমাণ করা যায়। এইরূপে বোখারী ও মোসলেম উভয়েই এরূপ একটি হাদিস প্রচার করিয়াছেন, যাহাতে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে কোরান-জ্ঞান কোরানীয় বাক্যের তিরোভাব হেতু বিলুপ্ত না হইয়া বরং জ্ঞানীদিগের মৃত্যু হইলেই বিলুপ্ত হইবে। * বায়হাকী কর্ত্তৃক উল্লিখিত অন্য একটি 'রওয়ায়েতে' (সংবাদে) উক্ত হইয়াছে যে, এমন এক সময় আসিবে যখন ইসলামের নাম ভিন্ন অন্য কিছুই থাকিবেনা এবং কোরানের অক্ষর ভিন্ন অন্য কিছুই থাকিবে না †। এবনে মাজা (যিনি একমাত্র বিশেষজ্ঞ বলিয়া যাঁহার উপর

---

* হাদিসটি এইরূপ ; ওমরের পুত্র আবদোল্লার উক্তি, প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন 'নিশ্চয় আল্লাহদাসগণ (মনুষ্যগণ) হইতে জ্ঞান আকর্ষণ করিয়া প্রতি গ্রহণ করেন না, কিন্তু জ্ঞানীদিগের মৃত্যু হইলে জ্ঞান প্রতি গ্রহণ করিয়া থাকেন।'……" (মেস্কাত, কেতাব-অল-এল্‌ম্)।

† এই হাদিসটি মেস্কাত কেতাব অল-এল্‌মেও এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

"হজরত আলির উক্তি ; প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, অচিরেই লোকের নিকটে এমন সময় উপস্থিত হইবে যে, এসলামের নাম ভিন্ন থাকিবে না এবং কোরানের নাম ভিন্ন থাকিবে না ; তাহাদিগের মসজেদ সকল লোকে পূর্ণ থাকিবে কিন্তু উহারা ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হইবে। গগন চন্দ্রাতপের নিম্নে পণ্ডিতগণ কুলোক হইবে। তাহাদের হইতে (জগতের) অনিষ্টকর কার্য্য সকল সংঘটিত হইবে, পরে তাহাদের মধ্যে তাহা প্রত্যাবৃত্ত হইবে।" শোওয়বোল্ ইমানগ্রন্থে বয়হকী।

তাবিল-অল-কোরান' প্রণেতা নির্ভর করিয়াছেন) ছাড়া, তৃতীয় একটি হদিস যাহা তৃমিজী, আহামদ ও দোরিমী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে একইরূপ স্পষ্ট কথায় এই একই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। যখন হজরত রসুল, জ্ঞানের তিরোধন সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই সময় একজন আসহাব (পারিষদ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কেমন করিয়া কোরআনের জ্ঞান তিরোহিত হইবে, যেহেতু আমরা ইহা সতত পাঠ করিতেছি ও স্বীয় সন্তানদিগকে পড়াইতেছি ও তাহারা আবার তাহাদের সন্তানদিগকে পড়াইবে *। তদুত্তরে প্রেরিত পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন যে পবিত্র কোরআনে জ্ঞান তিরোহিত হওয়া অর্থে এই বুঝায় যে লোকে তদনুসারে কোন কার্য্য করিবে না বা তাহাকে তাহাদের জীবনের পরিচালন কারী নিদর্শন (দলিল) করিবেনা। এই সকল হদিস হইতে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, যখন হজরত রসুল কোরান-শরীফ জ্ঞানের তিরোধান সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি কখনই এরূপ উদ্দেশ্য করিয়া বলেন নাই যে পবিত্র গ্রন্থই পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইবে। এতদ্বিষয়ে তিনি যাহা বুঝিয়া ছিলেন, তাহা এই যে লোকে তদনুসারে কার্য্য করিবেনা।

এই সকল বিচার বিতর্কে মাত্র একটি সিদ্ধান্তই লক্ষিত হয়, অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের আসহাবগণ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ কর্ত্তৃক কোরান সংরক্ষিত হওয়া সম্পর্কীয় কোরানোক্ত অঙ্গীকারকে অঙ্গীকৃত বাক্যের প্রত্যক্ষ অর্থেই বুঝিয়াছিলেন এবং এই গুরুতর অঙ্গীকার পালন সম্বন্ধেও কেহই কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, ইহাও জানা যায় যে প্রেরিত পুরুষের মৃত্যুর পরে কোরান শরীফের মূলের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এইহেতু সর্ব্বযুগের মুসলমানেরাই এই অঙ্গীকার-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াছেন। আরও কতকগুলি অসংশনীয় সত্যতাপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা হইতেও এইরূপ অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোরানের মূল কখনই বিনষ্ট হয় নাই। আরও একটি কারণ আছে, যাহা হইতে এই অঙ্গীকার পালনের অলক্ষিত প্রমাণ পাওয়া যায়। রক্ষাকরণ সম্বন্ধে সেই একই সময়ে প্রেরিত পুরুষের নিকট দুইটি প্রয়োজনীয় অঙ্গীকার করা হয়। একটি প্রেরিত-পুরুষের শত্রুদিগের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে তাঁহার দেহরক্ষা করিবার অঙ্গীকার ; আর একটি কোরান শরীফের মূল বিনষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা করিবার অঙ্গীকার। প্রথম অঙ্গীকারটি হজরতের জীবিতসময়েই পালন করা হয়। দ্বিতীয়টি তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময়ে রক্ষিত হয়।

---

* "লবয়দের পুত্র জেয়াদের উক্তি ; প্রেরিত পুরুষ কোন বিষয়ে প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন. পরে বলিয়াছিলেন, 'জ্ঞানের তিরোধান কাল এই নিকটবর্ত্তী।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রেরিত পুরুষ কেমন করিয়া জ্ঞানতিরোহিত হইবে, যে হেতু আমরা কোরান অধ্যয়ন করি ও স্বীয় সন্তানদিগকে তাহা পড়াইতেছি ও আমাদের সন্তানগণ তাহাদের সান্তানগণকে ক্রমশঃ কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত পড়াইবে। তখন তিনি বলিলেন, "জয়াদ তোমার মাতা তোমাকে হারাইয়া প্রাপ্ত হউক, নিশ্চয় মদিনাতে আমি তোমাকে সুবিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতাম, এই ইহুদী ও ঈসায়ী লোকেরা কি তওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছে না ? এই দুই গ্রন্থে যাহা আছে তাহারা তদনুসারে কিছুই আচরণ করিতেছে না।"

দুইটি ভয়ানক বিপদ হজরত রসুলের প্রেরিতত্বের সম্মুখীন হইয়াছিল অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষ তাঁহার শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইবেন ও এইরূপে তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় তাঁহার মৃত্যুর পরে কোরানশরীফ পরিবর্ত্তিত হইবে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন সংবাদ বাহক সংহৃত হন ও অন্যান্য সংবাদ বাহকেরা তাঁহাদিগের মৃত্যুপরে তাঁহাদিগের শিষ্যগণের পথপ্রদর্শন জন্য যে ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি রাখিয়া যান, সেগুলির মূল বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু উপরোক্ত দুইটি অঙ্গীকার দ্বারাই হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রেরিতত্বকে এই উভয় বিপদ হইতে রক্ষা করা হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা সহজেই দেখা যাইতে পারে যে দ্বিতীয় অঙ্গীকারটি রক্ষিত হওয়া অপেক্ষা প্রথম অঙ্গীকারটি রক্ষিত হওয়া অধিকতর দুঃসাধ্য হইলে ও রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেনা। মক্কা ও মদিনা উভয় স্থানেই হজরত রসুলের জীবননাশের জন্য অনেক রকম চেষ্টাকরা হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি সবই নিষ্ফল হইয়াছিল। হজরত রসুলের জীবদ্দশায় এই অঙ্গীকার রক্ষিত হওয়াই হজরতের আসহাবগণের নিকটে একরূপ একটি আশ্বাস ব্যঞ্জক ব্যাপার যে, দ্বিতীয় অঙ্গীকারও রক্ষিত হইবে। কারণ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ যিনি হজরত রসুলকে নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে হজরত রসুলের ন্যায় একজন অসহায় ও একক লোকের বিরুদ্ধে বলবান শত্রুদিগের দুরভিসন্ধি সকল নষ্ট করিতে পারেন, তিনি কোরানকে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতে রক্ষা করা সম্বন্ধে সমভাবে প্রয়োজনীয় অঙ্গীকার পালন করিতে কখনই অসমর্থ হইতে পারেন না।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ।

কবি।

দিনের পর দিন আসিয়া কত যুগযুগান্তর, কত শতাব্দী কত হিমাচল কালের করালগতিতে অতলজলধিতলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে; কত সুরম্য হর্ম্ম্য, কত সুরম্য উদ্যান, কত নগরনগরী ধরায় মিশাইয়া গিয়া এখন শুধু সমীরণের হুঁ হুঁ'র সঙ্গে হাহাকার করিতেছে, আর ধূলিরাশি উড়াইয়া দিয়া অনন্তের চরণতলে নিজের অব্যক্ত বেদনা জানাইতেছে।—কিন্তু মানব যে কবে, কোন সুদূর অতীতে অনন্তের সন্ধান পাইয়া, আকাশের অসীম নীলিমায় নিজকে মিশাইয়া দিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

কিন্তু যেদিন মানব সেই সন্ধান পাইয়াছিল, যেদিন মানব বুঝিয়াছিল যে ঐ সুদূর গগনের, অনন্তের অনন্তত্বে, ঐ অনন্ত তারকারাজি মণ্ডিত চাঁদের ভুবন ভুলান মনমাতানো হাসির

ওপারে, ঐ প্রকৃতির বাহ্যিক অপার সৌন্দর্য্যের অপরদিকে, আর একটী মহান অনন্তশক্তি আছে—আর সেই শক্তির প্রভাবেই বিশ্বের এই অসীম লীলাখেলা, বিশ্বের এই বিরাট উত্থান ও পতন, ভাঙ্গা ও গড়া হইতেছে—সেই দিনই কবির প্রকৃত জন্মদিন সেই দিনই কবির প্রথম সৃষ্টি—

কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের প্রশ্ন কবি কে? চাঁদের জ্যোৎস্নাধারায় স্নাত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া, গগনের কোলে অসংখ্য তারকা মালার মাঝে পুষ্পের চাঁদ দেখিয়া, সেই অসীম সৌন্দর্য্যে যিনি নিজকে মিশাইয়া দিতে পারেন; অমানিশার গভীর অন্ধকার রাত্রিতে, আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলী দেখিয়া, সেই অন্ধকারের কালো আবরণ গায়ে মাখিয়া, যিনি নিজের হৃদয়কে তার মাঝে লুটাইয়া দিতে পারেন; ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে কালো মেঘরাশির মাঝে বিদ্যুতের খেলা দেখিয়া যিনি নিজের প্রাণকে সেই প্রবল সমীরণের সঙ্গে উড়াইয়া দিতে পারেন, তিনিই কবি। তবে জিজ্ঞাসা করি, মানব নিজের প্রাণকে, নিজের হৃদয়কে, নিজের সর্ব্বস্বকে কিসের চরণে অবাধে লুটাইয়া দিতে পারে? যেখানে সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া মানব অনুভব করিতে পারে, যেখানে মানব সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, যেখান হইতে মানব সৌন্দর্য্য টানিয়া বাহির করিতে পারে—সেই খানেই যে নিজকে লুটাইয়া দিতে পারে। অর্থাৎ, যিনি সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন, সৃষ্টি করিতে পারেন, সংরক্ষণ করিতে পারেন, তিনিই কবি।

দেখিতে গেলে জগতের সবাই কবি। কারণ জগতের প্রত্যেকেই তাহার জীবনের কোন না কোন মুহূর্ত্তে প্রকৃতির অন্তরালস্থ লুক্কায়িত শক্তির সৌন্দর্য্য দেখিয়া একবার না একবার চীৎকার করিয়া বলে—কি সুন্দর! ঐ সৌন্দর্য্য অনুভূতিও কবিত্ব—

কবি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—নীরব কবি, ও প্রকাশ্য কবি।

নীরব কবি কে?—তুমি হয়ত পূর্ণিমার নিশার ভুবন ভুলান, মনমাতান, প্রাণমাতান সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে এক মহাশক্তি লুক্কায়িত আছে, সেই মহাশক্তির চরণে নিজের মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব লুটাইয়া দিয়া "কে তুমি" করিয়া দিশাহারা হইয়াছ, কোথায় আছ, কি করিতেছ, ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না, নিজের মনোভাব বলি বলি করিয়া বলিতে পারিতেছ না—আমি বলি, তুমিই নীরব কবি। শ্মশানের পাদধৌত নদীতীরে কঙ্কালরাশির মাঝে দাঁড়াইয়া মানবের অবস্থা বিপর্য্যয়, মানবের অন্তিমদশা দেখিয়া তোমার হৃদয় হয়ত এক মহান, অনন্ত, অসীম শক্তির পদতলে আছড়াইয়া পড়িতেছে, অথচ তুমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না কোথায় সেই শক্তি, কি সেই শক্তি, তুমি হয়ত বুঝিতে পারিতেছ না কি তোমার মনের অবস্থা, কি তুমি করিতেছ. আমি বলি, তুমিই নীরব কবি। নীরব কবি যিনি, তিনি নিজকে শুধু এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারেন না। নীরব কবি যিনি, তিনি শুধু সুরম্য উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া নিজে সুখানুভব করিতে পারেন, কিন্তু অন্যকে সেই সুখের সঙ্গী করিতে পারেন না।

এই 'ত' গেল নীরব কবির কথা। এখন দেখিতে হইবে প্রকাশ্য কবি কে। বসন্তের প্রারম্ভে, উষার কনকপ্রভা গগন প্রান্তে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, মধ্যাকাশে লালিমা দেখিয়া, আকাশে সাদা মেঘের ভেলা দেখিয়া, কোকিলের কুহুতান শুনিয়া; বাসন্তি-সমীরের রোমাঞ্চকর ছুহু অনুভব করিয়া, যার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে—যার হৃদয় ঐ সকলগুলীর ওপারস্থ ক্ষীণ কুয়াশার আড়ালে লুক্কায়িত সেই অনন্ত মহাশক্তির প্রভাব অনুভব করিতে পারে, তার পর সেই সুরম্য উদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া; জগতবাসীকে ভাষায় বুঝাইয়া সেই সৌন্দর্য্যের, সেই আনন্দের অনুভূতির অন্ততঃ ক্ষীণ আভাসও দিতে পারেন, তিনিই প্রকাশ্য কবি।

নীরব কবি নিজকে প্রকাশ করিতে পারেন না বলিয়াই, আমরা তাঁহার খোঁজখবর লই না। তিনি হয়ত হিমাচলের উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে, শৈলমালার বুকে বসিয়া প্রকৃতির অধরসুধা পান করিয়া দিন কাটাইতেছেন. আমরা সংসারের মানব, আমরা তাঁহাকে কি করিয়া বুঝিব, আমরা তাঁহাকে কি করিয়া চিনিব! অথবা, তিনি হয়ত এই জগতের বিরাট কোলাহলের এক প্রান্তে থাকিয়া নীরবে সব পরিবর্ত্তন, সব লীলাখেলা দেখিয়া, মহাশক্তির অনুসন্ধানে দিন কাটাইতেছেন। আমরা সংসারী, সংসারের কোলাহলে ব্যস্ত, আমরা তাঁহাকে কি করিয়া চিনিব? কিন্তু অন্যদিকে, প্রকাশ্য কবি নিজকে প্রকাশ করিতে জানেন; জগতবাসীকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে পারেন, নিজের সৌন্দর্য্য অনুভূতির ভাগদিতে পারেন, তাই আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি। যিনি সংসার হইতে দূরে থাকিয়া, সমাজ ও সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করেন, আমরা তাঁহাকে ধরিতে পারি না। কিন্তু যিনি আমাদের মধ্যে আসিয়া, আমাদের ভাবের তারে ঝঙ্কার দিয়া গান গাহিয়া প্রাণ মাতাইতে পারেন, আমরা তাঁহাকেই চিনি। তাই আমরা নীরব কবিকে চিনি না, প্রকাশ্য কবিকে চিনি। তাই আমরা সেক্সপিয়ার, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতি, সাদী, হাফেজ, রবিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কায়কোবাদ, সিরাজী ইত্যাদিকে চিনি; কিন্তু বিন্ধ্যাচলের গুহায়, চিরতুষারাবৃত হিমাচলের শিখরে, নিবিড় বনের মাঝে, অথবা সংসারের কোলাহলের প্রান্তে কত যে নীরব কবি নীরবে বাস করিতেছেন, তাহার কোন সংবাদই আমরা জানিনা, আমরা তাঁহাদের জানিতে পারি না।

প্রকাশ্য কবি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী শুধু সৌন্দর্য্যের খেলা দেখিতে পান। তাঁহাদের মতে এই বিশ্ব অসীম সৌন্দর্য্যপূর্ণ এক মহা কাব্য; আর উহার অন্তরালে যে মহা শক্তি আছে, তাহাও এক অসীম সৌন্দর্য্য। তাই তাঁহারা শুধু সৌন্দর্য্যের লীলা দেখিতে পান। কিন্তু ঐ সৌন্দর্য্য এক বলিয়া তাহারা উহা ঠিক ধরিতে পারেন না—উহা ঠিক প্রকাশ করিতে পারেন না। একটী হইলে এই বিশ্বের কোন না কোনস্থানে উহাকে খুঁজিয়া পাইতেন, কিন্তু এক বলিয়া নিজকে উহার সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু উহা ঠিক ধরিতে পারেন না। তাই তাঁহারা সদাই নিজকে বিরহের আনন্দে মিশাইয়া রাখেন। পারস্যের মহাকবি হাফেজ এই শ্রেণীভুক্ত; ভারতের মহাকবি কালিদাস এই শ্রেণীভুক্ত; বাঙ্গলা দেশের বর্ত্তমান কবি রবিন্দ্রনাথ এই শ্রেণী ভুক্ত।

আর এক শ্রেণীর কবি সৌন্দর্য্যের খেলার সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিতও দেখিতে পান। তাঁহাদের মতে এই বিশ্বের মহাকাব্য শুধু সৌন্দর্য্যের খেলাতেই সীমাবদ্ধ নহে, এতে কুৎসিতের খেলাও আছে। তাঁহারা মনে করেন, শুধু সৌন্দর্য্যে সুন্দরের অনুভূতি ঠিক হয় না, তাহার সঙ্গে কুৎসিতও আবশ্যক। কালোর পাশে সাদা থাকিলে দুইটার বিভিন্নতা যেমন ভাল করিয়া অনুভব করা যায়, তেমনি সুন্দরের পাশে কুৎসিতকে স্থাপন করিলে, সুন্দরের অনুভূতি ভাল হয়। তাই তাঁহারা সুন্দর ও কুৎসিতকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়া জগতের সম্মুখে ধরেন।

আর একটা কথা রহিল। যে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ও সৃষ্টি লইয়া কবিত্ব, যাহা কবির জীবন—সেই সৌন্দর্য্য কি? কেহ বলেন প্রেমই সৌন্দর্য্য (Love is Beauty) আবার কেহ বলেন বিশ্বনিয়ন্তাই সৌন্দর্য্য (God is Beauty)। এই বিশ্বের উত্থান ও পতনের অন্তরালে, ভাঙ্গা ও গড়ার ভিতরে যে এক মহা শক্তি আছে, সেই শক্তিই বিশ্বনিয়ন্তা—সেই শক্তিই খোদা, সেই শক্তিই ঈশ্বর। কবি এই বিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন না, ইহার অন্তরালে যে এক অসীম সৌন্দর্য্য আছে, তাই দেখিয়া মুগ্ধ হন। আমার মনে হয়; এই প্রকৃতির ক্ষীণ আবরণের অন্তরালে, যে এক লুক্কায়িত মহাশক্তি—সেই শক্তিই সৌন্দর্য্য। ঐ যে অসীম মহাশক্তি—উহাই সৌন্দর্য্য, উহাই প্রেম। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য হইতে আমরা আসিয়াছি, সেই অনন্তের প্রেম সাগর হইতে জলবুদ্বুদের মত ফুটিয়া উঠিয়াছি—অবার আমরা তাহাতেই লীন হইব। তাই আমরা সৌন্দর্য্য এত ভালবাসি, তাই আমরা এত প্রেমিক হইতে পারি। তাই আমরা কবিদের এত আদর করি। তাঁহারা আমাদের সম্মুখে ঐ অসীম সৌন্দর্য্য, ঐ অপার প্রেমরাশি ব্যক্ত করিয়া দেন। তাই বলি কবিই ধন্য! তাই বলি কবিই শ্রেষ্ঠ মানব! তাই বলি কবির জয় হউক!

এস, এম, আকবরউদ্দীন।

তাবাকাতে এব্‌নে সায়াদ।

মোহাম্মাদ এব্‌নে সায়াদ জোহরী হিজরী ৩য় শতাব্দির স্বনামধন্য ঐতিহাসিক। ২৩০ হিজরী সনে বাগদাদ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাসুলে করিম, সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ১২শ খণ্ডে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, ইহাই "তাবাকাত" নামে বিখ্যাত। ঐতিহাসিক এবং মোহাদ্দেস মণ্ডলির নিকট ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। ঐতিহাসিকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে ইহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে ইহার বর্ণনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাবা-

কাতের পর আরও বহু গ্রন্থ, এই বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটিই তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই অতুলনীয় গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর কোন এক পুস্তকাগারেই বর্ত্তমান ছিল না। সুতরাং এ পর্য্যন্ত কেহই এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই, স্বণামখ্যাত জর্ম্মাণ অধ্যাপক সাখ্‌ এবিষয়ে প্রাণপণ করিলেন, এবং মিশর ইউরোপ কনষ্টাণ্টিনোপল মন্থন করিয়া এই রত্ন উদ্ধার করিলেন, তিনি অশেষ পরিশ্রম এবং বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়া তাবাকাতের বিভিন্ন খণ্ডের একাধিক হস্তলিপি সংগ্রহ করিলেন। জর্ম্মাণ সম্রাট ইহা অবগত হইয়া গ্রন্থ সঙ্কলন ও মুদ্রনের জন্য ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। তখন প্রাচ্য ভাষাবিদ জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ দ্বারা একটা মণ্ডলি গঠিত হইল, তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রমের সহিত হস্তলিপিগুলি পরস্পর মিলাইয়া বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করেন, এবং বহুস্থানে মূল্যবান টীকা সংযোজিত করেন, এইরূপে ক্রমান্বয়ে যে খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্ট কাগজে বিশেষ পরিপাটিরূপে লিডনের বেরিণযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

এব্‌নে খান্‌লাকাণ লিখিয়াছেন "তাবাকাত ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থকার তাঁহার সমসাময়িক খলিফাদিগের অবস্থা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন" কিন্তু জর্ম্মণ পণ্ডিত মণ্ডলি মাত্র ১২ খণ্ড উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ধৃত খণ্ডগুলিতে খলিফাদিগের সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ শেষখণ্ডদ্বয় তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। অথবা এব্‌নে খালনাকান স্বয়ং তাবাকতে না দেখিয়া অপরের নিকট শুনিয়া ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এব্‌নে খালনাকানের গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে এব্‌নে খালনাকান সম্বন্ধে ঐরূপ সন্দেহ করা কতদূর অন্যায়। যাহাহউক জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ যে ১২ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে এপর্য্যন্ত ১০ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড বহু পৃষ্ঠা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড পুস্তক। পৃষ্ঠায় আকার বড় (ডিমাই ৪ পেজী) প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৮টী লাইন। ১৩২০ হিজরীতে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩০ হিজরীতে শেষ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ পণ্ডিতমণ্ডলির মিলিত চেষ্টা এবং অর্থের প্রাচুর্য্য থাকা সত্বেও ১০ বৎসরে ১০ খণ্ডের অধিক প্রকাশিত করা সম্ভবপর হয় নাই। ব্যাপার কতদূর গুরুতর, ইহা হইতে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

এপর্য্যন্ত যে সকল খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিষয়, পৃষ্ঠা, সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হওয়ার তারিখ এবং মূল্য নিম্নে লিখিত হইল।

১। ১ম খণ্ড ১ম ভাগ রাসুলেকরিমের চরিত সম্বন্ধে। সম্পাদক ডাঃ উচিন মিটাভক, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পৃষ্ঠা ১৬১, ১৩২১ হিজরীতে মুদ্রিত মূল্য ১১৲।

২। ১ম খণ্ড ২য় ভাগ, যন্ত্রস্থ।

৩। দ্বিতীয় খণ্ড ১ম ভাগ রাসুলেকরিমের যুদ্ধাবলি। বার্লিন বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ যোজেফ হারডিক্ সম্পাদিত ১৩৭ পৃষ্ঠা ১৩১৫ হিজরীতে প্রকাশিত মূল্য ১১৲।

৪। ১ম খণ্ড ২য় ভাগ—রাসুলে করিমের শেষ পীড়া, মৃত্যু, সমাধি এবং শোক গাথা। রাসুলের সময় যাহারা কোরআন মজিদ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং মদিনার তাবেয়ীদিগের সম্বন্ধে। সম্পাদক ডাঃ ফ্রেডারিক স্থালী, কেলিস কলেজের প্রাচ্য ভাষা অধ্যাপক। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৩। ১৩৩০ হিজরীতে প্রকাশিত মূল্য ১১৲।

৫। তৃতীয় খণ্ড ১ম ভাগ, বদর যুদ্ধ এবং তাহার মোহাজের যোদ্ধাদিগের বিষয় বার্লিন ওরেয়েন্টিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড আইজাক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৪, ১৩২১ সালে মুদ্রিত, মূল্য ১৫৲।

৬। তৃতীয় খণ্ড ২য় ভাগ বদর যুদ্ধের আন্‌সারী যোদ্ধাগণের বিবরণ। ডাঃ যোসেফ গবডিজ সম্পাদিত। ১৫২ পৃষ্ঠা, ১৩২১ সালে প্রকাশিত, মূল্য ১১৲।

৭। ৪র্থ খণ্ড ১ম ভাগ। অন্যান্য মহাজের ও অনসারদিগের বিবরণ। সম্পাদক, ডাঃ জুনিয়স লেপার্গ, বার্লিন ওরিয়ান্টিয়াল কলেজের আরবী অধ্যাপক, ১৮৫ পৃষ্ঠা ১৩২২ হিজরী। মূল্য ১১৲।

৮। ৪র্থ খণ্ড ২য় ভাগ মক্কা বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহাবীগণের অবস্থা। ডাঃ জলিয়ম রিপর্ট সম্পাদিত। পৃঃ সং—৯৩, ১৩২৫ হিজরী মূল্য ১১৲

৯। ৫ম খণ্ড মদিনার তায়েবীগণ, এবং মক্কা, তায়েফ এমন এমামা, ও বহরায়নের সাহাবী ও তায়েবীগণ সম্বন্ধে। সম্পাদক অধ্যাপক জে ট্রেষ্টি, উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা অধ্যাপক। পৃঃ সং ৪০৫ ১৩২২ হিজরী, মূল্য ১৮৲।

১০। ৬ষ্ঠ খণ্ড কুফা বাসী সাহাবী এবং তাবেয়দিগের সম্বন্ধে, অধ্যাপক জেট্রষ্টীন সম্পাদিত ২৯১ পৃষ্ঠা, ১৩২৫ সালে প্রকাশিত, মূল্য ১৮৲।

১১। ৭ম খণ্ড যন্ত্রস্থ।

১২। ৮ম খণ্ড। মহিলা সাহাবীগণের সম্বন্ধে। সম্পাদক ডাঃ ব্রক্লিম্যান, কোনিস-বার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৫,১৩২১ সালে মুদ্রিত, মূল্য ১৮৲।

প্রকাশিত সমুদয় খণ্ড একত্র গ্রহণ করিলে ১৩০৲। বোম্বাই নগরে বিখ্যাত আরবি পুস্তক বিক্রেতা সুরাটি এণ্ড সন্সের, নিকট প্রাপ্তব্য।

মোহাম্মাদ আবদুল্লাহেল বাকী।

---

* এই প্রবন্ধে যে সকল স্থান এবং ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইয়াছে যেগুলি আরবী ভাষায় লিখিত থাকায় তাহার সংশোধন করিবার কোন উপায় সঙ্কলয়িতার হাতে নাই।

মোসলেম বীরাঙ্গনা

(৫)

"তাজোকে জাহাগিরী" تزک جہانگیری গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, সম্রাট বাবর, কাবুল, সমরকন্দ ও ফরগনা ইত্যাদি স্থান বিজয় করিয়া যে যশঃগৌরব লাভ করিয়াছিলেন তাহার মূলে তদীয় সৈনিক বিভাগের মোসলেম বীরাঙ্গনা কুলের কৃতিত্ব উপেক্ষার বিষয় ছিল না। তিনি অনেক যুদ্ধে এবং ভীষণ বিপদসঙ্কুল অবস্থায় তাঁহার বীরাঙ্গনা সৈনিকগণের সহায়তায় জয়যুক্ত ও বিপদমুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নূরজাহান বেগম।

নূরজাহান বেগম তৈমুর ও বাবরের বংশধর ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি যে তাঁহাদের কুলবধু ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মোগল রাজান্তঃপুরে থাকিয়া তিনি যে সৎসাহস বীরত্ব, ধৈর্য্য ও সামরিক কৌশল ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে তাহা পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। নূরজাহানের জীবনী আলোচনায় জানা যায়, তিনি অত্যন্ত মৃগয়া প্রিয় ছিলেন। তিনি সচরাচর গজারোহণে মৃগয়ার্থে যাতায়াত করিতেন। স্বহস্তে ব্যাঘ্র, বরাহ ও মৃগাদি জীব জন্তু শিকার করিতেন। তিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় ও বন্দুক ব্যবহারে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তিনি অনেক সময় এক গুলির আঘাতে ব্যাঘ্র শিকার করিয়া সম্রাটের নিকট সুযশ ও প্রশংসা লাভ করিতেন, সম্রাট জাহাঁগীর স্বপ্রণীত "তোজোকে জাহাগিরী" গ্রন্থে নূর জাহানের বীরোচিত শিকার কাহিনী লিখিতে বিশেষ আমোদ ও আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি উক্ত পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমি একদা মৃগয়ার্থে গিয়াছিলাম, একটী হস্তী-পৃষ্ঠে আমি ও শিকারী রুস্তম খাঁ আরোহণ করিয়াছিলাম এবং অন্য হস্তী পৃষ্ঠে বেগম নূর জাহান উপবিষ্টাছিলেন। আমাদের সম্মুখস্থ বনে ব্যাঘ্র লুক্কায়িত ছিল। হস্তী ব্যাঘ্রের গন্ধ পাইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। এমতাবস্থায় বন্দুকের নিশানা ঠিক রাখা কিরূপ গুরুতর ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। হস্তী পৃষ্ঠের হাওদা হইতে লক্ষ্য স্থির রাখা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা। শিকার কার্য্যে আমার পর রুস্তম খাঁই অব্যর্থ লক্ষ্য শিকারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে অনেক সময় ভীত হস্তী পৃষ্ঠ হইতে তাঁহাকেও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। সময় সময় তাঁহার ৩।৪টী গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নূরজাহান বেগমকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। তিনি অনেক সময় হস্তী পৃষ্ঠে বসিয়া একই গুলির আঘাতে ব্যাঘ্র শিকার করিতেন। তিনি অব্যর্থ লক্ষ্য শিকারী ছিলেন। (১)

(১) تزک جہانگیری তোজকে জাহাঁগিরী ২৭০ পৃঃ

আর একবার নূরজাহান সম্রাট জাহাঁগীরের সহিত মৃগয়ার্থে গমন করিয়াছিলেন। তিনি হস্তী পৃষ্ঠে উপবিষ্টা ছিলেন, হঠাৎ পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য হইতে এক যোগে ৪টি ব্যাঘ্র তাঁহাদের উপর আপতিত হইল, কিন্তু নূরজাহান তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত বা ভীত না হইয়া পূর্ণ ধৈর্য্য ও বীরত্বের সহিত তাহাদের প্রতি গুলি চালনা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত একএকটী গুলির আঘাতে দুইটী ব্যাঘ্র শিকার করিলেন এবং দুই দুইটী গুলির আঘাতে অপর দুইটী ব্যাঘ্রকে বধ করিলেন। জাহাঁগীর তাঁহার এই অপূর্ব্ব বীরত্বের জন্য পরমানন্দিত হইয়া বেগমকে বহু মূল্যের জহরাত ও অলঙ্কারাদি পুরস্কার প্রদান করিলেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ দরবারের জনৈক কবি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত তাঁহার সদ্যরচিত নিম্নের পার্সী কবিতাটী সর্ব্ব সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন; যথা—

نور جہان گرچہ بصورت زن ست
درصف مردان زن شیر افگن ست —

অর্থাৎ—নূরজাহান যদিও, নারী আকৃতিতে কিন্তু তিনি পুরুষ শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইলে তিনি "শের আফগান" (ব্যাঘ্র জয়ী) মহিলাই বটেন। পাঠকগণের অবিদিত নাই,:নূরজাহান পূর্ব্বে "শের আফগান" উপাধিধারী আলী কুলি খাঁর পত্নী ছিলেন, সুতরাং কবিতায় "শের আফগান মহিলা" বাক্যটী দ্বি-অর্থ বাচক অথচ বেগমের বীরত্বের প্রশংসাসূচক হওয়ায় সাহিত্যের হিসাবে নিতান্তই দুরভাবোদ্দীপক কবিতা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাতে এক দিকে যেমন নূরজাহানের বীরত্বের প্রশংসা করা হইয়াছে, প্রকারান্তরে তাঁহার অতীত জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাই বলিয়াছি, কবিতাটী দ্ব্যর্থ বাচক চমৎকার ভাবোদ্দীপক হইয়াছে।

সম্রাট জাহাঁগীরের রাজত্বের শেষ ভাগে নূরজাহানের সহোদর আছেফ খাঁর ষড়যন্ত্রে মন্ত্রীবর মহাবত খাঁর সহিত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কাহারও সদ্ভাব ছিল না। আছেফ খাঁ সর্ব্বদা মহাবত খাঁর অবমাননার কৌশল উদ্ভাবনেই তৎপর থাকিতেন। একবারকার ঘটনা এই যে, সম্রাট জাহাঁগীর ভাট তীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। আছেফ খাঁ এক দিবস পূর্ব্বেই সসৈন্য নদী পার হইয়া গিয়াছিলেন। মহাবত খাঁ এই স্বর্ণ সুযোগে সম্রাটকে একাকী পাইয়া গেরেফ্‌তার করিলেন। নূরজাহান কৌশলে নদী পার হইয়া রাজকীয় সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে নানাপ্রকারে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অদূরদর্শিতা এবং অসাবধানতা নিবন্ধন যে সম্রাট বন্দী হইলেন তজ্জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। সৈনিক পুরুষগণ সকলেই এক বাক্যে স্থির করিলেন, পর দিবস উঁহারা সকলেই নূরজাহানের নেতৃত্বাধীনে সম্রাটকে উদ্ধার করিবার জন্য নদী অতিক্রম করিবেন এবং মহাবত খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। পর দিবস প্রাতঃকালে সৈন্যগণ রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নদী অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। মহাবত খাঁ পূর্ব্বেই নদীর সেতু নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রাতে সৈন্যগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নদী অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। মহাবত খাঁর পূর্ব্বেই নুরজাহানের অশ্বারোহী সৈন্যদল নদী গর্ভে অশ্ব সাতরাইয়া দিল। হস্তী আরোহী সেনাপতি ও অমাত্যগণও স্ব স্ব হস্তী নদী গর্ভে ধাবিত করিলেন। নুরজাহান নিজেও একটী হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্টা ছিলেন, তাঁহার সমভিব্যাহারে শাহজাদা সহরেয়ারের ভগিনী ও শাহনওয়াজের কন্যাও উপস্থিত ছিলেন, রাজকীয় সৈন্যদল নদীগর্ভে থাকিতেই মহাবত খাঁ তাহার দলভুক্ত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। নদীগর্ভে দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সৈন্যদলের মধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। নুরজাহান সেনাপতি খাজা আবুলহাসন ও মোতমদ খাঁকে ভৎর্সনা করিয়া আদেশ দিলেন, তোমরা এখনও নীরব কেন? তোমরা মহাবত খাঁর সৈন্যদলকে পালটা আক্রমণ করিতেছ না কেন? যে কোনরূপেই হউক নদী পার হইয়া শত্রু শিবির আক্রমণ করিতেই হইবে। মহাবত খাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল অগ্রসর হইয়া বেগম নুরজাহানের হস্তী অবরোধ করিল হাতীর হাওদা মুসলধারে বর্ষিত তীরের আঘাতে জীর্ণ ও ছিন্ন হইতে লাগিল। হাওদার একটী عماري অর্থাৎ চতুর্দ্দিকের ঘেরাও এর পর্দ্দা ভেদ করিয়া তীর সমূহ অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে লাগিল। শাহজাদীর বাহুমূলে একটী তীর বিদ্ধ হইল, রক্তে হাওদা রক্তাক্ত হইয়া গেল। নুরজাহান স্বহস্তে শাহজাদীর ক্ষত স্থান হইতে তীর বহিষ্কৃত করিলেন। ইহার ক্ষণেককাল পরেই নুরজাহানের সঙ্গের খাজাসারা অন্য একটী তীরের আঘাতে নিধন প্রাপ্ত হইল। নুরজাহানের হস্তী অবিশ্রান্ত তীরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। হস্তী পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। অতি কষ্টে তাহাকে পুনরায় শিবির সন্নিকটে আনয়ন করা হইল। হস্তী পলায়ন না করিলে নুরজাহান স্বয়ং যুদ্ধ করিতে বিরত হইতেন না ইহা নিশ্চিত, কারণ তিনি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াই রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। (১)

হামিদ বেগম জাহাঁগিরের সময় দৌলতাবাদের দুর্গ নেজামুল মুলকের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ছিল। হামিদ খাঁ হাবশী নেজামুল মুলকের দরবারে উকিল ছিলেন। রাজান্তপুরে হামিদ খাঁর স্ত্রীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার স্ত্রী একজন সাধারণ শ্রেণীর নারী ছিলেন বটে, কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রাখর্য্য ও অসাধারণ কৌশল চাতুর্য্যে তিনি ক্রমে নেজামুল মুলকের দরবারে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি করিয়া লইয়া ছিলেন যে, উক্ত মহিলার সওয়ারী বহির্গত হইলে রাজ দরবারের অমাত্য সেনাপতি ও আমির ওমরাগণ সকলেই তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইতেন। নেজামুল মুলক তখন হামিদ খাঁ ও তাহার স্ত্রীর ইঙ্গিতেই চালিত হইতেন। এ সময় আদেল খাঁ একদল প্রবল সৈন্য নেজামুল-মুলকের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নেজামলমুলক, কাহার নেতৃত্বাধীনে সৈন্য চালনা করিয়া শত্রুপক্ষের গতিরোধ করিবেন তাহা তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। হামিদ বেগমের

(১) তজোকে জাহাঁগিরী ৪০৪,৪০৫ পৃষ্ঠা।

প্রস্তাব মতে অবশেষে তাঁহাকেই সেনাদলের অধিনায়িকা রূপে সম্মুখ সমরে প্রেরণ করিলেন। হামিদবানু তাঁহার সৈন্যদিগকে মধ্যপথে যথেষ্টরূপে পুরস্কার বিতরণে সন্তুষ্ট ও উৎসাহিত করিলেন। উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইলে, হামিদবানু স্বয়ং রণসাজে সজ্জিতা হইলেন এবং অটল পর্ব্বতের ন্যায় নিজ সৈন্যদলের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক অসীম সাহস ও অটল ধৈর্য্যের সহিত সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। তিনি কোন সৈন্যকে একপদও পশ্চাৎপদ হইতে দিলেন না। যুদ্ধ ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর আদেল শাহের সৈন্যদল পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। তাঁহার সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। তাহাদের প্রচুর হস্তী, ঘোড়া, কামান, বন্দুক ও যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র রণক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিল। 'তজোকে জাহাঁগিরের পরিশিষ্টে মির্জ্জা হাদী এই বীরাঙ্গনা হামিদ বেগমের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

পুঁজী খাতুন বিজাপুরের আদেল শাহী বংশের প্রথম নরপতি বাদশাহ ইউসফ আদেল শাহের স্ত্রীর নাম পুঁজী খাতুন। আদেল শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার অপরিণত বয়স্ক পুত্র এস্‌মাইল আদেল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, এসময় দাক্ষিণাত্যের কামাল খাঁ প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া রাজ্যটী আত্মসাৎ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। রাজ-মাতা পুঁজীখাতুন মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া কমাল খাঁকে পদচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজপুরুষ ও দেশের অভিজাত বর্গ সকলেই কামাল খাঁর বশীভূত ছিল, প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে কিছুই করিবার উপায় ছিল না। পুঁজী খাতুন একটি গুপ্ত উপায় স্বয়ং উদ্ভাবন করিলেন। ইউসফ তোক নামক এক ব্যক্তিকে গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে কৌশলে কামাল খাঁর সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। ইউসফ কামাল খাঁকে লইয়া নির্জ্জনে একই ছুরিকাঘাতে তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। এবং পরক্ষণে সেখানে হত হইয়া নিজেও নিহত হইল। কামাল খাঁর স্ত্রী স্বীয় পুত্র ছফদর খাঁকে ডাকিয়া পুঁজী খাতুন ও এস্‌মাইল আদেলশাহের বিরুদ্ধে অবিলম্বে অভিযান করিতে আদেশ দিলেন এবং কামাল খাঁর মৃত্যু সংবাদ আপাততঃ চাপাদিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন।

পুঁজী খাতুন তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযানের বিষয় পূর্ব্বেই স্থির নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য তিনি প্রথমতঃ দুর্গস্থিত সৈন্যদিগকে বশীভূত করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। যাহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইল না, তাহাদিগকে তিনি দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। বলা বাহুল্য যে তিন শত সৈন্যের মধ্যে ২৫০ জন মোগল এবং তিনশত হাবশী সৈন্যদলের মধ্যে মাত্র ১৭ জন সৈন্য পুঁজী খাতুনের পক্ষ সমর্থন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল, অবশিষ্ট সকলেই কামাল খাঁর পক্ষাবলম্বন জন্য দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পুঁজী খাতুন তাঁহার ২।৩ শত মাত্র সৈন্যের সাহায্যে অবিলম্বে দুর্গের সংস্কারসাধন করিলেন এবং তাহাদিগকে দুর্গের ছাদে দাঁড় করাইয়া দিলেন। পুঁজী খাতুন, ইউসফ আদেলশাহের ভগিনী প্রভৃতি রাজন্তঃপুরেরও কতিপয় মহিলা সমভিব্যহারে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ছাদে দণ্ডায়মান হইলেন। কামাল খাঁর পুত্র ছাদের খাঁ একদল প্রবল সৈন্য লইয়া দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইল, পুঁজী খাতুন, দেলশাদ আগা ও অন্যান্য সিপাহীগণ অবিশ্রান্ত তীর বর্ষণ করিয়া ছাদের খাঁ ও তাহার সৈন্যদলকে ব্যতিব্যস্ত ও বিষম ক্ষতিগ্রস্ত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মোস্তফা আকা নামক আদল শাহী রাজবংশের একজন রাজভক্ত হিতৈষী অভিজাত ৫০জন গোলন্দাজ সৈন্যসহ পুঁজী খাতুনের সাহায্যার্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোলন্দাজ সৈন্যগণ দুর্গের ছাদ হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। ছাদের খাঁ অনন্যোপায় হইয়া বৃহৎ কামানের সাহায্যে দুর্গ ধ্বংসের উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুঁজী খাতুন শত্রুপক্ষের এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তিনি হতাশ না হইয়া তাহার স্বভাবসুলভ বুদ্ধি প্রাখর্য্যদ্বারা একটা নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার সমুদায় সৈন্যদিগকে ছাদ হইতে নিম্নদেশে নামাইয়া দিলেন। মাত্র পুঁজী খাতুন এবং অপর কতিপয় স্ত্রীলোক সহ তিনি দুর্গের ছাদে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ইহাতে ছাদের খাঁ মনে করিলেন পুঁজী খাতুনের সৈন্যগণ, নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকদিগকে ছাড়িয়া সকলেই পলায়ন করিয়াছে। ইহাতে ছাদের খাঁ দুর্গ ধ্বংসের জন্য বৃহৎ কামান ব্যবহারের সংকল্প ত্যাগ করিয়া নিজ সৈন্যদিগকে দুর্গ আক্রমণ জন্য আদেশ করিলেন। তাহারা ভীম বিক্রমে দুর্গের বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ছাদের খাঁ দুর্গের অন্তর দ্বার ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তরদেশে প্রবেশে উদ্যত হইলে পুঁজী খাতুনের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তাঁহার অক্ষতদেহ সৈন্যগণ সিংহবিক্রমে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণই নিশ্চিন্ত ছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, বিনা বাধাতেই তাহারা দুর্গাধিকার করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু আকস্মিকভাবে তাহারা আক্রান্ত হওয়ায় বহুসংখ্যক লোক হতাহত অবস্থায় ধরাশায়ী হইল। হতাবশিষ্টগণ পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। পুঁজী খাতুন সহজে জয়লাভ করিয়া আদেল শাহী বংশের রাজ্য রক্ষা করিলেন। (১)

চাঁদ বিবী　নেজাম শাহী বংশ দাক্ষিণাত্যে প্রায় ১২৫ বর্ষ কাল নিতান্ত সফলতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আহমদ নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। চাঁদ খাতুন বিবী ওরফে চাঁদবিবী নেজাম শাহী বংশের কন্যা এবং আদেল শাহী বংশের কুলবধূ ছিলেন। আলী আদেল শাহ তাঁহার স্বামী, নিজাম শাহ বাহরী তাঁহার পিতা, তিনি ভারতের প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট আকবরের সহিত যেরূপ ধৈর্য্য ও সৌর্য্যবীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থানে তাহার সামান্য আভাস দেওয়া হইল।

১) তারিখে ফেরেস্তা ২য় খণ্ড ১১৬।১১৭ পৃষ্ঠা

আকবর ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অংশ অধিকারভুক্ত করার পর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া প্রথমতঃ শাহজাদা মোরাদ ও মন্ত্রীপ্রবর খান খানানের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করিলেন। এ সময় আহমদ নগরের সিংহাসনে বোরহান নেজাম শাহ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বেরার প্রদেশ আক্‌বরের হস্তে সমর্পন অভিপ্রায়ে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু বেরার প্রদেশে আক্‌বরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই নেজাম শাহ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শাহজাদা মোরাদ ও সেনাপতি খান খানান গুজরাটে অবস্থান পূর্ব্বক সুযোগের অন্বেষণে ছিলেন। এ সময় বোরহান শাহের স্থলাভিষিক্ত এব্রাহিম শাহ গৃহবিবাদে নিহত হইলেন। অতঃপর মনঝু খাঁ আহেঙ্গ খাঁ ও এখলাছ খাঁ এই তিন আমিরের মধ্যে নিজাম শাহী সিংহাসনের স্বত্বাধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। প্রত্যেকই স্ব স্ব পক্ষের একএক জনকে বাদশাহ নির্ব্বাচিত করিয়া আত্মকলহে প্রলিপ্ত হইয়া পড়িলেন। রক্তপাতেরও বিরাম ছিল না। মনঝু খাঁ বিরক্ত হইয়া মোরাদ খাঁকে দেশাধিকার দেওয়ার জন্য সাদরে আহ্বান করিলেন। শাহজাদা এই স্বর্ণসুযোগে স্বার্থোদ্ধার জন্য বিনা আপত্তিতে অগ্রসর হইলেন। খান খানান, শাহ রোখ মির্জ্জা, শাহবাজ খাঁ, রাজা জগন্নাথ, রাজা দুর্গাদাস, রাজা রামচন্দ্র প্রভৃতি সেনাপতি ও আমির ওমরাগণ সমভিব্যাহারে শাহজাদার অনুসরণ করিলেন। আক্‌বর বাহিনী আহমদ নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে মনঝু খাঁ তাঁহার অদূরদর্শিতার বিষয় চিন্তা করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন, কারণ তিনি ইত্যবসরে তাঁহার সমুদায় বিরুদ্ধবাদীদিগকে দমনপূর্ব্বক একচেটিয়া ক্ষমতা প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিরূপায় হইয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এ সময় নেজাম শাহী রাজ্য রক্ষার জন্য আর কেহ চিন্তা করিবার লোক ছিল না। বিশেষতঃ সম্রাট আক্‌বরের বীর্য্যবন্ত প্রবল বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে, এরূপ সাহস ও প্রাণের বলও কাহারও ছিল না এবং নাথাকাই স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কিন্তু চাঁদ খাতুন চতুর্দ্দিকের অবস্থা দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায় এরূপ অসহায় অবস্থাতেই কি নেজামশাহী বংশের রাজ্য ও স্বাধীনতা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? নিজামশাহী বংশের গৌরবসূর্য্য চিরকালের তরে অস্তমিত হইয়া যাইবে? তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন, যে কোন প্রকারেই হউক, পিতৃরাজ্য রক্ষা করিব, স্বদেশের গৌরব ও স্ববংশের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে একবার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিয়া দেখিব।

তিনি এই সংকল্প করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী আমির ওমরাদিগকে দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, কতক বিভিন্ন মতের ওমরাদিগকে নানারূপ যুক্তি তর্ক এবং একতা ও স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনাময়ী উপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া বশীভূত করিয়া লইলেন। গোলকুণ্ডার কুতুব শাহ এবং বিজাপুরের আদেল শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনী হইলেন। দুর্গের সংস্কার বিধান ও সংরক্ষণকল্পে যে সকল উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র ক্রটী করিলেন না। চাঁদ খাতুন এই সমস্ত উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিয়া

শাহ জাদা মোরাদ ও খান খানের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শাহজাদা মোরাদ ৩০শে রবিয়স্সানী ১০০৪ হিজরী অব্দে, সসৈন্যে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চাঁদখাতুন নিজ সৈন্যদিগকে কামান দাগিবার আদেশ প্রদান করিলেন। মোরাদ সারাটা দিন দুর্গমূলে পহুছিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। দলের পর দল সৈন্য সম্মুখে অগ্রসর করিতে লাগিলেন, কিন্তু চাঁদখাতুনের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের ফলে তাহারা কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সন্ধ্যার সময় মোরাদ ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া কিছুদূর পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিবস প্রত্যূষে শাহজাদা মোরাদ, শাহ রোখ মির্জ্জা, খান খানান, শাহবাজ খাঁ রাজা জগন্নাথ প্রভৃতি প্রবীন ও প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণ মরুচাবন্দী হইয়া দুর্গের চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়া লইলেন। নেজাম শাহী ও মোরাদের মধ্যে কেহ কেহ ভীম বিক্রমে অগ্রসর হইয়া দুর্গের সাহায্যকল্পে যাইতে প্রয়াসী হইলেন বটে, কিন্তু খানখানানের সামরিক কৌশলে সমস্তই ব্যর্থ হইল। খানখানান ও শাহজাদা মোরাদ মাসাধিককাল এইভাবে দুর্গাবরোধ করিয়া নিত্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু চাঁদখাতুনের অসাধারণ ধৈর্য্য সাহস ও বুদ্ধিকৌশলে তাঁহাদের কোন চেষ্টাই কার্য্যকরি হইল না।

ইত্যবসরে চাঁদখাতুনের অনুরোধক্রমে আদেল শাহ ২৫ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার সাহায্যকল্পে প্রেরণ করিলেন। অন্যদিকে কুতুব শাহ ৫।৬ হাজার অশ্বারোহী এবং কতক পদাতিক সৈন্য চাঁদবিবীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বোল্লেখিত মনস্থ খাঁ এখ্লাছ খাঁ ও আহেঙ্গ খাঁ এই তিন আমিরও এই সাহায্যকারী সেনাদলে যোগদানপূর্ব্বক বাহিনীর বলবিধান করিয়াছিলেন। শাহজাদা মোরাদ এই নূতন সৈন্যদলের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত চিন্তাতুর ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাহার সেনাদলের মধ্যে একটা হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, শাহজাদা ও তাঁহার সেনাপতিগণের পরস্পর আলাপ পরামর্শে স্থির হইল, এই সাহায্যকারী সৈন্যদল গন্তব্য স্থানে পৌছিবার পূর্ব্বেই যে কোনপ্রকারে দুর্গ জয় করিতে হইবে।

আকবর-বাহিনী বুঝিতে পারিল, চাঁদ খাতুনের সহিত প্রকাশ্য রণভূমিতে যুদ্ধ করিয়া দুর্গাধিকার করা সম্ভবপর হইবে না, কিন্তু তাহারা তিন মাসকাল দুর্গাবরোধের অবসর সময়ের মধ্যে তাহাদের শিবির সন্নিবেশের স্থান হইতে দুর্গের প্রাচীর মূল পর্য্যন্ত ভূগর্ভে ৫টা সুড়ঙ্গ খননপূর্ব্বক তাহাতে বারুদ পুরিয়া দিলেন, এবং সুযোগমতে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিবেন ইহাই স্থির করিলেন। চাঁদবিবী নিতান্ত চতুর ও অনুসন্ধিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি গুপ্ত অনুসন্ধানে এ সকল সুড়ঙ্গের তত্ত্বোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সুকৌশলে সুড়ঙ্গের বারুদসমূহ বহিস্কৃত করিয়া তাহা মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। দুইটীর মাটি পূরণ কার্য্য শেষ হইয়াছে, তৃতীয়টীর কার্য্যারম্ভ হইয়াছে ইতঃমধ্যে শাহজাদা মোরাদ তাঁহার খনিত সুড়ঙ্গের পূরিত বারুদে অগ্নিসংযোগের আদেশ প্রদান করিলেন। শাহজাদা একাকী দুর্গ বিজয়ের গৌরবের অধিকারী হইবার প্রত্যাশায় খানখানানের সহিত

কিছুমাত্র পরামর্শ না করিয়াই নিজ রাজপুত ও মোগল সৈন্যদিগকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিলেন। সুড়ঙ্গে অগ্নিসংযোগ করা মাত্রই ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ হইল, ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ন্যায় মেদিনী থর থর কম্পিত হইতে লাগিল, আকাশ পাতাল ভাঙ্গিয়া যেন সমস্তই চুরমার হইতে লাগিল। দুর্গের লোকজন মহা প্রলয়ের ভীষণকাণ্ড দর্শনে সকলেই ভীতিবিহ্বল হইয়া এদিক সেদিক বিছিন্নভাবে পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে ৫০ গজ পরিমিত দুর্গ প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়া পড়িল। দুর্গে এক মহা গণ্ডগোল ও হুলস্থূল পড়িয়া গেল, শাহজাদার সৈন্যদল নূতন উৎসাহে, উদ্দীপিত হইয়া ভীমবিক্রমে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। চাঁদখাতুন এই মহাবিপদে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অবিলম্বে রণসাজে সজ্জিতা হইয়া মুক্তরবারি হস্তে অশ্বারোহণে দুর্গের ভগ্ন প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে বহুসংখ্যক অনলবর্ষী কামান সংস্থাপনপূর্ব্বক কতিপয় পারদর্শী গোলন্দাজ সৈন্যকে গোলাবর্ষণের আদেশ প্রদান করিলেন। চাঁদবিবীর ধৈর্য্য সাহস বিক্রম দর্শনে তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই আবার নব-উৎসাহ ও নবউদ্যমে রণক্ষেত্রে যোগদান করিলেন। শাহজাদা মোরাদ ইত্যবসরে অপর দুইটী সুড়ঙ্গে অগ্নিসংযোগ করিয়া পুনরায় দুর্গে প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন—কিন্তু তিনি অবিলম্বেই চাঁদখাতুনের অপূর্ব্ব চাতুর্য্য ও বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। সমস্ত দিন উভয় পক্ষে তীর ধনু বন্দুক ও কামান দ্বারা ভীষণরূপে যুদ্ধ চলিল, চাঁদ খাতুন তাহার সৈন্যগণের পশ্চাতে অশ্বচালনা করিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহাদিগকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিয়া তাহাদের হৃদয়ে নূতন আশা ও নূতন বলের সঞ্চার করিতে লাগিলেন। মোরাদ ও তাঁহার অপর সেনাপতিগণ একযোগে ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও একপদও দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। চাঁদ খাতুন অটল হিমাচলের ন্যায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সৈন্যগণের পশ্চাতে ও পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক অপূর্ব্ব কৌশলে যুদ্ধ চালাইয়া এতাধিক রাজপুত ও মোগল সৈন্যের নিধনসাধন করিয়াছিলেন যে তাহাদের হতাহত দেহস্তুপে দুর্গের পরিখা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় শাহজাদা ভগ্নহৃদয় লইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করতঃ পশ্চাতে শিবির সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। চাঁদ খাতুন নিশাযোগে দ্বিগুণ উৎসাহে দুর্গের ভগ্নাংশের সংস্কার বিধানে মনোনিবেশ করিলেন। ৫০ গজ ভগ্ন প্রাচীরের অংশ নিশা অবশানের পূর্ব্বেই তিন গজ উচ্চ করিয়া তাহার পুনর্নিম্মাণের কার্য্য সমাধা করিলেন।

চাঁদ খাতুনের এই অপূর্ব্ব বীরত্ব অসাধারণ সাহস বিক্রম ও বুদ্ধি কৌশল দর্শনে শত্রু মিত্র সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ সময় হইতে তিনি দেশে চাঁদ সোলতানা নামে অভিহিত হইলেন।

শাহজাদা তাঁহার সমস্ত শক্তি ও উদ্যম শেষ করিয়াও যখন আহমদ নগরের দুর্গাধিকার করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিতান্ত হতাশ ও ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধ পরিচালনা

আর তাঁহার উৎসাহ উদ্যম প্রকাশ পাইতেছিল না। তিনি নিরুপায় হইয়া চাঁদ সোলতানার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু চাঁদ খাতুন তাহাতে প্রথমাবস্থায় সম্মত হইলেন না। কারণ তিনি সেনাপতি ও সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বুঝাইলেন, শত্রুগণের উৎসাহ উদ্যম দমিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, সন্ধির প্রয়োজন নাই, আমাদের জয়লাভ নিশ্চিত, কিন্তু সৈন্য ও সেনাপতিগণ অবিশ্রান্তভাবে কয়েক মাস দুর্গ প্রাচীরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিয়া নিতান্ত ত্যক্ত বিরক্ত ও উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা সকলেই সন্ধির অনুকূলে মত পোষণ করায় চাঁদবিবী অবশেষে মৃত বোরহান শাহের পূর্ব্ব প্রস্তাব মতে বেরার প্রদেশ শাহজাদার হস্তে সমর্পণ করার অঙ্গীকারে সন্ধি স্থাপন করিলেন।

পাঠক একবার চাঁদ খাতুনের আদ্যোপান্ত ঘটনার বিষয় চিন্তা করিবেন। আহমদ নগরের সিংহাসন রাজশূন্য, ওমরা মন্ত্রীদল কলহ বিবাদে লিপ্ত, রাজ পরিবারভুক্ত লোকজন গৃহযুদ্ধে প্রমত্ত, রাজকোষ অর্থশূন্য। সৈন্য সেনা চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন ও বিদায় হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সম্রাট আকবরের ন্যায় প্রবল শক্তিশালী নরপতির বিপুলবাহিনী বহুসংখ্যক প্রবীণ ও সমর নিপুণ সেনাপতিগণের তত্ত্বাবধানে চালিত হইয়া অরক্ষিত আহমদনগরের দুর্গ এরূপ দুঃসময়ে অবরোধ করিয়াছে, এরূপ ভীষণ বিপদসঙ্কুল অবস্থায় দুর্গ রক্ষা করা কিরূপ বিক্রম ও বুদ্ধিমত্তার কাজ, তাহা সহজেই অনুমেয়। বর্ত্তমান ভীরু কাপুরুষ কর্ম্মবিমুখ উৎসাহ উদ্যমহীন মুসলমানগণ কি সেই জাতিরই বংশধর? তাহারা কি সেই মোসলেম সন্তান? যাহাদের মাতৃ জাতীয়দিগের মধ্যে চাঁদ খাতুন, পুঁজী খাতুন ও হামিদা বেগমের ন্যায় বীরপ্রসবিণী নারী বিদ্যমান ছিলেন? হতভাগ্য বঙ্গীয় মুসলমান! স্মরণ কর একবার তোমাদের বীরাঙ্গনা মাতৃকুলের কথা, তোমরা সেই বীরাঙ্গনা কুলের রক্তের উত্তরাধিকারী কিনা একবার ভাবিয়া দেখ!

ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিগত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

ইউরোপ ধর্ম্মের শত্রু কেন ?

প্রফেসার "লারওয়াস্" ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন "যদি আমরা বলিযে, যেসকল বিষয় জ্ঞানে স্থান পায় সে সকল বিষয়ে কি বিশ্বাস স্থাপন করিব ? তবে আমরা তাহার এই উত্তর পাইব "না—কখনই নয়"। এইস্থানে জ্ঞান—যাহার ভাল মন্দের বিচারের শক্তি আছে, তাহাকে অপদস্থ করা হয়। এমন কি শেষে জ্ঞানের চক্ষুকে এতদূর অন্ধ করিয়া ফেলে যে, অলৌকিক ঘটনা একটা মামুলি জিনিষের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে, সাদা কালো হইয়া যায়, সুদৃশ্য কুদৃশ্য হইয়া পড়ে। তখন ধর্ম্ম আসিয়া বলে "মস্তক অবনত কর।" কাহার সম্মুখে ? জ্ঞানের সম্মুখে ? "না" প্রাকৃতিক কর্ত্তব্যের সম্মুখে ? "না"। বিচার-শক্তির সম্মুখে ? "না" প্রকৃতির সম্মুখে ? "না"। (১)

ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত "মসি ও বেণজামিন কনষ্ট্যান" ধর্ম্মের স্বরূপ এবং তাহার উৎপত্তি ও স্থিতিবর্দ্ধন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই পুস্তকে তিনি ধর্ম্মের অপূর্ণতা (অপকারিতা) বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন "যে ভিত্তির উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা জ্ঞানের শত্রু, এই জন্য সকল ধর্ম্মই ধ্বংস হওয়া উচিত"। "বরটডু" লিখিতেছেন, "শিক্ষা এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম আর তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিবেনা। সে ভয় দূর হইয়া গিয়াছে।"

এই সকল মতামত হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ঐ সকল ধর্ম্মে অস্বীকার কারী-দিগের দৃষ্টিতে ধর্ম্মের মূল, জ্ঞানালোচনা পথের পরিপন্থী বলিয়াই তাহা তাহাদিগের সম্মুখে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেনা। নতুবা যদি এমন কোন ধর্ম্ম হয়, যাহার সকল নীতিই জ্ঞানানু-যায়ী ও যুক্তিমূলক তাহা হইলে জড়বাদিগণও সে ধর্ম্ম মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিতেরা এই নীতির উপর ধর্ম্মের এক কাল্পনিক মূর্ত্তী আঁকিয়াছেন, এবং তাহার নাম রাখিয়াছেন। "প্রাকৃতিক ধর্ম্ম" তাঁহারা বলেন যে, "বর্ত্তমান ধর্ম্ম সকল মিথ্যা, কিন্তু নিম্ন প্রদর্শিত নিয়মানুযায়ী যদি একটি নূতন ধর্ম্ম গঠন করা যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে তাহা গ্রহণোপযোগী হইবে, এবং তাহা জ্ঞানের সঙ্গদিতে সক্ষম হইবে।" (২)

প্রফেসার "জোল্‌সিমান" এই কাল্পনিক, জ্ঞানানুমোদিত ধর্ম্মের যে মূর্ত্তী আঁকিয়াছেন নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) তাত্ত্বিক ২৪ পৃঃ। (২) তাত্ত্বিক ২২ পৃষ্ঠা।

"পরকালের পুরস্কারের অর্থ এই যে, মানুষ নীতিনিষ্ঠ হইবে, কিন্তু এই নীতি কি? আত্ম-রক্ষা করা। মানুষের প্রকৃতিতে যে সকল গুণ (স্বভাব) অতি গোপনে রক্ষিত হইয়াছে সে সকলের উৎকর্ষ সাধন করা। মনুষ্যজাতির প্রতি প্রেম এবং তাহাদিগের সেবা করা। আল্লার উপাসনা করা, কিন্তু আল্লার উপাসনার অর্থ কি? স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করা, সৎকর্ম্ম করা, কর্ম্ম এবং শুদ্ধতা ইহাই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, এবং ইহাই প্রাকৃতিক উপাসনা" ইহা গেলে প্রাকৃতিক ধর্ম্মের কার্য্য, পরন্তু তাহার বিশ্বাস এইরূপ "যিনি সকল জিনিসেরই উপর ক্ষমতাবান, কোন শক্তিই যাঁহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হয় না এবং যাঁহার সকল কার্য্যই নিয়ম ও পর্য্যায়ক্রমে সমাধা হয়। মাত্র এমন একজন সর্ব্বশক্তিমান মহা শক্তিধরে বিশ্বাস করিতে হইবে" (১)

"লারওয়েস" সাহেব বলিতেছেন "উক্ত মহোদ্ভব সমষ্টির নামই যদি ধর্ম্ম হয়, এবং সমগ্র মানবজাতিকে একই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করাই যদি তাহার মুখ্যোদ্দেশ্য হয়, এবং যেমন জ্ঞান বলে তাহার আভ্যন্তরীণ অংশ উজ্জ্বল ও শক্তিশালী তাহার বহিরাঙ্গও যদি তদ্রূপ শৃঙ্খলিত ও শক্তি-শালী হয়, তবে সে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, এবং তোমরাও বলিতে পার যে, ধর্ম্ম মনুষ্যের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ" (২)

ফলকথা এই সকল উদ্ভব অনুযায়ীই হইক, কিম্বা স্বভাবতঃ ঘটনা বিপর্য্যয়ানুযায়ীই হউক, একটি সত্য ও পূর্ণ এবং চিরস্থায়ী ধর্ম্মের জন্য যে সকল বিষয় আবশ্যক তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১। জ্ঞানের ভিত্তির উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে, অন্ধবিশ্বাসের বা অনুকরণের উপর নয়।

২। ধর্ম্মের কোন বিশ্বাস জ্ঞানের বিপরিত হইবে না।

৩। কেবল পরকালের উদ্দেশ্যে উপাসনা করা এবং আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম করিলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন, উপাসনার অর্থ কেবল ইহাই হইবে না। বরং উপাসনার দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিকও পার্থিবজীবনের কল্যাণ সাধন হইতে পারে উপাসনার অর্থ এইরূপ হওয়া চাই।

৪। পার্থিব ও পারলৌকিক কর্ত্তব্য সমূহকে এমন সমান অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহাতে একে অপরের ক্ষতিসাধন করিতে না পারে, বরং উভয়ই উভয়ের সমসঙ্গী হইবে।

৫। ধর্ম্ম, নীতি ও সভ্যতার উন্নতি হইতে অধিকতর উন্নতির সঙ্গদিতে সক্ষম হইবে, বরং সে নিজেই এই উন্নতির পথ প্রদর্শক হইবে"

এই নীতির সহিত এসলামের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

---

(১) তাত্ত্বিক ৩০ পৃঃ। (২) তাত্ত্বিক ২৫ ও ২৬ পৃঃ।

জ্ঞান ও ধর্ম্ম।

প্রথমে ইহা দেখা আবশ্যক যে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের নিকট জ্ঞান কিরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং এস্লামই বা তাহাকে কিরূপ অধিকার প্রদান করিয়াছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যতধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে সে সকল ধর্ম্ম এইরূপ আদেশের দ্বারা প্রথম শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে, যথা "ধর্ম্মে জ্ঞানের অধিকার প্রবেশ করাইও না" এই অত্যাচার মূলক আদেশ বশতঃই, ধর্ম্ম বহুবিধ সত্যানুসন্ধান ও সুচেষ্টা হইতে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, এবং এতৎ সমূহের কোনটিই তাহার (ধর্ম্মের) অন্যায় অহঙ্কারের হ্রাস সাধন করিতে সমর্থ হইতেছে না, ইহার এমনই প্রভাব যে এক ব্যক্তি, দর্শন, বিজ্ঞানে, ভূগোল ও অঙ্ক শাস্ত্রে এবং জ্যোতিষে শত শত অদ্ভুত ও অভিনব বিষয় সকল আবিষ্কার করিতেছে "য়্যারিয়ষ্টটল" ও প্লেটোর" কত ভ্রম প্রদর্শন করিতেছে, কিন্তু যখন তাহার সম্মুখে এ বিষয় উপস্থিত করা হয় যে, "একই তিন এবং তিনই এক" তখন তাহার সকল জ্ঞানই, সকল সাধনাই একেবারেই অচল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, ইহারই প্রভাবে "সক্রেটিসের" ন্যায় মহা পণ্ডিতও প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার সময় এইরূপ অন্তিম উপদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "অমুক মূর্ত্তীর (দেবতার) সম্মুখে উৎসর্গ করিব বলিয়া আমি যে সংকল্প (মানৎ) করিয়া ছিলাম, তাহা যেন পূর্ণ করা হয়।" ইহারই প্রভাবে বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে শত শত জ্ঞানী পণ্ডিত সৃষ্ট হইতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মমতের গুরুতর ভ্রম বিশ্বাসের প্রতিও তাহাদের সন্দেহ উৎপত্তি হইতেছে না। জ্ঞানের এইরূপ অকর্ম্মণ্যতায় কেবল যে মিথ্যা বিশ্বাস ও অন্ধ অনুকরণ চিরকালের মত স্থায়ী অধিকার লাভ করিয়া মানবীয় মস্তিষ্ক গুলিকে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা নহে, বরং ইহা হইতে কল্পনা প্রসূত মিথ্যা ও অলৌকিকত্বের উপাসনা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এমন কি কিছু দিন পরে ধর্ম্মের মূলও উত্তম বিশ্বাস সকলও এই কল্পনা প্রাবল্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এবং ধর্ম্মের আপদ মস্তক অলৌকিকত্ব ও অসম্ভবত্ব ময় হইয়া পড়ে। এই জিনিষই ইউরোপের স্বাধীনতা প্রিয় দিগের অন্তরে ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। প্রোফেসার "লারওয়াস্" যাবতীয় ধর্ম্মের ধ্বংসের যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও এই হেতুতেই এই কথা প্রচার করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম জ্ঞানের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত, এই জন্য ধর্ম্মরই ধ্বংস হওয়া উচিত। এই প্রোফেসার মহোদয় অন্যত্র বলিতেছেন, যে, "যদি আমরা আত্মম্ভরিতা ও কল্পনার সেবা পরিত্যাগ করিয়া এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে যাই যে, পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যতদূর পার্থিব, আধ্যাত্মিক ওচরিত্রোন্নোতি সাধিত হইয়াছে ইহার মুখ্যোদ্দেশ্য কি ? তবে ইহার উত্তর এই হইবে যে, অত্যাচারের বন্দীশালা হইতে জ্ঞানের স্বাধীনতা সাধনই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য"

এখন একবার দেখা যাউক যে, এস্লামের শিক্ষা কি ?

পবিত্র কোরআনে "ইহুদি" খৃষ্টান ; মূর্ত্তি উপাসক ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে শত শত স্থানে বিভিন্ন রীতিতে এসলামে বিশ্বাস স্থাপনার্থে আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু এক স্থানেও এমন কথা

বলা হয় নাই যে, "অনুকরণ পূর্ব্বক এই সকল বিষয়ে অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস স্থাপন কর" বরং প্রত্যেক স্থলেই চিন্তা ও অনুধাবন যোগে বিবেকের সাহায্যে তাহাদিগকে স্বীকার করাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এবং যথাসাধ্য অন্ধ অনুকরণ প্রথার দোষোদ্ঘাটন করা হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে এসলাম বিরোধীগণের প্রতি যে সর্ব্ব প্রধান দোষারোপ করা হইয়াছে তাহা এই। (১)

وكاين من اية في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون — سورة — يوسف

"আকাশে ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন আছে যাহার উপর তাহারা সঞ্চরণ করিতেছে, কিন্তু তাহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইতেছে" অর্থাৎ চিন্তা করিতেছেনা।" সুরায় ইয়ুসফ, ১২ রুকু

لهم قلوب لا يفقهون بها —

"তাহাদের অন্তঃকরণ আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহারা বুঝিতে চেষ্টা করেনা"। সুরায় এরাফ, ২২রুকু।

انا وجدنا اباءنا علي امة وانا على اثارهم مقتدون —

(তাহারা বলে যে,):"নিশ্চয় আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে এক রীতিতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের পদচিহ্নের অনুসরণকারী"। সুরায় জোখ্‌রোফ, ২ রুকু।

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم —

"এবং মানব মণ্ডলীর মধ্যে এমন লোক আছে যে, অজ্ঞানতার সহিত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে"·সুরায় হজ্ব ১ রুকু।

افلا يتدبرون القران —

"তাহারা কি কোরানের বিষয় গভীর চিন্তা করেনা" সুরায় মোহাম্মদ, ৩ রুকু।

اولم ينظروا في ملكوت السموات والارض —

"ইহারা কি আকাশ ও পৃথিবীর কার্য্য পদ্ধতি (সৃষ্টিকৌশল) চিন্তার সহিত দেখেনা"

এই সকল উক্তি মোটের উপর কার্য্য সিদ্ধির সাপক্ষে উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ সংসৃষ্ট এসলাম যে শিক্ষা দিয়াছে তাহাও জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মূল ধর্ম্মের আবশ্যকতা এইরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

---

(১) আমাদের সমাজে অধুনা যে নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের ভাব ক্রমশই মারাত্মকরূপে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে,ইহারও একমাত্র কারণ ইহাই। কটু বাক্য প্রয়োগও "কাফকাফের হোগিয়া" বলিয়া কেবল ফৎওয়া না দিয়া ইহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। যুক্তির দ্বারা লোকের মতি পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে,কিন্তু গালাগালির দ্বারা সাধারণতঃ বিপরীত ফল হয়।— সম্পাদক।

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله —
سورة روم ٣ع

"স্বীয় আনন সকল দিক হইতে প্রবর্ত্তিত করিয়া, বিশুদ্ধ ধর্ম্মেরদিকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। ইহা (এই ধর্ম্ম) খোদাতালার (সৃষ্ট) সেই প্রকৃতি যে, প্রকৃতির উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন! খোদার সৃষ্টিতে পরিবর্ত্তন হয় না। (সুরা রুম ৪ রুকু ২৯ আয়াত)

বিশ্বমানবকে এস্‌লাম ধর্ম্মে আহ্বানের আদেশ করিয়া, আহ্বানের এইরূপ নীতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن—سورة نحل—

"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উত্তম উপদেশের সহিত লোক দিগকে আহ্বান কর। এবং উত্তম নিয়মানুসারে তাহাদিগের সহিত বিতর্ক কর"। (সুরায় নহল১৬ রুকু ১২৫ আয়াত)

বিশেষ বিশেষ এস্‌লামিক বিশ্বাস যে যে স্থলে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তৎসংসৃষ্ট যুক্তি প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে। খোদাতালার অস্তিত্বের অনুকূলে এত যুক্তি প্রমাণ উক্ত হইয়াছে যে, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকলের সমাবেশ সম্ভবে না।

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا —

"গগনে এবং ভূমণ্ডলে যদি এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য ঈশ্বর হইত। তবে অবশ্য তাহা স্বর্গ ধ্বংস হইয়া যাইত। (সুরা আম্বিয়া ২ রুকু ২২ আয়াত) আল্লা সর্ব্বজ্ঞ এবং মহাজ্ঞানী, এ সম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

الا يعلم من خلق —

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি জ্ঞান রাখেন না?" প্রেরিত মহাপুরুষের প্রেরিতত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীগণের যে সন্দেহছিল এইরূপে তাহার অপনোদনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

قل ما كنت بدعا من الرسل —

"তুমি বল" প্রেরিত পুরুষগণের (পয়গম্বরের) মধ্যে আমি নূতন কেহ নহি"। সুরায় আহ্‌কাফ ১ রুকু।

পরকালের সত্যতার অনুকূলে এইরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা।—

قل يحييها الذي انشاها اول مرة

"বল যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন" (সুরা এয়াসিন, রুকু ৭৯ আয়াত)

اوليس الذي خلق السموت والارض بقادر — علي ان يخلق مثلهم —

যিনি গগন ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি ইহাদের ন্যায় (মনুষ্যকে কেয়ামতে) পুনরায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। (সুরা এয়াসিন ৮১ আয়াত)

পরকালের আবশ্যকতা এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

افحسبتم انما خلقنكم عبثا و انكم الينا لاترجعون —

"তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে ক্রীড়ারভাবে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমাদিকে তোমরা ফিরিয়া আসিবে না"। (সুরায় মুমেনুন, ৬ রুকু)

ফল কথা, এসলাম ধর্ম্মের মূলই হউক, অথবা তাহার বিশেষত্ব হউক, কিম্বা তাহার বিশেষ বিশেষ বিশ্বাসই হউক, যাহাই হউক না কেন! যখনই যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তখনই তৎ সংসৃষ্ট যুক্তি প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং একস্থানেও এমন কথা বলা হয় নাই যে, "বিনা যুক্তিতে এ বিষয়কে স্বীকার করিয়া লও।

এস্থলে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আজকাল সময়ের ভাবানুযায়ী সকল ধর্ম্মাবলম্বীরাই আপন আপন ধর্ম্মকে জ্ঞানানুমোদিত বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মই ঐরূপ দাবী করিয়াছে অথবা তাহা তাহাদের সকপোলকল্পিত সে সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সাব্যস্ত হইবে যে, "আমি জ্ঞানানুমোদিত ও যুক্তি সম্মত ধর্ম্ম একথা মাত্র এক এসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মই বলিতে সাহসী হয় নাই। পরন্তু মানবের ধর্ম্ম যে যুক্তি অনুমোদিত হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু এই যুক্তি বলে বলিয়ান, ও অন্ধবিশ্বাসের অত্যাচার এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। এই প্রভেদ স্থলে এসলাম অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে স্বাতন্ত্রতা লাভ করিয়া মহা গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে। এবং এতদিন বিশ্বমানব তাহাকে সম্যকরূপে বরণ না করিয়া থাকিলেও এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে, সে ব্যতীত মানবের পথ প্রদর্শক আর কেহই নাই। সুতরাং তাহাকেই গ্রহণ করিয়া মানব স্বীয় জীবনকে সার্থক করতঃ এই দ্বেষ, হিংসা পাপতাপময় ধরাধামে, আবার কিছুদিনের জন্য স্বর্গরাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইবে।

আহমদ আলি।

মোস্তফা চরিতালোচনা

শত্রুর আক্রমণ নিবারণ।

(৯)

(১১) খালেদের দুর্দ্ধর্ষতা।—(অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাস—৬৩০ খৃষ্টাব্দ।
মক্কা মুসলমানাধিকৃত হইলে, হজরত মোহাম্মদের আজ্ঞানুসারে আরবের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম প্রচারার্থ মুসলমান সুধীমণ্ডলী বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্ন পূর্ব্বক এসলামের সৎনীতি, সৎশিক্ষা, সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি বিষয়ে উপদেশ বিতরণ করায় পৌত্তলিক আরবজাতি পৈতৃক ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া দলে দলে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রায় সমগ্র আরবে একমাত্র খোদাতালার উপাসনা প্রচলিত হইল। ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া, ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য কাহারও সহিত যুদ্ধবিগ্রহ হইল না বা মুসলমানেরা কাহারও প্রতি বল প্রয়োগ করিলেন না। কেবল একটীমাত্র স্থানে খালেদের দুর্দ্ধর্ষতা নিবন্ধন এক নিরীহ সম্প্রদায়কে বিনাপরাধে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। নিম্নে আমরা সে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। খালেদ বলবান্, সাহসী, তেজস্বী এবং রণকৌশলজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বুদ্ধি প্রাখর্য্য এবং হিতাহিত বিবেচনা শক্তি তাঁহাতে অধিক ছিলনা ও তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার কৃতকার্য্য জন্য, মুসলমান ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তককে দায়ী বা অপরাধী করা যাইতে পারে না।

ব্যাপার এই যে আরবে বনি জজিমা বা বনি জজারমা নামে এক পৌত্তলিক সম্প্রদায় ছিল। ধর্ম্ম প্রচারকগণের উপদেশ বিতরণের ফলে তাহাদের মধ্যে এসলাম ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিয়া যাইতেছিল। ঘটনা ক্রমে বীরকেশর খালেদ সদল বলে ঐ সম্প্রদায়ের নিকটবর্ত্তী হন। তাহারা খালেদকে বা তাঁহার সঙ্গী সৈন্যগণকে চিনিত না। সুতরাং সহসা অস্ত্রধারী যোদ্ধ পুরুষদিগকে নিকটাগত দেখিয়া শত্রু মনে করিয়া সশস্ত্র ভাবে প্রান্তরে বাহির হইল। কিন্তু খালেদকেও তাঁহার সৈন্যদিগকে মুসলমান বলিয়া চিনিবামাত্র তাহারা নিশ্চল ভাব ধারণ করিল; একপদও অগ্রসর হইল না। খালেদ অগ্রগামী হইয়া নিজপরিচিয় প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞসা করিলেন, "তোমাদের হাতে তরবারি কেন?" তাহারা মুসলমানদিগকে চিনিতে না পারিয়া শত্রু বোধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, বলিয়া কৈফিয়ৎ দিল এবং খালেদের আজ্ঞামাত্র অস্ত্রত্যাগ করিল। তাহাদের বেশেও ব্যবহারে তাহারা যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী তাহা যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহারা মুসলমান কিনা, একথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু অল্প বুদ্ধি খালেদ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন। "তোমরা কি মুসলমান হইয়াছ?" একে খালেদ ভীষণ দর্শন বীরপুরুষ তাঁহাকে দেখিলেই পল্লীবাসী নিরীহ ব্যক্তিগণের অন্তরাত্মা

কাঁপিয়া উঠিত; তাহার উপর অহদযুদ্ধে, মওতারযুদ্ধে এবং মক্কাযুদ্ধে তাঁহার বীরত্বগাথা, আরবের সর্ব্বত্র ব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই খালেদ বর্ম্মে চর্ম্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিতাবস্থায় সম্মুখে সমুপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহার উচ্চ কণ্ঠের বজ্রনাদধ্বনিবৎ প্রশ্ন শুনিয়া বনি জজারমার দলপতি ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া প্রশ্নের উত্তরে এক কথা বলিতে গিয়া অন্য এক কথা বলিয়া ফেলিল। "আসলামনা," (হাঁ মুসলমান হইয়াছি) স্থলে, "সাবানা," (বিধর্ম্মী হইয়াছি) বলিয়া ফেলিল। "বিধর্ম্মী হইয়াছি," এই উত্তরে খালেদের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দিগ্বিদিগ জ্ঞান শূন্য হইয়া, তাহাদের মুখ হইতে কি কথা বাহির হইয়া পড়িল, তাহার সমালোচনা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি তাহাদের সকলের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

ঐ সময়ে খালেদের সমভিব্যাহারে কতক গুলি মহাজের ও কতকগুলি আনসার ছিলেন এবং বনি সলিম সম্প্রদায়ের কতকগুলি অশিক্ষিত নব মুসলমান ছিল। এই বনি সলিমেরা অত্যল্পদিন পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খালেদের সেনারূপে নিয়োজিত হইয়াছিল। মহাজের ও আনসারগণ খালেদের নৃশংশ আদেশ পালন করিলেন না। বনি জজায়মা সম্প্রদায়কে ভ্রান্তিবশে ধৃত করা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা যে সকল ব্যক্তিকে বন্দী করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। খালেদ সেনাপতি হইলেও, তাঁহার অন্যায় আদেশ, মহাজের ও আনসারগণ সদর্পে অবহেলা করিলেন। বনি সলিমেরা খালেদের ক্রীড়া পুত্তলি থাকা বশতঃ বান্দীদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া প্রভুর আদেশের সম্মান রক্ষা করিল।

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ ঐ ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না এবং বনিজজায়মার প্রতি উক্তরূপ নৃশংসতার আদেশও দেন নাই। তিনি ঐ ব্যাপার সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি খালেদের কুতকর্ম্মের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইবামাত্র তাঁহার প্রতি অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন এবং উভয় কর আকাশ পানে উত্থিত করিয়া কাতরভাবে বিনীত বচনে কহিলেন, "খোদাওন্দা! খালেদ যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গ যে আমি জানি না, তাহা তুমি সম্যক্ অবগত আছ। খালেদের দুষ্কর্ম্ম জন্য আমি দুঃখিত ও মর্ম্মাহত।" এই বলিয়া সর্ব্বপাপ পরিত্রাতা খোদাতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তৎক্ষণাৎ বণিজজায়মা সম্প্রদায়কে সান্ত্বনা দিবার ও তাহাদের চক্ষুঃজল মুছাইবার জন্য হজরত আলিকে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিহত ব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারীগণকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থদান করিলেন। সার উইলিয়ম মুর সাহেবও বণিজজায়মার হত্যাকাণ্ডে হজরত মোহাম্মদকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কোনরূপ টীকা টিপ্পনি কাটিবার উপকরণ পান নাই।

(১২) হোনেন যুদ্ধ।—(৮ম হিজরী—সওয়াল—৬৩০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী।)—

আরবে হওয়াজন ও শকিক নামক বদ্দু জাতীয় দুই পরাক্রান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ সম্প্রদায় ছিল। ঐ দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া তায়েফ নগর হইতে মক্কানগরীর

নিকট পর্য্যন্ত ৩০ ক্রোশ মরুভূমি ব্যাপিয়া বাস করিত। মুসলমানের মক্কা অধিকারের পর দলে দলে আরব সম্প্রদায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া, তাহারা আরব জাতির উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া এবং ধিক্কার দিয়া মুসলমান দলনে কৃত সংকল্প হইল।—বনিজমর ও বনিহেলাল সম্প্রদায়ের আরবেরাও তাহাদের সহিত যোগদান করিল। মালেক বেনউফ্ নামক এক খ্যাতনামা বদ্দু বীর, ঐ সম্মিলিত শক্তির সর্ব্বপ্রধান নেতারূপে দণ্ডায়মান হইল। চারিহাজার বদ্দু বীর তাহার পতাকাতলে সমবেত ও সকলে রণ মদে মত্ত হইয়া মক্কাভিমুখে প্রধাবিত হইল এবং মক্কার উত্তর পূর্ব্বদিকে ৫ ক্রোশ দূরস্থিত "হোনেন" নামক প্রসিদ্ধ প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিল।

তৎকালে কোরেশ বংশীয় যাবতীয় লোকেই প্রায় এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা মদিনা অপেক্ষা, মক্কায় অধিকতর বলশালী হইয়াছিলেন। মরুপ্রবাসী বর্ব্বর প্রকৃতি বদ্দু জাতি মক্কা আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া মক্কার অধিবাসীমাত্রেই ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিলেন। তাহাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া দূর করিয়া দিবার জন্য বার হাজার মোসলেমবীর একত্র হইলেন। হজরত মোহাম্মদ তাঁহাদিগকে লইয়া মহোৎসাহে অষ্টম হিজরীর ৬ই শওয়াল তারিখে (মক্কা হইতে) হোনেন প্রান্তরের দিকে যাত্রা করিলেন।

হোনেন প্রান্তরের নিকটে প্রায় চারিদিকেই শৈল শ্রেণী; তাহাতে কত দুর্ভেদ্য গিরিশঙ্কট। মুসলমানেরা যে পথে যাইতেছিলেন তাহার সম্মুখে শৈলমালা, ঐ শৈলমালার পর পারে হোনেন প্রান্তর—ঐ শৈলমালার গিরি শঙ্কট ভেদ করিয়া মুসলমানদিগকে যাইতে হইবে। কিন্তু এক কালে সমস্ত সৈন্যের গিরিশঙ্কট মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে; উহা দ্বারা বিপদেরই সমূহ আশঙ্কা; কেন না, সৈন্যেরা পর্ব্বত মধ্যস্থ পথে প্রবেশ করিলে এবং শত্রুপক্ষ পূর্ব্ব হইতে সন্ধান রাখিয়া পর্ব্বত মালার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া রন্ধ্রপথের দুই দিকের দুইমুখে বহু সংখ্যক সৈন্য রাখিলেই মুসলমান সৈন্যগণের প্রাণরক্ষা করা দুরুহ হইবে। সুতরাং দূরদর্শী হজরত মোহাম্মদ, আপন সেনাদলকে, কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া এবং প্রত্যেক দলে এক একজন বিপুল সাহসী সমর শাস্ত্রজ্ঞ সেনাপতি নিরূপিত করিয়া, একদলের পর একদলকে গিরিশঙ্কট পার হইবার আদেশ প্রদান করিলেন।

সর্ব্বাগ্রে বণি সলিমদলের সৈন্যদিগকে লইয়া তাঁহাদের দুঃসাহসী সেনাপতি বীর কেশরী খালেদ বেন্ ওলিদ গিরিপথে প্রবিষ্ট হইলেন। দুই দিকে সুউচ্চ পর্ব্বত—মধ্যে অতি সংকীর্ণ আঁকা বাঁকা গিরিবর্ত্ম; একটী অশ্বারোহী যাইতেও গিরিগাত্রে গাত্র সংঘর্ষ হয়। সেই পথ দিয়া খালেদ ও তাঁহার সৈন্যশ্রেণী চলিতেছেন। কতকদূর যাইবামাত্র উপর হইতে তাঁহাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর পড়িতে লাগিল। খালেদ মাথা তুলিয়া দেখিলেন—শত্রুপক্ষ তাঁহার সৈন্যশ্রেণীর মাথার উপরে অনেক উচ্চে থাকিয়া তাঁহাদের দিকে শর সন্ধান করিতেছে। তাঁহার দীর্ঘ তরবারি—তাহাদের পদস্পর্শ করিতে পারিল না—তিনি বাণ বর্ষণ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। পদে পদে বিপদ; পদে পদে পঙ্গপালের মত অসংখ্য তীর ছুটিয়া আসিয়া

সৈনিক পুরুষদিগকে ত্রস্ত ব্যস্ত করিতে লাগিল। তাঁহার অগ্রগামী হইবার সাহস সামর্থ্য লোপ পাইল—সুতরাং সদল বলে অতি সতর্ক ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া যেখানে একটু পথ প্রশস্ত পাইলেন, সেইখান হইতে ফিরিয়া যে দিক হইতে আসিয়াছিলেন—সেই দিকে পলায়ন করিলেন। বদ্দু সম্প্রদায় পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়া চলিল।

এ দিকে যে সকল সৈন্য গিরিশঙ্কটে প্রবেশোন্মুখ হইয়াছিলেন, তাঁহারা খালেদ ও তাঁহার সৈন্যদিগকে পলায়িত ভাবে প্রত্যাগত ও ধনুর্দ্ধর বদ্দু বীরদিগকে পশ্চাদ্ধাবিত দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। খালেদের মত সাহসী ও তেজস্বী বীরকে যখন বদ্দু বর্ব্বরেরা পিছু হঠাইয়া ভাগোড়া করিয়াছে, তখন তাহাদের সমরে কেহই টিকিতে পারিবে না, ইহাই ভীতির কারণ। মুসলমানেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত বা সজ্জিত ছিলেন না—খালেদকে দেখিয়া ভীত চকিত; এমন সময়ে খালেদের পশ্চাদ্ধাবিত বদ্দু সৈন্যগণ গিরিগাত্র হইতে নামিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রায় সমস্ত মুসলমান সৈন্যই ভয় বিহ্বল ভাবে ছুটিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িলেন। হজরত মোহাম্মদ একাকী একস্থানে থাকিয়া গেলেন—হওয়াজন সম্প্রদায়ের বদ্দু বর্ব্বরেরা সশস্ত্রে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি নক্ষত্র বেগে বিপুল বিক্রমে ও অদম্য সাহসে তাহাদিগকে হঠাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন ও মহাজের ও আনসারদিগকে ফিরিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে আদেশ দিতে লাগিলেন—এবং বলিতে লাগিলেন—"আমি সত্যই খোদাতালার তত্ত্ব-বাহক পয়গাম্বর। আমি আবদুল মত্তালেবের পৌত্র—যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের পাত্র নহি।" কিন্তু, পলায়মান মসলমান সৈন্যগণ তাহা শুনিতে পাইলেন না। তিনি তখন এক উচ্চ স্থানে গিয়া তাঁহাদিগকে ডাক দিতে আরম্ভ করিলেন। শত্রুসৈন্য তাঁহার অতি নিকট হইয়া আসিল। এমন সময়ে হজরত আব্বাস, তাঁহাকে শত্রুকর্ত্তৃক প্রায় বেষ্টিত দেখিয়া স্বীয় স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে মুসলমান সেনাগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগি-লেন—"ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদকে একাকী ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ?" হজরত আব্বাসের কণ্ঠধ্বনি শুনিবামাত্র সমস্ত মুসলমান একেবারে ফিরিয়া গেলেন এবং সমস্বরে "আল্লাহো আকবর" ধ্বনিতে শৈল শিখর কম্পিত করিয়া শত্রুসৈনাদলে পতিত হইলেন। মুসলমানের অসি চালনায় তাহারা অস্থির হইয়া ছুটিয়া গিরিরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। মসলমানেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিলেন। গিরিশঙ্কটের তুমুল যুদ্ধে বদ্দুগণের অনেকে হতাহত ও বন্দী হইল। তাহাদের দলপতি মালেক একদল হওয়াজন সঙ্গে তায়েফ নগরাভিমুখে পলায়ন করিল। অন্য সকলে একদল হইয়া "আওতাস" নামক প্রান্তরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

"আওতাস" প্রান্তর হোনেনের অতি অল্পদূরে অবস্থিত; সেখানে বণি হওয়াজনের বদ্দুদিগের শিবিরাবলী সন্নিবেশিত ছিল; তাহাদের স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গের সহিত যাবতীয় গৃহ সামগ্রী এবং যথাসর্ব্বস্ব ঐ স্থানে রক্ষিত ছিল। মোসলেম বীরকুলতিলক আবু আমের আশয়ারী

ঐ ফেরারী হওয়াজন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন।—স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ তায়েফের দিকে পলায়িত মালেকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিলেন।

আবু আমের ফেরারীদিগকে গেরেপ্তার করিবার জন্য সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতেছিলেন—পলায়মান বদ্দুগণ মধ্যপথে ফিরিয়া দাঁড়াইল। উভয় পক্ষের অসি কোষ-বিমুক্ত হইয়া শত্রুশোণিত পানে নিরত হইল। আবু আমের শহীদ হইলেন। সেনাপতির পতনে প্রায় সেনাগণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন পর হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হইল না—বরং, মুসলমানেরা সেনাপতি হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণাশায় বর্দ্ধিত সাহস হইয়া "মার মার" শব্দে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। অচিরে ফেরারীদল, তাহাদের জরুজাত সহ বন্দী হইল। তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব মুসলমানের করকবলিত হইল।

(১৩) তায়েফ অবরোধ।—এদিকে মালেক সম্প্রদায় তায়েফ নগরে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল—তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হজরত মোহাম্মদ নগর অবরোধ করিলেন। তোফেল নামক অপর এক মোসলেম সেনাপতি চারিশত সৈন্য ও অগ্নি সংযোগের যন্ত্র (Fire machine) লইয়া ঐ অবরোধে যোগদান করিলেন। অবরুদ্ধ অধিবাসীগণ প্রাণপণে নগর রক্ষায় প্রস্তুত হইয়া মুসলমানের আক্রমণের উত্তর দানে দণ্ডায়মান হইল। দুই পক্ষে কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধে অনেক হতাহত হইল। অবরোধ দীর্ঘ হইয়া চলিল—নগর দখল করা চাই—অথচ আশু দখল পাইবার সম্ভাবনা নাই। এ অভিযানে নগর অধিকার করিতে গেলে বিস্তর বল-ক্ষয় করিতে হইবে—অপর পক্ষে অগ্নি সংযোগ করিলে নগর ও তাহার ঐশ্বর্য্যরাশি ভস্মীভূত হইবে। আরবের মধ্যে তায়েফের ভূমিই উর্ব্বরা ও সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা—বাকি সমস্ত দেশই প্রায় মরুময়! বহু বলক্ষয়ে নগর দখল করিলেও ভস্মরাশি ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইবে না। অতএব, কেবল "জেদ" বজায় জন্য তাদৃশ ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত নগর ও প্রদেশ ধ্বংস করা, কোনরূপে হজরত মোহাম্মদের যুক্তি সঙ্গত বোধ হইল না। সমস্ত আরব মুসলমানের অধিকার গত হইলে, তায়েফেও তাহার আধিপত্য স্থাপিত হইবে—এসলামের বিমলালোক ক্রমশঃ অধিবাসিগণ মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে। অধিকন্তু কেবল বদ্দু জাতির মক্কা আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্যই মুসলমানেরা হোনেন প্রান্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; তায়েফ অধিকার করিবার তখন কোন প্রসঙ্গই উঠে নাই; এমতাবস্থায় তায়েফ হইতে সরিয়া গেলেই যে মুসলমানদিগের বীর্য্যবত্তায় কলঙ্করেখা অঙ্কিত হইবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং হজরত মোহাম্মদ ঐ সমস্ত ধীর ও স্থির ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তায়েফের অবরোধ উঠাইয়া লইলেন।

হোনেন ও আওতাস-বিজয়ী মুসলমানেরা বন্দীকৃত বদ্দু সম্প্রদায় ও লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রী-সহ "জেরানা" নামক প্রান্তরে হজরত মোহাম্মদের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। * তিনি তায়েফ ত্যাগ করিয়া ঐ প্রান্তরে গিয়া স্বজনগণে মিলিত হইলেন। বন্দীগণ তাঁহার বিশ্ব বিশ্রুত দয়া

---

* তায়েফ ও মক্কার পথে জেরানা প্রান্তর।

দাক্ষিণ্যের প্রশংসা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া আপনাদের মুক্তি নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল।

পূর্ব্বে সমরাঙ্গনে যে সৈন্য যাহাকে বন্দী করিত, ঐ বন্দীকে মারিয়া ফেলা বা দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখা কিংবা ছাড়িয়া দেওয়া তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ছিল। সৈন্যগণের ঐ ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবার প্রধান নেতা বা সেনাপতিগণের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরে সেনাগণের আর সে অধিকার ছিল না। প্রধান পুরুষ হজরত মোহাম্মদ খোদাতালা কর্ত্তৃক এই মর্ম্মে আদিষ্ট হন, "বন্দীদিগের প্রতিমূল্য (ফিদিয়া) লইয়া বা না লইয়া, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।" কোরআন শরীফের সুরা মোহাম্মদের এই সুকরুণ আদেশ, রণস্থলের বন্দীগণের হত্যা ও দাসত্ব বন্ধনের প্রথা, চিরকালের জন্য উঠাইয়া দিয়াছে। ঐ সদয় আদেশের পর কোন বন্দীর প্রাণ হনন করা হইবে না বা দাসত্ব বন্ধন থাকিবে না। উক্ত আদেশ কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের বন্দীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া করা হয় নাই; রণস্থলে যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই বন্দী হউক না কেন, সকলেই ঐ আদেশের ফল লাভের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। রণস্থলে বন্দীদিগের প্রতি এরূপ ভাবের করুণ ব্যবহারের বাধা নিয়ম কোরআন ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না। সেই কোরআনের প্রতি ছিদ্রান্বেষী ঐতিহাসিক ও বক্তাগণ কেন যে বিষদৃষ্টি পাত করেন, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ।

সুরা মোহাম্মদের ঐ মহান্ আদেশানুসারে হজরত মোহাম্মদ প্রথমে স্বকৃত বন্দীদিগকে বিনা প্রতিমূল্যে ছাড়িয়া দিলেন এবং আত্মীয় স্বজনগণের বন্দীগণকেও ঐরূপ বিনা প্রতি মূল্যে ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। তাঁহার ক্ষমা ও দয়ার একান্ত পক্ষপাতি হইয়া মহাজের ও আনসারগণ স্ব স্ব বন্দীদিগকে উক্তরূপে (বিনা প্রতি মূল্যে) ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু, নব মুসলমান বনি সলিম ও বনি ফজারা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৈন্যগণ ইতিপূর্ব্বে বন্দীদিগের প্রতি বিজেতা জাতির এরূপ দয়া প্রকাশ কখনও দেখিয়া বা শুনিয়া থাকে নাই বলিয়া, বিনা মূল্যে বন্দীগণকে মুক্তি দিতে ইতস্ততঃ করিতে থাকায়, হজরত মোহাম্মদ, দয়া পরবশ হইয়া তাহাদের প্রত্যেক বন্দীর প্রতিমূল্য-স্বরূপ এক একটা উষ্ট্র নিজ হইতে তাহাদিগকে দিয়া, সমস্ত বন্দীকেই মুক্তি দেওয়াইলেন এবং প্রত্যেক বন্দীকে এক একটা পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিলেন।

শীমা—হালিমার কন্যা। হালিমা নাম্নী ধাত্রী নিজ স্তন্য দুগ্ধ দিয়া হজরত মোহাম্মদকে শৈশবে লালন পালন করিয়া ছিল। সে হিসাবে হালিমা হজরতের স্তন্য দাত্রী ও প্রতি পালন কর্ত্রী মাতা ও শীমা ভগিনী। বন্দীদলের সহিত ঐ শীমাও গেরেপ্তার হইয়া আসিয়া ছিল। শীমার পরিচয় পাইয়া বীর হৃদয় মোহাম্মদের আনন্দ সীমা অতিক্রম করিল, করুণ রসের তরঙ্গ তাড়নায় বীর রস পরাস্ত ও পলায়িত হইল—নিজের চাদর বিছাইয়া সমাদরে সস্নেহে শীমার হাত ধরিয়া তাহাতে বসাইলেন। শীমা—এখন ত বন্দী মধ্যেই পরিগণিতা নহে, যেহেতু সে হজরতের ভগ্নী—ভাই ভগ্নী উভয়ে স্নেহাশ্রু লোচনে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। "শীমার অশ্রুজল—চক্ষুর সীমার মধ্যে থাকিতে পারিল না—দর বিগলিত ধারে গণ্ডস্থল বহিয়া

চলিল। স্নেহাধার ভ্রাতা সযত্নে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।—কত আদর কত যত্ন করিলেন; কত ভেট ঘাট নজরানা দিলেন। শীমা শৈশবের স্নেহের ভ্রাতার সৌজন্যে, সৌহৃদ্যে ও সমাদরে পরম পুলকিতা হইল।

যে মালেক হোনেন যুদ্ধে মুসলমান দলনে শক্তি প্রয়োগের ত্রুটি করে নাই, যে মালেক পলায়ন পূর্ব্বক তায়েফে অশ্রয় লইয়া মুসলমানের শত্রুতা সাধনে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই—সেই মালেক বন্দিগণের প্রতি হজরত মোহাম্মদের কৃপা-কাহিনী শুনিবা মাত্র "জেরানা" প্রান্তরে আসিয়া স্বেচ্ছায় এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

যে বদ্দু জাতি মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের জন্মভূমি পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমনোদ্যত হইয়াছিল—যাহারা ঈর্ষ্যা ও শত্রুতা বশে মুসলমানদিগকে ধ্বংশ মুখে পতিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই জাতির প্রতি; সেই শত্রু সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় পয়গম্বর যেমন ভাবের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, বিজিত জাতির প্রতি তেমন ভাবের ব্যবহার কয় জন বিজেতা করিতে পারেন? ইতিহাসে তেমন কয়টা মহাপুরুষের মহানুভবতার প্রশংসাবাদ আছে? মোসলেম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের ঐরূপ মহতী কীর্ত্তি চাপা দিয়া যাঁহারা তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা কোন শ্রেণীর জীব?

(১৪) তাই বংশের দমন।—(নবম হিজরী—৬৩১ খৃঃ)

এমন প্রদেশে "তাই" নামে এক সম্প্রদায় ছিল। ঐ সম্প্রদায়, হাতেম নামক এক পর দুঃখ কাতর দয়ালু মহাপুরুষের কীর্ত্তি কলাপ * দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বিপুল বলশালী ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নবম হিজরীতে ঐ সম্প্রদায় মুসলমানের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছিল। হাতেম তখন পরলোকে, তাঁহার পুত্র আদ্দির প্রতি সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অর্পিত হইয়াছিল।

খয়বর বিজয়ী মহাবল আলী মাত্র ১৫০ জন মুসলমান সৈন্য সমভিব্যাহারে তাই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন এবং এমনে গিয়া একেবারে আদ্দির বাসস্থান অবরোধ করিলেন। সামান্য সংঘর্ষের পর আদ্দি ভীত চিত্তে সিরিয়া অভিমুখে পলায়ন করিল। তাই সম্প্রদায় বিশৃঙ্খল হইয়া মুসলমাণের হস্তে ধৃত হইল এবং তাহাদের সর্ব্বস্ব মুসলমানেরা দখল করিয়া লইলেন অতি অল্প সময়ে ও অল্পায়াসে ঐ কার্য্য শেষ করিয়া মুসলমানেরা বন্দীদিগকে ও তাহাদের দ্রব্য সামগ্রী সমস্ত লইয়া মদিনায় ফিরিয়া গেলেন।

ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ বন্দিগণের অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে এক বীর হৃদয়া তাই-তনয়া

---

* হাতেমের কীর্ত্তি কলাপ, "আরায়েসে মহফেল" নামক উর্দ্দু পুস্তকে সুস্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হাতেম তাইয়ের পুঁথি মুসলমান সমাজে বিশেষ পরিচিত। এখন প্রায় সকল ভাষাতেই ঐ পুস্তকের প্রচলন হইয়াছে।

সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে নিবেদিতা হইল—"মহাপুরুষ! বন্দিভাবে আনীত 'তাই' সম্প্রদায়ের সরদার হাতেমের দানশীলতা ও পরদুঃখ কাতরতা জগদ্বিখ্যাত, এই দুভাগিণী তাহারই কন্যা। ভাগ্য দোষে তিনি পরলোকগত, ভ্রাতা আদ্দি মোসলেমবীর প্রতাপে নির্ব্বাসিত! আজ আমি সহায় সম্বল হীনা—বন্দিনী!" তাই-তনয়ার কলকণ্ঠ ঝঙ্কৃত কাতরোক্তিতে করুণ হৃদয় মোহাম্মদ বিগলিত হইয়া তখনই তাহার অব্যাহতির আদেশ দিলেন। সে আদেশে তাই নন্দিনী সন্তুষ্ট হইল না—পুনরপি বলিল—"ধাম্মিক প্রবর! আমি সরদার নন্দিনী—সরদারের ভগিনী এবং স্বসম্প্রদায়ের মাতৃস্বরূপিণী। আমি একাকিনী বন্দিনী হইলে, আপনার নিকট মুক্তি ভিখারিণী হইতাম না। আমার সম্প্রদায়ের সকলেই বন্দী; যদি সেই জীবন মরনের সহচর সহচরীদিগের বন্ধন মোচনই করাইতে পারিলাম না—তবে আমার মুক্তির আবশ্যকতা নাই; না—আমি আর মুক্তি চাই না—আমার সম্প্রদায়ের যে দশা, আমারও সেই দশাই ভাল!" সরদার নন্দিনীর ঐরূপ সাহস ও স্বসম্প্রদায়ের প্রতি স্নেহ সহানুভূতি দেখিয়া মহাপুরুষ মোহাম্মদ তাহার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিনা মূল্যে সমস্ত বন্দীকে ছাড়িয়া দিলেন।—সরদার নন্দিনীর সাহসের পুরস্কার স্বরূপ পাথেয় প্রদানপূর্ব্বক স্বসম্মানে সমাদরে তাহার ভ্রাতার নিকটে (সিরিয়াদেশে) পাঠাইয়া দিলেন।

আদ্দি ভগিনীর নিকট এস্‌লাম ধর্ম্মগুরু মহাপুরুষের করুণ ব্যবহার ও কোমল হৃদয়তার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভের জন্য একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং অনতিবিলম্বে মদিনায় আসিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

(১৪) তবুক অভিযান।—(নবম হিজরী—রজব, ৬৩০ খৃঃ অঃ অক্টোবর।) নবম হিজরীর মধ্যভাগে সিরিয়া হইতে প্রত্যাগত একদল মুসলমান ব্যবসায়ীর মুখে মদিনায় প্রচারিত হইল, রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াসের এক বিপুল বাহিনী মদিনা আক্রমণে উদ্যত হইয়াছে। গস্‌সান ও লখম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আরব খৃষ্টানেরা তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। ঐ সংবাদ কেবল জনরবই ছিল না—এক বৎসর পূর্ব্বে মুতার সমরাঙ্গনে মোসলেম সেনাপতি খালেদের রণ কৌশলে পলায়নপর হইয়া রোমকেরা নিতান্ত অপমানিত হইয়াছিল এবং সেই অপমানের প্রতিশোধ প্রদান জন্যই হউক বা উদীয়মান মুসলমানদিগকে দমিত করিবার জন্যই হউক, তাহারা এবারে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নিমিত্ত বিপুল আয়োজন করিতেছিল।

রোমকের রাজশক্তি মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্থিত—এ সংবাদে মদিনায় মহা হুলস্থুল ও হৈ চৈ পড়িয়া গেল—অধিবাসীগণের মনে এক মহাভীতির সঞ্চার হইল। সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নামে বাঘে বকরিতে বিচরণ করে! অল্পদিন হইল রোমকেরা পারসিকদিগকে ভয়ঙ্কর ভাবে পরাস্ত করিয়াছে। তাহারা বিজয়-গৌরবে স্ফীত বক্ষঃ হইয়াছে। তাহাদের নামে মেদিনী কম্পিতা।—রোমক-পারস্যের ঐ মহাসমরের কিঞ্চিৎ আভাস কোরান শরীফে আছে; এখানে তাহার একটু আলোচনারও আবশ্যকতা আছে।

হজরত মোহাম্মদের একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচারের প্রাথমিক সময়ে, (৬১১—৬১৪ খৃঃ অঃ) পারস্য সম্রাট খোসরোর প্রতাপ অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সিরিয়া প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশ প্রদেশ রোমক রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পারস্য সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল। জীরুজালেম নগর পারসিকগণের হস্তগত হওয়ায় তাহার সম্রাট কনষ্টান্টাইন ও তাঁহার মাতা সেণ্টহেলেনার স্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ গির্জ্জা ধ্বংস করিয়া দেয়। মহাত্মা যীশুর সমাধি মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যীশুর পবিত্র শূল (Holy Cross) পারসিকগণ কর্ত্তৃক পারস্যে স্থানান্তরিত হয়।

পারস্য জাতির ঐ বিজয়বার্ত্তা মক্কা নগরে প্রচারিত হইলে, কোরেশেরা, হজরত মোহাম্মদের নিকটে গিয়া বলিল, "রোমকেরা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী—একেশ্বরবাদী, আর পারসিকেরা আমাদের মত অনেকেশ্বর বাদী। একেশ্বর বাদ ধর্ম্মই যদি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইবে, তাহা হইলে বহু-ঈশ্বর ব্যক্তিগণ, ঐ ধর্ম্মাবলম্বী জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্য অধিকার করিল কিরূপে?" খোদাতায়ালা কোরেশদিগের ঐ উত্তর স্বরূপ হজরত মোহাম্মদকে জ্ঞাপন করিলেন—"রোমকেরা পরাজিত হওয়ার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার নিশ্চয় জয় লাভ করিবে।" *

পারস্যের নিকট পরাজিত হইয়া রোমকেরা উদ্যম হীন হয় নাই। সম্রাট হেরাক্লিয়াস, পারসিকগণের সহিত ১০ বৎসর কাল অবিরাম যুদ্ধনিরত থাকিয়া পারস্যকে পরাস্ত করিলেন। পারস্য রাজ সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন হইতে বিতাড়িত হইলেন। পারস্যের রাজধানী মদাএন নগর রোমক কর্ত্তৃক ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইল। যীশুর পবিত্র শূলের উদ্ধার হইয়া যীরুজালেমের যথা স্থানে নিবেশিত হইল—(৬২৫ খৃষ্টাব্দ।) কোরআন শরীফে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যে অভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণ সত্য, পারসিকগণের উপর সম্রাট হেরাক্লিয়াসের ঐ বিজয় লাভই তাহার অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু, ঐ কোরআন যে অসম্পূর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট মানবের রচনা নহে এবং উহা সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মহতী বাণী তাহাও ঐ ঘটনা দ্বারা সম্যক্-ভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে।

সম্রাট হেরাক্লিয়াসের ঐ জয় লাভে জগতের সর্ব্বত্র রোমক সৈন্যের বীরত্ব কাহিনী বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য রোমক সৈন্য মদিনা আক্রমণ করিবে, এই সংবাদ মদিনা বাসি-দিগকে ভীত ও বিচলিত করিয়া দিল। নগরের সর্ব্বত্র কেবল ঐ ভীতি ব্যঞ্জক আক্রমনের অশুভ ফলের আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। কিন্তু বীর হৃদয় হজরত মোহাম্মদ ধীর ও স্থির ভাবে মদিনা রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। মদিনা শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। (ক্রমশঃ)

আবদুল লতিফ।

---

* কোরআন শরীফ সুরা রুম।

জাহান-আরা বেগম।

(২)

করুণাময় খোদাতায়ালা, রাজ্ঞী নূরজাহান বেগমকে * যেমন অদ্বিতীয় সুন্দরী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার হৃদয়ে যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহ করুণাও দান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-কার্য্য পরিচালন-সময়, কর্ত্তব্যের নিকট স্নেহ ও করুণাকে তিনি ভাসাইয়া দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতেন না। তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিলে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার হৃদয়ে স্ত্রী সুলভ চপলতা আদৌ স্থান পায় নাই। তিনি অতীব গম্ভির প্রকৃতির মহিলা ছিলেন, কিন্তু পদ-মর্য্যাদা ও গাম্ভির্য্য বজায় রাখিয়া, তিনি সুরুচি সম্পন্ন রসিকতা করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি অতি উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। কিন্তু কষ্ট করিয়া অক্ষর গণনা করিয়া তিনি কবিতা লিখিতেন না। আরবী ও পার্শী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। রহস্যালাপে ও কথা প্রসঙ্গে তিনি কবিতার হিসাবে যে সমস্ত কথা আবৃত্তি করিতেন, তাহাই নির্দ্দোষ ও নির্ভুল কবিতা মধ্যে গণ্য হইত। পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত আমরা নিম্নে তাঁহার বিভিন্ন কবিতা হইতে তিনটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

عشقت چنان گداخت تنم را که آب شد
گردی که ماند سرمه چشم حباب شد

অর্থ—তোমার প্রেমে আমার দেহ এরূপ বিগলিত হইয়াছে যে, তাহা জলে পরিণত হইয়া গেল। ধূলিকণা যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা বুদ্বুদের চক্ষে সোরমা (কাজল) হইল!

کشاد غنچه اگر از نسیم گلزارست—
کلید قفل دل ما تبسم یارست

ভাবার্থ—কাননে প্রবাহিত মৃদুমন্দ মলয় সমীরণে কুসুম কলিকা বিকশিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আমাদের হৃদয় কলিকাগুলি সেই পরম প্রেমাস্পদের মুখের মৃদু হাসি ব্যতীত আর কিছুতেই বিকশিত হয় না।

دل بصورت ندهم تا نشده سیرت معلوم
بنده عشقم و هفتاد و سه ملت معلوم

---

* নূর জাহান বেগমের জীবনচরিত আমরা পৃথক ভাবে প্রকাশ করিব। কেবল যে টুকুর সহিত, রাজ নন্দিনী জাহানা-আরা বেগমের জীবন চরিতের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এইস্থলে আমরা মাত্র সেই টুকুই লিপিবদ্ধ করিলাম। (লেখক)

زاهدا هول قیامت مفکن در دل من

هول هجران گزراندم و قیامت معلوم

ভাবার্থ—যে দিন গুণের সন্ধান পাইয়াছি, সে দিন হইতে রূপে আর মন মজেনা। আমি **প্রেমের দাস**, ৭৩ ফেরকার তত্ত্ব সবই আমার জ্ঞাত।

হে সাধু! প্রলয়ের বিভীষিকা আমার মনে জাগাইবার চেষ্টা করিও না, বিচ্ছেদের বিভী-**ষিকা যথেষ্ট দেখিয়াছি**, এবং প্রলয়ও আমার অজ্ঞাত নহে। *

মেহেরুন্‌ নেসা ওরফে নূর জাহান ৯৮৪ হিজরী অব্দে জন্মগ্রহণ **করিয়াছিলেন**। ১০১৫ **হিজরী অব্দে** শের আফগান্‌ খাঁ নিহত হন, এবং ১৬১১ খৃষ্টাব্দে. সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে **পুনরায় বিবাহ করেন**। এই সময় নূর জাহানের বয়ক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর **হইয়াছিল**। ১৬২৭ **খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের** মৃত্যু হয়, এবং ৭২ বৎসর বয়ক্রম কালে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর ১৮ **বৎসর** পরে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ও ১০৫৫ হিজরী অব্দে, ২৯শে শওয়াল তারিখে নূর জাহান **বেগম লাহোর** নগরে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েন। শাহ দারায় জাহাঙ্গীরের সমাধি মন্দিরের পার্শ্বে "**তিনি নিজে যে কবর** নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথায় সমাহিতা **হন**। † মৃত্যুর **অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তিনি যে কবিতাটী** রচনা করিয়াছিলেন, সেই কবিতাটী আজিও তাঁহার সমাধি মন্দিরে—**প্রাচীর গাত্রে** খোদিত রহিয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিয়ে সেই কবিতাটী উদ্ধৃত **করিয়া দিলাম**।

بر مزار ما غریبان نے چراغے نے گلے

نے پر پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے

অর্থ—আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের কবরে একটী প্রদীপও নয়, একটী ফুলও নয়। একটী **পতঙ্গের পাখা সেখানে** পুড়িবে না, একটী বুলবুলেরও কলকণ্ঠ সেখানে শ্রুত হইবে না।

আসফ খান।

মির্জা গায়াস বেগের অন্যতম পুত্র, ইতিহাস বিখ্যাত মির্জা আবুল হাসান আমিন্‌-উদ্‌-দৌলা **আসফ খান নূর জাহান** বেগমের সহোদর ভ্রাতা। ‡ পিতার মৃত্যুর পর, আসফ **খান স্বীয় প্রতিভা বলে প্রধান** মন্ত্রীর. পদ লাভ করিয়া ছিলেন। **সম্রাট শাহ জাহানের রাজত্ব কালের রাজনীতিক** ব্যাপার যে আধুনা এই সভ্য সমাজেও **প্রশংসার বিষয় বলিয়া** গণ্য

---

* **মৌলভী** মহবুবর রহমান সাহেব কলিম বি, এ, লিখিত **নুর জাহানের জীবন চরিত দ্রষ্টব্য**।

† **এই** সমাধি মন্দির বহুকাল অনাদৃত অবস্থায় থাকিয়া **ধ্বংসমুখে চলিয়াছিল। বর্দ্ধ-মানের মহারাজাধিরাজ** পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় **করিয়া, উহার সংস্কার করিয়াছেন**।

‡ **শাহ জাহান** নামায়, আসফ খানকে **নূর জাহান** বেগমের **সহোদর ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দলিল উর** রহমান, **নূর জাহান নামায়, আসফ খানকে, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১ম ভাগ, ২৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য**।

হইয়াছে, তাহাও অনেকাংশে মন্ত্রীপ্রবর আসফ খানের মস্তক প্রসূত গভীর গবেষণার ফল, স্বয়ং সম্রাটও আসফ খানের বিশেষ প্রশংসা করিতেন। * শাহজাহান যে ভারত সিংহাসনে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, সে একমাত্র আসফ খানের চেষ্টার ফল, একথা বলাও বোধ হয় অন্যায় হইবে না। সম্রাট শাহজাহান, মন্ত্রী আসেফ খানের গুণে ও কার্য্য দক্ষতায় এতই মুগ্ধ হইয়া ছিলেন যে, প্রায় সমস্ত রাজ কার্য্যের ভার'ই তিনি তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। আসেফ খানও সম্রাটের এই বিশ্বাসের সম্মান পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি প্রায়'ই বলিতেন যে, "এখন আমার হৃদয়ের এক মাত্র আকাঙ্খা এই যে, শাহ জাহানের রাজত্ব কালেই যেন আমার মৃত্যু হয়।"

ঐতিহাসিক শামস্-উল ওলামা মৌলবী জিয়াউল্লা, তাঁহার "তারিখই হেন্দ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "সম্রাট শাহ জাহান আসেফ খানকে যে পদ-মর্য্যাদা ও সম্মান দান করিয়া ছিলেন, তাহা মোগল সাম্রাজ্যে অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আসফ খান আঠার হাজারী সৈন্যের মনসবদারের জাইগীর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি ১৬ কোটী ১২ লক্ষ 'দান' আয়ের এক পৃথক জায়গীরও প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তিনি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া লাহোরে এক প্রাসাদ [illegible] রয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ প্রাসাদ হইতে, ২॥০ কোটী টাকা মূল্যের অ[illegible] [illegible] বাহির হইয়াছিল। তিনি আগ্রাতেও ঐ পরিমাণ টাকা ব্যয় করিয়া যে প্র[illegible] [illegible]করিয়াছিলেন, আজিও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতে[illegible]

আসফ খান যে কেবল রাজনীতিতে সুপ[illegible] [illegible]এমন নহে, তিনি সু রসিক, সু-বক্তা এবং সু-কবিও ছিলেন। অনেক সময় তিনি প[illegible] [illegible]র সহিত একত্র হইয়া কাব্য আলোচনা করিতেন। সম-সাময়িক গ্রন্থকারদিগের ম[illegible] [illegible]গ্রন্থকার মোল্লা মাহমুদ জ'ন পুরীর সহিত ইহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। এই মোল্লা [illegible] [illegible]ট আকবর শাহ কর্ত্তৃক, "আরস্তুয়ে হেন্দ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোল্লা [illegible] মাহমুদ, [illegible] পারসী সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনেকগুলি রত্ন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্র[illegible] গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) কাব্য গ্রন্থ, (২) তাসাউওফ বিষয়ক গ্রন্থ, (৩) বিজ্ঞান—চিকিৎসা বিজ্ঞান। মোল্লা মাহমুদ সম সাময়িক হাকিমদিগের ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আসেফ খান প্রায়ই মোল্লা মাহমুদের সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত থাকিতেন। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই শওয়াল তারিখে লাহোর সহরে আসেফ খানের মৃত্যু হয়। মন্ত্রীপ্রবর আসেফ খানের মৃত্যুতে ভারত সাম্রাজ্যের সমস্ত আফিস আদালত তিন দিন পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। † ইহা ব্যতীত স্বয়ং সম্রাট মহোদয়

* তোজকে শাহ জাহান দ্রষ্টব্য।

† ঐতিহাসিক গোলাম মোস্তাফা সাহেব এক সপ্তাহের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক এবয়ার ঐতিহাসিক তিলক চাঁদ প্রভৃতি, আফিস আদালত তিন দিন বন্ধ ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন।

প্রায় এক সপ্তাহ কাল দরবার করেন নাই। * সম্রাট জাহাঙ্গীরের মাকবারার পশ্চিম পার্শ্বে মন্ত্রী আসফ খানের মৃত দেহ দফন করা হইয়াছিল। প্রায় ৮০ হাজার হিন্দু মুসলমান জানাজার সহিত পদব্রজে গমন করিয়া ছিলেন, এবং প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান তাহার জানাজার নমাজ পড়িয়া ছিলেন। আজিও আসেফ খানের সমাধি মন্দির কালের সহিত যুদ্ধ করিতেছে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে।

দেওয়ানজী বেগম।

মন্ত্রী আসেফ খান, খা'জা গায়াস-উদ্দিন কাজুনির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। খাজা গায়াস-উদ্দিন কাজুনির পিতার নাম, মোল্লা শাহ সুফি মোহাম্মাদ তাহের। হজরত শেখ শাহাবুদ্দিন (কঃ), আসেফ খানের হিন্দুস্থানী পূর্ব্বপুরুষ। হজরত শেখ শাহাবুদ্দিন (কঃ), প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) বংশধর। সুতরাং আসেফ খান যে অতি উচ্চ বংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। † আসেফ খান যে মহিলা রত্নের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, জন সমাজে তিনি দেওয়ানজী বেগম নামে সুপরিচিতা। তাঁহার অপর কোন নাম ছিল কিনা, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই‡।

মোমতাজ মহল।

ইতিহাস বিখ্যাত তাজবিবি ওরফে মোমতাজ মহল বা বানুবেগম, মন্ত্রী আসেফ খানের ঔরষে, দেওয়ানজী বেগমের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাজবিবির সৌন্দর্য্য প্রভৃতির পরিচয় দিবার চেষ্টা অনর্থক বোধে তাহা হইতে বিরত থাকিলাম। ১০২১ হিজরী অব্দের ৯ই রবিওল আউওল তারিখে, মোমতাজ মহলের সহিত শাহজাহানের বিবাহ হয়। এই বিবাহের সময় সম্রাট জাহাঙ্গীর, এক কোটি টাকা মূল্যের এক হার নব বধূকে যৌতুক স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। § বিবাহকার্য্য এ'তেমাদ-দ্দৌলার বাড়ীতেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। স্বয়ং বাদশাহ এই বিবাহ মজলিশে উপস্থিতছিলেন।

এই বিবাহের পূর্ব্বে, শাহজাহানের আরও কয়েকটী বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ফারেস সম্রাট শাহ ইসমাইল সুকবির কন্যা জায়তুন খাতুনের সহিত যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহাই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, মোমতাজ মহলের সহিত শাহজাহানের বিবাহের ছয় বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি দুইটী পুত্র রাখিয়া

---

* শহ জাহান নামা দ্রষ্টব্য।

† কিন্তু এসলামে বংশগত কৌলিন্যের কোন মূল্যই নাই।—সম্পাদক।

‡ আমরা এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার অপর কোন নাম প্রাপ্ত হই নাই। যদি কেহ দেওয়ানজী বেগমের আসল নাম বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। (লেখক)

§ ঐতিহাসিক মহবুবর রহমান কলিম বি, এ, সাহেব লিখিয়াছেন যে, ঐ হার তিনি শাহজাহানের পাগড়ীতে বাঁধিয়াছিলেন।

গিয়াছিলেন। কিন্তু এই পুত্র দুইটীও অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মহিষি মোমতাজ মহল'ই পাট-রাণীর আসন অধিকার করিয়াছিলেন। শাহজাহান, মোমতাজ মহলকে এত অধিক পরিমাণে ভাল বাসিতেন যে, তিলার্দ্ধের জন্যও তিনি তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না। যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রেও মোমতাজ মহলকে শাহজাহানের সঙ্গে থাকিতে হইত।

মোমতাজ মহল কেবল যে অদ্বিতীয়া সুন্দরীছিলেন তাহা নহে, তিনি করুণাময়ী ও দয়াবতীও ছিলেন, তাঁহার জীবন চরিতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সমস্ত অপরাধীর প্রতি সম্রাট শাহজাহান, জীবনদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিবেন, এমন যে সকল অপরাধী, তাহারা যদি কোন ক্রমে রাজ্ঞী মোমতাজ মহলের করুণা প্রার্থী হইয়া আবেদন করিতে পারিত, তিনি সম্রাটের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ভিক্ষা করিয়া লইতেন। কালের অত্যাচারে যে সমস্ত হতভাগ্য নরনারী, অনাহারে অথবা আশ্রয় শূন্য হইয়া, তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিয়া আবেদন করিত, তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ধন দৌলত দান করিতেন। যে সকল গরীব দুঃখী অর্থাভাবে, বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পারিত না, তাহারা তাঁহার নিকট অভাব জানাইলে, তিনি অতীব আড়ম্বরের সহিত তাহাদের কন্যাদিগকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিতেন। অবশ্য ভারত সম্রাটের পাটরাণীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবজনক না হইলেও, ইহার আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাটী যে অত্যন্ত গৌরবজনক তাহা বলাই বাহুল্য। সে ব্যবস্থাটী এই যে, ভিখারীর ভিক্ষার আবেদন, তাঁহার হস্তগত হওয়া বা সম্মুখে উপস্থিত করার সুব্যবস্থা।

মোমতাজ মহল, গওহর আরা বেগম নামক এক কন্যা প্রসব করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়েন। জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক এইরূপে তাঁহার মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। "১০৪০ হিজরী অব্দের ১৭ই জেলকদ তারিখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বানু বেগমের প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়, এবং দ্বিতীয় দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি এক কন্যা প্রসব করেন। বোধ হয়, জরায়ু মধ্যে কোন বিষাক্ত পদার্থ বিষক্রিয়া করিয়াছিল। উপযুক্তরূপ চিকিৎসার অভাবে সেই বিষ সমস্ত শরীরে ক্রিয়া আরম্ভ করে। কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার দুইদিন পরে, যখন তিনি শরীরের অবস্থা মন্দ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহান্ আরা বেগমকে, সম্রাট শাহজাহানকে ডাকাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বাদশাহ এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই সূতিকাগৃহে, মোমতাজ মহলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মোমতাজ মহল সম্রাটের আগমন জানিতে পারিয়া চক্ষু মেলিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বাদশা, বেগমের এই অবস্থা দেখিয়া, ক্রন্দনের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি এই অবস্থায় সম্রাটকে স্বীয় পুত্রকন্যাদিগের এবং পিতৃবংশের লোকদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুরোধ ও অসিয়ত করিয়া, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সম্রাটের মুখের প্রতি তিনি যে ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, চক্ষের অবস্থা সেই ভাব'ই থাকিল; শেষ নিঃশ্বাস

বাহির হইয়া গেল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৯ বৎসর ৪ মাস হইয়াছিল।" মির্জ্জা বাদল খান, বেগম সাহেবার মৃত্যুর তারিখ নিম্নলিখিত কবিতার দ্বারা লিখিয়া গিয়াছেন।

جاے ممتاز محل جنت باد

মোমতাজমহল্ মোট চৌদ্দটী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আটটী পুত্র এবং ছয়টি কন্যা। প্রথম সন্তানের নাম পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় সন্তান জাহান আরা বেগম, তৃতীয় দারা শেকোহ, চতুর্থ শাহ শুজা, পঞ্চম রওশন আরা বেগম, ষষ্ঠ আওরংজেব্ (আলমগীর) এবং দশম মোরাদ বখশ। * সপ্তম, অষ্টম, নবম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সন্তানের নাম আমারা আজিও সংগ্রহ করিতে পারিনাই। চতুর্দ্দশ সন্তান্ গওহর আরা বেগম। † জাহান আরা বেগম, জন্ম ১০২৩ হিজরী। দারা শেকোহ, জন্ম ১০২৪ হিজরী। শাহ মোহাম্মদ শুজা, জন্ম১০২৫ হিজরী। রওশন আরা বেগম জন্ম ১০১৬ হিজরী। গাজী আবুল মুজাফফর মহিউদ্দিন মোহাম্মাদ আওরঙ্গজেব আলমগীর, জন্ম১০২৬ হিজরী। মোরাদ বখশ, জন্ম ১০৩৩ হিজরী। গওহর আরা বেগম, জন্ম১০৪০ হিজরী।

প্রিয়তমা বেগমের মৃত্যুতে সম্রাট শাহজাহানের হৃদয়ে যে কি পরিমাণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ব্যর্থচেষ্টা অপেক্ষা, বোধ হয় অনুভব করাই সহজ। দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত তিনি কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মুখে কেহ হাস্য রেখা দেখিতে পায় নাই। বহুবার তিনি দরবারে একথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যদি খোদাতায়ালা আমাকে মহাবিচারের দিন অপরাধী করিবেন বলিয়া আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে আমি এই শাহী ত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিয়া জঙ্গলে যাইতাম, এবং পুত্র কন্যাদিগকে এই রাজ্য বিভাগ করিয়া দিতাম।" বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি ঈদাদি পর্ব্বের সময়, অথবা যখনই তিনি মোমতাজ মহলের কামরায় প্রবেশ করিতেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। বেগম সাহেবার শোকে এক রাত্রেই তাঁহার মস্তকের সমস্ত কেশ শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। ‡

প্রায় ছয় মাস পর্য্যন্ত তাঁহার লাশ কবরস্থ করা হয় নাই। বোরহানপুরের যুদ্ধক্ষেত্রের তাঁবুতে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময় খান্ জাহান লোদীর সহিত, সম্রাট শাহজাহান বোরহানপুরে যুদ্ধ করিতেছিলেন। আগ্রার জেলাবাদ বাগে তাঁহার সমাধিমন্দির—বিখ্যাত তাজমহল, অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া আদর্শ প্রেম প্রচার করিতেছে। ১০৪১ হিজরী

---

* See the Tourist- guide to Agra page 1/o: 14.

† যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া প্রমাণ সহ অবশিষ্ট সন্তান কয়টীর নাম ও জন্ম তারিখ দিতে পারেন সাদরে গ্রহণ করিব। লেখক—

‡ শাহজাহান নামা দ্রষ্টব্য।

§ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১০৪১ হিঃ ১৫ই জমাদিওসসানি তারিখে দফন করা হইয়াছিল।

অব্দের ১৭ জমারিওল স্যাউওল তারিখে, তাঁহার লাষ সমাধিস্থ করা হয়। বোরহানপুর হইতে আগ্রার লাষ আনয়ন করিবার সময়, গরীব দুঃখীকে টাকা পয়সা ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইয়াছিল। তাজমহলের গঠন কার্য্যে প্রায় ২৫ বৎসর লাগিয়াছিল। মোমতাজমহল যে সময় শাহজাহানের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মোহরানা পাচ লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল।

তাজমহল প্রস্তুত কার্য্যে যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট মাকরামাত খান ও মীর আবদুল করিম, প্রধান ইঞ্জিনীয়ার "ওস্তাদ" ইসা; ইঁহাদের মাসিক বেতন ছিল এক হাজার টাকার হিসাবে। সিরাজ হইতে আমানত খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে, সম্পূর্ণ কোরআন শরীফের আয়াৎ গুলি ত্রোগরা করিয়া লিখিবার জন্য, মাসিক হাজার টাকা বেতনে আনয়ন করা হইয়াছিল। মোহাম্মদ হানিফ নামক এক ব্যক্তিকে বাগদাদ সহর হইতে পাথর ঠিক করিবার জন্য মাসিক হাজার টাকা বেতন ধার্য্যে আনয়ন করা হইয়াছিল।

লাহোর হইতে কায়েম খাঁ নামক একজন মিস্ত্রীকে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাঁহার বেতন ছিল মাসিক ৬৯৫৲ টাকা। মানুবেগ নামক একজন তুর্কিয় মাসিক বেতন ছিল ১৮০৲ টাকা। মনুহর সিং নামক এক ব্যক্তির মাসিক বেতন ছিল ২০০৲ টাকা। মন্নু লাল কান্দাহারীর মাসিক বেতন ছিল ২০০৲ টাকা। মোহাম্মাদ খান বাগদাদীর মাসিক বেতন ছিল ২০০৲ টাকা। মোহাম্মাদ ইস্‌মাইল তুর্কীর মাসিক বেতন ছিল ২০০৲ টাকা। দীন মোহাম্মাদ পেশওয়ারীর মাসিক বেতন ছিল ৮০৲ টাকা। আকবরাবাদ নিবাসী মোহাম্মাদই উসুফের মাসিক বেতন ছিল ১২০৲ টাকা। ইহা ব্যতীত তুর্কি, পারস্য, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে মাসিক ১০০৲ টাকা হইতে ৬০০৲ টাকা বেতনের আরও বহু সংখ্যক লোক ছিল। অবশ্য "কুলী-ক্লাস"কে ইহার ভিতর ধরা হয় নাই। এই সমাধি মন্দির প্রস্তুত করিতে মজুরী খরচ প্রায় এক কোটী, চোরাশী লক্ষ, পয়ষট্টি হাজার, একশত ছিয়াসি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজা মহারাজারা ও নওয়াবেরা অষ্টনব্বই লক্ষ, পঞ্চান্ন হাজার, চারিশত ছাব্বিশ টাকা দিয়াছিলেন এবং রাজকোষ হইতে ৮৬,০৯,৭৬০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রস্তর গুলি জয়পুর, নর্ম্মদা নদী, পঞ্জাব, আরব, বুন্দেলখণ্ড, চীন, তিব্বত, বাগদাদ, ইমন, পারস্য, সিলোন, গোয়ালিয়র, যশলমীর এবং ফতেপুর শিক্রি হইতে আনান হইয়াছিল। (ক্রমশঃ।)

আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

জাগরণে।

আজ্‌কে আমায় সকাল বেলায়—
কে জাগাল কোন্ সে সুরে—
জেগে দেখি সে ত কোথায়
চ'লে গেছে অনেক দূরে।
থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে
সকল আকাশ ব্যেপে ব্যেপে
তারি সুরে উঠিছে সুর
হৃদয়েরি পুরে পুরে
আজ্‌কে আমায় সকাল বেলায়
কে জাগাল কোন্ সে সুরে।

গাছে গাছে পাতায় পাতায়
তারি গাথা কে গেয়ে যায়
সোনার বরণ জলদ মালায়
তারি ছবি গেছে লেগে
নেরে পাগল ও মাধুরী
নেরে তোহার প্রাণে মেগে।
আজ্‌কে তার এ মধুর পরশ
চারি দিকে বিপুল হরষ——
কইতে ত না বচন ফুরে।
আজ্‌কে আমায় সকাল বেলায়
কে জাগাল কোন্ সে সুরে।

শেখ হবিবর রহমান

হজরত ওমর।

হে ওমর! সিংহবীর্য্য শূরেন্দ্র কেতন,
ইসলাম-আকাশে তুমি দীপ্ত প্রভাকর
উগ্রতেজা ক্ষিপ্রকর্ম্মা বলীন্দ্র-বারণ,
প্রেরিত পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভক্ত অনুচর।
অতুল সাধনা তব অতুল প্রতিভা
হইয়া ধরণী জয়ী খলিফা প্রধান
কি আশ্চর্য্য! কি পবিত্র চরিত্রের বিভা,
কাটালে জীবন আহা! দীনের সমান!
শুভ্রমণাঃ ঋষি তুমি জীতেন্দ্রিয় বীর
শমদম পরায়ণ সাধক রতন,
রাজনীতি জ্ঞানে তুমি-কুশাগ্রধী ধীর।
সত্যসন্ধ পাপবৈরী কাফের দমন।
ইঙ্গিতে কম্পিত তব সসিন্ধু অবনী
খলিত রাজেন্দ্র-শীর্ষ মুকুট-ভূষণ,
আজ্ঞাধীন ছিল তব বিক্রান্ত বাহিনী
প্রদীপ্ত পাবক তব মূরতি শোভন।
মিসর সিরিয়া আর পারস্য আফ্‌গান;
বিজিত হইল বীর তোমার যতনে,
খালেদ অমর তব সেনানী প্রধান
রাখিলা অতুলকীর্ত্তি এমরভুবনে।
প্রদীপ্ত ইসলাম-রবি তোমারি সাধনে
পরিল সমগ্র ধরা আলোক প্রভায়,
ইসলামের জয়ধ্বনি উঠিল গগণে,
ভাতিল গৌরব রবি অনন্ত ছটায়।
সে গৌরব রবি হায়! এবে অস্তমিত
হে ফারুক! পুনঃ কবে হইবে উদিত?

সিরাজী
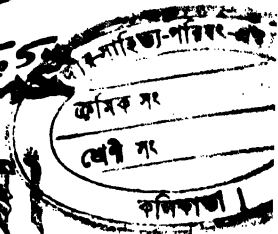
১ম ভাগ | চৈত্র, ১৩২২ | ১২শ সংখ্যা

এস্‌লাম সভ্যতা ও উন্নতির পরিপন্থী নয়, বরং সহায় ও উৎসাহদাতা।

(৪)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

افلم يايئس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا

" অনন্তর বিশ্বাসী (মোসলমান) গণের কি ধৈর্য্য নাই যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে সমুদয় মনুষ্যকে পথ দেখাইতেন " সুরা রঅদ, ৪ রুকু।

و لو شاء الله لجعلهم امة واحدة

"এবং যদি আল্লাহ চাহিতেন তবে তাহাদিগকে এক মণ্ডলী-ভুক্ত করিতেন" সুরা শুরা, ১ রুকু।

و لو شاء لهدكم اجمعين

" এবং যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন তবে একযোগে তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেন " সুরা নহল, ১ রুকু।

و لو شئنا لاتينا كل نفس هدها

" এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ধর্ম্মালোক দান করিতাম" সুরা সেজদা, ২ রুকু।

প্রেরিত মহাপুরুষ পয়গম্বর বটেন, কিন্তু তিনি মানুষ, এইজন্য মানবীয় ভাব প্রবণতা বশতঃ ধর্ম্মদ্রোহীদিগের ঔদ্ধত্যভাব, তাচ্ছিল্য এবং উপেক্ষা কোন কোন সময়ে তাঁহার প্রতি কষ্ট-

দায়ক হইত, এবং তাহাতে তিনি অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেন, ইহাতে আল্লাহতাআলা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

و ان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغى نفقا فى الارض او سلما فى السماء فتاتيهم باية و لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجهلين

"এবং যদি তাহাদিগের উপেক্ষা তোমার সম্বন্ধে কঠিন হইয়া থাকে, তবে যদি পার ভূমিতে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর, পরে তাহাদের নিকটে কোন অলৌকিক নিদর্শন (মোজেজা) উপস্থিত কর, আল্লাহতাআলা যদি ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্যই তিনি তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনে একত্রিত করিতেন, অতঃপর তুমি মূর্খদিগের অন্তর্গত হইও না" সূরা আনাম, ৪ রুকু।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষের প্রকৃতি এমন ভাবে গঠিত হইয়াছে যে যখন কোন সত্যের প্রচারক উপদেশ ও বক্তৃতার সাহায্যে সত্য প্রচার করেন, তখন তাহারা সে সত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য আল্লাহ তাআলা উপদেশ ও বক্তৃতার সাহায্যে এসলামধর্ম্ম প্রচারের আদেশ করিয়াছেন, যথা :—

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن

"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথেরদিকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উত্তম উপদেশের সহিত, (লোকদিগকে) আহ্বান কর, এবং উত্তম নিয়মানুসারে তাহাদের সহিত বিতর্ক কর" সূরা "নহল" ১৬ রুকু।

فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر

"অনন্তর তুমি (লোকদিগকে) উপদেশ দান কর, তুমি মাত্র উপদেশদাতা, এতদ্ভিন্ন তুমি তাহাদের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ নও" সূরা "গাশিয়া" ১ রুকু।

فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا

"অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করিবে।" সূরা মোজাম্মেল ১ রুকু।

افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

"পরন্তু তুমি কি বলপূর্ব্বক লোকদিগকে মোসলমান করিতে ইচ্ছা কর?" সূরা "ইয়ুনুস্" ১০ রুকু।

বিশ্বাস কোন বাহ্যবস্তু নয়, অন্তরের সহিত তাহার অতি প্রগাঢ় অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে, এইজন্য অত্যাচার এবং বল প্রয়োগের দ্বারা কোন ব্যক্তি কাহারও হৃদয়ে কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে পারে না। এই নীতি অনুযায়ী ধর্ম্ম সম্বন্ধে বল প্রয়োগ করা একেবারেই

গর্হিত ও অনর্থক কার্য্য। কিন্তু যতদিন এস্লাম তাহার স্বাভাবিক উদার উদাত্ত সুরে এ কথা ঘোষণা না করিয়াছিল যে, "ধর্ম্মের জন্ত বল প্রয়োগ নাই" (১) لا اكراه فى الدين । ততদিন জগৎ এ সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝিতে সক্ষম হয় নাই।

সুবিখ্যাত ফ্রান্স পণ্ডিত "জোল্ সিমান" লিখিতেছেন যে, "ধর্ম্মের অত্যাচার হইতে জগৎ বেশী দিন স্বাধীনতা লাভ করে নাই, কেন না পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাসই বাস্তব পক্ষে ধর্ম্মগত বিদ্বেষ ও হিংসার সমষ্টি মাত্র" ইহার পর পণ্ডিত প্রবর পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, মধ্য যুগ অবধির ধর্ম্মগত বিদ্বেষের ঘটনা সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, এবং পরিশেষে তিনি লিখিয়াছেন যে, "বস্তুতঃ দার্শনিক জীবনের প্রভাবে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ৪ ঠা আগষ্ট ধর্ম্মের নিষ্পেষণ হইতে স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে প্রথম বিতর্ক হইয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই, তৎপর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে যখন ইহুদীদিগকে অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত করা হয় তখন কার্য্যতঃ ইহা ব্যবহারাধীনে আসিয়াছিল। প্রত্যুৎ ফ্রান্সের আভ্যন্তরিণ অবস্থা তখনও সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলিত হয় নাই, এইজন্ত এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতার বিধানটি তখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।"

উপরোক্ত পণ্ডিত প্রবর, ধর্ম্মগত স্বাধীনতাবাদ মত প্রচারের উৎপত্তি ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ১২০০ বার শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণ সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার সহিত এসলাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এসলাম এবং তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা বিধায় পণ্ডিত প্রবর গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, অথবা ইচ্ছা করিয়া আত্মদোষ পরের ঘাড়ে চাপাইয়া পরের গুণ নিজের জাতীয় গুণ বলিয়া প্রচার করিয়া আত্ম-জাতি গৌরবান্ধতার বিকট মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন।

৫। সভ্যতার উন্নতি বিধান করিতে যে গুলিন শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন আছে, "নারী ও পুরুষের স্বত্ব ও অধিকার তুল্য বলিয়া মানিয়া লওয়া তন্মধ্যে অন্ততম। কিন্তু এসলামের অবির্ভাবের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে সমস্ত সংসারের ব্যবহারই ঘোর নীতি গর্হিত ছিল, এসলামই সর্ব্বপ্রথমে এ সম্বন্ধে যাহা স্বাভাবিক, সেই শিক্ষা দিয়াছে। এ বিষয়টি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

৬। কোন জাতিকে উন্নতিলাভ করিতে হইলে সে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই আত্মসম্মান জ্ঞান (Self-respect) প্রতিষ্ঠিত এবং উপলব্ধি করাইতে হইবে। এসলাম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মোসলমানদিগকে অতি উত্তমরূপে এই শিক্ষা দিয়াছে। যেমন পবিত্র কোরআনে মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। كنتم خير امة সুরা আল এমরাণ, ১২ রুকু। "তোমরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়" لله العزة و لرسوله و للمومنين "আল্লাহতাআলার ও প্রেরিত পুরুষের এবং বিশ্বাসী (মোসলমান) দিগের জন্তই শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান।" সুরা মোনাফেকুন ১ রুকু।

---

(১) সুরা বকরা ৩৪ রুকু।

এস্লামের প্রাথমিক যুগে, অর্থাৎ যতদিন এসলাম তাহার যথার্থ মূর্ত্তিতে সংসারে বিরাজমান ছিল, ততদিন এই আত্মসম্মান জ্ঞান মোসলমানদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিতেই—তা সে দাসই হউক না কেন—পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, তাহারা প্রত্যেকেই আপনাকে জাতির একজন বিবেচনায় সকলের সহিত তুল্য পদ বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত, এবং এই অভিনব আত্ম-সম্মান-জ্ঞান ও উজ্জ্বল সাম্যের আদর্শই তাহাদিগের উন্নতির বেগকে শত মুখী করিয়া তাহাদিগকে, উচ্চাকাঙ্ক্ষাশীল, সৎসাহসী, অধ্যবসায়ী এবং নির্ভীক করিয়াছিল। যিনি ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তিনি দেখিয়াছেন যে, তৎকালীন এক একজন সাধারণ মোসলমান, বিপুল বৈভবশালী অত্যন্ত আড়ম্বর প্রিয় ঐশ্বর্য্য মদগর্ব্বিত পারস্য এবং রোমক রাজদরবারে কি অভিনব নির্ভীক এবং স্বাধীন অন্তকরণের সহিত বিতর্ক করিতেছেন।

৭। জ্ঞানই উন্নতির অনুকূলে শ্রেষ্ঠতম নীতি, এই জ্ঞানকে এসলাম তাহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছে। পবিত্র কোরআন এবং হাদিস্ শাস্ত্রে জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে যে সকল ভূরী ভূরী উপদেশ রহিয়াছে, এস্থলে তাহার আলোচনা ত্যাগ করিয়া কেবল সেই সকল উপদেশের ফলে কার্য্যতঃ যাহা ঘটিয়াছে, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইব এবং ইতিহাস প্রতিপদে এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত রহিয়াছে যে, পৃথিবীর যে অংশেই এসলাম পদার্পণ করিয়াছে, জ্ঞান, শিক্ষা ও সভ্যতা সঙ্গে লইয়াই গিয়াছে। পৃথিবীর যে সকল জাতি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া মূর্খতা ও অজ্ঞানতার সহিত অতিঘৃণ্য অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছিল, এসলামের সহবাস লাভ করিবামাত্রই তাহারা শিক্ষা ও জ্ঞান সম্পদে সম্পদশালী হইয়া অতি অল্প সময় মধ্যে জীবনে এক অতি অভিনব ও অলৌকিক পরিবর্ত্তন সাধনে সক্ষম হইয়াছিল। আরবগণ বরাবরই মূর্খ ছিল, এমন কি এসলামের প্রায় সাম সাময়িক সময় পর্য্যন্তও তথাকার বড় বড় "কবি"রাও হস্তে লিখন অথবা পুস্তক অধ্যয়ন করাকে লজ্জাস্কর কার্য্য বলিয়া জানিতেন, "রোদবা" আরবের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন, ইনি লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন এক ঘটনা উপলক্ষে একদিন যখন ইঁহাকে লোকের সম্মুখে কিছু লিখিবার আবশ্যক হইয়াছিল, তখন লজ্জায়, তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "এ কথা যেন কোথায়ও প্রকাশ না হয়, নতুবা আমার মস্ত দুর্ণাম রটিবে এবং তাহাতে জনসমাজে আমাকে লজ্জিত হইতে হইবে।" এই আরব এসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি সর্ব্ববিধ শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল, এবং তথা হইতে শত সহস্র দার্শনিক, নৈয়ায়িক, ঐতিহাসিক, তত্ত্ব শাস্ত্রবিৎ, ও বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পক্ষান্তরে তথা হইতে এমাম আবু হানিফা "শাফী" "মালেক" ও "জহরীর" ন্যায় মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দাতার অভ্যুদয় হইয়াছিল, ইঁহারা প্রত্যেকেই একাধারে তত্ত্বশাস্ত্রবিদ্ দার্শনিক নৈয়ায়িক, হাদিস শাস্ত্রে সুনিপুণ কোরআনের সূক্ষ্ম মর্ম্মোদঘাটক ছিলেন। এসলামের আবির্ভাবের বহু সহস্রবর্ষ পূর্ব্ব হইতেও তুর্কী জাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আকৃতিগত পার্থক্য ব্যতীত আর কোন বিষয়েই তাহারা

কখনও পশু অপেক্ষা উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল কি? এই তুর্কী জাতির মধ্যে এসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানী প্রবর দার্শনিক "আবু নসর ফারাবী" ও "আমির খসরু"র ন্যায় শত শত কবি, দার্শনিক, ও ঐতিহাসিকের অবির্ভাব হইয়াছিল। পৃথিবীর যে যে অংশের যে যে জাতি এসলাম গ্রহণ,—অথবা তাহার সংস্রব লাভের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, তাহাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া দেখ যে, পূর্ব্বে শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে তাহাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং পরেই বা কি হইয়াছে? এই সকল দেখিলে পরিস্কার ভাবে প্রতীয়মান হইবে যে, জ্ঞানার্জ্জন এসলামের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত।

৮। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী ও উন্নতির অনুকূল প্রধান নীতি সমূহের অন্যতম। মানবের এই অতি আবশ্যকীয় নিয়মটি এসলাম কর্ত্তৃক এত দৃঢ়তার সহিত নিয়মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, স্বয়ং প্রেরিত মহাপুরুষ ও এই নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, যথা আল্লাহতাআলা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন:— و شاورهم فی الامر " অর্থাৎ কার্য্যে তাহাদের সহিত মন্ত্রণা কর" বস্তুতঃ প্রেরিত মহাপুরুষের পক্ষে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিবার আবশ্যকই ছিল না, যেহেতু আল্লাহতাআলা কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই তিনি কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু তবুও তাঁহাকে এই সাধারণ নিয়ম পালন করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

ইহার পর দৃঢ়তর আদেশের দ্বারা মোসলমানদিগকে পরস্পরের সহিত পরামর্শযোগে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে এবং এ বিষয়টি তাহাদের জাতীয় বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

و امرهم شوری بینهم

অর্থাৎ "পরস্পরের সহিত পরামর্শ যোগে ইহাদিগের (মোসলমানদিগের) কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে"।

৯। শ্রম-বিভাগ নিয়মানুসারে কার্য্য করা উন্নতি বিধানের অনুকূল নীতি সমূহের অন্যতম। অর্থাৎ জাতির মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায় এক একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইবে তাহা হইলে বিশেষত্বের জন্য তাহারা সেই কার্য্যে অধিকতর উন্নতি বিধান করিতে সক্ষম হইবে। পাশ্চাত্যদেশে বর্ত্তমানে এই নিয়মটি এতই উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, তথায় চিকিৎসকদিগের মধ্যেও বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য পৃথক পৃথক ডাক্তার আছেন, এবং যিনি যে রোগে নিপুণ বলিয়া খ্যাত, তিনি সেই রোগ ব্যতীত অন্য রোগের চিকিৎসা করেন না। কেবল ইউরোপ কেন? স্বয়ং প্রকৃতিই এই নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছে, প্রত্যেক ঋতুর জন্য পৃথক পৃথক কার্য্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে, কোন ক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম হয় না, মানুষের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। হস্ত, পদ, মন ও মস্তিষ্ক প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক কার্য্য নির্দ্দেশিত রহিয়াছে। এই নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে এসলাম এই ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছে।

و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر

"এবং তোমাদিগের মধ্যে এমন একটি দল নিশ্চয় থাকা চাই, যাহারা লোকদিগকে সৎকর্ম্মে প্ররোচিত ও অসৎকর্ম্ম হইতে নিবারিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকিবে"।

و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين

"সকল মোসলমানের পক্ষে গৃহত্যাগী হওয়া সম্ভবপর নহে, কিন্তু তবে কেন প্রত্যেক সমাজ হইতে এক এক দল লোক এরূপ বাহির হয় না, যাহারা ধর্ম্মেতে জ্ঞানার্জ্জন করিবে" (ছুরা তওবা ১৫ রুকু)।

১০। পৃথিবীতে চিরদিনই এমন এক সম্প্রদায় লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা মানব জাতির মধ্যে যে পদ মর্য্যাদার তারতম্য আছে, তাহার মুলোৎপাটন করিবার জন্য নিয়তই সচেষ্ট। ইউরোপে "এনার্কিষ্ট" "নিহিলিষ্ট" "সোসিয়ালিষ্ট" প্রভৃতি সম্প্রদায় ও এই ধারণারই লোক। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে এই ধারণাটি প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এবং যদি কখনও এই নিয়ম মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহা হইলে যাবতীয় উন্নতির বেগ একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। এসলাম নিম্নোক্ত আদেশের দ্বারা এই তারতম্যের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়াছে।

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات
لتخذ بعضهم بعضا سخريا

"আমি পৃথিবীতে মানবের জীবিকা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করিয়াছি, ও তাহাদের একজনকে অন্য জনের উপর পদানুসারে উন্নত করিয়াছি যেন তাহাদের একে অন্যকে নিজের কার্য্যে গ্রহণ করে"। সুরা জোখ্‌রোফ ৩ রুকু।

১১। উন্নতি সাধনের অনুকুলে অপর একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ম এই যে, জ্ঞানোন্নতির কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিবে না, অর্থাৎ মানুষ উন্নতির কোন এক সীমায় পঁহুছিয়া নিশ্চেষ্ট বা সন্তুষ্ট হইবে না, এবং এরূপ বুঝিবে যে, এখনও উন্নতির আরও অনেক সোপান অতিক্রম করিতে বাকী আছে। এই ধারণাটিকে এসলাম এতই প্রশস্ততা প্রদান করিয়াছে যে, স্বয়ং প্রেরিত মহাপুরুষ যিনি আধ্যাত্ম জ্ঞানে জ্ঞানবান—তাঁহাকেই এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

قل رب زدنى علما

অর্থাৎ "বল (হে মোহাম্মদ) হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে আরও অধিক জ্ঞান দাও।"

ইহকাল ও পরকালের সম্পর্ক।

ধর্ম্মের যথার্থতা নির্ণয়ের ইহাই একটি প্রধান তুলা দণ্ড। মানবজাতির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্মই (এসলাম ব্যতীত) এই সন্ধিক্ষণে আসিয়া ভুল করিয়া বসিয়াছে। "আবাহিয়া" ও মজ্‌দকিয়া সম্প্রদায় এবং এপোকারিসের অনুগামিগণ কেবলমাত্র পার্থিব সুখ সম্পদলাভ মন্ত্রের অগ্রগামী ও প্রচারক ছিল, ইহারা পরকাল বলিয়া কোন জিনিষ আছে

বলিয়া মানিত না। অপর আর সকল ধর্ম্মই পার্থিব সুখ সম্পদকে অতি ঘৃণার চখে দেখিয়াছে, মানুষের পক্ষে সংসারের সংশ্রব হইতে দূরে অবস্থান করাকেই তাহারা তাহাদের (মানুষের) পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, এই ধারণাই সংসারে যোগী, দরবেশ, রাহেব, মস্ক, প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছে। এবং সেই সকল সংসার বিরাগীদিগের প্রতি মানুষ এতই অধিক শ্রদ্ধাবান হইয়াছে যে, একজন সামান্ত "কোপিন" ধারীর সম্মুখে বড় বড় নরপতিরও মস্তক অবনত হইয়াছে।

জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন যে, "ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ গুণ ও মুখ্যোদ্দেশ্য এই যে, পার্থিব ও রাষ্ট্রীয় জীবন একেবারেই ধ্বংস করিতে হইবে, পরলোকে স্বর্গ সুখ লাভ উদ্দেশ্যে পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবসায়াদি ত্যাগ করিতে হইবে, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সর্ব্ববিধ প্রকৃতিগত ইচ্ছা ও কামনাকে বলি দিতে হইবে"

"লারভেস্" সাহেব লিখিতেছেন যে, সংসার বিরাগীদিগের উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল প্রকৃতিগত কামনার বীজ, মানুষের প্রকৃতিতে রক্ষিত হইয়াছে, সে সমুদয়কে সমূলে নাশ করিতে হইবে।" এস্থলে কেবল যে ধর্ম্মেরই বিশেষত্ব তাহা নয় বরং দর্শন বিজ্ঞানেরও কতকটা ঝোঁক এই দিকে পরিদৃষ্ট হয়। "সক্রোটিস" "প্লেটো" ও আবু নসর ফা'রাবী প্রভৃতির জীবন সম্পূর্ণ সংসার বিরাগীর জীবনেরই অনুরূপ ছিল। খুব চিন্তা করিয়া দেখ যে, এই ধারণা সমগ্র জগতের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমরা যখন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে শ্রুত হই যে "সে সংসারকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, মৃত্তিকার উপর উপবেশন করে, এবং কোন প্রকার উপকরণ বিহীণ শুষ্ক রুটিকার দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে" তখন আমাদের বিবেক বুদ্ধির অজ্ঞাতসারে, আমাদের অন্তরের শ্রেষ্ঠ স্থানে তাহার জন্য আসন রচিত হয়। এবং মাত্র ঐ সকল বিষয় ব্যতীত তাহাতে অন্য কোন প্রকার গুণ আছে কিনা, সে বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা বা মীমাংসা করার প্রবৃত্তি আমাদের মনে আর স্থান পায় না।

ইহকাল ও পরকালের মধ্যে তুল্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মানব জাতির জন্য একটা অতি সরল ও সহজ "মধ্য পথ" নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া এতই দুষ্কর কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান গর্ব্বী ইউরোপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও তাহাকে একেবারেই অসম্ভব সাব্যস্ত করিয়া পথটি লাভের আকাঙ্ক্ষায় আক্ষেপ করিতেছেন। "হেন্‌রী বারেজী" লিখিতেছেন (১)। "হায় যদি কোন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ধর্ম্ম এবং শিক্ষার মধ্যস্থিত বিদ্বেষের পর্দ্দাকে চিরদিনের তরে উঠাইয়া ফেলিতেন, এবং ধর্ম্মমত ও শিক্ষার অহঙ্কারের মধ্যে যে দৃঢ় সম্বন্ধ আছে তাহাকে পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে অনির্দ্দিষ্টকাল হইতে এতদুভয়ের মধ্যে যে দুঃখ ও অভিমান এবং মহা সংঘর্ষ ও বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, একেবারেই তাহার মূলোৎপাটিত হইয়া যাইত"।

---

(১) রিভিউ অব রিভিউ চতুর্বিংশতিতম সংখ্যা।

এই মধ্য পথ বা স্বাভাবিক ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষায় আধুনিক বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা, সমাজের নিকট সকরুণ আবেদন করিতেছেন।" (১) আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এ জগৎটাকে কিছুই নয় বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সাহিত্যে এদিকে দৃষ্টি একেবারেই ছিল না। তাঁহাদের দৃষ্টি জীবনের ওপারে কেবল পরলোকের দিকেই ছিল।" বক্তা মহোদয় আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন। "তাই আপনাদিগকে বলিতেছিলাম বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বারা আপনারা বঙ্গবাসীদিগকে সর্ব্বপ্রথমে "পরিশ্রমের মাহাত্ম্য" (Dignity of labour)" শিক্ষা দিউন। ভিক্ষা হইতে লোককে বিরত করুন। আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা দেশবাসীকে যে পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে আপনারা তাঁহাদিগকে কতকটা নিবৃত্ত করুন, তাঁহারা পরকাল পরকাল করিয়া লোককে পাগল করিয়া দিয়াছিলেন, আপনারা তাহাদিগকে ইহকালের কথাও স্মরণ করাইয়া দিন। তাহাদিগকে বলিয়া দিন, যে, ইহকাল ও পরকালের পরস্পর সংস্রব ও সম্পর্ক অতি নিকট ও অতি ঘনিষ্ঠ।"

এখন আমরা দেখাইতে প্রয়াস পাইব যে, এসলামের সূক্ষানুসন্ধায়ী অদ্বিতীয় তুলাদণ্ডে কিরূপে ইহকাল ও পরলোকের সম্বন্ধ তুলিত হইয়াছে।

এসলাম সন্ন্যাস ব্রতের মুলোৎপাটিত করিয়াছে

এস্‌লাম সর্ব্বপ্রথমে সন্ন্যাস ব্রত ও সংসার বিরাগ মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া গুরু গম্ভীর নাদে বলিয়াছে।

و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم و لا تنس نصيبك من الدنيا

"এবং যে সন্ন্যাস ব্রত (খৃষ্টানগণ) সৃষ্টি করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই—পৃথিবীতে তোমাদিগের জন্য যে স্বত্ব (অংশ) আছে তাহা বিস্মৃত হইও না।"

يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبت ما احل الله لكم

"হে মোসলমানগণ, খোদাতাআলা যে সকল জিনিষ তোমাদের জন্য বৈধ করিয়াছেন, সে সকলকে অবৈধ করিও না।

قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق

"বল, আল্লার সেই শোভা (জিনত) কে যাহা তিনি আপন দাসদিগের জন্য বাহির করিয়াছেন, (সৃষ্টি করিয়াছেন) এবং বিশুদ্ধ উপজীবিকা সকলকে কে অবৈধ করিল? সুরা আরাফ ৪ রুকু।

يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر

"খোদাতাআলা তোমাদিগের সহিত সহজ ব্যবহারের অভিলাষী, তিনি তোমাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না"

(১) সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহোদয়ের অভিভাষণ। মানসী ১৩২১। বৈশাখ ৩৩৩ ও ৩৩৪ পৃঃ।

অপর সকল ধর্ম্মই এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকে যে, এই বিশাল ও সুবিস্তৃত পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে আহারের জন্য সামান্য শুষ্ক রুটিকা ও পরিধানের জন্য সামান্য একখানি কৌপিন ব্যতীত তাঁহাদের জন্য আর কিছুই নাই। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগের প্রতি যে পাচটি অবশ্য পালনীয় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা এই, যথা :—

১। নিষিদ্ধকালে আহার গ্রহণ করিবে না। ২। যাত্রায় গান বাদ্যাদি করিবে না। ৩। অলঙ্কার, পুষ্পমাল্য ও সুগন্ধদ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না। ৪। প্রশস্ত রথাদিতে চলিবে না। ৫। স্বর্ণ রৌপ্যাদি দান গ্রহণ বা উপার্জ্জন করিবে না" দ্বেষ, হিংসা, আত্মান্ধতা ও পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে কেহ কি বলিতে পারেন যে, বুদ্ধদেবের এই পাচটি আদেশ মানুষের পক্ষে পালন করা সম্ভব? কিন্তু এসলাম শিক্ষা দিতেছে যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে—অর্থাৎ পর্ব্বত, মৃত্তিকা, সাগরজঙ্গম, নদনদী, বৃক্ষ, পশুপক্ষী, ফলমূল, হীরাজওয়াহের, রজতকাঞ্চন, সুগন্ধাদি সকলই মানুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই সকল ন্যায়ভাবে আবশ্যকানুরূপ ব্যবহার করিতে প্রত্যেক মানুষই যথার্থরূপে অধিকারী।

و سخر لكم ما في السموات و ما في الارض جميعا و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة

"এবং যাহা কিছু স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে সেই সমস্তই আল্লাহতাআলা তোমাদিগের অধিকৃত করিয়াছেন, এবং আপন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন সর্ব্ববিধ সম্পদ তোমাদের জন্য পূর্ণ করিয়াছেন। সুরা লোকমান। ৩ রূকু।

و سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرة بامره

"এবং তিনিই (আল্লাহতাআলা) দিবা ও রজনী এবং চন্দ্র ও সূর্যকে তোমাদের অধিকারে করিয়াছেন, এবং নক্ষত্রবৃন্দও তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তোমাদের অধিকৃত"। সুরা নহল ২ রূকু।

و هو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها
و ترى الفلك فيه و لتبتغوا من فضله

"এবং তিনিই (আল্লাহ) যিনি সমুদ্রকে এইজন্য অধিকৃত করিয়াছেন, যেন তাহা হইতে তোমারা সদ্য মাংস ভক্ষণ করিতে পাও ও আভরণ (মুক্তাদি)—যাহা তোমরা পরিধান করিয়া থাক, তাহা তাহা হইতে বাহির কর, এবং তাহাতে নৌকা সকল দেখিতেছ কি? (সমুদ্রে জলরাশি কর্ত্তন করিয়া চলিয়া থাকে) যেন তোমরা তাহাতে খোদার অনুগ্রহে জীবিকা (ব্যবসায়) অন্বেষণ করিতে পার।" সুরা নহল ৩ রূকু।

و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة

"এবং অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভদিগকে তিনি তোমাদিগের আরোহণের জন্য ও শোভার নিমিত্ত সৃজন করিয়াছেন। সুরা নহল ১ রূকু।

و ما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه

"এবং তিনি তোমাদিগের জন্য যাহা বিকীর্ণ করিয়াছেন তাহা বিভিন্নবর্ণ।" সুরা নহল ২ রুকু।

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب و من كل الثمرات

এবং তিনি (বারিবর্ষণ দ্বারা) তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, জয়তুন ও খোর্মাগাছ এবং দ্রাক্ষা ও সর্ব্ববিধ ফল উৎপাদন করেন।" সুরা ৮ রুকু।

পবিত্র কোরআনে এবম্বিধ শত শত উক্তি বিদ্যমান আছে, স্থানাভাবে আমরা তদুল্লেখে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

এই সকল উক্তিতে স্পষ্ট এবং উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, দৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই মানুষের উপকারার্থ ও ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। এবং এই জন্যই আল্লাহতাআলা এই সকল জিনিষকে মানুষের অধিকৃত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক জগতের জিনিষ সমূহ যথা,—গ্রহ, উপগ্রহ ও তারকাদি মানুষের অধিকৃত হওয়া সম্বন্ধে কোরআনে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে বাহ্যত দেখিতে তাহা অমূলক বা কবির কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যুগধর্ম্ম সর্ব্বদাই ইহার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত যে, ইহা অমূলক অথবা কবির কল্পনা নয়, বরং যথার্থভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তাপ, বিদ্যুৎ, তাড়িৎ ও শব্দ ইত্যাদি জিনিষ কি মানুষের অধিকৃত হয় নাই? এবং সেই সকলের দ্বারা অত্যাশ্চার্য্য ও বিস্ময়জনক ব্যাপার সমূহ কি সমাধা হইতেছে না?

এস্থলে বিশেষরূপে অবধানের বিষয় এই যে, যে সমস্ত জিনিষ পার্থিব সুখ সম্পদ ভোগের মধ্যে গণ্য, যদিও তাহার সংখ্যা বহুতর হইবে, কিন্তু মোটামুটি হিসাবে সে সমস্তকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা:—

(১) ধনসম্পত্তি। (২) বংশ। (৩) খ্যাতি। এখন দেখিতে হইবে যে, এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে এসলাম কি শিক্ষা দিয়াছে। ধনৈশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদাকে আল্লাহতাআলার বিশেষ দান সমূহের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে, এবং আল্লাহতাআলা প্রেরিত মহাপুরুষদিগকেও ইহা প্রদান করিয়া তাহাদিগের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তিনি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়াছেন। স্বয়ং আমাদিগের শেষ প্রেরিত মহাপুরুষকে আল্লাহতাআলা যে সমস্ত অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছেন, ধনসম্পত্তিও তন্মধ্যে অন্যতম। পবিত্র কোরআনে হজরতকে (সঃ) লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে;—

و وجدك عائلا فاغنى

"এবং তিনি তোমাকে নির্ধন পাইয়াছিলেন, পরে ধনবান করিয়াছেন। সুরা জোহা ৮ আয়াত।

প্রেরিত পুরুষ সোলেমানকে যে সাম্রাজ্য ও পদমর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছিল, পবিত্র কোর-আনে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, হজরত

সোলেমান আল্লাহতাআলা সমীপে ঐরূপ সাম্রাজ্য প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সোলেমান বলিয়াছিলেন,—

رب هب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى

"হে, আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে এমন সাম্রাজ্য প্রদান কর যে, আমার পরে তেমন আর কেহ না পায়।" সুরা সাদ ৩ রুকু।

আল্লাহতাআলা এস্রায়েল বংশীয়দিগকে যে সমস্ত অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠদান এইটি, যথা :—

اذ جعل فيكم انبيا و جعلكم ملوكا

"(আল্লাহ) তোমাদিগের মধ্যে পয়গম্বর প্রেরণ ও তোমাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছে"

و لقد اتينا بنى اسرائيل الكتب والحكم والنبوة

"এবং সত্য সত্যই আমি এস্রাইল বংশকে গ্রন্থ, সাম্রাজ্য এবং প্রেরিতত্ব প্রদান করিয়াছি।" সুরা জাসিয়া ২ রুকু।

فقد اتينا آل ابراهيم الكتب والحكمة و اتينا هم ملكا عظيما

"অনন্তর নিশ্চয় আমি এব্রাহিমের সন্তানদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান প্রদান করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে আমি মহা সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছি।" সুরা নেসা ৮ রুকু। (ক্রমশঃ)

আহমদ আলি।

প্রার্থনা

গিরি গুহা বন,
সৈকত বিজন,
খুজি আমি দশদিশি ;
না পাই তোমারে,
তবুও আমাতে,
রও তুমি দিবানিশি।
যবে দুঃখ বিভাবরী,
ঘিরে মম হৃদি,
অভয় দাও আমারে ;
আমি জানি না কিছু,
বুঝি না কিছু,
ভুলিয়া থাকি তোমারে।
সুনীল আকাশে,
রবি শশী হাসে,
বিহগ ধরিছে তান ;

ফুটেছে কমল,
বহে নদী জল,
তুলিয়া মধুর তান।
যে দিকে তাকাই,
দেখিবারে পাই,
তব প্রেমে রয় মাতি ;
সংসারের মোহে,
রয়েছি ভুলিয়ে,
আমি শুধু দিবারাতি !
ভেঙ্গে দাও মোর,
যত মোহ ঘোর,
বিবেক দাও আমারে ;
যেন সরল অন্তরে,
ভকতি পরাণে,
পুজিতে পাই তোমারে।

তালেবর রহমান।

বাবি ধর্ম্মের ইতিহাস

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি হইতে যে নব ধর্ম্ম পারস্য, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানে শনৈঃ শনৈঃ প্রচারিত হইয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ইহার দিকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং সুদূর ইংলণ্ড ও যুক্তপ্রদেশ সমূহেও নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই ধর্ম্মের নাম বাবি ধর্ম্ম। মির্জ্জা আলি মহম্মদ এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ১৮২০ খৃঃ অঃ ইনি সিরাজে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে মনোযোগ দেন এবং ১৮৪৪ খৃঃ অঃ নিজকে বাব (দ্বার) বলিয়া ঘোষণা করেন।

শিয়া মতাবলম্বীগণের মধ্যে একটী সম্প্রদায় আছে, তাঁহারা বিশ্বাস করেন * যে, খলিফা মুত্তামিদের রাজত্বকালে তাহাদের শেষ ইমাম পঞ্চবর্ষীয় বালক ইমাম মহম্মদ অল্‌মেহদি স্বীয় পিতা ইমাম হাছানুল্‌আস্কারির মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়া একটী বৃহৎ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তিনি এক্কাল পর্য্যন্ত অদৃশ্যভাবে জীবিত থাকিয়া লোকের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করেন ও মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে দর্শন দিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ দান করেন। সেই উপযুক্ত ব্যক্তিকেই বাব অর্থাৎ ইমামের আদেশ প্রচারের দ্বার বলা হয়।

এ কাল পর্য্যন্ত কেহ নিজকে বাব বলিয়া প্রচার করিতে সাহস করে নাই। মির্জ্জা আলি মহম্মদই প্রথমে বাবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছুকাল এই ধর্ম্ম প্রচার হইবার পর ইরাণিগণ দলে দলে এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। পারস্যের শাহ বিপদ জানিয়া আলি মহম্মদকে বন্দী করিয়া তেহরানের কারাগারে রাখিয়া দিলেন, কিন্তু তিনি বন্দী হওয়ায় দেশে শান্তি রক্ষা দূরে থাকুক বরং তাঁহার উত্তেজিত শিষ্যগণ বারফুরুষ, নিরিজ ও জেনজান নামক পারস্যের তিনটী স্থানে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। পারস্যের শাহ ২০,০০০ সৈন্য লইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হন, এবং আলি মহম্মদকে তেহরানের কারাগারের সম্মুখে ১৮৫০ খৃঃ অঃ ফাঁসি দেওয়া হয়; কিন্তু বাবিগণ তাঁহার মৃতদেহ কৌশলে হস্তগত করত একার নামক স্থানে আনিয়া কবরস্থ করে। এই একারই এখন বাবিগণের মক্কামদিনা। (নাউজ-বিল্লাহ)! আলি মহম্মদ যখন কারাগারে বন্দী ছিলেন, স্বীয় উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া, তখন কারাগার হইতেই কৌশলে মির্জ্জা এহিয়াকে স্বীয় উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করেন। মির্জ্জা এহিয়া সোবহে-আজল (صبح ازل) উপাধী ধারণ করতঃ অসীম উৎসাহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন এবং নিজকে বিপদাদি হইতে বাঁচাইবার জন্য বাগদাদে

* এ দেশেও এক শ্রেণীর লোক হজরৎ সৈয়দ আহমদ (রঃ) সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করিতেন। সুখের বিষয় এই যে, এখন তাঁহাদের এ বিশ্বাস অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। — সম্পাদক।

যাইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। স্বীয় ভ্রাতা মির্জ্জা হোসেন আলিকেও প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে দুই বৎসরকাল নির্ব্বিবাদে প্রচার কার্য্য চলিবার পর বাবিগণের দল বিশেষরূপে পুষ্ট হইতে লাগিল। এখন আর তাহারা ধর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট নয়, রাজনীতিক চালটাও চালিতে লাগিল। পারস্যের শাহকে তাহাদের উন্নতির অন্তরায় দেখিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। শাহ নসিরুদ্দিন এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া বাবিগণের ধ্বংস সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রত্যহ বাবিগণের ঝুঁড়ি ঝুঁড়ি চক্ষু ও কর্ণাদি শাহের নিকট আনয়ন করা হইত এবং প্রধান প্রধান প্রচারকগণকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইত। কিন্তু এত অত্যাচার সত্ত্বেও বাবিগণ দমিল না। শেষে শাহ তুরস্কের সুলতানের সহিত পরামর্শ করিয়া সোবহে আজলকে বাগদাদ হইতে বন্দী করত কনষ্টান্টিনোপলে পাঠাইয়া দেন। সুলতান সোবহে আজলকে, স্বীয় রাজধানীতে তাঁহার বাস যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করিয়া— ফামাগুস্তা নামক সাইপ্রেসের একটী গ্রামে অবরুদ্ধ করিয়া সামান্য বৃত্তিভোগী অবস্থায় রাখিয়া দিলেন।

১৮৭৪ খৃঃ অঃ যখন ইংরাজেরা সাইপ্রেস অধিকার করেন, তখন ফামাগুস্তা গ্রামে একটী ছোট দুর্গে সোবহে আজলকে বন্দী অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বয়স তখন ৫০ বৎসর, কিন্তু দেখিতে প্রায় ১৭০ বর্ষীয় বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার শরীর শীর্ণ, নাতিদীর্ঘ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষুদ্বয় দুঃখভারাক্রান্ত, নাসিকা দীর্ঘ এবং অগ্রভাগ বক্র; তাঁহার মস্তকে শ্বেত বর্ণের পাগড়ী, পরিধানে সবুজ রঙ্গের রেশমি আবা। সার চার্লস ওয়ালপোল লিখিতেছেন যে, তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় যেন সেণ্ট জোসেফ অবতীর্ণ হইয়াছেন। সোবহে আজলের মুখখানি একবার যে দেখিয়াছে জন্মাবধি আর ভুলিতে পারিবে না। *

সোবহে আজলের নির্ব্বাসনের পর বাবিগণ দুইটী দলভুক্ত হইয়া পড়িল। একদল সোবহে আজলের প্রদর্শিত পথানুসরণ করিতে লাগিল, আর একদল তাঁহার ভ্রাতা মির্জ্জা হোসেন আলিকে প্রকৃত "বাব" মনে করিয়া তাহারাই মতানুসারে চলিতে লাগিল। মির্জ্জা হোসেন আলি বাহাউল্লা নাম ধারণ করত নিজকে বাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং এই ধর্ম্মের অন্য একটী নাম বাহাই ধর্ম্ম রাখিলেন। কিন্তু সোবহে আজলের অনুবর্ত্তিগণ আপনাদিগকে বাবি ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই পরিচয় দান করে।

বাহাউল্লা পারস্যের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন ও রাজনৈতিক চর্চ্চা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে ১০ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পারস্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক স্বধর্ম্মে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

---

* (ক্লেদর, ক্লেম, শালি) মোটের উপর সব 'কোকরের একই ধারা, সম্ভবত এইজন্য সাহেবের এত সহানুভূতি। —সম্পাদক।

এখন পারস্যে বাবি ধর্ম্মাবলম্বীর দল কম পাওয়া যায় এবং বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীগণের দল দিন দিন বাড়িতেছে।

বাহাউল্লার শেষ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। পারস্যের শাহের প্রার্থনায় তুরস্কের সুলতান তাঁহাকে একারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখানেই ১৮৯২ খৃঃ অঃ ইনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন। ইহার মৃত্যুর পর ইহার পুত্র এফেন্দি আবদুল বাহা নাম ধারণ করিয়া দেশবিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ১৯১০ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডে গিয়া স্বীয়ধর্ম্ম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইনি একটা বক্তৃতা প্রদান করেন।

অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যেই পারস্যের এক তৃতীয়াংশ ও সীরিয়ার প্রায় সমুদয় লোক বাবি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যুক্তরাজ্য সমূহে অনেক বাবি ধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তুরস্কের সুন্নিগণের নিকট এই ধর্ম্ম অলীক বলিয়া বোধ হওয়ায় সেখানে ইহার কোন প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ শিয়া এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তাহার কারণ, পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের বিশ্বাস আছে যে, তাহাদের শেষ ইমাম মহম্মদ অল্‌মেহদি জীবিত আছেন। বাবি ধর্ম্ম সেই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত হওয়ায় শিয়াগণকে সহজে ইহার দিকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে।

বাবিগণ বিশ্বাস করেন যে, হজরত মহম্মদ (দরূদ) শেষ নবি নন, পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন নবির আবির্ভাব হয়, এবং যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে শান্তি, ভালবাসা, স্বাধীনতা এবং একতা স্থাপিত না হইবে, ততদিন নবির আবির্ভাব হইতে থাকিবে।

ফলতঃ শিয়া মজহাবের একটা আজগৈবী অপ্রমাণ্য ও ধর্ম্ম বিগর্হিত বিশ্বাসের উপর এই ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এসলামের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ বা সংস্রব নাই। আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানহীন নব্য শিক্ষিতদিগের নিকট, ঠিক তাঁহাদের রুচির অনুরূপ করিয়া ইহারা এমন কয়েকটা কথা প্রকাশ করে যে, বাহ্যদৃষ্টিতে তাহা খুবই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা প্রবঞ্চণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাবি ও বাহাই উভয় দলের প্রচারকেরা এদেশে বহুদিন হইতে আড্ডা জমাইয়াছে। খুব ধীরে ও নীরবে তাহাদের কাজ চলিতেছে। কলিকাতায় তাহাদের স্থায়ী মিশনও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু হায়! আমাদের কয়জন আলেম ইহাদের ন্যায় আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া মন্ত্রের সাধন করিতে সক্ষম ?

খলিলুল্লাহ।

হজরত রাবিয়া বসরী।

যে সমস্ত মোস্‌লেম রমণী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ পুণ্য ও তপস্যা বলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় অমর হইয়া গিয়াছেন, তাপস-কুলরাণী রাবিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন। করুণাময় খোদাতাআলার নিয়মই এইরূপ যে, যখন যে জাতি উন্নতি লাভ করে, তখন তাহার মধ্যে খ্যাতনামা মহাজনদিগের আবির্ভাব হয়। তাই মুসলমান রাজ্য যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তারলাভ করিতেছিল, সেই সময় পারস্য উপসাগরের উপকূলে টাইগ্রীস নদীর মোহনা স্থিত, প্রসিদ্ধ বসরা নগরীর এক ক্ষুদ্র পল্লীতে তপস্বিনী রাবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহাম্মদ ইসমাইল। রাবিয়া অতি শৈশবেই মাতৃহারা হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি একমাত্র পিতার যত্নে লালিত পালিত হন।

ইসমাইলের অবস্থা তত ভাল ছিল না। তাঁহাকে কঠিন পরিশ্রম করিয়া উদর পালন করিতে হইত। এইরূপে দুঃখে কষ্টে পিতায় কন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিছুদিন পর, দশ বৎসর বয়সের সময়, রাবিয়ার উপর এক আকস্মিক বিপদ ঘটে। আরবের লুণ্ঠন-প্রিয় বর্ব্বর বেদুইন জাতি ডাকাতি করিবার জন্য রাবিয়ার বাসগ্রাম আক্রমণ করে এবং অন্যান্য বহু লোকের সহিত ইসমাইলকেও ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসরূপে আবদ্ধ রাখে। নিরাশ্রয় বালিকা পিতৃশোকে অধীরা হইয়া পড়িলেন। নিজে পরিশ্রম করিয়া খাইবার যোগ্য বয়সও ক্ষমতা তাঁহার হয় নাই। তিনি মহাবিপদে পড়িলেন। পল্লীবাসি লোকেরা তাঁহার বিপদে দয়াপরবশ হইয়া স্থির করিলেন যে, রাবিয়া প্রতিদিন তাঁহাদের এক এক গৃহস্থের অতিথী হইবেন। এইরূপে তিনি প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন এবং শৈশবকাল হইতেই দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও আত্মসংযমী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কখনও অলসতার প্রশ্রয় দেন নাই—যেদিন যাহার অতিথী হইতেন, সেখানেই গিয়া কাজকর্ম্ম করিতেন। বিনা পরিশ্রমে বসিয়া খাইতেন না।

একদিন রাবিয়া তাঁহার নির্জ্জন কুটীরখানিতে বসিয়া বসিয়া বিষণ্ণ মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন, স্নেহশীল পিতার দয়ামমতার কথা মনে করিয়া শোকে কষ্টে অধীরা হইয়াছেন, এমন সময়ে জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত, তৃষ্ণাক্লিষ্ট এক বৃদ্ধ দৌড়িয়া তাঁহার কুটীরদ্বারে উপনীত হইলেন এবং পাণি দাও, পাণিদাও বলিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। রাবিয়ার কুটীরে পাণি ছিল না, তিনি পাণি আনিতে দৌড়িয়া গেলেন; ফিরিয়া আসিয়া দেখেন বৃদ্ধ পিতা ইসমাইলের প্রাণবায়ু তাঁহার ক্ষীণ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি তখন আরও দ্বিগুণ শোকে অধীরা হইলেন। বৃদ্ধ পিতা তাঁহার একমাত্র কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত দুস্তর মরুভূমি পার হইয়া প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন, অথচ একবিন্দু জলের অভাবে তাঁহার মৃত্যু হইল! এ দুঃখে রাবিয়ার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষস্থল সিক্ত করিল।

কিছুদিন পর রাবিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তিনি যেমন কাল তেমনই কুৎসিৎ ছিলেন সুতরাং বিবাহ করিয়া সংসার সুখ লাভের ইচ্ছা তাঁহার মনে আদৌ উদয় হয় নাই।

লীলাময় বিধাতার লীলাখেলা অতীব আশ্চর্য্য। তিনি যাহাকে ভালবাসেন, যাঁহারা তাঁহার প্রেমে মাতোয়ারা, তাঁহাদের উপরেই দুঃখের উপর দুঃখের বোঝা চাপাইয়া দেন। সেই অসভ্য বর্ব্বর বেদুইন জাতি পুনরায় রাবিয়ার বাস-পল্লী আক্রমণ করিল এবং অন্যান্য বহুলোকের সহিত রাবিয়াকেও ধরিয়া লইয়া গিয়া বসরা নগরের এক ধনাঢ্য লোকের নিকট দাসীরূপে বিক্রয় করিল। রাবিয়ার প্রভুগৃহে বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতগণের সমাগম হইত এবং সকলে মিলিয়া নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতেন। একদা এইরূপ সম্মিলনসময় রাবিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় আহার সামগ্রী পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময় এক পণ্ডিত অস্থি-গ্রন্থী হইতে মাংস লইতে গিয়া গ্রন্থীর সংস্থান দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ইহা কেমন কৌশলে স্থাপিত, মানুষের শরীরেও কি ঠিক এইরূপ?" উত্তরে এক হাকিম বলিয়া উঠিলেন, "মানুষের শরীরেও ঠিক এইরূপ, তবে চতুষ্পদ ও দ্বিপদের মধ্যে সামান্য প্রভেদ রহিয়াছে" প্রথম ব্যক্তি বলিল, "এই সময় উহা দেখিতে পাইলে কি আনন্দই না হইত।" এই কথা মদমত্ত গৃহকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র রাবিয়াকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই দাসীটার পা কাটিয়া দেখিলেইত হয়।" আদেশ পাইবামাত্র কয়েকজন তাঁহাকে চপিয়া ধরিল এবং একজন হাকিম ছুরিদ্বারা সন্ধিস্থান কাটিয়া ফেলিল। রাবিয়া মহাবিপদ ও যন্ত্রণায় পড়িয়াও হিমাদ্রি সদৃশ্য অচল, অটল হইয়া রহিলেন। অস্থিগ্রন্থীর সংস্থান দর্শনে এক পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "আল্লার কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি।" এ হেন কষ্টের সময়ও খোদার মধুময় নাম রাবিয়ার কর্ণে অতুল স্বর্গীয় অমৃত বর্ষণ করিল। তিনি দুঃখ যন্ত্রণা সব ভুলিয়া গেলেন এবং খোদা প্রেম আত্মহারা হইয়া "শোক্‌রে খোদা" (খোদাকে ধন্যবাদ) বলিয়া যন্ত্রণার লাঘব করিলেন। সাধ্বী রাবিয়া যথার্থই খোদা প্রেমিকা ছিলেন। খোদার নাম শুনিলেই তিনি আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন। দয়াময় আল্লাহতাআলার নাম তাঁহার পবিত্র সরল হৃদয়ে অক্ষরে অক্ষরে অঙ্কিত ছিল; তাই সেই নাম শুনিবামাত্র সব দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন এবং মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া পড়িয়া আত্মহারা হইয়া বলিতে লাগিলেন—"দয়াময় প্রভো, আজিকার যন্ত্রণায় হৃদয়ঙ্গম করিলাম। এতদিন আমাকে কতদিক দিয়া কত যত্নে রাখিয়াছ, আহত হইয়া জানিলাম কত সুখেই না ছিলাম! হায়, কতজনই না আমার ন্যায় কষ্ট পাইতেছে! বিধাতা, কবে তুমি তাহাদের সেই সব দুঃখ আমার বুকে চাপিয়া দিয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান করিবে? দয়াময় আমি দুর্ব্বলা বালিকা হইলেও তোমার মধুমাখা নামে সব যন্ত্রণা নিঃশব্দে বহন করিতে পারিব।"

আরবের আতিথেয়তা দেশ বিখ্যাত। রাবিয়ার প্রভু প্রথমে অতিথিসৎকার না করিয়া আহার স্পর্শ করেন না। একদিন রাবিয়ার প্রভুগৃহে অতিথিসমাগম হয় নাই, ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল তবুও কোন অতিথি আসিল না। অতঃপর গৃহকর্ত্তা দাসদাসীদিগকে

বিদায় দিয়া একাকী অতিথির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে ভৃত্যাবাসের নিকট দিয়া বাহিরে রাস্তার ধারে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, রাত্রি গভীর হইয়াছে, প্রকৃতি নিরব নিস্তব্ধ। গৃহস্বামী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এমন সময়ে এক মধুবর্ষী করুণ স্বর তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি ধীরে ধীরে স্বর লক্ষ্য করিয়া পদবিক্ষেপ করিতে করিতে রাবিয়ার কক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন। জগত নিরব, পশু পক্ষী সকলই ঘুমঘোরে অচেতন, শুধু রাবিয়া জাগরিত থাকিয়া দয়াময় আল্লার নিকট কাতর-করুণ-কণ্ঠে আরম্ভ করিতেছেন—"ওগো হৃদয় স্বামী, তোমাকে শত ধন্যবাদ; হে আমার অন্নদাতা প্রভু, তোমাকেও শত ধন্যবাদ। তোমার নিকট যে মাথা রাখিবার স্থান ও জীবন ধারণের অন্নজল পাইতেছি তজ্জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ; আর তোমার আদেশে যে যন্ত্রণা পাইয়াছি তাহার জন্য আরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি জ্ঞানহীনা; তোমার দয়াতেই অনাথের নাথ আল্লাহ, তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। হে জগতের পতি, তোমার কাছে আর কি চাহিব? দয়াময় প্রভো, তোমাকে ডাকিলেই যে অনন্ত অপার্থিব সুখ পাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তো তাহার তুলনা নাই। ইচ্ছা হয়, সর্ব্বক্ষণ কেবল তোকে হৃদয়ে বসাইয়া সেই সুখ তোমাকেই দেখাই—আর আনন্দে তোমার নাম জপিতে জপিতে নাচিয়া বেড়াই।"

—"প্রভো যাতনা পাইলে দুঃখ হয় তাই কাঁদি, নিজের জন্য নহে, ভাবি আরও কত শত শত জন বেদনায় ভুগিতেছে। জগত পিতা! মানব দুর্ব্বল, কেন তুমি তোমার দুর্ব্বল সন্তান সন্ততিদিগকে এত দুঃখ কষ্ট দেও? হে নিখিল নাথ—অনাথের গতি—পতিতের পাবন, তুমি জান; মনে হয়, সর্ব্বদাই ভক্তিভরে তোমার সেবায় রত থাকি; কিন্তু দয়াময়, আমি অন্যের দাসী, তাই প্রত্যহ বিলম্বে পদতলে উপস্থিত হই। তুমি করুণাময়, আমায় ক্ষমা করিও। আমি অকৃতজ্ঞ নহি, তোমাকে শত শত ধন্যবাদ।"

গৃহকর্ত্তা এই সব দেখিয়া শুনিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। সামান্য দাসীর এইরূপ নিষ্কাম খোদাপ্রেমে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। যাহাযারা একদিন কত যন্ত্রণা পাইয়াছেন, তাহারই মঙ্গলের জন্য করুণ প্রার্থনা! এমন সরলভাবে জগতের হিতকামনা কতই না বিরল। গৃহকর্ত্তা উন্মত্তের ন্যায় প্রাসাদে ফিরিলেন। লজ্জা, ভয় ও ভক্তি একযোগে আসিয়া তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিয়া দিল।

সে দিবস তাঁহার চিন্তায় চিন্তায় অতিবাহিত হইল। পর রাত্রে তিনি পুনরায় রাবিয়ার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার কক্ষ স্বর্গীয় নূরে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে এবং রাবিয়া তন্ময়চিত্তে কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতেছেন—"ওরে ভিখারী, ওরে অন্ধ, ওরে ক্ষুধার্ত্ত, ওরে পঙ্গু, আয়, আমার দুঃখী ভাই বোন আমার বুকে আয়, তোদের যন্ত্রণা যে আমার অসহ্য। তোদের দুঃখ, কষ্ট, জরা, ব্যধি আমাকে দিয়া তোরা শান্তিলাভ কর। দয়াময়, যতদিন তুমি তাহাদিগকে সুখী না কর ততদিন আমি সুখ চাহি না।"

—"প্রভো! তুমি রহিম, তুমি রহমান, যতদিন তুমি পাপীকে পরিত্রাণ না কর, তাপিতকে শান্তি না দাও, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান না কর, ততদিন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। যদি কেবল সুখের জন্য স্বর্গ চাই, তবে সে স্বর্গ আমার পক্ষে হারাম হউক, যদি কেবল নরকের ভয়ে মুক্তি চাই, তবে সেই নরকেই আমার বসতি হউক; তোমার সাধনাই আমার স্বর্গ, তোমার বিচ্ছেদই আমার নরক, তোমার আদেশই আমার অবলম্বন, তোমার ইচ্ছাই আমার সুখ।"

গৃহস্বামী আর পূর্ব্বের সেই গৃহস্বামী নহেন। এখন তাঁহার পদমর্য্যাদার অভিমান নাই, ধন ঐশ্বর্য্যেরও গৌরব নাই। রাবিয়ার নিঃস্বার্থ প্রেম দর্শনে তিনি দাসী ও প্রভুর বিভিন্নতা ভুলিয়া গেলেন। চতুর্থ দিবসে তিনি রাবিয়াকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেবী, আমার রক্ষা করুন, আপনি রমণীকুলের উজ্জ্বল শিরোমণি। আপনারই প্রভাবে আমার মোহজনিত অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। আমি এখন জগতপিতা করুণাময় আল্লাহতাআলাকে চিনিতে পারিয়াছি। মা! আমি আপনার নির্ব্বোধ সন্তান, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার স্বার্থহীন পরের হিতকামনা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, ভক্তির সহিত আপনাকে মুক্তিদান করিলাম, আপনি এখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করুন।"

রাবিয়া লজ্জাবনত মস্তকে উত্তর দিলেন,—"প্রভো! আমাকে নিরাশ্রয়া করিবেন না। আমি অনাথিনী, আপনার নিকট আশ্রয় পাইয়া খুব সুখেই আছি। কি দোষে আমায় পরিত্যাগ করিতেছেন? আপনার দয়ায় আমার অন্ধকার হৃদয় আলোকিত হইয়াছে। সেবা দ্বারা দাসীরূপে সামান্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছি মাত্র। আমায় তাড়াইয়া দিবেন না।"

গৃহকর্ত্তা পুনরায় ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ওহো! আপনি মানবী নহেন, স্বর্গীয় তপস্বিনী। নরাধম সন্তানের পাপপূর্ণ গৃহ আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান নহে। আমার কৃতকার্য্যের জন্য আমি অনুতপ্ত হইতেছি, সন্তান জ্ঞানে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন। এখন হইতে আপনি মুক্ত, স্বেচ্ছায় বিচরণ করুন।"

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী মুক্তি পাইলে যেমন উৎফুল্ল হইয়া কেবল আকাশে উড়িয়া উড়িয়া আনন্দে গান করিয়া বেড়ায়, হজরত রাবিয়াও সেইরূপ মুক্তিলাভের পর দিবানিশি আল্লাহতাআলার গুণগানে মত্ত হইলেন। কোর্‌আন শরীফ পাঠ এবং আরাধনা উপাসনাতেই তাঁহার দিবসরজনী কাটিয়া যাইতে লাগিল। অতঃপর তিনি এক জঙ্গলে গিয়া কঠোর যোগাভ্যাসে রত হইলেন এবং সেই অরণ্য প্রদেশেই সিদ্ধিলাভ করেন

মিসেস্ এম, আহমদ্।

জন্মান্তর বাদ।

জন্মান্তর বাদ লইয়া আজকাল পণ্ডিত মহলে মহা হট্টগোল বাধিয়া গিয়াছে। চির প্রচলিত প্রাকৃতিক বিধানানুসারে একদল ইহার পক্ষে এবং একদল বিপক্ষে দাঁড়াইয়া যুক্তি তর্কের তুমুল ঢেউ তুলিয়া দিয়াছেন। বাংলা দেশের যত গুলি মাসিক এবং সাপ্তাহিক কাগজ আছে, জন্মান্তর লইয়া আন্দোলন করেন নাই তাহার মধ্যে মাত্র দুই একটী। সকলে যে দিকে যায়, আমরা তাহার বিপরীত দিকে গেলে চলিবে না ভাবিয়া কতকগুলি খাপ ছাড়া কথা লইয়া আসরে পা দিলাম।

السعى منى والاتمام من الله تعلى (১)

যাঁহারা জন্মান্তর মানেন, তাঁহারাও বলেন, জীব জগৎ কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত; আর যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাঁহাদেরও এই মত। তবে পার্থক্য এই, জন্মান্তরবাদী বলেন কর্ম্ম প্রভাবে জীব মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন ধারণ করিয়া সুখ বা দুঃখ ভোগ করে এবং বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, " তাহা নয়, জীবনলীলা একবার সাঙ্গ করিলে আর উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে না।" ইহার পর পরজগতের লীলা আরম্ভ হইয়া থাকে। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের যুক্তিগুলি যদি একাদিক্রমে আলোচনা করি, তবে বোধ হয় একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেও পারিব।

১।

জন্মান্তর বাদী বলেন, জীব পাপ প্রভাবে পতিত এবং পুণ্য প্রভাবে উত্থিত হয়। পূর্ব্ব জন্মে যে যে পরিমাণে পাপ বা পুণ্য করিয়াছে, পরজন্মে তাহার জীবন সেই অনুপাতে উন্নত বা অবনত হইয়া থাকে। এবং এই উন্নতি বা অবনতি দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের নূতন লীলার সুযোগ ঘটিয়া থাকে। পুনঃপুনঃ জীবন পরিবর্ত্তন করিতে করিতে শেষে এক সময় সব লীলার সাঙ্গ হইয়া চরম মোক্ষ ঘটিবে। যাঁহারা ডারউইনের মতের পক্ষপাতি, তাঁহাদের মতে এই কথাগুলি নিতান্ত হাল্কা এবং হাস্যাস্পদ। তাঁহারা বলেন, নিকৃষ্ট জীবকুলের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমিক সাধনার ফলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মানব আকারে পরিণত হয়। আবার আর একদল আছেন; তাঁহারা বলেন, এই দুইই অযৌক্তিক। সংসারে মানুষ মানুষরূপে জন্মধারণ করে, আর ইতর জীব ইতর জীব আকারেই জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির এক একটা বিশেষ বিশেষত্ব আছে তাহা কস্মিনকালেও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। তোতা বা ময়না পাখীকে কথা, গান, প্রভৃতি শিখান যায়, ভলুক নর্ত্তকের কাজ করিতে পারে এবং বানর হাটকোট পরিয়া সিগার সিগারেট টানিয়া পায়চারী করিতে পারে—শিক্ষার প্রভাবে; কিন্তু

---

(১) সাধনা আমার এবং সিদ্ধিদান মহান আল্লার আয়ত্ত।

প্রকৃত মানব হওয়া অনন্তকালের সাধনাতেও সম্ভব হইবে না। ইহা প্রাকৃতিক বিধান। আমরা এই প্রাকৃতিক বিধানের ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়া ডারউইন কিংবা জন্মান্তর বাদীর সহিত একমত হইতে পারি না।

(ক)

জন্মান্তর বাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি উত্থাপনের জন্য দৃষ্টান্ত স্থলে মানুষকে উপস্থিত করিব। জন্মান্তর বাদী বলেন, অতি পাপ প্রভাবে মানুষ কৃমিকীটরূপে পরিণত হয়। আমরা বলি, তাহা সত্য; কিন্তু সে যে কি ভাবে তাহা তিনি বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? পাপ করা হইল দেহ এবং আত্মার সংযোগ ক্রমে মানব সাজিয়া, মরিয়া গেলে দেহ দেহের স্থানে পড়িয়া রহিল আর আত্মা যাইয়া উভয়ের বোঝা ঘাড়ে করিয়া একটী ইতর জীব সাজিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিল! তাহাও শুধু নিজে নহে, আর এক নিরীহ দেহ বেচারাকে তাহার ভাগী করিয়া লইল। পরমেশ্বর ত ন্যায় দর্শী? তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন না, এ কাজটা মোটামুটি ভাবে সঙ্গত কি অসঙ্গত হইল? একজন পৈশাচিক অভিনয় করিয়া স্বীয় জীবন-নাট্যের লীলা সাঙ্গ করিল, যদি তাহার ফলে তাহাকে পরজন্মে ভোগ করিতেই হয়, তবে তাহার দেহখানি যে কোন উপায়ে তাহার পরজন্মের পিতা মাতার দেহান্তর্গত হইয়া গেলে বিচার মত কাজ হয়। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, তাহা মানুষের হাতে চন্দ্র সূর্য্যের অবতরণের ন্যায় অসম্ভব।

(খ)

ইতর জীবেরও সুখ দুঃখ দুইই আছে। উহারা কখনও মানুষ হইতে পারিল না বলিয়া আক্ষেপ করে কি না, তাহা কেহ জানিতে পারে না। বরং মানুষ অনেক সময় কোন ইতর জীবের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় সুখ দুঃখের হিসাবে যে মানবেতর জীবের সহিত মানুষের কোন পার্থক্য আছে, তাহাত অনুমান হয় না। সুতরাং যদি কোন মানুষ কিছু পাপ করিয়া একটা কুকুর, বিড়াল বা মলকৃমিতে পরিণত হয়, তবে তাহাতে তাহার শাস্তিলাভ হইল বলিয়া ধারণা করিবার আমাদের কোন যুক্তি নাই। অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষের জীবন একটা মানবেতর জীবের জীবন অপেক্ষা বহু অংশে দুঃখময়। সুতরাং যদি মনে করা যায় যে, কোন মানবেতর জীব পাপের প্রভাবে মানবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাও যে অসঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে মানুষ যে জীব জগতে কোন অংশে অপরাপর জীব অপেক্ষা হেয় এ কথা কেহই স্বীকার করেন না।

(গ)

বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, প্রজনন দোষে অথবা পিতৃমাতৃ দৈহিক উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ প্রভাবে সন্তানের দেহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ ঘটিয়া থাকে। বিকলাঙ্গ হওয়া যেমন পিতামাতার অবস্থার উপর নির্ভর করে, তেমনই সুস্থসবল হওয়াও তাহাদেরই

ইচ্ছা ও সাধনারই সাপেক্ষ। পরন্তু অঙ্গ বিশেষের উৎকর্ষ বা হীনতার উপর কাহারই সুখ দুঃখ নির্ভর করে না। অনেক জন্মান্ধ সদানন্দ সাজিয়া মহাসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, পক্ষান্তরে বিস্তর সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট মানুষকে যাবতীয় সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অনন্ত দুঃখসাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে ইহলীলা সম্বরণ করিতে দেখা যায়। আত্মার পরিতোষ এবং পরিতৃপ্তিই যখন সুখের আকর, তখন পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিবার সুযোগ পাওয়া যায় কোথায়? দ্বিতীয় জন্মলাভ করিল আত্মা, আর হীনতা ঘটিল দেহের; অথচ আত্মার ইহার প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই! সুতরাং দেখা যাইতেছে অঙ্গ হীনতা কাহারও পক্ষে শাস্তিরূপে গৃহীতব্য নহে এবং এই হিসাবে পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্ম বলিয়া কোন কথাও উঠিতে পারে না।

(ঘ)

বংশমর্য্যাদা পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্যের ফল বলিয়া গৃহীতব্য হইতে পারে না। কারণ উহাতে আন্তরিক হিসাবে দেখিতে গেলে সুখ দুঃখের কোনই সম্বন্ধ নাই। একজন সৎ-ব্রাহ্মণের সন্তান—জন্মান্তর বাদীর বিশ্বাস মত—পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবলে মহাপুরুষ হইতে পারেন। কিন্তু অভিজ্ঞ ন্যায়দর্শী বলিবেন, ইহা খাম-খেয়ালি বই আর কিছুই নহে। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের প্রভাবে যদি ব্রাহ্মণ হইতে হয়, তবে প্রত্যেক ব্রাহ্মণই সর্ব্বতোভাবে সুখী এবং সুদর্শন হওয়া আবশ্যক ছিল। জগৎ তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখ, একজন মুচি মেথর পর্য্যন্ত একজন সৎ ব্রাহ্মণের তুলনায় সুস্থ-সবল, অর্থ-প্রতিপত্তিশালী, জ্ঞান-বিজ্ঞানাভিজ্ঞ এবং সুশ্রী ও নিরুদ্বেগ হইতে দেখা যায়। ভারতে হয়ত ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া কেহ কথঞ্চিত সম্মান পাইতে পারে—শুধু মুখে মুখে, তাহাও চক্ষুলজ্জার খাতিরে—মাত্র সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্গত জনকয়েক লোকের কাছে। কিন্তু জগৎ তাহার কোনই প্রাধান্য স্বীকার করিবে না। ম্লেচ্ছের (?) ঘরে জন্মধারণ করিয়া প্রতিভা বলে যাঁহারা ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এবং যাই-তেছেন জন্মান্তরবাদী তাঁহাদের সম্বন্ধেত কোন কথাই বলিতে পারেন না! আবার অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলে, ব্রাহ্মণবংশধরগণ যে বিকলাঙ্গ, মূর্খ, কুষ্ঠী, কদাকার প্রভৃতি হইয়া থাকেন; সংসার যে তাঁহাদের নিকট কারাগার বিশেষে পরিণত বলিয়া গণ্য হয়! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলে যদি ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন, তবে তাঁহাদের এই সব দুর্গতি কেন? "ঈশ সর্ব্বস্য জগতো ব্রাহ্মণ বেদ পরাগঃ" বা "দেবাধীনাং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনঞ্চ দেবতাঃ তন্মন্ত্র ব্রাহ্মণাধীনং ব্রাহ্মণো মম দৈবতঃ" প্রভৃতি মহদ্বাক্যে যাঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; তাঁহারা পাচক, পরিচারক, বিদূষক এমন কি মুটে মজুর হইয়া অনন্ত দুঃখজ্বালার ঘাত প্রতিঘাতে চির অশান্তিতে কাল কাটাইলে, এমন তথাকথিত উন্নত ব্রাহ্মণ জীবন পাইয়া তাঁহারা কি লাভবান হইলেন।

(ঙ)

সন্ততি সম্পন্ন পিতামাতার গৃহে জন্মধারণ করিয়া প্রথম জীবনে অথবা সুখ দুঃখানুভবের ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বে হয়ত কেহ খুব সুখ পাইয়াছে; কিন্তু যখন তাহার ভোগের সময় আসিল, নিজ কৃতকর্ম্মের প্রভাবে অথবা পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবক কিংবা অপর কাহারও কোন

প্রকার ত্রুটীতে সব হারাইয়া মহা বিপদসাগরে পড়িল। যদি কেহ মনে করেন, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পূণ্যের প্রভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন পিতৃমাতৃকুলে জন্মধারণ করা হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই, সে অবস্থার পতন হয় কেন? অন্ততঃ উহাও যদি কোন বিশেষ প্রকার পাপের প্রভাবে ঘটা সম্ভব হয়, তথাপি আর একটী মহা সমস্যার সমাধান হইয়া উঠে না। সমস্যাটী এই, অবস্থার উত্থান পতনের সঙ্গে বাহ্যিক সুখ দুঃখের রক্ত মাংস সম্বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু মানসিক সাচ্ছন্দ্য—যাহা সুখ নামের মাথার মুকুট, আর্থিক অবস্থার মুখাপেক্ষী নহে। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা আমাদিগকে চখে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইতেছে যে, রাজা অপেক্ষা প্রজা, লক্ষপতি অপেক্ষা কড়ার ভিখারী, বড় বড় ব্যবসায়ী অপেক্ষা একজন পথের মুটে শারিরীক, মানসিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সুখ একাধারে ভোগ করিতেছে। কথায় বলে বড়র বড়ই উদ্বেগ, আর গরীবের চিরশান্তি। সর্ব্বত্র না হউক অন্ততঃ শতকরা আশীজন গরীব সুখী এবং বিশজন তথাকথিত ভাগ্যবান শান্তির সন্ধান মাত্র পাইতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় একজন মহা সম্পদের অধিকারী শান্তির জন্য, প্রাণের উদ্বেগ নিবারণ করিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিবার জন্য, টাকাপয়সা, রাজ্যরাজত্ব, বাড়ীঘর, দালানকোঠা এমন কি যাবতীয় ভোগ্য বস্তু অবলীলা ক্রমে ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যবাস পছন্দ করিয়া লয়। হজরত মোহাম্মদ (সঃ), মহাত্মা বুদ্ধ, তাপস প্রবর এবরাহিম আদহমের কথা কে না জানেন। ইহাঁদের সম্পদই ইহাঁদের জন্য দুঃখ জনক মনে হইত। আবার যখন নিঃসম্বল হইলেন, তখনকার অবস্থা আলোচনা করুন, দেখিতে পাইবেন প্রথম ও পরবর্ত্তী জীবনে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কেহ হয়ত বলিবেন, তবে মানুষ ধনী হইতে চায় কেন? উত্তরটী অতি সহজ ও সরল। একজন লোক যদি ধর্ম্মের বন্ধনী এড়াইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার ক্ষমতা পায়, তবে তাহার মন তাহাতে পুলক প্রকাশ করে কিনা, বিচার করিয়া দেখুন। কিন্তু সেই পুলক প্রকাশ যেমন অজ্ঞতার নিদর্শন, দরিদ্রের ধন লিপ্সাও তেমনই আশার মোহমায়া বই আর কিছুই নহে। মরু প্রান্তরে মরীচিকা যেমন মৃগকুলকে চতুর্দ্দিকে ছুটাইয়া ছুটাইয়া বুককাটা তৃষ্ণার সময় কথঞ্চিৎ শান্তিদান করে, সংসার মরুভূমিতেও তেমনই আশা মৃগতৃষ্ণিকা মানব-কুরঙ্গ নিচয়কে সম্পদ-নীরের লোভ দেখাইয়া, তাহাতে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছায়াচিত্র কল্পনা পটে আঁকিয়া দিয়া, অসার সংসারযাত্রা হইতে সরিয়া যাইতে প্রতিরোধ করে মাত্র। তত্ত্বদর্শীর নিকট সেই মহান্ জ্ঞান ও গুণাকরের এই লীলাভিনয়টী বড়ই দেখন বাহার হয়। বহুদর্শী যেমন তৃষ্ণার্ত্ত হইলেও মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে না যাইয়া বাস্তব জলাশয়ের সন্ধান করেন, জ্ঞানগুণভূষিত মহাত্মা নিচয়ও তেমনই অর্থের ভিতর সুখ নাই জানিয়া, প্রকৃত সুখের জন্য কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ (?) করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাঁহারা খোজেন, অনন্ত শান্তি—যাহা অর্থের নিকট ঘনাইতেই পারে না। এই জন্যই শেষ নবী হজরত রসুলে মকবুল কথায় এবং কার্য্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, দারিদ্র্যই আমার গৌরব। (الفقر فخري)

২।

জন্মান্তরের বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য আমাদের আরও একটী বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বের আলোচনার ফলে দেখা গিয়াছে যে, জন্মান্তর হয় আত্মার,—দেহের নহে। আত্মা যখন পর জন্মে গিয়া পূর্ব্বজন্মের পাপ এবং পুণ্যের ফলে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে তখন ন্যায়ের খাতিরে আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইতেছে যে, সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিধাতা (আল্লাহ) মানুষের পাপ পুণ্য হইতে নির্লিপ্ত। যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল ভোগ করে। জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহার এই নির্লিপ্ততা কোন হিসাবে? জীবের কর্ম্মের উপরে তিনি আদৌ ক্ষমতা পরিচালনে অক্ষম, না তাহা হইতে ইচ্ছা করিয়া সরিয়া থাকেন? অক্ষমতার গন্ধ যেখানে বিধাতৃভাব সেখানে থাকিতে পারে না। অনেকে বলিবেন, তিনি নিয়ন্তাও। আমরা বলি, তা' বেশ। কিন্তু তিনি জন্মান্তরের নিয়ম কেন করিলেন, তাহারও একটা কারণ আছে ত? স্বীকার করি, তিনি যে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে। যদি কোন কার্য্যের লাভালাভের একটা হিসাব নিকাশ করা না যায়, তাহাতে যদি ভবিষ্যহিতাহিত কিছুই দেখা না যায়, তাহা হইলে সেই কার্য্য বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। জ্ঞান বলে, বৃথা কর্ম্ম অকর্ম্ম অপেক্ষা হেয় এবং তেমনতর কর্ম্মী অজ্ঞান এবং তামসিক ভাবাপন্ন। বিশ্ব নিয়ন্তা কি তবে জ্ঞান শূন্য এবং তামসিক ভাব সম্পন্ন!

৩।

আত্মা পাপ করে। তাহাতে তাহার পরম ব্রহ্মে সম্মিলিত হইবার একটা অন্তরায় উপস্থিত হয়। যদি এই বাধা দূর করিবার জন্যই পরজন্মের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেক আত্মার জন্য অন্ততঃ অতটুকু অনুভূতি থাকা আবশ্যক ছিল যে, সে অমুক জন্মে এই প্রকার অপকর্ম্ম করিয়াছে। ইহাতে লাভ এই হইত যে, দূর ভবিষ্যতে আর কখনও সে এমন কাজ করিত না; সুতরাং পরম ব্রহ্মে সম্মিলিত হইবার জন্য একটী পাপরূপ অন্তরায় তাহা হইতে দূরে হইয়া যাইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা কাহারই ভাগ্যে ঘটে না। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, অপরাধীকে তাহার অপরাধ দেখাইয়া দিয়া শাস্তিদান করা হয়। বিশ্বনিয়ন্তা নিয়ম করিয়াছেন, মানুষ পাপ করিলে শাস্তিভোগ করিবে—সংশোধনের জন্য; কিন্তু কোন সময় পাপ করা হইল, কি কার্য্য পাপজনক বলিয়া গৃহীত হইল, তাহা জানা হইল না কলুর বলদের মত শাস্তি পাইয়া মরিয়া গেল! এইটী যদি সেই মহান নিয়ন্তার নির্দ্ধারিত নিয়ম হয়, তবে বলিতে হইবে, তিনি খাম খেয়ালি করিয়া যাহা ইচ্ছা করেন। (نعوذ بالله)

৪।

পাপের যখন অনুভূতি হয় তখন শাস্তিও অনুগ্রহ বলিয়া বোধ হয়, পরন্তু শাস্তি না পাইলেও তখন আর পাপের প্রবৃত্তি থাকে না। জন্মান্তরবাদীরা যখন বলিতে পারেন না যে, কোন জন্মে কখন এবং কি ভাবে কোন পাপ করিয়া বর্ত্তমান জন্মে মানুষ গাধা হইল, ধোপার মোট

বহিয়া বহিয়া সাধের জীবন প্রান্তরে ত্যাগ করিল—গাধাও তাহা বুঝিতে পারিল না, তখন বলিতে হইবে যে, এই জন্মান্তর প্রথা যে নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রিত তিনি সামান্য শাসননীতি পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহেন। এহেন নিয়ন্তা এবং এমন নিয়ম সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন যোগ্য।

(ক্রমশঃ)

মোহাম্মদ মুজাফ্ফর উদ্দীন।

সেই ভাববাদী কে?

উপক্রমণিকা।

(এসমাইল ও এসহাক)

আজ হইতে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরবের উত্তর পূর্ব্ব সীমাবর্ত্তী বাবল রাজ্য উন্নতির চরমে উঠিয়াছিল। তথাকার রাজা নমরুদ অর্থ এবং সামর্থ্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাতায়লাকে ভুলিয়া গেল। সে মনে করিল, তাহার উপর ক্ষমতা চালনা করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই। কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী কুলের গর্ভ ধারণ যেমন উহাদের মৃত্যুর কারণ হয়, নমরুদের এই অসাধারণ উন্নতিও তেমনই তাহার বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। শয়তানের প্ররোচণায় পড়িয়া সে নিজের স্বর্ণ প্রতিমা গড়াইয়া সাধারণকে উহার অর্চ্চণা করিতে দিল। এই সময় খোদা তাহার দর্পচূর্ণ এবং মানব মণ্ডলীকে তৌহিদের শিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত হজরত এবরাহিমকে জগতে নবীরূপে পাঠাইয়া দিলেন।

হজরত এবরাহিমের জ্ঞানের সঞ্চার হইলে মানুষ স্বহস্ত নির্ম্মিত পুতুল সকলকে সর্ব্বমঙ্গল-নিয়ন্তা আল্লাহ জ্ঞানে বিবিধ নৈবেদ্য দান এবং পূজা করিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এই কুসংস্কার দূর করা তখন তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। পিতা এবং স্বজন-বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন;---

ماذا تعبدون ج ايفكا الهة دون الله تريدون ط فما ظنكم برب العلمين

অর্থ---তোমারা এসব কি পূজা করিতেছ? আল্লাহ থাকিতেও কি মিছামিছি (আরও) উপাস্য চাও? বিশ্বনিয়ন্তা সম্বন্ধে তোমাদের কি মনে হয়?

কুক্রিয়াশক্ত কাফের নিচয় তাঁহার এই পাণ্ডিত্য পূর্ণ উপদেশের প্রতি লক্ষ করিলনা। বরং তাঁহাকেও এই সমস্ত হঠকারিতা (?) ছাড়িয়া তাহাদের দেব পূজায় যোগ দিতে বলে। কিন্তু হজরত এবরাহিম, কর্ত্তব্য নিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রত্যাদেশ বলে বলীয়ান হজরত এবরাহিম, সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনি দাও খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন কাফেরগণ কোন উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে, কথা ছিল, তিনিও যাইবেন। আবশ্যক কালে তিনি স্বাস্থ্যভঙ্গের আপত্তি করিয়া নিস্তার লাভ করিলেন। তাহারা হজরত এবরাহিমকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি পূজার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া নিবেদিত ভোজ্যবস্তুর প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, ? الا تأكلون (খাওনা তোমরা?) কিন্তু মাটীর পুতুল খাইবে কেমন করিয়া! ইহার পর আবার বলিলেন, ? ما لكم لا تنطقون (কথা বলিতেছ না কেন, তোমাদের কি হইয়াছে?) উহারা নিরব নিশ্চল।

এই ত গেল উপহাস। ইহার পর সেই মহাপুরুষ প্রতিমা নিচয়ের উপর প্রহার বৃষ্টি-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সবগুলি প্রতিমা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলে; কুঠারখানি বড় প্রতিমাটীর গলায় ঝুলাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কাফের সম্প্রদায় নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবমন্দির লণ্ড ভণ্ড! অধিকাংশের বিশ্বাস জন্মিল যে এই কার্য্য এবরাহিম দ্বারা সাধিত হইয়াছে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "বড় দেবতাকে জিজ্ঞাসা কর"। প্রতিমা কথা বলেনা বলিয়া তাহারা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে,—এই ভাব প্রকাশ করায়, তিনি বলিলেন, যাহারা কথা বলিতে পারেনা, স্বহস্তে কাটিয়া ছাঁটিয়া যাহাকে তৈয়ার করিয়াছ তাহাকেই সর্ব্বমঙ্গল-নিকর জ্ঞানে পূজা করিতেছ; নৈবেদ্যও উপস্থিত করিতেছ তাহারই নিকটে বল তোমাদের মত মূর্খকে? ধিক্ তোমাদিগকে, আর শত ধিক্ তোমাদের সেই অনীশ্বর দেবতাদিগকে!

মূর্খকে উপদেশের কথা বলিলে সকলের ভাগ্যে যাহা ঘটে, হজরত এবরাহিমকেও তাহাই পাইতে হইল। কাফের সম্প্রদায় তাঁহাকে জলন্ত অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। এই সময় তাঁহার স্নেহময় পিতা, শোনিত সম্বন্ধ যুক্ত আত্মীয়বর্গ এবং প্রীতিভাজন সুহৃদ সম্প্রদায় তাঁহার সাহায্য করিতে আসিলনা—সমবেদনার চিহ্ন স্বরূপ একটী উহঃ আহঃ ও করিল না! তিনি দেখিলেন, যাহারা তাঁহার সাহায্য করিবে, তাহারাই বেশী করিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতিত করিতে চেষ্টা করিতেছে! দেশ ও সমাজের প্রতি তাঁহার বীতরাগ জন্মিল। একমাত্র কথায় দোসর স্ত্রী সারা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত লুতকে লইয়া দেশত্যাগ করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে শাম দেশের এক প্রান্তে যাইয়া বসতি স্থাপন করিলেন।

আল্লাহ যাহার সহায়, তাহার অভাবেরই অভাব হয়। হজরত এবরাহিম দূরদেশে যাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পালন করিতে লাগিলেন। অতিঅল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পশুপাল বিস্তর বাড়িয়া গেল। কিছু দিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেলে, খোদা আর এক লীলার সূত্রপাত করিলেন। যে ভূখণ্ডে হজরত এবরাহিমের আবাস নির্ণীত হইয়াছিল, বহুদিন বারিপাত বন্ধ রাখিয়া উহা এক ভয়ানক অনুর্ব্বর মরুক্ষেত্রে পরিণত করিয়াদিলেন। হজরত এবরাহিম দেখিলেন, তাঁহার পশুপাল এখন মারা যায়! কোথায় যাইবেন কি করিবেন এইরূপ নানা চিন্তায় যখন তাঁহার মন উদ্বিগ্ন, খোদাতালা তখন তাঁহার প্রতি আদেশ করিলেন স্থান পরিবর্ত্তন করিতে। তিনি মিশরে চলিয়া গেলেন।

তৎকালীন মিশরপতি (ফরৌণ) একজন প্রজারঞ্জক এবং ন্যায়নিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার বিচক্ষণতা অতীব প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার জন্মভূমি কিন্তু মিশর ছিলনা। শাম রাজ্যের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। দেশে থাকিয়া অভাবের হাত এড়াইতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে মিশরে আগমন করেন। সামান্য মজুরের ব্যবসা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি করিতে করিতে শেষে রাজপদে আরুঢ় হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মন চিরকাল দেশের জন্য কাঁদিত, দেশের নামে তাঁহার প্রাণে পুলক জাগিয়া উঠিত।

কেবল অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে বলিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। মিশরে আসিয়া তাঁহার একটী কন্যা সন্তান জন্মে। মৃত্যুর পরেও যাহাতে তাঁহার দেশত্যাগের স্মৃতিটুকু বিলুপ্ত না হয়, এই জন্য কন্যাটীর নাম রাখিলেন 'হাগার' বা হাজেরা অর্থ—দেশত্যাগিনী।

হাজেরা শৈশবে মাতৃহারা হয়েন। স্বদেশ এবং স্বজাতি প্রাণ ফরৌণ (মিশরপতির নাম) বিপত্নিক হইয়াও মিশরের কোন কন্যাকে সহধর্ম্মিনীরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না বা করিলেন না। হাজেরা যখন বিবাহযোগ্যা হইলেন, ফরৌণ তখন বরের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। নিজে যে জন্য দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিলেন না সেই কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করিবে ! যে ফরৌণ সামান্য শ্রমজীবির অবস্থা হইতে রাজপদে উন্নীত হইয়াছেন—শুধু বুদ্ধির বলে, তিনি কি এমন পাত্র, যে একটা প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়াই তাহাতে সম্মত হইবেন ! বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে শামবাসির সন্ধানের জন্য এক আশ্চর্য্য রকমের ফান্দ আঁটিলেন। তিনি দেখিলেন, মিশর একটী বাণিজ্য কেন্দ্র ; দূর দূরান্তর হইতে লোক আসিয়া এখানে পণ্য সরবরাহ এবং সংগ্রহ করে, সুতরাং শামের লোকও নিশ্চয়ই আসে। দেশের উন্নতির জন্য আয় বৃদ্ধি করিতেছেন, এই ভান করিয়া বাণিজ্য শুল্কের প্রবর্ত্তন করিলেন। ফলে ঘাটিতে ঘাটিতে লোক নিযুক্ত করিতে হইল। তিনিও এদিকে স্বদেশীর সন্ধান নিবার সুবিধা করিতে পারিলেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

নূতন জিনিষ ভালই হউক আর মন্দই হউক চিরকালই লোকের বিরক্তিজনক হইয়া থাকে, অন্য বিষয় যেমন তেমন অর্থের যেখানে সম্বন্ধ ব্যাপার সেখানে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। ফরৌণের প্রবর্ত্তিত শুল্ক যদিও কেবল নামমাত্র আদায় ছিল, তথাপি বৈদেশিক বণিকদল ইহাতে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা দেশে দেশে প্রচার করিয়া দিল, মিশরপতি ফরৌণ লুট-তরাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—সেখানে গেলে ধন, প্রাণ, মান সম্ভ্রম কিছুই আর বাঁচে না। এই গুজব প্রচারের ফল এই দাড়াইল যে কোন বণিক ত দূরের কথা, একজন সাধারণ লোকও আর সাধ্য পক্ষে সে দেশে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

হজরত এবরাহিম একেত দুর্ভিক্ষ পীড়িত, তাহার উপর খোদার আদেশ, কাজেই তাঁহাকে মিশরের দিকে রওয়ানা হইতে হইল। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতর আশা ও আশঙ্কা আসিয়া মহা হট্টগোল বাধাইয়া দিল। আশা বলে, সেদেশে যাইতেই হইবে—তথায় সুখ আছে, সমৃদ্ধি আছে। পক্ষান্তরে আশঙ্কা নানারূপ ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়াবাজী দেখাইয়া তাঁহাকে বিবেক হারা করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। পথ চলিতে চলিতে বিবিধ চিন্তাজালে তাঁহার অন্তশ্চক্ষু অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিলে প্রবৃত্তি আসিয়া তাঁহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিল। তিনি দেখিলেন, সারা সুন্দরী—যুবতী। মিশরবাসিগণ তাহাকে দেখিলে রাজার নিকট একথা গোপন রাখিবেনা। পরন্তু রাজা যখন অত্যাচারী তখন সুন্দরী নারী লাভের জন্য সারাকে স্বামীর কবল হইতে যে কোন উপায়ে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতে পারে। আবশ্যক বোধ করিলে এতদুপলক্ষে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতেও হয়ত দ্বিধা

করিবেনা! নিজের প্রাণ গেলে এত আশা, এত আকাঙ্খা সব নষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া সারাকে এক অদ্ভূত ধরণের পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখ, আমি দেখিতেছি, তুমি দেখিতে সুন্দরী। হইতে পারে, মিশরবাসিগণ তোমাকে দেখিলে বলিবে যে তুমি আমার স্ত্রী। তাহাতে তাহারা আমাকে মারিয়া তোমাকে উদ্ধার করিতে পারে। বিনয় করি, তুমি বলিও যে তুমি আমার ভগিনী। তাহাতে তোমাদ্বারা আমার উপকার হইতে পারে, তোমার প্রভাবে আমার প্রাণ বাঁচিতে পারে।" * তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই ছলনা-দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। সারা যদি অপহৃত হয়েনও, সাধ্বী হইলে, আত্মসম্মান রক্ষা করিতে থাকিবেন, তিনিও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইবেন।

কোন সংস্কার যখন যাহার মনের ভিতর বদ্ধমূল হইয়া পড়ে, ধৈর্য্য স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি তখন তাহার কিছুই বিদ্যমান থাকেনা। মিশরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, রাজ কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া লইয়াছে। শুধু ঘেরাও নহে, বিবিধ প্রশ্ন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কোথায় যাইবেন, কেন যাইবেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন, সঙ্গীয় মেয়েটী তাঁর কে হয়েন ইত্যাদি প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর তাহারা পুস্তকে লিখিয়া লইতেছে। আতঙ্কে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। শেষে পথে যে সিদ্ধান্ত করিয়া আসিয়াছিলেন কার্য্যে তাহাই করিলেন। রাজকর্ম্মচারীদের নিকটে পরিচয় দিলেন যে তিনি শামদেশ হইতে আসিতেছেন, সঙ্গীয় যুবতী তাঁহার ভগিনী। তাহারা সবিস্তার বিবরণ লিখিয়া রাজসরকারে রিপোর্ট দিল। ফরৌণ দেখিলেন, তাঁহার সাধের আশালতা এতদিনে ফলবতী হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। হজরত এবরাহিম এবং বিবি সারাকে নিজের প্রাসাদ সংলগ্ন এক সুরম্য আবাসে অবস্থান করিতে দিলেন।

ফরৌণ মনে করিলেন বিবি সারাকে প্রথম গ্রহণ করা যাউক, পরে যখন উভয়ের মধ্যে একটা সুসম্বন্ধ বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তখন হাজেরাকে সমর্পণ করিবার সুবিধা হইবে। কার্য্য সিদ্ধির জন্য তাঁহার এই দূরদর্শিতা-পরিচায়ক-নীতি প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু মূলে ভুল থাকায় তিনি সিদ্ধমনস্কাম হইতে পারিলেন না। যখন তিনি সারাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, বিবিধ বিপদ জাল আসিয়া তাঁহাকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিল যে তিনি হতভম্ব হইয়া গেলেন। শেষে স্বপ্ন যোগে জ্ঞাত হইলেন যে, সারা সঙ্গীয় যুবকের বিবাহিতা পত্নী। ইঁহাকে গ্রহণ করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। তিনি হজরত এবরাহিমকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি আমার সহিত এ কি করিলে? এ যে তোমার স্ত্রী একথা কেন আমাকে বল নাই? তুমি কেন বলিয়াছিলে যে ইনি আমার ভগিনী? আমি তাঁহাকে আমার সহধর্ম্মিনীরূপে গ্রহণ করিতাম। যাহা হউক-তোমার স্ত্রী তুমি নেও।" † সারাকে হজরত এবরাহিমের নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরৌণের আশা ভরসা সব চূর্ণ বিচুর্ণ

---

* আদি পুস্তক ১২ অধ্যায় ১১-১২ পদ।

† আদি পুস্তক ১২ অধ্যায় ১৮-১৯ পদ।

হইয়া গেল। এই অবস্থায় পড়িয়া অনেকেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ে—কেহ কেহত বিবেক পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে। কোন মহাপুরুষ যদিওবা বহু সাধ্য সাধনায় বাহ্যতঃ প্রকৃতিস্থ থাকে, কিন্তু অভিষ্ট সিদ্ধির দিকে প্রায় শতকরা নিরানব্বুই জনই অগ্রসর হইতে পারে না। তিনি কিন্তু তেমন লোক নহেন। বিশেষ সাবধানে আত্মসম্বরণ করিয়া ভাবিলেন, নিজে বিবাহ নাই বা করিলাম। বয়সত আর কমিতেছে বই বাড়িতেছে না? মেয়েটীকে কিন্তু পাত্রস্থ করিতেই হইবে—যে উপায়েই হউক।

কর্ম্মীর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম জড়িভূত থাকে। ফরৌণ মনে করিলেন, এবরাহিমের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুন্ন হইয়া থাকিবেন। সুতরাং কৌশলে তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন ছলে কন্যাদানের এক আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করিলেন। যোগাড় করিলেন, তাঁহাকে উপহার দিবেন। উপহারের জন্য আনা হইল, উট, ভেড়ী, ছাগল, দাস দাসী—সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কন্যাটীও আনিয়া উপস্থিত করিলেন। দান কালে বিনীত ভাষায় বলিলেন "ইহাকে তোমার হাতে অর্পণ করিলাম, সারার সেবিকারূপে ইহাকে গ্রহণ কর। কথাগুলি এমনভাবে বলিলেন যে হজরত এবরাহিম প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার সম্মতি জ্ঞাপন ভিন্ন আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ইহার পর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে, হজরত এবরাহিম দেশে ফিরিয়া আসেন।

পিত্রালয় হইতে বাহির হইয়া হজরত এবরাহিম কিছুদিন এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া আবাস নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। মোরাহ প্রান্তর স্থিত সিশেম নামক স্থান (Sechem unto the plain of morah. Gen, 12 ; 6) উপস্থিত হইলে, সদাপ্রভু তাঁহাকে বলেন যে এই দেশ তাঁহার বংশধরকে দেওয়া হইবে। * তিনি তখন এই প্রতিশ্রুতির স্মৃতি এবং স্থানটীর চিহ্ন রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এক বেদী নির্ম্মাণ করিয়া উহার নাম রাখিলেন 'বেথেল' বা বয়তুল্লাহ। † এই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তিনি অন্যত্র যাইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ‡ মিশর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বহুদিন অপেক্ষার পরেও যখন দেখিলেন যে তাঁহার সন্তান হইতেছে না, তখন বিশ্ববিধাতা খোদাতালার নিকট প্রার্থনা ছলে পুত্র প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই সময় তাঁহার দামাক দেশীয় এক দাসীর গর্ভে একটী পুত্র ছিল। কিন্তু দাসী পুত্রকে উত্তরাধিকারী করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। প্রার্থনা কালে মুখ ফুটিয়া একথা খুলিয়াও রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক খোদাতালা তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন; এবং তাঁহাকে সহধর্ম্মিনীজাত উত্তরাধিকারী দান করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। (আদিপুস্তক ১৫ অধ্যায়।)

* আদি পুস্তক ১২ ; ৭

† বেথ = গৃহ + এল = ঈশ্বর। বেথেল অর্থ ঈশ্বরের গৃহ। কালে আরবী ভাষায় এই শব্দ বথেতুল্লা নামে অভিহিত হয়।

‡ হজরত এবরাহিম বেথেল বা বর্ত্তমান মক্কার উত্তর পূর্ব্ব দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া কানান দেশ বা বর্ত্তমান ফিলিস্তাইনে বসতি স্থাপন করেন। আদি পুস্তক, ১২ ; ৮।

আশায় আশায় আরও বহুদিন চলিয়া গেল কিন্তু সন্তানের মুখ দেখা হইল না। অবশেষে বিবি সারা দেখিলেন, বয়স যায়; মনে করিলেন তিনি নিজেই সন্তান ধারণের অযোগ্যা। হজরত এব্রাহিমকে বলিলেন, 'আমিত সন্তানের মুখ দেখিতে পাইলামই না, তুমিও আমাকে লইয়া বঞ্চিত হইবে! হাজেরাকে গ্রহণ কর, একটী উত্তরাধীকারী হউক। তিনি সম্মত হইলেন। বিবাহের অনতিকাল পরেই দেখা গেল হাজেরা গর্ভবতী হইয়াছেন। এখন হজরত এবরাহিমের যত ভালবাসা, যত আদর সব গিয়া পড়িয়াছে হাজেরার দিকে। সারার প্রাণ জলিয়া উঠিল, সপত্নীকে তিনি বিদ্বেষ-বিষে জ্বালাইয়া ভষ্মিভূত করিতে আরম্ভ করিলেন। হাজেরা কিছুদিন নিরবে বহু অত্যাচার সহ্য করিলেন; কিন্তু উত্তরোত্তর যখন অবস্থা আরও মন্দ হইতে আরম্ভ করিল, তখন মানসিক উদ্বেগ আসিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি দেখিলেন শুধু তাঁহারই প্রভাবে হজরত এবরাহিমের শান্তিময় সোণার সংসার প্রচণ্ড বিদ্বেষ বহ্নিময় নরক কুণ্ডে পরিণত এবং দিনে দিনে কেবলই অধোগামী হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সকল বিষয়েরই যদি একটা সীমা থাকে, তবে সহ্যের সীমা থাকিবে না কেন! তিনি নানাদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক বিষময় পরিণামের আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কালের প্রবাহ সহকারে তাঁহার ভাবনা স্রোত, এত প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি ভবিষ্যৎ বিপদের কল্পনা পাকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। শেষে সকল প্রতীকারের আশা ছাড়িয়া দিয়া—সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়া চক্ষের পানিতে ভাসিতে ভাসিতে সাধের সংসার ত্যাগ করিলেন। স্বামী এবং সপত্নীর সুখের জন্য নিজে সুখ সুবিধা এমন কি জীবন পর্য্যন্ত খোদার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া দুই চক্ষু যে দিকে যায় সেই দিকে রওয়ানা হইলেন। পথে সদাপ্রভুর দূত আসিয়া তাঁহাকে শান্তনা দান করিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখ তুমি গর্ভবতী-একটী পুত্র প্রসব করিবে। তাঁহাকে এসমাইল * বলিয়া ডাকিও। কেন না সদাপ্রভু তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন।" বাইবেলে উক্ত আছে, হজরত এবরাহিম নিজেই প্রথম এই ঐশীদত্ত নাম ব্যবহার করেন। +

ইহার পর খোদা হজরত এবরাহিমকে আরও এক সন্তান দান করিবার সংবাদ জ্ঞাপন করেন। বিবি সারার গর্ভে তাঁহার জন্ম হইবে বলিয়া বলা হয়। তিনি এই সুসংবাদ পাইয়া প্রথমতঃ বুঝিতে পারিলেন না—যে খোদাতালা কি আদেশ করিতেছেন! বলিতে কি বাইবেলের মতে তিনি এতটা হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ে খোদাতালার ভ্রম হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন

---

* এসমাইল শব্দহিব্রু এসমা:+ঈল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহার অর্থ—খোদা শুনিয়াছেন। হজরত এবরাহিম সন্তানের আশায় বঞ্চিত হইয়া প্রার্থনা করিলে খোদ তাঁহাকে সন্তান দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন, হজরত এসমাইলের নামে সেই প্রার্থনা এবং প্রতিশ্রুতির কথা জাগরুক থাকিবার জন্য এই আদেশ হইয়াছিল।

+ আদি পুস্তক ১৬ অধ্যায়।

না এই বিগত যৌবনে আবার পুত্রের পিতা হইবেন কি করিয়া সারাতে তখন নারীধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই দিক দিয়া দেখিলেও হজরত এবরাহিমের এই অবিশ্বাসের একটা যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল। বলিতে কি এই সময় তিনি তাচ্ছিল্যের হাসিটুকু পর্য্যন্ত সম্বরণ করিতে সমর্থ হন নাই শুধু তিনি কেন, বিবি সারাও এই সংবাদে তেমনই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন। কিন্তু মানুষ যাহা অসম্ভব মনে করে, খোদার নিকট তাহা সবই সম্ভব। খোদা আদেশ করিলেন, সন্তান ত হইবেই, তবে তোমরা যে আমাকে বিশ্বাস না করিয়া হাসিলে, এই জন্য উহার নাম রাখিও এসহাক (اسحاق অর্থ—হাস্য) যেন এই অবিশ্বাসের স্মৃতি লুপ্ত না হয়। যথাসময়ে সন্তান হইল। হজরত এবরাহিম ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তাঁহার নাম এসহাকই রাখিলেন। হজরত এসহাকের জন্মের সময় হজরত এসমাইলের বয়স চৌদ্দ বৎসর ছিল। *

সারা খোদার অনুগ্রহে গর্ভধারণ এবং সন্তান লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সময় সকলের পক্ষে সমভাবে সপত্নীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা আশ্চর্য্য। তিনি দেখিলেন, হাজেরা এখন আর তাহাপেক্ষা কোন অংশে বেশী নহেন। সুতরাং তাঁহাকে তাঁহার চক্ষের উপর স্বামী সোহাগের অংশ ভোগ করিতে দেখিতে পারিলেন না। এটা ওটা অজুহাত ধরিয়া হজরত এবরাহিমকে বলিলেন, "এই দাসী এবং উহার পুত্রকে তাড়াইয়া দেও।" কোন অপরাধ নাই, এই অবস্থায় প্রিয়তমা পত্নী এবং স্নেহের দুলাল সন্তানকে কেহ বাড়ী ছাড়া করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারে কি না, বলা যায় না। সরল প্রাণ হজরত এবরাহিম এই কঠোর আব্দার শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কোন দিক অবলম্বন করিবেন, ভাবিয়া স্থির করা তাঁহার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। নিরীহ হাজেরা এবং এসমাইলের বিচ্ছেদ তাঁহার সহ্য হইবে না, পরন্তু তাঁহাদিগকে দূর না করিলে সারা কি অনর্থ ঘটাইয়া বসেন, তাহাই বা কে জানে! লীলাময় খোদাতালা স্বীয় অদ্ভুত লীলা প্রকটন করিতে যাইয়া মানব মণ্ডলীকে অহোরহ এইরূপ ধাঁধায় ফেলিয়া তামাসা দেখেন, আমরা তাহা বুঝি না বলিয়া হাহাকার করিয়া থাকি। বস্তুতঃ সারার মুখ নিসৃত এই কঠোর আজ্ঞা হজরত এবরাহিম, হাজেরা, এসমাইল এবং অল্প বুদ্ধি আমাদের জন্য যতই কঠোর বোধ হউক, খোদা ইহারও নিয়ন্তা। শুধু নিয়ন্তা বলিলে শোভা পায়না, তিনি হজরত এবরাহিমকে সারার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশ্য আজ্ঞাদ্বারা বাধ্য করিলেন। হজরত এসমাইলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হজরত এবরাহিমকে কোন বেগ পাইতে হইবে না, খোদা তাঁহাকে উন্নত এবং এক জাতির পিতা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। নিরুপায় খলীল মরিয়া হইয়া কিছু খাদ্য এবং পানি দিয়া মাতা পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিলেন—সেই প্যারান প্রান্তরে। এই খানে খোদার আদেশে তাঁহারা ভূখণ্ড নিবা-

---

* হজরত এসমাইলের জন্মের সময় হজরত এবরাহিম "চার কুড়ি ছয়" বৎসর বয়স্ক ছিলেন। (আদি পুস্তক, ১৬; ১৬) হজরত এসহাকের জন্ম অব্দে তাঁহার শত বর্ষ বয়স পূর্ণ হয়। (আদি পুস্তক, ২১; ৫) সুতরাং হজরত এসমাইল (১০০—৮৬ = ১৪) চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক ছিলেন।

রণার্থ এক কূপ প্রাপ্ত হয়েন। বাইবেলে এই কূপের নাম হইয়াছে 'বীর সেবা'। (১) কালে ইহা আরবদের নিকট 'বীরে জম জম' নামে অভিহিত হইতে থাকে। কূপ প্রদর্শনকালে স্বর্গদূত উদ্বিগ্না হাজেরাকে কয়েকটী শান্তনা-সূচক আশ্বাসবাক্য বলিয়াছিলেন। খোদা তাঁহার পুত্র হজরত এসমাইলকে বহুপ্রজ করিবেন এই কথাটী তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বাইবেল আরও বলে, God was with the lad. অর্থ—ঈশ্বর সেই বালকের সহায় ছিলেন।

হজরত এবরাহিম হজরত এসমাইলকে পাইয়া এবং খোদার আদেশ ক্রমে তাঁহার নাম এসমাইল রাখিয়া মনে মনে এই ধারণা করিয়া লইলেন যে, ইনিই তাঁহার সেই সাধনাজাত উত্তরাধিকারী। ভবিষ্যতে যে তাঁহার আরও সন্তান হইবে, একথা তিনি আদৌ কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। পরন্তু বহু সন্তানের পিতা হওয়া তাঁহার কাম্যও ছিলনা। বেশী সন্তান হয় হউক মঙ্গলই ; কিন্তু আদৌ পুত্রহীন হওয়া শোভা পায়না বলিয়া তিনি এমন আগ্রহ, এমন অধৈর্য্য সহকারে একটী পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেন। হজরত এসমাইলকে যেই কোলে পাইলেন, অমনি তাঁহার সব দুঃখ দূর হইয়া গেল। এদিকে বহুকাল পরে আবার আর এক পুত্র পাইবেন শুনিয়া ভাবিলেন, তবে এসমাইলের দশা কি হইবে ? খোদা কি এবার আমার ভক্তি এবং পুত্র স্নেহ পরীক্ষা করিতে চাহেন ?" বিনীত প্রার্থনা করিয়া হজরত এসমাইলের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, that Ismail might live before thee। অর্থাৎ এসমাইলকে তুমি জীবিত রাখ। (আদি পুস্তক, ১৭ ; ১৮) এই প্রার্থনা এবং তৎসহ তাচ্ছিল্যের হাস্য আমাদিগকে এই বলিয়া দিতেছে যে তিনি এসমাইলকে পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং অপর সন্তান পাইতে চান না। কিন্তু খোদা সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পুত্র এসহাক ভূমিষ্ঠ হইলেন। গ্রন্থধারীদের (ইহুদী এবং খৃষ্টীয়ান) মধ্যে অনেকের ধারণা এই যে হজরত এসহাকই হজরত এবরাহিমের একমাত্র Legitimate Son হজরত এসমাইল নহেন। আদি পুস্তকের ২২ অধ্যায়ের ২য় পদে "Thine only Son Isaac" (তোমার একমাত্র পুত্র এসহাক) কথাটীই তাহাদের এই ধারণার যুক্তি যুক্ততা প্রতিপাদক। কিন্তু আমরা ইহার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ পাই, তাহা আরও প্রবল—আরও যুক্তিযুক্ত। হজরত এসমাইল ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে হজরত এবরাহিমের দামস্ক দেশীয় এক দাসীর গর্ভে এলিজার নামে এক পুত্র হয়, তিনি তাহাকে পুত্র বলিয়াই স্বীকার করে নাই।

---

(১) হজরত রসুলে করিম মোহাম্মদ মোস্তফার পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের প্রকৃত নাম শয়রা ছিল। তাঁহার সময়ে জমজম কূপ ভরাট হইয়া প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনিই উহা খোদার্থ করিয়া পুনরায় উদ্ধার করেন। অতএব দেখা যায়, এই নাম যদি হজরত মুসার জানিত এবং লিখিত হইয়া থাকে, তবে ইহা যে রসূলের পূর্ব্ব পুরুষের দ্বারা উদ্ধার হইবে তজ্জন্য ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ এই নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। বাইবেল এসম্বন্ধে কোন যুক্তি দিতে পারে না। সুতরাং আমাদের অনুমান অসত্য বা অযৌক্তিক হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

খোদাও বলিয়া দিলেন, 'সে তোমার উত্তরাধিকার পাইবে না' (আদি পুস্তক, ১৫ ; ৪) পক্ষান্তরে হজরত এসমাইলকে খোদা এবং হজরত এবরাহিম উভয়েই হজরত এবরাহিমের ঔরষজ এবং পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শুধু নামের দিক দিয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় ; তাহা ছাড়া সারাকে শান্তনা দান প্রভৃতি দ্বারা বিষয়টা আরও স্পষ্ট ভাবে বোধগম্য হয়। সর্ব্বজ্ঞ সদাপ্রভুর ভ্রম হইয়াছিল (?) একথা স্বীকার না করিলে এসমাইলকে হজরত এবরাহিমের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া এসহাককে Only Son বলা সঙ্গত বা সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বে বরং এ বিষয় একটা মিমাংসা করিয়া লইলে ভাল হইত। মোটের উপর আমাদের ধারণায় আসে, হজরত এসমাইল নামের হিসাবে খোদার নিকটবর্ত্তী, পিতার পরম স্নেহ ও আশীর্ব্বাদে সমৃদ্ধ এবং খোদাতালা কর্ত্তৃক বহু প্রজ হইবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন সুতরাং তাঁহার পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

হজরত এসমাইল এবং হজরত এসহাকের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করিলে খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায় ইহুদীগণের অনুকরণ করিয়া যে এসহাকের প্রাধান্য দাবী করেন, বাইবেল দৃষ্টে তাহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়। মোসলমানের হিসাবে আমরা অবশ্যই উভয়ের তুল্য মর্য্যাদা স্বীকার করি। কিন্তু বাইবেল বলে,—সারা হজরত এবরাহিমের স্ববংশজা আর হাজেরা স্বজাতীয়া। যদি সারা স্ববংশজা বলিয়া বড় হইতে চাহেন, হাজেরা নিজে রাজ কন্যা বলিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবেন। প্রথম বিবাহিতা বলিয়া যদি সারার অহঙ্কার করিবার দাবী আসে, তবে হাজেরা প্রথম পুত্রবতী বলিয়া তাহাকে পশ্চাতে ফেলিতে ন্যায্য অধিকারিণী। সর্ব্বশেষে সারা খোদার উক্তির উপর ব্যঙ্গের হাস্য হাসিয়া তিরস্কার ভাজন এবং হাজেরা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাদেশ ও শান্তনা প্রাপ্ত। এখন পাঠক পাঠিকা উভয়ের পার্থক্য বিচার করুণ। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, হজরত এসমাইল যদি এমনই উপযুক্তা মাতার সন্তান এবং এতই মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন, তবে নির্ব্বাসিত হইলেন কেন ? উত্তরটির জন্য কাহাকেও বেগ পাইতে হইবে না। আদি পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ের ৭ম ও ৮ম পদ পাঠ করুন, দেখিবেন খোদা হজরত এবরাহিমের বংশধরকে যে স্থানটী দিতে প্রতিশ্রুতি দেন সেই 'বেথেল' বা মক্কা ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তিনি কানান দেশে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন; সন্তান দুইটীও সেখানেই ভূমিষ্ট হয়েন। হাজেরা আত্মীয় বিহীন অপরিচিত দেশে সপত্নীর সংঘর্ষে আসিয়াছেন দেখিয়া, হজরত তাঁহাকে একটু বেশী স্নেহ করিতেন। ওদিকে বেথেল সম্বন্ধে তিনি সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। খোদা যদি তাঁহাকে একটী পুত্র পাঠাইয়া সেইদেশ আবাদ করিতে আদেশ করিতেন তবে কাঁহাকে পাঠাইতে হইবে তাহাই লইয়া একটা গোল বাধিতে পারিত। হয়ত এই বিষয় লইয়া হজরত এবরাহিমকে মহা বিব্রতও হইতে হইত। খোদা কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলেন। বিবি সারার প্রাণে এমন এক ভাবের সঞ্চার করিয়া দিলেন, যাহাতে হাজেরা এবং তাঁহার পুত্রের প্রতি হজরত এবরাহিমের অনুরাগ দেখিয়া তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বামীকে অনুরোধ করিলেন,

তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে। ফলে লাভ এই হইল, হজরত এবরাহিম নিরাপত্তে 'বেথেল' এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান মিচরের কর্ত্তা হইয়া খোদার সেই প্রতিশ্রুতির স্বার্থকতা প্রদর্শন করিলেন। হজরত এসমাইল স্বীয় মাতুলালয় মিশরের এবং হজরত এসহাক স্বীয় মাতুল দেশ বাবলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি নিজ নিজ দখলে পাইয়া সুবিধারও চরম ভোগ করিতে পারিলেন। এসব সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিমত্তার নিদর্শন। যাহারা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া হজরত এসমাইলকে Birth right দিতে অনিচ্ছুক, আমরা তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক পাঠের ধারাটাই বুঝিতে অক্ষম। হজরত এসমাইল, বয়সে জ্যেষ্ঠ, রাজপুত্রি-গর্ভজাত, প্রার্থিত উত্তরাধিকারী, বেথেলস্থ ঈশ্বরের গৃহের তত্বাবধায়ক এবং তাঁহার মাতা তাঁহারই মাহাত্ম্যের নিদর্শন স্বরূপ খোদা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদিত এবং প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। * প্রথম বার গর্ভবতী থাকা কালে পলায়নের পথে শান্তনা পান, তাহার স্মৃতি রক্ষার জন্য যেখানে স্বর্গদূত তাহাকে দর্শন দেন, সেখানে অবস্থিত কূপটীকে তিনি 'বীর লা হাইরোই' বা "জীবিতেশ্বরের কূপ যিনি আমাকে দর্শন দিয়াছেন" নাম রাখিয়া দেন। সারার ভাগ্যে কিন্তু তদ্বিপরীতে তিরস্কার এবং একটা অর্ব্বাচীনতার স্মৃতি প্রকাশক তাঁহার পুত্রের নাম এসহাক রাখিয়া তাহার চরিত্রে কলঙ্কের কৃষ্ণরেখা পাত করা হইল। كل شي يرجع الي اصله † প্রবাদের যদি কোন স্বার্থকতা থাকে তবে হজরত এসমাইলের সম্মানের উপর আক্রমণকারীগণ একবার নিজের ভ্রান্তি হীনতার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ‡

মোহাম্মদ মুজাফফর উদ্দীন।

---

* আদি পুস্তক ১৬; ৭—১৪ পদ, ঐ ১৭—১৯ পদ।

† প্রত্যেক বস্তু উহার মূলের অনুসরণ করে।

‡ হজরত এসমাইল এবং হজরত এসহাক সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে চাহিলে পাঠক পাঠিকা উৎসর্গীকৃত সন্তান নামক পুস্তক পাঠ করিবেন।

শাসন কর্ত্তার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

ত্রিযামের প্রথম যাম অতীত প্রায়। তারকাকুল শঙ্কুল সুনীল গগণ প্রাঙ্গণে কুমুদ বান্ধব নিশাকান্ত সগৌরবে নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন। অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকা ও কুটীরাদি সমন্বিত মোস্লেম রাজধানী মহানগরী মদীনা এখনও জাগরিত। লোক সমাগমে মহানগরী এখনও কোলাহলময়ী। এমন সময় দুইজন "বেদুইন" বাসী আরব একটী সুরম্য গৃহ হইতে ধীরে ধীরে—অতি সন্তর্পণে নিক্রান্ত হইয়া জনস্রোতে মিশিয়া গেলেন। তাঁহাদের বেশভূষা এবং অঙ্গসৌষ্ঠব সন্দর্শনে তাঁহাদিগকে বাস্তবিকই উচ্চবংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহারা, অন্যের অলক্ষ্যে, আড়ম্বর শূন্য বীতচেতন দরিদ্র পল্লাভি-মুখে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহারা যেরূপভাবে এবং যে সকল স্থানে যাইতে লাগিলেন তাহাতে তাঁহারা যে অতিশয় কষ্ট সহিষ্ণু, ও তাঁহাদের অন্তঃকরণ যে দয়ামমতায় পরিপুর্ণ, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইল। তাঁহারা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল নগরীর নানা অংশে কেবল দরিদ্র পল্লীতেই ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অনেকক্ষণ এবং অনেক দূর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিবার পর একটী কূপ-পার্শ্ববর্ত্তী শিলাসনে বিশ্রামলাভার্থ তাঁহারা উপবেশন করিলেন। কিয়ৎ কাল পরে তাঁহাদের একজন অন্য জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আব্বাছ! তুমি কি আশ্চর্য্য বস্তু দেখাইবার নিমিত্ত অদ্য আমাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছ, তাহা এখনও বুঝিতে পারিলাম না। মন অতিশয় সংক্ষুব্ধ এবং চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।" আববাছ ভক্তি বিনম্র বচনে উত্তর করিলেন,—প্রভো! আর একটুকু অপেক্ষা করুন, বহুদূর পরিভ্রমণ জনিত ক্লান্তি কিয়ৎ পরিমাণে লঘু হইলে আমরা অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইব।

কিছুক্ষণ উভয় মহাত্মাই নীরব ও নিস্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট থাকিবার পর, আববাছ বলিলেন "প্রভো! এখন বোধ হয়, আপনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন; চলুন এখন আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করি। আব্বাছের প্রশ্নের কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করিয়াই তাঁহার সঙ্গী স্মিত মুখে গাত্রোত্থান করিলেন। আব্বাছ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গী নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনুমান অর্দ্ধঘণ্টা কাল পথ চলিবার পর তাঁহারা একটী কুটীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আব্বাছ আস্তে আস্তে বলিলেন, "এমন ভাবে পথ চলিবেন যেন পদ-বিক্ষেপের শব্দ না হয়।" তাঁহারা যে কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহার দ্বার রুদ্ধ। সুতরাং আববাছের পরামর্শানুযায়ী তাঁহার সঙ্গী রুদ্ধনিশ্বাসে কুটীর-দ্বার-রন্ধ্র-পথে সংলগ্ন দৃষ্টি হইয়া দেখিতে পাইলেন, দুই বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়ঃক্রম বিশিষ্ট পাঁচটী শিশু শয্যাশায়ী; এবং তাহাদের মাতা—অনুমান

ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্কা রমণীসুলভ কমনীয়তা বিরাজিত এক অনিন্দ্য সুন্দরী, উহাদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া উননে জ্বাল জ্বালিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে এক একটী উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। এতদ্দর্শনে তিনি বলিলেন "আব্বাছ! কিছুই বুঝিলাম না; আমাকে বুঝাইয়া বল।" আব্বাছ বলিলেন "অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন, সকলই বুঝিতে পারিবেন।" অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত না হইতেই কুটীরস্থিত শিশুগুলি সমস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল এবং তচ্ছ্রবণে বহিঃস্থ আববাছ ও তদীয় সঙ্গী পুনঃ দ্বার বিন্যস্ত-চক্ষু হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রমণী একটী রুমাল দ্বারা স্বকীয় অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিতেছেন "বৎসগণ! আর বিলম্ব নাই; এই আমি আসিতেছি একটু অপেক্ষা কর বাপ্।" রমণী যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছেন দরবিগলিত অশ্রুধারে তখন তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে। আববাছের সঙ্গী পুনর্ব্বার আববাছকে বলিলেন; "আব্বাছ! তুমি কি আমাকে ইহার কারণ বলিবে না? আমিত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না;—আমার নিকট এ সকল হেঁয়ালী বলিয়া বোধ হইতেছে।" আববাছ বিনয়-নম্রবচনে উত্তর করিলেন "প্রভো! আমি একদা ভবদীয় আদেশ প্রতিপালনার্থ নগরীর এই প্রদেশে রজনী যোগে আগমন করিয়া যাহা যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলাম, অদ্য আপনাকে মাত্র তাহাই দর্শন এবং শ্রবণ করাইলাম। আমি ইহার কারণ বা মর্ম্ম অবগত নহি। কি জন্য রমণী নয়ন জলে সিক্ত হইয়া উননে জ্বাল জ্বালিতেছেন, কি জন্য শিশু গুলিকে "আর একটু অপেক্ষা কর বৎসগণ! এই আমি আসিতেছি" বলিয়াও স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাহা আমি ঘুণাক্ষরেও অবগত নহি। তদীয় বাক্য শ্রবণে তিনি খেদান্বিত কণ্ঠে আদেশ করিলেন "আববাছ! দ্বারে আঘাত কর।" আব্বাছ দ্বারে আঘাত করিলেন। গৃহাভ্যন্তর হইতে রমণী সুলভ ব্রীড়াবিজড়িত কোমল কণ্ঠে শব্দ হইল "কে আপনি, এত রাত্রিতে দ্বারে আঘাত করিতেছেন?" আববাছ তদীয় সঙ্গীর আদেশানুসারে বলিলেন, "মাতঃ! আমরা দুইজন পথিক, একটু পানীয় যাচ্ঞা করিতেছি।" দ্বার উন্মুক্ত হইল; রমণী দুইটী পাত্র স্বাদু জলে পূর্ণ করিয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মহোদয়গণ! আজ প্রায় দুই বৎসর যাবৎ আমার স্বামী স্বর্গগত হইয়াছেন; হতভাগিনী আমি তদবধি আর এক দিনের তরেও অতিথি সৎকার করিতে পারি নাই। আজ যেও আপনাদের শুভ পদার্পণে আমার কুটীর পবিত্র হইল, কিন্তু জল ভিন্ন অন্য কিছুই উপস্থিত করিয়া আপনাদের সম্মুখে ধরিবার সঙ্গতি আমার নাই। এই যে উননের উপর তাম্র পাত্র দর্শন করিতেছেন, উহার মধ্যদেশ জল পূর্ণ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির উপর স্থাপন করিয়াছি। আমার গৃহে আহারের কিছুমাত্র সংস্থান নাই বলিয়া সন্তানগুলি যখন নিদারুণ জঠরানলে উৎপীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছে, তখন এই কটাহের মধ্যস্থিত উষ্ণ জল আলোড়িত করিয়া তাহাদিগকে শান্তনা প্রদান করিতেছি;—যখন আমার অপোগণ্ড শিশুগুলি আমার আশ্বাস বাক্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে কটাহের উৎক্ষিপ্ত উষ্ণ জলের বাষ্প সন্দর্শন করিতেছে, তখন তাহারা মনে করিতেছে যে, তাহাদের স্নেহময়ী জননী তাহাদের জন্ম নিশ্চয়ই

কোন স্বাদু আহারীয় প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু হায়! তাহারা জানেনা যে তাহাদের জননীর নিকট ময়দার একটী মাত্র কণিকাও নাই যদ্দ্বারা সে তাহাদের ক্ষুন্নিবারণের জন্য অতি সামান্য খাদ্যও প্রস্তুত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইবে। মা হইয়া এইরূপে সন্তানকে প্রতারণা করা কতদূর কঠিন অন্তঃকরণের কার্য্য তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার দ্বিতীয় মানটী বোধ হয় করুণাময় খোদাতালার সৃষ্টিতে নাই! কিন্তু আমার উপায়ান্তর নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা দারুণ ক্ষুধায় নিপীড়িত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া নিদ্রাভিভূত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এই স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া কটাহের জল নাড়িয়া নাড়িয়া স্তোকবাক্যে আমার প্রাণাধিক অপোগণ্ড শিশুগুলিকে ভুলাইতে থাকিব। যে মাতা আপন সন্তানকে পেট ভরিয়া আহার করাইতে না পারিলে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, আমিও সেই মাতৃজাতীয় একজন, কিন্তু অদৃষ্টবশে আজ প্রবঞ্চনা প্রয়োগে অবোধ শিশু গুলিকে আমি অনশনে রাখিতেছি। আমার অবস্থা দর্শন এবং শ্রবণ করিবার কেহ নাই; আমার কাহিনী শ্রবণ করিলে পাষাণও পীড়া পায়।"

রমণীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে আব্বাছ ও তাঁহার সঙ্গীর প্রায় কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতি কষ্টে আব্বাছ বলিলেন "মাতঃ! আপনি আমাদের সদাশয় খলিফার নিকট আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করেন নাই কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা হইলে আপনাকে এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুগুলি লইয়া কখনও এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না।"

রমণী—"আমাদের সদাশয় খলিফা? আপনার বাক্য শ্রবণে আমি অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমাদের কি খলিফা আছে?"

আব্বাছ—"মাতঃ! আমাদের খলিফা আছেন। অমিত পরাক্রম, অদ্বিতীয় বিচারক, কুশাগ্রধী, বিপন্নের আশ্রয়, ক্ষুধাতুরের অন্নদাতা, মহানুভব হজরত ওমর ফারুখ (রাজি) আমাদের বর্ত্তমান খলিফা। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার নাম আপনি অবগত নহেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক! রুম, শাম, জঙ্গবার, হাবেশ, মেছের প্রমুখ বিভিন্ন প্রদেশে যাঁহার পবিত্র নাম প্রতি নিয়ত গীত হইতেছে আপনী রাজধানীর উপরে থাকিয়াও কেন যে সেই পূতঃ নাম জানিতে পারেন নাই তাহা আমি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না।"

রমণী—"ও, বুঝিয়াছি! বুঝিয়াছি!! আপনারা বুঝি সেই স্বার্থপর, ক্ষমতাপ্রিয়, অর্থগৃধ্নু-কেই খলিফা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন? আমিত তাহাকে অতিকায় পাষণ্ড, বিচার-মূঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিবর্জ্জিত নীচাশয় বলিয়াই জানি।"

আব্বাছ—"তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আপনি কিরূপে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন? পরন্তু তিনি যে কর্ত্তব্যজ্ঞান বিবর্জ্জিত তাহাই বা আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন? আপনি স্নেহময়ী মাতৃজাতীয় রমণী হইয়াও যে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লোকান্তর গীত কীর্ত্তি পুরুষ প্রধানের নামে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ইহাতেই আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি।"

রমণী—"তাহার খলিফা পদটীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যই আমার লক্ষ্য। পরম কারুণিক বিধাতার পরম অনুগ্রহে যে ব্যক্তি কোটী কোটী নর-নারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছে, তাহার সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এই যে সে তাহার হস্তে-ন্যস্ত ভাগ্য প্রত্যেক প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তৎপ্রতিকারের সচেষ্ট হয়। আত্মসম্মান এবং বংশমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া অনেকেই হয়ত খলিফার নিকট নিজ নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করিতে তথা তাঁহার কৃপা-বৃক্ষের ফললাভ করিতে অসমর্থ। অতএব পরমেশ্বরের সৃষ্ট অসংখ্য জীবের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি কেবল মধুচাকে স্বীয় রসনার তৃপ্তিসাধন করনান্তর দুগ্ধ-ফেন-নিভ কোমল শয্যায় শয়নপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে দিনাতিপাত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় দুরদৃষ্ট পামর আর দ্বিতীয় নাই! স্বয়ং জগৎপাতা যখন তাহার কর্ত্তব্য অবহেলার কারণ জিজ্ঞাসু হইবেন, তখন সে তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে থাকিবে; তখন তাহার পদ্মরাগ গঞ্জিত অরুণ লোচন নিষ্প্রভ এবং কোটর প্রবিষ্ট হইবে। খলিফার যে খলিফা আছে তাহা খলিফার হৃদয়পটে, প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায়, বিশেষ ও বিশদভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। খলিফার ছিদ্র আছে ভ্রম আছে;—খলিফার যে খলিফা তাঁহার ছিদ্র নাই, ভ্রম নাই।"

রমণীর বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহারা উভয়ই স্তম্ভিত হইলেন। এবং ঘন ঘন একে অন্যের মুখেরদিকে দীনদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আব্বাছ রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মাতঃ! আমরা পথিক নহি, রাজচর। রজনীযোগে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া প্রজার মঙ্গলা-মঙ্গল লক্ষ্য এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা রাজগোচর করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা আপনকার নিঃস্ব অবস্থার বিষয় খলিফার গোচর করিব,—আমাদের সমক্ষে আর আপনি তাঁহার বৃথা নিন্দা করিবেন না।"

আব্বাছের এবম্বিধ প্রভুভক্তি ব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণে পৃষ্ট-পুচ্ছ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় রমণী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; এবং কণ্ঠস্বর একটু চড়াইয়া উত্তর করিলেন "কি? আপনারা রাজচর? আচ্ছা ভালই। আর যদি স্বয়ং খলিফা নামধারী ক্ষমতা প্রিয় খাত্তাব-নন্দন ওমর (রাজিঃ) এই মুহূর্ত্তে আমার সমক্ষে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে এই কথা বলিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিতাম না। আপনাদের নিকট আমার এই বিনীত অনুরোধ, আপনারা তাঁহাকে আমার অবস্থার কথা কিছুমাত্র বলিবেন না—কেবল তাঁহার প্রতি আমি যে রূঢ় এবং পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি তাহাই যেন বিশেষ করিয়া এবং বিশদভাবে জ্ঞাপন করেন।"

"আর বলিতে হইবে না"—আব্বাছের সঙ্গী করুণ চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল পরিকম্পিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আর বলিতে হইবে না; যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বার্ত্তা চলিতেছে আমিই সেই হতভাগ্য নরাধম ওমর। মাতঃ! আমি বাস্তবিকই স্বার্থপর, ক্ষমতা প্রিয়, এবং পাষণ্ড। জননি! আমার কর্ত্তব্যহীনতা নিবন্ধন যে কষ্ট পাইয়াছ তজ্জন্ত আমাকে

ক্ষমা কর,—আমি ক্ষমার পাত্র—ক্ষমার যোগ্য কিনা তাহা জানি না; মাতঃ! বল আমাকে ক্ষমা করিবে কি না?—আববাছ! তুমি এখনই যাইয়া এই দেবী রূপা রমণী ও তাঁহার পুত্রদের নিমিত্ত সহস্র সংখ্যক প্রচলিত মুদ্রা পঞ্চ উষ্ট্র বাহিত গম এবং পঞ্চ উষ্ট্র বাহিত ঘৃত ও অন্যান্য উপকরণ শীঘ্র লইয়া আইস।"

আববাছ অনতি বিলম্বেই হজরত ওমরের (রাজিঃ) আদিষ্ট দ্রব্য-সম্ভার সমভিব্যাহারে, ফিরিয়া আসিলেন। রমণী এতক্ষণ চিত্রার্পিত পুত্তলীবৎ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া সকল দেখিতেছিলেন। আববাছ ফিরিয়া আসিলে তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন "খলিফা! হজরত! আমায় ক্ষমা কর।" উত্তরে খলিফা বলিলেন "মা! তোমার নিকট আজ যে শিক্ষা পাইলাম, তজ্জন্য আমিই তোমার নিকট ঋণী,—ক্ষমা করিব কি? অবোধ পুত্র জ্ঞানে আমাকে ক্ষমা কর।" রজনী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া উভয়ে মিষ্ট বাক্যে রমণীকে শান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন।

ধন্য ওমর! ধন্য তোমার স্বজাতীপ্রিয়তা, ধন্য তোমার প্রজাবৎসলতা, ধন্য তোমার ন্যায়-পরায়ণতা, ধন্য তোমার ধর্ম্মপ্রাণতা, ধন্য তোমার একাগ্রচিত্ততা, ধন্য তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। এইরূপে তুমি কত শত দীন দুঃখীর ধনপ্রাণ মান রক্ষা করিয়াছ তাহার সংখ্যা কে করে? পৃথিবীর যাবতীয় নরপাল যুগে যুগে তোমার পদানুসরণ করুন পৃথিবী নন্দন-কানন হইবে।

দেওয়ান আহমদ আলী।

জাহান-আরা বেগম।

(৩)

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে একথা বলা বোধ হয় অন্যায় ও অসঙ্গত হয় না যে, সম্রাট শাহজাহান যেমন বীরপুরুষ ছিলেন, তেমনি প্রেমিকও ছিলেন। তিনি ভারত সাম্রাজ্যেরও যেমন সম্রাট ছিলেন, পৃথিবীর মধ্যে তেমনি তিনিই একমাত্র প্রেম-রাজ্যের সম্রাটের আসন অধিকার করিয়া গিয়াছেন। একাধারে তিনি যে কঠিন ও কোমল ছিলেন,—শক্ত ও নরম ছিলেন, জগৎবাসীর সম্মুখে তিনি তাজমহলকে তাহার প্রমাণ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি বা এমন কোন সম্প্রদায় নাই যে, আগ্রার তাজমহল দেখিবার আগ্রহ ও আকাঙ্খা তাহাদের না হয়। জগতের সপ্তম আশ্চর্য্যের মধ্যে তাজমহলকে শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়।

যাঁহার রওজায় আজিও এত অধিক পরিমাণে কবিত্বভাব বর্ত্তমান; জীবিতমানে তিনি কিরূপ কবি ছিলেন, পাঠকবর্গকে তাহারই একটু দৃষ্টান্ত দিয়া, আমরা এই প্রসঙ্গের

উপসংহার করিব। একদিন সম্রাট শাহজাহান, তাঁহার হৃদয়রাণী মোমতাজ মহলের সঙ্গে হারেম সন্নিহিত গোলাপ কুঞ্জে বসিয়া যমুনার শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন। উপর্য্যুপরি তরঙ্গের পর তরঙ্গ—এক সঙ্গে বহু তরঙ্গমালা আসিয়া প্রাসাদ সংলগ্ন প্রাচীর গাত্রে আহত হইতেছিল। বোধ হয় সম্রাটের হৃদয়ের মধ্যেও যমুনার ন্যায় তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল। তিনি মোমতাজ মহলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

آب از براے دیدنت می‌آید از فرسنگہا

"আ'ব আজ বরায়ে দি-দানাৎ মি-আয়েদ আজ ফর সঙ্গেহা।"

অর্থাৎ—(হে তাজবিবি সুন্দরী !) যমুনার জল তোমাকে দেখিবার জন্য বহু দূর হইতে আসিতেছে।

মোমতাজমহল, সম্রাটের এই রহস্যাত্মক উক্তি শ্রবণ করতঃ আর মূহুর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া, সহাস্য-আননে কহিলেন,—

از ھیبت شاہ جہان سر می زند بر سنگہا

"আজ হয়বতে শাহজাহাঁ সর মিজানাদ বর সঙ্গে হা।"

অর্থাৎ—শাহজাহান বাদশার ভয়ে, কিন্তু পাথরের উপর মাথা ঠুকিতেছে।

আমরা তৈমুর গোরগানিকেই প্রথম পুরুষ ধরিয়া এই পরিচয় আরম্ভ করিতেছি। প্রথম তৈমুর গোরগানি, তৎপুত্র জহিরদ্দিন মোহাম্মাদ বাবর। সম্রাট জহিরদ্দিন মোহাম্মাদ বাবরের পুত্র হুমায়ুন, মির্জ্জা কামরাণ, মির্জ্জা আস্‌কারী, মির্জ্জা হিন্দাল। সম্রাট হুমায়ুনের পুত্র হাকিম জালাল-উদ্দিন মোহাম্মাদ আকবর ও হাকিম জালাল-উদ্দিন মোহাম্মাদ ইব্রাহিম। সম্রাট আকবরের সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে কুমার সলিমশাহ জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ করিয়া, ভারতের সম্রাট হয়েন। জাহাঙ্গীরের কয়েকটী পুত্র কন্যার মধ্যে শাহজাহান সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। এই সম্রাট শাহজাহানের ঔরষে এবং সুন্দরী শিরোমণি মোমতাজ মহলের রত্নগর্ভে আমাদের আখ্যায়িকা জাহান্-আরা বেগমের জন্ম।

জাহান্-আরার জন্ম।

১০২৩ হিজরী অব্দে শাহাজাহান মিরাটের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল যুদ্ধের সময়ই মোমতাজ মহল তাঁহার সঙ্গিনী হইতেন। সুতরাং এই যুদ্ধকালেও মোমতাজ মহল, তাঁহার সহিত মিরাটে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ণ গর্ভাছিলেন বলিয়া, ছাউনীর বস্ত্রাবাসে অবস্থান করিয়া, শাহজাহানকে যুদ্ধ জয় কার্য্যে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ৩১শে সফর তারিখে ফজরের আজানধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে, শাহজাহান, শত্রু সৈন্যের কোলাহলধ্বনি শ্রুত হয়েন। শত্রু সৈন্য ভীমবেগে শাহজাহানকে আক্রমণ করে। শাহজাহান শত্রুদিগের সহিত অমিত তেজের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময় (অনুমান বেলা ৮টার সময়।) সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে "মোমতাজ

মহলের গর্ভে ভুবনমোহিনী এক কন্যা ভূমিষ্ট হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রুত হইয়া, শাহজাহানের হৃদয়ের তেজ ও বল শত গুণে বৃদ্ধি হয়, এবং সামান্য কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে শত্রু সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া, তিনি মোমতাজ মহলের নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় কণ্ঠ হইতে "গজমতিহার" খুলিয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে কন্যার মুখ দর্শন করেন। এই কন্যা রত্নই ইতিহাস বিখ্যাত জাহান্-আরা বেগম ওরফে বেগম সাহেবা।

জাহান্-আরার পিতৃ পরিচয়।—উপরে আমরা রাজনন্দিনী জাহান্-আরা বেগমের মাতৃ বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি, এক্ষণে আমরা তাহার পিতৃ বংশের নামোল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

তৈমুর গোরগানি ওরফে তৈমুর লং হইতে আমরা এই পরিচয় আরম্ভ করিতেছি। তৈমুর গোরগানীর পুত্র জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর। বাবরের পুত্র মোহাম্মদ হুমায়ুন। হুমায়ুনের পুত্র জালাল-উদ্দিন হাকিম মোহাম্মদ আকবর। আকবরের পুত্র সলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান, এবং শাহজাহানের কন্যা জাহান্-আরা বেগম।

জাহান্-আরার জন্মবৃত্তান্ত।— ঐতিহাসিক মৌলবী মহবুবর রহমান সাহেব তাঁহার শাহজাহান চরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, জাহান্-আরার জন্মের পূর্ব্বে শাহজাহানের উপর যে সমস্ত আপদ বিপদ পর্য্যায়ক্রমে ঘূর্ণি-বায়ুর ন্যায় আপতিত হইতেছিল, তাহাতে তিনি ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি একটির পর একটি করিয়া বিপদ যেন পুঞ্জিভূত হইতেছিল। শত্রুদল ক্রমেই পুষ্টিলাভ করিতেছিল। কিন্তু মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ যাঁহার মস্তকে বর্ষিত হয়, তাঁহার কোন প্রকার বিপদ আপদই আর থাকে না; সমস্তই যেন একে একে অন্যের অলক্ষিত ভাবে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। শাহজাহানের প্রতিও বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এবং কন্যা জাহান-আরার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একে একে সমস্ত বিপদ আপদ যেন ভয়ে দূরে পলায়ন করিল। পাঠক বর্গের অবগতির নিমিত্ত আমরা নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

"হিজরী ১০৩২ অব্দের শেষ ভাগে মিরাট ও তৎসন্নিহিত কয়েকটা স্থানের প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডিন করে। সুতরাং বীরবর শাহজাহানকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সসৈন্যে মিরাট অভিমুখে গমন করিতে হইয়াছিল। এই সময় আদর্শ সুন্দরী মোমতাজ মহল আসন্ন প্রসবা বলিয়া শাহজাহান তাঁহাকে সঙ্গে লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মোমতাজ মহল কিছুতেই আগ্রায় থাকিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, অগত্যা শাহজাহান তাঁহাকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হয়েন। ১০৩২ হিজরী অব্দের ৫ই জেলহজ্জ তারিখে সম্রাট বাহিনী, শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। ১০৩৩ হিজরীর ২৯শে সফর তারিখে শাহজাহানের পক্ষে যুদ্ধের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, এমনকি সেদিন যদি সন্ধ্যা সুন্দরী

আর একটু অপেক্ষা করিয়া ধরাতলে দর্শন দিতেন, তাহা হইলে খুব সম্ভব শাহজাহানকে সাঙ্গোপাঙ্গে বন্দী অবস্থায় শত্রু শিবিরে প্রবেশলাভ করিতে হইত। কিন্তু বিধাতার তাহা ইচ্ছা ছিল না। তাই সেদিন শীঘ্র শীঘ্র যেন সান্ধ্য অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। কোথাও সন্ধ্যাবন্দনার জন্য আজান-ধ্বনি আরম্ভ হইল; আবার কোথাও বা শঙ্খঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং সন্ধ্যাগমের সংবাদে, উভয় পক্ষই সেদিনকার মত যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সমস্ত রাত্রিই একপ্রকার উদ্বিগ্নে কাটিয়া গেল। সেনাপতি হইতে সামান্য সৈনিক পুরুষ পর্য্যন্ত, কাহারও সেরাত্রি ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। কেহ বা জয় আশায় উৎফুল্ল হৃদয়ে জাগিয়া জাগিয়া রাত্রি পোহাইল; আবার কেহ বা পরাজয়ের পর শেষ পরিণাম কি হইবে, সেই চিন্তাতেই নিশি যাপন করিল।"

"এই ভাবে শাহজাহানেরও অর্দ্ধেক রাত্রি অতিবাহিত হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তিনি "তাহাজ্জত" নমাজ আরম্ভ করিলেন, এবং ফজর নমাজ শেষ করিয়া, খোদাতায়ালার নিকট যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন, এমন সময়, ১০৩৩ হিঃ অব্দে ৩০শে সফর তারিখে এক বাঁদী আসিয়া জাহান্-আরার জন্ম সংবাদ তাঁহার কর্ণ-গোচর করিল। শাহজাহান এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রই মোমতাজ মহলের খিমায় (তাঁবুতে) উপস্থিত হইলেন; এবং স্বীয় কণ্ঠ বিলম্বিত এক ছড়া গজমতি হার (মুক্তামালা) খুলিয়া দিয়া কন্যার মুখ দর্শন করিলেন। কিন্তু অধিক ক্ষণ তিনি মোমতাজ মহলের নিকট অবস্থান করিতে পারিলেন না। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শাহজাহানের হৃদয়ের যত দুর্ব্বলতা, এই কন্যামুখ দর্শনে যেন সমস্তই দূরীভূত হইয়া, তাঁহার হৃদয়ে সেদিন এক স্বর্গীয় নব বলের ও নব তেজের সঞ্চার হইয়াছিল। শাহজাহানের সেদিনের বিক্রম দেখিয়া শত্রুরাও মুগ্ধ, এবং স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। বেলা দেড় প্রহরের পর আর শত্রুদল শাহজাহানের বিক্রমের নিকট তিষ্ঠিতে সক্ষম হইল না; তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল. এবং শত্রুদলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে দুই চারি-জন সম্রাটের বন্দিরূপে আগরায় প্রেরিত হইল। শাহজাহান সৈন্য, শত্রুসৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল।"

"যুদ্ধ জয়ের পর শাহজাহানের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সদ্যপ্রসূত কন্যা রত্নলাভের ফলেই তাঁহার এইরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে; সুতরাং এই কন্যা-রত্নের সৌভাগ্য গুণেই যে তিনি ভাগ্যবান দিগের অগ্রণী হইতে পারিবেন, শাহজাহান তাহা প্রথম হইতেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। সে কারণ তিনি সর্ব্বদাই জাহান-আরাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। রাজ মহিষি মোমতাজ মহলের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত প্রায় এক কোটী টাকা মূল্যের হীরা মণি-মাণিক্য-খচিত অলঙ্কারাদির অর্দ্ধেক সম্রাট শাহজাহান স্বীয় প্রিয়তমা কন্যা জাহান্-আরা বেগমকে এবং অপরার্দ্ধেক সমস্ত সন্তানদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত মোমতাজ মহলের ব্যবহার্য্য সমস্ত আসবাব পত্রই

সম্রাট জাহান্‌-আরাকে দান করিয়াছিলেন। শাহজাহাননামা পাঠে জানা যায় যে, মির্জা এসহাক বেন নামক জনৈক ধার্ম্মিক ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি মোমতাজ মহলের "মীর সামানের" পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট ঐ ব্যক্তিকে অপর কোন কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া জাহান্‌-আরা বেগমের দেওয়ানের পদে বহাল করিয়াছিলেন। *

জাহান্‌-আরার প্রতি সম্রাটের অত্যধিক স্নেহের কারণ।—সম্রাট শাহজাহান নিম্নলিখিত তিনটী বিশেষ কারণ বশতঃ, কন্যা জাহান্‌-আরাকে অপরাপর সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। যথা—

(১) জাহন্‌-আরার জন্ম দিবস হইতেই, শাহজাহানের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। পূর্ব্বে যাঁহারা শাহজাহানের প্রধান শত্রু ছিলেন, জাহান্‌-আরার জন্মের পর হইতে তাঁহাদের অনেকেই শাহজাহানের মিত্র দলভুক্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা শত্রুভাবে শাহজাহানের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেক কার্য্যেই বিফল মনোরথ হইতেছিলেন। কোন কার্য্যেই তাঁহারা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ জাহান্‌-আরার জন্মের পর হইতেই, শাহজাহানের সৌভাগ্য সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগণে উদিত হইয়াছিল।

(২) শৈশব কাল হইতেই জাহান্‌-আরা বেগম, খোদাতায়ালার ফরজ ও ওয়াজেব এবং রসুলোল্লার সোন্নতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সর্ব্বদাই ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। ধার্ম্মিক পুরুষ ও মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত পাঠ করা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য্য ছিল। জ্ঞানোদয়ের পর হইতে তিনি কখনও নমাজ-রোজা ত্যাগ করেন নাই।

(৩) বাল্যকাল হইতেই তিনি সত্য কথা বলিতে ভাল বাসিতেন, এবং মিথ্যা কথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল ছিল, এবং শত্রু ও অপরাধি-দিগকে ক্ষমা করিতে পারিলে তিনি অধিক পরিমাণে সুখানুভব করিতেন। তিনি বলিতেন, অপরাধ না করিলে কেহ তোমার আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থীরূপে আইসে না। সুতরাং প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পূরণ করাই মনুষ্যত্ব। ধন দৌলত দ্বারা হৃদয়হীন দস্যুরাও প্রার্থনা-কারীর প্রার্থনা অনেক সময় পূরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা কি রাহাজানী করিবার সময় কাহারও ক্রন্দনের প্রতি কর্ণপাত করে? এমতাবস্থায় তাহাতে আর আমাতে প্রভেদ কি? কেহ অপরাধ করিয়া যে পরিমাণ মনুষ্যত্বকে হারাইয়া বসে, অপরাধকারীর আকুল ক্রন্দনে যে ব্যক্তি তাহাকে ক্ষমা না করে, সে পশুরও অধম। † সে তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসে।"

---

* মৌলভী মহবুবুর রহমান প্রণীত জাহান্‌-আরা চরিতের ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† মুনশী শিউ বক্‌শ লিখিত জাহান্‌-আরা চরিতের ২৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সদর-উন্-নেসা খানম।

সদর-উন্-নেসা খানম নাম্নী যে আদর্শ চরিত্রা মহিলা রত্নকে, শাহজাহান নন্দিনী জাহান-আরা বেগমের শিক্ষার ভারার্পণ করা হইয়াছিল, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে দুইনামে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সদর-উন্-নেসা নামে অভিহিত করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে সফিওন্-নেসা খানম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা এই প্রবন্ধে, সদর-উন্-নেসা খানম বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিব। যাঁহারা পার্সী সাহিত্যের কিঞ্চিৎ মাত্রও সংবাদ রাখেন, তাঁহারা হাকিম রোকনাকাশী নামক জনৈক আদর্শ কবির কবিতার রসাস্বাদন করিবার সুযোগ বোধ হয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কবিবর হাকিম রোকনা কাশী, ইরাণাধিপতি আব্বাস শাহের রাজ সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। কবিবর রোকনাকাশী ইরাণপতির অসদ্ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া পারশ্য দেশ ত্যাগ করতঃ, ভারতবর্ষে চলিয়া আইসেন। সমস্ত পারশ্য সাম্রাজ্যের মধ্যে হাকিম রোকনাকাশী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইরাণ ত্যাগ করিয়া, ভারতাভিমুখে রওয়ানা হইবার সময়, পারস্য সম্রাট আব্বাস শাহকে লক্ষ্য করিয়া পার্সী ভাষায় যে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, আমরা পাঠক বর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কবিতাটী এই,—

"গর্ ফলক্" এক সোবেহ দম চামন্ গের্দ্দা বাশদ্ সরশ।
শাম বেরু মি-রওয়াম চুঁ আফতাব আজ কেশওয়ারশ।"

অর্থাৎ—যদি অতি অল্পক্ষণের জন্যও আকাশে একখণ্ড মেঘের উদয় হয়, তাহা হইলে চির দিনের তরে সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

কবিবর রোকনাকাশী যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন দিল্লির সিংহাসনে বসিয়া সম্রাট আকবর ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন। আকবর শাহ পূর্ব্ব হইতেই পারশ্য-রাজ-সভাপণ্ডিত হাকিম রোকনাকাশীর কাব্য ঝঙ্কারের ও পাণ্ডিত্যের বিস্তৃত পরিচয় অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি কবিবরের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সভাপণ্ডিতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাকিম রোকনাকাশী যে কেবল একাই ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি সস্ত্রীক ও সপরিবারে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারত গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সহধর্ম্মিণী উম্মাতন্-নেসা খানম, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আগরার বিখ্যাত কবি দেওয়ান নসির এবং দেওয়ান নসিরের সহধর্ম্মিণী সদর-উন্-নেসা ওরফে সফিওন্-নেসা খানমও আসিয়াছিলেন। * পণ্ডিত রোকনাকাশী ও তাঁহার পরিবারবর্গের আগরায় পৌছার কয়েকদিন মাত্র পরেই, নওরোজ উৎসব আরম্ভ হয় এবং এই উপলক্ষেই হারেমের বেগমদিগের সহিত রোকনাকাশীর পরিবার ভুক্ত মহিলা-দ্বয়—উম্মতন্-নেসা ও সদর-উন্-নেসার পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। বেগমেরা এই দুই নবাগত

* আকবর নামা দ্রষ্টব্য।

মহিলা-রত্নের সহিত আলাপ পরিচয়ে এতই প্রীতি লাভ করেন যে, তাঁহাদিগকে প্রত্যহ হারেমে উপস্থিত হইবার জন্যও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কথিত আছে যে, এই দুই মহিলা রত্নের সহিত যাঁহারা একবার মাত্র আলাপ-পরিচয়ের সুযোগলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইঁহাদের চরিত্র বলে ও সুমিষ্ট বচন প্রভাবে অত্যধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাহিরে—রাজ দরবারে কবি রোকনাকাশী ও দেওয়ান নসির সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং অন্দরে হারেমভ্যান্তরে এই দুই আদর্শ-চরিত্রা মহিলা, সকলের পূজনীয় মহিলারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, একমাত্র চরিত্র বলেই, হাকিম রোকনাকাশীর পরিবার ভুক্ত প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকই, অতি অল্পকাল মধ্যে সমগ্র দিল্লি ও আগরার হিন্দু মুসলমান নর-নারীর নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দিল্লি ও আগরার প্রত্যেক নর-নারী দিবারাত্র এই পরিবার ভুক্ত নর-নারীর সংশ্রবে থাকিয়া, সদুপদেশ পূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত সামান্য দুই চারি দণ্ড আলাপ পরিচয়ে কেহই যেন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না।

সম্রাট মোহাম্মাদ জালাল-উদ্দিন আকবরের মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র কুমার মোহাম্মাদ সেলিম শাহ, ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে "আসেফ-উদ্-দৌলা মোহাম্মাদ জাহাঙ্গীর" উপাধি গ্রহণ করতঃ যখন ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে যখন হতভাগ্য শের আফগনের ধ্বংশ সাধন করতঃ গেয়াস-উদ্দিন কন্যা মেহের উন্-নেসাকে "নূর জাহান" উপাধিতে ভূষিত করিয়া, পত্নীরূপে গ্রহণ করতঃ যুক্ত শক্তিতে বিশাল ভারত সাম্রাজ্য শাসন-পালন করিতেছিলেন, সেই সময় এই কবিবর ও তাঁহার পরিবার বর্গের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সমগ্র আগরা ও দিল্লি নগরীতে আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। *

ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, সদর-উন্-নেসা খানমের গুণে মুগ্ধ হইয়া, অনতিকাল মধ্যে তাঁহার সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। † এই গুণবতী মহিলা সদর-উন্-নেসাই, পরবর্ত্তী কালে সম্রাট তনয়া, জাহান-আরার শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে এই গুণবতী মহিলার পিতৃ বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া পাঠক পাঠিকা বর্গের কৌতূহল নিবারণ করিতেছি।

যাঁহারা পার্সী সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া, রক্ষিত রত্নাদির সৌন্দর্য্য দর্শন করতঃ ভাগ্যবান শ্রেণীভুক্ত হইবার অবসর লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় পার্সী-সাহিত্য ভাণ্ডারের অভ্যন্তরস্থিত অন্যতম রত্ন, "দিওয়ান তালেব-আমলি" দর্শন করিয়াছেন। এই "দিওয়ান তালেব-আমলি"র গ্রন্থকর্ত্তৃ কবি সম্রাজ্ঞী তালেব আমলি সদর-উন্-নেসা খানমের জ্যেষ্ঠ সহোদরা ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দির শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দির প্রথম ভাগে, এই স্ত্রী কবি তালেব-আমলির কাব্য-ঝঙ্কারে সাধারণতঃ

* জাহাঙ্গীর নামা দ্রষ্টব্য।　　† তোজকে জাহাঙ্গীরী দ্রষ্টব্য।

সমস্ত পার্সী-সাহিত্য জগৎ, এবং বিশেষতঃ সমগ্র আজম দেশ মুখরিত হইয়াছিল। কবি শ্রেষ্ঠা তালেব-আম্লির লিখিত দিওয়ান খানিতে আধ্যাত্মিক ভাবের চতুর্দ্দশ সহস্র কবিতা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। * যাঁহারা তাঁহার সমগ্র দিওয়ান খানি পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করেন যে, "পারস্য সাহিত্যের মধ্যে যতগুলি উচ্চ শ্রেণীর কাব্য-গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানিকে শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" জনৈক সমালোচক, তালেব আম্লির দেওয়ানের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "হর এক শের দেলপর তীর ও নস্তর কা কাম কার্ত্তা হায়।"

ہر ایک شعر دل پر تیر و نشتر کا کام کرتا ہے

কবি তালেব-আমলি, এবং সদর-উন্-নেসা খানমের বংশ পরিচয় ইতিহাসে সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক সাহেব উদ্দিন, তালেব-আমলির জীবনচরিতে লিখিয়াছেন,— "বিখ্যাত স্ত্রী কবি তালেব-আম্লি ও তাঁহার ভাগিনী আদর্শ কবি ও শিক্ষয়িত্রী (ওস্তানি) সদর-উন্-নেসা খানম্ হজরত সৈয়েদ এমাম জয়নাল আবেদিন (রঃ) র বংশসম্ভূত।" সুতরাং ইঁহারা যে, হজরত নবী করিম (সঃ)র বংশ সম্ভূত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সদর-উন্-নেসা খানম ও তাঁহার স্বাভাবিক কাব্য ঝঙ্কারে ভারতবর্ষকে মুখরিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান কেন যে ইঁহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হিজরী ১০২৮ অব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইঁহাকে "শায়ের-উল-মোল্ক" উপাধি গৌরবে ভূষিত করিয়াছিলেন। সদর-উন্-নেসা খানম কেবল যে বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন তাহা নহে, তিনি বিবিধ শিল্পকার্য্যেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ কোরাণ-শরীফের হাফেজ ছিলেন। হাদিস ও তফসিরের অনেক পুস্তক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। অধিকন্তু তিনি সুন্নি সম্প্রদায় ভুক্ত মহিলা ছিলেন।

এক দিকে যেমন তিনি এক মহান গৌরবান্বিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অন্যদিকে তেমনি তিনি এক উচ্চবংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত উদ্বাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার স্বভাব-চরিত্র, তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁহার আচার-ব্যবহার সমস্তই আদর্শ জনোচিত ছিল। এই হেতু তৎকালীন ভারতের ভবিষ্যত রাজমহিষি সুর-সুন্দরী মোমতাজ মহলের শিক্ষার এবং চরিত্র গঠনের ভারও প্রথমে যেমন তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল; তেমনি বৃদ্ধ বয়সে আবার জাহান্-আরার শিক্ষয়িত্রীর পদও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। † যে সময় তিনি জাহান্-আরার শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন জাহান্-আরার বয়ক্রম মাত্র পাঁচ বৎসর ছিল।

---

* আমরা তালেব-আম্লির লিখিত দিওয়ান খানি পাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। কলিকাতায় ও অপরাপর স্থানের পুস্তক বিক্রেতারা জানাইয়াছেন যে, তাহা এখন আর ছাপা হয় না। বিখ্যাত খোদা বখশ্ লাইব্রেরীতে নাকি একখানি আছে, এবং আমার কোন বন্ধু তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

† শাহজাহান নামা দ্রষ্টব্য।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় যে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে বড় বড় কলেজ স্কুল ছিল না, বিশেষ বন্দোবস্তযুক্ত কোন ইউনিভার্সিটী ছিল না, রাজা বাদশা হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারতের হিন্দু মুসলমান জন সাধারণ আপনাপন গৃহে ওস্তাদ (শিক্ষক) রাখিয়া, স্ব স্ব সন্তান-সন্ততিদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। তখন এখনকার মত স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকের এত ছড়া-ছড়ি ছিল না—হস্ত লিখিত পুস্তকই যে তখন ছাত্র ছাত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র অবলম্বন ছিল, এ সকল কথার কথঞ্চিৎ আভাষ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। তখনকার শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা যে কেবল পুস্তক পাঠ করাইয়াই শিক্ষাদান কার্য্য সমাপ্ত করিতেন তাহা নহে, বরং তাঁহারা অনেক সময় ছাত্র ছাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া (পর্দ্দা প্রথার সম্মান রক্ষা করতঃ) ভ্রমণে বহির্গত হইতেন এবং সর্ব্বদাই তাহাদের সহিত বিবিধ নীতিপূর্ণ ও চিত্তবিনোদক গল্প করিয়া ছাত্রদের শিক্ষা সহজ সাধ্য করিয়া দিতেন। *

শাহী-আমলের মুসলমানেরা বর্ত্তমান সময়ের মুসলমান সমাজের ন্যায় স্ত্রী শিক্ষা ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। তখনকার মুসলমান সমাজ পুত্র কন্যা নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান ভাবে শিক্ষাদান করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিতেন। তখন এখনকার অনুরূপ স্ত্রী শিক্ষার জন্য এত গার্‌ল স্কুল, মেমোরিয়েল স্কুল ও কলেজাদি ছিল না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তখনকার বালিকারা মূর্খও থাকিত না। তখনকার কন্যার অভিভাবকেরা বুঝিতেন ও জানিতেন যে, "সমাজের সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিতে হইলে, প্রথমে শিক্ষিত মায়ের অভাব মোচন করিতে হইবে।" তাঁহারা আরও বলিতেন যে "পুত্রদিগের ন্যায় কন্যাদিগকেও শিক্ষা দিতে আমরা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" সুতরাং সামান্য পথের ভিখারী হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত সকলেই আপন আপন পুত্রদিগের ন্যায় কন্যাদিগকেও উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেন। এখনকার ন্যায় তখন মুসলমান সমাজে "কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। বর্ত্তমান সময় যাঁহারা মহিলাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ঘোর বিরোধি, তাঁহাদের পক্ষেও বলিবার যুক্তি তর্ক না আছে, এমন নহে, কিন্তু দোষ কাহাদের ?—দোষ শিক্ষার, না শিক্ষার ব্যবস্থার ? তখনকার অভিভাবকেরা যে নীতি অবলম্বনে কন্যাদিগকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেন; এখনকার অভিভাবকেরা সে নিয়ম ও নীতির পরিবর্ত্তন করে নাই ?

যে সময় দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল, সে সময় বাদশাহ জাদীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে গণ্য না হইবে কেন ? সুতরাং বাদশাহজাদী জাহান্‌-আরা বেগমের সুশিক্ষার জন্য আদর্শ শিক্ষয়িত্রী সদর-উন্‌-নেসা খানমকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সদর-উন্‌-নেসা খানম অনেক সময় ছাত্রী জাহান্‌-আরাকে সঙ্গে লইয়া, দেশ ভ্রমণে বিশেষতঃ তীর্থস্থানের জেয়ারতে বহির্গত হইতেন। জাহান্‌-আরাকে তিনি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, এবং জাহান্‌-আরাও তাঁহাকে অত্যধিক পরিমাণে ভক্তি, শ্রদ্ধা

* অধুনা ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়েও এই নিয়ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে।

ও ভয় করিতেন। কেবল যে জাহান্‌-আরাই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা নহে। নূরজাহান, মোমতাজ মহল ও লাড্‌লি-বেগম † ইহাঁরাও তাঁহাকে ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা, করিতেন।

জাহান্‌-আরা বেগম, এই মহিয়সি মহিলার নিকট একাদিক্রমে ২৯ বৎসর কাল শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষয়িত্রী সদর-উন্‌-নেসা খানম, হিজরী ১০৫৬ অব্দে, লাহোর নগরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। কিন্তু মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়স ঠিক কত হইয়াছিল, ত। জানিবার কোনই উপায় নাই। ইহাঁর মৃত্যুতে রাজধানীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই তিন দিন কাল শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বাদশাহ পর্য্যন্ত ইহাঁর শোকে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এই নির্ম্মল চরিত্র বিদুষি "ওস্তানির" শোকে, রাজনন্দিনী জাহান্‌-আরা বেগম দীর্ঘ দিন ধরিয়া শোকাভিভূতা ছিলেন। সদর-উন্‌নেসার মৃত্যুর পর হইতেই, প্রকৃত প্রস্তাবে জাহান্‌-আরা বেগম সম্পূর্ণরূপে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সদর-উন্‌-নেসা যে সময় পীড়াক্রান্ত হইয়া, মৃত্যুশয্যায় শায়িতা হয়েন, সে সময় জাহান্‌-আরা দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সেবা যত্ন করিয়াছিলেন। সম্রাট শাহজাহান ও প্রত্যহ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সংবাদ গ্রহণ ও দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কুল্‌সুম নাম্নী এক বাঁদী, সদর-উন-নেসার সেবার ভার তাঁহাকে দিয়া, জাহান্‌-আরাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু জাহান্‌-আরা উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, অধুনা আমাদের নিকট তাঁহা গল্প বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার জন্য বাঁদী নিযুক্ত হইয়াছ, সুতরাং আমাকে এরূপ অনুরোধ করা তোমাদের পক্ষে অন্যায় না হইতে পারে; কিন্তু আমি যাঁহার বাদী, যিনি একাধারে আমার মা ও ওস্তাদ, তাঁহার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কি অপরের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে? ইচ্ছা হয় তোমরা বিশ্রামার্থ চলিয়া যাইতে পার, আমার কোন আপত্তি নাই।"

বিখ্যাত তাজগঞ্জ নামক স্থানে, শিক্ষয়িত্রীকুল উজ্জ্বলকারিণী সদর-উন্‌-নেসা খানমের সমাধি মন্দির জীর্ণদশায় বিদ্যমান থাকিয়া, আজিও অতিতের গাথা প্রচার করিতেছে। আগরা প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষয়িত্রীরা, আজিও মধ্যে মধ্যে তাঁহার পবিত্র সমাধি ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া জেয়ারত করিয়া থাকেন। জাহান্‌-আরা বেগম, এই আদর্শ শিক্ষয়িত্রীর পরকালের মঙ্গল কামনা করিয়া, দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ভিক্ষুকদিগকে দান করিয়াছিলেন, এবং ত্রিশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে তাঁহার সমাধি গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

---

† নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফ্‌গানের ঔরষ জাত কন্যা।

খোদা-তায়ালার অস্তিত্ব।

প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণ খোদা-তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার সার এই যে—"জগৎ সৃষ্ট বস্তু, সুতরাং যে জিনিষ সৃষ্ট—অনাদি নয়, তাহা স্বীয় অস্তিত্বলাভের নিমিত্ত কোন এক কারণের মুখাপেক্ষী হইবে ইহা নিশ্চিত। বলা বাহুল্য যে, সৃষ্ট জগতের এই কারণই খোদা।" এই যুক্তির দ্বিতীয় সূত্রটী (অংশ) স্বতঃসিদ্ধ। প্রথম সূত্রের প্রমাণ স্থলে তাঁহারা যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা এই—জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, এবং যাহা পরিবর্ত্তন শীল তাহা অবশ্যই অনিত্য, সুতরাং জগৎ অনিত্য। বাহ্যতঃ এই যুক্তি নিতান্তই সহজ বোধ্য ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অধিক উচ্চবাচ্য করা হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ভ্রম শূন্য নয়। দৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থই দুইটী বিষয়ের সমষ্টি মাত্র, মৌলিক পদার্থ এবং তাহার এক বিশেষ অবস্থা। যে জিনিষের পরিবর্ত্তন হইতেছে বা যাহা পরিবর্ত্তনশীল, তাহা মাত্র এই অবস্থা, কিন্তু মৌলিক পদার্থ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। যখন কোন জিনিষ ধ্বংস বা বিলীন হইয়া যায় তখন তাহার মৌলিক উপকরণ কোন না কোন অবস্থায় থাকিয়াই যায়, মাত্র উক্ত বস্তুর বিশেষ অবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিলীন হইয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন,—একখণ্ড কাগজ পুড়াইয়া ফেল, তাহা ভস্মে পরিণত হইবে, কাগজ ধ্বংস হইয়া যাইবে সত্য, কিন্তু মূল জড়ের দ্বিতীয় অবস্থা ভস্মরূপে বিদ্যমান থাকিবে। আবার ভস্মকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিলে অবস্থান্তরে যাইয়া তাহার মূল উপকরণ বিদ্যমান থাকিবেই। বস্তুতঃ বিশ্বজগতে মাত্র জড় পদার্থের অবস্থারই পরিবর্ত্তন হয়, মূল বস্তুর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এখনও কোন পরীক্ষা বা প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

এই যুক্তি ঠিক হইলে অবস্থার হিসাবে জগৎকে সৃষ্ট বস্তু বলা যাইতে পারে, কিন্তু মূলের হিসাবে তাহা বলা চলে না, অপিচ যদি "জগৎ সৃষ্ট" ইহা নির্ণীত না হয়, তবে এই যুক্তিও ভিত্তিহীন বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। এই প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "এরিষ্টটল্" (আরাস্তু) যুক্তি সম্বন্ধে অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি বলেন, "জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই কোন না কোন

এরিষ্টটলের যুক্তি।

প্রকারের ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের নিদর্শন পাওয়া যায়, কারণ বস্তু মাত্রই যে, হয় উন্নতির দিকে না হয় অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে এই বর্দ্ধন ও অবনমন ক্রিয়ারই অন্যতম রূপান্তর

মাত্র। যে জিনিষকে আমরা অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান আছে দেখিতে পাই, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ পুরাতন অণুপরমাণু সমূহ ক্রমে বিলীন হইয়া যাইতেছে এবং তাহার স্থলে নূতন উপকরণ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। পদার্থ মাত্রেরই এই পরিবর্ত্তনশীলতা, ইহাও এক প্রকার ক্রিয়ার পরিচায়ক। অতএব সমগ্র জগৎই ক্রিয়া-প্রবণ বা পরিবর্ত্তনশীল, এবং যে জিনিষ ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনশীল—তাহার কর্ম্মকারক কেহ আছে এরূপ বিশ্বাস স্বভাবতই লোকের অন্তরে বদ্ধমূল হয়, এখন ইহার দুইটি অবস্থা বিবেচনার বিষয়। প্রথমতঃ, হয় এই ক্রমগতিশীলতা (সেল্‌সেলা) যদি কারণ পরম্পরার কোন এক স্থানে গিয়া সীমাবদ্ধ হয় অর্থাৎ অবশেষে এই ক্রমগতি বা পরিবর্ত্তনশীলতার মূল কারণরূপে এমন এক শক্তি নির্ণীত হয় যে, সেই আদি কারণ উল্লিখিত নিয়মের মধ্যবর্ত্তিতায় সমস্ত জিনিষেরই কর্ম্মকারকরূপে বিদ্যমান থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জগতে বিবিধ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছেন, কিন্তু তিনি বা সেই কারণ স্বয়ং অপরিবর্ত্তনীয়, এই শক্তি বা কারণের নামই "খোদা"। দ্বিতীয়তঃ ক্রম-পরিবর্ত্তনশীলতার কারণ যদি কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে না ঠেকে এবং ক্রমে কারণ পরম্পরার শ্রেণী অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা হইলে ক্রম-পরিবর্ত্তনশীলতার কার্য্যকে অসীম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা কি প্রামাণ্য ও স্বীকার্য্য?

এরিষ্টটলের ব্যক্তিগত মত এই যে, "জগৎ অনাদি এবং স্বয়ম্ভূত, কিন্তু তাহার ক্রিয়া সৃষ্ট, খোদাতালা এই ক্রিয়ারই স্রষ্টা, এই যুক্তি অনুযায়ী তিনি আল্লার অস্তিত্বের অনুকূলে ক্রিয়া লইয়া যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, মোস্‌লেম দার্শনিকদিগের মধ্যে "এবনে রোশদের"ও এই মত। *

* দার্শনিক এবনে রোশদের পুরা নাম আবু অলিদ মোহাম্মদ বেন আহমদ বেন রোশদ্, ৫১৪ হিং ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন দেশের কার্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে অত্যল্পকাল মধ্যে নানা শাস্ত্রে ও বহু বিদ্যায় অতুলনীয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন করেন, স্পেনের তৎকালীন গুণগ্রাহী সম্রাট আবদুল মুমেন, এবনে রোশদের পাণ্ডিত্যে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কাজির সম্মানিত পদ লইতে অনুরোধ করেন, রাজাদেশ অবহেলা না করিয়া তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন, এবং স্বীয় কার্য্যে অত্যন্ত নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যে "কাজি-অল্-কুজ্জাত" এর মহা সম্মানের পদে বরিত হন! এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র সপ্তবিংশতি বৎসর ছিল। আব্দুল মুমিনের পর তদীয়পুত্র ইউছফ, এবং ইউছফের পর তৎপুত্র "মনসুর" সিংহাসনারূঢ় হন, জ্ঞানী জনের প্রতি স্বভাবত ভক্তি প্রবণতাবশতঃ ইঁহারা উভয়েই এবনে রোশদের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

কি তর্কশাস্ত্রে, কি দর্শনশাস্ত্রে এবনে রোশদের পাণ্ডিত্যের স্বীমাছিলনা। তিনি "এরিষ্টটল" ও "প্লেটোর" জটিলতাময় দর্শনের বিরাট ভাষ্য পুস্তক লিখিয়া তাহা মানুষের পক্ষে সহজবোধ্য করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের দর্শনের অনেকগুলীন সূত্র ও প্রতিজ্ঞার অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া নূতন মতের সৃষ্টি করিয়া দর্শনে নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন।

বু-আলী সিনাও জগতের অনাদিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু এসলামের প্রভাবে জগৎ খোদার স্বষ্ট নয়” এ কথা তিনি বলিতে পারেন নাই। এই জন্য তিনি এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন যে, “জগৎ অনাদি এবং তাহা খোদার স্বষ্ট।” এই যুক্তির উপর এরূপ সংশয় আরোপিত হইতে পারে যে, যদি জগৎ এবং ঈশ্বর দুইকেই অনাদি অনন্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে একক কর্ম্ম, ও অপরকে কর্ত্তা কিরূপে বলা চলে? যেহেতু কর্ত্তা ও কর্ম্মের মধ্যে সময়ের অগ্র পশ্চাৎ বা ব্যবধান হওয়া আবশ্যক। “বু-আলী সিনা” ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, কর্ত্তার জন্য মাত্র মূলতঃ অগ্রে হওয়া সাব্যস্ত হইলেই হইল, সময়ের হিসাবে অগ্রে হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার আবশ্যক নাই; যথা কুঞ্জিকার ক্রিয়াই তালা খুলিবার কর্ত্তা, কিন্তু এস্থলে কুঞ্জিকার ক্রিয়া

দার্শনিক বু-আলী সিনার যুক্তি।

ইউরোপীয় সমাজে বহুকাল যাবত একথা প্রবাদবাক্যবৎ ব্যবহৃত হইত যে “প্রকৃতির মূলতত্ত্ব কোথায় তাহা জানিতে হইলে ‘এরিষ্টটলের দর্শন বুঝিতে হইবে,’ এবং এরিষ্টটলের দর্শন কি, তাহা বুঝিতে হইলে এবনে রোশদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে হইবে। এবনে রোশদের দর্শন পুস্তক বা ভাষ্য না বুঝিয়া এরিষ্টটলের দর্শন বোধগম্য করা মানুষের পক্ষে সহজ সাধ্য নয়”। ইহা হইতেই এবনে রোশদের পাণ্ডিত্যের অনুমান করা যাইতে পারে।

আরবী ভাষায় এবনে রোশদের একাধিক জীবন চরিত আছে। ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত প্রোফেসার রেনান, ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবনে রোশদের একখানি বিস্তারিত জীবন চরিত লিখিয়াছেন, তাহতে তিনি এবনে রোশদের গ্রন্থাবলী ও দর্শন এবং জীবনী লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, “জার্ম্মাণ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় দার্শনিকগণ দর্শন সম্বন্ধে বহুকাল যাবত এবনে রোশদের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং তাঁহারা বিদ্বান সমাজে আপনাদিগকে এবনে রোশদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গৌরব লাভ করিতেন।

এবনে রোশদ্ এমাম গাজ্জালীর শিষ্যস্থানীয় ছিলেন, এবং এমাম সাহেবের দর্শন, এল্‌ম কালাম ও এরিষ্টটল ও প্লেটোর দর্শনের প্রতিবাদ এবং মূলধর্ম্মের নিগূঢ়তম ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমাম সাহেবেরই ন্যায় স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হইয়াছিলেন। কি দর্শন বিজ্ঞানে, কি তর্কশাস্ত্রে, কি এল্‌ম কালামে, পশ্চিম দেশীয় (স্পেন দেশীয়) এবনে মাজা, এবনে তফিল এবং পূর্ব্ব দেশীয় (প্রাচ্য দেশীয়) আবু নসর ফারাবী, এবনে তামিমিয়া, আবু আলী সিনা, আবু মোসলেম ও গাজালী ব্যতীত আর কেহই এবনে রোশদের সমকক্ষ ছিলেন না! তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকই জার্ম্মাণ ও ফ্রান্স প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। যে মহা কার্য্য সাধনের জন্য এবনে রোশদ পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, অর্থাৎ পৌরাণিক জটিলতাময় দর্শনকে সহজ বোধ্য করিয়া সন্ধিগ্ধচিত্ত মানবের নানাদিকে বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল চিন্তাস্রোতকে সরল ও সহজগামী করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথকে প্রশস্ত করিয়া দিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিয়া ৫৯৫ হিং অব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

এবং তালা খুলিতে এক নিমেশ সময়েরও অগ্র পশ্চাৎ হয় নাই। * মোসলেম ধর্ম্মগত দার্শনিকগণের (মোতাকাল্লেমিনগণের) মতে আল্লা ব্যতীত অন্য কোন জিনিষের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে খোদাতালার একত্বের গৌরব হ্রাস করা হয় বলিয়া, তাঁহারা "জগৎ"কে সৃষ্ট বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, এবং জগৎ সৃষ্ট এই যুক্তির উপরই তাঁহারা খোদাতালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়াছেন। জগতের সৃষ্ট হওয়া সম্বন্ধে "মোতাকাল্লেমিন"দিগের যে যুক্তি, তাহা বুঝিবার জন্য নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলিন স্মরণ রাখা আবশ্যক :—

মোতাকাল্লেমিন-দিগের যুক্তি।

১। জগতে দ্বিবিধ জিনিষ পাওয়া যায় :—মূল পদার্থ এবং তাহার "ধর্ম্ম" বা গুণ (عرض ও جوهر) যে বস্তু স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ জন্য অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নয় তাহাই মৌলিক বস্তু; যেমন প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ট, জল, ইত্যাদি। যে বস্তু অন্যের সাহায্য ব্যতীত আত্ম প্রকাশে অক্ষম, তাহাই বস্তুর গুণ বা ধর্ম্ম। যথা রং, গন্ধ, স্বাদ, সুখ, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি।

২। কোন জড়পদার্থই স্ব ধর্ম্ম বা স্ব গুণ শূন্য হইতে পারে না, কেননা সকল জড়বস্তুরই কোননা কোন অবস্থা বা আকার বিশিষ্ট না হইয়া উপায়ন্তর নাই, এবং এই অবস্থা ও আকারই তাহার ধর্ম্ম বা গুণ, প্রত্যুত সর্ব্ববিধ জড়বস্তুতেই কোননা কোন প্রকারের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, অপিচ এই ক্রিয়াই তাহার ধর্ম্ম বা গুণ। ফলকথা, যত প্রকার জড়বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, সে সকলেতেই কোননা কোন প্রকার ধর্ম্ম বা গুণ অবশ্যই পাওয়া যাইবে। অতএব এখন বেশ বুঝা গেল যে, কোন জড়বস্তুই ধর্ম্ম বা গুণশূন্য হইতে পারে না।

৩। ধর্ম্ম বা গুণ পরিবর্ত্তনশীল ও অনিত্য অর্থাৎ তাহা সৃষ্টি হইতেছে এবং ধ্বংস হইয়া যাইতেছে।

৪। যে জিনিষ কখনই ধর্ম্ম বা গুণ শূন্য হইতে পারে না তাহা অবশ্যই সৃষ্ট বস্তু; কেননা যদি তাহাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম বা গুণকেও অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু যে দুইটী জিনিষ পরস্পর পরস্পরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তন্মধ্যে একটী যদি অনাদি হয় তবে দ্বিতীয়টীও অবশ্যই অনাদি হইবে। নতুবা ইহাদের উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আবশ্যক হইবে। পক্ষান্তরে ইহা অসম্ভব। †

---

* উদাহরণটী এইরূপে বুঝিলে আরও সহজ হইবে—হাত ও চাবি, এই দুই এর গতিতে সময়ের হিসাবে একটুও অগ্রপশ্চাৎ হওয়া আমরা ধারণা করিতে পারি না; কিন্তু তালা খুলিবার সময় হাতের গতি যে চাবির গতির পূর্ব্বেই হইয়া থাকে, একথা সকলেই নিঃসন্দেহে স্বীকার করিবেন। —সম্পাদক।

† কেহ যদি পূর্ব্বোল্লিখিত চাবি ও হাতের গতির উদাহরণ দিয়া এই সূত্রটীতে সংশয় উপস্থিত করেন, তাহা হইলে কি উত্তর দেওয়া হইবে? ফলতঃ আল্লার তত্ত্ব তিনিই যতটুকু মানুষকে শিখাইয়াছেন, মানুষের সসীম জ্ঞানেন্দ্রীয় তাহার অতিরিক্ত কিছুই বুঝিতে পারে নাই, কারণ পক্ষান্তরে তিনি অসীম। সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার একমাত্র উপলক্ষ কোরআন। —সম্পাদক।

এখন জগতের সৃষ্ট হওয়া সম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, জগৎ দুইটী অবস্থা হইতে কখনই মুক্ত নহে:—উহা "বস্তু" হইবে অথবা "গুণ" এবং "গুণ ও "বস্তু" দুইই সৃষ্ট বস্তু। গুণের সৃষ্ট হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। বস্তু এই জন্য সৃষ্ট যে, কোন বস্তুই গুণ শূন্য হইতে পারে না, অপিচ ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, যে জিনিষ গুণশূন্য নহে তাহা সৃষ্ট।

যখন ইহা নির্ণীত হইল যে, জগৎ সৃষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল, তখন অবশ্যই তাহার কোন কারণ আছেই। এখন এই কারণও যদি সৃষ্ট হয়, তবে তাহার জন্যও অপর কোন কারণের আবশ্যক হইবে। এই অবস্থায় এই পারম্পর্য্য (সেলসেলা) যে শক্তিতে যাইয়া শেষ হইবে, সেই শক্তিই "আল্লাহ"। আর যদি এই পরম্পরা কোথায়ও যাইয়া শেষ না হয়, তাহা হইলে তাহার ক্রমগতি মানিতে হইবে, পক্ষান্তরে ক্রমভাবের ক্রমগতির অসীমত্ব অসম্ভব। *

"মোতাকাল্লেমিন" পণ্ডিতদিগের এই যুক্তি, যত সময় পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করা যাইবে যে, সময়ের অসীমত্ব অসম্ভব, তত সময় পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইবে নতুবা ইহা একেবারেই ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

ইহা সত্য যে বস্তু গুণ শূন্য হইতে পারে না, কিন্তু অবিরত তাহার কোন এক বিশেষ গুণ সম্পন্ন হওয়ার আবশ্যক করে না, বরং প্রত্যেক সময় কোন না কোন গুণের অস্তিত্ব পাওয়া চাই। এবং যখন সময়ের অসীমত্ব স্বীকার করা যাইবে, তখন ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে, জগৎ অনাদি এবং তাহার ক্রম-পরিবর্ত্তনে কোননা কোন গুণের সহিত সম্বন্ধ থাকেই। এই গুণনিচয় পৃথক পৃথক অবস্থায় ত সৃষ্ট এবং পরিবর্ত্তনশীল আছেই। কিন্তু ইহার ক্রমগতি, যাহার নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা অনাদি এবং অসীম। জগতের সৃষ্ট হওয়ার অনুকূলে এই যুক্তি ছিল যে, যদি জগৎ অনাদি হয় তবে তাহার গুণ বা ধর্ম্মও অনাদি হইবে। আমরা বলিব যে, গুণ নিচয়ের প্রত্যেক অংশের অনাদি হওয়ার আবশ্যক করে না, বরং গুণের ক্রম-গতির অনাদিত্ব সাব্যস্ত হইলেই হইল। এবং যদি সময়ের অসীমত্ব সাব্যস্ত হয়, তবে ক্রম-গতির ও অসীম হওয়া সম্ভব হইবে। "মোতাকাল্লেমিন"গণ আরও বহু প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু সে সকলেরই সত্যতা "সময়ের অসীমত্ব অসম্ভব" এই যুক্তির উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে সময়ের অসীমত্ব অসম্ভব—ইহা সাব্যস্ত করিবার জন্য "দার্শনিক" ও "মোতাকাল্লেমিন"গণ বহু যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সে সকল যুক্তি তখনই কার্য্যকরী হইবে যখন ইহা স্বীকার করা যাইবে যে, "এই ক্রমগতি পর্য্যায়ক্রমে বিদ্যমান।" কিন্তু জড়বাদিগণ কারণ সমূহের ক্রমভাবকে এইরূপে স্বীকার করেন যে, "প্রত্যেক কারণ বিলীন হইয়া গিয়া তাহার স্থলে অন্য কারণ আসিয়া স্থান লইতেছে।

* মন্তেকের পরিভাষায় ইহাকে تسلسل বলা হয়, সাধারণতঃ ইহা অসম্ভব বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু স্বাধীন তর্কের নিক্তিতে তাহার ওজন খুব বেশী বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় না বলিয়াই আমাদের ধারণা।—সম্পাদক।

দার্শনিক "দওয়ানি" এরূপ দাবী করিয়াছেন যে, "এমতাবস্থায়ও যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেহেতু যদিও কারণ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে কিন্তু তাহার একত্রিত (জমা) এবং পর্য্যায়ক্রমে হওয়া, স্বীকার করা যাইতে পারে। কেননা, কারণ সমূহের একত্রিত হওয়া অসম্ভব নয়, এবং যাহা অসম্ভব নয় তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে।" কিন্তু দার্শনিক প্রবরের এই যুক্তি অভ্রান্ত নহে, যেহেতু, কারণ সমূহের একত্রিত হওয়া যদিও মূলতঃ অসম্ভব নহে, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাহা অসম্ভব, পক্ষান্তরে পরোক্ষভাবে অসম্ভব সাব্যস্ত হইলে যুক্তিতে অসম্ভবতঃ আসিয়া পড়ে, যদিও এই অসম্ভব পরোক্ষভাবে অসম্ভব হইবে।

ফল কথা এই সকল যুক্তিতে এক প্রধান ভুল এই যে, ইহা দ্বারা খোদাতালার অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইলেও তিনি যে, ইচ্ছা-শক্তি-সম্পন্ন ও সর্ব্বশক্তিমান ইহা প্রমাণীত হয় না। এই সকল যুক্তি দ্বারা মাত্র এক কারণের কারণ, علة العلل "cause of the causes" এর অস্তিত্ব নির্ণীত হয়। কিন্তু কারণের জন্য ইহা আবশ্যক করে না যে তাহা হইতে উৎপন্ন কর্ম্ম বা বিষয় সমুহ তাহার ইচ্ছা ও জ্ঞাতসারে প্রকাশ হউক। সূর্য্য জ্যোতিঃ বিকীরণের হেতু, কিন্তু তাহার জ্ঞান বা ইচ্ছা শক্তি কিছুই নাই, বরং তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছা ব্যতীত তাহা হইতে আপনা আপনিই জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই নীতি অনুযায়ী বহু দার্শনিকের মত এই যে, খোদাতালা জ্ঞানকে ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই—এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দার্শনিক 'বু-আলী' সীনাও ইহাঁদিগের মতের সমর্থনকারী।

দার্শনিকদিগের এই সকল যুক্তি লইয়া আলোচনা করিলে বেশ সহজেই বোধগম্য হয় যে, "এরিষ্টল" (আরস্তু) "প্লেটো" (আফ্‌লাতুন) ইহাঁরা কেহই এ বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই. এবং "মোতাকাল্লেমীন"গণও তাঁহাদিগেরই অনুগমন করিয়াছিলেন বলিয়া এ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারেন নাই! এখন দেখা যাউক. পবিত্র কোরআন এই বিশ্বাসকে কিরূপে সহজ বোধ্য করিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে?

খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের নীতি ও যুক্তি।

আসল কথা এই যে, মানব প্রকৃতি এমনই উপকরণে গঠিত হইয়াছে যে, খোদার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া তাহার গত্যন্তর নাই। মানব তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এ বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছেন যে. মানুষ প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন জ্ঞান. বিজ্ঞান, শিল্প, সভ্যতা ইত্যাদি সকলপ্রকার সভ্যতার সহিত মানুষ একেবারেই সংস্রব শূন্য ছিল, তখন তাহারা প্রথমে কল্পিত দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা করিয়াছিল, না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি খোদার পূজা করিয়াছিল? নগণ্য জড়বাদী (মেটিরিয়ালিষ্ট) গণ ব্যতীত আর সকল পণ্ডিতই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন. যে "মানুষ প্রথমে খোদাতালারই পূজা করিয়াছিল।" ভুবন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত "ম্যাক্সমুলার" লিখিয়াছেন "আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তখনই খোদার

সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, যখন তাঁহারা খোদার নামকরণ করিতেও সক্ষম হন নাই। তাহার পর শরীর যুক্ত খোদা (মূর্ত্তি) এরূপভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে, প্রকৃত খোদা উদাহরণের যবণিকার অন্তরালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

এইরূপে পৃথিবীর ইতিহাস যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, প্রত্যেক দেশের মানব সমাজেই খোদা-বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। আসিরিয়, মিশরবাসী, কালডীয়, য়্যাহুদী, ফিনিশিয়া ইহারা সকলই খোদা বিশ্বাসী ছিল। "প্লুটার্ক" বলিতেছেন "যদি তোমরা পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত কর তবে এমন বহু স্থান দেখিতে পাইবে, যেখানে না দুর্গ আছে, না রাজনীতি, না রাষ্ট্রীয় শাসন আছে, না শিক্ষা আছে, না জ্ঞান বিজ্ঞান আছে, না কৃষি শিল্প আছে, না ধনৈশ্বর্য্য আছে, কিন্তু এমন কোন স্থান পাইবে না যেস্থানে খোদা নাই।"

ফ্রান্সের" বিখ্যাত পাণ্ডিত "পোয়েণ্টার" (ইনি ওহি: ও এল্‌হাম স্বীকার করেন না) বলিয়াছেন, "জার ওয়াস্তার, মনু, সোলন, সক্রেটিস্, সাস্রূ ইহাঁরা সকলই একই প্রকৃতি বা পিতার উপাসনা করিতেন"। (১) আল্লাহতালা এই প্রকৃতিকে পবিত্র কোরআনে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ✱ (২)

"এবং যখন তোমার প্রতিপালক আদমের পৃষ্টদেশ হইতে তাহার সন্তানদিগকে বাহির করিলেন, এবং তাহাদিগকে তাহাদিগেরই সম্বন্ধে সাক্ষী করিলেন যে, "আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক প্রভু নহি?" তাহারা সকলই বলিয়া উঠিল :—"হাঁ! নিশ্চয়ই; আমরা ইহার সাক্ষী রহিলাম।"

কিন্তু পার্থিব জগতের বাহিরের অভ্যাস অনেক সময় এই প্রাকৃতিক শক্তিকে আবৃত করিয়া ফেলে, এই জন্য খোদাতালা এইরূপ সাবধানবাণী প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা—

افي الله شك فاطر السموات والارض "ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লার প্রতি কি সন্দেহ হইতে পারে?" সুরা এব্রাহিম, ২ রুকু।

পক্ষান্তরে পার্থিব অভ্যাস প্রাবল্যে অনেক স্থলে এই প্রাকৃতিক শক্তি এতই অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, তখন কেবলমাত্র সঙ্কেত ও তাড়না আর তেমন কার্য্যকরী হয়না, এই জন্য মাত্র তাহার উপর খোদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা হয় নাই, বরং পরীক্ষিত এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যজ্ঞানের সাহায্যে যাহাতে মানব বুঝিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

---

(১) মানসি ও ইথোরের দর্শন পুস্তক আরবী অনুবাদ বিরূতের ছাপা ১৭৫ পৃঃ।

(২) বিজ্ঞ সুধীমণ্ডলী পবিত্র কোরআনের এই উক্তির এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সৃষ্টি কর্ত্তা এমনই উপকরণে মানব-প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সৃষ্টি কর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে সে নিয়তই বাধ্য। সুবিখ্যাত এমাম ফখর উদ্দিন রাজির তফসির কবীর দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানোদয়ের প্রথমাবস্থায় মানুষ যে সকল স্বতঃসিদ্ধ ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে একটি এই যে, যখন নিয়মিতরূপে শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত কোন জিনিষ তাহার দৃষ্টিগোচর হয় তখন তাহার এই স্থির বিশ্বাস হইয়া যায় যে "এই জিনিষকে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে। যদি আমরা কতিপয় জিনিষকে একস্থানে বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখি, তবে আমাদের এরূপ ধারণা হয় যে, জিনিষগুলি আপনা আপনিই এইরূপ একত্রিত হইয়াছে। কিন্তু যখন সেগুলি এরূপ শৃঙ্খলা এবং নিয়মের সহিত রক্ষিত হইতে দেখি যে, কোন বিজ্ঞ শিল্পিও বহু চেষ্টায়ও সেরূপ করিতে সক্ষম হয় না, তখন এরূপ ধারণা কিছুতেই মনে স্থান পায়না যে, সেগুলি আপনা আপনিই এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়টি একটি অধিকতর পরিস্কার উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। "হাফেজ" বা "নেজামীর" কোন একটি কবিতা লও, এবং তাহার শব্দগুলি উল্টা পাল্টা করিয়া কোন একজন সাধারণ মানুষকে দাও, এবং তাহাকে ঐ শব্দগুলি যথাযথ ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বল, দেখিবে যে, সে ব্যক্তি শত শত বার তাহার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিবে, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা আর "হাফেজ" বা "নেজামির" কবিতা হইবে না। বস্তুতঃ তাহা সেই কবিতা সেই শব্দ সেই অক্ষর এবং সেই আকার ইকার, মাত্র সামান্য শৃঙ্খলার অভাব। যখন এই সামান্য ব্যাপারেই এত প্রভেদ, তখন ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে, এই সুনিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খল সুসজ্জিত জগৎ আপনা আপনি সৃষ্টি হইয়াছে? পবিত্র কোরআনে খোদাতা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে—

صنع الله الذي اتقن كل شي "ইহা সেই আল্লার শিল্প-নৈপুণ্য যিনি প্রত্যেক জিনিষকে সুশৃঙ্খল এবং সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوة فارجع البصر هل ترى من فطور —
"খোদাতালার সৃষ্টিতে তুমি (হে দর্শক) কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবেনা, অনন্তর পুনঃ পুনঃ চক্ষু ফিরাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতেছ কি?"—সুরা মোলক, ১ রুকু।

خلق كل شيئ فقدره تقديرا "তিনি সমস্ত পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, অনন্তর তাহা সুশৃঙ্খলা সহকারে যথেষ্টরূপে নিয়ম বদ্ধ করিয়াছেন"—সুরা ফোরকান, ১ রুকু।

لا تبديل لخلق الله "খোদাতালার সৃষ্টিতে পরিবর্ত্তন হয় না।"—সুরা রূম ৩ রুকু।

فلن تجد لسنة الله تبديلا "খোদাতালার নীতিতে তুমি পরিবর্ত্তন পাইবেনা"—সুরা আহজাব, ৮ রুকু।

এই সকল আয়াতে জগৎ সম্বন্ধে তিনটি গুণ বর্ণিত হইয়াছে, প্রথম তাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত, দ্বিতীয় তাহা পরিমিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ, তৃতীয় এমন নীতি ও নিয়মের অধীন যে, তাহা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

ইহাও গেল প্রমাণের ক্ষুদ্রাংশ, তাহার শ্রেষ্ঠাংশ স্বতঃসিদ্ধ। অর্থাৎ যে জিনিষ পূর্ণ শৃঙ্খলা-বদ্ধ এবং বরাবরই শ্রেণীবদ্ধ, তাহা কখনই স্বয়ং সৃষ্ট নহে বরং তাহা কোন সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্ট বস্তু।

এখন চিন্তা বা বিবেচনার বিষয় এই যে, এই জ্ঞানোন্নত বিংশ শতাব্দীতে, যে যুগে মানবের চূড়ান্ত (?) জ্ঞানোন্নতি সাধিত হইয়াছে, যে যুগে জগতের শত সহস্র গুপ্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, যে যুগে বিজ্ঞানের সম্মুখে প্রকৃতি স্বীয় পর্দ্দা উন্মোচন করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে—সেই যুগের বড় বড় দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণও খোদার অস্তিত্বের প্রমাণে সেই অকাট্য যুক্তিরই পুনরালোচনা করিয়াছেন—যাহা তের শত বর্ষ পূর্ব্বে "পবিত্র কোরআন" অতি সূক্ষ্ম ও পরিস্কার অথচ সহজ বোধ্য প্রণালীতে প্রকাশ করিয়াছে।

আইজাক্ নিউটন বলিতেছেন, "জগতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সময় ও স্থান বিশেষে শত সহস্র পরিবর্ত্তন হওয়া সত্বেও যে শৃঙ্খলা, ও আভ্যন্তরিণ সংযোগসম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহা সেই অনাদি অনন্ত মহাজ্ঞানী সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতেই সম্পাদিত হইয়াছে, নচেৎ এরূপ থাকা কখনই সম্ভবপর হইত না।"

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার বলিতেছেন, "যখন এই সকল গুপ্ত তত্ত্বের অবস্থাই এইরূপ যে, আমরা যতই তাহাতে প্রবেশ করিতে যাই, ততই তাহা আরও গুপ্ত হইয়া পড়ে। আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে সক্ষম হই না, তখন এতটুকু বিনা তর্কে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জ্ঞানাতীত আরও একটি অনাদি অনন্ত মহাশক্তি আছে, তাহা হইতেই এই সকল প্রকাশ পাইতেছে।"

জার্ম্মাণির বিখ্যাত পণ্ডিত কিমাল ফালা মরিয়া বলিতেছেন, "কিরূপে যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং কিরূপেই বা তাহা চিরকাল স্থিতি করিতেছে, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানই তাহা বুঝিতে অক্ষম। কাজেই বাধ্য হইয়া এমন একজন সৃষ্টি কর্ত্তাকে মানিতে হয়, যিনি অনাদি অনন্ত কাল হইতে স্ব-প্রভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন।"

প্রোফেসার লিনী বলিতেছেন, "মহাজ্ঞানী সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ স্বীয় আশ্চর্য্য এবং অত্যাশ্চার্য্য শিল্প নৈপুণ্য সহকারে আমার সম্মুখে এরূপভাবে দীপ্তিমান হন যে, তদ্দর্শনে আমার নয়ন উন্মুক্ত হইয়াই থাকে, এবং আমি একেবারেই উন্মত্ত হইয়া পড়ি। প্রত্যেক জিনিষে, তা সে জিনিষ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন—তাঁহার কতই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা—মহিমা, কতই অত্যাশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য, এবং কতই অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হই!"

পুণ্টাল এন্সাইক্লোপিডিয়ায় লিখিতেছেন—"জ্ঞানবিজ্ঞান কেবল আমাদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণার্থে নহে বরং তাহার আরও একটী প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তাহার সাহায্যে আমরা স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ তাঁহার অসীম মহিমা, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করিয়া আমরা তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিব।"

খোদাতালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেটুকু বলা হইল, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। ইহাতেই বোধগম্য হইবে যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের দুই একটি সোপান অতিক্রম করিলেই এসলামের বিশ্বাসের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়, তবে যাঁহারা নিম্নস্তরে পড়িয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের দাবী করিয়া অজ্ঞানান্ধকারে হাবু ডুবু খান; প্রকৃত জ্ঞানের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না।

আহমদ আলি।

মোস্তফা চরিতালোচনা।

শত্রুর আক্রমণ নিবারণ।

(১০)

এবারে বিষম গোল বাধিল—পূর্ব্ব কথিত কপটাচারী আব্দুল্লা মোনাফেক, মুসলমানগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধযাত্রার নানা আপত্তির সূচনা তুলিয়া দিল। তাহার দ্বারা প্রতারিত ও ভয় প্রদর্শিত হইয়া সুশিক্ষিত সমরাভিজ্ঞ রোমক সৈন্যের সহিত সংগ্রামসজ্জা করিতে অনেক বীর হৃদয়ও দুরু দুরু করিয়া উঠিল। আরবের সীমার বাহিরে যাইতে তাহাদের পা উঠিতে চায় না। এক এক সম্প্রদায়ের নেতা এক এক নূতন ভাবের আপত্তি তুলিতে লাগিল। রসদাভাবের প্রসঙ্গই সর্ব্বোপরি আপত্তি। কিন্তু, হজরত মোহাম্মদের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি প্রভাবে, মোনাফেক আব্দুল্লার চতুরতা প্রকাশ হইয়া পড়ায়, মোসলেম যোদ্ধৃগণের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল—তাহাদের সকল আপত্তি দূরীভূত হইয়া গেল। মদিনার সর্ব্বত্র "সাজসাজ" রব পড়িয়া গেল।

১০ হাজার অশ্বারোহী ও ২০ হাজার পদাতিক—মোট ৩০ হাজার মোসলেম সৈন্যের একত্র সমাবেশ হইল। রসদের চিন্তাই—সমধিক বলবতী ছিল—ধর্ম্ম প্রাণ মুসলমানগণের যত্নে ও উদ্যোগে তাহারও সুব্যবস্থা হইল। মহামনা হজরত আবুবকর সিদ্দিক, নিজের সমস্ত নগদার্থ ও অস্থাবর দ্রব্যজাত, ও হজরত ওমর তাঁহার যথাসর্ব্বস্বের অর্দ্ধেক এবং হজরত ওস্মান ধনবান থাকায় জন্য বিস্তর অর্থ যুদ্ধব্যয়ে উৎসর্গ করিলেন। আপরাপর মহাজের, আনসার এবং সখা সহচরগণও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্যে কুণ্ঠিত হইলেন না। যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব ও নিসংস্বল, তাহারা স্ব স্ব দৈনিক শ্রমার্জ্জিত যৎসামান্য অর্থও যুদ্ধব্যয়ভাণ্ডারে দান করিতে লাগিল। আবুআকিল রাত্রে পথিকদিগকে জল দিয়া মজুরি স্বরূপ চারিসের খোরমা (শুষ্ক খেজুর) পাইয়াছিল; তাহার দুইসের নিজ পরিবারবর্গের জন্য রাখিয়া বাকি দুইসের রসদ ভাণ্ডারে আনিয়া দিল। চারিদিক হইতে চাঁদা দিবার ধুম পড়িয়া গেল।

তখন মুসলমানগণের নব বল, নব উদ্যম—নব উৎসাহ ; এখনকার-মুসলমানের মত তাঁহারা হতোদ্যম বা হতোৎসাহ ছিলেন না। এখনকার মত তখন দুয়ারে দুয়ারে "চাঁদা চাঁদা" করিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে ও চাঁদাদাতাগণের বিরক্তি জনক মুখভঙ্গীর নিকট চাঁদার কৈফিয়ৎ দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত না। এখনকার কোন কোন ধনকুবেরের মত, নিজে দু'পয়সা রাখিয়া যাইতে পারিলে, ছেলে মেয়েরা সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবে, সাধারণের উপকারে বা সমাজ হিতসাধনে লাভ কি, ইত্যাদি রূপ বোলচাল, তখনকার ধনবানদের ছিল না ; কিসে এস্‌লাম উন্নত, পরিপুষ্ট, দিগন্ত ব্যাপ্ত, সর্ব্বত্র সম্মানিত, সমপুজিত ও সমাদৃত হইবে, কি উপায়ে এস্‌লামের সম্মান সম্ভ্রম ও গৌরবাদি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তখনকার মুসলমান ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই ধন-প্রাণ-দেহ-মন তাহারই জন্য উৎসর্গ করিতেন। অতএব, উপরি উক্ত প্রকারে সাধারণের অকাতরে প্রদত্ত অর্থে অচিরে যুদ্ধযাত্রার রসদাদি সংগ্রহ হইয়া গেল।

একালে সদুদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ হয় না, এমন বলিতেছি না। বহু কষ্টে যে চাঁদা সংগৃহীত হয়, তাহা কিন্তু, অনেক স্থলে যথা যোগ্য কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পায় না। সদুদ্দেশ্যে উহার ব্যবহার অল্পই হয়। প্রথমতঃ যাঁহারা চাঁদা সংগ্রহের নিমিত্ত পাণ্ডার পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের অনেকে ঐ সংগৃহীত অর্থের অপব্যবহার করেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ সংগৃহীত অর্থ যাঁহাদের হাতে মৌজুদ হয় বা থাকে, তাঁহাদের অনেকে সমাজের লীডার বা সমাজপতি হইয়াও ঐ সাধারণ হিতার্থ অর্থের অনর্থ ব্যয় করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না। কাজেই চাঁদার নাম শুনিলে লোকে নাক মুখ বিকৃত করে—চাঁদা দিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। এখনকার দাতা গৃহীতা উভয় শ্রেণীরই দোষ আছে। সুতরাং সাধারণের প্রদত্ত অর্থের দ্বারা মুসলমান সমাজের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা যাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যও অনুগামী বলিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি, তাঁহারা কি আমাদের মত নীচাশয় ছিলেন, না তাঁহারা স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে সমাজের লীডার সাজিতেন? খলিফাগণের ভাণ্ডারে ধনপূর্ণ থাকিত ; অথচ নিজের আহারের জন্য তাঁহারা স্বহস্তে পরিশ্রম করিতেন। ধন ভাণ্ডার সাধারণের—সাধারণ হিতের জন্য ;—তাঁহারা নিজে ব্যক্তিগত ব্যয়ের নিমিত্ত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না ; বা তাহা হইতে এক কপর্দ্দকও লইতেন না। একালের সমাজপতিগণ যদি সেই মহাপুরুষগণের প্রকৃত অনুগমন করিতেন, তাহা হইলে কি মুসলমান সমাজ এত দুর্দ্দশা ও জরাগ্রস্ত এবং পদে পদে অবমানিত হইত? যাহা হউক, রসদাদি যথোপযুক্ত ভাবে সংগৃহীত হইলে ৬৩০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, হজরত মোহাম্মদ উপরিবর্ণিত ৩০ হাজার মোসলেম যোদ্ধৃ সমভিব্যাহারে মদিনা হইতে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সানন্দে "আল্লাহো-আকবর" রবে মরুপ্রান্তর মুখরিত করিয়া, মরুভূমির অনলস্পর্শী বায়ু প্রবাহ ও আতপ তাপাদির বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া চলিলেন—দশ দিন চলিয়া আরব ও সিরিয়ার সীমান্তরেখা রূপ কোরা নামক (ওয়াদিয়ল কোরা) বিস্তৃত প্রান্তরে পহুঁছিলেন এবং ঐ প্রান্তরস্থিত "তবুক" নামক গ্রামের নিকটে শিবির সমাবেশ করিলেন। তবুকের

উত্তরে বনিগস্‌সান, বনিগস্‌সানের সরদারের হাতে নিরীহ ও নির্দ্দোষ পত্র বাহক হারেসের মৃত্যু ঘটিয়াছিল এবং বনি গস্‌সান ও তন্নিকটস্থ নখ্‌লা প্রভৃতির খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণও মদিনা আক্রমণে উদ্যত থাকার কথা মদিনায় রাষ্ট্র হইয়াছিল। এজন্য খৃষ্টানে ও মুসলমানে মোকাবেলা হইবার, কোরা ময়দানই যথোপযুক্ত স্থান ছিল। শত্রুর রণাকাঙ্খা থাকিলে, নিশ্চয়ই এই ময়দানে তাহার সেনা নিবাস স্থাপিত হইবে। এমত অবস্থায় তবুক হইতে আরও উত্তরে অগ্রসর হইবার মুসলমানগণের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

মুসলমানেরা এক মাসের অধিক কাল তবুকে অবস্থিতি করিলেন, কিন্তু কোন খৃষ্টীয় বাহিনীর সাড়া শব্দ পাইলেন না। উপরে বলিয়া আসা হইয়াছে, কোরা ময়দান আরবও সিরিয়ার সীমান্ত রেখা—ঐ ময়দান আরবকে সিরিয়া হইতে পৃথক করিয়াছে। ঐ ময়দানের উত্তরে সিরিয়া দেশ—উহা রোমক রাজের সীমাধিকৃত ছিল। সুতরাং আরবের উত্তর সীমা—সুদৃঢ় করিয়া আরবকে রোমক রাজ্যের আক্রমণ হইতে কতকটা নিরাপদ করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। এ জন্য হজরত মোহাম্মদ তবুকও উহার পার্শ্ববর্ত্তী খৃষ্টান অধিবাসিগণকে মুসলমান শাসনাধীনে নীত করা আবশ্যক বোধ করিলেন। তবুকের পশ্চিমাংশে আয়েলা; আয়েলার শাসনকর্ত্তা ইউহান্না এবং আরও কতিপয় সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান, "জিজিয়া" দিয়া মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। তবুকের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে "দমাতল জেন্দল"—ঐ নগর তদঞ্চলের খৃষ্টরাজ্যের রাজধানী। তথাকার রাজা একিদর (একিদর বেন্ আবদুল মালেক কুঁদরি) মুসলমান ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদের সাদরাহ্বানে উপস্থিত হইলেন না। * অসম সাহসী খালেদ, তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিলে, তিনিও জিজিয়া দানে মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তত্রস্থ যাবতীয় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধি হইয়া যথারীতি সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইল।

জিজিয়া প্রসঙ্গ।—জিজিয়ার কথা যখন প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত হইয়াছে, তখন তৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা হওয়া উচিত। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে জেরবার করিয়া, কষ্ট দিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার, "জিজিয়াই" প্রধান অস্ত্র থাকা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন এবং জিজিয়ার কথা উঠিলেই মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদের উপর গালাগালি বর্ষণ করেন। "জিজিয়া" শব্দটাকে নিতান্ত ঘৃণাজনক বলিয়া মনে করেন। আরও মনে করেন, জিজিয়া দেওয়ার মত অপমান জনক কাজ আর কিছুই ছিল না। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে হজরত মোহাম্মদ উহার প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন। মুসলমান আমলের পূর্ব্বে পারস্য রাজ "নওশেরওয়াঁর" সময়ে পারস্যে উহার প্রবর্ত্তন হয়। "জিজিয়া" আরবী ভাষার শব্দও নহে—উহা পারস্য "গিজিয়া" শব্দের নামান্তর। গিজিয়া শব্দের প্রথম অক্ষর "গাফ"(গ); কিন্তু, আরবী ভাষায় গাফ অক্ষর না থাকায়, গাফের পরিবর্ত্তে "জিমের" (জএর) ব্যবহার হইয়া, গিজিয়া শব্দ মুসলমান আমলে জিজিয়ায় পরিণত হইয়াছে।

* কিন্তু, শাসনকর্ত্তা আসমগ ও অনেকগুলি খৃষ্টান অধিবাসী ৬ষ্ঠ হিজরীতে মুসলমান সেনাপতি আবদুর রহমানের নিকটে এস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমাদের বাঙ্গালী বাবুরা জিজিয়া শব্দের মানে মুণ্ডকর ধরিয়াছেন। * কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা মুণ্ডকর নহে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিলে, তাহাদের শরীর ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার মুসলমানেরা লইতেন। কোন শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, মুসলমানেরাই তাহাকে দমন করিতেন—দস্যু তস্করাদির উপদ্রব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। যুদ্ধে যাইতে তাহাদের দায়িত্ব ছিল না। তাহারা নিশ্চিন্ত ভাবে আপনাদের কাজকর্ম্ম ব্যবসায়াদি করিত ও স্বাধীনতার সহিত স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। মুসলমানের ঐ সকল উপকারের বিনিময়ে তাহারা "জিজিয়া" নামধেয় সামান্য মাত্র কর, মুসলমানদিগকে দিত।

মুসলমানগণের উপর জিজিয়ার পরিবর্ত্তে জাকাত রূপ একটা গুরুতর কর ছিল এবং আছে। প্রত্যেক মুসলমানের বার্ষিক আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, জাকাত স্বরূপ রাজকোষে প্রদত্ত হইত। গবাদি পশু এবং অলঙ্কারাদির উপরেও জাকাতের বিধান ছিল ও আছে। প্রত্যেক মুসলমান বয়স্থ পুরুষই যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য হইত; ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় শান্তি সুখ সম্ভোগ করিবার অবসর পাইত না।

জিজিয়ার পরিমাণ বার্ষিক ৩৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। যাহারা বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী, তাহাদের বার্ষিক কর ১২৲ টাকা এবং দরিদ্রদিগের ৩৲ টাকা মাত্র কর ছিল। † অন্ধ, কাণা, খোঁড়া, পঙ্গু, অর্দ্ধাঙ্গ, বিকলাঙ্গ প্রভৃতিরূপ ব্যাধিগ্রস্তেরা, মুক বধিরেরা ও ২০ বৎসরের ন্যূন ও ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কেরা, ধর্ম্মযাজকেরা ও স্ত্রীলোকেরা এবং যাহাদের নিকট ৫০০ দেহরম (প্রায় ১২৫৲ টাকা) থাকিত না, তেমন ভাবের দরিদ্র লোকেরা জিজিয়ার দায় হইতে একেবারে মুক্ত ছিল।

জিজিয়া অপেক্ষা জাকাত অধিকতর ভারবহ ছিল। মনে করুন—একজন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর খরচ পত্র বাদে বার্ষিক এক হাজার টাকা আয় হইল—সেই টাকা সুদে বসিল—সুদের হার ন্যূন পক্ষে মাসিক শত করা ॥০ আনা ধরিলেও, বৎসরে তাহার ৬০৲ টাকা লাভ হইল, ‡ আর জিজিয়া স্বরূপ তাহাকে দিতে হইল মাত্র ১২৲। শাস্ত্রে মুসলমানের সুদ লওয়া নিষিদ্ধ বিষয়ে একজন মুসলমানের ঐ এক হাজার টাকা ঘরে পড়িয়া থাকিল, অথচ তাহার জাকাত লাগিল ২৫৲ টাকা। হীনাবস্থার লোকের যদি বৎসরে ২০০৲ টাকা থাকিত, তাহারসুদে উপরিউক্ত হিসাবে আয় হইত ১২ টাকা; তাহাকে জিজিয়া দিতে হইত মোট ৩৲ টাকা। ঐ

---

* বাঙ্গালা রাজস্থানে মুণ্ডকর শব্দের ব্যবহার আছে।

† কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সর্ব্বোচ্চ জিজিয়ার হার ২০৲ টাকা। লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইলেও ঐ ২০৲ টাকার অধিক জিজিয়া দিতে হইত না।

‡ খাতক মহাজনী কারবারে মাসিক শতকরা ॥০ হারে সুদের প্রচলন আছে বলিয়া শুনা যায় না। সুদের হার সচরাচর প্রায় ২ টাকার কম নহে। কোন কোন স্থলে মাসি শতকরা ৫৲ টাকার উপরও সুদের প্রচলন আছে।

শ্রেণীর মুসলমানের ২০০৲ টাকা অনর্থক পড়িয়া থাকিত, অথচ জাকাত বাবৎ তাহাকে দিতে হইত ৫৲ টাকা। ঐ উভয় শ্রেণীর অবস্থা তুলনা ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, ভিন্ন ধর্ম্মীর কর অধিক ছিল, কি মুসলমানের কর অধিক ছিল? যে যে কারণে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী জিজিয়ার দায় হইতে মুক্তি পাইবার অধিকারী বলিয়া উপরে বলা হইয়াছে, সেই সেই কারণে কোন মুসলমানকে জাকাত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত না। যাঁহাদের অনুমান, জিজিয়া রূপ করভারে প্রপীড়িত করিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে আনা হইত, তাঁহাদের অনুমানের ভিত্তি আকাশ কুসুমে স্থাপিত। জিজিয়ারূপ কর তত ভারবহ ছিল না। অতএব যাঁহারা জিজিয়া ও জাকাতের তথ্য না জানিয়া ও জানিবার চেষ্টা না করিয়া কেবলই জিজিয়া প্রবর্ত্তকগণের কলঙ্ক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ উক্তি ঐতিহাসিক প্রমাণ ও গবেষণা বিহীন বলিয়া সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। (ক্রমশঃ)

আবদুল লতিফ,
বর্দ্ধমান।

—— ঃ০ঃ ——

আহ্বান।

(১)

কে যাবি সেখানে তোরা,
আয়রে আয় ছুটে ;—
যেখানে আজান ধ্বনী
উঠছে মধুর ফুটে।
আকাশ পাতাল ভেদি, ঊষার আলোক ছেদি ;
করনে পশ্‌ছে অই
উল্কা সম বটে!—
কে যাবি আমার সাথে
আয়রে আয় ছুটে।
যেখানে পবিত্র গাথা
উঠ্‌ছে সুধা ফুটে।

(২)

ভাঙ্গিল প্রভাতি ঘুম
কার সে মধুর সুরে,
জাগিয়া খুজিনু তায়,
পলাইল কোন্ সে দূরে !
আল্লাহু আকবর ধ্বনী, পবিত্র মধুর বাণী,
রটিয়াছে সেই সুর
বিশ্ব ব্যেপে ব্যেপে ;
সেই গাথা সেই সুর হৃদি খানি ভরপুর।
গাছে গাছে পাতে পাতে
উঠ্‌ছে কেপে কেপে।
কে যাবি আমার সাথে
আয়রে আয় ছুটে।

(৩)

ওযে পলকের ঢেউ
ধরায় ছুটায় !
ওযে মরমে পরশে
হৃদি ছুয়ে যায়।
ওযে ছুট্‌ছে মধুর ধারা ; বিপুল এ বিশ্ব জোড়া
আকাশের গায় গায়
উঠিয়াছে ফুটে ;—
কে যাবি আমার সাথে
আয়রে আয় ছুটে।

(৪)

আজানের কণ্ঠ ধ্বনী
ঝরে সদা ক্ষীর !
যাও গেয়ে ধীরে ধীরে
হে ধীর সমীর।
সুখের তৃপ্তি হাসি উদ্বেলিত শান্তি রাশি ;
ওযে এম্‌নি আকর্ষণ,
হৃদি মাঝে মিশে করে
প্রেম সম্ভাষণ !
কে যাবি আমার সাথে
আয়রে আয় ছুটে !
যেখানে সোহাগ-প্রীতি
উঠিয়াছে ফুটে !

(৫)

শ্রবণে ঝঙ্কারি অই
মধুর আবাহন
কি যতনে মনটী ভরে
করছে বিতরণ;
ও পবিত্র মধুবাণী তাই, যে বিপুল বিশ্বখানি,
উঠ্‌ছে জেগে জেগে।
অই যে সুন্দর বিহগ গুলি, নাচ্‌ছে কেমন পাখা তুলি;
ওখানেতে সোণার কমল
উঠ্‌ছে কেমন ফুটে।
কে যাবি আমার সাথে
আয়রে আয় ছুটে।

(৬)

ওরে ভক্ত ও প্রেমিক,
তোলরে ভক্তির রোল।
যেখানে প্রেমের সুরে, হৃদি খানি পুরে পুরে,
উঠ্‌ছে মধুর বোল।
ঘন সবুজ গাছের ছায় যেখানে দাঁড়ায়ে গায়,
উষায় জাগিয়া করে;
মধুর আলাপন।
ল'তে ও প্রেমের দীক্ষা, কর্‌তে ও সাধন শিক্ষা,
ও সাধু, ও প্রেমিক
আয়রে তোরা ছুটে,
যেখানে দীক্ষার মন্ত্র
উঠ্‌ছে উষার আলো কেটে।
কি ধনী কি দীন, রাজা কি প্রজা
যে যেথায় আছিস
আয়রে ছুটে।

রায়হান উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী।